গল্পলহরী

ষষ্ঠ বর্ষ—১৩২৫

বৈশাখ—চৈত্র

সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু

১৩২৫।

মূল্য ২৸০ টাকা। ৪৭

প্রিণ্টার—শ্রীকুলচন্দ্র দে

শাস্ত্রপ্রচার প্রেস

৫নং ছিদামমুদীর লেন,

কলিকাতা।

বর্ষসূচী

১৩২৫

গল্পলহরী

৬ষ্ঠ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩২৫ { ১ম সংখ্যা।

অভিমানিনী

লেখিকা—শ্রীমতী শরদিন্দু সরকার

(১)

গোধূলি লগ্নে যথা সময় রেণুকাবালার সহিত বিনয়কুমারের বিবাহ হইয়া গেল। জামাই দেখিয়া সমাগত সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছিল। মাতৃপিতৃহীনা অভাগিনী রেণুকার কপালে এরূপ বর জুটিবে তাহা কেহ একদিনের জন্যও মনের কোণে স্থান দেয় নাই!

শুভদৃষ্টির সময় চিরদুঃখিনী রেণুকা স্বীয় সলজ্জ সশঙ্ক-দৃষ্টি বিনয়কুমারের উদাস দৃষ্টির সহিত মুহূর্ত্ত মাত্র মিলাইয়া চক্ষু নত করিল—কি সুন্দর মুখ! মনে মনে নিজের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের সুখময় চিত্র মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজ হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইল।

পরদিন শুভ মুহূর্ত্তে বিনয়কুমার বধূ লইয়া ঘরে ফিরিলে, মাতা আসিয়া "এস মা, আমার ঘরের লক্ষ্মী এস," বলিয়া নববধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। প্রতিবেশিনীগণ বধূর রূপের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল।

এ বিবাহে কিন্তু পতিপত্নীর মধ্যে, প্রথম প্রণয়ের উদ্দাম উচ্ছ্বাস তেমন দেখা গেল না। পিতৃহীন ধনীসন্তান উশৃঙ্খল যুবক—চিরদুঃখিনী পত্নীর উপর স্নেহযুক্ত হইতে পারিল না। তবুও পত্নীকে সুখী করিবার জন্য বসন ভূষণে অর্থব্যয় করিতে বা অন্যরূপে স্নেহ-যত্নের ত্রুটি করিত না। তাহাতে রেণুকাবালা মনে মনে অসুখী হইলেও ভালবাসার ত্রুটি লইয়া কোন পক্ষ

বিনয়কুমার বন্ধুবান্ধব লইয়া সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিত, গভীর রাত্রে তাহার বৈঠক ভঙ্গ হইলে নিদ্রিতা স্ত্রীর মুখখানি দেখিয়া ক্ষণিকের তরে তাহার যেন কি একটা ভাবের উদয় হইয়াই মুহূর্ত্তে মিলাইয়া যাইত। ঈষৎ হাসিয়া মনে মনে বলিত "আহা বেচারী"; ইহাতে যে পত্নীর মনে বিন্দুমাত্র ক্লেশের কারণ হইতে পারে—তাহা তাহার মনে আদৌ উদয় হইত না। সে ভাবিত রেণুকার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, চিরদুঃখিনী সে ইহার অধিক আশা তাহার থাকিতে পারে না। আর রেণুকাও তাহার মাতুলালয়ের অতীত জীবন—সঙ্গিনীদের সঙ্গে সেই ধুলা খেলা—কি সুখের দিনই তাহার গিয়াছে। তারপর যৌবনের প্রারম্ভে প্রথম যখন সে স্বামীর মুখ দেখিল এবং জানিল এই দেবতুল্য স্বামী তাহারই, তখন মনে হইল জগৎ কি সুন্দর—কি ইন্দ্রজাল লইয়া তাহার চোখের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। সেই ইন্দ্রজালের মধ্যে সেই প্রথম যৌবনের আশার আলোকে—সে কি সুখের স্বপ্নই দেখিয়াছিল। সে কি তখন জানিত—ভালবাসায় নৈরাশ্য আছে? পুরুষ-হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন পদার্থে গঠিত, সে হৃদয়ে তাহার মত দুঃখিনীর জন্য এতটুকু স্নেহও থাকিতে পারে না। মাতুলের আদর, মাতুলানীর স্নেহ, একদিনের জন্যও মাতা পিতার অভাব তাহাকে বুঝিতে দেয় নাই। আর আজ সে একটু স্নেহের কাঙ্গাল—যেদিন সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিল—অভিমানে তাহার চক্ষে জল আসিল। কেন সে এই ভুলের মধ্যেই আপনাকে ডুবাইয়া রাখিতে পারিল না—এই ভুলই যে তাহার জীবনের সুখ—ভবিষ্যতের আশা! স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইলে স্বর্গও যে তাহার প্রার্থনীয় নহে। তাই স্বামীর অবহেলা, অবজ্ঞা সহ্য করিয়াও তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যাহা কিছু প্রার্থনীয় ছিল—সমস্তই অকপটে স্বামীর চরণে উৎসর্গ করিয়া দিয়া, একটু স্নেহ পাইবার আশায় তৃষিত প্রাণে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এই নিদারুণ আঘাতে হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলেও—মুখ ফুটিয়া সে স্বামীকে কোনও কথা বলিতে পারিত না—সে যে বড় অভিমানিনী! সে গরীব, কিন্তু ভিখারিণী নহে।

(২)

বিনয়কুমার ধনী পিতার একমাত্র পুত্র। বাল্যে মাতার স্নেহঅঙ্কে প্রতিপালিত। যৌবনে অগাধ সম্পত্তি হাতে আসিলে ধনী সন্তানগণ প্রায়ই যেরূপ হইয়া থাকে—ততটা না হইলেও বিনয়কুমারের যে কিছুই ছিল, না তাহা বলা যায় না। সে অবাধে বন্ধুবান্ধব লইয়া হাস্য-কৌতুক নাচথিয়েটার,

আমোদ-প্রমোদেই দিন কাটাইয়া দিত, একবারও ভাবিত না যে তাহার অজ্ঞাতে দুইটী তৃষিত চক্ষু অন্তরাল হইতে তাহারই মুখের পানে চাহিয়া, নিরন্তর কতই ক্লেশ পাইতেছে। বিনয়কুমার যে পত্নীর উপর একবারেই স্নেহশূন্য ছিল, তাহা নয়; কিন্তু ভালবাসাকে অতিক্রম করিয়া স্বার্থরূপ প্রবল বৃত্তি তাহার চিত্তকে জয় করিয়া লওয়ার জন্যই তাহাকে পত্নীর প্রতি ঐরূপ স্নেহশূন্য বলিয়া মনে হইত। সে যাহাতে আমোদ পাইত, তাহা ছাড়া যে অন্য কোনও কর্ত্তব্য থাকিতে পারে তাহা একবারও তাহার মনে উদয় হইত না। পত্নীকে ক্রীড়ার-পুত্তলি এবং গৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার বস্তু ভিন্ন অন্য কিছুই ভাবিতে পারিত না। স্ত্রীর হৃদয়ও যে মনুষ্য হৃদয়—আঘাত পাইলে যে প্রতিঘাত করিতে পারে এ সন্দেহ তাহার কোন দিনই মনে স্থান পাইত না। রেণুকার সে সদা প্রফুল্ল মুখে আর বড় একটা হাসি দেখা যাইত না—শুধু একটা পাণ্ডুরতা ও ঈষৎ ম্লানিমা।

সেদিন শয্যা ঝাড়িয়া রেণুকা নূতন করিয়া শয্যা রচনা করিতেছিল। বিনয়কুমার আসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া কহিল "দুটো পান দাও তো।" রেণুকা ঈষৎ ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল "এত ব্যস্ত কেন, কোথায় যাওয়া হবে শুনি?" বিনয়কুমার আদেশের স্বরে বলিল "সে তোমার জানবার ত কিছু দরকার নেই! যা বল্‌ছি তাই কর।" রেণুকা আর কোনও কথা বলিল না, ডিবা হইতে পান লইয়া তাহার হাতে দিতেই সে ত্বরিত পদে বাহির হইয়া গেল। রেণুকা বসিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এতটুকুও তাহার জানিবার অধিকার নাই। সে দেখিয়াছে প্রতিবেশিনী কন্যা ও বধূগণের স্বামী তাহাদিগকে কত ভালবাসে, তাহার চেয়ে কত কুরূপা কুৎসিতাগণেরও কত সৌভাগ্য, তাহাদের স্বামী কতই স্নেহ যত্ন করিয়া থাকে, আর সে এমনই পোড়াকপাল লইয়া জন্মিয়াছে, যে একদিনও স্বামীর নিকট এতটুকু স্নেহ পাইল না, বা একটা মিষ্টি কথার আশা করিবারও তাহার অধিকার নাই—এমনই দুর্ভাগ্যবতী সে, তাহারই অদৃষ্টের দোষে এমন দেব তুল্য স্বামীকে সে সুখী করিতে পারিল না। সে ত অধিক আকাঙ্ক্ষা করে না, শুধু তাঁহার হৃদয়ে না হউক পায়ের তলে একটু স্থান—তাহাও তাহার ভাগ্যে নাই. সে কাঁদিয়া কাটিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িতেছিল এবং তাহার শরীর দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল,. তাহার পাণ্ডুরবিবর্ণ ম্লান মুখ দেখিয়া শাশুড়ী সব বুঝিতেন—নির্জ্জনে ছেলেকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইতেন, কিন্তু একটু তাচ্ছিল্যের

হাসি ভিন্ন অন্য উত্তর পাইতেন না, নিরুপায় হইয়া তাঁহার মাতৃ-হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ ঢালিয়া দিয়া বধূর যে ক্ষতিটুকু পূরণ করিতে নিষ্ফল যত্ন করিতেন, এবং আড়ালে দুই বিন্দু চোখের জল তাঁহার গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িত। রেণুকাও নিতান্ত ছেলেমানুষটী নহে, সে সব বুঝিত এবং এই দুঃখেই যে শাশুড়ীর দিন দিন শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে তাহাও বুঝিত—দুঃখিনীর একমাত্র সান্ত্বনার স্থল—তাহাও বুঝি হারাইতে হয় ভাবিয়া প্রাণপণে সে শাশুড়ীর সেবা করিত, এবং নির্জ্জনে যাইয়া চোখের জল ফেলিত। বিনয়কুমার সে ধাতের লোক নহে। মাতার অসুখ—ডাক্তার দেখিতেছে—সেবার জন্য রেণুকা আছে, এই হইলেই তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়াই সে মনে করে। এর বেশী আর কি করিতে পারে, ইহার বেশী এতটুকু কষ্ট সহিতে সে রাজি নহে। রেণুকা এজন্য কোন দিন অনুযোগ করিলে বলিত "তুমি আছ, আমি আবার কি কর্ব্ব শুনি?" রেণুকার সে কথার উত্তর দিতে ইচ্ছা হইত না—তথা হইতে সরিয়া যাইয়া অঞ্চলে চোখের জল মুছিত।

(৩)

মাতার মৃত্যুর পর বিনয়কুমারের যেটুকু বাধা ছিল তাহা আর রহিল না। রেণুকার প্রতি অবজ্ঞা অবহেলা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। গ্রামের যত নিষ্কর্ম্মা যুবক আসিয়া তার বন্ধুর দল বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

স্বামীর অবহেলা কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে থাকিলেও প্রকাশ করিয়া মনের ভার লঘু করিবার তাহার উপায় ছিল না। স্বামী-সৌভাগ্যবতী বলিয়া সখীজন ও আত্মীয় মহলে তাহার যে একটা সম্ভ্রম আছে, তাহা বিসর্জ্জন দিয়া আপনার দীনতা প্রকাশ করিয়া লোক-চক্ষে আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবে? সে তাহা জীবন থাকিতে পারিবে না। স্বামীর অবহেলার কথা প্রকাশ করিয়া পরের দয়া অনুকম্পার পাত্রী সে হইতে পারিবে না। তাহা সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে।

সময় অবাধে জল-স্রোতের ন্যায় অবিশ্রান্ত গতিতে আপনার গন্তব্য পথে বহিয়া যাইতেছিল। বিবাহের চারি বৎসর পরে রেণুকার একটী কন্যা জন্মিল। কন্যার মুখপানে চাহিয়া তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া অনন্দের অশ্রু ঝর্ ঝর্ ধারে ঝরিয়া পড়িল। এ মুখ দেখিয়া যত বড়ই পাষাণ হউক না কেন—ভাল না বাসিয়া কি থাকিতে পারে? মামা মামীর আদর যত্ন ছাড়িয়া আনন্দপূর্ণ চিত্তে সাত মাসের কন্যা লইয়া সে আবার স্বামী-গৃহে ফিরিয়া আসিল। রেণুকার

উপর বিনয়কুমারের যেমনই ব্যবহার হউক না—কন্যার প্রতি তাহার স্নেহের সীমা ছিল না। এই সাত মাসের মেয়েটীর সুন্দর টুক টুকে মুখখানিই তাহাকে কিছুদিনের জন্য শান্ত রাখিতে পারিয়াছিল। রেণুকা একটী আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল "হে ঠাকুর স্বামীর মতি ফিরাইয়া দাও।" প্রথম প্রথম বিনয়কুমার হাসিয়া দুই একটী কথা বলিত। কিন্তু অল্প দিন পরেই তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখা যাইতে লাগিল। একদিন কেহ নাই দেখিয়া রেণুকা বাহিরের কক্ষে আসিয়া স্বামীকে বন্দি করিল। বিনয় কুমার মৃদু হাসিয়া কহিল "একি তুমি এখানে রেণু, পালাও এখুনি কেহ এসে পড়বে।"

স্বামীর কথার মর্ম্ম বুঝিতে তাহার বেশী বিলম্ব হইল না। তা'ই রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল, ভাবিল 'বেশ আমিই বুঝি থাকতে পারি না' সেই হইতে সাধ্যমত দূরে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিত! এবং অবহেলার তীক্ষ্ণ অস্ত্র বাছিয়া বাছিয়া প্রয়োগ করিতে গিয়া নিজেই আহত বক্ষে আড়ালে যাইয়া চোখের জল মুছিত। যাহার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ঘোষণা সে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছে কিনা, তাহা ভাল বোঝা যাইত না।

ধনীগৃহে অর্থ সচ্ছলতা থাকায় দাসী চাকরের অভাব ছিল না। কন্যার জন্যও পৃথক দাসী নিযুক্ত আছে। তাহাকে সংসারের কাজ কর্ম্ম বড় একটা করিতে হইত না। স্বামীও তাহার নিকট কোন দিন কিছুই চাহেন নাই। তাহারও এ সম্বন্ধে বড় বেশী আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তা ছাড়া তাহার হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসাই স্বামীর চরণে সে ঢালিয়া দিয়াছে। সে আর কিছুই চাহে না—তাহার মনে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। স্বামীর সুখের জন্য সে নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিবে, তাঁহার নিকট দেনা পাওনার দাবি আর সে করিবে না—ত্যাগশীলা ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার সুখের জন্য সে দেহপাত করিবে। সবে আঠারো বৎসর বয়সে এমন করিয়া ত্যাগের মন্ত্র পাট করিতে তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে খুকীর সেই হাস্য প্রফুল্ল মুখখানির দিকে চাহিয়া আবার তাহার সংসারী হইতে সাধ হইল। কন্যাকে বুকে জড়াইয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে শত সহস্র চুম্বন করিল। মনের জ্বালা মনে চাপিয়া দিন দিন তাহার শরীর শীর্ণ হইয়া পড়িতে ছিল। মুখখানায় যেন বিষাদের কালিমা ছড়াইয়া পড়িল। একদিন সহসা তাহার ম্লান মুখ ও শরীরের শীর্ণতা বিনয়কুমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

খেয়ালি বিনয়কুমার অবিলম্বে দাসী চাকরকে অযথা বকিয়া ঝকিয়া হুলুস্থুল বাধাইয়া বসিল এবং ডাক্তার ডাকিয়া একটা বলকারক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিল। শান্ত কণ্ঠে রেণুকা জিজ্ঞাসা করিল "কিসের জন্যে এ সব? আমি ত কোনও ব্যায়ামের কথা কাহাকেও বলি নি।"

বিনয়কুমার অপ্রস্তুত হইয়া বলিল "তুমি বলেনি সত্য, কিন্তু আমি ত দেখতে পাচ্চি। রেণুকা আবারও শান্ত কণ্ঠে কহিল "তার কোনই দরকার ছিল না।" তাহাকে দেখাইয়া ঔষধটা জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল। ইহাতে বিনয়কুমার অন্তরে আঘাত পাইল কিনা তাহা ভাল বোঝা গেল না। সে কোন কথা না বলিয়া রেণুকার পানে একবার চাহিয়া দেখিল। তারপরে ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল। রেণুকা বিছানায় পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। ইহাপেক্ষা বিনয়কুমার যদি বকিত ঝকিত রাগ করিত তাহাও যে ভাল ছিল—এ যে বড় অসহ্য। এমন দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রাচারের বাহিরে বাস করা আর তাহার সহ্য হয় না! স্বামীর নিষ্ঠুর হৃদয় হীনতা নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়া—বর্ষাকালের জলে ভরা মেঘখণ্ডের ন্যায় তাহার হৃদয়েও দারুণ অভিমানের মেঘ জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

(৪)

সে দিন বিনয়কুমার শয়ন-কক্ষে শয্যোপরে কন্যাকে লইয়া খেলা করিতে ছিল। রেণুকা দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতেই বিনয়কুমার বলিয়া উঠিল "এই যে মেঘ চাইতেই জল! খুকিকে নাও তো, আমি বাইরে যাই।" রেণুকা তাহার মুখের পানে চাহিয়া ধীর স্বরে কহিল "এ সৌভাগ্য আমার কবে থেকে ফিরলো?" কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি পত্নীর মুখের উপর স্থাপিত রাখিয়া রহস্যের স্বরে বিনয়কুমার কহিল "এ সৌভাগ্যের অভাব তোমার ছিল নাকি?" রেণুকা আবারও শান্ত স্বরে কহিল "অন্ততঃ আমার ত তা'ই মনে হয়।" হো হো শব্দে হাসিয়া বিনয়কুমার কহিল "ভুল রেণু, এটা তোমার মস্ত ভুল।" রেণুকার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে কহিল "ভুল হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়—যে তা নয়।" ঈষৎ শ্লেষের স্বরে বিনয়কুমার কহিল "তোমার যদি এই বিশ্বাস—তবে তাই।" তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া পত্নীর মুখের উপর হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া লইয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

তারপরে হঠাৎ একদিন রেণুকার শরীর জ্বর জ্বর বোধ হইল, দুঃখীজনের আবার শরীর—ভাবিয়া কোন নিয়মই করিল না। ফলে জ্বর বাড়িয়া গেল।

ক্রমে বিনয়কুমার তাহা জানিতে পারিল। ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিল। কিন্তু রেণুকার তাহাতে তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। নিয়মিত ঔষধ পথ্যের ত্রুটি কিছুই হইল না। তবুও রোগ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ঔষধ প্রায়ই রেণুকার পেটে না গিয়া—গামলার মধ্যেই পড়িতে ছিল! কাজেই রোগের বৃদ্ধিই দেখা যাইতে লাগিল।

বিনয়কুমার এত দিনের পরে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু হায় তাহার আশা না মিটিতেই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইতে বসিয়াছে। আজ নিষ্ঠুর ভাগ্য যেন মোহময় স্বপ্নের মতই তাহাকে পরিহাস করিতেছে। সে পত্নীর রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া তীব্র বেদনায় দগ্ধ হইতে ছিল। কি নিরাশার সে চিত্র—কি গভীর বিষাদময়ী সে মূর্ত্তি! সেদিকে যেন আর চাওয়া যায় না। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। পত্নীর মুখের উপর হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া লইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

হাস্য-কৌতুক, আমোদ-প্রমোদ সব ছাড়িয়া প্রাণপণে সেবা যত্নের মধ্যে পত্নীকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে ছিল। তাহার নিজের জন্য না হইলেও স্নেহের কন্যা পরিমলের জন্য পত্নীকে বাঁচাইতে হইবে। নহিলে অবোধ বালিকা বাঁচিবে না। সে যখন মাতার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া মা মা বলিয়া মায়ের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহে—তখন বিনয়কুমারের চোখের জল রোধ করা অসাধ্য হইয়া পড়ে। সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল রেণু, নিয়ম মত ঔষধ খাও, নতুবা রোগ ত সারবে না!

বহুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর রেণুকা চক্ষু মেলিয়া স্বামীর মুখের উপর ম্লান দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিল "আমার মরবার ইচ্ছা যদি থাকে তাহলে কি তুমি আমাকে ধরে রাখতে পার্ব্বে?" আগ্রহের স্বরে বিনয় কুমার কহিল "আমার জন্য না হলেও—খুকির জন্যে তোমার এ ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিৎ নয় কি রেণু?" কন্যার নাম শুনিয়া তাহার আবার বাঁচিতে সাধ হইল। একটা চাপা নিঃশ্বাসে হৃদয় কম্পিত করিয়া কহিল "বৃথা চেষ্টা—সময় অতীত হয়ে গেছে।"

তাহার কোটরে প্রবিষ্ট কালো কালো চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া উঠিল। দেখিয়া কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বিনয়কুমার পত্নীর ক্ষীণ দুর্ব্বল হাতখানি আপনার কম্পিত হস্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল "না রেণু, তুমি যদি বাধা না দাও—তাহলে আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পার্ব্বো।" রেণুকা কোন উত্তর দিল না। আবার একটি চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

প্রতিবেশিনীগণ অবসর মত রেণুকাকে দেখিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়া বলিতেন "বিনু যে এমন বৌয়ের আঁচল ধরা হয়ে উঠবে তা কোন দিন মনে হয় নি।" কেহ একধাপ্ চড়াইয়া বলিতেন "হবে না কেন, এতদিন হয় নাই, তাই আশ্চর্য্য, দেখিস এবার ছোঁড়াকে ভেড়া বানিয়ে তুলবে।" রায় গৃহিণী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাপা স্বরে ঈষৎ হাসিয়া বলিতেন "আমি ত দেখে অবাক হয়ে গেছি বোন, ছোঁড়ার যদি এতটুকুও লজ্জা থাকে? বৌকে যেন তুলোর উপর শুইয়ে রেখেচে, এত বাড়াবাড়িও ভাল নয়! কোথায় বৌকে দেখে জ্বলে যেত—হলো ত একবারে আঁচল ধরা।" যদুর মা কুটিল হাসিয়া বলিতেন "ওগো আজকাল ওই ধরণই হয়েছে. ও ছোঁড়া এমন ছিল না, এখন তাও হলো, কালে কালে কতই দেখবে? ও কথা আর বলো কেন বোন্।" কেহ বলিতেন স্পষ্ট কথা বলব তার আবার 'ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়' কি বাছা, শাশুড়ী মারা গিয়ে বৌ যেন ধিঙ্গি হয়েছে।"

পত্নীর প্রতি ঠিক উচিত মত ব্যবহার কোন দিন করিতে পারে নাই বলিয়া আত্মগ্লানি প্রচ্ছন্ন ভাবে বিনয়কুমারের মনে সর্ব্বদাই জাগিয়া থাকিত। জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক রেণুকার প্রতি যে ত্রুটি করিয়াছিল—অত্যধিক স্নেহ প্রকাশে যেন সেই ত্রুটির স্খালন করিয়া পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিত। অনভ্যাস বশতঃ—নূতন করিয়া স্নেহ প্রকাশ অনেক সময় অত্যন্ত বিসদৃশ রূপেই প্রকাশ পাইত।

পাড়ার নিন্দুক রমণীগণের ক্রমেই তাহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা অনেক সময় রেণুকার দ্বারা নানা প্রকারে সাহায্য পাইয়া আসিয়াছে—এস্থলে তাহারাও নিঃসঙ্কোচে এ সম্বন্ধে দুই একটা মতামত প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু যাহার উপর প্রযুক্ত হইত সে এ সম্বন্ধে নিতান্তই অনভিজ্ঞা। জগতে আসিয়া এত অল্প স্নেহ সে লাভ করিয়াছে যে ইহার কৃত্রিমতা বুঝিবার শক্তি তাহার ছিল না। তবুও সেই অনাদৃতা কুণ্ঠিতা চির দুঃখিনী রেণুকা—রোগ শয্যোপরে এই অযাচিত স্নেহ আশাতীত রূপেই লাভ করিয়াছিল।

(৫)

জ্বর প্রত্যহই বাড়িয়া চলিয়াছিল। ক্ষীণদেহ ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া বিছানায় মিলাইয়া আসিতেছে, তবু বিনয়কুমার আশা ছাড়িতে পারে নাই। তাহারই অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই যে রেণুকা তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে।

এই অনুতাপ পলে পলে বিনয়কুমারকে দগ্ধ করিতেছিল। প্রাণসম স্নেহের কন্যার মুখপানে চাহিতে তাহার সাহস হইতে ছিল না। যদি রেণুকা ঝটিকাচ্যুত নীড়ের ন্যায় ঝোড়ো বাতাসে খসিয়া পড়ে তাহা হইলে কি হইবে? খুকিকে সে কিরূপে বাঁচাইয়া রাখিবে? ভাবিতে তাহার হৃদয় দ্বিধা হইয়া যাইতেছিল।

আজ রেণুকার অবস্থা একটু ভালর দিকেই আসিয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছেন আর ভয়ের কোনও কারণ নাই। বিনয়কুমারের মুখ আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কয় দিনের পরে আজ সে কন্যাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কত আদর করিল; এবং মনে মনে বলিল "হে ঠাকুর রেণুকে ফিরিয়ে দাও।" তাহার দুইগণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িল। নিদ্রিতা পত্নীর মুখপানে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়াছিল। রেণুকা ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া স্বামীর স্নেহাবনত দৃষ্টির সহিত আপনার উৎসুক দৃষ্টি মিলাইয়া ধীরে ধীরে কহিল "তাহলে সত্যিই তুমি আমাকে ভালবাস?" তাহার কালো কালো চোখ দুটী জলে ভরিয়া উঠিল। বেদনা-ব্যথিত স্বরে বিনয়কুমার কহিল "এখনও তোমার বিশ্বাস হয় নি রেণু, বল কি করলে তোমার এ সন্দেহ দূর হবে!" তাহার ম্লান বিবর্ণ মুখখানি আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। স্বামীর হাতখানি আপনার শীর্ণ ক্ষুদ্র হস্তের মধ্যে লইয়া করুণ স্বরে কহিল, "আমার বিশ্বাস কর্ত্তে যে সাহস হয় না—যদি এ স্বপ্ন আবার ভেঙ্গে যায়? আমি যে বড় অভাগিনী—তাই ভয় হয়।" সস্নেহে পত্নীর কপাল হইতে চূর্ণ কুন্তল গুচ্ছ সরাইয়া দিয়া কহিল "আমার সে মোহ কেটে গেছে রেণু, এখন আমি তোমার মূল্য বুঝতে পেরেছি. আর এ স্বপ্ন ভাঙ্গবার নয়। এ জীবন থাকতে নয়।" রেণুকার শীর্ণ ওষ্ঠে মৃদু হাস্য রেখা ফুটিয়া উঠিল। স্বামীর হাতখানি আপনার ক্ষুদ্র মুষ্টির মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া সে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

যেদিন রোগের দারুণ যন্ত্রণায় রেণুকা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল—সেদিনও এতখানি আশা সে করিতে পারে নাই। কন্যার স্নেহবশতঃই যে বিনয়কুমার তাহাকে ধরিয়া রাখিবার বিফল যত্ন করিতেছে—সেই ধারণাই প্রবল হইয়া তাহার হৃদয়ে দেখা দিয়াছিল। আজ চক্ষু মেলিয়াই দেখিল সেই হৃদয়হীন স্বামীর কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার চোখে আন্তরিক প্রেমের একটা ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া নির্ভরতার সহিত শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়খানি আবার আজ নূতন করিয়া স্বামীর পায়ে সে নিবেদন করিয়া দিল। বিনয়-

কুমার পত্নীর অকপট নিবেদন সস্নেহে গ্রহণ করিয়া ঈষৎ নত হইয়া তাহার জ্বর-তপ্ত ললাটে চুম্বন করিল।

বিষম স্বদেশী।

(লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু)

সমরেন্দ্র যখন এম, এ পড়িতেছিল, তখন দেশে স্বদেশী আন্দোলন বিশেষ-রূপ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। সে আন্দোলনে সমস্ত দেশবাসীর মন অল্পাধিক দেশেরদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ একদিন কলেজস্কোয়ার হইতে স্বদেশী বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়াই সমরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "আমার আর লেখা পড়া করা হবে না।" মেসের অপর সকলে যখন কারণ জিজ্ঞাসা করিল তখন সে দৃঢ় ভাবে উত্তর করিল "স্বদেশের সেবার জন্য নিজেকে অর্পণ কর।"

সমরেন্দ্র নিজের ঘরে যখন বসিয়া সম্মুখে ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া রাখিয়া কি ভাবিতেছিল সেই সময়ে অমর ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া সমরেন্দ্রের কাঁধে হাত দিতে তাহার চমক ভাঙ্গিল। অমর জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি ভাবছিলি বল ত।" "কি আর ভাব্‌ব, একবার নিজের মাতৃভূমির, স্বদেশের ম্যাপ্‌টা দেখ্‌ছিলুম" বলিয়া সমরেন্দ্র অমরের হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের পার্শ্বে বসাইল। "সমর সত্যিই কি তুই লেখাপড়া ছাড়বি।" "ছাড়াব কি, ছেড়েছি, এখন কেবল মনে স্বদেশের চিন্তা, লেখাপড়ার চিন্তা একবারে ত্যাগ করেছি।" "কাজটা কিন্তু ভাল করলেনা, অন্ততঃ আর চার মাস পরে এক্‌জামিন দিয়ে যা ইচ্ছা করলে ভাল হত। তোমার বাবা একথা শুনে বিশেষ দুঃখিত হবেন।" "না অমর, তোমরা আর আমার মনকে কিছুতেই ফেরাতে পারবে না। আমি স্বদেশের সেবাই জীবনের ব্রত করে নিয়েছি।" অমর আর কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

অমর চলিয়া গেলে, সমরেন্দ্র মনে মনে বলিতে লাগিল, না কিছুতেই সঙ্কল্প ত্যাগ করা হবে না। দেশের জন্য ত্যাগ-স্বীকার করিতেই হইবে। নিজের স্বার্থ রক্ষা করিয়া স্বদেশের মঙ্গলের চেষ্টা অসম্ভব। যে দেশের শতকরা ৯৫জন লোকই নিরক্ষর, সে দেশের মধ্যে দুই একজন লেখাপড়া শিখিয়া, পাশ করিয়া কি করিবে। আমি পাশ করিতে তবে কেন বৃথা সময় নষ্ট করি। দেশের

যে কিছু লাভ হইবে এমন বোধ হয় না। সকল লোকই নিজের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, দেশের জন্য কয়জনের প্রাণ কাঁদে? আমাকে আদর্শ স্বদেশ সেবক হইতে হইবে। দেশের কার্য্যে কিরূপে আত্মত্যাগ করিতে হয়, তাহা সকলকে দেখাইব।

(২)

সমরেন্দ্র মহেশপুরের জমিদার হরিহর রায়ের একমাত্র সন্তান। তাহার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। রায় মহাশয় পুত্রের খরচের জন্য মাসে মাসে ৬০৲ টাকা করিয়া পাঠাইতেন। সমরেন্দ্র নিজের খরচের জন্য ১৫৲ টাকা রাখিয়া তিনটী দরিদ্র সহপাঠীকে মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে সাহায্য করিত। স্বগ্রামে পিতার প্রতিষ্ঠিত 'হরিহর ইনষ্টিটিউসন' হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সমরেন্দ্র যখন ছয় বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় কলেজে ভর্ত্তী হইতে আসিয়াছিল, সে সময় মাতা জ্ঞানদাদেবী কিছুতেই একমাত্র সন্তানকে বিদেশে পাঠাইতে রাজি ছিলেন না। হরিহর বাবু পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা ও ভবিষ্যতে মঙ্গলের কথা ইত্যাদি বুঝাইয়া তবে পত্নীকে রাজি করিয়াছিলেন।

অমরের বাটীও মহেশপুর। উভয় পরিবারে বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। জ্ঞানদাদেবী অমরের উপরই নিজপুত্রের তত্ত্বাবধান ভার দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। সমরেন্দ্র ও স্বগ্রামবাসী সহপাঠিকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত। উভয়েই অতি স্বৎসভাবাপন্ন বলিয়া মেসের সকলের নিকট সমাদর পাইত। সমরেন্দ্র হঠাৎ খেয়াল বশতঃ লেখাপড়া বন্ধ করিল বলিয়া সকলেই একটু দুঃখিত হইয়াছিল।

কয়দিন পরেই সমরেন্দ্র নিজের ঘর হইতে টেবিল চেয়ার ও তক্তাপোষ বাহির করিয়া দিল। মেঝেতে কম্বল বিছাইয়া তাহার এক পার্শ্বে শয্যা ও অপর পার্শ্বে বসিবার স্থান হইল। যতদূর সম্ভব বিদেশী সরঞ্জাম পরিত্যাগ করিল। কলেজ হইতে বাসায় আসিয়া অমর সমরেন্দ্রের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে সে "কম্বলের উপর বসিয়া এক মনে কি ভাবিতেছে। সমর লেখাপড়া না হয় বন্ধ করলে, কিন্তু নিজের স্বাস্থ্য যাহাতে বজায় থাকে তাহাত করা উচিত" বলিয়া অমর সমরেন্দ্রের মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল। সমরেন্দ্র উত্তর করিল, "দেশের শতকরা নব্বই জনেরই যে মাটিতে শয্যা, তার কি কিছু খোঁজ রাখ।" "তা জানি কিন্তু তাদের অবস্থার সঙ্গেত তোমার অবস্থার তুলনা হতে পারে না।" "না এখন আর আমি কোন পার্থক্য দেখি না, সকলেই আমার স্বদেশবাসী, আমার

ভাই, আমাদের সকলের অবস্থা এক।" অমর দেখিল তর্ক করা মিথ্যা, সেজন্য চুপ করিয়া গেল। সমস্ত রাত্রি কঠিন মেঝেতে নিদ্রা গিয়া প্রাতে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা লইয়া উঠিয়া সমরেন্দ্র ভাবিল এই ত দেশ-ভক্তের পুরস্কার।

স্বদেশী সভায় বক্তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া সমরেন্দ্র যে দিন ভাবে বিভোর হইয়া সম্পূর্ণ বিলাতী বর্জ্জনে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিল, সেই দিনই মেসে আহারে বসিয়া দেখিল, বিলাতী কুমড়ার তরকারী, আর বিলাতী আমড়ার চাট্‌নী—কি ভীষণ—সমরেন্দ্র কিছুতেই আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারিল না। ভাত তরকারী সমস্ত ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমায় পরীক্ষা, আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের চেষ্টা।" মেসের সকলেই আসিয়া পড়িল, কিন্তু তাহার রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিল না—। সেদিন সমরেন্দ্রের বিনা আহারেই কাটিয়া গেল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, তাইত এ যে 'বিষম-স্বদেশী' হইয়া উঠিল। নগ্ন পদে মালকোঁচা বাঁধিয়া কাপড় পরিয়া গায়ে হাপ হাতা পাঞ্জাবী লাগাইয়া, মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া সমরেন্দ্র আরশিতে একবার নিজের চেহারা দেখিয়া লইল। ভাবিল এই পরিচ্ছদই প্রকৃত দেশ-ভক্তের পরিচ্ছদ। মেসের বাহির হইতে দরজাতেই অমরের সহিত দেখা হইল। অমর বলিল—"খালি পায়ে যাচ্চ কেন।" "ভারতের তেত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে বত্রিশ কোটী লোকেরই খালি পা" বলিয়া সমরেন্দ্র চলিয়া গেল। অমর দেখিল ক্রমশঃই অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে। নিজের ঘরে আসিয়া সে সবিস্তারে একখানি পত্র লিখিয়া সমরেন্দ্রের পিতার নিকট পাঠাইয়া দিল।

হরিহরবাবু অমরের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলেন। জ্ঞানদাদেবীর কাছে গিয়া তাঁহাকে পত্রের বিষয় না জানাইয়া বলিলেন, দেখ, বৈশাখ মাসেই সমরের বিবাহ ঠিক করা যাক। পরীক্ষার সংবাদ বাহির হইলে পর আষাঢ় মাসে পুত্রের বিবাহ হইবে এইরূপই স্থির ছিল, কিন্তু হঠাৎ কর্ত্তার মত পরিবর্ত্তনের কারণ তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন কেন রমানাথবাবু কি তোমায় লিখিয়াছেন। হ্যাঁ একখানা চিঠি পাইয়াছি বলিয়া হরিহরবাবু বাহির মহলে চলিয়া গেলেন। পুত্রের বিবাহের দিন আরও নিকটবর্ত্তী হইল দেখিয়া গৃহিনী অন্তরে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং কাল বিলম্ব না করিয়া বাটীর অপর সকলকে সে শুভসংবাদ জানাইয়া দিলেন।

রমানাথবাবু হরিহরবাবুর বাল্য বন্ধু। স্কুলে ও কলেজে উভয়ে বরাবর

একসঙ্গেই পড়িয়াছেন। রমানাথবাবু বিশ বৎসর যাবৎ ডেপুটীমেজিষ্ট্রেটী করিয়া এক্ষণে বিভাগীয় কমিশনারের পার্শ্বন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট হইয়াছেন। সমরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার একমাত্র কন্যা শোভার বিবাহ দিবার প্রস্তাব তিনি অনেক দিন হইতে করিয়া রাখিয়াছেন। হরিহরবাবুও বাল্যবন্ধুর সুশিক্ষিতা সুন্দরী কন্যাকে পুত্রবধূরূপে পাইবেন বলিয়া বরাবর সম্মতি দিয়াছেন। আষাঢ় মাসে কন্যার বিবাহ হইবে এবং কিছু দিন বিশ্রামও করা যাইবে বলিয়া রমানাথবাবু ছয় মাসের ছুটি লইয়া সম্প্রতি কলিকাতায় নিজ বাটীতে বাস করিতে ছিলেন। হরিহরবাবু তাঁহাকে একখানি পত্র দিলেন যে তিনি কল্য কলিকাতায় যাইতেছেন।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া রমানাথবাবুর সহিত হরিহরবাবুর নানা রূপ কথাবার্ত্তা হইল। রমানাথবাবু বলিলেন ভায়া দুচার বৎসরের মধ্যে সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে, কোন ভাবনা নাই। কেবল বর্ত্তমানে তাহাকে কলিকাতার উত্তেজনার মধ্য হইতে সরাইয়া বাটীতে লইয়া যাইতে হইবে। উভয়ে সমরেন্দ্রের মেসের দিকে রওনা হইলেন।

তাঁহারা যখন মেসে উপস্থিত হইলেন, তখন সমরেন্দ্র তথায় ছিল না। অমর উভয়কে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। রমানাথবাবু অমরকে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে সমরেন্দ্র সম্প্রতি স্বপাক আরম্ভ করিয়াছে, সৈন্ধবলবণ পর্য্যন্ত স্বহস্তে গুঁড়া করিয়া লয়। চাকরদের বিশ্বাস নাই, পাছে তাহারা অন্য লবণ দিয়া তাহার ব্রত ভঙ্গ করে। অযত্নে শরীর দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। সমস্ত শুনিয়া রমানাথবাবু বলিলেন সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে। হরিহরবাবু কোন কথা না বলিয়া কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

সমরেন্দ্র স্বদেশী পোষাকে সজ্জিত হইয়া নগ্ন পদে যখন গৃহে প্রবেশ করিল, হরিহরবাবু তাহার দিকে চাহিয়া আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন শরীরটা একবারে মাটি করেছিস্। হঠাৎ নিজ গৃহে পিতা ও পিতৃবন্ধুকে উপস্থিত দেখিয়া সমরেন্দ্রের কিরূপ ভ্যাবাচেকা লাগিয়া গিয়াছিল। রমানাথবাবু যখন তাহাকে হাত ধরিয়া বসাইলেন, তখন সে তাড়াতাড়ি তাঁহাকে প্রণাম করিল।

(৩)

সমরেন্দ্র পিতার সহিত মহেশপুরে চলিয়া আসিয়াছে। রমানাথবাবু তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে স্বদেশের সেবা করিতে চাও ত

পল্লীগ্রামের উন্নতি কর, কলিকাতায় থাকিয়া সভায় সভায় ঘুরিয়া কেবল বক্তৃতা শুনিলে কিছুই হইবে না। কথাগুলি সমরেন্দ্রের বিশেষ ভাবে মনে লাগিয়াছে। নিজ গ্রামে আসিয়াই সে বনজঙ্গল পরিষ্কার ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিতে লাগিল। গ্রামের প্রত্যেক প্রজার বাটী গিয়া সমরেন্দ্র সকলকে জানাইল যে প্রতি দিন সন্ধ্যার পর তাহাদের সদরবাটীতে নৈশ বিদ্যালয় বসিবে, সকলে সেখানে যেন উপস্থিত হয়।

প্রজারা সমরেন্দ্রকে খোকাবাবু বলিয়া ডাকিত। হঠাৎ খোকাবাবু নিজে সকলের বাটীতে পদধূলি দেওয়ায় এবং সকলকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ব্যস্ত হওয়ায় প্রজাদের মধ্যে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। বৃদ্ধ প্রজারা বলিতে লাগিল, নিশ্চয়ই কোন অভিসন্ধি আছে, তাহা না হইলে যে খোকাবাবু একবার আমাদের দিকে তাকাইতেন না, তিনি প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী আসিবেন কেন? শেষে স্থির হইল, আচ্ছা আদেশ অমান্য করা ভাল নয়, দেখা যাক কতদূর গড়ায়।

প্রথম দিন কতক নৈশবিদ্যালয়ে যুবা বৃদ্ধ বালক বহু প্রজাই উপস্থিত হইতে লাগিল। অগ্রে কোনরূপ পড়াইবার ব্যবস্থা না করিয়া সমরেন্দ্র কেবল বক্তৃতা দিয়া, পূর্ব্বে আমাদের পল্লীর অবস্থা কিরূপ ছিল, এখন কত অবনত হইয়াছে কিরূপে উন্নতি সাধন করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় বুঝাইতে লাগিল। চার পাঁচ দিন যাইতে না যাইতেই ক্রমশঃ লোকের সংখ্যা কমিতে লাগিল। সমস্ত দিন খাটিবার পর অনেকের শরীর এত ক্লান্ত থাকিত যে খোকাবাবুর বক্তৃতা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ করিত। চাকর গিয়া তাহাদের ঠেলিয়া উঠাইয়া দিলে, চোখে মুখে জল দিয়া আসিবার নাম করিয়া সরিয়া পড়িত। দুএক জন বক্তৃতার একটু আধটু বুঝিতে পারিলেও বাকি লোকে কেবল খোকাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত এবং কতক্ষণে বক্তৃতা বন্ধ হইবে তাহাই চিন্তা করিত। একদিন বক্তৃতার শেষে একজন বৃদ্ধ প্রজা বলিল, খোকাবাবু যদি রামায়ণ পাঠ করেন তাহলে ভাল হয়, আর একজন বলিল গরীব প্রজাদের জন্যে একটু তামাকুর বন্দোবস্ত রাখতে আজ্ঞা করবেন। সমরেন্দ্র বুঝিতে পারিল যে তাহার বক্তৃতায় বিশেষ ফল হইতেছে না, কেবল জমীদার পুত্রকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য জন কতক করিয়া প্রজা প্রত্যহ আসিতেছে।

সমরেন্দ্র একদিন বলিল যে, সকলে মিলিয়া গ্রামের বন জঙ্গল পরিষ্কার

করিতে হইবে, আপাততঃ গ্রামের প্রধান রাস্তার দুই পার্শ্বে যে সব জঙ্গল আছে তাহা পরিষ্কার করা দরকার। পরদিন হইতেই নৈশবিদ্যালয়ে লোকের সংখ্যা একবারে অনেক কমিয়া গেল। বিজ্ঞ প্রজারা বলিতে লাগিল, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিছু মতলব আছে দেখিতেছ না। বিনা মজুরীতে আমাদের দ্বারা রাস্তার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া লইবেন, আসল কথা এতদিনে প্রকাশ পাইয়াছে। অপর সকলেও বুঝিল যে খোকাবাবুর বিনা মজুরাতে খাটাইয়া লইবার মতলব। কয়েকদিন পরে বালক ও যুবকে দশ বারজন প্রজা লইয়া সমরেন্দ্র রাস্তার জঙ্গল পরিষ্কার কার্য্যে লাগিয়া গেল। জমীদার পুত্র নিজে কোদাল কুড়ুল ধরিয়া লাগিয়াছেন, সেজন্য প্রথম দিন উৎসাহে সকলে অনেকটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। তিন দিন পর্য্যন্ত এইরূপ উৎসাহে কাজ চলিল। চতুর্থ দিবসে অবসন্ন শরীরে কার্য্যস্থলে আসিয়া সমরেন্দ্র দেখিলেন মাত্র ৫ জন উপস্থিত আছে। সেদিন নিজের শরীরটা ভাল ছিল না এবং লোকও বেশী আসে নাই, সুতরাং কার্য্য স্থগিত রহিল। পরদিন বাকি সকলকে ডাকিয়া আনিতে বলিয়া দিয়া সমরেন্দ্র বাটী ফিরিয়া গেল। তাহার অন্তরের উত্তেজনাও অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল।

সমরেন্দ্র বাহিরবাটীতে নিজ ঘরে শুইয়াছিল, পিতাকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। "রমানাথবাবু কাল তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন, ২৮ শে বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। এ কয়দিন বনজঙ্গল কাটার কাজ বন্ধ রাখিও। বিবাহের সমস্ত কাজকর্ম্ম সমাধা হইলে আবার তোমার ইচ্ছামত কার্য্য আরম্ভ করিও, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।" বলিয়া হরিহর পুত্রের গৃহ হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেলেন। সমরেন্দ্র ভাবিতে লাগিল—বিবাহ করিলে স্বদেশ সেবার ব্যাঘাত হইবে না ত! ব্যাঘাত হইলে ত আমার কিছুতেই বিবাহ করা উচিত নয়, আমি যে স্বদেশের সেবা জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছি। কেন, ব্যাঘাতই বা কিসের জন্য হইবে, আমাদের দেশের স্বদেশী নেতারাও সকলেই বিবাহিত। দেশের কাজের অসুবিধা হইলে তাঁহারা কি বিবাহ করিতেন! শোভাকে ত দুই বৎসর দেখি নাই, সে এখন আরও বড় হইয়াছে, লেখাপড়াও বেশ শিখিয়াছে, তাহার দ্বারা আমার দেশ সেবার কার্য্যের সুবিধা হইবে বলিয়াই বোধ হয়। উভয়ে মিলিয়া দেশের সেবায় জীবন অর্পণ করিব।

পুত্রের বিবাহে বহু লোকের সমাগম হইবে বলিয়া হরিহর বাবু গ্রামের

প্রধান রাস্তার দুই পার্শ্বের জঙ্গল মজুর লাগাইয়া পরিষ্কার করাইলেন। কতক অংশ সমরেন্দ্র পূর্ব্বেই পরিষ্কার করিয়াছিল বলিয়া কিছু খরচা কম লাগিল। প্রজারা বলিতে লাগিল, খোকাবাবু নিজের বিবাহের জন্য আমাদের দ্বারা সমস্ত জঙ্গল বিনা খরচায় পরিষ্কার করিবার মতলব করিয়াছিলেন। অমর বিবাহের সময় আসিয়া লোক পরম্পরায় প্রজাদের এই কথা শুনিয়া সমরেন্দ্রকে বলিয়াছিল। সমরেন্দ্র অমরের কাছে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, "দেখ! যাদের উন্নতির জন্যে এত চেষ্টা করি, তারাই আমায় সন্দেহ করে। সাধে কি এ সব লোকের এত অবনতি।"

(৪)

বিবাহের পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রমানাথ বাবুর বিশেষ চেষ্টায় সমরেন্দ্র একটি ডেপুটিগিরি কার্য্য পাইয়াছে। তাহার স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রথমে চাপকান, পরে গলাবন্ধ, কোট—গোল টুপি ছাড়িয়া সমরেন্দ্র এখন হ্যাটকোট পরা পুরা সাহেব হইয়াছে। তাহার মনে ধারণা হইয়াছে যে অশিক্ষিত লোকেদের শিক্ষা দিয়া উন্নত করা কিছু নয়, তাহাদের আস্পর্দ্ধা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইবে এবং ভদ্রসম্প্রদায়ের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কোন মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইলে সে দেখাইবে যে কিরূপে নিম্নশ্রেণীর দেশবাসিগণকে দমন করিতে হয়। অনেক চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু শোভাকে কিছুতেই নিজের মনের মত করিয়া লইতে পারিতেছে না, সে কিছুতেই স্বামীর বন্ধুবর্গের সম্মুখে বাহির হইতে পারে না! সমরেন্দ্র বলে—এ সব শিক্ষার দোষ। অনেক বন্ধু পত্নী তাহার সঙ্গে কথা কন, জুতা পরিয়া ভ্রমণেও বাহির হন। শোভাকে একদিন জুতা পরানর জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় সে উত্তর দিয়াছিল "ভারতের তেত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে বত্রিশ কোটি লোকেরই খালি পা। আমি মেয়ে মানুষ হয়ে জুতা পরিয়া কি করিব!" সমরেন্দ্র এই উত্তর শোনার পর আর একদিনও শোভাকে জুতা পরিবার কথা বলে নাই।

অমর বি,এল পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছে। তাহারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি সমরেন্দ্র যে জেলায় বদলি হইয়াছে সে স্থানেই অমরের শশুর কেশব বাবু ওকালতি করেন। উভয়ের বাসা পাশা পাশি থাকায় উভয় পরিবারের মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্য হইয়াছে। অমর খবর পাইয়াছিল যে 'বিষম স্বদেশী' সমরেন্দ্র এক্ষণে 'বিষম বিদেশী' হইয়া পড়িয়াছে। স্বদেশের, স্বদেশ-

বাসীর ও স্বদেশী নেতাদের নিন্দা সর্ব্বদাই তাহার মুখাগ্রে লাগিয়া আছে। বেশভূষা, চাল চলন সমস্তই একবারে বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। অমর পত্র লিখিলে সময়ের অভাবে উত্তর দিতে সমরেন্দ্রের এক মাস লাগিয়া যায়, সে জন্য উভয়ের মধ্যে পত্র চলাচলও একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

জেলার কালেক্টর সাহেব যখন টাউন স্কুলের সম্মুখ দিয়া টম্‌টম্ হাঁকাইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় কয়েকটী বালক "বন্দেমাতরম্" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল! পুলিস অনেক তদন্ত করিয়া কেশব বাবুর ত্রয়োদশ বর্ষীয় পুত্র সরলকুমার ও অপর একটী বালককে আসামী স্থির করিল। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এস্ রায়ের (সমরেন্দ্রের) কোর্টেই আসামিদের বিচার হইবে। এই মকদ্দমা লইয়া ক্ষুদ্র সহরে বেশ একটু আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল। মিষ্টার রায় বালকগণকে শাস্তি না দিয়া ছাড়িবেন না। কেশব বাবু স্থির করিলেন এই সময় জামতাকে সংবাদ দিলে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। অমর হাইকোর্টের উকিল এবং ডেপুটির বাল্যবন্ধু, তিনি তাহাকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিলেন।

অমর ট্রেন হইতে নামিয়াই একবারে কোর্টে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন সবেমাত্র আদালত বসিয়াছে, চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। সকলেই বিচার ফল জানিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া আছে। মিষ্টার রায় দেখিলেন তাঁহার বাল্যবন্ধু অমর আসামীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অমর বক্তৃতায় বালকদের অল্প বয়স এবং প্রথম অপরাধের বিষয় উল্লেখ করিয়া বিচারকের দয়া প্রার্থনা করিল। যাহাতে কেবল সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সেজন্যও বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিল। বিচারক রায়ে বলিলেন কলেক্টর সাহেবের পশ্চাতে "বন্দেমাতরম্" বলিয়া চীৎকার সামান্য অপরাধ নহে। বিশেষতঃ প্রথম আসামী সরলকুমার এই সহরের একজন স্বদেশী নেতার পুত্র বলিয়া একটু বিশেষ উচ্ছৃঙ্খল। অপর আসামীর পিতা স্থানীয় স্বদেশী ভাণ্ডারের সত্ত্বাধিকারী। উভয় বালকই এক্ষণে বিনা শাস্তিতে মুক্তি পাইলে, ভবিষ্যতে স্বদেশী আন্দোলন কারী হইয়া উঠিবে। আমি তাহাদের মঙ্গলের জন্য এবং অন্য বালকগণকে সাবধান করিবার জন্য আসামীদ্বয়কে সামান্য দণ্ড দিলাম। প্রত্যেককে ১০ বার করিয়া বেত্রাঘাত করা হইবে। রায় পাঠ শেষ হইলে "কি ভীষণ পরিবর্ত্তন" বলিয়া অমর আদালত গৃহের বাহির হইয়া

আসিল। তখন বাহিরের জনসঙ্ঘ বলাবলি করিতেছিল "প্রাণে একটুও দয়ামায়া নেই—কি নিষ্ঠুর?"

মুহূর্ত্ত মধ্যে দণ্ডের সংবাদ ক্ষুদ্র সহরের সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল। সরল কুমার শোভাকে দিদি বলিয়া ডাকিত, শোভাও তাহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত। সে দণ্ডের কথা শুনিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার স্বামী যে কি করিয়া এমন নিষ্ঠুর হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

সমরেন্দ্র স্বদেশী আসামীর দণ্ড দিয়া বীর দর্পে গৃহে প্রবেশ করিতেই শোভা অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—"তুমি কি নিষ্ঠুর, তোমার প্রাণে কি একটুও মায়া মমতা নেই।" সমরেন্দ্র কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

রাত্রে আহারাদি শেষ করিয়া সমরেন্দ্র খাটের উপর শুইয়া কত কি ভাবিতেছিল। শোভা ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিয়া মেজেতে একখানি মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল। সমরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—তুমি যে ওখানে শুলে। শোভা বলিল—"দেশের যে শতকরা নব্বই জনের মাটিতে শয্যা।" কথাগুলি সমরেন্দ্রকে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিল।

ঋণ পরিশোধ

(লেখক—শ্রীধরণীধর ঘোষাল।)

(১)

চারুশীলা নাছোড়বন্দা হইয়া ধরিয়া বসিল, কিছুতেই সে ভূপতিকে বিবাহ করিবে না। তাহার এই হঠাৎ, এত জেদের কারণটা যে কি, তাহার মা সরলা দেবী তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। নিরীহ, গোবেচারী ভূপতি যে কোন মতে, কখনও চারুর মনে পীড়া দিতে পারে,তাহা সরমা দেবীর স্বপ্নেরও অগোচর। সকলেই জানিত, যতীন ও ভূপতির প্রতিদ্বন্দীতায় ভূপতিরই শেষে জয় হইবে। কারণ যতীনের সঙ্গে, হুজুগের খাতিরে, বেশী মিশিলেও, ভূপতির প্রতি চারুর যে একটা আন্তরিক টান ছিল, তাহা যে, সময়ে তাহাকে যতীনের বাবু গিরির চালের মধ্য হইতে টানিয়া আনিয়া ভূপতির সাদাসিধা, আড়ম্বরহীন জীবন গণ্ডীর মধ্যে বন্দী করিবে, সকলেই ইহা ভালরূপে জানিত। তাই ভূপতির

প্রতি তাহার এই আকস্মিক বিমুখতায় সকলেই অতীব বিস্মিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। কন্যার মনের কথা সরমাদেবী ভালরূপই জানিতেন। মুখচোরা ভূপতির ছোট খাট দোষ ত্রুটিগুলি যেরূপ আগ্রহে ও সুকৌশলে সে ঢাকিয়া লইত, তাহার স্পষ্ট অন্যায়কেও খাটো রাখিবার জন্য যেরূপ প্রাণপণে সে সকলের ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপনাকে দাঁড় করাইয়া দিত, অন্য কেহ না বুঝিতে পারিলেও তাহা সরমাদেবীর চক্ষু এড়ায় নাই। তিনি জানিতেন আজীবন ধূলা খেলার ও সখ্যতার দৃঢ়-বন্ধন চারুর বিলাস-লালসায় আপাততঃ হয় ত একটু শিথিল হইয়াছে, কিন্তু তাহা যে ক্ষণস্থায়ী, তাহাতে তাঁহার বিন্দু মাত্র সন্দেহ ছিল না। ধনীর সন্তান যতীনের সহিত কন্যাকে অবাধে মিশিতে দিবার ইচ্ছা প্রথমে তাঁহার ততটা ছিল না। কিন্তু ও বাড়ীর বিনয় ঠাকুর-পোর ওকালতীতে তিনি অমত করিতে পারিলেন না। তাহার উপর তাঁহার মনটি ছিল এক রকমের। পাছে আপনার কোন কাজে অপরে মনে কোনরূপ কষ্ট পায়,—সেই ভয়ে তিনি সদাই শঙ্কিত ও সতর্ক থাকিতেন। তাঁহার অনিচ্ছার কথা জানিতে পাইয়া পাছে চারু মনে ব্যথা পায়, সেইজন্য তিনি বিনয়ের কথায় দ্বিরুক্তি করিলেন না। যাহার সহিত যত আলাপ পরিচয়, মেশামিশিই করুক না কেন, ভূপতির অপেক্ষা অন্য কেহ যে চারুর স্নেহের পাত্র হতে পারেনা, সরমার এটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাই আজ কন্যার কথা শুনিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি কন্যাকে চিনিতেন। বুঝিলেন পৃথিবী লয় হইবে, তবু চারুর গোঁ দূর হইবে না। কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সরমা দেবী চক্ষু মুছিলেন।

(২)

সতের বৎসর বয়সে উকীল স্বামী বিমল মুখুয্যের ঘর করিতে আসিয়া, সরমা প্রথমেই ভাব করিয়া লইয়াছিলেন, পাশের বাড়ীর বৌ সরলার সহিত। তাহারি দুই বৎসরের সুকুমার সন্তান ভূপতি, সরমার অধিকাংশ সময় কাটাইবার অন্যতম উপায় হইয়া দাঁড়াইল। দশটার সময় স্বামী বাহির হইয়া যাইতেন, সন্ধ্যা ব্যতীত তাঁহার আর সাক্ষাৎ মিলিত না। সুতরাং এই সুদীর্ঘ সময়টা ডাক্তার পত্নী সরলা ও তাহার শিশু পুত্র এবং দুএকখানা বই লইয়াই কাটাইতে হইত। চারি বৎসর পরে কন্যা চারুশীলা তাঁহাদের সময় ক্ষেপণের আর একটি অপরিহার্য্য সামগ্রী হইয়া উঠিল। এই দুইটি শিশুকে একত্রে প্রাঙ্গণে হাসিয়া হাসিয়া খেলা করিতে দেখিয়া সরমা ও সরলা ভাবিতেন,—একজোড়া স্বর্গের ফুল তাঁহাদের গৃহে ফুটিয়াছে!

ইঞ্জিনীয়ার যদুনাথ রায় বদলি হইয়া, শিউড়ীতে আসিলে, তাঁহার তিন বৎসরের কন্যা হেমলতা এই দুইটির সহিত মিশিয়া, তিনটি গৃহস্থকে সখ্যতার বন্ধনে বন্ধন করিল। বিমল উকিলের মেয়ের সহিত,নরেন চাটুয্যের ছেলের বিবাহ সম্বন্ধে পাড়ার কাহারো সন্দেহ রহিল না। সংসারে নানারূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, প্রিয়সই সরলার ও প্রিয়তম স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে. কিন্তু ভূপতি ও চারুর বিবাহ সম্বন্ধে অন্য কোন ভাব দিনেকের জন্যও উভয় পক্ষের মনে উদিত হয় নাই। ভূপতির পিতার হঠাৎ মৃত্যুতে এ বৎসর বিবাহ হয় নাই, আগামী বৈশাখে হইবে, সরমাদেবী অবিভাবকহীন ভূপতিকে একথা বার বার জানাইয়াছেন। বিবাহের আর বেশী দেরী ছিল না। চৈত্র মাসের একটা দিন ও বৈশাখের সাতটা দিন মাত্র মাঝে! সুতরাং একটু আধটু করিয়া উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে, এমন সময় কন্যাকে বাঁকিয়া বসিতে দেখিয়া সরমাদেবীর বুক ভাঙ্গিয়া গেল।

ভয়ে, ভয়ে সন্ধ্যার পর চারুর ঘরে যাইলেন,—উদ্দেশ্য যদি বুঝাইয়া তাহার মত ফিরাইতে পারেন। একখানা চেয়ারে বসিয়া, টেবিলের উপর দুই হস্তে ভর দিয়া ঝুঁকিয়া, চারু "বিষবৃক্ষ" পাঠের চেষ্টা করিতেছিল। পাতা উল্টাইয়া যাইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন ছিল, বৈকালের ছিন্ন নাগকেশর ফুলগুলির উপর! ঘটনাটা তুচ্ছ হইলেও অনবরত মনের মধ্যে আনাগোনা করিয়া চারুকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। এই অস্বস্তির একমাত্র কারণ যে ভূপতি,—মনে হইতেই তাহার সমস্ত প্রাণটা ভূপতির প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিতেছিল। মানুষের মনের ধর্ম্মই এই—দোষ পাইলেই—তা সে যত ছোট এবং যত তুচ্ছই হোক না কেন—বিরাগটা তাহাকে লইয়া কেবলি নাড়াচাড়া করিতে থাকে। তাই চারু বৈকালের সমস্ত ঘটনাটা দুশবার ভাল করিয়া ঘাঁটিয়া দেখিয়াও তৃপ্তি পাইতেছিল না।

বাগানে যতীনের সহিত বেড়াইবার সময় হেমলতা ও ভূপতির আগমন। নাগকেশরের গুচ্ছটির প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ, চাকরকে, বলিয়া সেটি পাড়াইয়া লওয়া, ভূপতিত পুষ্পগুচ্ছের জন্য ভূপতি ও যতীনের কাড়াকাড়ি,—সকলি মনে পড়িল। তারপর যতীনের হাত হইতে ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইবার জন্য ভূপতি চেষ্টা করিতেই ছিন্ন ভিন্ন ফুলগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ার কথা মনে হইতেই চারুর মনে কাঁটা বিঁধিতেছিল। ভূপতির দোষেই যে তাহার সাধের ফুলগুলি এমন নিষ্ঠুরভাবে দলিত পিষ্ট হইয়াছে, চারু কোন রূপে ইহা

ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। তাহার সারা প্রাণটা কেবলই সেই শতছিন্ন ফুলগুলির জন্য হাহাকার করিতেছিল, এবং দোষী ভূপতিকে আসামীর কাঠ-গড়ায় দাঁড় করাইয়া, তাহার প্রতি সুকঠিন বিচার করিতেছিল। তাই সে মুখ ভার করিয়া বাগান হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্থির দৃপ্তকণ্ঠে মাকে জানাইল "কিছুতেই সে ভূপতিকে বিবাহ করিবে না।" এ বিষয়ে যে সম্পূর্ণ ন্যায় ও পক্ষ-পাতশূন্য হইয়াছে, ভাবিয়া তাহার মন আত্ম-প্রসাদের আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু যতীনের বিলাসিতা তাহার ভোগ প্রয়াসী মনে গোপনে যে নব অনুরাগের সৃষ্টি করিতেছিল, আজ ভূপতির এই সামান্য অপরাধে তাহাই যে অকস্মাৎ সতেজে মাথা জাগাইয়া দাঁড়াইয়াছে,—চারু তাহা ধরিতেই পারিল না।

চেয়ারের হাতাটা ধরিয়া, ধীরে ধীরে সরমাদেবী বলিলেন,—"ভাল ক'রে ভেবে দেখ, চারু! হঠাৎ একটা কাজ করা কিছু নয়। তাছাড়া যেটা জীবন মরণ নিয়ে—" মাকে বাধা দিয়া চারু শক্ত হইয়া বলিল, "ভাল ক'রেই ভেবে দেখছি, মা! ভূপতিকে আমি বিয়ে ক'র্ত্তে পার্ব্ব না।" "তাহলে এ বিয়ে হবে না?" চারু চুপ করিয়া রহিল। সরমা পুনরপি বলিলেন—"কি বলিস! তা হলে এ বিয়ে হবে না ত?" চারু পূর্ব্ববৎ স্থির কণ্ঠে বলিল, "না।" "যতীনকে বিয়ে কর্ত্তে কোন আপত্তি নাই ত।" সরমা কথাটা সরল ভাবে বলিলেন, কি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন ঠিক করিতে না পারিয়া, চারু চেয়ার ছাড়িয়া, খাড়া হইয়া দাঁড়াইল এবং মায়ের দিকে জ্বলন্ত চক্ষে চাহিয়া বলিল,—"হুঁ, আমি তাকেই বিয়ে কর্ব্ব। তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমি কিছুতেই, প্রাণান্তেও বিয়ে কর্ব্ব না।" বলিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। সরমা কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

(৩)

পড়িবার ঘরে টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া, ভূপতি একখানা চেয়ারের মধ্যে অসাড় ভাবে পড়িয়াছিল। বৈকালের ঘটনাটা চেষ্টা করিয়াও সে কিছু-তেই মন হইতে দূর করিতে পারিতেছিল না। তাহার সেই সামান্য দোষে চারুর তীব্র তিরস্কার ভুলিতে চেষ্টা করিলেও, তাহারা মূর্ত্তি ধরিয়া, চক্ষের সম্মুখে কেবলি ভাসিয়া উঠিতেছিল। তাহার অভিমানী হৃদয় যে কিরূপ আহত হইয়াছে, তাহা কে বুঝিবে? আজ আঠার বৎসর সে চারুর স্নেহ ও ভালবাসা সকল কাজে, সকল সময়েই পাইয়া আসিয়াছে। কোন দিন ভুলিয়াও সে রূঢ়

ব্যবহারে তাহাকে ব্যথিত করে নাই। আজ সেই চারু—ভূপতির মুদ্রিত চক্ষু হইতে ঝর, ঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। একখানা ইংরাজী বইএর একটা অংশ বুঝাইয়া লইতে ঘরে ঢুকিয়াই, হেমলতার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। কত বড় আঘাত, ভূপতির মত শান্ত, সহিষ্ণু হৃদয়কেও বিচলিত করিয়াছে, চোখের বিগলিত অশ্রুধারা হইতে সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল! চারুর উপর তাহার একটু রাগও হইল! দোষটা যে শুধু ভূপতির একার, তাহা নহে। বরং যতীনই এ ক্ষেত্রে দোষী, সে যদি না ভূপতির হাত হইতে প্রথমে নাগকেশরের গুচ্ছটা কাড়িয়া লইত, তাহা হইলে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতই না! সে কাড়িয়া লইয়াছিল বলিয়াইত, ভূপতি কাড়িতে গিয়াছিল! চারু যে ভূপতিকে ভালবাসে, হেমলতা বহুবার তাহার প্রমাণ পাইয়াছে। অথচ আজকের এই সামান্য ঘটনায় সে যে কেন এরূপ নির্ম্মম, নিষ্ঠুর ভাবে তাহাকে ভৎসনা করিল, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। চারুর অপেক্ষা যতীনের উপরই তাহার রাগটা হইতেছিল বেশী। যতীনের আচার, ব্যবহারে এমনি একটা কুৎসিৎ উদ্ধত ভাব তাহার চোখে স্পষ্ট ঠেকিত যে, হেমলতার বিলাস-বিমুখ মন স্বতঃই তাহার প্রতি বিরূপ ছিল। তাহার উপর, আজ ভূপতির লাঞ্ছনার কথা মনে করিয়া তাহার অন্তরাত্মা ঘৃণায় ভরিয়া গিয়াছিল! চারুর প্রণয়ে ভূপতি তাহার প্রতিদ্বন্দী বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার এই নির্য্যাতনে কোন ভদ্র সন্তান যে মৃদু, তীব্র, ক্রূর হাস্যে তাহাকে অধিকতর অপমানিত করিতে পারে, হেমলতার শিক্ষিত অন্তঃকরণ তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

ভূপতির সেই অকারণ অপমানের সময়, তাহার স্তম্ভিত হৃদয় যে একটা প্রতিবাদ বাক্যও উচ্চারণ করিতে পারে নাই, তাহাতে হেমলতা আপনার নিকটেও লজ্জিত ছিল। তাই এখন সেই ত্রুটিটি সারিতে বই লইয়া এখানে আসিয়াছিল। ভূপতিকে তদবস্থ দেখিয়া, তাহার হৃদয়ে সমবেদনা উপস্থিত হইল। ধীরে, ধীরে কাছে আসিয়া, রমণীসুলভ কণ্ঠে, মৃদুস্বরে ডাকিল, "ভূপতি—দা।" ভূপতি চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিয়া দেখিল,—হেমলতা তাহার শান্ত, স্নিগ্ধ, আয়ত চক্ষু দুইটার অনিমেষ পলকে তাহার সর্ব্বাঙ্গে সান্ত্বনা ছড়াইতেছে! এই প্রিয় সঙ্গীটির কাছে সে আপনাকে ঠিক রাখিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ হৃদয়-বেদনা চক্ষু জলে গলিয়া পড়িল! হেমলতা সস্নেহে তাহার অশ্রু মুছাইয়া, নিজের চক্ষু মুছিতে মুছিতে পার্শ্বের চেয়ারে বসিয়া পড়িল! এমনি সময় দমকাবাতাসের মত চারু কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, গলা হইতে হারটা

খুলিয়া, টেবিলের উপর ছুড়িয়া ফেলিল এবং তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই নাও তোমার হার। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই!" বলিয়া যেরূপ বেগে আসিয়াছিল, সেই রূপ বেগেই বাহির হইয়া গেল। ব্যাপারটা কি বুঝিতে না পারিয়া, পাংশুবর্ণ মুখে, রুদ্ধশ্বাসে ভূপতি হেমলতার দিকে চাইতেই, কুণ্ঠায় উভয়ের চক্ষুই নত হইয়া পড়িল। চারুর আত্মসংযমের এই শোচনীয় পরিণামে হেমলতা বিষম লজ্জিত হইল। বহুক্ষণ সে আর মুখ তুলিয়া ভূপতির দিকে চাহিতেই পারিল না। কতক্ষণ পরে চোখ তুলিতেই সে বিস্মিত ও ভীত হইয়া উঠিল। ছায়ের মত ফ্যাকাসে মুখে ভূপতি এমনি স্পন্দহীন, অসাড় ভাবে পড়িয়াছিল যে, হেমলতা তাহাকে ধরিয়া ভীতি কাতর-কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, "ভূপতি—ভূপতি—দা।" ধীরে ধীরে অভিভূত ভাবটা কাটাইয়া ভূপতি বলিল,—"ভয় নাই লতা! আমায় ছেড়ে দাও।" হেম কাঁদিয়া ফেলিল। টেবিলের উপরে হারটাকে দেখিয়া, ভূপতির আগাগোড়া সব কথাই মনে পড়িল। বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে, হেম বলিল,—"হারটা তুলে রাখ। রাগ পলে আবার নেবে।" "ওটা বাহিরে ফেলে দাও তো হেম!" বলিয়া ভূপতি ধীরে, ধীরে বারান্দায় চলিয়া গেল। হারটা হাতে লইয়া হেমলতা, বিস্মিত, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

(৪)

অতিতুচ্ছ ঘটনার ফলটা যে এত বড় এবং এত বিষময় হইবে, কেহই তাহা ভাবিতেই পারে নাই। চারুও এদিকটা চাহিয়া দেখে নাই। ভূপতির বিরুদ্ধে তাহার এই আকস্মিক বিদ্রোহ,হয়ত দুই দিন পরেই থামিয়া যাইত, কিন্তু সরমাদেবীর স্নেহপূর্ণ একটা কথায় তাহার জেদ প্রচণ্ড এবং কঠিন হইয়া উঠিল। ভূপতির সে দিনের ছোট অপরাধটাকে জেদের বশে সে এতবড় করিয়া লইল যে, তাহাতে তাহার প্রতি ভালবাসাটাও ঢাকা পড়িয়া গেল। তাই সে সহজেই ভাবিল—সে যে একদিন তাহাকেই ভালবাসে বলিয়া সকলকে জানাইয়াছে এবং নিজেও জানিয়াছে, সেটা তাহার মস্ত ভুল! এই ভ্রান্ত ধারণাটা সত্যের মুখোস পরিয়া, চিরদিন হয়ত তাহাকে ভুলাইয়া রাখিত, যদি না সেদিন খাঁটি সত্যটা তেমন করিয়া হঠাৎ আপনাকে প্রকাশ করিয়া ফেলিত! এই মিথ্যা সত্যলাভে সে এমনি আত্মহারা হইল যে, কোনটা যে সত্য কোনটা যে মিথ্যা, ঠিক করিতে না পারিয়া, একের ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার, অন্যকে সে জোর করিয়া দিয়া বসিল!

* * * * *

কন্যা সম্প্রদান হইবার পরই, সরমাদেবী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শুভদৃষ্টির সময় যতীনের গলায় মালা দিতে চারুর হাত কাঁপিয়া উঠিল। নবোঢ়ার লজ্জা বলিয়া চাপা দিতে চাহিলেও, চারুর মনটা কেমন খারাপ হইয়া গেল। মায়ের অসুখের অছিলায় সজলচক্ষে আড়ম্বরহীন বাসর হইতে বাহিরে আসিতেই, তাহার ডাগর ডাগর চক্ষু হইতে বড় বড় ফোঁটায় টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। অশ্রু মুছিয়া মায়ের ঘরে ঢুকিতেই, ভূত দেখিয়া লোকে কেমন সভয়ে পিছাইয়া আসে, তেমনি করিয়া সে পা কতক পিছাইয়া আসিল। সভয়ে ও সাশ্চর্য্যে দেখিল, অনাহূত, অনাদৃত ভূপতি তাহার মায়ের মাথাটি আপনার কোলে তুলিয়া জলের ছিটায় তাঁহার জ্ঞানোৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে। হেমলতা পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পাখা করিতেছে। ভূতাবিষ্টের ন্যায় খানিক নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, চারু হঠাৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। এবং আপনার কক্ষের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অনুতাপে আত্ম-গ্লানিতে তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে চাহিতেছিল। পরদুঃখকাতর ভূপতির পার্শ্বে, আত্মসুখনিরত যতীনকে দাঁড় করাইতেই সে শিহরিয়া উঠিল!

(৫)

ভূপতি ঠিক করিয়াছিল,—পিতৃঋণ শোধ করিয়া অতি শীঘ্রই শিউড়ী ত্যাগ করিবে। কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সরমাদেবীর অসুখ সারিতে দুই-মাসেরও উপর গেল। সুতরাং তাঁহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিল না। সে ভাবিয়াছিল—চারু ও যতীন আসিয়া তাহার ভার লইলেই, সে এদেশ হইতে ছুটিয়া পলাইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বিবাহের পর যতীন একটি দিনও এদিকে উঁকি মারে নাই। চারু প্রায়ই চিঠি দিত বটে, কিন্তু যতীনের কথা কিছুই লিখিত না। জিজ্ঞাসায় সারা চিঠিটা ভরা থাকিত! সরমা চিঠি শুনিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতেন,—কিছুই বলিতেন না। তাঁহার মনের ভাব হেমও ভূপতি কেহই বুঝিতে পারিত না! হেম উত্তর দিতে চাহিলে, তিনি নিষেধ করিতেন,—সুতরাং চারু একখানা চিঠিরও উত্তর পাইল না। পিতৃঋণ শোধ করিতে পৈত্রিক বাড়ীটা বিক্রয় করিয়া, সন্ধ্যা বেলা ভূপতি সরমাদেবীর ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। বালিশে ঠেস দিয়া, শয়নাবস্থায় সরমাদেবী তখন হেমলতার গীতা পাঠ শুনিতেছিলেন। গলাটা ঝাড়িয়া ভূপতি বলিল, "আমার এখানকার অন্ন উঠিল, সই মা! শিউড়ী হতে জন্মের মত বিদায় নিচ্ছি!"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সরমা ও হেমলতা ত্রস্তে তাহার দিকে চাহিতেই, ভূপতি কাঁদিয়া ফেলিল। "অনেক অত্যাচার করেছি সই মা, আমায় ক্ষমা করো। ছেলেবেলা হ'তে তোমার কোলেই মানুষ হয়েছি। আজ বাইশ বৎসরের বাঁধন ছিঁড়ে,আমার বুকটা ভেঙ্গেচুরে—বলিতে বলিতে সে হাউ, হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সরমা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। হেমলতা কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গেল। আবেগ কম্পিত দেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে সরমা বলিলেন, "আরো দিন কতক থাক না, বাবা!" অশ্রু মুছিতে মুছিতে ভূপতি বলিল, "আমায় আর কিছু বলো না, মা, কথা রাখতে পারবনা হয় ত! যাবার সময় তোমায় কষ্ট দিতে চাই না, মা! যে কষ্টে আমি তোমাদের মায়া কাটিয়ে যাচ্ছি—তা' অন্তর্যামীই জানেন।" সরমা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "এ শাস্তি তোর নয় ত ভূপতি। এ শাস্তি আমার! প্রায়শ্চিত্ত আমাদের ক'র্ত্তে হবে, তোকে কেন, বাবা?—যেথা ইচ্ছা তোর যা,—আশীর্ব্বাদ করি, বাবা, শান্তি পাস।" বিদ্রোহী হৃদয়টাকে দমন করিতে করিতে ভূপতি তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়াই ছুটিয়া ঘর হ'তে বাহির হইয়া গেল। সিঁড়িতে নামিতে, হেমলতা আসিয়া বলিল, "দাঁড়াও, একটা কথা আছে।" তাহার স্পষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে বিস্মিত হইয়া, ভূপতি ফিরিয়া দাঁড়াইল। নবোদিত চন্দ্র কিরণে সে দেখিতে পাইল,—হেমলতা প্রাণপণে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতেছে। আরো সরিয়া আসিয়া মৃদু, ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে হেম বলিল, "আমাকেও তোমার সঙ্গে নাও!"

তাহার উন্নত, প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া ভূপতি মহা বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া হেম পুনরায় বলিল, "আমি মিথ্যা বলছিনা। আমাকে ফেলে যেয়ো না,—সঙ্গে নাও।"

কথার অর্থটা স্পষ্ট হইলেও, ভূপতি যেন এতক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। চমক ভাঙ্গিলে, বিষাদ কণ্ঠে বলিল, "তুমিও ঠাট্টা কচ্ছ লতা! আমার মত দুঃখী যে জগতে কেউ নেই!" হেম পূর্ব্ববৎ স্থির কণ্ঠে বলিল, "তাইত আমি যেতে চাচ্ছি!—তোমার পায়ে পড়ি, আমায় সঙ্গে নাও।" হঠাৎ তাহার পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমায় তোমার দুঃখের ভাগ নিতে দাও,—এইটুকু তোমার কাছে আমার প্রার্থনা। এ অধিকার হ'তে আমায় বঞ্চিত করো না!" নির্ণিমেষ নয়নে, তাহার আনত, সজল মুখের দিকে

চাহিয়া, ভূপতি অতি ধীরে, ধীরে "ছ' মাস পরে উত্তর পাবে," বলিয়া শ্লথ চরণে নামিয়া গেল ! হেমলতা সেইখান হইতেই তাহাকে প্রণাম করিয়া, ধীরে ধীরে সরমার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

ছয়মাস নানাস্থানে ঘুরিয়া ও বহু চিন্তা করিয়া ভূপতি হেমলতার কথাটার একটা সঙ্গত উত্তর খুঁজিয়া পাইতেছিলনা। সে তাহার সর্ব্বস্ব চারুকে দিয়াছে, তাহার হৃদয় শূন্য, একেবারে শূন্য ! হেমকে সে কি দিবে ? অথচ হেমলতার স্বেচ্ছাকৃত তাহার এই সারাজীবনব্যাপী দুঃখের ভাগ লইবার জন্য কাতর, আকুল প্রার্থনাকেও সে পায়ে ঠেলিতে পারিতেছিলনা। তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার মা যে আর অধিক দিন কন্যাকে অবিবাহিত রাখিতে সাহস করিবেন, তাহা মনে হয় না। এতবড় একটা মহৎ প্রাণকে নষ্ট করিতেও তাহার মন সরিতেছিল না। এদিকে প্রতিশ্রুত উত্তর দানের সময়ও আর নাই, ভাবনায় ভূপতি কাতর ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় সে হেমের তার পাইল, "সই মা মৃত্যুশয্যায়। শীঘ্র এসো ! " পুঁটলি প্যাঁটলা বাঁধিয়া ভূপতি সেই দিনই শিউড়ী রওনা হইল।

* * * *

মরণোন্মুখ সরমার পায়ে মুখ লুকাইয়া ভূপতি কাঁদিয়া উঠিল, "সইমা, মাগো !" সরমা অবশ হাতটা তাহার পিঠে ফেলিয়া, চক্ষু মুদিয়া নীরবে রহিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া গলিত অশ্রু উপাধানটা ভিজাইতে লাগিল ! বহুক্ষণ পরে, কষ্টে আত্মসংযম করিয়া, জড়িত স্বরে বলিলেন, "আমার আর সময় নেই ভূপতি ! তোকে আমার এই শেষ অনুরোধ বাবা, পারিসতো— তাকে ক্ষমা করিস !" ভূপতি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। হেমলতা পার্শ্বে বসিয়া, প্রবল রোদনের বেগটাকে চাপিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল !

(৬)

শ্বশুর বাড়ী আসিয়া চারু দেখিল,—এবাটীতে বধূর অধিকার, তাহার অতি অল্প ! পরের ছেলের যে অধিকার আছে, যতীনের তাহাও এখানে নাই। খাওয়া পরা ব্যতীত অন্য কোন দাবী দাওয়া এ বাড়ীতে তাহার ছিল না। দিন কতকের মধ্যেই সে বুঝিতে পারিল,—শ্বশুর দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানদের সর্ব্বস্ব দিয়া গিয়াছেন, তাহার ও তাহার স্বামীর বাসে মাত্র ৫০৲টি টাকার অধিকার ! কিন্তু ধন-সম্পদে চারুর এখন আগ্রহ ছিল না। নিজের কৃত

অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, সে যতীনকে আশাতীতরূপ আদর, যত্ন করিতে লাগিল। সে বুঝিয়াছিল,—তাহার এ হঠকারিতার জন্য দায়ী সে,—যতীন বা অন্য কেহ নহে। ইচ্ছা করিলেই সে ভূপতিকে বরণ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা যখন করে নাই, যখন সে স্বহস্তে বিষ পান করিয়াছে, তখন ইহা গলাধঃকরণ করিতেই হইবে!—স্বামী যত মন্দই হৌক না কেন, তাহাকে সুখী করাই তাহার ধর্ম্ম ও তাহার জ্ঞানকৃত পাপের কঠোর উচিত প্রায়শ্চিত্ত। তাই সে যতীনের সেবার মধ্যে ভূপতিকে ভুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল! কিন্তু হায়! যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে পূর্ব্বকথা ভুলিতে চায়, সেই খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া বার বার সেই পরিত্যাজ্য, লোভনীয় প্রসঙ্গ তুলিতে থাকে? অদৃষ্টের এ কি কঠোর, মর্ম্মান্তিক পরিহাস! চারু কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতে লাগিল!

ভূপতিকে পরাজিত করিয়া, চারুকে বিজয়মুকুট স্বরূপ লাভ করিতে, যতীনের একটা দুর্দ্দমনীয় জেদ ছিল। সেই জেদের বশে ভাবিয়াছিল—চারুকে সে যথেষ্ট ভালবাসে! কিন্তু তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন মুঠার মধ্যে পাইয়া, দুই দিন পরেই দেখিল, থিয়েটারের অভিনেত্রী সরোজিনীর সহিত চারুর তুলনাই হইতে পারে না। চারু যে তাহাকে অপেক্ষা ভূপতিকে অধিক ভালবাসে, যতীনের তাহা অজ্ঞাত ছিল না। অথচ তাহার প্রতি এখন সে এরূপ ভাব দেখায়, যেন সেই তাহার একমাত্র কাম্য ও উপাস্য! তাহার এই কৃত্রিমতায় যতীন মহা বিরক্ত ছিল! নেশার ঝোঁকে কোন কোন দিন ভূপতি ও তাহার নাম একত্রিত করিয়া, কুৎসিৎ ভাবের ছড়া কাটিয়া মহা আনন্দ উপভোগ করিত। চারু দুঃখে, ক্রোধে, ঘৃণায় ঘর হইতে দ্রুত বাহির হইয়া, বিরলে অশ্রুমোচন করিত আর নিজেকে ধিক্কার দিত।

হেমের চিঠিতে মায়ের অসুখের কথা শুনিয়া, চারু দুইদিন জল স্পর্শ করিল না। তাহার মন যেরূপই হৌক, মাকে সে প্রকৃতই ভালবাসিত। আজ আট দশমাস মাকে দেখিতে পায় নাই। দুইখানি চিঠিতে হেমের নিকট হইতে সে মায়ের সংবাদ পাইয়াছিল। হেম তিনমাস চিঠি দেয় নাই, সুতরাং মায়ের সম্বন্ধেও সে কিছুই জানিতে পারে নাই। বিবাহের পর যতীন আর তাহাদের বাড়ীমুখো হয় নাই। বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিবার কথা তুলিলেই বাড়ীশুদ্ধ সকলেই আদুরে মেয়ে, কচিখুকী প্রভৃতি বাক্য বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিত। হতাশ হইয়া চারু আর সে কথা তুলিত না। মৃত্যুশয্যাশায়ী মাকে শেষ দেখা

দেখিবার প্রবল আগ্রহ সত্বেও, চারু যাইতে পারিল না। বাড়ীর কেহ তাহার এ অনুরোধ রাখিতে না চাহিলেও, যতীন যে তাহার এই সনির্ব্বন্ধ কাতর মিনতি রাখিবে,—এ বিশ্বাস চারুর ছিল। মফস্বলে থিয়েটার করিয়া পাঁচদিন পরে সে বাড়ী আসিতেই, চারু কাতর ভাবে তাহাকে ধরিয়া বসিল,—মায়ের বড় অসুখ! একটিবার, একদিনের জন্যও তাহাকে পাঠাইয়া দিতে হইবে। পূর্ব্বদিন "সধবার একাদশীতে" "নিম চাঁদের অভিনয় করিয়া, যতীন ঘন ঘন করতালি ও বাহবা পাইয়াছিল। তাই নিমচাঁদী রসিকতার অবতারণা করিয়া বলিল, "প্রাণনাথের পত্র এসেছে বুঝি? কই দেখি? হু, হু, বাবা, আমার কাছে চালাকী! অভিসারে যাবার কথা লিখেছে বুঝি—বটে?" চারু বিবর্ণ মুখে, কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মুখস্থ চেয়ারের পায়াটা সজোরে ধরিয়া বসিয়া পড়িল! একটা বিকট অট্টহাস্যে তাহার মাথাটা ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিতেই, সে সংজ্ঞাহীন হইয়া মেঝেয় ঢলিয়া পড়িল।

(৭)

তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া, প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই হেমলতা সবিস্ময়ে ও সভয়ে দেখিল,—মলিন বসনে চিত্রার্পিতের ন্যায় চারু দাঁড়াইয়া আছে! এরূপ সময় এরূপ বেশে তাহাকে দেখিয়া, হেমের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। দ্রুতপদে নিষ্পন্দ চারুর নিকট যাইয়া, মাথার সিন্দুর দেখিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পুরাতন স্মৃতিগুলি চারুর বুকের মধ্যে ভীষণ তরঙ্গ তুলিয়াছিল। কোন মতে আপনাকে সে ঠিক রাখিতে পারিতেছিল না। উপস্থিত অশ্রু প্রাণপণে বাধা দিয়া জোর করিয়া বলিল, "ভূপতি—ভূপতি কোথায়?" তাহার এরূপ আবেগময় রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠস্বরে হেমলতা বিস্মিত হইল। তাহার এই দুর্দ্দমনীয়, তীব্র হৃদয়াবেগকে রোধ করিতে, কতখানি শক্তির যে দরকার সে তাহা বুঝিয়াছিল। ভূপতির নাম করিতে তাহার পিপাসিত অন্তঃকরণটা যে হাহা করে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে বুঝিতে পারিয়া হেম সহজ স্বরেই বলিল, "তিনি স্কুল স্থাপনের জন্য সভায় গেছেন। "বিশেষ দরকার তাকে, একবার ডাকাত বোন।" বলিয়া চারু সেইখানেই বসিয়া পড়িল। স্বামীকে ডাকিতে পাঠাইয়া, চারুর হাত ধরিয়া হেম ঘরে যাইয়া তাহার পার্শ্বে বসিল। সে বুঝিয়াছিল চারুর সহিত এখন কথা কহিতে যাওয়া বিড়ম্বনা! ভূপতি ঘরে ঢুকিতেই চারু তাহার পাদুটি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "আমায় ক্ষমা কর ভূপতি! আমায় ক্ষমা কর। তাঁকে বাঁচাও।

আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইও না।" অনেকদিনের পর চারুকে হঠাৎ দেখিয়া ভূপতি বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া, বলিল,"কেন ? যতীনের কি হয়েছে ?" চারুর চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল ঝরিতেছিল ! হেমলতা ভূপতিকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই উঠিয়া গিয়াছিল। চারু সরোদনে বলিল, "আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'চ্ছে। আমি নিজেকে ক্ষমা কর্ত্তে পাচ্ছিনা। তুমি আমায় ক্ষমা করো।" ভূপতি নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। চারু বলিল, "মা আমায় ক্ষমা করেছেন কিনা জানি না।" "কিন্তু আমি জানি তিনি তাঁহার কন্যাকে অত বড় অভিশাপের মধ্যে ফেলে রেখে যান নি।" চারু অশ্রু মুছিয়া বলিল, "থিয়েটারের একটা অভিনেত্রী নিয়ে একটা লোকের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। ক্রোধে তিনি তাকে সাংঘাতিক রূপে প্রহার করেছেন। লোকটা এখন হাঁসপাতালে। পুলিশে তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে। তাঁকে বাঁচাও তুমি,—তাঁর আপনার বলতে কেউ কোথাও নেই। তুমি তাকে বাঁচাও নইলে আমার ইহকাল, পরকাল সব যাবে! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখানেই শেষ হোক ; পরকালের জন্য যেন ছিট না বাকী থাকে। তাঁকে ফিরিয়ে আন, ভূপতি। তোমার কাছে আমার এই শেষ প্রার্থনা!" "ভূপতি স্তব্ধ হইয়া বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। হেম ঘরে ঢুকিতেই, চারু তাহাকে জড়াইয়া, ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, "ওকে বল তুমি, সই! তোমার কথা হয়ত শুনবেন।" তাহার কথাই যে ভূপতির কাছে যথেষ্ট, আদেশ স্বরূপ, হেম তাহা জানিত। তবু আজ সে পর ভেবে তাহার পূর্ব্ব আনুগত্যের কথা ভুলিতে চেষ্টা করিতেছে, বুঝিয়া হেম সন্তুষ্ট হইল ; বলিল, "তিনি গেছেন। একটা ব্যবস্থা অবশ্যই কর্ব্বেন।" চারুর হৃদয়ের গুরুভার সে ভালরকমই অনুভব করিতেছিল ; সহানুভূতিতে তাহার মন গলিয়া গিয়াছিল। কত বড় ব্যথা যে সে নীরবে সহ্য করিতেছে, ভাবিতে হেমের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। শায়িত চারুর উষ্ণ মস্তকে হাত বুলাইতে, বুলাইতে, সে মনে মনে বলিল, "ভগবান, অভাগিনীকে দয়া কর, শান্তি দাও।" স্বামীর বেদনা সে জানে। অংশ লইয়া সে ব্যথার কতকটা সে লাঘব করিয়াছে। কিন্তু, এই অনাদৃত, উপেক্ষিতা নারী,—তাহার যে এ ব্যথা জানাইবার কেহই নাই,—কিছু নাই। চারুর জন্য হেমের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

হেমের সমস্ত গহনা বিক্রয় করিয়া, ভূপতি যতীনকে উদ্ধার করিয়া আনিল। যতীন কাঁদিয়া বলিল—"আমায় কেন বাঁচালে, ভাই! আমার যে মুখ

দেখাবার,—মাথা রাখিবার স্থান নাই।" যতীনের সহিত ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে না পারিয়া, ভূপতি আপনাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। চারুদের বাড়ীতে তাহাকে বসাইয়া, সে চারু হেমকে জানাইল,—ভূপতি আসিয়াছে। চারু শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তিনদিন পরে বৈকালে, হেম চারুর পায়ের কাছে একখানা দলিল আর একটা আংটী রাখিয়া প্রণাম করিল। বলিল, "সইমা এবাড়ী আমার স্বামীকে দিয়ে গিয়েছিলেন। তোমার বিবাহে তিনিতো কিছুই দিতে পারেন নি। এ গুলি তোমার বিবাহের যৌতুক বলে গ্রহণ ক'রো। আর সইমায়ের শেষ বাক্যের সঙ্গে তিনিও তোমায় ক্ষমা ক'রেছেন। তাঁর যদি কিছু অপরাধ থাকে তা ক্ষমা ক'রে নিও, বলিয়া গলায় আচল জড়াইয়া পুনরায় প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। স্তম্ভিত চারু বহুক্ষণ পরে দেখিল,—বিবাহের প্রতিশ্রুত হীরকাঙ্গরীয়টী ফিরাইয়া দিয়া ভূপতি তাহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়াছে।

মার্কুইস

লেখক—শ্রীশরচ্চন্দ্র মজুমদার বি এল

(মার্কুইস নামক বিখ্যাত ডাকাতের কার্য্যাবলীর একটি অভিনয়)

[সময়, ১টা রাত্রি, স্থান লাইব্রেরী, কর্ণেল বেরীর বাটী, লণ্ডন। কক্ষের মধ্যস্থলে একটি লৌহ সিন্দুক স্থাপিত। দক্ষিণে ও বামে দ্বার। বেরির বয়স ৫৮ বৎসর। তিনি একটি প্রকাণ্ড পিস্তলে টোটা পুরিতেছেন। গায়ে একটি পুরাতন কোট। হাতে এক স্থলে তালি লাগান]

বেরী। (স্বগত) ৫৮ বছর বয়সে চোর দেখে কিছু আমি ভয় পাবনা, চোরেরই বরং আমাকে দেখে ভয় পাওয়া উচিত। লোকেই বলে আজকালকার চোরগুলো সাহসী, ছাই সাহসী, আমি সেকথা মোটেই বিশ্বাস করিনে। চোরেরা স্বভাবতই ভীরু বলে আমার বিশ্বাস (কক্ষ মধ্যে পাইচারি করিতেছেন) আজ সকালে কোথায় কোন্ খবরের কাগজে কি একটা খবর বেরিয়েছে বলে

আজ রাত্তিরেই আমার বাড়ীতে চোর আস্‌বে; সেকথা মনে করাও পাগ্‌লামি (কাণ খাড়া করিয়া শুনিতেছেন) ওই যে, বোধ হচ্ছে কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠছে (গ্যাসের আলো কমাইয়া দিলেন) ডিটেক্‌টিভটাকে বলেছিলাম যে চোর আমি ধরে দেব, তাকে ডেকে নিলেই বোধ হয় ভাল হত, গতস্য শোচনা না করাই ভাল, (একটি শেল্‌ফের পশ্চাতে লুকাইলেন) বেটা চোর কিন্তু বুঝবে যে নেহাত শ্বশুর বাড়ী আসেনি।

[বাহিরে সামান্য শব্দ হইল। দ্বার নিঃশব্দে উদ্‌ঘাটিত হইল, একজন লোক প্রবেশ করিল। স্তিমিত আলোকে দেখা গেল তাহার বেশভূষার বিশেষ পারিপাট্য আছে। দেখিতে অতি সুপুরুষ। সে আসিয়াই গ্যাসের আলো বাড়াইয়া দিল। সিন্দুকের সম্মুখে নতজানু হইয়া চাবিদ্বারা সিন্দুক খুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। হঠাৎ কর্ণেল বেরী লুক্কাইত স্থান হইতে বহির্গত হইলেন, তাঁহার হাতের পিস্তল চোরের মস্তকের দিকে নির্দ্দিষ্ট হইল]

বেরী। হাত দুটো উঁচু কর—(চোর হস্তদ্বয় উর্দ্ধে উত্তোলন করিল। কর্ণেল একগোছা চাবি ও তালা ভাঙ্গিবার কল ও একটি পিস্তল চোরের পকেট হইতে লইয়া পকেটস্থ করিলেন) উঠে দাঁড়াও—(চোর উঠিয়া দাঁড়াইল) ঐ চেয়ারে বস: আমি তোমার চেহারা ভাল করে দেখতে চাই—(চোর অতিশয় শান্ত ভাবে ইজিচেয়ারে আরামের সহিত উপবেশন করিল ও কর্ণেল বেরীর দিকে নিরপেক্ষ ভাবে চাহিয়া রহিল)

চোর। তোমার চাউনিটা কিন্তু মোটেই ভাল নয় বন্ধু—

বেরী। কে তোর বন্ধু রে ব্যাটা?

চো। ওঃ তাইত, ভুল হয়েছে তাহলে যে তোমার মর্য্যাদাটা বেড়ে যায়, তাইত।

বে। তাই বলে কোনও হারামজাদা চোর আমার বন্ধু হতে পারে না—

চো। তা ঠিক্, তবে তোমার কথাগুলো বড়ই কর্কশ।

বে। হাঁ, কুকুরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে জুতো না মারাই উচিত—তবে তোমার বাক্যের দাপটে বিরক্ত হতে হয়। আমার বাড়িতে চুরী করতে আসবে এমন বোকা যে সংসারে আছে তা জানতাম না। ডিটেক্‌টিভটা ঠিকই বলেছিল কিন্তু—

চো। কোথাকার ডিটেক্‌টিভের কথা বল্‌ছ?

বে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের। তোমরা যে বড় তাদের ঠাট্টা কর, তারাই ত

আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল। তারাই খবর পাঠিয়েছিল যে আজ সকালে যখন খবরের কাগজে বেরী পরিবারের হীরের আজগুবি গল্প বেরিয়েছে তখনই তোমাদের দলের প্রভুদের দাড়ি চুলকে উঠবেই। তখন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেম বটে, কিন্তু এখন দেখছি তারা ঠিক বলেছিল।

চো। তা তারা কখন কখন সত্যি কথা বলে থাকে। আজগুবি গল্প বল্লে কেন?

বে। আমার আবার হীরে ছিল কবে?

চো। কিন্তু বেরী পরিবারে হীরে আছে ত! আজ বিকেলে তার বিষয় মিউজিয়ামে সব পড়ে এলাম যে!

বে। সেকথা ঠিক, কিন্তু সেটা এ বাড়ীর হীরে নয়, সে আমার খুড়তুত ভাই নরফোকের বেরীদের বাড়ীতে আছে। ওইখানেই খবরের কাগজ ওয়ালারা ভুল করেছে, আর তাতেই তুমি এই বোকার মত কাজ করে ফেলেছ। আমি শদু'এক টাকা মাত্র পেন্সন পাই। যদি বেরীদের হীরে আমার থাকত তাহলে কি আমি এই বাড়ীতে থাকি?

চো। (ধীর ভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) তাবটে, মোটেই খাপ খাচ্ছে না, এই কুঁড়ে ঘরে হীরে থাকা সম্ভব নয়।

বে। (চটিয়া) কুঁড়েই হক্, আর যাই হক্, ভদ্রলোকের বাড়ী।

চো। ভদ্রলোকের বাড়ীতে আরও খানদু'এক আস্‌বাব থাকা উচিত ছিল। তুমি বলছ তোমার হীরে নেই, তা যদি তোমার ইচ্ছে হয় ত বল, আমার একজন বন্ধু আছেন, তিনি কর্ণেল টর্ণেলদের বড় পছন্দ করেন, আমার অনুরোধে তিনি খান দুএক হীরে তোমায় দিতেও পারেন, বুঝলে?

বে। তা'বলে সেই লোভে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছিনে, আর তোমার মত চোরের কাছে হীরে কিনতেও আমি রাজী নই।

চো। কেয়াবাৎ, থিয়েটারের ষ্টেজে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বললে গোটা দুতিন ক্ল্যাপ পেতে! যাক্ এখন আমার দশা কি হবে বলত? তোমার বিশেষ কোনই ক্ষতি হয় নি, কিন্তু আমি একটু বিপন্ন হয়েছি বটে।

বে। (টেবিল হইতে পিস্তল উঠাইয়া) বলি এ অবস্থায় কি সহজে লোকে নিষ্কৃতি পায়?

চো। প্রায় হাজার দুয়েক বার চোখের ওপর পিস্তল নিয়ে অনেক কাজ করেছি, তবে তুমি একটু বেশী সুবিধে করে ফেলেছ, স্বীকার করি—

বে। এর পরেই পুলিসের কোৎবর, আর ফৌজদারী আদালত, দুটোই ভায়রাভাই—জান ত?

চো। না, এ পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতে করে উঠতে পারিনি।

বে। ব্যস্ত কি? আমি করিয়ে দিচ্ছি (টেলিফোঁর নিকট যাইয়া) "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, ইন্স্পেক্টার পাঠিয়ে দাও, বলে দাও একজন ভদ্রলোক কর্ণেল বেরীর হীরে নিতে এসেছেন, শীঘ্র পাঠাও দেরী না হয়।"

চো। বেশ, বুঝলাম।

বে। যদি পালাতে চেষ্টা কর ত মনে রেখ্যো, গুলি চালান আমার পেশা—আর জান্‌লাটা মাটী থেকে ৩৫ ফুট উঁচু—

চোর। বুঝতে পাচ্ছ কি বন্ধু, ইউরোপের সমস্ত ডিটেক্‌টিভ পাড়া যা পারেনি তুমি তাই করেছ।

বে। কি?

চো। আমাকে ধরেছ।

বে। একজন সামান্য কনষ্টেবল তোমায় ধরতে পারত না কি?

চো। বটে? আমার চেহারাখানা দেখে তাই বোধ হয় কি?

বে। তা বটে তোমাকে দেখলে বোধ হয় কোন ভদ্রলোকের ছেলে।

চো। তুমি ত সামান্য কর্ণেল মাত্র, তোমায় চেনে কে? কাল যখন খবরের কাগজে বেরুবে যে তুমি 'মার্কুইসকে' ধরেছ, তখন দেশ বিদেশে তোমার নাম ছেয়ে যাবে, আর গোটা দশেক সোনার মেডেল পাবে। থাক্ তাহলে হীরে 'নয়ফোকে' তোমার ভাইয়ের বাড়ীতেই আছে কেমন?

বে। হঁা।

চো। তাহলে ত এখন সেখানে আমাকে যেতে হয়!

বে। আগে বছর পনর শ্রীঘরে বাস করে এস ত!

চো। পাগল আর কি! তাও কি কখন হয়? ভারতবর্ষে যারা কাজ করে তাদের একটু কেমন বাড়িয়ে বলা স্বভাবটা আপনি হয় দেখছি। বোধ হয় লিভারের দোষ জন্মায়।

বে। (চটিলেন) তোমাকে বেত লাগান উচিত।

চো। একটু ভদ্রলোকের মত কথা কইতেও শেখনি? তোমার ত আর জর্ম্মেনিতে বাড়ী নয়, বোধ হয় আরদালি থেকে কর্ণেল হয়েছ, লেখাপড়ার ধার ধারনী বুঝি—তা বেশ, যা ইচ্ছে হয় বলে যাও।

[সিঁড়িতে পদ শব্দ শোনা গেল, কর্ণেল একবার সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন, চোর নিঃশব্দে টেবিল হইতে পিস্তল হস্তগত করিল। যখন কর্ণেল মুখ ফিরাইলেন তখন চোর উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল]

শীঘ্র,—ইন্‌স্পেক্টার, ওর কাছে অস্ত্র আছে, ধর ওকে।

[কর্ণেল চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখেন, চোর এক হস্ত টেবিলের উপর রাখিয়া অপর হস্তে পিস্তলটী তাঁহার দিকে নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছে। ইন্‌স্পেক্টার অবিলম্বে কর্ণেলকে ধৃত করিয়া তাঁহার হস্তে হাতকড়া লাগাইল ও পকেট হইতে তাহার সংগৃহীত পিস্তল, চাবি ও তালা ভাঙ্গিবার কল বাহির করিল]

চো। আমাকে বড়ই বিপদে ফেলেছিল। ভয়ানক ডাকাত, যদি তোমাদের পরামর্শ শুনে প্রস্তুত না থাকতাম তাহলে দেখছি আমার ভাইয়ের হীরের জন্যে আমার প্রাণটা বেঘোরে মারা যেত, আমি পুলিস কমিশনারের বন্ধু। তাঁকে তোমার কথা আমি নিশ্চয়ই বলব।

ই। আজ্ঞে—তা—তা—আপনার অনুগ্রহ (বাক্য হীন স্বপ্নাবিষ্ট কর্ণেলের প্রতি কটমট করিয়া চাহিয়া) লোকটা ষণ্ডা বটে, বোধ হয় দাগী চোর।

চো। বলছিল—ওই নাকি মার্ক্যুইস্

ই। মার্ক্যুইস ? নাঃ এ কেমন করে মার্ক্যুইস হবে, সে যে ভদ্রলোক—

বে। (ভয়ানক চটিলেন) বটে! আর আমি ছোট লোক, কেমন ?

ই। থাম্, থাম্. মনে থাকে যেন, তুমি যে কথা বল্‌বে তাই তোমার বিপক্ষে প্রমাণ বলে আদালতে গ্রাহ্য হবে।

বে। (হাতকড়া বদ্ধ হস্ত উঠাইয়া) আরে ওই লোকটাই যে চোর! ও আমাকে কাবু করেছে স্বীকার করি, কিন্তু ওকে যদি ছেড়ে দাও তাহলে কিন্তু ফের তোমাকে রাস্তায় চৌকি দিয়ে বেড়াতে হবে বলে দিলাম।

চো। কেমন বল্‌বার কায়দা দেখেছ ইন্‌স্পেক্টার, ঠিক যেন সত্যি কথাই বলছে—

ই। আজ্ঞে হাঁ, ওরা সবাই প্রায় ওই রকমই হয়। প্রথমে খুব লাফাবে ঝাঁপাবে, তারপর যাই শ্রীঘরে যাবে, অমনি ঠণ্ডা।

বে। (চোরের প্রতি) আর তোমাকেও বলি, চোর বাবাজি, আপাতত সুখ করে নাও।

চো। তাত বটেই, মিছে বকে আর কেন কষ্ট পাও ? তোমার মত গুণ্ডাকে জব্দ করেও আমোদ আছে, তুমিই বোধ হয় মার্ক্যুইস, কেমন না ? আমার আরও আমোদ যে তোমাকে ধরেছি।

বে। ইন্‌স্পেক্টার, ঢের হ'ল ত, আর কেন? তুমি যে ঠকেছ তাতে তোমার কোনও দোষ নেই। ওর মুখের কাছে এমন লোক নেই যে ঠকেনা—তবে তোমার দুপক্ষেরই কথা শোনা উচিত—

ই। তুমি যা বল্‌বে আদালতে সেটা প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে, মনে থাকে যেন।

চো। (ছড়ি ও কোট লইয়া) আমার ঘুম পাচ্ছে, যা বল্‌বে থানায় গিয়ে বল।

ই। (কর্ণেলের প্রতি) বস্‌, চলে এস, দেখ বদ্‌মাইসি ক'রনা—

বে। ইন্‌স্পেক্টার, যে রকমে ইচ্ছে আমার কথা প্রমাণ বলে ব্যবহার ক'রো, কিন্তু তোমার এই বোকামি আমি নিশ্চয়ই তোমারি মনিবের সাক্ষাতে বল্‌ব। তুমি এমন ভুল করছ যে কাল লোকে তোমাকে হাততালি দেবে, আর যারা তোমার নীচে আছে তারা তোমার ওপরে প্রোমোশন পাবে।

ই। বাস্‌, আমাকে ভয় দেখাতে পাচ্ছনা, কিন্তু—

বে। হা ভগবান এও হয়—আমার নাম বেরী—আমার ক্লাবে চল, আমার উকীলের বাড়ী চল, পাড়ায় চল—সকলেই আমাকে চেনে।

চো। উঃ কি ধড়ীবাজ, কেমন মুখস্থ বলে যাচ্ছে দেখেছ? এই লোকটাই মার্কুইস বটে—ও চায় যে কাল সকালে আমার বন্ধুরা সবাই আমাকে ঠাট্টা করুক, হাঁসুক, বাঃ বেশ চালাক ত তুমি।

ই। (একবার ইহার, একবার উহার মুখের দিকে চাহিয়া) কই, চেনা মুখ বলে ত বোধ হয় না।

বে। এই লোকটাকে ফাঁদে ফেল্‌তে গিয়ে বোকামী করে আমি নিজেই সেই ফাঁদে পড়ে গেছি, আমি যা বলব ও তাই উল্‌টে নেবে। আচ্ছা আমার পকেটে আমার চিঠি আছে তা দেখলেও ত আমাকে চিনতে পারবে, এই আমার পকেট দেখ ত—

ই। (পকেট খুঁজিয়া কিছুই পাইল না—চোর একবার দ্বারের নিকট হইতে ঘুরিয়া আসিল) কই, পকেটেত কিছুই নেই—আমাকে ফাঁকি! এতে তোমার মঙ্গল হবে ভাবছ?

বে। আঃ—খাবার সময় কোটটা বদ্‌লে ফেলেছি যে—সেটা ওপরে আছে, আমাকে যেতে দাও আমি এখনি নিয়ে আস্‌ছি—

চো। বাঃ বলিহারি, ইন্‌স্পেক্টার যেন একটা গাধা আর কি। বেশ ত?

ই। (মাথা চুলকাইয়া ফেলিল) না—বড়ই গোলমাল দেখছি—এত দেরী করবার মানে কি বুঝতে পাচ্ছিনে ত।

চো। কেবল মিছে সময় নিচ্ছে। ওর মতলব বোঝা ভার। সত্যি কথা বল্‌তে কি আমার মত ইন্‌স্পেক্টার হ'লে ওকে অনেক আগে ছেড়ে দিত, তোমার কথা স্বতন্ত্র—লণ্ডনে তোমার বুদ্ধির কে না প্রশংসা করে।

ই। আজ্ঞে ঠিক্ বল্‌ছেন, মিছে সময় নিচ্ছে—

চো। হুঃ—তোমার সঙ্গে চালাকি—তুমিই না সেই যে, সেই ভয়ানক খুনটার কিনারা করেছিলে? ইউরোপে সে কথা কে না জানে?

ই। আপনি বুঝি সেই রেডিং এর খুনের কথা বল্‌ছেন?

চো। ঠিক্, ঠিক্—বলি বলি করেও বেধে যাচ্ছিল। তাইতেই ত তোমার এত উন্নতি। আজকাল যে সময় পড়েছে তাতে পুলিস লাইনে উন্নতি করা নেহাত সোজা—ছোক্‌রাগুলো হনুমানের মত লাফিয়ে উঠছে, বুড়োদের একটা ভুল ধরলেই—বাস্।

ই। আপনি ঠিক বলেছেন, এ লাইনে উন্নতির কোনই স্থিরতা নেই—

বে। বলি ওর কথা ফুরলো কি? এ তরফের দু একটা কথাও শোনা দরকার ত—

চো। (চমকাইয়া) তাই ত, মার্কুইসের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম দেখ্‌ছি—

বে। বলি ইন্‌স্পেক্টার মশাই—তোমাকে আরও একটা উপায় বল্‌ছি যদি তোমার বুদ্ধিতে ঢোকে। ওপরে মিসেস্ বেরী ঘুমিয়ে আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই ত চুকে যায়।

চো। (ভয়ানক চটিয়া লাফাইয়া উঠিল) বড়ই আস্পর্দ্ধা তোমার দেখতে পাচ্ছি। তুমি সব করতে পার। আমার স্ত্রীর শরীর দুর্ব্বল, তাঁকে কিনা এই রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়ে এই দুষমন চেহারাটার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেব—খুব সাহস ত তোমার দেখছি। ইন্‌স্পেক্টার মশাই, ও নিজের পরিচয় ঢাক্‌ছে, আমি থানায় গিয়ে এখনি সেটা প্রমাণ করে দিচ্ছি—কিন্তু এই দুপুর রাত্রে মিসেস্ বেরিকে কষ্ট দিয়ে এই চোরটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে আমি কিছুতেই রাজী নই।

ই। তা বটে, তা বটে, তাঁর শরীর ভাল নয়, আর পুলিস কমিশনার ত আপনার বন্ধু, তিনি একজন লেডিকে এত রাত্রে বিরক্ত করা হয়েছে শুনলে

চটে যাবেন। যাক্, থানায় গিয়েই একটা হেস্ত নেস্ত করা যাক, কি বল বন্ধু—
(কর্ণেলের প্রতি)

বে। গাধা, উট্, হাতি, ভেড়া—তোমার মত মূর্খ ইন্‌স্পেক্টার বোধ হয় ইংলণ্ডে আর নেই। তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না যে, তুমি মান সম্ভ্রম উন্নতি সব একটু খোসামোদে জলাঞ্জলি দিচ্ছ? জীবনে অনেক গাধা দেখেছি---কিন্তু তোমার মত—

ই। বস্—ঢের হয়েছে সুবিধে করতে না পারলেই লোকে চটে থাকে। চল যা বল্‌বে পুলিশ কমিশনর নিজেই শুনে যা হয় করবেন। কাল সকাল পর্য্যন্ত কোৎ ঘরে থাক্‌বে মাত্র—চলে এস—যদি জোর কর তাহলে—

বে। চল জোর কর্‌ব না।

ই। মহাশয় আপনিও আসুন।

চো। তা আর বল্‌তে! বাইরের ঘরে একটু অপেক্ষা করগে, আমি একবার আমার স্ত্রীকে বলে আসি—কি জানি যদি তিনি উতলা হন্। শরীরটা এদানিং বড়ই খারাপ হ'য়েছে।

ই। তবে শীঘ্র আসুন।

বে। [সজোরে ইন্‌স্পেক্টারের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু ইন্‌স্পেক্টার তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়া সোজা করিয়া দাঁড় করাইল] হারামজাদা পাজি তোর মতলব বুঝেছি—এই হতভাগা উঁট ইন্‌স্পেক্টারটা কিছুই বুঝলে না—আচ্ছা—আবার দেখা হবে—তখন তোমার অবস্থা কি করি—দেখতে পাবে—উঃ একবার হাতটা খোলা পেলে হ'ত।

চো। ইন্‌স্পেক্টার মশাই, একথাগুলো ওর বিপক্ষে প্রমাণ বলে ধরে নিও। নিজের কাণে শুন্‌লেত আমাকে ভয় দেখাচ্ছে—

বে। আচ্ছা থাক্, আবার দেখা হচ্ছে—ভয় নেই—

ই। আপনি কিন্তু আমাদের সঙ্গে আসুন—

চো। নিশ্চয়ই। আমি এক মিনিটে তৈরী হয়ে আস্‌ছি (গ্যাসের আলো নিভাইয়া দিল, অপর সকলে বাহিরে চলিয়া গেল। কাণ পাতিয়া শুনিয়া) তাইত, একেবারে নীচের ঘরে চলে গিয়েছে। যাক্ এইবারে 'নরফোকে' যেতে হয় (খুব হাসিয়া) বেরী বেচারা কিন্তু লোক ভাল (দ্বারের নিকট যাইয়া) ইন্‌স্পেক্টার বেচারার ভবিষ্যৎ কিন্তু বড়ই শোচনীয়—আহা! (নিষ্ক্রান্ত)

[যবনিকা পতন]

বিপ্লব

[লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিলাত ফেরৎ

নেউগী পাড়ার করালী চাটুয্যের ছেলে পরেশ চাটুয্যে বিলাত হইতে ডাক্তারী পরীক্ষার শেষ সার্টিফিকেট লইয়া যে দিন দেশে ফিরিল, সে দিন গ্রামে এমন একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, রাজা রাজড়ার উপস্থিতিতেও এত হৈ চৈ ব্যাপার হয় কি না সন্দেহ। অনেকেরই পূর্ব্বরাত্রে সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, এমন সংবাদও পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের এত নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ যে এমন গভীর বিস্ময়ে ও বিষাদে পরিণত হইবে, ইহা কেহই জানিত না। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোট প্যাণ্টালুন আঁটা বাঙ্গালী সাহেবরূপী এক অদ্ভুত জীবের পরিবর্ত্তে, যখন ধুতি-চাদর পরা চির-পরিচিত পরেশ চাটুয্যে সহাস্যমুখে কৌতুহলপূর্ণ জনতার সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন সকলেরই দিবসদ্বয় ব্যাপী প্রগাঢ় উৎসাহ, গভীর নৈরাশ্য ঘোর বিষাদে পরিণত হইল। তাহারা নিতান্ত হতাশ চিত্তেই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং বিলাত ফেরৎ যুবকের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল।

সুবিজ্ঞ হরিধন ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ওহে, ছোকরা চালাক আছে। সাহেবী পোষাক পরে এলে যদি সমাজে গোলযোগ ঘটে, তাই ধুতি চাদর পরে এসেছে।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "কিন্তু ধুতি চাদর পরলেই তো বিলাত যাত্রার প্রায়শ্চিত্ত হ'লো না। এর রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। রঘুনন্দন স্পষ্টই লিখে গেছেন, "সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ মধুপর্কে পশোর্বধঃ।"

গদাধর মণ্ডল বলিল, "আচ্ছা বাবাঠাকুর, উনি যে মেম বিয়ে করেছিল, কৈ তেনাকে তো সঙ্গে নিয়ে এলো না।"

ঘোষাল মহাশয় তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "দূর বোকা চাষা, তাকে কি এখানে নিয়ে আসে? আর সেই বা এ পাড়াগাঁয়ে আসবে কেন?"

শ্রীমন্তপাল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে তবে কোথায় রেখে এল ?"

ঘোষাল। কলকাতায় রেখে এসেছে।

সার্ব্বভৌম মহাশয় মস্তক সঞ্চালনে দীর্ঘ শিখা কম্পিত করিয়া বলিলেন, "আমার কথাটা কি জান, ছোকরা এমন ভাবে এসেচে, যাতে সহজে সমাজে ঢুকতে পারে। আর বাপু সেটী হবে না। একি ম্লেচ্ছের সমাজ যে, যেখানে সেখানে গিয়ে, যা তা খেয়ে সমাজে চলে যাবে,—এ হিন্দু সমাজ।"

বৃদ্ধ বিশ্বনাথ আকুলি বিষাদ ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "ছি ছি, করালী চাটুয্যের ছেলে হ'য়ে এমন কাজটা করলে!"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "ঘোর কলি। একালে ছেলেরা কি আর কিছু মানতে চায়। যা মনে আসে তারা তাই করে।"

হরিধন ঘোষাল বলিলেন, "শুধু ছেলের দোষ দাও কেন? পিতার গুণ পুত্রে বর্ত্তে। করালীই বা কি সাধু পুরুষ ছিল। সে কি না করেছে, কি না খেয়েছে।"

অতঃপর পুত্রকে ত্যাগ করিয়া সকলে পিতার দোষ-গুণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

করালী চাটুয্যের যে বাস্তবিক কোন দোষ ছিল না এমন নয়, কিন্তু গুণ এত ছিল, যাহাতে সে সামান্য সামান্য দোষগুলির দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর না পাইয়া গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাঁহার অসামান্য গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল। করালীচরণের পৈতৃক ভূসম্পত্তি এবং নগদ অর্থ এত ছিল যে অনেক জমীদারও তাঁহার সহিত পাল্লা দিতে পারিত না। কিন্তু তাহার অধিকাংশই তিনি পরোপকারার্থে ব্যয় করিয়া মৃত্যুকালে কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ব্যতীত আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবের আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু অতিথি অভ্যাগতের কোলাহলে বৃহৎ ভবন নিরন্তরই উৎসবময় হইয়া থাকিত। লোকের বিপদে, সে ব্রাহ্মণই হউক বা চণ্ডালই হউক, তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না, আপনার যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া লোককে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। জমিদার প্রজার উপর অত্যাচার করিত। দুর্ব্বল প্রজা করালী বাবুর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িত। করালীবাবু প্রজার পক্ষে মোকদ্দমা চালাইয়া অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ভয়ে প্রবল দুর্ব্বলকে উৎপীড়িত করিতে সাহসী হইত না, জমিদার

প্রজাকে ভয় করিয়া চলিত। জমিদারের সহিত মোকদ্দমায় তাঁহার অনেক নগদ সম্পত্তি ও ভূসম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়াছিল।

শুধু মামলা মোকদ্দমায় নহে, দানেও তাঁহার অনেক টাকা খরচ হইত। কখনও কোন প্রার্থী তাঁহার নিকট আসিয়া রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যায় নাই। গ্রামে অনেক দরিদ্র কৃষক ও ইতর লোকের বাস। তাহাদের মধ্যে কঠিন রোগ হইলে প্রায়ই বিনা চিকিৎসায় মারা যাইত। কিন্তু করালী বাবুর কাণে গেলে তাহা হইতে পারিত না। তিনি ভাল ডাক্তার আনিয়া ঔষধ পথ্যের খরচ দিয়া রোগীকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ করিতেন।

একবার এক ডোমের ছেলের কলেরা হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া করালী বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং রহিমপুর হইতে গণেশ ডাক্তারকে অনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্তার মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই অন্যত্র ডাকে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। প্রেরিত লোক সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল। রোগীর অবস্থা তখন খুব শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। করালীবাবু ব্যস্তচিত্তে স্বরূপগঞ্জের ডাক্তার হেমবাবুকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। হেম-বাবু কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারের বেতন ভোগী। সুতরাং করালীবাবুর আহ্বানে তিনি আসিলেন না; শরীর অসুস্থ, রাত্রিতে বিদেশে যাইবেন না, ইত্যাদি ওজর করিয়া কাটাইয়া দিলেন।

মধ্যরাত্রিতে রোগী মারা গেল। পুত্রশোকাকুল মাতাপিতার করুণ চীৎকারে নৈশ-আকাশের বক্ষ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। করালীবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিলেন।

পরেশের বয়স তখন পনেরো বৎসর। সে এণ্ট্রান্স ক্লাশে পড়িত। পরেশ তখন ঘুমাইতেছিল। করালীবাবু তাহাকে ডাকিয়া তুলিলেন, এবং শোকরুদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেখাপড়া শিখে পাশ ক'রে কি ক'রবে ভেবেছ?"

পরেশ বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিল। করালীবাবু বলিলেন, "ডাক্তারি শিখতে পারবে?"

বিনীতস্বরে পরেশ উত্তর করিল, "পারবো।"

করালীবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "ছোটখাট ডাক্তার নয়, খুব বড় ডাক্তার হতে হবে' আর দেশের এই সব লোকদের—যারা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়—তাদের বাঁচাতে হবে।"

নম্র অথচ দৃঢ়স্বরে পরেশ বলিল, "যে আজ্ঞা।"

পরেশ এফ এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিল।

শুধু মেডিকেল কলেজের বিদ্যায় পরেশের অদম্য শিক্ষা-লালসার পরিতৃপ্তি হইল না। এখানকার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সে বিলাত যাত্রার ইচ্ছুক হইল। করালী বাবুও পুত্রের ইচ্ছায় বাধা দিলেন না, তিনি কোম্পানীর কাগজ বেচিয়া পাঁচ হাজার টাকা পুত্রের হাতে দিয়া বলিলেন, "বিলাত যাও, কিন্তু সাহেব সেজে যেন দেশে ফিরো না।"

পিতার পদধূলি মস্তকে লইয়া পরেশ বিলাত যাত্রা করিল। এবং দৃঢ় অধ্যবসায় প্রভাবে সেখানকার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল।

পিতা কিন্তু পুত্রের এই আশ্চর্য্য শক্তি সন্দর্শন করিবার অবসর পাইলেন না; পরেশের পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে কালের আহ্বানে তিনি ইহলোক হইতে অপহৃত হইলেন। সংবাদ পাইয়া পরেশ কাঁদিল, কিন্তু সঙ্কল্প হইতে পশ্চাৎপদ হইল না।

করালী বাবুর মৃত্যুতে গ্রামের অনেকেই কাঁদিয়া বলিল, "ইন্দ্র পাত হ'য়ে গেল।"

দুই চারিজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "দেশের একটা মাতাল ক'মে গেল।"

করালী বাবুর গুণ অনেক থাকিলেও দোষও কিছু কিছু ছিল। তিনি মদ্যপায়ী ছিলেন, জাতিবিচার বড় একটা করিতেন না, ইতর জাতির সংস্পর্শ দোষটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। ইহাতে সমাজের মধ্যে যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থাবান, তাঁহারা করালী বাবুকে একটু বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখিতেন। মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও মনের ভিতর একটা রুদ্ধ ক্রোধ আগ্নেয় গিরিগর্ভ নিরুদ্ধ অগ্নিরাশির ন্যায় পোষণ করিতেন। ইহাঁদের মধ্যে হরিধন ঘোষাল, যাদব সার্ব্বভৌম, সীতানাথ আকুলি প্রভৃতি প্রধান। ইহাঁরা করালী বাবুর নিকট অনেক যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিয়া পরেশের বিলাতযাত্রায় বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু করালী বাবু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। সার্ব্বভৌম মহাশয় শেষে ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবাজি, তোমার এই একমাত্র পুত্র, পিণ্ডাধিকারী; এই পুত্র বিলাত যাত্রা করলে তোমার পিতৃপুরুষেরা এক গণ্ডুষ জল পাবেন না।"

উত্তরে করালী বাবু বলিয়াছিলেন, "পরেশ বিলাত হ'তে ফিরে যদি একটা

মুমূর্ষু রোগীর মুখে একবিন্দু ঔষধ দিতে পারে, তবে সে ঔষধ বিন্দুতে আমার পিতৃপুরুষ অমৃতবিন্দু পানের তৃপ্তি অনুভব করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।”

অগত্যা সার্ব্বভৌম মহাশয় করালী চরণকে নাস্তিক, অর্ব্বাচীন প্রভৃতি আখ্যা দিয়া বিরত হইয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ সমাজপতিগণের সহিত মিলিত হইয়া করালী বাবুর ধর্ম্ম ও সমাজের উপর এই গভীর উপেক্ষার প্রতিশোধ লইবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প বদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু কালের শাসনে করালী বাবু যখন তাঁহাদের প্রতিশোধ স্পৃহাকে সম্পূর্ণ নিস্ফল করিয়া দিয়া, সমাজশাসনের অতীত দেশে চলিয়া গেলেন, তখন সমাজপতিগণ পিতৃঋণ পুত্রের নিকট হইতে শোধ লইবার সঙ্কল্প করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে

করালী বাবুর বাড়ীখানা খুব বড়; বাহির মহল ও ভিতর মহল এই দুই-ভাগে বিভক্ত। কিন্তু এই দুইমহল বড় বাড়ীখানায় মাত্র দুইটী প্রাণী ঝটিকা বিধ্বস্ত বৃহৎ উদ্যানে দুইটী জীর্ণ বৃক্ষের মত স্তব্ধ শঙ্কিত চিত্তে বাস করিত। একজন পরেশের বিধবা পিসীমা তারাসুন্দরী, দ্বিতীয় বুড়া চাকর রামু গয়লা। পরেশের মা অনেক দিন আগেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তদবধি পিসীমাই সংসারে কর্ত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কর্ত্তব্য ভার লইয়া একদিন যে তাঁহাকে একা এত বড় বাড়ীখানা আগলাইয়া থাকিতে হইবে, ইহা কখনও ভাবেন নাই। ভ্রাতার মৃত্যুতে দাবদগ্ধ অরণ্যানীর ভীষণ স্তব্ধতা আসিয়া যখন বাড়ী-খানাকে আচ্ছন্ন করিল, তখন এই স্তব্ধ নির্জ্জন বাড়ীতে বাস করিতে তারা-সুন্দরীর নিশ্বাস যেন রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি এ স্থান হইতে পলাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু রামু তাঁহাকে যাইতে দিল না; বুঝাইয়া বলিল, তুমি যদি যাও, তবে কাজেই আমাকেও যেতে হবে। তা হ'লে ছোঁড়াটা ফিরে এসে কার কাছে দাঁড়াবে বল দেখি?”

অগত্যা তারাসুন্দরী ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া কোন রকমে তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

তারপর যখন সংবাদ আসিল, পরেশ ফিরিয়া আসিতেছে, তখন আশায় আনন্দে তারাসুন্দরীর হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে একটা আতঙ্ক আসিয়াও দেখা দিল। তিনি প্রায় সকলের মুখেই শুনিয়া

আসিতেছিলেন, পরেশ আর সে পরেশ নাই, সে এখন পূরা দস্তর সাহেব হইয়া আসিতেছে। সে এখন দিন রাত হ্যাট কোট পরিবে, মুখে 'গ্যাড্ ম্যাড্' বুলি বলিবে, টেবিলে বসিয়া ছুরি কাঁটা ধরিয়া বিলাতি খানা খাইবে, যিশুখৃষ্ট ভজবে এবং সকলকে ভজাইবে; চাই কি একটা মেমসাহেবকেও সঙ্গিনী করিয়া আনিতে পারে,—ইত্যাদি।

এই সকল শুনিয়া শুনিয়া তারাসুন্দরীর মনের ভিতর এমন একটা আশঙ্কা জন্মিল যে, তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। রামুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে রামু, কি হবে?"

রামু প্রবল উৎসাহ দেখাইয়া বলিল, "হবে আবার কি? তুমি বুড়ো শিবের পূজোর জোগাড় করে রাখ। গোটা পাঁচেক টাকা দাও, দু'টো পাঁটা কিনে আনি। ডাইনে বাঁয়ে পাঠা দিয়ে কালীর পূজো দিয়ে আনতে হবে।"

তারাসুন্দরী বিষণ্ন ভাবে বলিলেন, "তাতো হবে, কিন্তু পরেশ যদি সাহেব সেজে আসে?"

রামু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারাসুন্দরী ঈষৎ লজ্জিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসছিস যে?"

রামু হাস্যবেগ সম্বরণ করিয়া খানিকটা কাসিয়া বলিল, "তোমার কথা শুনে। হ্যাগো ছোড় দি, তুমি কি রকম মানুষ গা? সে সাহেব সেজেই আসুক, বা ফিরিঙ্গি সেজেই আসুক, আমাদের পরশা তো বটে।"

রামুর কথায় তারাসুন্দরী কতকটা আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু বুড়া বয়সে ধর্ম্মটা খোয়াইতে হইবে কি না এ চিন্তাটুকু একেবারে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। রামু মিস্ত্রী লাগাইয়া বাড়ীর সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইল।

তারপর পরেশ চাদরের খুঁটটা মাটীতে লুটাইতে লুটাইতে আসিয়া যখন পিসীমার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া পায়ের ধূলা লইল, তখন তারাসুন্দরী দুই হাতে পরেশের মাথাটা জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দের আতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "পরেশ, তুই এলিরে বাপ!"

রামু আসিয়া ব্যস্ততার কণ্ঠে বলিল, "কৈ, ছোড় দি, পুজোর জিনিষ পত্তর কোথায়?"

পরেশ তাহার দিকে ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি যে পূজো

নিয়ে ব্যস্ত হ'লে কাকা, আমার সঙ্গে একটা কথা কইবার সময়ও যে তোমার নাই ?"

রামু বলিল, "থাম্ থাম্, আগে পূজোগুলো পাঠিয়ে দিই, তারপর বসে দিন রাত ধরে তোর সঙ্গে কথা কইবো। কৈ গো ছোড় দি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "এই যে দিই। আজ যদি দাদা থাকতেন রামু ?"

রামু রাগিয়া চড়া গলায় উত্তর করিল, "থাক্‌তো থাকতো, নাই যখন—নাঃ, তোমাদের মেয়ে মানুষগুলোর জ্বালায়—"

কথা শেষ না করিয়াই রামু ছুটিয়া পালাইল। তারাসুন্দরী ডাকিয়া বলিলেন, "চললি যে রে রামু।"

রামু যাইতে যাইতে ধরা গলায় উত্তর দিল, "আসছি; দেখি মুটে বেটারা মোট ঘাটগুলো কোথায় ফেলছে।"

পরেশের চোখ দুইটা ছল ছল করিতে লাগিল। আহারে বসিয়া পরেশ এক গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়া উৎফুল্ল স্বরে বলিল, "আঃ বাঁচলাম! এমন দেশেও মানুষ যায়, যেখানে ভাতের মুখ দেখবার যো নাই।"

তারাসুন্দরী কাছে বসিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে পরেশ, সেখানে কি খেতিস্ ?"

পরেশ বলিল, "ছাই পাঁশ কত কি। সত্যি পিসীমা, আমার সেগুলো ছাই ভস্ম ব'লেই মনে হতো। খেতে বসলেই দেশের ডাল-চচ্চড়ির কথা মনে পড়তো, আর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতো।

শুনিয়া পিসীমার চোখ দুইটাও জলে ভরিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে দেশে কি ভাত পাওয়া যায় না ?"

পরেশ বলিল, "পাওয়া যাবে না কেন, তবে সেখানে ভাত খাওয়ার তেমন চলন নাই। জাতটার এ দিকে সব ভাল, কিন্তু না জানে রাঁধতে, না জানে খেতে।" শাকের ঘণ্টটা যে ফুরিয়ে গেল, আর একটু দাও পিসীমা।"

পিসীমা আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে বলিলেন, "ওমা, তুই আগে যে শাক পাতেও পাড়তিস্ না রে পরেশ ?"

সহাস্যে পরেশ বলিল, "তখন কি জানতাম্ পিসীমা, যে শাকের ঘণ্টটাও এমন দুর্লভ! অভাবেই জিনিষের মর্য্যাদা বোঝা যায়। আমি সেখানে বসে শাকের নামে একটা স্তব লিখেছি, তোমাকে পড়ে শোনাব।—

হরিৎ বরণ পত্র বৃন্ত রসভরা,
দশনে হইয়া পিষ্ট দাও সুধাধারা।

গিসীমা হাসিতে হাসিতে উঠিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন।

অপরাহ্নে গ্রামের অনেকেই পরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। পরেশ তাহাদিগকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। তাহারা পরেশের উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিল, চাটুয্যে মহাশয়ের অকালে পরলোক গমন জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া পরেশের পিতৃহীনতায় আপনাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিল, বিলাতের অনেক আশ্চর্য্য জনক বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আপনাদের কৌতুহল চরিতার্থ করিতে লাগিল। পরেশ বিনয় ও নম্র ভাবে তাহাদের কথার উত্তর দিয়া সকলের যথাসম্ভব সম্মান রক্ষা করিতে যত্নবান হইল। পরিশেষে হরিধন ঘোষাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হলে ভায়ার এখন কোথায় থাকা হবে? কলকাতায়, না পশ্চিমের কোন সহরে?"

পরেশ উত্তর করিল, "আপাততঃ তো এই গাঁয়েই।"

অতিমাত্র বিস্ময়ে ঘোষাল মহাশয়ের বাক্‌শক্তি যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ ভাবে অবস্থিতি করিয়া তিনি বিস্ময়াপ্লুতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বল কি ভায়া, এই গাঁয়ে?"

পরেশ মৃদু হাসিল। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "এখানে থাকলে তোমার পোষাবে কি?"

সহাস্যে পরেশ বলিল, "যা পোষায়। মাসে বিশ পঁচিশ টাকা হবে না?"

গম্ভীর ভাবে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "কিন্তু তাতে তোমার কি হবে?"

পরেশ বলিল, "আমাদের মত গরীব গৃহস্থের পক্ষে তাই যথেষ্ট।"

ঘোষাল মহাশয়ের ভ্রুযুগল কুঞ্চিত হইল। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "উত্তম সঙ্কল্প করেছ বাবাজি, আমাদেরও তিন ক্রোশের ভিতর বড় ডাক্তার নাই। একটা ভারি ব্যারাম হ'লে অকূল পাথারে পড়তে হয়। তুমি কাছে থাকলে আমরা এক রকম নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।"

পরেশ সবিনয়ে বলিল, "আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাদের সেবাতেই যেন আমার শিক্ষার সার্থকতা হয়।"

উৎফুল্ল কণ্ঠে সার্ব্বভৌম বলিলেন, "পিতার উপযুক্ত পুত্র। আহা, করালী ভায়া প্রায়ই বলতো, ভট্টাচার্য্য দাদা, ছেলেটিকে মানুষ করা ছাড়া আমার আর

অন্য আশা নাই। তাহা, আজ যদি ভায়া থাকতো, তার কি আনন্দ হত! গোবিন্দ হে, তুমিই সত্য।"

গভীর হুঙ্কার সহকারে সশব্দ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় মোহাবেগে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পিতার নামে পরেশের চক্ষুও সজল হইয়া আসিল। স্কন্ধস্থ গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা শুষ্কচক্ষু মার্জ্জনা করিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "অদৃষ্ট, অদৃষ্ট! আর এমন মন্দ অদৃষ্টই বা কি, এমন সুপুত্র রেখে স্বর্গে গেছে। 'পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরানাং পুণ্যপাপণম্।' এমন পুত্র রেখে যেতে পারলে তো হয়।"

পরেশ একখানা কাগজ লইয়া নীরবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "কিন্তু বাবাজি, তোমার কর্ত্তব্য এখনো বাকী আছে। তুমি বিদেশস্থ থাকায় ভায়ার শুধু পিণ্ডদান কার্য্যই হয়ে রয়েছে। তোমার উচিত, বৃষোৎসর্গ করে পিতার প্রেতত্ব বিমুক্ত করা। কি বল হে ঘোষাল?"

ঘোষাল মহাশয় মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "অবশ্য কর্ত্তব্য।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তার সময়ও এখনো অতীত হয় নি। 'আদ্যশ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষে বা ষষ্টে মাসি চ বৎসরে।' ত্রিপক্ষও অতীত হয়ে গিয়েছে, এখন ষষ্ঠ মাসেই বৃষোৎসর্গের আয়োজন কর।"

পরেশ সবিনয়ে উত্তর দিল, "যে আজ্ঞা।"

অতঃপর হিসাব করিয়া দেখা গেল, পঞ্চম মাস অতীত হইয়া ষষ্ঠ মাসই চলিতেছে; সুতরাং এই মাসের মধ্যেই কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে। সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পরেশকে যে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইবে না, সার্ব্বভৌম ও ঘোষাল মহাশয় প্রভৃতি আত্মীয়গণ সমবেত হইয়া অনায়াসেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন এরূপ আশ্বাসও দিলেন। পরে আরও নানা কথায় পরেশের সহিত আপনাদের আত্মীয়তার প্রগাঢ়তা জ্ঞাপন করিয়া সকলে একে একে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরেশের একটা আশঙ্কা ছিল যে, সে সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে। কিন্তু আজি সার্ব্বভৌম ও ঘোষাল মহাশয়ের কথায় তাহার সে আশঙ্কা অনেকটা দূরীভূত হইল। তাহার বিলাতযাত্রারূপ অপরাধটা সমাজ যে এত সহজে ক্ষমা করিবে ইহা সে কখনও ভাবে নাই। এই সঙ্কীর্ণতার জন্য হিন্দুসমাজের উপর তাহার মনে যে একটু অশ্রদ্ধার ভাব ছিল, তাহা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইল। সে প্রফুল্লচিত্তে উঠিয়া গিয়া পিসীমাকে এই সুসংবাদ প্রদান করিল।

এদিকে যাহারা এই বিলাত প্রত্যাগত যুবকের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হইতে সহসী হয় নাই, তাহারা সার্ব্বভৌম ও ঘোষাল মহাশয়ের নিকট গিয়া এই যুবকের হাল চাল ও রীতি নীতির কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাঁহার এই সকল জিজ্ঞাসার উত্তরে তাচ্ছিল্যসূচক হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখবো আর কি, বিলেত থেকে এসেছে, সাহেবী মেজাজ। তবে সমাজের ভয়টুকুও তো আছে, তাই একটু নরম। শুনলাম, পিসী বুড়ী আসন পেতে ভাত দেওয়ায় তাকে এই মারে তো এই মারে। পাতে শাক দেখে বলে, এসব বুনো ঘাস তো গরু ছাগলেই খায়। ওর ইচ্ছা আজই বাবুর্চ্চি রাখে, বুড়ীটাই অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে রেখেছে যে, আগে সমাজে চল হয়ে যাক্, তার পর যা মনে আছে তাই করবে।"

শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ ছি ছি করিতে লাগিল। ঘোষাল মহাশয় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপের বৃষোৎসর্গ করবে যে হে, তোমাদের লুচি মোণ্ডা খাওয়াবে।"

শ্রোতৃবৃন্দ ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "এমন লুচি মোণ্ডায় আমরা—ক'রে দিই। আমাদের শাকভাতই ভাল।"

ঘোষাল মহাশয় তখন তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এখন এ সকল কথার আন্দোলনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।' ছোঁড়া অনেক মিনতি, অনেক অনুনয় বিনয় করেছে বটে, কিন্তু সমাজ-ধর্ম্ম তো ত্যাগ করা যায় না। দেখা যাক্, ও যদি রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করে, হিন্দু আচরণে চলে, তখন যা হয় করা যাবে।"

এই কথা লইয়া সাধারণের মধ্যে একটা মৃদু আন্দোলন চলিতে লাগিল। কিন্তু সে আন্দোলনের কোন কথা পরেশের কাণে গেল না। পরেশ মহোৎসাহে কলিকাতা হইতে ঔষধপত্র ও ডাক্তারীর সাজসরঞ্জাম আনাইয়া ডাক্তারখানা স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

কপালের দোষ

(লেখক—শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী)

(১)

ঠিক শ্রাবণের মেঘভরা আকাশের মত বাড়ীখানা আজ থম্ থম্ করিতেছে। চারিদিক হইতে মৃত্যুর ছায়া যেন জীবন্ত হইয়া—কালো কালো যমদূতের মত বিকট হাঁ করিয়া গিলিতে আসিতেছে। যে মৃদু বাতাস আজ সন্ধ্যাবেলাতেও আমার কাণের ভিতর দিয়া প্রাণের ভিতরে দ্বাপরের অভিসারের বাঁশী বাজাইয়া গিয়াছিল সেও এখন—এই রাতটুকু পোহাইতে না পোহাইতেই—এই ভোরের বেলা যেন হাজার হাজার অতৃপ্ত প্রেতাত্মার কান্না জুড়িয়া দিয়াছে! আর যাহাকে লইয়া এই সব ঘটিয়াছে—সে এখনও—ঠিক সেইখানটিতেই—দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির গোড়ায়—তেমনি রক্তাক্ত দেহে—নিথর—নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে!

মা দুপুর রাত হইতে সেই যে লুটোপুটি খাইয়া কাঁদিতেছেন—থামেন নাই। কেবল মূর্চ্ছার ফাঁকে ফাঁকে এক একবার বলিতে সুরু করিয়াছেন "খুনে খুনে—খুনে ইন্দিরে—খুনে ইন্দি—হায় হায় দুধকলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছিলুম, আমার সব খেলে!"

মায়ের প্রাণ ঠিক টের পায়! হাঁ আমিই তো তাঁর সাতরাজার ধন নীলমণিকে একমাত্র বংশের দুলাল সুপ্রকাশকে খুন করিয়াছি! সুপ্রকাশ—সুপ্রকাশ! হাঁ, যে সুপ্রকাশ আমার ধ্যান জ্ঞান জীবন সর্ব্বস্ব, যে সুপ্রকাশ আমার এই নারীজন্মের ইষ্টদেবতা! যে সুপ্রকাশকে লইয়া আজ সন্ধ্যাবেলাতেও ভবিষ্যৎ সুখ স্বর্গ রচনার কল্পনা করিয়াছিলাম! সেই—আমার স্বামী—আমার প্রভু—আমার প্রিয়তম- জীবনাধিক সুপ্রকাশ! হাঁ, তাহাকে আমি এই হাতেই খুন করিয়াছি!

কিন্তু সে কথা জানে কে? এক সে আর আমি ছাড়া কেউ জানেনা। মায়ের প্রাণ ঠিক টের পাইলেও, আর কেউ তা মানিল না—পুলিশ হার মানিয়া গেল। সে আমার কলঙ্ক বুকে ধরিয়া চলিয়া গেল—আমি তার কলঙ্ক বুকে চাপিয়া রাখিয়া চিরকাল তুষানলে পুড়িয়া মরিব। হাঁ—এই তো আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত!

তবুও—ওঃ—বুক ফাটিয়া যায়! যদি চেঁচাইয়া বলিতে পারিতাম—যদি তার জন্য কলঙ্কের পশরা মাথায় বহিয়া আজ ফাঁসী কাঠে ঝুলিতে পারিতাম—তবে বুঝি যথার্থই বড় সুখ হইত, বড় শান্তি পাইতাম! কিন্তু না—তা হইবার নয়!

মৃতদেহ সরাইবার আগে অনেক কষ্টে অনেক সাধ্যসাধনায় একবার জন্মের শোধ শেষ দেখা দেখিয়া লইবার অনুমতি পাইলাম।

চোখ ভরিয়া দেখিতেছি। আর তো কথা কহিবে না! সে ঠোঁট দুখানি আজ সন্ধ্যেবেলাতেও আমার ঠোঁটে মদিরার কলসী উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিল, সে দুটী আমার কলঙ্কের কথা বলিবার ভয়েই যেন এখন চিরকালের মত একেবারে বন্ধ হইয়াছে! যে হাত দুটি কতই না আগ্রহে আমার কোমর বেড়িয়া অতি সন্তর্পণে বুকের উপর টানিয়া লইয়াছিল—তা এখন নিজের বুকের উপরেই কাঠ হইয়া রহিয়াছে! যে চোখ দুটি আমার চোখের দিকে চাহিয়া এক নিমিষে হাজার মুখের কথার চেয়ে সমস্ত প্রাণের ভালবাসা টুকুর পরিচয় দিয়া দিত—সে দুটিও নীমিলিত!

হাঁটু গাড়িয়া বসিলাম, হাত দু'খানি ধরিলাম, ওঃ—কি ঠাণ্ডা! —আমার সমস্ত দেহের শোণিত যেন সেই স্পর্শেই জমিয়া গেল! চোখে এক ফোঁটাও জল আসিল না। উপুড় হইয়া চোরের মত—অত্যন্ত সাবধানে একবার এদিক ওদিক চাহিয়া মুখের উপর মুখ আনিয়া অতি মৃদুস্বরে ডাকিলাম—প্রিয়তম!

একবার যেন চোখ মেলিয়া চাহিল—ঠোঁট দুখানিতে যেন বিদ্যুতের মত চকিতে একটু হাসি খেলিয়া গেল। উঃ—কি সে চাহনি! কি ভালবাসা ভরা অকাতর মিনতির অনুরোধ—সে দৃষ্টিতে!

বুঝিলাম—মনের ভুল! কিন্তু থাকিতে পারিলাম না—তেমনি সন্তর্পণে—তেমনি সারা মন-প্রাণ ঢালিয়া চুম্বন করিয়া বলিলাম—"ভয় নাই প্রাণেশ্বর, একথা প্রকাশ হইবে না, তুমি যেমন আমার কলঙ্ক বুকে ঢাকিয়া লইয়া আগে চলিয়া গেলে—আমিও তেমনি তোমার কলঙ্ক সারাজীবন বুকে চাপিয়া রাখিয়া তোমার অগাধ ভালবাসার প্রতিদান দিব!

আবার সেই ক্ষীণ বিদ্যুৎ-রেখার মত চকিত হাসি! কিন্তু এবার চাহনি যেন পরিতৃপ্ত! না:—এও আমার মনের ভুল!

(২)

আমি ছাড়া আমার মায়ের যেমন দুনিয়ায় আর কেউ ছিলনা—সুপ্রকাশের মায়েরও তেমনি ওই একটি মাত্র ছেলে ছাড়া আর কেউ কোথাও ছিল না।

স্বামী তাঁর সিবিল-সার্জ্জন. ডাক্তার ছিলেন। রোজগারও করিয়াছিলেন ঢের, কিন্তু তাঁর মরণের সঙ্গে সঙ্গে সে সবই তিনি শেষ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, বাকী যা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে মা-বেটার কোন রকম কষ্ট হইবার কথা না থাকিলেও—ছেলেটি বাপের ধাত কিছু কিছু পাইয়া সেই কষ্টটা ডাকিয়া আনিতেছিল।

সবাই বলিত—"সুপ্রকাশ উড়োনচড়ে—জুয়াড়ি, সব উড়াইয়া পুড়াইয়া দিয়া দেনা করিয়াছে, তার উপর আবার তুলোর খেলায় মাতিয়া সেই ভিজা কম্বলখানা দিন দিন আরও ভারী করিয়া তুলিতেছে।"

মা মৃত্যুকালে তাঁহার বড় আদরের ইন্দিরাকে তাঁর সখির হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তখন আমি ছেলে মানুষ, কিন্তু বেশ মনে পড়ে যে তদবধি আমি আর একটি নূতন মা পাইয়াছি। তেমনি স্নেহময়ী, তেমনই যত্নবতী! সুপ্রকাশের মাতাকেই 'মা' বলিয়া তাঁহাকে ভুলিতে পারিয়াছি।

অনেককাল ধরিয়া স্কুলের বোর্ডিংএ ছিলাম, সকল খরচই এই মা বহন করিতেন। পনর বছর বয়সে এন্ট্রান্স পাশ করিবার পর আমাকে ঘরে আনিয়া কাছে রাখিলেন। বুঝিলাম যে আমাকে আরো পড়াইবার ইচ্ছা থাকিলেও খরচে কুলাইয়া উঠিতে পারিলেন না—দেনাটা তখন সত্যই বড় ভারী হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু সে কথা আমাকে জানাইয়া কখনো একটি দিনের তরেও মনোকষ্ট দেন নাই।

কিন্তু যাক্ সে কথা। আজ এ কি দেখিলাম? সুপ্রকাশকে আরও তো কতবার দেখিয়াছি, কথা কহিয়াছি, একসঙ্গে বেড়াইয়াছি কিন্তু এমনতর তো কখনো দেখি নাই। এ দৃষ্টি এত দিন কোথায় ছিল?

বোর্ডিংএ কুমারী মেয়েদের সঙ্গে পুরুষ মানুষ লইয়া কত আলোচনা—কত রহস্য—কত ব্যঙ্গ করিয়াছি। কতদিন বুক ফুলাইয়া জোর গলায় বলিয়াছি—"আমি চিরকুমারী থা'কবো, সাধ করে বেড়ী পরে পুরুষের দাসীত্ব করতে যাব না।" তারা বলিত—"দেখ্‌বো লো দেখ্‌বো, কত দিন থাকে?"

তখন হাসিতাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি—যে সত্যই এক লহমায় কে কোথা দিয়া আসিয়া হঠাৎ আমার গুমোর ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে? যেটা অত্যন্ত উপেক্ষার, অত্যন্ত হাস্যকর বস্তু ছিল—সেইটাই এখন দাঁড়াইয়াছে একমাত্র কামনার ও সাধনার বিষয়!

চুম্বক লোহাকে টানে জানিতাম, কিন্তু হৃদয় যে হৃদয়কে তার চেয়েও বেশী

জোরে টানিয়া থাকে, সেটা প্রথম বুঝিলাম সেইদিন, যেদিন সহসা এক বর্ষার নিস্তব্ধ রাত্রে পীড়িতা মাতার শয্যাপার্শ্বে পুত্রকে ডাকিয়া দিতে গিয়া কে জানে—কেমন করিয়া তাহারই বাহুবেষ্টনে বাঁধা পড়িয়া আমার অনভিজ্ঞ ঠোঁট দুখানির উপরে আর দুখানি উষ্ণ রক্তাভ ওষ্ঠের সংস্পর্শ সূচিত হইয়া গেল !

উঃ—কি তার উত্তেজনা, কি তার আবেশ, কি তার নেশার জোর ! সেই দণ্ডে মরিয়া এক নবজীবন লাভ করিলাম।

(৩)

ঘটিল বটে কাণ্ডটা সকলের চোখের আড়ালে—অন্ততঃ আমরা দুজনেই তাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম, কিন্তু যাঁহার চোখে দুনিয়ার কিছুই বাদ পড়িবার জো নাই, তিনিত দেখিতে পাইলেনই, অপিচ যাঁহাকে সব চেয়ে বেশী ভয়—সেই মা যে কেমন করিয়া টের পাইলেন বলিতে পারি না।

কিন্তু টের যে নিশ্চই পাইয়াছেন তা বুঝিতে আমাদের কারও বাকী থাকিল না। পরদিন সকাল হইতেই তাঁহার ভিন্নমূর্ত্তি দেখিলাম। সে স্নেহ, দয়া, মায়া আর ছিল না—যাহাতে আমাদের দুজনে পরস্পরে আর গোপনে দেখা সাক্ষাৎ না ঘটে, সে বিষয়ে সর্ব্বদাই প্রখর দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। তবু যে কেন আমাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন না—তা তিনিই বলিতে পারেন। বোধ হয় সেটা কেবল ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া।

যাক্—সে জন্য কিন্তু আমাদের কিছুই ঠেকিয়া থাকিল না। যে ঠাকুরটি তখন আমাদের উপর কৃপাদৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁর দয়াতেই সুযোগ যেন আপনি আসিয়া দেখা দিতে লাগিল। আমরাও একনিষ্ঠ ভক্তের মত—তা অবহেলা করিতে পারিলাম না।

একদিন এমনি গোপনে মিলনের সময়ে সুপ্রকাশের মন, বড় চঞ্চল দেখিলাম। থাকিতে পারিলাম না—দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজ কি হয়েছে তোমার ? মুখ এমন শুকিয়ে গেছে কেন ? কি হয়েছে বল।"

সুপ্রকাশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জবাব দিল—"টাকা, ইন্দিরা টাকার ভাবনা ! শুনছি মহাজনেরা নালিশ করবে।"

টাকার কথাটায় হাসি পাইলেও সেই দীর্ঘনিশ্বাস টুকু উড়াইয়া দিতে পারিলাম না—সেটুকু অত্যন্ত ছোটখাট হইলেও আমার বুকের ভিতরে যেন বিষাক্ত তীরের মত বিঁধিতে লাগিল।

টাকা ?—টাকার জন্য এই ?—কত টাকা চাই ? তার জন্য এত ভাবনা কেন ? তখনি ছুটিয়া গিয়া আমার বাক্স খুলিয়া যা কিছু ছিল—ধূলো গুঁড়ো পর্য্যন্ত ঝাড়িয়া লইয়া গিয়া তার হাতে ধরিয়া দিলাম।

সে—সর্ব্বশুদ্ধ একান্নটি ! মায়ের যা পাইয়াছিলাম এবং এতদিন ধরিয়া খাইয়া না খাইয়া যা জমাইয়াছি—তা ওই !

সুপ্রকাশ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। আমাকে যেরকম নিবিড় আদরে বুকে ধরিয়া চুম্বন করিল তাতেই টের পাইলাম। টাকাগুলি যে তার সামান্য উপকারে লাগিল এই আনন্দেই আমার বুক ফুলিয়া উঠিল।

সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে বলিল—"তুমি জাননা, জানবেই বা কেমন করে'? এর একশো গুণ হলে তবে যদি অভাব মেটে ? যাহোক এ গুলোও একটা উপকারে আসবে।"

সেই দেখা—তিন দিন আর তার খোঁজ খবর রহিল না।

(৪)

কয়দিন ধরিয়া উপরি উপরি পাওনাদারেরা আসিয়া তাগাদা করিতেছে—শাসাইতেছে—নালিশের ভয় দেখাইতেছে—টের পাইতেছি। মা সকলকেই জবাব দিলেন—"এই মাসটা চুপ করে থাক, আস্‌ছে মাসে না চুকিয়ে দিই—যা ইচ্ছা হয় করো।"

রাত এগারোটা বাজিয়াছে শুইতে গিয়া ঘুম হয় নাই—ছটফট করিতেছি। হঠাৎ সুপ্রকাশের ঘরের দিকে মার চাপা গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম; সুপ্রকাশ বাড়ী আসিয়াছে। চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না—আঙুলের উপর ভর দিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলাম।

মা বলিতেছেন—"আমার দিব্যি করে বল যে আর জুয়োর খেলা খেলবি নি ?"

সুপ্রকাশ একটু ইতস্ততঃ করিল—"খেলবো না তো এত দেনা শুধবো কি করে ? পাঁচ হাজার ছাপিয়ে গেছে—যদি দুটো দিন আসে—

বাধা দিয়া মা রাগিয়া বলিলেন—"আসুক না আসুক আর ও দিক মাড়াবিনি—আমার মাথার দিব্যি—বল। দেনার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না—আমার কথা শুনে চলিস্ যদি—আসছে মাসের মধ্যে সব মিটিয়ে দেব।"

"যা বলবে শুনবো, দিব্যি করছি—আর জুয়ো কি কোন খেলার ধার দিয়েও যাব না। কি করে শুধবে এত দেনা !"

দুজনে এবার অত্যন্ত চুপি চুপি কথা—একটা বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না।

হঠাৎ সুপ্রকাশ একবার যেন চোখ খুব ডাগর ডাগর করিয়া মায়ের পানে চাহিল—তারপর মুখ নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল—একটাও জবাব করিল না।

শেষে মা বলিলেন—"এ ছাড়া আর উপায় নেই। আমাকে ঢের জ্বালিয়েছিস্—পুড়িয়েছিস্—এখন এই শেষ দশায় একটু স্বোয়াস্তিতে মরতে দে—তুইও সুখী হ। আমার দিব্যি—আর আমার অবাধ্য হস্‌নি। নইলে আমি গলায় দড়ি দেব।"

বুকের মাঝখানটা যেন কেমন করিয়া উঠিল,—কিসের এ কথা? কিছুই তো বুঝিলাম না। ভাল লাগিল না—ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম।

হঠাৎ ঘড়িতে দুইটা বাজিল শুনিলাম। ঘুমাইবার জন্য পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

"ইন্দিরা"

"কে ডাকিল? চমকাইয়া উঠিলাম।"

"ইন্দিরা চুপি চুপি উঠে এসে দোরটা খুলে দেও; বিশেষ কথা আছে—মা এখনো ঘুমোননি। সাবধানে উঠে এস।"

স্বর অত্যন্ত মৃদু, কিন্তু বুঝিলাম সে সুপ্রকাশের। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, উঠিতে পারিলাম না—কে যেন জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল,—একটা সাড়াও দিতে পারিলাম না—কথা যেন বন্ধ হইয়া গেল,—গলা একেবারে শুকাইয়া কাঠ; পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পদশব্দে বুঝিলাম—সুপ্রকাশ ফিরিয়া গেল।

ঘুমাইয়া ছিলাম, হঠাৎ একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখিলাম—যেন দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির গোড়ায় সুপ্রকাশ খুন হইয়া রক্তাপ্লুত দেহে পড়িয়া রহিয়াছে!

চেঁচাইয়া ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। সকাল হইয়া গিয়াছে—রোদ আসিয়া আমার মুখের উপর পড়িয়াছে, ঘামে বিছানা পর্য্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছে।

কেমন করিয়া কি হইল জানিনা। ঘুমিয়ে না জাগিয়া, বাঁচিয়া না মরিয়া ঠিক বুঝিতে পারিতেছিনা। আমার ভিতরটা যেন শুকাইয়া নিস্পন্দ—অসাড় কাঠ হইয়া গিয়াছে!

(৫)

বাড়ীর পাশেই একঘর নূতন প্রতিবেশী আসিয়া হঠাৎ পাড়া জাঁকাইয়া বসিয়া গিয়াছে। মস্ত ধনী—অনেক টাকার মানুষ, নগদ পাঁচহাজার টাকা, একরাশ গহনা এবং একটি সদাই নাক উঁচু গর্ব্বিতা ফেঁক্ ফেঁকে কটা চামড়া ষোড়শী সুন্দরী মেয়ের বদলে সুপ্রকাশকে কিনিয়া লইবে,—তারা!

কথাটা ইতিমধ্যেই কেমন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মায়ের আর আহ্লাদ ধরে না, ইঁদুর ধরিয়া মারিবার আগে বিড়াল যেমন অত্যন্ত মনের সুখে সেটাকে লইয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া নাড়াচাড়া করিতে থাকে, তিনিও তেমনি ঘুরিতেছেন, ফিরিতেছেন আর দিনের মধ্যে একশোবার আমার সামনে আসিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া হাসিতে হাসিতে পাঁচজনকে ছেলের বিয়ের কথা বলিয়া আমোদ করিতেছেন।

কোথা দিয়া দিনমান কাটিয়া গেছে জানিনা সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া রাস্তার ধারের বারান্দায় বসিয়া নির্জ্জনে ফুলিয়া ফুলিয়া বড় কান্না কাঁদিতেছি? সামনের বড়ীর দোতলার খোলা জানলার ভিতর দিয়া সুখের হাসির অবিরাম হিল্লোল বহিয়া আসিয়া আমার ভিতরটায় আগুন ছড়াইয়া দিতেছে। মা —সেখানে—নূতন বেহানের বাড়া নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছেন!

হঠাৎ সামনে সুপ্রকাশ!

আমার যেন ঘুমের চট্‌কা ভাঙ্গিল; তাড়াতাড়ি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছি—দুটি উদ্যত বাহুর বেষ্টনে—লোহার শিকলের চেয়েও জোরে—বাঁধা পড়িয়া গেলাম।

হায়রে নারীর প্রাণ!—একান্ত নির্ভরে বুকে মুখ লুকাইয়া কেবল ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

কখন যে কেমন করিয়া কান্না ভুলিয়া আবার কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম—নিজেই জানিন।

কন্নাভরা ভারি ভারি গলায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"বে করবে তুমি রোজি দত্তকে?"

দুহাতে আমার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া সুপ্রকাশ গম্ভীর প্রেমে আমার চোখের পানে খানিকক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল; তারপরে বড় আদরে একবার চুম্বন করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল—"এ জীবনে তোমাকে ছাড়া আর কাকেও কখনও ভালবাসবনা ইন্দু!"

"কিন্তু বে করবে তো রোজিকে ?"

তখনও মুখ আমার তার দুহাতের ভিতরে—চোখ চোখের উপর ?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হায় যদি বড় মানুষ হতুম ?"

তবু আমার কথার জবাব নাই ?

অভিমানে অন্ধ হইলাম, বুকের ভিতরটা ওলট-পালট করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল নখ দিয়া নিজেরই হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়িয়া উপড়াইয়া ফেলি। চোখে জল উপচাইয়া উঠিতেছিল সামলাইয়া লইলাম। যে বিষ কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভরিয়া উঠিতেছিল তাই একটুখানি ঢালিয়া ধাঁ করিয়া জবাব দিলাম—

"রোজিকে বে করলে বড় মানুষ হতে পারবে ?"

"করতেই হবে, উপায় নেই।"

আবার সেই দীর্ঘনিশ্বাস ? কিন্তু এবারে যেন তাতে বিছার কামড়ের জ্বালা—সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। ভারি একটা কড়া রকম জবাব ঠোঁটের ডগায় ঠেলিয়া উঠিয়াছিল—জানিনা কেমন করিয়া সামলাইয়া লইলাম। আস্তে আস্তে তার হাত দুখানি সরাইয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলাম—

"বেশ সুখী হও, এ বাড়ীতে আর আমার ছায়াও দেখতে পাবেনা।"

জবাব শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই মুখ নীচু করিয়া চলিয়া যাইতেছি— হঠাৎ পিছন দিক হইতে আবার সেই বাহুর বন্ধন !

"ধর্ম্ম জানেন তোমায় আমি অত ভালবাসি !"

খপ্ করিয়া ফিরিয়া তীক্ষ্নস্বরে চোক পাকাইয়া বলিলাম—"তাইতে বিয়ে করবে রোজিকে ? আর আমাকে এখানে থেকে বাঁদী হয়ে তোমাদের পদসেবা করতে হবে ?"

চোখদুটো আমার বোধ করি বড় বেশী জ্বলিয়া উঠিয়াছিল ! সুপ্রকাশ থতমত খাইয়া ছাড়িয়া দিল, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—

"তুমি ঠিক আমার অবস্থা বুঝতে পারছ না ইন্দু, ধর্ম্ম জানেন একমাত্র তোমাকেই আমি—"এবার একবারে তার বুকের ভিতরে ? মুখ খানা আমার মুখের উপর ? বড় আবেগে জোর করিয়া ধরিয়া আবার চুম্বন করিয়া বলিল—

"বোঝ ইন্দু, উপায় নেই, ধর্ম্ম জানেন—

বড় রাগ হইল, সবলে আপনাকে মুক্ত করিয়া বড় জোরে বলিলাম— "খবরদার বেইমান, আর ধর্ম্ম দেখিও না—তোমায় আমায় এই জন্মের শোধ ?"

সাপের মত গর্জ্জিয়া ফিরিলাম। আবার পিছনে দীর্ঘশ্বাস! অশ্রুভরা ভারি কণ্ঠস্বর?

"এমনি করেই আমার বুক ভেঙ্গে দিচ্ছ?" ততোধিক কঠোর স্বরে জবাব করিলাম—

"তুমি আমার আগে ভেঙ্গে দিয়েছ, শয়তান?"

"যেওনা—শোন শোন পায়ে পড়ি?"

সুপ্রকাশ অত্যন্ত বেগে আসিয়া আবার আমাকে বুকে ধরিবার চেষ্টা করিল। মাথার ভিতরে আগুন জ্বলিতেছিল, ধাঁ করিয়া সজোরে তার মুখে এক ঘা বসাইয়া দিলাম, তার পরেই প্রবল বেগে এক ধাক্কা!—ঠিক্‌রাইয়া গিয়া তিন হাত দূরে পড়িল।

"দূর হও বেইমান, মিথ্যাবাদী, খবরদার আর আমার ত্রিসীমানায় ঘেঁসনা, তোমাকে কুকুর বেরালের চেয়েও অধিক ঘৃণা করি!"

প্রবল উত্তেজনায় থর থর করিয়া চলিয়া গেলাম।

ক'দিন আর দুজনে দেখা-সাক্ষাৎ নাই। চেষ্টা করিয়াই আমি সাবধানে থাকি। দৈবাৎ দেখা হইয়া গেলে, দুজনেই মুখ ফিরাইয়া লই।

তিনদিন পরে সুপ্রকাশের বিবাহ?

সুপ্রকাশের মাসী আসিয়াছেন। মস্ত বড় মানুষ—ছেলেপুলে নাই। বয়স না গেলেও সন্তান হইবার আর সম্ভাবনাও নাই!

তিনি কিন্তু বিয়ে দেখিবার জন্য থাকিতে পারিবেন না—বিশেষ জরুরী কাজের জন্য পরশুই রেঙ্গুণে স্বামীর কাছে চলিয়া যাইবেন।

মাসীর ঐশ্বর্য্যের কথা দশদিকে রাষ্ট্র। তাঁর গলার হারার নেকলেশ ছড়ারই দাম—দশ হাজার টাকা! বোন-পোর বিয়ে যা যৌতুক দিলেন তা হাজার টাকার কম নয়।

কেন জানিনা—মাসীমা আমাকে বড়ই সু-নজরে দেখিয়াছেন! এত দয়া, এত স্নেহ, এমন ভালবাসা আমি বোধ করি জীবনে আর কারও কাছে পাই নাই।

সর্ব্বদাই আমাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখেন,—একসঙ্গে খাওয়া, বসা, ওঠা! কত প্রাণের কথা, কত সুখ দুঃখের কথা—কত হাসি তামাসা রঙ্গরসের কথা!

সবাই অবাক হইয়া ভাবে, কি গুণে দুদিনের ভিতরেই আমি তাঁহার এত আপন হইয়া উঠিলাম ?

কথায় কথায় হঠাৎ একদিন বলিয়া ফেলিলেন—"দিদি আমার কি চোখের মাথা খেয়েছেন—না ভীমরতি ধরেছে ?"

"কেন ?" অবাক হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

মাসী-মা উচ্ছ্বসিত স্নেহের আবেগে আমার দাড়ি ধরিয়া জবাব দিলেন—"এমন মেয়ে ঘরে থাকতে ছেলেটার বে দিতে গেল কিনা ওই দেমাকে, নাক-উঁচু মাংসপিণ্ডটার সঙ্গে ? ছি—ছি—ছি !"

বুঝিলাম তিনি রোজিকে ঘৃণা করেন। হঠাৎ আমার সারা প্রাণটুকু যেন স্বেচ্ছায় তাঁহার পায়ে বিকাইয়া গেল। কিন্তু আমার চোখ দুটো বুঝি আমার প্রাণের জ্বালার বিবরণটা তাঁর কাছে বলিয়া দিতে বাকি রাখিল না। তিনি একটু অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি সে কথাটা চাপা দিয়া কহিলেন—

"ইন্দু, যাবি তুই আমার সঙ্গে ? চিরকাল দুজনে মা বেটীর মত একসঙ্গে থাকবো, আর তো কেউ নেই আমার ?"

হাত বাড়াইয়া যেন স্বর্গ পাইলাম ?

"এক্ষুণি মাসীমা, এক্ষুণি, আমায় বাঁচাও, মার মত করে এখান থেকে আমায় নিয়ে চল।"

চোখের জল আর ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না—উপচাইয়া উঠিল। মাসীমা ছোট মেয়েটীর মত আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অসীম স্নেহে বারম্বার চুমো খাইলেন।

(৭)

পরশু বিয়ে—কালই আমরা চলিয়া যাইব।

বুঝিতে পারিলাম—মা, এ খবরটায় ভারি খুসী হইয়াছেন, এমন কি, আজ আবার ঠিক সেই আগেকার মতই যত্ন আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ?

কিন্তু মনের সমস্যা বুঝিয়া উঠা দায় ! সুপ্রকাশ আমার কে ? তার সঙ্গে আর আমার সম্পর্কই বা রহিল কিসের ? পরশুই সে রোজির স্বামী হইয়া—এ বাড়ীতে সুখের স্বর্গ গড়িয়া তুলিবে ? লজ্জায় আমার মুখ লুকাইবার মত একটু জায়গাও আর এখানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তবু—তবু—কি জানি কেন চির বিদায়ের প্রাক্কালে—এই বাড়ীটি ছাড়িয়া যাইবার কথা ভাবিয়া আমার বুকের শিরগুলা যেন ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল।

দূর হইতে আড়চোখে একবার সুপ্রকাশের মুখের পানে চাহিলাম—মুখখানা ঠিক মড়ার মত সাদা হইয়া গেছে ?

কাজের বাড়ী কে কার খোঁজ করে ? সন্ধ্যাবেলা মাসী-মা তাঁর পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখাশুনা সারিয়া আসিতে গিয়াছেন। একলাটি তাঁর ঘরে বসিয়া তোরঙ্গটা গুছাইতেছি ?

হঠাৎ মৃদু পদশব্দ ? কে যেন—চোরের মত অত্যন্ত সন্তর্পণে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। চমকাইয়া ফিরিয়া দেখি—সুপ্রকাশ ?

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া একটা বিষম উপেক্ষার ভাব টানিয়া আনিলাম। সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া সে তাড়াতাড়ি বলিল—"শোন ইন্দু, একটা বিশেষ দরকারী কথা !

জবাব করিলাম না—ফিরিয়াও চাহিলাম না।

"এ সময়ে অমন করে থেক না—শোন, তোমার পায়ে পড়ি—এ সুযোগ চলে গেলে আর পাব না।"

স্নেহ উচ্ছ্বসিত আগ্রহভরা কণ্ঠস্বর !

ভূরু কোঁচকাইয়া উপেক্ষার ভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিলাম—ফিরিলাম না।

"একটা কথা আমার রাখবে ?"

"কোন কথা নেই তোমার সঙ্গে আমার।"

"না শুনে জবাব করো না। মাসীমার সঙ্গে তোমার যাওয়া হবে না।"

ঈষৎ উপেক্ষার হাসি হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলাম। সুপ্রকাশ জোর করিয়া আমার মুখখানা দুইহাতে ধরিয়া ফিরাইবার চেষ্টা করিল।

"সাবধান—গায়ে হাত দিওনা বলছি—এখুনি চেঁচিয়ে গোল বাধাব।"

কিন্তু তা শুনে কে ? জোর করিয়া আমাকে কোলের ভিতরে টানিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি বলিল—

"আগে শোন—তারপর লোক ডাকতে ইচ্ছা হয় ডেকো !"

জানিনা—যাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা যায়, তার স্পর্শে বুঝি কি যাদু আছে ! নড়িতে পারিলাম না—ইচ্ছাও হইল না ! সুপ্রকাশ বলিতে লাগিল—

"শোন, রাগ কর না, সত্যি কি আমি এ অমূল্য কাঞ্চন ফেলে সেই তুচ্ছ কাচখানাকে বে করতে পারি ! কি করবো—প্রকাশ্যে না বলতে পারিনি। তাই কদিন ধরে ঠাউরে উপায় স্থির করেছি। চল—আজই শেষ রাত্রে দু'জনে একসঙ্গে পালিয়ে যাব।"

ফোঁস্ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলাম—"বেরিয়ে যাব, কলঙ্কিনী হয়ে?" কথা বাধিয়া গেল—চোখে জল উথলিয়া উঠিল।"

"ছিঃ—এত অবিশ্বাস আমাকে, আমি কি এত নীচ?"

"তবে—তবে?"

"পালিয়ে গিয়ে দু'জনে বে' ক'রে অন্য দেশে চলে যাব, আমি টাকার যোগাড় করেছি—তুমি প্রস্তুত থাক, কাল শেষ রাত্রেই!"

কি শুনিলাম? আমি কোন্ স্বর্গে? প্রিয়তমের বুকে মুখ রাখিয়া বড় কান্না কাঁদিলাম! কিন্তু তা দুঃখে নয়—সে অশ্রুর প্রতি বিন্দুটিতে অগাধ অফুরন্ত সুখের আশে!

সুপ্রকাশ যেমন চুপিসারে আসিয়াছিল—তেমনি চুপিসারে বাহির হইয়া গিয়াছিল। ভাল করিয়া সামলাইতে পারি নাই। মাসীমা আসিয়া হঠাৎ আমার মুখের পানে চাহিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। হাসিয়া কহিলেন—"কি হয়েছে রে ছুড়ী, গাল দুটো যে গোলাপফুল?

"তোমার সঙ্গে যাব যে মাসীমা।" বলিয়াই ঝাঁপাইয়া বুকে পড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরিলাম।

তখন জানিতে পারিলাম না—কি নির্ঘাৎ সত্যটা মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

(৮)

মাসীমার তোরঙ্গের ভিতরে দুইটা ছোট পিস্তল ছিল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—

"একি মাসী-মা, লড়াইয়ে যাবে নাকি?"

"যে দেশে আমাদের থাকতে হয়, তাতে ও সব সর্ব্বদা সঙ্গে রাখা দরকার। বিশেষ—পথে ঘাটে একলা মেয়ে মানুষ, গয়না-গাঁটি নিয়ে যাতায়াত।"

"ছুড়তে জান?"

"নইলে কি আর তোর মেশো বশ হয়ে থাকে! ওর—একটা তোর, আয় তোকে ছুড়তে শিখিয়ে দিই।"

হঠাৎ হাত কাঁপিল, বুকের ভিতরটায় যেন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—গ্রাহ্য করিলাম না।

অনেকক্ষণ ধরিয়া তালিম দিয়া মাসীমা আমাকে সাকরেদ করিয়া তুলিলেন। সারাদিনটা ধরিয়া যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সুপ্রকাশের

বিবাহের সমস্ত আয়োজন—আমোদ আহ্লাদ আমার চোখের উপর যেন থিয়েটারের অভিনেতার মিথ্যা সাজ পরিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে! মনে মনে হাসিতেছি, আর ভারি একটা গর্ব্ব বোধ করিতেছি!

পিস্তল ছুড়িয়া মাসী বোনঝি বাড়ী শুদ্ধ মেয়ে পুরুষকে তাক লাগাইয়া দিলাম। সেটা ভারি একটা উৎসবের আনন্দের উপকরণ হইয়া খেলার লাটিমের মত হাতে হাতেই রহিল।

সুপ্রকাশের দিকে চোক পড়িতেই বুঝিলাম তার উৎসাহ যেন বাড়িয়া গেছে, ওই খেলার সামগ্রীটি যত্নে সঙ্গে লইবার ইঙ্গিত!

সঙ্গে লইয়াই ঘরে আসিলাম। টোটা পূরিয়া পাশটিতে রাখিয়া শুইয়া পড়িলাম। উৎকণ্ঠায় ঘুম আসিল না কতক্ষণে ভোর চারটে বাজিবে?

হঠাৎ দুপুর রাত্রে মাসীমার কাতর চীৎকার শুনিলাম

"চোর চোর, ডাকাত, আমার নেকলেশ"

ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ অন্ধকার! সবাই অকাতরে ঘুমাইতেছে!

আবার মাসীমার চীৎকার

"চোর চোর, ধর ধর, সর্ব্বনাশ করলে!"

সর্ব্বাঙ্গ ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি পিস্তলটা তুলিয়া লইয়া বারাণ্ডায় আসিলাম।

বারাণ্ডার শেষেই সিঁড়ি। মনে হইল সেই অন্ধকারে সেইখানে যেন মনুষ্য মূর্ত্তি—তাড়াতাড়ি নামিয়া যাইতেছে!

জ্ঞান ছিলনা কি হইতে কি হইল জানিনা। কিন্তু হঠাৎ "গুড়ুম্" করিয়া একটা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া পিস্তলটা পড়িয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির নীচে ধুপ্ করিয়া একটা শব্দ!

অজ্ঞান হইয়াই বিদ্যুৎগতিতে নামিয়া গেলাম।

সিড়ির গোড়ায় রক্তাক্ত হইয়া পড়িয়া সে ছটফট করিতেছিল—আমি কাছে দাঁড়াইতেই স্থির হইল।

কি একটা চক্‌চক্ করিতেছিল তার হাতে, উপুড় হইয়া তুলিয়া লইয়া দেখি —মাসীমার হীরের নেকলেশ্!

আর যা দেখিলাম—থাক সে কথা? নেকলেশটা লুকাইয়া ফেলিলাম।

(৯)

আজ আমার সুপ্রকাশ খুন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে!

নেকলেশটা চোর লইয়া যাইতে পারে নাই, তাড়াতাড়িতে মাসীর ঘরের মেঝেতেই ফেলিয়া গিয়াছে। চোরকে তাড়া করিয়া ধরিতে গিয়াই অন্ধকারে হঠাৎ আমার গুলি লাগিয়া সুপ্রকাশ প্রাণ দিয়াছে!

সকলেরই ওই ধারণা। কেউ কিছু জানিল না কেউ কিছু বুঝিল না—কেউ আমাকে দোষী করিতে পারিল না। সকলেই "হায় হায়" করিতে করিতে একবাক্যে বলিল "এ দোষ কারও না, হতভাগা ছোঁড়াটার কপালের দোষ!"

মা পুত্রশোকে পাগল হইয়া কাঁদিতেছেন বটে, কিন্তু যে শোকের হাত হইতে আমি আজ তাঁকে বাঁচাইয়া দিলাম, সে কথা ঘুণাক্ষরে কেউ জানিতে পারিলে, মনোকষ্টে আত্মহত্যা করিয়া তাঁকে সে লজ্জার জ্বালা, শোকের জ্বালার হাত এড়াইতে হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু বুদ্ধিমতী মাসীমার বুঝি টের পাইতে বাকী ছিলনা। জাহাজে চড়িয়া অকুল পাথারে ভাসিয়া যাইবার সময়ে একদিন আমাকে আদর করিয়া বুকে লইয়া চুমো খাইয়া কহিলেন—

"সব বুঝেছি ইন্দু—ধন্য বটে তোমার ভালবাসা! কিন্তু কি করবি হতভাগী,—এ সব তোদের দুজনকারই কপালের দোষ।"

একাল সেকাল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২৯)

দুধভরা ঘড়ার মধ্যে এক ফোটা চনা পড়িয়া তাহার দুধগুলিকে যেমন একেবারেই অসার অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়, বিমলার এত চেষ্টা, প্রাণপাত যত্নও একটুকু অপরাধে ঠিক সেইরূপ হইয়া পড়িল। যাহার প্রমাণ বিচ্ছেদ-বিরামহীন চিন্তার মধ্যে বিরহকাতরা বিমলার কেবলই মনে হইতেছিল, সে এতখানি পারিতে চেষ্টা করিয়াও এতটুকু করিতে পারিল না কেন? পৃথিবী জোড়া দুঃখকে ঘাড় পাতিয়া লইবার জন্য তাহার এমনই একটা সুখদুঃখ বা

লজ্জার কথা মনে আসিল কেন? লজ্জাহীনা বলিয়া কেহ বিদ্রূপ করিলে ত গায়ে ফোস্কা পড়িত না, একথা এভাবে সেভাবে যতই তাহার মনের উপর দাগ কাটিতেছিল, ততই অভাব ও বুদ্ধিহীনতার প্রমাণগুলি যেন নাকাদড়ি দিয়া ঘানিগাছে ঘুড়াইয়া শ্রান্ত অবশ করিয়া আনিতেছিল, না ছিল তাহার ভবিষ্যৎ আশা, না ছিল বর্ত্তমানের সুখসুবিধা, অতীত যেন প্রত্যক্ষ হইয়া অট্ট হাস্যে হাহাকার পাকাইয়া তুলিতেছিল, এত বড় বাড়ীটার দালানকোটা সজ্জাসমারোহ সবাই মিলিয়া নাই নাই শব্দে তাহার কাণে তালি লাগাইয়া দিতেছে। চিন্তার বিচ্ছেদও নাই, বিরামও নাই, যেন একটানা নদীস্রোত, তৃণের মত সে তাহারই টানে ভাসিয়া চলিয়াছে, কোথায় শেষ কে বলিয়া দিবে, ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে এমন লোক নাই, ডাকিলে সাড়া দিবে এমন সহায় যে দূরে নিকটে কোথায়ও দেখিতে পায় না, প্রবল প্রলয়ের কল্লোল ক্ষান্তবর্ষণ মেঘের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জনে যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল। দিনের আলোটাকে ঢাকা দিয়া বাড়ীর চারি দিকে যেন একটা ভীষণ বিভীষিকা অন্ধকারের ছায়া লইয়া তাহার পথ রোধ করিয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। কোন দিকে দৃষ্টি করিবার শক্তি নাই, গভীর আতঙ্ক, দুর্ব্বার অগ্নিপরীক্ষা! স্বামীর সেই কথা, "এত বড় জিনিষটার জন্য এতটুকু ত্যাগ করিতে পারে না।" সত্যইত স্বামীর সুখের জন্য অনায়াসেই অতটুকু লোভ তাহাকে ত্যাগ করা উচিত ছিল। ইহাই যদি সে না পারিল ত, তাহা দ্বারা কোন মহৎ কাজের যে আশাই করা চলে না, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও সে যদি স্বামীকে সুখী করিতে পারিত তবেই তাহার প্রকৃত কার্য্য করা হইত, কোন অভাব থাকিত না, পৃথিবীর সেরা রত্নের অধিকারী হইয়া পরের নিন্দা, নিজের অতটুকু গ্লানির মধ্যেও সে জীবনমন সুখের মধ্যে শান্তির হাতে অর্পণ করিয়া আরামের শ্বাস ত্যাগ করিত। তবে কেন এমন হইল, কোন্ দুষ্ট গ্রহের সংস্পর্শে সে এমন কাজ করিল। গলার সাচ্চা রত্নহার ছিড়িয়া দূর করিয়া ফেলিয়া ঝুটা মুক্তার মালা টানিয়া লইল। সত্য সত্যই যে তাহার এখন তিষ্ঠান দায় হইয়াছে। ঘরে বাহিরে কার্য্যে কোলাহলে নিদ্রায় জাগরণে এই একই চিন্তা নানা ভাবে নানা প্রকারে ঘুড়িয়া ফিরিয়া মর্ম্মান্তিক পীড়ায় পীড়িত করিয়া তুলিতেছে। শান্তি যখন ঘরের দোড়ে আসিয়া পুনঃ পুনঃ ডাকাডাকি করিল, তখন তাহার পা সরিল না কেন? এক পা বাড়াইলেই যে সে তাহাকে টানিয়া বুকে লইতে পারিত। চেষ্টা করিতেও সে কিছু ত্রুটি করে নাই, তবু কেমন দুরন্ত দুস্ত্যজ লজ্জা স্বভাবের উপর

জোড় করিয়া চাপিয়া বসিল, বিমলার সর্ব্বাঙ্গ জড়ীভূত করিয়া দিল, হাতপা আকৃড়াইয়া ধরিল। বিমলা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িয়া নিজের মনেই বলিয়া উঠিল—"হায়, এ আমি কি কর্ত্তে চলেছি, প্রাণ দিয়েও যাঁকে চাই, যাঁর বাক্য পালন করাই আর্য্যরমণীর এক মাত্র ধর্ম্ম, নারীজীবনের চরম সার্থক্য, আমি তাঁকেই অবহেলা করলাম, কাচের বিনিময়ে কাঞ্চন পেয়েও কাচকেই আকৃড়ে ধরে রাখ্‌লাম, আমার যে ইহ কাল পরকাল দুইই খোয়াতে হল।"

ধীরে ধীরে নৈশনিস্তব্ধতা মথিত করিয়া একটা সূক্ষ্ম শ্বাস বায়ুতে মিলাইয়া গেল, বিমলা শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, একপা একপা করিয়া প্রলম্বাগর-কৃশ শরীর বহিয়া লইয়া দোর খুলিয়া ছাতে আসিয়া দাঁড়াইল, স্তব্ধ রজনার গাঢ় অন্ধকারে জনপ্রাণীর সারা ছিল না, পাশের বাগানের ঝীঝীপোকাগুলি পরস্পর জড়াইয়া লুটাপুটি করিতেছে, তাহাদেরই মৃদু শব্দে একবার সেই অমারজনীর তমোমণ্ডিত পৃথিবীর পানে তাকাইয়া বিমলা কাঁপিয়া উঠিল। সুপ্ত রজনীর দীর্ঘতা প্রমাণ করিয়া নীচের তলার ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। সহসা তাহার কদিন আগেকার এক জ্যোস্না প্রফুল্ল রজনীর কথা মনে পড়িয়া গেল। সেদিন নির্ম্মল ছাতে যাইবার জন্যে তাহাকে কত অনুরোধ করিয়াছিল, একবার একটি দিনের জন্যে এ অনুরোধ রক্ষার্থ কত মিনতি জানাইয়াছিল, কিন্তু তাহার কঠোর মনের গতিত সে কোন প্রকারেই পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই।

বিমলা কাঁদিয়া ফেলিল, "আমিত তোমার জন্যে কিছুই কর্ত্তে পারিনি।" বলিতে বলিতে নগ্ন আকাশের তলে নিঃসহায় দেহ লইয়া ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল। আকাশের গায়ে পেচক ডাকিয়া গেল, বিমলার যেন সংজ্ঞা ছিল না। পতিপরিত্যক্তা বিমলার প্রাণ এই অকর্ম্মণ্য দেহটাকে যেন ভার বলিয়া ঠেলিয়া ফেলিতে পারিলে উদ্ধার হইতে পারে। অন্ধকারগুলি তাহার চোখের তারা লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। অবসানপ্রায় রজনীর সেই সুখসেব্য শীতল বায়ু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহন করিয়া আনিতেছিল। এমনই কত রজনীতেও সে জানালা খুলিয়া রাখিতে দেয় নাই, স্বামী কত কষ্ট পাইয়াছেন, কত অনুযোগ করিয়াছেন, তবু তাহার মন এ পথে অগ্রসর হয় নাই, সমস্ত রাত্রি নিরবছিন্ন সে পাখার বাতাস করিয়াছে, তাহাতে কিন্তু তাহার আলস্যও ছিল না, শ্রান্তিও ছিল না, হায় সে যে তাহার জন্যেই জল ঢালা হইয়াছে, ফলত কিছুই হয় নাই, স্বামীর অপ্রসন্ন মুখ ত সে প্রসন্ন দেখিতে পায় নাই, সেই অপ্রসন্নতার পরিবর্ত্তে ও কি তাহার এতটুকু করা উচিত ছিল না, সহসা বিমলা হাত বাড়াইল, কিন্তু কোথাও কিছু ঠেকিল না, শূন্য শূন্য, এদিকে ওদিকে নীচে উপরে কিছুই নাই, সুধু অভাব সদলবলে আত্ম প্রকাশ করিতেছে। "তুমি এখন কত দূরে, প্রাণ দিয়েও কি একটিবার তোমায় দেখ্‌তে পাই না, আমিত আর তোমার অবাধ্য হব না, এস আর একবার তোমার এ আশ্রিতাকে ক্ষমা কর।" বলিতে বলিতে বিমলার মাথা মাটিতে লোটাইয়া পড়িল।

শেষ রাত্রির তারা বিবাহবাসরের তেলহীন প্রদীপের ন্যায় মিটি মিটি

জ্বলিতেছিল, ফোটা ফুলের গন্ধভারে শিশিরসিক্ত বাতাসও কেমন ঢিমা তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে। বিমলার যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে, তাহার হৃদয়দীপ তেলের অভাবে আর রশ্মি ছড়াইতে পারে না, অস্ফুটস্বরে "উঃ" করিয়া সে উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, দিনের বলটুকুও যেন এই একটা রাত্রিতে শেষ হইয়া পড়িয়াছে। "ওগো অপরাধ আমি অনেক করেছি, তুমিত ক্ষমা কর্ত্তেও পার, অনেক আঘাত ত সয়েছ, আর একবারের জন্যে কি ফিরে আস্‌তে পার না।" কথাগুলি বাতাসে মিলাইয়া গেল, কেহ শুনিল না, কাহারও কাণে গেল না, এমনই অবস্থায় কতক্ষণ কাটিয়া গেল, সে অনুভূতি বিমলার ছিল না, কাহার কোমল স্পর্শে সে শিহরিয়া উঠিল, রোমাঞ্চিত শরীর হইতে ঘাম বাহির হইতে লাগিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে রমা বলিল—"ঠাকুরঝী, তোমার এই দশা—"রমার কথাও মাঝখানে আটকাইয়া গেল, প্রাণপ্রতিমা বিমলার এই যাতনা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার হৃদয় ফাটিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। খানিকক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিলে রমা আবার বলিল—"এমন করেই নাকি শরীর নষ্ট কর্ত্তে হয় বোন?"

বিমলা চাহিয়া দেখিল, দিনের আলো দূরে বৃক্ষপত্রের আগায় সোণালী রঙ মাখাইয়া দিয়াছে, ধীরে ধীরে সে রমার কাঁধে মাথা রাখিল—রমা আবার বলিল—"যে জলের আশায় সে শুষ্ককণ্ঠে ফিরে আসবে, এম্‌নি রোদ লাগিয়ে তাকেই যদি তুমি শুকিয়ে ফেল, তবে যে আর কোন আশাই থাক্‌বে না।"

বিমলা কুণ্ঠিত কণ্ঠেই উত্তর করিল—"আশা আমার আর নেই বৌদি—"

রমা বাধা দিল, বলিল—"ছিঃ অমন কথা যেন মুখেও এন না।"

"সাধ করেই কি মুখে আনি, আমি যে ঘরের শালগ্রাম শীলা পা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছি।"

রমা দুই হাতে মুখ চাপিয়া ধরিল,—"পাগল!" বলিয়া সহসা থামিয়া পড়িল। কমলা হাত সরাইয়া দিয়া বলিল—"পূজা সে আমার সাধ করেই নিতে এসেছিল, তাতে কিন্তু তার ভালমন্দ বিচারও ছিল না, এককণা ক্ষুদ পেলেও যে সে সন্তুষ্ট হয়ে আমার ঘর জুড়েই থাকৃত, কিন্তু আমিত তাতেও কৃপণতা করেছি।"

"আছে যার, তার দাতা হতেই কতক্ষণ।" বলিয়া রমা সান্ত্বনা করিতে যাইতেছিল। বিমলা কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—"দান যে গ্রহণ কর্‌বে, তাকে যে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি, মুষ্টিভিক্ষাও দেইনি, তবে কোন্ আশায় সে আবার আস্‌বে বৌদি।"

(ক্রমশঃ)

গল্পলহরী

ষষ্ঠ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ { ২য় সংখ্যা।

সংসারের পথে

(লেখক—শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ)

সামান্য গৃহস্থঘরের পুত্র হইয়াও নারায়ণচন্দ্র গ্রহদোষে 'বাবু' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল এ পক্ষে শুধু যে নারায়ণচন্দ্রের একলা হাত ছিল তাহা নহে—সে যখন স্কুলে পড়িত তখন তাহার বাপ মা, ভাল কাপড় জামা পরাইয়া ওপাড়ার উকীল তিনকড়ি ঘোষের পুত্র দেবীদাসের সহিত সমান চালে চলাইয়া দিত। বাড়ীর অন্যান্য পুত্রগণের জল খাবারের জন্য মুড়ি গুড়ের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু নারায়ণের দেবীদাসের মত দুই বেলায় দুই আনার কচুরী সন্দেস খাইবার আদেশ ছিল। সুবোধ নারায়ণচন্দ্র এক আনার খাবার খাইয়া বাকী এক আনা সিগারেটের জন্য রাখিয়া দিত। এ সম্বন্ধে বাড়ীর কাহারও কাছে তাহার কোনদিনের জন্য জবাবদিহি করিতে হয় নাই।

বাড়ীর সকলেরই ভরসা ছিল যে নারায়ণচন্দ্র এক কালে না এক কালে এ পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করিবেই—কারণ এ পরিবারের কেহই কোনদিন এন্ট্রান্স অবধি অতিক্রম করে নাই। কিন্তু নারায়ণ তাহা সতের বৎসর বয়সে পার হইয়া গিয়াছিল এবং নারায়ণও মনে মনে এ ভরসাটা রাখিত, যে সে উকীল হাকিম হইতে না পারে মোক্তার অভাবে অন্ততঃ একজন আদালতের একটা কেরাণীও হইয়া উঠিবে, তাহাতে তাহাকে যতই বাহির লাগিয়া পড়া মুখস্থ করিতে হয় তা' সে করিবে।

কিন্তু তাহার শুভ বিবাহের অল্পদিন পরেই পিতা সংসারের এবং তাহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে চারিটি ভ্রাতা, একটি ভগ্নী ও কিছু ঋণ রাখিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।

নারায়ণ খতাইয়া দেখিল পিতা সম্পত্তি যাহা দিয়া গেলেন তাহা অপেক্ষা ঋণ অনেক বেশী। ভগ্নীটিকেও যৎকিঞ্চিত দিয়া বিদায় করিতে হইবে। সেকেণ্ডইয়ার ক্লাসে উঠিয়াই পড়া ছাড়িয়া চাকরীর চেষ্টা করিতে হইল। উকীল মোক্তার হওয়া আর ঘটিয়া উঠিল না। বন্ধু-বান্ধবেরা পরামর্শ দিল ওহে আর একটা বৎসর পড়িয়া ফাষ্ট আর্টটা পাশ করো, নারাণ দেখিল ফাষ্ট আর্ট পাশ করাও যা, এণ্ট্রান্স পাশ করাও তা। বি এ পড়া পর্য্যন্ত যখন সবুর সইবে না এবং সে খরচাও নাই তখন যত শীঘ্র চাকরীতে ঢুকিয়া দেনার এবং ভগ্নীটার একটা বন্দোবস্ত করিতে পারা যায়, ততই ভাল।

কালেজ ছাড়িয়া বাটী আসিয়া খোরাকী ধান্য হইতেই কিছু বেচিয়া পাথেয় সংগ্রহ করিয়া নারাণ চাকরীর চেষ্টায় দূরান্তরে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা কহিলেন, এবার চাষ বাসের কি হইবে?

নারাণ কহিল ভাগে দিও। আর আমারও কি এমন কিছু হইবে না! তাহা হইতেই সংসার খরচ চালাইব।

মা ভাবিলেন, তাও ত বটে, এত লেখাপড়া শিখিয়াছে, পুত্র কি কিছুই রোজগার করিতে পারিবে না? বিনা লেখাপড়ায় যখন গ্রামের মহেন্দ্র অধিকারী লক্ষপতি হইয়াছেন, তখন নারায়ণ লেখাপড়া শিখিয়া তার সিকির সিকিও হইতে পারিবে না কেন?

ঠাকুর দেবতাদের পুষ্প-অর্ঘ্য ইত্যাদি চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া দিয়া সত্যনারায়ণের পূজা দিয়া মা নারায়ণকে উপায়ের স্থলে পাঠাইয়া দিলেন।

নারায়ণেরও মনে আশা আছে—একটা কিছু করিবেই। দূর হইতে চাকরীর ব্যাপার যতটা সুলভ বলিয়া মনে হইয়াছিল কাছে গিয়া দেখিল এযে সম্পূর্ণ বিপরীত। দেশের পরিচিত লোকদের কাছে দুই এক দিন থাকিয়া সন্ধান সুলভ করিয়া কোথাও একটা কিনারা করিতে পারিল না। এদিকে যে কয়েকটি টাকা বাড়ী হইতে লইয়া আসিয়াছিল তাহাও জলের মত খরচ হইয়া যাইতেছে। অনেক চেষ্টার পর একজন খবর দিল যে রেলোয়ে একটা কাজ খালি আছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে স্বয়ং দরখাস্ত করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। নারায়ণচন্দ্র দরখাস্ত হাতে করিয়া দাঁড়াইল, ভাগ্যলক্ষ্মী একটু প্রসন্ন হইলেন। কিন্তু মাহিনা এত কম হইল যে নারায়ণ বন্ধুদের কাছেও

বলিতে লজ্জিত হইল তাহার মাহিনা কত? বাড়ীতে পত্র লিখিল ঈশ্বরেচ্ছায় ১৫৲ টাকা মাহিনার একটা চাকরী হইয়াছে, ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে।

মাতাঠাকুরাণী দেবতাদের কাছে পূজা দিলেন এবং প্রতিবেশিনীদিগকেও আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন নারায়ণের ১৫৲ টাকা মাহিনার চাকরী হইয়াছে। পাড়াগায়ে মাসে পনের টাকার হিসাব নিতান্ত নিন্দারই বা কি?

প্রতিবাসিনীরা ঠিক দিয়া কহিল, বছরে তা হলে দুশোটাকা হচ্চে, বাজার খরচ ত চলে যাবে।

নারাণের মা কহিল, হাঁ মা তাই আশীর্ব্বাদ করো, আমার হাঁসের খরচ কর্ত্তাও ত বেশী কিছু রেখে যেতে পারেন নি।

পূজার সময় নারাণের কাছে এক পত্র আসিল। পত্রে মাতা লিখিয়াছেন, বাড়ীর সকলকার কাপড়, জামা, কানাই বলাইয়ের এক জোড়া জুতা, জমির খাজনা এবং বউমার জন্য সেমিজ কাপড় এবং সংসার খরচের জন্য কিছু ঘৃত আটা ও ডাইল আনিতে পারিলে ভাল হয়।

পত্র পড়িয়া নারাণের চক্ষু স্থির হইয়া গেল। বাসা ভাড়া দিয়া বিছানা বালিশ করিতে ও খাইতে দাইতে প্রথম মাসের সমুদয় মাহিনা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। উপরন্তু বন্ধুদের কাছে যে ধার আছে তাহারও এক পয়সা শোধ দিতে পারে নাই।

নারায়ণ কোন পত্র লিখিল না। কিন্তু পূজার সময় সাধ্যানুসারে বাড়ীর সকলকার জন্য কিছু কিছু লইয়া যাইবার মনস্থ করিল। গাড়ী ভাড়ার টাকাটা মাত্র রাখিয়া দুই মাসের সমস্ত মাহিনা, ছেলেদের জামা কাপড় খরিদ করিয়া বাড়ী উপস্থিত হইল।

মার জামা কাপড়ের দিকে তত লক্ষ্য হইতেছিল না, যত লক্ষ্য হইতেছিল তাঁহার পকেটের দিকে।

নারায়ণ পকেট হইতে দুইটি মাত্র টাকা বাহির করিয়া মায়ের হাতে দিল।

মা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, কহিলেন ১৫৲ টাকা করে মাইনে পাচ্ছিস আমি বলিবা খুব অভাবই মেটাবি। বউ নিয়ে আসাতে পাল্কী ভাড়াই পাঁচ টাকা লাগিয়া গেল। জমিদারের খাজনাই বা মেটাব কোথা হইতে, তখন নারায়ণচন্দ্র একে একে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া গেল, মেসের

খরচ, বাসার খরচ সমস্তই বলিল, কিন্তু মায়ের সেটা মনঃপুত হইল না, মনে করিলেন একটা লোকের খোরাকী কখনো মাসে ১০।১২১ টাকা হইতে পারে? আর কিছু নয়, ভাইদিগকে ফাঁকি দিয়া পুঁজি করিতেছে।

কানাইকে ডাকিয়া মা কহিলেন বাবা লেখাপড়া বন্ধো করো, চাকরীতে পেট ভরবে না, তা বেশ বুঝেছি, নারাণ যখন বাড়ী আসিয়া তুইটি টাকা মাত্র দিল তখন চাকরী অপেক্ষা চাষই ভাল বোধ হচ্চে।

কানাই কহিল আমায় এক জোড়া বলদ কিনে দিলেই হবে। আমিত আর দাদার মত বাবু হইনি।

নারায়ণ বসিয়া বসিয়া সমস্ত কথাই শুনিল। সে যে স্বহস্তে কৃষিকর্ম্ম করিতে পারিবে না তাহা ভালরূপই জানিত। কাজেই তাহাকে নিজের এবং নিজের স্ত্রীর কথাটা বেশী করিয়াই চিন্তা করিতে হইল। ভাই ভগ্নীগুলির উপরেও তাহার পূর্ব্বের মত স্নেহ ছিল না। তাহারাই যে তাহার জীবনটাকে মরু করিয়া দিতে বসিয়াছে, এ ধারণাটা তাহার দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাহার উপর ভগ্নীটিও দিন দিন বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠিতেছিল।

নারায়ণ ঠিক করিল কপনই নহে, আমি একা এ ভার বহিতে বাধ্য নহি। ঋণভার, গৃহস্থালীরভার, কন্যাভার এ সমস্ত ভার লইয়া সুখে সংসার করা অপেক্ষা দুঃখের সহিত নিজের পেটটা চালানোই শ্রেয় মনে করিল। তাহার উপর রাত্রিকালে বালিকা স্ত্রীর অনুযোগটাও নিতান্ত ব্যর্থ হইল না। সে বলিল, মা ত এক এক করিয়া আমার সব গহনাই লইতেছেন, বাঁধা দিতেছে। আমাকে যদি তুমি না নিয়ে যাও আমার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। এখানে আমি গতর মাটি করিয়া খাটিয়া মরিতে পারিব না।

নারায়ণ আশ্বাস দিয়া কহিল, কিছু দিন সবুর করিয়া থাকো, তারপর তোমায় লইয়া যাইব।

ইতিমধ্যে আপিস হইতে পত্র আসিল যদি তুমি পত্র পাঠ না আইস, তোমার পোষ্টে অন্যলোক বাহাল করা হইবে।

নারায়ণ তাড়াতাড়ি নাকে মুখে চারিটি গুঁজিয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল। যাইবার সময় মা কহিলেন সংসারের খরচ চালাইতে পারিবে ত?

নারায়ণ কহিল চেষ্টা দেখিব—না পারি উপায় নাই।

মা আচ্ছা বলিয়া পুত্রকে বিদায় দিয়া অন্যপুত্রদ্বয়কে কাছে ডাকিলেন। কানাই ও বলাই ছিল বড় তাহাদিগকে সংসারের সমস্ত [illegible] দিয়া

কহিলেন, যদি বাঁচিতে চাও তাহা হইলে চাকরী তোমাদিগকে করিতে দিব না। চাষ করিয়াই খাইতে হইবে।

বলাই কিছু সৌখীন প্রকৃতির ছিল এবং তাহার চেহারাখানিও নেহাৎ মন্দ ছিল না। সে কহিল, সে কি হয় মা, লোকে বলিবে কি? আমরা হাল ছাড়া হয়ে আছি—আবার হাল ধরিব?

মা দৃঢ়ভাবে কহিলেন সংসারে টিকিয়া থাকিতে হইলে হাল ধরিয়াই থাকিতে হইবে, ছাড়িলে উপায় নাই। হাকিম হুকিম হবার মত পড়াইবার সে সাধ্বী যখন নাই,অথচ ২০।২৫৲টাকার চাকরীতে যখন পেটের ভাত জোটে না.তখন চাষ করিয়াই খাইতে হইবে। তাহার উপর দেনা আছে।

কানাই উৎসাহের সহিত কহিল—আমরা চাষ করিয়াই দেনা শুধিব।

বলাই কহিল চাষ করিয়া দেনা শোধ যায়?

মা কহিলেন—যদি আমার কথা শুনে চলো, তবে সব শুধিতে পারিবে। কথায়ই আছে বাণিজ্যের ধন, ক্ষেতের কোণ। তোমার এক বিঘা জমিতে আখ হইলেই দুশো টাকা পাইবে।

তখন এক জোড়া বলদ কিনিবার পরামর্শ চলিতে লাগিল। মা কহিলেন, বড়'বউএর গায়ে যে গহনা আছে সেই গহনা বন্ধক রাখিয়া আপাততঃ গরু কেনা যাউক। তারপর বড় গহনা খালাস করিয়া লইলেই হইবে।

বড় বৌ কিন্তু কিছুতে গহনা দিতে চাহে না। তখন মা জোর করিয়া পুত্র-বধূর বাক্স হইতে গহনা বাহির করিয়া লইলেন, কহিলেন, তুমিত আমার একটি নও, পাঁচটাকে মানুষ করিতে হইবে।

বড় বৌ গহনার শোকে দুইদিন প্রায় কিছুই খাইল না, তারপর তৃতীয় দিনে স্বামীকে এমন ভাবে এক পত্র দিল যে পত্রপাঠ নারায়ণ চন্দ্রের সমস্ত হৃদয় যন্ত্রটা অচল হইবার উপক্রম হইল।

নারায়ণের সম্পর্কে এক সম্বন্ধী শনিবারে শনিবারে বাড়ী যায়। তাহার কাছে গিয়া নারায়ণ কহিল তুমি এ সপ্তাহে যদি বাড়ী যাও তবে তোমার ভগ্নীটিকে অতি অবশ্য আমাদের বাড়ী হইতে এখানে লইয়া আসিবে। না পাঠা-ইতে চাহে আমার অসুখ হইয়াছে বলিবে। আমি এদিকে বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিব, বলিয়া স্ত্রীর পত্রখানার কিয়দংশ সম্বন্ধীকে দেখাইল। বুদ্ধিমান সম্বন্ধী ভগ্নীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া এ বিষয়ে কোনরূপ উচ্চবাক্য করিল না।

হঠাৎ এক রবিবারে গিয়া নারায়ণের মায়ের নিকট নীরদাকে তাহাদের বাড়ী পাঠাইবার জন্য জেদ করিয়া বসিল।

নারায়ণের মা কহিলেন, আমি একলা সংসারের সকল কাজকর্ম্ম পারিয়া উঠিব কেমন করিয়া?

নীরদা কহিল, না পারিলে আমি কি করিব, আমি তোমার বাড়ীতে বাঁদীগিরি করিতে পারিব না। তোমরা না পাঠাও নিজেই দাদার সঙ্গে চলিয়া যাইব।

মহামায়া আর অধিক কিছু বলিলেন না। তিনি বুঝিলেন, ইহাতে পুত্রেরও যোগ আছে, একলাই সংসারের সমস্ত ভার মাথায় তুলিয়া বউকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া কহিলেন, এসো মা, সুখেই থাকো, লোকে শেষ বয়সে সুখে শান্তিতে থাকিবার জন্যই ছেলের বউ প্রার্থনা করে, আমার ভাগ্যে তা যখন ঘটিল না—না ঘটুক। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছি তোমরা সুখেই থাক।

নীরদা শাশুড়ীর দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। তাহার গহনা নষ্ট হওয়ায় সমস্ত বর-অঙ্গখানি খালি হইয়াছিল। ক্ষণে ক্ষণে গহনার স্মৃতি মনে পড়িয়া তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ ও হৃদয় তিক্তস্বাদে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। কোন গতিকে শাশুড়ীকে একটা প্রণাম করিয়া নীরদা তাহার দাদার সঙ্গে গ্রাম ছাড়িয়া গেল।

ইতিমধ্যে নারায়ণও বাসা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। লক্ষ্মী আসিয়া নারায়ণের গৃহের শূন্যতা পূরণ করিল।

নারাণচন্দ্র রাত্রে স্ত্রীর কাছে বাড়ীর সমস্ত খবর পাইয়া কহিল, ব্যাপার কি বলো দেখি।—

নীরদা কহিল ব্যাপার আর কি? মা তোমার ভাইদিগকে এক একটা চাষা করিয়া তুলিতেছেন, গহনা বন্ধক দিয়া গরু কিনিয়া লাঙ্গল করিয়া ইত্যাদি সমস্ত বলিল।

নারায়ণ খানিক স্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, মরুক্‌গে সংসারে কুলী মজুরই হউক তাহারা, আমি তার কি করিব। যাহাদের এতটুকু আত্ম-সম্মান জ্ঞান নাই তাহাদের ঐ অবস্থাই হইবে।

নীরদা তাড়াতাড়ি কহিল—যাই করুক তাহারা, তোমাকে ত আর কেহ কুলী মজুর বলিবে না।

নারায়ণের যেমন আফিস চলিতে থাকে তেমনি চলিতে লাগিল। নীরদারও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের কোন ক্রুট নাই। যেমন যেমনটি দরকার স্বামীর আফিস যাইবার—জামা চাদর জল খাবার ইত্যাদি যথাসময়ে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

মাঝে একবার বাড়ী হইতে পত্র আসিল, হেমাঙ্গিনী বিবাহযোগ্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। পাত্র ঠিক করিতে যেন একটু চেষ্টা করা হয়।

নারায়ণ পত্রে লিখিল, আমিত বাড়ীর সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছি। আমাকে আর কোন কথা না বলাই যুক্তি সঙ্গত।

তারপর আর অনেকদিন বাড়ী হইতে কোন চিঠি পত্র আসিল না, একদিন অগ্রাণের অপরাহ্নে একখানি পত্র আসিল, মাতা লিখিয়াছেন: নারাণ, কর্ত্তা তোমারি হাতে তোমার ভাইক'টিকে ও ভগ্নীটিকে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তুমি কোন ভারই গ্রহণ করিলে না। ঋণ ভারও লইলে না, যাই হোক তুমি সুখেই থাক। তাহারা চাষবাস করিয়া এক রকমে দিন গুজরাণ করিবে।

নারাণ পত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। একদিন লোক মুখে শুনিল হেমাঙ্গিনীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

নারায়ণের কিছুই উচ্চবাচ্য করিবার নাই। সেত সকল সম্পর্কই ছিন্ন করিয়াছেন।

এমন সময় ভরা শীতের সময় নারায়ণের শ্যালীর বিবাহের সংবাদ আসিল। নারায়ণের শ্বশুর স্বামী স্ত্রী দু জনকেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আমন্ত্রণ করিয়াছে।

নীরদা নারায়ণকে ছুটি লইবার জন্য ধরিয়া বসিল। রেলোয়ে চাকরীতে ছুটি নাই, অনেক করিয়া নারাণচন্দ্র জোগাড় পত্র করিয়া দিন কয়েকের ছুটি মঞ্জুর করাইয়া শ্বশুর বাড়ীর দেশের যাত্রা করিল।

দেশে গিয়া দেখিল ঘরে ঘরে লোকের জ্বর, ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে। নারায়ণ ব্যস্ত হইয়া পলাইবার উপক্রম করিতে লাগিল কিন্তু নীরদবরণী বিবাহের শেষ পর্যন্ত না থাকিয়া কিছুতে যাইতে চাহিল না। অগত্যা নারায়ণকে একলাই ফিরিয়া আসিতে হইল। নীরদা রহিয়া গেল।

নারায়ণ যে ম্যালেরিয়াকে এত ভয় করিতেছিল, এত করিয়াও সে সেই ম্যালেরিয়ার হাত এড়াইতে পারিল না। কলিকাতা আসিয়া শ্বশুরবাড়ী যাত্রার ফল ফলিতে লাগিল।

একবারে পেট জোড়া পীলে যকৃৎ লইয়া শ্রীমান ম্যালেরিয়াদেব স্বশরীরে নারায়ণচন্দ্রের দেহে আবির্ভূত হইলেন। নারায়ণ দাহে ছট্ ফট্ করিতে লাগিল।

চিঠির পর চিঠি নীরদবরণীকে লেখা হইতে লাগিল। নীরদ আসিতে চাহিল না। পত্রে লিখিল আবার কখন আসি তাহার ঠিক নাই, ভগ্নীর সহিত না দেখা করিয়া যাইতে পারিব না, তখন নারায়ণ একবার মনে করিল—দেশে মাকে একখানা চিঠি লেখা যাউক। কিন্তু মায়ের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে চিঠি লিখিবার কোন মুখই তাহার নাই। অগত্যা স্ত্রীকেই এবার টেলিগ্রাম করিতে হইল। শ্বশুর মহাশয় তাঁহার কন্যা সহ, নারায়ণের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আপিস রীতিমতই কামাই হইতেছিল, হাতে মাহিনার যে কয়টি টাকা ছিল তাহা বিবাহের ধুমধামেই খরচ হইয়া গিয়াছে, দেনা করিবার সে উপায়ও আর নাই। কারণ যে সব আত্মীয় স্থলে দেনা করা হইয়াছিল তাহাদের কাহাকেও শোধ না দেওয়ায় সে পথও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, শ্বশুর আসিলেন। তাঁহাকে ভাল রকম অভ্যর্থনা করিতে পারিল না। মাত্র বাসায় একখানি ঘর ও একখানি রান্না ঘর। বসাইবার দাঁড়াইবারই স্থানাভাব। শ্বশুর মহাশয় সেইদিনই কোন রকমে আহার সারিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় নীরদা কাঁদিতে লাগিল। শ্বশুর মহাশয় তাহাকে শীঘ্র লইয়া যাইব বলিয়া আশ্বাস দিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে একমাস হইয়া গিয়াছিল। আপিস হইতে চিঠি আসিতে লাগিল—শরীর সারিয়াছে কি না? না সারিয়া থাকে এরকম সর্ব্বদা পীড়িত ব্যক্তিকে কোম্পানী রাখিতে পারেন না, রোগের মাথায়—পীড়ার প্রাবল্যে কিছুমাত্র ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া নারায়ণ লিখিলেন—কোম্পানী অন্য লোকের চেষ্টা দেখিতে পারেন। এরকম পীড়িত অবস্থায় আপিস যাওয়া হইতে পারে না।

ফলে হইলও তাহাই। নোটিশ আসিল—নারায়ণ তাহার মাহিনা পত্র বাকী পাওনা যাহা আছে বুঝিয়া লইয়া যাউক। তাহার স্থানে নূতন লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইয়া গেল। এক মাসের অনুপস্থিতিতে যে চাকরী যাইবে এটা কখনও একবার কাহারও মনে হয় নাই। কিন্তু ব্যাপারটা যখন নিতান্তই পরিষ্কার হইয়া গেল।

তখন আর কাহারও কিছু বুঝিতে গোল রহিল না। বন্ধুরা আসিয়া কহিল, নূতন যে সাহেব আসিয়াছে, পনের দিনের ছুটিতে খচাখচ ডিস্‌মিস করিতেছে। লোকেরও ত অভাব নাই। একটা পোষ্ট খালি হইতে না হইতে লোক হাঁ করিয়া রহিয়াছে।

যে দুচার টাকা আপিস হইতে পাওয়া গেল তাহাই মাত্র সম্বল করিয়া এ দুস্তর ভবসমুদ্র অতিক্রম করিতে হইবে। বাড়ীওয়ালার পাওনা শোধ করিতেই প্রায় অর্দ্ধেক টাকা ফুরাইয়া গেল। তারপর দুধওয়ালীর ও ডাক্তারের দেনা আছে। এদিকে দেহও সারে নাই। স্বামী স্ত্রী যুক্তি করিয়া দেশে-যাওয়াই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিল।

দেশের নিজের বাড়ীতে যাওয়ার পথ ত নাই। অগত্যা নীরদবরণীর বাপের বাড়ীতে যাওয়াই স্থির হইয়া গেল, দারুণ দৈন্য ও দুঃখ মাথায় লইয়া স্বামী ও স্ত্রী আবার সেই ম্যালেরিয়া পীড়িত পল্লীগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল।

শ্বশুরবাড়ীতে নারায়ণচন্দ্রের অভ্যর্থনাটা এবার তত জাঁকাল রকম হইল না। যেন তাহাদের ভারের উপর আবার একটা ভার বৃদ্ধি হইল। এম্নিতর ভাবে সকলে তাহাদের দিকে চাহিল। জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধটি ত দুই দিনের মধ্যে একবার দেখাও করিল না; নারায়ণ বুদ্ধি করিয়া চাকরী গিয়াছে এ খবরটা গোপন করিয়াছিল এবং স্ত্রীকেও গোপন করিতে বলিয়াছিল। তাই রক্ষা, তবু লোকে কানাকাণি করিতেও ছাড়িল না; কিন্তু শ্বশুর বাড়ীতে একমাস থাকিয়াও রোগের কোন উপশম দেখা গেল না, বরং রোজ রোজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহার উপর এই দারুণ দুশ্চিন্তার ভার!

নারায়ণ বিছানায় পড়িয়া দুঃখিনী মায়ের কথাই চিন্তা করিতে লাগিল— অবশেষে স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া দুঃখিনী মায়ের ঘরে যাওয়াই ঠিক হইয়া গেল—

স্ত্রী বুদ্ধিমতী, কহিল—আমি এখানে থাকি, তুমি একলাই সেখানে যাও। দেখে এসো না ব্যাপারটা কি? মায়ের ভালবাসার দৌড়টাই বা কত, দেখ না। নারায়ণ কহিল সেই যুক্তিই ঠিক।

বসন্তের প্রারম্ভেই ক্ষুদ্র নদীটি শুকাইয়া আসিয়াছিল। দুই পারের সিক্ত কিনারের ধারে কেবলই গাড়ীর চক্রচিহ্ন ব্যতীত আর কোন চিহ্নই বর্ত্তমান ছিল না। গাঙে ভরা জলও নাই, আর কূলে মৎস্য ধরিবার জন্য জালি হস্তে

ধীবর কন্যাগণেরও সমাগম নাই। প্রান্তরের মধ্য দিয়া নদিটি একটি সরু সূতার মত বহিয়া গিয়াছে। তীরের বাবলা বৃক্ষগুলির একটা সৌন্দর্য্যও নাই। কেমন একটা রিক্ততা তাহাদিগকে ঘেরিয়া ধরিয়াছে। নদীর কুলে কুলে নারায়ণের গাড়ী চলিতেছিল।

গাড়ী যখন বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন মা মহামায়া খবর পাইয়া দ্রুত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নারায়ণকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন, দুটো শক্ত শক্ত কথাও যে তাঁহার ঠোঁটে না আসিয়াছিল তাহা নহে কিন্তু পুত্রের রোগশীর্ণ কম্পান্বিত কলেবরের পানে চাহিয়া মায়ের সব অভি-মান চক্ষের জলে ভরিয়া উঠিল।

ধরাগলায় কহিলেন, শুনিয়াছিলাম তোমার অসুখ হইয়াছে। একখানা পত্রও ত দিতে হয়?

নারায়ণ অশ্রু ছল ছল কণ্ঠে কহিল, না মা পারিনি। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া কিন্তু নারায়ণের তাক লাগিয়া গেল। দারিদ্র্যের প্রকট চিত্র মূর্ত্তিমতী দেখিবে বলিয়া সে যাহা ভাবিয়া ছিল,দুই বৎসরের মধ্যে দেখিল সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত। বাড়ীতে বড়বড় দুইটা ধানের গোলা ধানে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। গোয়ালের গাই গুলিরও শ্রী ফিরিয়াছে, ঘরে বাহিরে যেন একটা পরিপূর্ণ লক্ষ্মীশ্রী বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে।

নারায়ণ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাড়ীর চারিদিক দেখিয়া লইল, আনন্দে তাহার হৃদয়টা ভরিয়া আসিতে ছিল।

ভাইগুলির খবর লইয়া জানিল, তাহারা গুড় ছোলা মটরের ব্যাপার করিতে গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছে। হেমাঙ্গিনীও শ্বশুর বাড়ীতে আছে।

নারায়ণ বিছানায় পড়িয়া কহিল—মা এখন আর আমার কোন দুঃখ নাই। তুমি যে তাহাদিগকে চাকরীতে না ঢুকাইয়া চাষ ও ব্যবসায় লাগাইয়াছ, তাহাতে আমার আনন্দের সীমা নাই। আমার দুঃখ কষ্ট আমি গ্রাহ্যই করি না, তাহারা মানুষ হইয়া যে বাঁচিতে পারিয়াছে ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট।

নারায়ণ আরও শুনিল দেনাও সব শেষ হইয়া গিয়াছে। ভিতরে যতটুকুই আনন্দ লাভ করিতেছিল, নিজের নির্ম্মম আচরণের জন্য আবার তাহাপেক্ষা বেশী অনুতপ্ত হইতেছিল—সে আস্তে আস্তে চক্ষু মুদিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। দীর্ঘ দিবসের অনাহার ও দুর্ব্বলতায় তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া-

ছিল। এতটা আনন্দ সংবাদ সামলাইতে পারিল না সন্ধ্যাবেলায় প্রবল দাহ ও কম্পের সহিত জ্বর আসিয়া উপস্থিত হইল। পরদিনেই বিকারের লক্ষণ সকল দেখা গেল। গাড়ীতে আসিবার সময় সে মনে করিতেছিল মাকে সে অন্ন দেয় নাই, মায়ের অন্ন কেমন করিয়া খাইবে? ঈশ্বর তাঁহার কাতর অনুরোধ শুনিয়াছিলেন। মায়ের ভাতও খাইতে হইল না; অপরাহ্ন বেলার মৃত্যু লক্ষণ প্রকাশ পাইল।

মা কহিলেন বৌকে আনিতে লোক পাঠাইব?

নারায়ণ কহিল না মা—যদি আমার মৃত্যু হয় তবে তাহার গহনা কয়খানা পাঠাইয়া দিও।

মা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—তাহার গহনা যে সব খালাস করিয়া আনা হইয়াছে।

গভীর রাত্রে নারায়ণের শ্বাস উপস্থিত হইল। ভাইরা সেই মাত্র বাড়ী পৌঁছিয়াছিল। তাহারা আসিয়া কহিল, দাদা তুমি আমাদের ছাড়িতে পারিয়াছিলে, আমরা ত তোমায় ছাড়িতে পারি না, আমরা খেটে খাটিয়াও তোমায় খাওয়াইতে পারিতাম।

নারায়ণ সকলের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল না ভাই—চলিলাম। তোমাদের গলগ্রহ হইয়া পড়িয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তোমরা খাটিবে আর আমি বসিয়া খাইব সে হইতে পারে না। বাবা যদি লেখাপড়া শেখানের সঙ্গে সঙ্গে একটু মানুষ হইবার মত শিক্ষা দিতেন তবে আমায় অকালে মরিতে হইত না।

ভোরের আলো পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বেই নারায়ণের জীবনালোক চির অন্ধকারে নির্ব্বাপিত হইল।

মা জ্যেষ্ঠ পুত্রের শোকে দুইদিন উঠিলেন না—

*   *   *   *   *

শ্রাদ্ধের সময় বৌ নীরদবরণী কাঁদিতে কাঁদিতে শাশুড়ী প্রদত্ত গহনাগুলি বক্ষের কাছে জড়াইয়া কহিতে লাগিল—ওগো মা কি হলো গো আমার—একবার দেখাও হ'লো না।—শেষটায়—

নীরদার মাও নীরদাকে বলিয়া দিয়াছিলেন—যতদিন না গহনাগুলি পাস্ ততদিন থাকিবি, গহনা পাইলেই—চলিয়া আসিবি।

নীরদার হিতৈষীগণ নীরদাকে শাশুড়ীর কাছে থাকিবার জন্যই অনুরোধ

করিতে লাগিল। নীরদা কিন্তু তাহার মাতার অনুরোধটাই রাখিয়াছিল। বাপের বাড়ী হইতে আর সে কখনও শ্বশুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসে নাই। স্বামীর সঙ্গেই স্বামীর ভিটার সম্পর্ক লোপ করিয়া দিল।

আকাশ-কুসুম

(লেখক—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

(১)

'ইন্দুলেখা'র যশঃ ক্রমশঃ দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকার নাম করিতে হইলে লোকে 'ইন্দুলেখা'র নাম নিঃসঙ্কোচে করিত।

মনোমোহন ইন্দুলেখাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিতে প্রাণপণ করিয়াছিল; দিবারাত্র তাহার সেই কক্ষটির মধ্যে বসিয়া সে আপনার কত জল্পনা কল্পনা মনে করিত। তাহার সেই টেবিলের উপরেই পোষ্টকার্ডখানি ফটোগ্রাফে সেই সুন্দর বাঁকা বাঁকা অক্ষর লইয়া প্রেমের সেই করুণ কাহিনী ফুটাইয়া অবস্থান করিতেছে। মনোমোহন তাহার পানে চাহিয়া, কত কথা ভাবিয়াছে; কত বিনিদ্র রজনী সে সেই অক্ষর কয়টির মধ্যে বাঁধা পড়িয়া কাটাইয়াছে।

ইন্দুর পিতার ভৎর্সনায় মনোমোহনের মনের গতির যে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এমত বোধ হয় না। বরং তাহার বড়ই বিমর্ষ হইল—কেন পৃথিবীর প্রেমের এত লাঞ্ছনা? যাহাকে ভালবাসিয়া থাকি, এক ছত্র লিপি তাহার নিকট দূষনীয়? তখনি মনে হইল, না, না—ইন্দু ত নৃশংসতা করে নাই; তাহার পিতার সহিত যে তাহার এক মত তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আর সে বৃদ্ধ 'ঘটিরামের' উপর তাহার বেজায় রাগ হইল। সে এই কয়দিন বিবাহ করিয়া এত আপনার হইয়া পড়িয়াছে যে চিরজীবনের আবাল্যের সহচরের একটি ছত্র পত্রও তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

ক্রোধের বশে সে "ঘটিরাম লীলা" নাম দিয়া একটি কবিতা লিখিয়া ফেলিল; প্রেসেও পাঠাইয়া দিয়াছিল; পরে মনে পড়িল, পূর্ব্ববঙ্গের কোন

কাগজওয়ালা জনৈক ডেপুটিকে আক্রমণ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিল; খবরের কাগজে প্রকাশ হওয়ায়, উক্ত কাগজওয়ালার কান ধরিয়া নাকি আদালতের পেয়াদা পঁচিশবার "উঠ বোস" করিয়াছে। কাজেই প্রেসে প্রুফ পাঠাইতে বারণ করিয়া দিতে হইল।

(২)

প্রথম ক্রোধের বেগ কমিলে একটু নির্জীবতা আসিয়া পড়ে; যেন আপনার বিষে জ্বলিয়া পুড়িয়া শেষে নির্ধূম ছাইয়ের মত ধূলায় পড়িয়া থাকে। মনোমোহন রাগের পরে স্তিমিত মস্তিষ্কে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

'ইন্দুলেখা'র নববর্ষারম্ভ, কাজের খুব ভিড়, মনোমোহন একাকী সব করিতে পারিবে না বলিয়া অনাদির ছোট ভাই শৈলেন্দ্রকে সহকারী নিযুক্ত করিয়াছে। সে নিজে শুধু অর্ডার পত্রগুলি দেখিয়া নম্বর করিয়া দেয়। প্রতি পত্রখানি সাগ্রহে পড়িয়া থাকে, তাই বলিয়া যেন কেহ ভাবেন না সাংসারিক হিসাবে মনোমোহন যে কার্য্য সম্পন্ন করে তাহা নয়। সেদিন একখানি পোষ্ট-কার্ডের পানে চাহিয়া দেখিয়া সে তাহার সকল শ্রম যেন সফল বিবেচনায় চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া নিবিষ্টমনে পাঠ করিতে লাগিল। শৈলেন্দ্রকে বলিয়া দিল, এখন হইতে যে সব অর্ডার আসিবে, তাহা সেই যেন নম্বর করিয়া দেয়।

যে পোষ্টকার্ড আসিল—তাহাও অর্ডার। প্রতি অক্ষর যেন একেবারে অন্তরে পশিতেছিল; হঠাৎ পূর্ণ স্বাক্ষরে নজর পড়িল—"শ্রীমতী ইন্দুলেখা দাসী।" ফটোক্রেমে দেখিল—'শ্রীমতী' একবার বুকের কোন্ একটা জায়গায় কেমন একটা জোর আঘাত লাগিল—তখনি আবার সে বেদনা হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া সে ভাবিল—তবে ইন্দু, আমার ইন্দু স্বাধীনা! এই চিন্তাটির মধ্যে যেন একটা উত্তেজনার মাদকতা মিশ্রিত ছিল, মনোমোহন চঞ্চল হইয়া পড়িল। এই পত্রে যেন আগ্রহ বেশী, গ্রাহিকার পত্রিকা-প্রাপ্তির জন্য বড় বেশী ব্যাকুলতা। "পত্রিকা বাহির হইবামাত্র যেন তাহাকে ভিঃ পিঃ করা হয়।" তবে কি ইন্দু ধরিয়া ফেলিয়াছে যে মনোমোহন তাহার প্রেমে ভরপুর হইয়া, তাহারই উদ্দেশে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি প্রেরণ করিতেছে। এই কথায় সহজেই মনোমোহনের চক্ষে একটা হর্ষ ও প্রীতির ঝলক খেলিতে লাগিল।

তবে ইন্দু সেই কৈশোরের সেই ইন্দুই আছে।

সেই সময়ে মনোমোহনের একখানি কাব্য সম্পন্ন হইয়াছিল ; সে তাহার নাম রাখিল—"জীবন-ইন্দু।"

ইন্দুলেখায় তিন পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিল।

(৩)

নববর্ষের ইন্দুলেখা প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার দুই দিন পরেই জীবন-ইন্দু'র যে অর্ডার প্রথমে আসিল—তাহা এইরূপ—

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের 'জীবন-ইন্দু' কাব্যের বিজ্ঞাপন পাঠ করিলাম ; এই গ্রন্থ আমার নামে একখানি ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। নিম্নে আমার ঠিকানা প্রদত্ত হইল।

নিবেদিকা—শ্রীমতী ইন্দুলেখা

—নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মনোমোহন সে পত্রখণ্ড দেখিয়া ভাবিতে লাগিল —এত নিকটে, ইন্দু এত কাছে--অথচ কত দূরে। একদিন সে দূরে থাকিলেও কত কাছে মনে হইত, আর আজ এত নৈকট্য যেন সুদূর দেশান্তর মনে হইতেছে। ইন্দু স্বাধীনা ! সে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়াছে ; তাহার পিতা যে বহুবাজারে বাসা করিয়া আছেন, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম। একবার ছুটিয়া গিয়া কেন দেখিয়া আসি না ? বিবাহের পর বিদায়ের দিনে যাহাকে চখের দেখাও দেখিতে পাই নাই, আজ তাহাকে মনপ্রাণ খুলিয়া দেখিয়া আসি ; তাহাতেও বাধা আছে যে ! সেবার পত্রের ব্যাপারটায় ইন্দুর পিতা বেশ কড়া কড়া কয়টা কথা বলিয়াছিলেন। হোক্, ইন্দুর মনটা বুঝিয়া আসা যাইবে। ইন্দু, সেই—সরলা, প্রেমবিহ্বলা বালিকা—সে নিশ্চয়ই আমার প্রতি সম-প্রেমবতী ! কিন্তু, কিন্তু ইন্দুর পিতা—এবার যদি ভদ্রতা রক্ষা না করেন, তবেই ত' !

তাহা অপেক্ষা আর একটি সহজ উপায় আছে। বই ডাকে না পাঠাইয়া লোক দ্বারা ইন্দুর নিকট পাঠাইতে হইবে। একটু ভাবিবামাত্র মনোমোহন এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বুঝিতে পারিল। অবশেষে স্থির করিল, পুস্তক বিক্রেতা (বিক্রেতী হইলে আরো ভাল হয়) লোক দ্বারা পুস্তক পাঠাইতে হইবে।

শৈলেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল—একটা দরকার—যা খাইবেন বিক্রেতী রমণী

ঠিক করিয়া আনিতেবলি যে,এক বাড়ীতে কয়েক খানা বই পাঠাইতে হইবে। হার চুক্তি হয়, তাহাতেই রাজী হইও।

শৈলেন্দ্র তদ্রূপ করিল, একটি রমণীকে লইয়া আসিল? মনোমোহন মহোল্লাসে অন্য কয়েকখানি পুস্তকের সহিত বাঁধান কয়েকখানি 'জীবন-ইন্দু' দিয়া বহুবাজার ষ্ট্রীটে, — নং বাটীতে উপস্থিত হইয়া ইন্দুলেখা নাম ধারিণীকে উপহার দিয়া আসিতে বলিল।

(৪)

মনোমোহন যদি মত্ততা ত্যাগ করিয়া স্বীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিত, বুঝিত, তাহার ধ্বংশ অনিবার্য্য এবং সন্নিকট। কর্ম্মচারীরা দুই হাতে লুটিয়া লয় একা শৈলেন্দ্র সামলাইতে পারে না। তাহাকে কেহ বড় মানেও না। যে মূলধন খাটিতেছিল, যাহা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত মূলধনের ন্যায় কিছু বহুদিবস যাবৎ অস্তিত্ব গোপন করিয়া আসিতেছিল, তাহা নিঃশেষে উড়িয়া গেল। তদুপরি কয়েক সংখ্যা 'ইন্দুলেখা' ও জীবন-ইন্দুর সমস্ত কাগজের দাম, প্রেসের বিল সব বাকী পড়িয়াছিল, তাগাদার পর তাগাদা আসিত, মনোমোহনের শেষ আশা 'জীবন ইন্দু' দেখাইয়া সকলকে শান্ত করিতেছিল। কাব্যখানি কাটিলে সে একরকম সামলাইতে পারে, এ কথা সে নিজে মধ্যে মধ্যে ভাবিত। তাহার লেখার সুখ্যাতি ত বাজারে পাঠকদের কাছে ছিলই, আবার এ বই খানা যেন হৃদয়ের প্রান্ত স্তর ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে—ইহা যে পাঠকের অন্তর আকর্ষণ করিবে সে বিষয়ে সে বিন্দুমাত্র সন্দিহান ছিল না।

যেদিন শৈলেন্দ্র আসিয়া বলিল —কাগজওয়ালারা আর টাকা ফেলিয়া রাখিবে না, সে বড়ই অধীর হইল; প্রেসওয়ালা নালিশ করিবে, দপ্তরী গালি দিতেছে এই সমস্ত উপদ্রবে উদ্ব্যস্ত হইয়া মনোমোহন দ্বিতলে স্থান লইল, আর নামে না।

সেই মাগিটা কাল বই লইয়া গিয়াছে, এখনও কোন সংবাদ দিল না— মনোমোহন উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া আছে। মধ্যাহ্নকাল; বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র করিতেছে গরমের চোটে দুনিয়া যেন চোটে লাল হইয়া উঠিয়াছে। মনোমোহন চিন্তাসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছে, এমন সময়ে পুস্তক বিক্রেত্রী রমণী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ দেখিয়া মনোমোহনের অন্তর উল্লাসিত হইয়া উঠিল। সে আশা উল্লাস উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসিল খবর কি?

রমণী একগাল হাসিয়া বলিল—বাবু আমার খুব বড় বকসিস চাই। বই দিয়া আসিয়াছি। দেখিয়া তিনি বড়ই খুসী হইয়াছেন। মনোমোহন জিজ্ঞাসিল—কিছু বলিলেন?

রমণী বলিল—বলিলেন বৈ কি। বইয়ে কোথায় লাল কালির দাগ দেওয়া ছিল, জিজ্ঞাস কল্লেন্ দাগ কেন, আমি বল্লাম কি জানি বাপু, কেন? বলিয়া একটু হাসিলাম। "সে চক্ষুর এমন একটা ইঙ্গিত করিল যে প্রকৃতিস্থ থাকিলে মনোমোহন তাহার পায়ে লুটিয়া পড়িত।

"আর কিছু?"

"সেইটেই ত আসল খবর। আপনার তিনি (পুনরায় ইঙ্গিত করিল) আপনার বইয়ের প্রথম সংস্কার না কি বলে ছাই—"

বাধা দিয়া মনোমোহন বলিল—সংস্করণ?

রমণী হাসিয়া বলিল—হাঁ গো হাঁ, সংস্করণ ত বটে—সেই সংস্করণে যত বই আছে সব চাহিয়াছেন।

মনোমোহন আপনা আপনি বলিয়া উঠিল—তবে ইন্দু, তুমি আমার; এখনও আমার; চিরদিন আমার—আমার, আমার! আমার বই তাই তুমি সব চাহিয়াছ!

রমণী একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কিছু বলিল না।

মনোমোহন বলিল—এখনই যাইবে?

রমণী বলিল—আজ আর নয়, কাল দুপ্রহরে যাইব। আপনি বই ঠিক করিয়া রাখিবেন, আমি মুটে লইয়া আসিব। এখন যাই। বলিয়া সে উঠিল।

মনোমোহন একবার ভাবিল, অন্তকার বই পাঁচখানার দামটা চাহিয়া লওয়া যাক্—না থাক্—উহাকে বখসিস্ ত করিতেই হইবে—থাক্।

রমণী প্রস্থান করিলে, মনোমোহন 'জীবন-ইন্দুর' উপহার পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়িতে লাগিল—

"জীবনে যে আমার মানসী-প্রতিমা; পূজায় যে আমার শ্রেষ্ঠ-দেবতা; নশ্বর জগতে যে আমার চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি—আমার সেই বাল্য সহচরী, প্রেমময়ী, প্রাণ-প্রতিমা ইন্দুলেখাকে প্রেমের নিদর্শন এই ক্ষুদ্র পুষ্পোপচার প্রদত্ত হইল।"

(৫)

বহুবাজার ষ্ট্রীটের একটি অনতিবৃহৎ দ্বিতল বাটীর উপরের কক্ষে একটি মহিলা একখানি খট্টাঙ্গোপরি শয়ন করিয়া মাসিক পত্রিকা পাঠ করিতেছিলেন। মহিলাটির অঙ্গে শ্বেত বাস। কক্ষটি সুসজ্জিত; মেঝেয় উৎকৃষ্ট কার্পেট্ বিছান; আলোর রঙ্গিন কাচের ফানুস; নানাবিধ চিত্র পরিশোভিত।

এই মহিলাই—ইন্দুলেখা।

ইন্দু লেখার বাল্যের সেই স্বভাব ঠিকই আছে; মাসিক পত্রিকা পড়িতে ইহার কখনই অবসরাভাব ঘটে না। অদ্যও একখানি পড়িতেছেন; পার্শ্বে পাঁচখানি 'জীবন-ইন্দু' কাব্য পড়িয়া রহিয়াছে। একবার তিনি একখানি কাব্য উঠাইয়া লইয়া তাহার উপহার পৃষ্ঠা খুলিলেন; শুভ্র আননে রক্তরেখা ফুটিয়া উঠিল; চক্ষু যেন জ্যোতির্ম্ময় হইল—আবার তিনি সে কাব্য বন্ধ করিয়া মাসিক পত্রিকার পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল—পুস্তক বিক্রেত্রী রমণী আসিয়াছে; সাক্ষাৎ চাহে।

তাহাকে আনিতে বলিয়া ইন্দু স্বীয় বস্ত্রাদি ঠিক করিয়া লইলেন। পুস্তক বিক্রেত্রী আসিয়া অভিবাদন করিল।

ইন্দু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সব বই এনেছ?

দন্ত বিকশিত করিয়া সে বলিল—আজ্ঞে।

ইন্দু স্বীয় পরিচারিকাকে আজ্ঞা দিলেন—বই আনিয়া বারান্দায় জমা করিতে।

আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। তিনি স্বয়ং উঠিয়া, শয্যায় পতিত পাঁচখানি কাব্য লইয়া, উপহার পৃষ্ঠা পাঁচটি ছিঁড়িয়া তাহাতে সর্ব্ব সমক্ষে পদাঘাত করিলেন; পরে স্তূপীকৃত পুস্তক রাশির মধ্যে সে কয়খানিকে নিক্ষেপ করিয়া, তাহাতে কেরোসিন ঢালিয়া অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে পুস্তকগুলি হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ইন্দু স্তম্ভিত-পুলকে দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। পুস্তক বিক্রেত্রী রমণী দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; যেন ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছে। ইন্দু মধ্যে মধ্যে তাহার দিকে চাহিয়াও আনন্দোপভোগ করিতেছিলেন।

কাব্যেররাশী ভস্মীভূত হইলে, ইন্দু পরিচারিকাকে বলিলেন—দীর্ঘ একগাছি সম্মার্জ্জনী আনিয়া ঐ পুস্তকবিক্রেত্রী রমণীর সর্ব্বাঙ্গে কাব্যের রেখা ফুটাইয়া দেও।

শুনিয়া পুস্তক বিক্রেতীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সে বুঝিল রমণীর নিকট কেমন করিয়া ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া যায়। সে কাঁদিয়া ইন্দুর পাদস্পর্শ করিয়া বলিল—মা! আমার কি দোষ? আমি বিক্রেতী মাত্র! দোহাই মা তোমার, আমায় ছাড়িয়া দাও।

ইন্দু তাহাকে আর কিছু বলিলেন না। সে ছাড়া পাইয়া রাস্তায় নামিল, এবং উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। তাহাকে তদবস্থায় ছুটিতে দেখিয়া ছোঁড়ার দল পিছনে হাত তালি দিতে লাগিল।

(৬)

সে তখন ক্ষিপ্ত কুক্কুরের মত হইয়া গিয়াছে। যদি সম্মুখে পায়—মনোমোহনের অবস্থা সঙ্গীন্ করিয়া তুলিবে। তাহার ধমনীর ভিতর উষ্ণ-স্রোত ছুটিতে লাগিল। ছুটিয়া আসিয়া সে একদম মনোমোহনের সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া হাঁপ ছাড়িল। মনোমোহন সোল্লাসে জিজ্ঞাসিল—কি খবর?

রমণী দুই হাত তুলিয়া নাচিয়া, কাঁদিয়া একেবারে রঙ্গমঞ্চের নিতাই-নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। মনোমোহন যত জিজ্ঞাসা করে কি হইয়াছে, সে কথার উত্তর না দিয়া সে প্রবল বেগে গালি পাড়িতে থাকে। মনোমোহন ধমক দিল। আর যায় কোথা—সে লাফাইয়া উঠিয়া মনোমোহনের স্কন্ধের উপরে ব্যাঘ্রের মত পড়িল। দাঁত মুখ খিঁচাইয়া সব কথা বলিয়া বলিল—"পেরেম করিতে পাঠিয়েছ আমারে। আ—মর মিন্সে। ইত্যাদি।"

তাহাকে বীররসসম্পন্ন জ্ঞানে মনোমোহন দ্রুত সরিয়া পড়িল এবং শয়ন-কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

সেই সময়ে বাহিরে কে একজন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। মনোমোহন সে স্বর চিনিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে তখন স্বেদ-নদী বহিতেছে—সে শুইয়া পড়িল। শৈলেন্দ্র আগন্তুককে বলিল—বাবুর অসুখ হোয়েছে; দেখা ত হ'বে না।

যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি ইন্দুর পিতা। তিনি শৈলেন্দ্রকে বলিয়া

গেলেন—তোমার বাবুকে বলিও যে, যদি প্রাণের মায়া থাকে তবে যেন কাব্য টাব্য আর না লেখে। ভালো হবে না—বলছি। এবারই পুলিশ-কেস কর্ত্তাম, তা যাক্—পরের বারে একেবারে শ্রীঘরে পাঠিয়ে তবে ছাড়্‌ব।

পুস্তকবিক্রেতী রমণী ইন্দুদের বাড়ী হইতে পলায়ন করিবার সময় এই স্বর শুনিয়াছিল; কাজেই সেও কাঁপিতে লাগিল। তাহার এবং শয়নকক্ষে মনোমোহন—উভয়ের অবস্থা সমান হইয়া দাঁড়াইল।

বীণা

(লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস)

(১)

"মণিবাবু!"

কোন উত্তর আসিল না! বীণা আবার সুর তুলিয়া ডাকিল—"ও মণিবাবু! শুনতে পাচ্ছেন কি?" মণিন্দ্র এতক্ষণে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল। তার একটা মস্ত চমক ভাঙ্গিয়া গেল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া উত্তর করিল—

"এই যে, এস।"

"তা যেন এলাম। আপনি আজকে কলেজে যাবে না, শুয়ে আছেন যে বড়, বেলা ত প্রায় ১টা বাজে!"

মণিন্দ্র নাথ জবাব দিতে গিয়া থতমত খাইল।

বীণা আবার বলিল—"কোন অসুখ করেছে কি?"

মণিন্দ্র শুষ্ক মুখে উত্তর দিল—"না!"

"মাথা ধরেছে?"

"না।"

"পেটের অসুখ করেছে?"

"না—রে, না।"

"ও মনটা তবে খারাপ হয়েছে বুঝি! না—না—আপনার কিছু অসুখ

করেনি, যান—এক্ষুণি যান কলেজে। আবার ভাল ছেলেটীর মত কলেজ করে ফিরে আসুন। না যাবেন ত—বুঝতেই পাচ্ছেন—কি শাস্তি।"

মণিন্দ্র ভাবী শাস্তির আশঙ্কায় যতটা না ব্যস্ত হইয়া পড়িল, বর্ত্তমান বাগ্‌-যুদ্ধে সে যে কিছুতেই জয় লাভ করিয়া উঠিতে পারিবে না, এটা সে বেশ বুঝিয়াছিল। তাই আর দিরুক্তি না করিয়া—একটা খাতা ও একখানা বই হাতে করিয়া কলেজে চলিয়া গেল।

বীণার মনে খুব আঘাত লাগিয়াছিল। সে মণিন্দ্রের চোখের ভাব দেখিয়াই বুঝিয়াছিল তার প্রাণে আজ কে খুব ব্যথা দিয়াছে। বীণা এক প্রকার কার্য্য সিদ্ধি করিয়া আসিয়াই মাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল—

"মা, মণি বাবুকে যে আজ কেমন কেমন দেখাচ্ছে, বোধ হয় কেউ কিছু বলেছে ?"

প্রমদা বলিলেন—"কই না! তেমন কিছু শুনিনি ত।" বীণা বলিল—"তবে তিনি শুয়েপড়ে কত কি ভাবছিলেন কেন ? কোন অসুখ তো তার করেনি। চোখ দুটো যেন ব্যাথা ভরা! এই তাকে কলেজে পাঠিয়ে দিয়ে আসছি।"

প্রমদা একটু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"মণিত কাকেও কিছু বলিবার ছেলে নয়। সব সময়ই যে হাসি তার মুখে লেগে থাকে। যা হক দেখিও মা কি ওর হল।"

বীণা কি যে করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তার বুক ক্ষোভে ও দুঃখে ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহিল। যে এই নিরীহ বেচারীকে এমনি ধারা আঘাত করিতে পারে, তাকে পাইলে তার সাথে এখনি সে একটা বুঝা পড়া করিয়া লইত।

(২)

উকিল প্রমথবাবু যেদিন তাঁহার নিঃসহায় নিঃসম্বল বন্ধুর মৃত্যুতে তাঁহার একমাত্র পুত্র মণিন্দ্রনাথকে নিজের বাড়ী রাখিয়া পড়াশুনা করাইবেন বলিয়া লইয়া আসিলেন, সেইদিন অলক্ষ্যে অন্তদিকে একটা অসন্তোষ ও হিংসার মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

নীরেন পাশের বাড়ীর অবস্থাপন্ন জমিদারের ছেলে। চেহারাটী তাহার বেশ—বি, এ, পড়ে।

নীরেন প্রমথ বাবুর গৃহে আসিয়াই দেখিল তাহার আরাধ্যা বীণা

দুদিনের মধ্যেই মণিন্দ্রকে কেমন করিয়া যেন আপনার করিয়াছে। তাহার সমস্ত মনটা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কোথা থেকে তাহার পথে এই কণ্টক আসিয়া উপস্থিত হইল। যেমন করিয়াই হ'ক সে ইহার একটা সুব্যবস্থা করিবেই। সে একটা পথ ধরিল—মণিন্দ্রকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিয়া বীণা হইতে তাহাকে ছিন্ন করিয়া ফেলিবে।

বীণা গৃহে ছিল না। নীরেন তাদের বাড়ী ঢুকিতেই দেখিল মণিন্দ্রনাথ চেয়ারে বসিয়া কি একটা বই লইয়া পড়িতেছে। সে রুক্ষ হাসির স্বরে তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল—যে দরিদ্র, যার পৃথিবীতে দাঁড়াইবার স্থান নাই, যে পর-গলগ্রহ হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে, তার কেন আকাশে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা ?

বীণা মণিন্দ্রকে নিতান্তই আপনার করিয়া লইয়া ছিল। তার বাবা বলিয়াছেন—মণির কাছে তার পড়াশুনা বুঝিয়া লইতে। তাই সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় নিয়া দুজনের মধ্যে প্রায়ই বেশ দু'এক পশলা তর্কের বৃষ্টি হইয়া যাইত।

মণিন্দ্র সেদিন ক্ষুব্ধ, ছিন্ন-হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিতেই—বীণা তাহার কাছে ছুটিয়া গেল। আপন হাতেই আজ সে তাহার জামাটা খুলিয়া দিয়া পড়িবার গৃহে চেয়ারে বসাইল। হাত মুখ ধুইবার জল রাখিয়া বীণা খাবার থালা হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। খাবার রাখিয়া বলিল—

"খান" মণি একটু হাসিয়া বলিল—"আজকে আমার সৌভাগ্য বল্‌তে হবে, আচ্ছা তুমিই আরম্ভ কর না।"

বীণা—"আজ্ঞে না। আপনারা হলেন ধরার শ্রেষ্ঠ জীব। সে কি হয়। আমি বরং পরে খাচ্চি।"

মণি—"তা না হলে আমিও খাচ্চ না"—বলিয়া মণিন্দ্র বীণার কোমল হাতখানি ধরিয়া টানিয়া খাবারের উপর চাপিয়া ধরিল। অলক্ষ্যে উভয়েরই শরীর ও মনের উপর দিয়া একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিয়া গেল।

খাওয়া শেষ হইলে বীণা জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা মণিবাবু আজ সকাল বেলায় আপনার কি হয়েছিল বলুন ত।"

মণি বলিল—"এই—বিশেষ কিছুই নহে।" কিন্তু এই অসম্পূর্ণ অর্থহীন উত্তর দিয়াই সে নিষ্কৃতি পাইল না, বীণা তাকে এমন করিয়া ধরিয়াছিল যে অনিচ্ছায় মণি সত্য ঘটনাটি ব্যক্ত করিয়া দিতে বাধ্য হইল।

শুনিয়া বীণার শরীরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কি বলিতে যাইতেছিল—পারিল না। সামনের বিছানায় বসিয়া পড়িল।

মণিন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"বীণা দুঃখ করোনা। স্রোতের ফুলের মত ভেসে তোমাদের এখানে এসেছি, তোমরা ছেড়ে দেও—আবার ভেসে চলে যাব। যারা দরিদ্র—তাদের মানস সরোবরে কটা ফুল ফুটে ওঠে? আমার জন্য দুঃখ করোনা বীণা!"

বীণার সমস্ত প্রাণ যেন আরো—আরো সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। আবেগ ভরে বলিয়া উঠিল—"মণিদা—মণিদা, তুমি কেন অমন্ ক'রে বলছ? ওতে আমার যে হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে। না—তুমি আমার কাছ থেকে কিছুতেই যেতে পারনা। আমি তোমায় মঙ্গলের মত ঘিরিয়া থাকিব।"

মণির চোখ ছল-ছল করিয়া উঠিল। বীণার হাতখানি হাতে লইয়া বলিল—"বীণা, জানি না, কি করে তোমাদের এই ঋণ শোধ করবো।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়া ছিল। মণি বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল।

(৩)

বীণা মণিন্দ্রের পড়ার ঘর সাজাইতেছিল। এদিক ওদিক পতিত বইগুলি গুছাইয়া রাখিল। ময়লা কাপড় গুলি একটা পুটলি করিয়া ফেলিল। জামাগুলি যথা স্থানে আলনায় টাঙ্গাইয়া দিল। তাহারই হাতে তৈরি একখানা রুমাল টেবিলে পড়িয়া ছিল—তাতে লেখা—'মণি।' বীণা রুমালখানা হাতে জড়াইয়া কত কথাই ভাবিতে লাগিল। এমন সময় সহসা নীরেন আসিয়া ঘরে উঁকি মারিয়া ডাকিল—"বীণা!" বীণা কোন জবাবই দিলনা।

আবার ডাকিল—"বীণা!"

বীণা বলিল—"কেন, কি খবর?

নীরেন—আজকাল দেখছি তোমার তন্ময় ভাবটা বেশি হয়েছে। তা'—তা' হবে বই কি! তোমার মা কোথা?"

এ প্রশ্নের যে বিশেষ কিছুই মূল্য ছিল না, তা বীণা বুঝিল। সে আসিয়া ছিল সংবাদ লইতে।

বীণা বলিল—"জানিনা। আপনি একজামিন দেবেন না? পড়ার সময় এমনি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?"

নীরেন বুঝিতে পারিল—এ কথার অর্থ কি! তবু সে নিজকে চাপিয়া ফুলের একটা তোড়া বাহির করিয়া বলিল—"এইটে আমাদের বাগানের ফুল থেকে করেছি। নাও—রেখে দাও।"

বীণা সরিয়া গিয়া বলিল—না। ও ফুলে আমার দরকার নেই। আমার ফুলের কোন দুঃখ নেই। আপনার কাজ থাকে ত যেতে পারেন।"

নীরেনের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহিতে ছিল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আবার বলিল—এই কাপড় খানা রাখিবে কি? পারত একটা রুমাল তৈরি করে দিও—বলিয়া একখণ্ড লংক্লথ বীণার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

বীণা তাহা কুড়াইয়া লইয়া নীরেনের দিকে ফেলিয়া দিয়া বলিল—"আমার আজকাল বড় কাজ। সময় আদৌ পাইনা—ওসব এখন হবে টবে না।"

নীরেন আর পারিল না। সে যদি দুর্ব্বাসার মত তেজ পাইত, তাহা হইলে বোধ হয় বীণার আর রক্ষা ছিল না! তবু যে আগুণ জ্বলিয়া ছিল—তা' তাকে মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ করিতেছিল। সে কাপড়খানি তুলিয়া লইয়া কাঁপা স্বরে বলিল—"আচ্ছা" তার পরেই নীরেন সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বীণা এখন থেকে মণিন্দ্রের উপর একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। নীরেনের কঠোর আচরণে বীণার চোখে একটা সন্দেহের ছায়া ফেলিয়া দিয়াছিল। নীরেন যে মণিন্দ্রকে বিপদে ফেলিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করিবে না এটা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল।

জুলাই মাসে মণি এম, এ পরীক্ষা দিবে। আর দুমাস মাত্র বাকি। বীণা সর্ব্বদা তাকে উৎসাহিত ও প্রফুল্লিত করিয়া রাখিত।

সেদিন বড় গরম পড়িয়াছে। বীণা মাকে বলিল—মা, আজকে আমাদের বাগান বাড়ীতে গেলে হয় না?"

প্রমদা বলিলেন—সে বেশ ত মা, আমি গিয়ে আর কি করব'। গাড়ী ত রয়েছে—মণিরও খাবার খাওয়া হল; তার বেড়াতে যাওয়ারও সময় হয়েছে। তাকে নিয়ে বেড়িয়ে আয় গে।"—"আচ্ছা তাই যাচ্ছি" বলিয়া বীণা সহিসকে গাড়ী যুতিতে আদেশ দিয়াই মণিকে প্রস্তুত হইতে বলিল। বীণার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

মনির হৃদয়ে কি একটা প্রশ্ন যেন উকিঝুকি মারিতেছিল। তবুও সে বীণার উৎসাহ-ব্যঞ্জক মধুর মিনতি উপেক্ষা করিতে পারিল না।

তারা ব্যারাকপুর উদ্যানে চলিয়া গেল।

(৪)

"বাবা"

"কেন, মা!"

"বিয়ে তবে ঠিক হল—বলিয়া বীণা যেন সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল।"

"হল বৈকি ; কেন এতে তোর কোন অমত আছে ?"

" দিনকতক পরে হলে হত না ?"

"কেন মা, নীরেন ত অযোগ্য পাত্র নয়। বি, এ, দিয়েছে। দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়। স্বভাবটিও সুন্দর! বেশ নম্র। আর তোর ওপরও বেশ একটু আন্তরিক টান আছে, দেখেছি। এতে তোরা অসুখী হবি—তার তো কিছু দেখতে পাচ্ছিনে মা। কি হয়েছে তোর বলত।

বীণার ওরূপ ভাবে বাবার কাছে কথা বলাটা সাধারণতঃ প্রগলভতা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ওযে ওই ভাবেই প্রতিপালিত, বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত। দোষ দিতে হয়—প্রমথ বাবু ও তাঁর স্ত্রী দোষী—কন্যা নহে।

নীরেনের সহিত বৈশাখের ২০শে বীণার বিবাহ এক প্রকার ঠিক হইয়া গেছে। কিন্তু বীণা যে তার সবটুকু প্রাণ মণিকে জ্যোছনার মত ঢালিয়া দিয়াছে। নীরেন! সে কে? সে যে মণির শত্রু! তার সর্ব্বনাশ করিবে। নানা সে হইতে পারে না। এ কল্পনা করিতেও সে ঘৃণা বোধ করিল। সে আর এ কথা মনেই করিবে না। তাতেও পাপ।

বীণা গিয়া তার ক্যাশবাক্সটী খুলিতেই, সেদিন মণি বড় আদরে যে গোলাপ ফুলটি তাহাকে দিয়াছিল। সেই গোলাপ ফুলটী বাহির হইয়া পড়িল। বীণার চোখ উজ্জ্বল হইল। হৃদয় হর্ষে ও পবিত্রতায় ডুবিয়া গেল। ফুলটী আবেগ কম্পিত হস্তে একবার বুকে, একবার কপালে, একবার কম্পিত ওষ্ঠে চাপিয়া ধরিল এবং একটি ভেলভেটের বাক্সে অতি যত্নে রাখিয়া দিল।

* * * * * * *

আজ দুদিন মণিন্দ্রের কোন খোজ নাই। সেদিন রাত্রে বন্ধুবাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে ছড়ি হাতে করিয়া বাহির হইয়াছে। আর ফিরে নাই। প্রমথ

বাবু ও তাঁর স্ত্রী বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে অনেক অনুসন্ধান নিলেন, কিন্তু কোন সংবাদ মিলিল না।

আর বীণা! তার হৃদয় ব্যাপিয়া একটা আশঙ্কা মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে। সে মাকে দোষী করে, বাবাকে দোষী করে,কেন তাকে যাইতে দেওয়া হইল। কেন সেই রাত্রে লোক পাঠান হইল না ইত্যাদি। কিন্তু কিছুতেই সে শান্তি পাইল না।

পড়ার ঘরের দিকে চাহিলেই বীণার প্রাণ কাঁদিয়া ওঠে। মণির কি হইল? কোথাও কোন অসুখ হইয়া পড়িয়াছে কি? মণি বলিয়াছে তার কেউ নাই, নাজানি সে কত যন্ত্রণা পাইতেছে। এ সময় তার কাছে থাকিতে পারিলেও সে কতকটা শান্তি পাইত। না তার ওপর অভিমান করে কোথাও সে চলিয়া গিয়াছে? এ কি সম্ভব। বীণা ত কোনও অপরাধ করে নি। না—তা নয়। তা হলে সে একদিন পরেই ছুটে আসত। ওঃ—এযে অসহ্য।

সব শেষে মনে হইল তার নীরেনের কথা। মনে পড়িতেই বীণা শিহরিয়া উঠিল। সে কিছু দুরাভিসন্ধি করেনি ত। মণি তার চক্রান্তে পড়েনিত? তা হলে ত সর্ব্বনাশ; না জানি কি হইয়াছে। বীণা ছুটা ছুটি করিতে লাগিল।

প্রমথ বাবু খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে হঠাৎ চোখে পড়িল—সেদিন সকাল বেলা রাস্তায় অচৈতন্য অবস্থায় রক্তাক্ত দেহে একটি যুবককে পাওয়া যায়, সে এখন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আছে। জ্ঞান হইয়াছে, অবস্থা আশাপ্রদ। যুবকের নাম—মণিন্দ্রনাথ রায়, এ, এম, পড়ে। গায়ে ছোরার দাগ।

পড়িতেই প্রমথ বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া মোটারে বাহির হইয়া গেলেন।

হাসপাতালে গিয়া দেখিলেন মণি শুইয়া আছে। তাহার বাহুতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। প্রমথবাবুকে দেখিয়াই মণি উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না, পড়িয়া গেল। প্রমথবাবু তাকে ধরিয়া ফেলিলেন ও শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন।

তাঁকে দেখিয়া মণির মুখ প্রসন্ন হইল। কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেই থামিয়া গেল। তার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

প্রমথবাবু মণিকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু একটী ও জবাব সেখানে দিতে রাজী হইল না। মণির নাম কাটাইয়া প্রমথবাবু তাহাকে বাড়ী লইয়া গেলেন।

বীণা শুনিয়াই ছুটিয়া আসিল। মণিদা—মণিদা করিয়া গিয়া মণিকে ধরিয়া ফেলিল। তার ভাবিবার অবসর ছিলনা—ব্যাপারখানা কি।

মণি শুইয়া আছে। বীণা বাতাস করিতেছিল ও তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। বীণা ভাবিল—একি! সে যে আশঙ্কা করিয়াছিল, তাই ঘটিয়াছে। তবু যে তাহার প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে সেইজন্য ভগবানের উদ্দেশ্যে বীণা মাথা নোয়াইল।

প্রমদা একবাটি গরম দুধ লইয়া ঘরে ঢুকিতেই বীণা আনন্দে বলিয়া উঠিল—"মা মণিদা আজ উঠে বসতে পারে। তুমি ধরত পাখাটা, আমি দুধটা খাইয়ে দিচ্ছি।"

প্রমদা তাই করিলেন। মণিকে যে তিনি নিজের পুত্রের মতই স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন।

প্রমদা—"মণি।"

"কেন মা?"

"আজ ভাল আছ?"

"হাঁ মা।"

তুমি সেরে ওঠ বাবা। তোমার পরীক্ষার পরে আমরা পশ্চিমে বেড়াতে যাব।

কৃতজ্ঞতায় মণির প্রাণ ভরিয়া উঠিল। দুফোটা তপ্ত অশ্রু প্রমদার হাতে পড়িল। প্রমদা তার শিরশ্চুম্বন করিলেন।

(৫)

নীরেন যে কি ভীষণ কার্য্য করিয়াছে, তাহা আর দুটী পরিবারের কাহারো কাছে অবিদিত রহিল না। প্রমথবাবু যথোচিত প্রতিফল দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু মণি তাঁর পা ধরিয়া অনুরোধ করিল—নীরেনকে ক্ষমা করিবার জন্য। কিন্তু সে যে কাজ করিয়াছে তার কি ক্ষমা আছে? তিনি কর্ত্তব্য খুঁজিয়া পাইলেন না। শেষে স্থির করিলেন তিনি সব ভুলিয়া যাইবেন—তাকে ক্ষমা করিবেন। বিশেষতঃ নীরেনের পিতা—তাঁহার পুরাতন বন্ধু যখন সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন।

প্রমথবাবু যে এমন পাষণ্ড ও মূর্খের হাতে আদরের কন্যা বীণাকে সপে দিতে যাচ্ছিলেন—সে কথা মনে করিতে তাঁহার অন্তঃকরণ ঘৃণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

মণির মহাপ্রাণতা, প্রমথবাবুর চোখের কাছে জগৎটাকে একটু নতুন করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার মনে হইল—মণি আলো, নীরেন আঁধার, মণি স্বর্গ, নীরেন নরক। মণিই বীণার উপযুক্ত পাত্র। তিনি বুঝিতে পারিলেন—কেন বীণা ওরূপ আপত্তি করিয়াছিল। বীণাকে তার হাতেই সপে দেবার সঙ্কল্প করিলেন।

* * * * * *

যথাসময়ে চারিটী সতৃষ্ণ সলজ নেত্র মিলিত হইল; দেবতার আশীর্ব্বাদ তাহাদের মস্তকে ঝরিয়া পড়িল।

গোপাল-দা

[লেখক—শ্রীদেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়, আলিপুরে ট্রেনে চড়িয়া দেখিলাম, প্রায় দশ-বার জন লোক কামরাটি দখল করিয়া বসিয়া আছে। কোন রকমে এককোণে একটু স্থান করিয়া লইয়া বিরক্তিপূর্ণ মুখে বসিলাম। মনে করিয়াছিলাম, বি-ডি-আরের গাড়ীতে বিশেষ ভিড় হইবে না—আরামের সহিত নিদ্রাদেবীর আরাধনা করা চলিবে। কিন্তু মনের আশা মনেই রহিল; সেই জন্য একটু বিরক্তও হইলাম। কিন্তু শীঘ্রই সে বিরক্তির মেঘ কাটিয়া গেল। স্থির হইয়া বসিতেই হঠাৎ চোখে পড়িল সেই আরোহীগণের ঠিক মধ্যস্থলে একটী ৪০।৪৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি বিরক্তি-ব্যঞ্জকমুখে বসিয়া আছে, আর তাহার চতুর্দ্দিকে তাহাকেই ঘিরিয়া প্রায় দশ বার জন লোক সেই কামরার মধ্যে বৃত্তাকারে বসিয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নবীন-যুবক, প্রত্যেকেই মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত—বয়স কাহারও আঠার উনিশের বেশী হইবে না। একটু ভাল করিয়া দেখিতেই দেখা গেল,

যেন প্রত্যেক যুবকের মুখে-মুখে চাপা হাসির ফোয়ারা ছুটিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ৪০।৪৫ বৎসর বয়স্ক সেই মধ্যস্থ ব্যক্তিটীকে যেন একটু ক্রুদ্ধ—একটু বিরক্ত বলিয়া বোধ হইল, তাহার পরিধানে একখানি 'আড়-ময়লা' দেশী-তাঁতের কাপড়, তাও আবার হাঁটুর নীচে নামে নাই; গা'য়ে একটী হাত-কাটা জামা; মাথায় একটা শত-ছিন্ন চাদর জড়ানো; বগলে একটী ছাতা আর পা' খালি। এই সমস্ত দেখিয়া আমার একটু কৌতূহল হইল। আমি তাহাদের মধ্যে একজনকে আমার দিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"মশাই, আপনারা কো'থেকে আস্‌ছেন?" উদ্দিষ্ট-যুবক প্রশ্ন শুনিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিল। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা কি সব্বাই এক 'জায়গা' থেকেই আস্‌চেন্?" যুবক এইবার আমার পাশে বসিয়া পড়িল। বলিল—"আজ্ঞে হাঁ, আমরা সব্বাই 'পলাশী' গিয়াছিলাম আর সেখান থেকে সকলে বাড়ী ফিরে যাচ্চি।" "মাপ্ কর্‌বেন্ মশাই, কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন দেখি। আপনারাই বা এমনভাবে বৃত্তাকারে বসে কেন; আর মাঝখানে ও লোকটীই বা এমনভাবে কেন?—আপনাদের মধ্যে যেন কি একটা রহস্য চল্‌ছে—যদি কোন বাধা না থাকে—"

"কোনই বাধা নেই—তবে আপনাকে বলবারও বিশেষ কিছু নেই। একটু চুপ করে ব'সে থাকুন, এখনি মজা দেখতে পাবেন। আমরা সকলেই একই গ্রামের লোক, "বরযাত্রী" হয়ে গিয়াছিলাম্ "পলাশী"তে বিয়ে দিতে—এখন বাড়ী চলেছি।" "কৈ, আপনাদের মধ্যে 'বর'কে ত দেখতে পাওয়া যাচ্চে না?" "তিনি এ-গাড়ীতে নেই—'ফাষ্ট'-ক্লাসে 'বেটার-হাফ'-(better-half)-সহ বিরাজ কচ্চেন। আমরা মাত্র এখানে বার-জনা আছি।" "আপনারা কোন্ ষ্টেশনে নাম্‌বেন?"

"'বলবনি'—আপনি?" "আমি 'রাজপুরে' নাম্‌ব।" "ওঃ তাহ'লে আপনি আমাদের একটা ষ্টেশন আগে নাম্‌বেন দেখছি—আপনার নামটী কি?"

আমি আমার নাম বলিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহার নাম বিধুভূষণ। মধ্যস্থ সেই ব্যক্তিটীর নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"ওর নাম গোপাল; কিন্তু সকলেই ও'কে 'গোপাল-দা' ব'লে ডাকে।"

বিধুভূষণকে জিজ্ঞাসা করিয়া আরো যাহা-যাহা জানিতে পারিলাম তাহা বলিতেছি। গোপাল-দা জাতিতে তেলী, বাড়ী 'বেলবনিতে,' 'চাষ-বাস'

করিয়া খায়। কিন্তু চাষা হইলে কি হয়, 'গোপাল-দা' সখের মানুষ, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স হতে গেল কিন্তু এখনও সে নিজেকে একজন নব-যুবক বলিয়া মনে করে। প্রথম-পক্ষের স্ত্রী যখন একটী শিশু-পুত্র রাখিয়া সূতিকা গৃহেই নয়ন মুদিল, তখন গোপাল দা প্রথম প্রথম কিছুদিন শোকে পাগল প্রায় হইয়া মাঠে মাঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইত—'লেখাপড়া' জানিলে বোধ হয় দু' চা'র খানা প্রেমের 'কাব্য'ও লিখিয়া ফেলিত!—কিন্তু পরে ছেলেকে 'মানুষ' করিবার লোকের প্রয়োজন বুঝিয়া দ্বিতীয়বার একটী কৃষক যুবতীর পাণিপীড়ন করিয়া ফেলিল! বৃদ্ধ গোপালের দ্বিতীয় পক্ষের এই তরুণী, প্রথমা স্ত্রী পরিত্যক্ত শিশুপুত্রটীকে 'মানুষ' করিতেছিল কি না বলিতে পারি না, তবে এটা ঠিক জানি যে, সেই অবধি 'গোপাল-দা'কে আর মাঠে মাঠে কাঁদিয়া বেড়াইতে কেহ দেখে নাই। সে যাহা হউক, বিবাহ শেষে "পলাশী" হইতে ফিরিবার সময় গোপাল-দা 'কাঁচা গোল্লা' বাজারে কিছু সস্তা বিকাইতেছে দেখিয়া স্বীয় শিশুপুত্রের জন্যই হউক আর—আর অন্য কাহারও জন্যই হউক কিঞ্চিৎ ক্রয় করিয়াছিল। 'ট্রেনে' উঠিয়া অবধি গোপাল দা মিষ্টান্নের 'পুটুলী'টী যদিও "যতনে—অতি গোপনে" রক্ষা করিয়াছিল তথাপি যে সুচতুর যুবকগণ দ্বারা সে পরিবেষ্টিত হইয়াছিল তাহাদের সতর্ক দৃষ্টি হইতে তাহা পরিত্রাণ পায় নাই। 'আলিপুর' হইতে 'বলবনি' যাইতে পনেরটি ষ্টেশন অতিক্রম করিতে হয়; সময় প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। আমি বিধুবাবুর কথা মত 'মজা' দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া রহিলাম; বিধুবাবু তাঁহার নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া উপবেশন করিলেন। গোপাল দা সন্দেশের 'পুটলী'টি লইয়া মাঝখানে বসিয়া এতক্ষণ ঝিমাইতে ছিল, হঠাৎ বিধুবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল—কিরে বিদে, এতক্ষণ ও লোকটির সঙ্গে কি 'ফুস্‌ফাস্' করছিলি বলদেখি?" বিধুবাবু বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন—"এই বুঝলে কি-না গোপাল দা, 'বলবনি'তে পৌঁছুতে অনেকখানি রাত্তির হবে তাই ওর সঙ্গে পরামর্শ কচ্ছিলাম যে আমরা সকলেই একটু ঘুমিয়ে নি—খামকা রাত্তির জাগা বৈত নয়—কি বল" বিধুবাবু এই কথা বলিবামাত্র বাকী যুবক কয়টি অমনি বলিয়া উঠিল—"হাঁ হাঁ, সেই ভাল, আমাদের বড় ঘুম পাচ্চে—আমরা একটু ঘুমোব" এই বলিয়া কেহ ঘন ঘন জৃম্ভন করিতে লাগিলেন, কেহ বা চোখ-কচলাইতে লাগিলেন, কেহ বা হাঁচিতে লাগিলেন, আর কেহ

বা খক্‌-খক্‌ করিয়া কাশিতে আরম্ভ করিলেন। 'ভবি কিন্তু ভুলিল না, গোপাল-দা বলিল—"হাঁ, তাই তোরা সকলে ঘুমো আর আমি জেগে থাকি; 'বলবনি' ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছুলেই সবাইকে জাগিয়ে দেব'খন—সবাই মিলে যদি ঘুমিয়ে পড়ি ত সেটা ভারী খারাপ হবে।" বিধুবাবুও ছাড়িবার লোক নন, তিনি আর এক 'চাল' চালিলেন। আমাকে দেখাইয়া বলিলেন,—"ঐ যে উনি জেগে থাকবেন,—আমাদি'গে উঠিয়ে দেবেন'খন। বিশেষ তুমি বুড়ো সুড়ো মানুষ—তোমার একটু ঘুমোন দরকার।"

বুড়ো বলায় 'গোপাল-দা' বিষম চটিয়া গেল। বলিল,—"হাঁ—হাঁ, নিজে কচি—খোঁকা, 'ঝিনুকে করে দুধ খাচ্চেন'—বি'য়ে দিলে এদ্দিন 'সাড়ে আড়াই পন' ছেলের বাপ হতিস্‌। খুব আক্কেল হয়েছে কিন্তু তোর—তোরা ঘুমুবি আর ও ভদ্রলোক তোদের জন্যে জেগে থাকবে?" এই কথা কয়টী বলিয়া গোপাল-দা মুখে একটা বিতৃষ্ণার ভাব টানিয়া আনিয়া সন্দেশের পুঁটলীটী বক্ষের কাছে টানিয়া আনিল এবং বোধ করি বা যাহার জন্য উহা ক্রয় করিয়াছিল তাহাকেই মুদ্রিতনেত্রে ধ্যান করিতে লাগিল, আর মনে মনে বলিতে লাগিল—'কতক্ষণে হেরিব সে মুখ চন্দ্রমা!'

বিধুবাবু বিরক্তির ভান করিয়া বলিলেন—"তা তোমার যা ভাল লাগে কর, আমরা কিন্তু ঘুমুচ্চি" এই বলিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন; তাঁহার ইঙ্গিত-মত অপরাপর যুবকগণও এ উহার গা'য়ে ঢলিয়া পড়িল। একজন যেন ঘুমে বিভোর হইয়া সজোরে গোপাল-দার বক্ষস্থলে যাইয়া টলিয়া পড়িল; সজোর আঘাতে মিষ্টান্নের পুঁটলীটী স্থানচ্যুত হইয়া 'বেঞ্চি'র নীচে পড়িয়া গেল। গোপাল-দা বক্ষঃস্থলে আঘাত পাওয়ার জন্য না হউক ক্ষণমাত্র মিষ্টান্ন বিরহে উহু উহু করিয়া বলিয়া উঠিল—"যা, হতভাগা ছোঁড়ারা সব নষ্ট কল্লে, সব গেল, সব গেল" এই বলিয়া গোপালদা সত্বর হইয়া পুনরায় বেঞ্চির তলা হইতে ক্ষিপ্র হস্তে পুটলিটী কুড়াইয়া লইল। নিদ্রায় অচেতন সেই যুবক তখন পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছে, অপর সকলে নাসিকা ধ্বনি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আমি কেবল মাত্র এক কোণে জাগিয়া বসিয়া আছি। গোপালদা বলিল,—"হতচ্ছাড়া ছোড়াদের সব বদমাইসী—সব বজ্জাতি—সব্বাই জেগে আছে—কেবল আমার সঙ্গে চালাকী করা হচ্চে!" আমি মনে মনে বলিলাম—"এই উদ্যোগ পর্ব্ব' এখনো অনেক বাকী।"

কেহ একটি কথা পর্য্যন্ত কহিল না। এদিকে ট্রেন আলিপুরের পরবর্ত্তী

খগড়িয়া ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল, মিনিট দুই পরে ট্রেন আবার চলিতে আরম্ভ করিল। মিনিট পনের অতিবাহিত হইল; তথাপি কেহ জাগরিতের কোন লক্ষণ দেখাইল না দেখিয়া গোপালদা মনে করিল বুঝি সত্যই সকলে ঘুমাইয়াছে। আমিও একটু 'চালাকী' করিলাম। বিধুবাবুকে চার পাঁচ বার নাম ধরিয়া ডাকিলাম, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া গোপালদাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলাম,—"তাই ত এরা সকলেই যে ঘুমিয়ে প'ল,—তা গোপাল-দা ত জেগে থাক্‌চ—আমিও একটু ঘুমুই" এই বলিয়া আমিও যুবক-বৃন্দের অনুকরণে চক্ষু-মুদ্রিত করিয়া নাসিকা-ধ্বনি আরম্ভ করিলাম। গোপালদার মনে আর এতটুকুও সন্দেহ রহিল না। সে মনে করিল, ঘুমে সকলেই অচেতন হইয়াছে। তখন সে-ও নিঃশঙ্কচিত্তে সন্দেশের পুঁটলীটী পাশে রাখিয়া জড় সড় হইয়া শুইয়া পড়িল। যতই হোক্‌—বুড়ো মানুষ—গোপাল-দা শুইতে না শুইতে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে বিধু-বাবু আস্তে আস্তে মাথা তুলিয়া ধীর কণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"আপনি কি ঘুমিয়েছেন?" আমি গা-ঝাড়া দিয়া বলিলাম,—"আজ্ঞে হাঁ, আপনাদের মতই" তখন বিধু-বাবু বলিলেন—"ওরে ও শচী জেগে আছিস্ ত?" শচী বলিল—"আজ্ঞে না কর্ত্তা, জেগে আর কই আছি!" বিধু-বাবু আর একজনকে ডাকিলেন,—"হরিপদ, ঘুমিয়েছ নাকি?" "সীতা-রাম" বলিয়া শ্রীমান্ হরিপদও মাথা তুলিলেন। এইরূপে সকলেই একে-একে সহাস্য-মুখে উঠিয়া বসিল। গোপাল-দা তখন ঘুমে অচেতন। বিধু-বাবু ইঙ্গিত করিবা মাত্র পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ব-গুণ সম্পন্ন শচীন্দ্র গোপাল-দার বাহুপাশ হইতে অতি-সন্তর্পণে মিষ্টান্নের পুঁটলীটী বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর দেখিতে দেখিতে গোপাল-দার কত সাধের কাঁচা-গোল্লা কয়টী টপাটপ্ করিয়া হস্তদ্বয়ের সাহায্যে এক অভিনব কৌশলে নাসিকা-নিম্নস্থ-দ্বার-পথে প্রেরণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সমস্ত যুবকগণই কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিয়া দিল। কার্য্য-শেষ হইলে বিধু-বাবুর উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত বুদ্ধি অনুসারে পুঁটলীটী পূর্ব্ব সংগৃহীত প্রস্তর খণ্ডে পূর্ণ করিয়া গোপাল-দার বাহু পাশের মধ্যে কৌশলের সহিত পূর্ব্ববৎ স্থাপিত হইল। বিধু-বাবু বলিলেন। "নে, আবার সবাই ঘুমিয়ে পড়্!"

ট্রেন ততক্ষণে 'খগড়িয়া'র পরবর্ত্তী সোনামুখী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। গার্ড সাহেবের বাঁশীর শব্দে গোপালের নিদ্রা টুটিয়া গেল। সে ধড় মড়

উঠিয়া বসিয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিল—"ওরে—ওবিদে—বিদে—বাড়ী পৌঁছুতে আর কত দেরীরে ?" গোপালদা "বিদে-বিদে" বলিয়া যত চীৎকার করিতে থাকে ওদিকে বিধুভূষণও তত নাসিকা-ধ্বনি করিতে থাকে! গোপাল-দার হাতটা তাহার সন্দেশের পুঁট্‌লীটার উপর পড়িয়া যাওয়ায় সে দেখিল, তাহা অত্যন্ত কঠিন বোধ হইতেছে। তখন সে তাড়াতাড়ি করিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিল। খুলিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। আমি আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না, আমাকে হাসিতে দেখিয়া ক্রমে ক্রমে শচী হরিপদ বিধু-বাবু সকলেই গা' 'টেপাটিপি' করিতে লাগিলেন আর মুখে কাপড় গুঁজিয়া ভিতরে ভিতরে পেটের নাড়ী ছিঁড়তে লাগিলেন!

গোপাল-দা একটু তোত্‌লা ছিল, বিশেষ যখন সে রাগিত, তখন তাহার মুখ হইতে মোটেই কথা বাহির হইতনা। বিধুবাবু আর থাকিতে না পারিয়া চোখ কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—"কি হয়েছে, গোপাল-দা,—বাড়ী পৌঁছুবার জন্য অত তাড়া কেন ?" শচী বলিল—"দ্বিতীয়পক্ষের 'পিত্তিরক্ষিণী'র মূর্ত্তিখানি মনে পড়ে গেছে বোধ হয়!" হরিপদ নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে গোপাল-দা ?" গোপালের চোখ ফাটিয়া তখন আগুণ ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল। সে বলিল—"কি—কি—কিচ্ছু জান না—ভা—ভা—ভাল চাও ত আ—আ—মার স—স—স"। গোপাল-দা "স—স" করিতে করিতে শচী হঠাৎ চটিয়া উঠিল—"ও গোপাল-দা অত চট কেন? আর স—স করই বা কেন ?" তাহা শুনিয়া হরিপদ বলিল—"ও ভাই, গোপাল মামা কি হচ্চে বল দিকি ?"

ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকেই গোপাল-দাকে কেহ "গোপাল খুড়ো", কেহ "গোপাল মামা", কেহ "গোপাল কাকা" ইত্যাদি যাহার যা' ইচ্ছা নামে সম্বোধন করিয়া, যেন কেহ কিছু জানে না, এই ভাব দেখাইয়া নিতান্ত নির্দ্দোষীর ন্যায় ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। গোপাল-দা নিষ্ফল আক্রোশে ভিতরে ভিতরে গুমরিতে লাগিল। একবার দুইহাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—"চু—চু—চুরি, ডা—ডা—ডাকাতি, পু—পু—পুলিশ আ—আছে—জা—জানো ? ভা—ভা—ভা—ভাল চাও ত—" শচী গোপাল-দাকে তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিল—"ভেড়ার মত অত ভ্যা ভ্যা কর্‌চ কেন ?"

গোপাল দা বলিল—"কি আমি ভে—ভে—ভেড়া ?" হরিপদ বলিল—"বালাই, তুমি কেন ভেড়া ভেড়া হ'তে যাবে!" গোপাল অগ্নিদৃষ্টিতে হরিপদর দিকে চাহিয়া রহিল।

বিধুবাবু বলিলেন—"ওরে, সবাই চুপ্ কর—গোপালদার কি হয়েছে শুনি আগে—(গোপালের দিকে ফিরিয়া) কি হয়েছে বলত গোপাল-দা।"

গোপাল বলিল—"মা-মা-মাথা হয়েছে। ভা-ভাল চাওত আমার স-স-স সন্দেশ দা—দা—দাও।"

বিধু বলিল—"কে নিয়েছে তোমার সন্দেশ? তুমি আমাদের নিতে দেখেচ? ঐত একজন ভদ্রলোক রয়েছেন ওঁকে জিজ্ঞেস কর দেখি।" গোপাল বলিল—"স—স—সব সাধু।" চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া শচী বলিল—"হাঁ ভাই, গোপাল খুড়ো, কার জন্তে সন্দেশ কিনেছিলে?" হরিপদ বলিল—"যাও, এখন বাড়ীতে ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!" আর একজন সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিল—"হায়-হায়-হায়, গোপাল-দা বৌদির জন্যে সন্দেশ কটী নিয়ে যাচ্ছিল তা' তোরা সব কটীই খেয়ে ফেল্লি—এখন ও বেচারী বাড়ী যেয়ে বৌদিকে কি বলবে?"

এদিকে ত এইরূপ চলিতে লাগিল, ওদিকে আবার গোপালের আর এক নূতন 'তাড়া' আসিয়া জুটিল। বহুক্ষণ হইতেই সে বোধ হয় বেগ সম্বরণ করিয়া আসিতেছিল কিন্তু এখন আর থাকিতে না পারিয়া কাতর নয়নে আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মশাই, এখানে 'পাইখানা'টা কোথায় আছে আমায় দেখিয়ে দিতে পারেন?" কথা শুনিয়া সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। গোপাল মনে করিয়াছিল, আমার কাছে সহানুভূতি পাইবে কিন্তু আমাকেও প্রাণ খুলিয়া হাসিতে যোগদান করিতে দেখিয়া তাহার সে-আশা মুকুলেই বিনষ্ট হইয়া গেল। আমি বলিলাম—"দেখ গোপাল দা, আমার কাছে বল্লে-বল্লেই কিন্তু আর কারো কাছে যেন ওরকম কথা বলো না—মুস্কিল হবে তা হ'লে। আমার কথায় গোপাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শোকে দুঃখে ক্রোধে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। সমস্ত চেষ্টা সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া গোপাল আর একবার বলিল—"ই—ইংরেজের রা—রা—রাজত্বে এ-এ-ত-ত অ-অ অত্যাচার। চোর ডা-ডাকাত কোথাকার। এখনও ব-ব-বলচি, স-স সন্দেশ দাও—ন-ন-নইলে পু-পু-লি-লি-শে যা-যা-ব।" হরিপদ বলিল—"সেই ভাল, পুলিশের কাছেই

যাও, চল তোমায় রাস্তাটা দেখিয়ে দিই।" এই বলিয়া হরিপদ সেই চলন্ত ট্রেণের দরজা উন্মুক্ত করিয়া গোপালকে হাতে ধরিয়া দরজার কাছে টানিয়া আনিল। অঙ্গুলি বাড়াইয়া বলিল—"যাও পুলিশের কাছে সোজা রাস্তা পড়ে রয়েছে!" আতঙ্কে গোপাল চীৎকার করিয়া দশ পা পিছাইয়া আসিল। বলিয়া উঠিল—খু-খু খুন খু-খু-খুন, ওগো খু-খু-খুন কল্লে গো।" আমার তখন হাসিতে দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিধু বাবু অনেক কষ্টে গোপালকে বুঝাইলেন যে, কেহ তাহাকে 'খু-খু-খুন' করিবে না। গোপাল কিন্তু সকলকে গালি দিতে লাগিল। শচী বলিল—"গোপাল্ দা কৈ তোমার টিকিট দেখি—তা না দেখাতে পাল্লে এর পরের ষ্টেসনে ডবল-ভাড়া দিতে হবে।"

সকলের টিকিটই বিধুভূষণ নিজের কাছে রাখিয়াছিল সুতরাং গোপাল বলিল—"আমার টিকিট বিদের কাছে আছে।" বিধু বাবু চোখ রাঙাইয়া বলিলেন—"আমার কাছে আবার তোমার টিকিট কোথায়? আমি তোমার টিকিট ফিকিট জানি না—পরের ষ্টেশনে টিকিট দেখাতে পার ভালই—না পার ছ'মাস জেল খাটবে'খন। শচী বলিল—"ছ'মাস কি? টিকিট না দেখাতে পাল্লে একবছর জেল হবে।" হরিপদ বলিল—"না, দু'বছর" মিয়াদ এইরূপে বাড়িয়াই চলিল। গোপাল কিন্তু তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সে কিছুতেই ভয় পাইল না। বলিল—"ভ-ভ-ভগবান আ-আছেন; অ-অ-অত পা-পাপ সইবে না।" তাহার চোখ হইতে অবিশ্রান্ত জল পড়িতে লাগিল। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন ছাড়াইয়া ট্রেন হু-হু শব্দে ছুটিয়া চলিল। গোপাল তাহার চক্ষের জলে বসন সিক্ত করিতে লাগিল। বেচারী একবার কাতরতা মাখানো স্বরে বলে,—"আমার সব সন্দেশ কটা তোরা খেয়ে ফেল্লি"—বলিয়া কাঁদিয়া ওঠে। কখনো বা ক্রোধে অধীর হইয়া "পু-পু-পুলিশ" বলিয়া চীৎকার করে, কখনো বা "ভ-ভ-ভগবান আছেন বলে" আর কখনো বা কেবলই কাঁদে। গোপালের কান্না দেখিয়া আমার মনে বড় দুঃখ হইল। আমি বলিলাম—"গোপাল দা, তোমাকে আমি সন্দেশের দাম দিচ্ছি, আবার কিনে নিও—আর কেঁদ না" গোপাল দা কিন্তু কোন ক্রমেই পয়সা লইতে চাহিল না। সে বলিল, তেমন কাঁচা-গোল্লা আর কোথাও মিলিবে না।

তাহার পর ক্রমে ট্রেণ 'রাজপুর' ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। আমি অনেক কষ্টে বিধু বাবু, শচী হরিপদ ইত্যাদি অপরাপর যুবকগণের নিকট

হইতে নিজেকে জোর করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া নামিয়া পড়িলাম। ট্রেন ছাড়িয়া দিল। তাহার পর গোপালদার কি হইল আর জানিতে পারিলাম না। দুঃখিত-চিত্তে বাড়ী আসিলাম। সে আজ অনেক দিনের কথা। বহু কাল গত হইয়াছে, কিন্তু গোপালদার কথা এখনও ভুলি নাই--হয়ত কখনো ভুলিব না। তাহার সে 'কাঁচা-গোল্লা' আর কোথাও মিলিবে না, কখনও ভুলিতে পারিব না। এখন গোপাল দা কেমন আছে জানিতে বড় ইচ্ছা হয় কিন্তু নিরুপায়?—স্বদেশ হইতে আমি যে এখন বহু—বহুদূরে!

বিপ্লব।

(লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবীন ডাক্তার

কলিকাতা হইতে ঔষধপত্র ও ডাক্তারখানার অন্যান্য সুরঞ্জাম আনীত ও ডাক্তারখানা স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যহ দলে দলে রোগীর সমাগম হইতে লাগিল। কিন্তু রোগীর সমাগমের ন্যায় অর্থাগম হইল না। তবে এই উপলক্ষে গ্রামের অনেকেই পরেশের সহিত নূতন নূতন ঘনিষ্ট সম্পর্ক পাতাইয়া লইল। পরেশ নিয়ম করিল, গ্রামে সে ভিজিট লইবে না। ইহার ফলে কারণে অকারণে রোগীর বাটী যাতায়াতে যখন পরেশের আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, তখন সে আপনার ভুল বুঝিতে পারিল। ভুল বুঝিলেও কিন্তু সে নিয়মের অন্যথা করিল না। অত্যধিক পরিশ্রমে যখন নিতান্ত ক্লান্তি ও অবসাদ আসিত, তখন সে ডাক্তারখানার সম্মুখের দেওয়ালে প্রলম্বিত পিতার তৈলচিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সজল দৃষ্টিতে চিত্রের দিকে চাহিয়া থাকিত; চাহিতে চাহিতে অন্তরে এক অব্যক্ত উন্মাদনা অনুভব করিয়া অবসাদগ্রস্ত প্রাণকে নবীন সঞ্জীবনী-শক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিত।

এই অগাধ পরিশ্রমে পরেশের নিজের কোন আপত্তি না থাকিলেও রামুর কিন্তু যথেষ্ট আপত্তি ছিল। শুধু যে পরিশ্রমের উপযুক্ত অর্থাগমের অভাবই রামুর আপত্তির কারণ তাহা নহে, এতটা উপকারের প্রতিফলে অনেকে যখন সুখ্যাতির পরিবর্ত্তে পরেশের অযশ ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না, তখন এই অকৃতজ্ঞ লোকগুলার ব্যবহারে রামু নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিত; তাহার ইচ্ছা হইত, পরেশকে বলিয়া ঔষধের পরিবর্ত্তে শেঁকো বিষ দিয়া এই লোকগুলাকে সদ্য সদ্য যমালয়ে প্রেরণ করে; তাহাতে সংসারে অকৃতজ্ঞতার ভার অনেকটা লঘু হইয়া আসিবে। আবার এই দুর্নামের প্রচারক লোকগুলা যখন বিনামূল্যে ঔষধ প্রাপ্তির আশায় শিশি হাতে ডাক্তার খানায় গিয়া ঝুঁকিয়া বসিত, তখন বিশেষ প্রয়োজনেও রামু ডাক্তার খানার দিকে যাইতে পারিত না।

তা লোকগুলারও বিশেষ দোষ ছিল না; সার্ব্বভৌম ও ঘোষাল মহাশয়ের ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, পরেশ চাটুজ্যে ডাক্তারের মধ্যেই গণ্য নহে। সে বিলাত গিয়াছিল শুধু খানা খাওয়া এবং সাহেবিয়ানা শিক্ষা করিতে; ডাক্তারীর 'ডও' সে জানে না। ইহার প্রমাণ, কোন বিলাতফেরৎ ডাক্তারই কোম্পানীর মোটা মাহিনার চাকরী ছাড়িয়া এমন একটা পল্লিগ্রামে আসিয়া বসে এবং এরূপ বিনা ভিজিটে দিনে শতবার রোগীর বাটীতে যাতায়াত করে না, বা এক ঘণ্টাকাল রোগীর পাশে বসিয়া তাহার ভাতের হাঁড়ির পর্য্যন্ত সংবাদ লইতে চাহে না। তাহাদের সময়ের মূল্য কত, একবার রোগীর নাড়ী টিপিলে একখানি নোট চাই। উহার ডাক্তারি সম্পূর্ণ মিথ্যা, উহার অপেক্ষা হীরু ডাক্তার লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ। তবে যে পরেশ এখন বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেছে, তাহার মধ্যে উহার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। "শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ, সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।" ও এখন হাজার খুন করিয়া ডাক্তার হইতে চায়; ইত্যাদি।

কেহ যদি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিত যে, পরেশ ভাল ডাক্তার না, তাহার ঔষধে রোগী আরোগ্য হইতেছে কেন, তাহা হইলে সার্ব্বভৌম মহাশয় সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইয়া বলিতেন "সে কি জান, রোগের শেষ আর ঋণের শেষ। রোগের ভোগকাল শেষ হ'য়ে এলে দূর্ব্বার [illegible] ভাল হয়। এমন কি হর্ত্তুকী ভিজান জল খেয়েও রোগী ভাল হয়েছে। [illegible] পয়সায় দামী ওষুধ দেয় নাকি? রাধেকৃষ্ণ। বস্তা বস্তা [illegible] এনে [illegible] রাখছে।

তাই ভিজিয়ে রাখে, আর সেই জল শিশি ভরে দেয়। হরিতকীর গুণ তো জান না, 'হরিতকীং ভুঙ্‌ক্ষ রাজন্‌' বুঝলে। রোগ একটু কঠিন হ'লে বিলাতী মদ দেয়। দেখতে পাওনা, ওর ওষুধে কেমন একটা বিশ্রী ঝাঁজ। মদ না হ'লে ওষুধের এত ঝাঁজ হয়? আমাদের হীরু ডাক্তারের ওষুধে এত ঝাঁজ আছে?"

এ কথাটা লোকে অস্বীকার করিতে পারিল না। তবে তাহাদের ধারণা ছিল, হীরু ডাক্তারের ঔষধ বহু কালের পচা বলিয়াই তাহাতে ঝাঁজ থাকে না। কিন্তু এখন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কথায় তাহাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইল, এবং ঔষধ নামে বিলাতী মদ খাওয়াইয়া পরেশ যে সকলের জাতি নাশ করিতেছে ইহা বিশ্বাস করিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে পরেশের ডাক্তারী বিদ্যায় অজ্ঞতা সম্বন্ধেও কাহারও সন্দেহ রহিল না; তাহারা নানারূপে আপনাদের এই সন্দিগ্ধ ভাব প্রচার করিয়া ডাক্তারিতে পরেশের অনভিজ্ঞতা প্রচার করিতে থাকিল।

তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরেশের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেও তাহার সাহায্য গ্রহণে কেহই বিরত হইল না। অধিক কি, এমন দিন যাইত না, যে দিন প্রভাতে সার্ব্বভৌম মহাশয় সর্ব্বাগ্রে আসিয়া ডাক্তার খানায় চাপিয়া না বসিতেন, এবং পরেশের ও তদীয় ঔষধের গুণ বর্ণনা করিয়া পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী, স্ত্রী কন্যা প্রভৃতির জন্য শিশি ভরিয়া ঔষধ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন না করিতেন। তাঁহাকে ঔষধ লইয়া যাইতে দেখিয়া পথে কোন স্পষ্টভাষী ব্যক্তি যদি পরেশের এই দূষিত ঔষধ গ্রহণের জন্য তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিত, তবে সার্ব্বভৌম বেশ হাসিতে হাসিতেই কৈফিয়ৎ দিতেন, "কি জান, ঠগ্‌ বাছতে গাঁ উজোড়।" গ্রামসুদ্ধ সকলেই যখন খাচ্চে, তখন আমি একাই না খেয়ে, কি করি বল। আর আমাদের শাস্ত্রেও তো আছে —'ঔষধার্থে সুরাপানং।' বাড়ীতে নিত্যি অসুখ লেগেই আছে। হীরু ডাক্তারের ওষুধ ভাল বটে, কিন্তু বেটা চামার; একশিশি ওষুধ দিলেই আট গণ্ডা পয়সা চেয়ে বসবে। গরীব ব্রাহ্মণ, রোজ এত পয়সা পাই কোথায় বল। বুঝেছ কি না, যে দিন কাল পড়েছে।"

ইহাতে রায়ু কিন্তু ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। সে একদিন স্পষ্ট করিয়া পরেশকে জানাইয়া দিল যে, কর্ত্তার পয়সাগুলা এরূপে জলে ফেলিয়া দেওয়া সে দেখিতে পারিবে না। যাহাদের সংস্থান নাই, যাহারা গরীব,

তাহারা বিনা মূল্যে ঔষধ লইয়া যাউক, কিন্তু গ্রামশুদ্ধ লোক যে নিত্য এই কাণ্ড করিবে, ইহা সম্পূর্ণ অসহ্য।

পরেশ তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, আপাতত ইহা বিতরণ ব্যাপার হইলেও ইহার ভিতর গূঢ় অভিসন্ধি আছে। বিনা পয়সায় ঔষধ বিলাইয়া পশার করিয়া লওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। পশার হইয়া গেলে সে এই পয়সা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিবে, তখন এক এক দাগ ঔষধের দাম এক একটী টাকা দিতে হইবে। প্রত্যেক বড় ডাক্তারকেই প্রথমে এইরূপ বিতরণ কার্য্য করিতে হয়।

রামু ইহাতে কতকটা আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু পরেশের কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না। সে ছোড়দির নিকট এ সম্বন্ধে কয়েকবার অভিযোগ করিল, কিন্তু তারাসুন্দরী ইহাতে তেমন কাণ দিলেন না। তিনি তখন বধূকে গৃহে আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তারাসুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, "বৌমাকে আনবি না রে পরেশ?"

মৃদু হাসিয়া পরেশ উত্তর করিল, "তা তুমি বললেই আনতে যাই পিসীমা।"

তারাসুন্দরী একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তুই আনতে যাবি কেন বাপ, আমি তার ব্যবস্থা কচ্চি।"

তারাসুন্দরী সেই দিনই রামুকে বধূর পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। পিত্রালয় অধিক দূরে নহে, নেউকী পাড়ার পাশেই সেনপুরে। উভয় গ্রামের মধ্যে ব্যবধান অত্যল্প; এক গ্রাম বলিলেই হয়। রামুকে পাঠাইয়া দিয়া তারাসুন্দরী বধূর আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বধূ আসিল না, রামু একা ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিল। বধূর খুড়া গোবিন্দ আকুলী বলিয়া দিয়াছিল, "পাঁচ জনের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ না ক'রে বিলাত ফেরতের ঘরে মেয়ে পাঠাতে পারি না।"

শুনিয়া তারাসুন্দরী গোবিন্দ আকুলীকে গালাগালি করিতে লাগিলেন, এবং পরেশকে বুঝাইয়া দিলেন, এই বুড়া গোবিন্দ আকুলীর মত বদ লোক ভূভারতে আর নাই। কিন্তু তিনিও করালী চাটুজ্যের ভগ্নী। বুড়া যদি এই মাসের মধ্যে মেয়ে না পাঠায়, তবে তিনি আগামী মাসেই পরেশের অন্যত্র বিবাহ দিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন।

পরেশ শুনিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে পরে যা হয় করবে পিসীমা, এখন আসছে সোমবারে বাবার কাজটা যাতে হয় তার চেষ্টা দেখ।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকথা।

পিতা জীবিত থাকিতেই পরেশের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, এবং সে বিবাহটাও অতর্কিতরূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল। পরেশ তখন মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িত। গ্রীষ্মাবকাশে সে বাড়ী আসিয়াছিল। এই সময়ে নেউকী পাড়ার পার্শ্ববর্ত্তী সেকপুর গ্রামে শ্রীপতি আকুলীর কন্যা অনুপমার বিবাহের উদ্যোগ হয়। দুই তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। মেয়ে দেখিতে তেমন সুন্দরী নয় বলিয়া বরের বাপ বেশ চড়া দরই হাঁকিয়াছিলেন, শ্রীপতি আকুলী অগত্যা সেই চড়া দরই শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। নেউকী পাড়া ও সেকপুর এক লাগাও গ্রাম বলিয়া নেউকী পাড়ার অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ এই বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। করালীবাবুও বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

যথা সময়ে বরযাত্রী সমভিব্যাহারে বর আসিয়া পৌঁছিল; কন্যা-পক্ষীয়েরা তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। কিন্তু হঠাৎ বরযাত্রীদের জল খাওয়া লইয়া একটা গোলযোগ বাধিল। দুই তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসায় অনেকেরই জল খাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। কন্যা পক্ষীয়েরা ঘড়ায় জল ও হাঁড়িতে মিষ্টান্ন আনিয়া বাহিরেই তাঁহাদের জলযোগের উদ্যোগ করিয়া দিল। ইহাতে বরযাত্রীরা কিন্তু আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞানে কোলাহল করিয়া উঠিলেন, এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ কন্যা কর্ত্তার বাড়ী পরিত্যাগে উদ্যত হইলেন। শ্রীপতি আকুলীর ভাই গোবিন্দ আকুলী একটু চড়া মেজাজের লোক, তিনি রাগিয়া বরযাত্রীদের দুই কথা শুনাইয়া দিলেন। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। বরযাত্রীরা একযোগে সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

বরযাত্রীদের অপমানে বরের বাপও আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিলেন এবং আত্মীয় স্বজন সকলকে ছাড়িয়া, তিনি এরূপ অভদ্র গৃহে পুত্রের বিবাহ দিতে রাজি হইলেন না। তিনিও বরের হাত ধরিয়া উঠাইয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। কন্যাপক্ষীয়েরা প্রমাদ গনিল। তাহারা বরের বাপের হাত ধরিয়া মিনতির সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। বরের বাপ কিন্তু ক্ষমা করিলেন না; তবে কাকুতি মিনতিতে বাধ্য হইয়া শেষে তিনি মত

প্রকাশ করিলেন যে, বরপণ সাতশত টাকা স্থিরীকৃত হইয়াছিল ; যদি দণ্ড স্বরূপ আর সাতশত টাকা দেওয়া হয়, এবং বরযাত্রীদের প্রত্যেকের হাতে পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া আনা হয়, তাহা হইলে তিনি এ স্থলে পুত্রের বিবাহ দিতে পারেন।

শ্রীপতি আকুলী ঘর-বাড়ী বন্ধক দিয়া সাতশত টাকার যোগাড় করিয়াছিলেন, সুতরাং এই রাত্রে পুনরায় একশত টাকার যোগাড়ও সম্পূর্ণ অসম্ভব। কন্যাপক্ষীয়েরা তখন বরের বাপকে অনেক বুঝাইল, এবং জোর করিয়া বিবাহ দিবার ভয় দেখাইল। বরের বাপ কিন্তু দমিলেন না, তিনি ইংরাজ আইনের দোহাই দিয়া পুত্রের হাত ধরিয়া সানন্দ চিত্তে প্রস্থান করিলেন। শ্রীপতি আকুলী আছাড় খাইয়া পড়িলেন, বাড়ীর ভিতর হইতে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল।

কন্যাযাত্রীরা তখন ব্রাহ্মণের জাতি-ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় কাতরতা প্রকাশ করিতে করিতে একে একে সরিয়া পড়িলেন। যাইতে যাইতে হরিধন ঘোষাল সক্ষোভে বলিলেন, "আহা, বুড়া বামুনের কি কষ্ট! কি বলবো, আমার শরীর এখন বিয়ে করবার মত নাই, নইলে বামুনকে এত কাঁদতে হয় ?"

ভুবন গাঙ্গুলী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আহা উচিত তো তাই। ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করার চাইতে কি ধর্ম্ম আছে। আমার ছোট ছেলেটার বিবাহের কথাবার্ত্তা যে ঠিক হয়ে গিয়েছে। এখানে সাতশো, সেখানে না হয় বারশো। তা টাকায় কি আসে যায়, তবে কথার নড় চড় তো করতে পারি না।"

এইরূপে অনেকেই পরোপকার প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে দিতে অন্তর্হিত হইলেন, থাকিলেন শুধু করালীবাবু। ব্রাহ্মণের ক্রন্দনে তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণকে তুলিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, আপনি কন্যা সম্প্রদানের উদ্যোগ করুন।"

আকুলী মহাশয় বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। সেই সঙ্গে বিপত্নীক করালীবাবু নিজেই বরের আসন গ্রহণ করিবেন কিনা এ শঙ্কাটুকুও তাঁহার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। কিন্তু তখন আর উপায় কি, কোনরূপে জাতিরক্ষা হইলে হয়। নতুবা রজনী প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমাজচ্যুতি যে অবশ্যম্ভাবী। আকুলী মহাশয় বিষণ্ণ চিত্তে সম্প্রদানের উদ্যোগ করিলেন।"

করালীবাবু যে ইতিমধ্যে পরেশকে আনিতে লোক পাঠাইয়া ছিলেন তাহা কেহ জানিত না। সুতরাং কিছুকাল পরে করালীবাবু যখন পুত্রের হাত ধরিয়া ঘরের আসনে বসাইয়া দিলেন, তখন সকলের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল; উপস্থিত সকলেই আনন্দ কোলাহল করিয়া উঠিল। শুভ মঙ্গল শঙ্খ আবার জোরে জোরে বাজিতে লাগিল।

বিবাহান্তে আকুলী মহাশয় পণের সাতশত টাকা আনিয়া করালী বাবুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন করালী বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমার টাকার অভাব নাই বেহাই মশাই, অভাব ছিল শুধু একটী মায়ের; বিধাতার কৃপায় তা পেয়েছি।"

আকুলী মহাশয় আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে করালী বাবুকে আলিঙ্গন করিলেন। গোবিন্দ আকুলী অন্তরালে মত প্রকাশ করিলেন, "মাতালস্য নানা গতিঃ।"

বিবাহ অতর্কিতরূপে হইয়া গেল, কিন্তু করালীবাবু বধূকে কাছে রাখিয়া মাতৃত্বের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। বিবাহের সময় তিন দিন শ্বশুর বাড়ীতে থাকিয়া অনুপমা সেই যে পিত্রালয়ে গেল, তারপর আর তাহার শ্বশুর বাড়ী আসা ঘটিল না।

বিবাহের কয়েক মাস পরে সেনপুরের যদু হাজরার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সামাজিক সম্মান লইয়া একটা গোলযোগ বাধিল। শ্রীপতি আকুলি প্রভৃতি কয়েক জন সমাজপতি মিলিত হইয়া যদু হাজরাকে বর্জ্জন করিলেন, এবং তাহার মাতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড করিবার উদ্যোগে থাকিলেন। যদু হাজরা আসিয়া করালীবাবুর কাছে কাঁদিয়া পড়িল। করালীবাবু তাহার জন্য বৈবাহিককে অনেক অনুরোধ করিলেন। আকুলী মহাশয় কিন্তু বৈবাহিকের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তিনি স্পষ্ট কথায় বুঝাইয়া দিলেন যে স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু আসিয়া অনুরোধ করিলেও তিনি আপনার জেদ ছাড়িবেন না।

বৈবাহিকের ব্যবহারে করালীবাবু আপনাকে যেমন অপমানিত জ্ঞান করিলেন, তেমনই ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি আপনার অনুগত ও বাধ্য লোক জন লইয়া যদু হাজরার মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া দিলেন।

পরস্পর প্রকাশ্যে ক্রোধ প্রকাশ না করিলেও এই উপলক্ষে উভয় বৈবাহিকের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সঞ্চার হইল, তাহার ফলে অনুপমার আর শ্বশুর বাড়ীতে যাতায়াত ঘটিল না। করালীবাবু বধূকে আনিবার কোন

চেষ্টাই করিলেন না। পুত্র তখন পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত, সুতরাং বধূকে লইয়া আসিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না।

আধুনিক প্রথানুসারে এরূপ স্থলে অনেক পরেশই পিতার অজ্ঞাতে বিবাহিতা পত্নীর সহিত প্রণয়লিপি ব্যবহার দ্বারা অদম্য প্রেম-পিপাসার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে থাকে, অনেকে আবার গোপনে রজনীযোগে শ্বশুরগৃহে আতিথ্য স্বীকার পূর্ব্বক আকুল বাসনায় পরিতৃপ্তিকে দোষাবহ বলিয়া বিবেচনা করে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ করালীবাবুর ছেলে পরেশনাথ তখন অস্ত্র-বিদ্যা ও ভেষজতত্ত্ব লইয়া এমনই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে প্রেমের কথাটা তাহার মনোমধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও জাগিয়া উঠিবার অবসর পাইল না। পঞ্চশরের অব্যর্থ সায়কসমূহ মেডিকেল কলেজের প্রস্তর প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

তারপর শ্রীপতি আকুলী স্বর্গারোহণ করিলেন; পরেশ বিলাত যাত্রা করিল; করালীবাবু মারা গেলেন। অনুপমা পিত্রালয়েই রহিল। শ্বশুরের মৃত্যুতে সে দশ দিনে নখ কাটিয়া স্নান করিয়া শুদ্ধ হইল। একাদশ দিবসে খুড়া গোবিন্দ আকুলী তাহাকে দিয়া একটা ভোজ্যোৎসর্গ করাইয়া দিলেন।

পরেশের বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ শ্রবণে তারাসুন্দরীর বধূকে আনিবার ইচ্ছা হইলেও পূর্ব্বাপর ঘটনা স্মরণে সাহস করিলেন না। ভাবিলেন, "কাজ নাই, পরেশ আসুক। তারপর যাহা ভাল হয় করা যাইবে। লোকের কথাই যদি সত্য হয়; পরেশ যদি সত্যই মেম বিবাহ করিয়া আইসে, তাহা হইলে বধূকে বৃথা আনিয়া ফল কি।"

তারপর পরেশ যখন কোন ইংরাজ মহিলাকে সঙ্গিনী না করিয়া একাই ফিরিয়া আসিল, তখন বধূকে ঘরে আনিয়া ছেলের সঙ্গিনী করিয়া দিবার জন্য তারাসুন্দরী ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বুড়া গোবিন্দ আকুলী যে তাঁহার এই ব্যগ্রভাব সম্পূর্ণ নৈরাশ্যে পরিণত করিয়া দিবে ইহা তিনি একবারও ভাবেন নাই। তারাসুন্দরী প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আগে দাদার কাজটা চুকে যাক্, তারপর যদি পরেশের বিয়ে না দিই, তবে আমি করালী চাটুজ্যের বোনই নই।"

তারাসুন্দরী প্রতিজ্ঞা করিলেন বটে, কিন্তু ভ্রাতার বৃষোৎসর্গের ব্যাপার লইয়া এত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, পরেশের বিবাহের কোন চেষ্টাই করিতে পারিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সাক্ষাতে।

"বাড়ীতে কে আছেন?"

অনুপমা রন্ধনশালায় ছিল; তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া উত্তর দিল, "কে গা?"

কিন্তু সদর দরজার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে এমনই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল যে, কি করিবে, কোথায় লুকাইবে, খুঁজিয়া পাইল না। তাহার গাত্রবস্ত্র অসংযত, মস্তক সম্পূর্ণ অনাবৃত ছিল; এমনই অবস্থায় সে স্বামীকে সদর দরজার উপর দণ্ডায়মান দেখিয়া লজ্জায় সম্ভ্রমে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল; দুইটা হাতই সকড়ি, মাথার কাপড় টানিয়া দিবার উপায় নাই, ছুটিয়াও পলাইতে পারে না। পরেশ তাহার এই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব এবং বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া মৃদুহাস্যের সহিত একটু সরিয়া দাঁড়াইল। অনুপমা দ্রুতপদে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল, এবং তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া গায়ে মাথায় কাপড় দিল। বিবাহের পর স্বামীর সহিত এই প্রথম সাক্ষাৎ; তাহাও অল্প দিনের কথা নয়, প্রায় পাঁচ বৎসর কালের ব্যবধান। অনুপমার বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল।

পরেশ আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল, এবং ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়া মশায় বাড়ীতে আছেন?"

অনুপমা দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া নখ দিয়া দেওয়াল খুটিতে লাগিল। উত্তরের প্রতীক্ষায় পরেশ রৌদ্রতপ্ত উঠানের মধ্যে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনুপমা সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত করিয়া রন্ধনশালা হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইল, এবং অনতিবিলম্বে সপ্তবর্ষীয় খুল্লতাতপুত্র রঘুকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। পরেশ বুঝিতে পারিল, অতঃপর এই শিখণ্ডীকে মধ্যে রাখিয়াই বাক্যচালনা হইবে। বুঝিয়া সে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিল, "খুড়ো মশায় বাড়ীতে আছেন?"

রঘুকে লক্ষ্য করিয়া দরজার আড়াল হইতে নাতি মৃদুস্বরে অনুপমা বলিল, "বল্ না রঘু, তিনি বাড়ী নাই।"

রঘুকে কিন্তু উত্তরের পুনরাবৃত্তি করিতে হইল না; তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই পরেশ পুনরায় প্রশ্ন করিল, "ফিরবেন কখন্?"

অনুপমা পূর্ব্ববৎ রঘুর মারফৎ উত্তর দিল, "বল্, এবেলা বোধ হয় ফিরবেন না।"

রঘু বলিল, "এবেলা—"

তাহাকে সম্পূর্ণ বলিবার অবসর না দিয়াই পরেশ বলিল, "আচ্ছা, তিনি এলে বলবে, পরশু বাবার শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ ভোজন, যাতে কাজ উদ্ধার হয়, খুড়ো মশায়কে দাঁড়িয়ে তাই করতে হবে। আমার তো অন্য অভিভাবক নাই!"

অনুপমা দাঁড়াইয়া দেওয়ালে আঁক কাটিতে লাগিল, পরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা অনুপমার মনে হইল, লোকটা উঠানে রোদে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বসিবার আসন পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। সে তাড়াতাড়ি একখানা কম্বল আসন লইয়া রঘুর হাতে দিয়া বলিল, "ও ঘরের দাওয়ায় আসনটা পেতে দিয়ে আয়।"

পরেশ বলিল, "আসন দিতে হবে না, আমার বসবার সময় নাই। এখনও অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে।"

রঘু আসন হাতে দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ বলিল, "খুড়ো মশাই কাল সকালেই যেন একবার যান। আর পিসিমা বলে দিয়েছেন—"

একটু থামিয়া পরেশ বলিল, "পিসীমা ব'লে দিয়েছেন, অন্ততঃ দু'টা দিনের জন্যও খুড়ীমাকে সঙ্গে নিয়ে যদি তুমি যাও তা হ'লে বড় ভাল হয়। পিসীমা একা।"

অনুপমা নীরবে রঘুর মাথার চুলে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিল। পরেশ বলিল, "কর্ম্ম উপলক্ষে গাঁয়ের অনেক মেয়ে পুরুষতো আসবে, সুতরাং এসময়ে গেলে বোধ হয় দোষ হবে না। কাজকর্ম্ম চুকে গেলেই চলে আসতে পারবে।"

অনুপমা নীরবে তীব্র ভ্রুকুটী করিল। পরেশ বলিল, "তা হ'লে আজ সন্ধ্যার সময় রামু পাল্কী নিয়ে আসবে।"

অনুপমা ঈষদুচ্চ স্বরে বলিল, "বল্ রঘু, কাকা বাড়ী এলে জিজ্ঞাসা করবো।"

"আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করে রেখো। তা হ'লে সন্ধ্যার সময় রামু এসে জেনে যাবে।"

পরেশ প্রস্থানোদ্যত হইল। অনুপমা রঘুর গা ঠেলিয়া বলিল, "জিজ্ঞাসা কর না রঘু, খাওয়া হয়েছে?"

পরেশ ফিরিয়া রন্ধনশালার দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিল, "এখনো হয় নি, এ বেলা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এখনো অনেক ঘর নিমন্ত্রণ বাকি।"

দরজার ফাঁক দিয়া অনুপমা স্বামীর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। পরেশও সেই দিকে চাহিয়াছিল, সুতরাং তাহার দৃষ্টিতে দৃষ্টি সম্মিলিত হইবা-মাত্র অনুপমা তাড়াতাড়ি একটু সরিয়া দাঁড়াইল। মৃদু হাসিয়া পরেশ বলিল "এমন মধ্যাহ্নে আতিথ্য স্বীকার করতে পারলে মন্দ হতো না, কিন্তু তার উপায় নাই। আমার এখনো প্রায়শ্চিত্ত করা হয় নি। সুতরাং আতিথ্য স্বীকারটা আমার পক্ষে এখন খুব দরকারী হ'লেও গৃহস্থকে বিপন্ন করা আমার মতে সঙ্গত হয় না।"

পরেশ ধীরে ধীরে বাটীর বাহির হইয়া গেল। অনুপমা দরজাটা চাপিয়া ধরিয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রঘু তাহার রক্তহীন মুখখানার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল. "ও কে দিদি?"

অনুপমা সদর দরজার উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উদাস গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল, "ডাক্তার।"

বিবাহের পর তিনদিন মাত্র স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ। তারপর দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের ব্যবধান। এই ব্যবধানে স্বামীর চেহারাটাও যেন বিস্মৃতির আবরণে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। শুধু স্বামী নয়, স্বামিগৃহের সহিতও কোন সম্বন্ধ ছিল না। লোকের মুখে অনুপমা শুনিতে পাইত, তাহার স্বামী লেখা-পড়া শিখিয়া খুব বড়লোক হইয়াছে। কিন্তু সেই বড় লোকটী যে কিরূপ, তাহার গৃহে বাস করাটা কেমন সুখকর, ইহা যে অনেক সময় ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিত না।

তারপর অনুপমা যখন শুনিল, স্বামী বিলাত গিয়াছে, সেখান হইতে সাহেব সাজিয়া ফিরিয়া আসিবে, তখন স্বামীর কথা মনে হইলেই তাহার যেন কেমন ভয় হইত। সমবয়স্কারা বিদ্রূপ করিয়া বলিত, "কর্তা সাহেব সেজে আসছে, তুই বিবি সাজ।"

ভ্রূকুটী করিয়া অনুপমা বলিত, "খেংরা মারি আমি বিবির মুখে।"

সঙ্গিনীরা হাসিয়া বলিত, "খেংরা মাত্তে হবে না লো, খেংরা নিয়ে বিবি সতীনের ঘর সাফ করতে হবে।"

অনুপমা রাগিয়া যাহা মুখে আসিত, তাহাই বলিয়া বিবির বিরুদ্ধে আপনার মনের জ্বালা মিটাইয়া লইত।

কখন বা কোন প্রতিবাসিনী খুড়িমার কাছে বসিয়া অনুপমার উপর সহানুভূতির প্রবল উত্তেজনায় সক্ষোভে বলিতে থাকিতেন, "আহা, এমন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মত মেয়ে; কিন্তু জামায়ের কি আক্কেল মা, এমন লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে শাঁকচুন্নীকে ঘরে আনবে! শাঁকচুন্নী নয় তো আর কি বলবো মা; সেবারে গঙ্গাস্নানে গিয়ে দেখেছি, ঠিক শাঁকচুন্নী। গায়ে প্যাঁজ রশুনের কি গন্ধ, পেটের নাড়ী উঠে যায়। তাকে নিয়ে কি করে ঘর করবে মা?"

অনুপমার ইচ্ছা হইত, সেই সহানুভূতিশালিনী প্রতিবাশিনীর মাথাটা নখে ছিঁড়িয়া ফেলে।

এইরূপ পাঁচমুখে পাঁচ কথা শুনিতে শুনিতে অনুপমার চিত্তটা স্বামীর সম্বন্ধে এমনই বিরূপ হইয়া উঠিল যে, স্বামীকে সে একটা ভয়াবহ জীব ব্যতীত আর কিছুই ভাবিতে পারিত না।

তারপর অনুপমা হঠাৎ যেদিন শুনিল, স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন এই ভয়াবহ জীবটাকে একবার দেখিবার জন্য আগ্রহ জন্মিলেও সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীতিপূর্ণ চিন্তা আসিয়া তাহার এই আগ্রহটুকু ম্লান করিয়া দিতে লাগিল। এই সাহেব স্বামীর সম্মুখে সে কিরূপে দাঁড়াইবে, কিরূপে মুখ তুলিয়া তাহার সহিত কথা কহিবে, ইহাই অনুপমার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং রামু লইতে আসিলে খুড়া যে দিন কড়া কড়া কথা বলিয়া রামুকে ফিরাইয়া দিল, সেদিন মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হইলেও অনুপমা যেন আপাততঃ একটা দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

এমনই সময়ে পরেশ যখন নিজে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন অনুপমার মনের ভিতর এমনই একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল যে, তাহার এত দিনের কল্পনা, এতদিনের বিরুদ্ধ ভাব এক মুহূর্ত্তে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে পরিণত হইয়া আসিল। তাহার সমগ্র অন্তঃকরণ সকল ভীতি, সকল ঘৃণা ত্যাগ করিয়া স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়িবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল। সে পুলকাঙ্কিত দেহে স্তব্ধভাবে দরজা চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খুড়ি মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"কে এসেছিল অনি? জামাই নাকি?"

অনুপমা সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হুঁ।"

খুড়ীমা একটু বিস্মিতভাবে বলিলেন, "তবে যে জামাই সায়েব হ'য়েছে?"

অনুপমা ধরাগলায় বলিল,—"কি জানি।" (ক্রমশঃ)

ধাত্রী

(লেখক—শ্রীধরণীধর ঘোষাল।)

ছেলে বেলা হ'তে শোকে, দুঃখে, অপমানে নিরাশায় প্রাণ আমার এমনি ভেঙ্গে পড়েছিল যে, আজ ২৮ বছর বয়সে, যৌবনের পূর্ণ জোয়ারের মাঝেও এ দেহটার দাম আমার কাছে মোটেই ছিল না,—একটা ঢেপ্পার চেয়েও না। সংসারে অনেক দেখেছি, শুনেছি, অনেক জ্ঞান, অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, কিন্তু কি হবে সে সব,—যদি না তাদের কোন কাজে লাগাতে পারলাম। অনেক ঠেকেছি—শিখেছি; কিন্তু তোমাদের মত আমার ত কেউ নেই—মা, বাপ, ভাই, বোন, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র—কেউ নেই যে, সে সব দুঃখের কথা বলে এক ফোঁটা সান্ত্বনার জল, কি একটা সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাস পাব? 'আহা' বলবার লোক জগতে আমার কেউ,—কেউ নেই।

মা বাপ হারিয়ে, তিন বছরের সময় মামার বাড়ীতে ঢুকেছিলুম,—১৮ বছরে বেরিয়ে আসি! কি, কষ্টে, কি সুখে—সে দিনগুলো গেছে! মামার ছেলে মানুষ ক'রে, গরুবাছুরের খড় কেটে, গোয়াল পরিষ্কার ক'রে, ঠাকুর পূজো ক'রে, মামীর তর্জ্জন গর্জ্জন আর মার খেয়ে একরকম সুখে, দুঃখে সে ১৫টা বছর কেটে গিয়েছিল। সুখে বইকি! ভবিষ্যতে সুখের রঙিন ছবি নিয়ে কুহকিনী আশা তখন যে কাণে কাণে কত কথাই বলতো! নিরাশার এমন বীভৎস নগ্ন মূর্ত্তি তখনও দেখি নি! জানিনাতো তখন যে, সে ১৫ বছরের দুঃখকে উপহাস ক'রে এমন সারাজীবনব্যাপী দুঃখ, উদ্যত খাঁড়ার মত মাথার উপর ঝুলছে! বুঝলে সে কষ্টের দিনগুলোকেও সুখের ক'রে নিতে পারতাম। তখন মনে হতো পরের ঘরে পরের দাসত্ব করার চেয়ে কষ্ট বুঝি জগতে আর নেই। কিন্তু আজতো একথা আর গোপন নেই যে, নিঃসঙ্গ মুক্ত জীবনে, ক্ষত বিক্ষত অন্তঃকরণের অসহ্য জ্বালার দুর্ব্বিসহ বেদনায় দেশে বিদেশে ছুটোছুটি করে বেড়ানোর চেয়ে সেই গৃহস্থ গৃহবন্ধনের শারীরিক কষ্টের দিনগুলো কত সুখের।

মামাতো ভাই হারুর বই লুকিয়ে লুকিয়ে প'ড়ে, এণ্ট্রান্স ক্লাসের পড়া

শেষ করলাম। কিন্তু আমি গরু বাছুর আর সংসারের খুটিনাটি নিয়েই থাকতাম, স্কুলের বেঞ্চেতে কোনদিন ব'সে জীবনের সাধতো মেটাতে পাইনি, তাই হারু পাশ করলে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীটা কেমন তা দেখতেও পেলাম না।

হারুর বৌভাতের ভাতরান্নার ভার পড়ল আমার উপর। এমনি খাটুনির কাজ চিরকালই আমার অভ্যস্ত,এ আজ কিছু নূতন নয়! বোশেখের খর রোদে উঠানে দাঁড়িয়ে ভাত রাঁধছি একা! ভেতরে কতকি হচ্ছিল, আমার তাতে কি? ৮।১০ হাঁড়ি ভাত নেমেছে, আরো দশ বার হাঁড়ি নামবে, বৌয়ের সঙ্গে হারু দু'হাজার টাকার পুটলি এনেছিল কিনা,—তাই অনেককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। গেল রাতে শরীরটা ভাল ছিল না,—খাইনি কিছু! তার উপর এই রোদে পরিশ্রম,—দেহটা এলিয়ে পড়েছিল। তবু ভয়ে ভয়ে কাজ করছি, নইলে খেতে পাব না। এক হাঁড়ি ভাত নামাচ্ছি—টগবগ ক'রে ভাত ফুটতে ফুটতে একঝলক গরম জল ডান হাতের উপর পড়ে গেল। যন্ত্রণায় হাঁড়িটা ছেড়ে দিতেই, সেই গরম ভাতের হাঁড়িটা আমার দু'পায়ের উপর পড়ে, ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল! চীৎকারে বাড়ী কাঁপিয়ে, আমি লাফাতে লাগলাম। বাড়ী হ'তে মামারা সব ছুটে এলো। ভাতের হাঁড়ী ভাঙ্গা দেখে মামী গালাগাল দিতে দিতে, নিজের মুখ চাপড়াতে লাগলেন, মামা রেগে আগুন হ'য়ে, আমার কাণ ধ'রে মারতে মারতে রাস্তায় বার করে দিয়ে, কপাট বন্ধ করে দিলেন। সেইখানে ধূলোয় পড়ে, যন্ত্রণায় ছটফট আর চীৎকার করতে লাগলাম। উঠে দাঁড়াবার শক্তি আমার তখন ছিল না। তারপর,—তারপর ঠিক মনে নেই, কে যেন আমায় তুলে নিয়ে গেল। জ্ঞান হ'লে দেখি আমার পা বাঁধা! একখানা মাটির ঘরের মেঝেয় বিছানায় শুয়ে, পাশে সুভা, আর তার মা! এই সমাজ পরিত্যক্তা দুঃখিনী রমণী ও তাঁহার কন্যার অযাচিত, অপরিসীম করুণায়, আমার জ্বরতপ্ত চোখে ঝর ঝর ক'রে ঝরতে লাগল।

সুভাদের আমি জানতাম। গরু বাঁধবার জন্য প্রতিদিন ওপার এ[illegible] মাঠের দিকে আসতে হ'তো! প্রতিদিন এইখানে সুভার সঙ্গে দেখা হ'তো। আমি আসবার আগে, দুপুরবেলায় কতদিন সে আমার গরুকে জল খাইয়ে, [illegible]রিয়ে বেঁধে দিয়ে, আমার কাজ শেষ ক'রে রাখত। ঐ তেঁতুল[illegible] বসে, দু'জনে কত গল্প ক[illegible]। গ্রামের এক লম্পট ধনী[illegible] [illegible]নীরা, সমাজচ্যুতা। তা[illegible] গোরী সুভার আজো বিয়ে [illegible],—[illegible]কে

কে বিয়ে করবে? আমার সেই রোগশয্যায় মাতা পুত্রীর সেবা, আর আজ এখানে বিদেশে, হাঁসপাতালে মনে হ'য়ে, কেবলি চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে! তেমন বুক দিয়ে সেবা, আজ ক'দিন যেন ধাত্রী মিস্ হালদারের সেবার মধ্যে তাহা অনেকটা অনুভব করছি। কিন্তু, হায়! সুভা আজ কোথায়?

অনেক অনুনয় বিনয় করেও সুভাকে পেলাম না। কুলীনের জাত নষ্ট করতে, তার মা কিছুতেই রাজী হ'লেন না। সুভাকে ধরলাম,—সে কাঁদতে লাগলো; কিছুতেই আমার পত্নীত্ব স্বীকার করলে না। নিরাশার তীব্র হাহাকার বুকে ধরে, দেশ ছাড়লাম।

(২)

সুভার জন্য কেন যে আমার জীবনটা এমন ভাবে বৃথা কেটে যায়. কতবার নিজেকে এ প্রশ্ন করেছি,কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পাইনি। এই দশ বছর দিনরাত আমার বুকে থেকে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, অতৃপ্তির মাঝে আমার জীবনে সে যে কত বড় অপরিহার্য্য সামগ্রী হ'য়ে উঠেছিল, যখনি তাকে ভোলবার ইচ্ছা হয়েছে তখনি বুঝেছি ভোলবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। তার স্মৃতিটুকু সঙ্গে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে, ধানবাদ হ'তে কলকাতা আসবার জন্য সেদিন সন্ধ্যায় ট্রেনে উঠেছিলাম। মাঘমাস,—বেশ শীত! কম্বল মুড়ি দিয়ে, মেঝে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে ছিলাম,—কতদূর এসেছি জানিনা, হঠাৎ একটা বিকট শব্দে ও প্রবল ঝাঁকিতে, ঘুম ভেঙ্গে গেল; কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় তখনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়লাম। জ্ঞান হ'লে দেখি, আসানসোলের হাঁসপাতালের একটা ঘরে শুয়ে, পাশে একজন মেম বসে! সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মাথা অসম্ভব ভার;--কি জিজ্ঞাসা করতে গেলাম পারলাম না—আবার জ্ঞান হারালাম।

আজ পনের দিন হাঁসপাতালে পড়ে,—উঠিবার শক্তি এখনো ভাল পাইনি, শুয়ে শুয়ে জীবনের কথা ভাবছি, দরজা খোলার শব্দে চেয়ে দেখি—মিস হালদার! প্রথম দিন তাঁকে দেখেই, সুভাকে মনে পড়েছিল, কিন্তু সে এখানে আসবে কি করে? আর এক রকমের মানুষ তো কত দেখেছি! সুতরাং সে সন্দেহ কেটে গেল! আজ তাঁর হাসিমাখা মুখ দেখে বুঝলাম, এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছি। আশ্চর্য্য! চিরদিন মরণের জন্যই লালায়িত ছিলাম। জীবনকে এতদিন উপেক্ষা করেই এসেছি। কিন্তু, ভেতরে ভেতরে এতখানি মমতা যে তার জন্যে বুকের এক কোণে লুকানো ছিল, আজকের মত এমন ভাবে, আর কোন দিন জানতে পারি নি! বাঁচবার আশায় আমার শুষ্ক ওষ্ঠে হাসি ফুঠে উঠলো!

হেসে, কাছে বসে মিস্ হালদার বললেন, "কি আজ যে খুব হাসি?"

এই একান্ত অপরিচিতা নারীর আমার প্রতি কেন যে এত স্নেহ, জানি না। জানি বটে, ধাত্রীর কাজই পরের সেবা করা; কিন্তু সে যে এমনি সেবা, তাতো কোনদিন ধারণাও ছিল না। সে যে দিন রাত একই ভাবে বসে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে, সমস্ত মন প্রাণের শক্তি দিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে

অনবরত যুদ্ধ করা, তাতো জানতাম না, যদি না এই স্নেহ-শক্তিময়ী রমণীর সেবা দেখতাম। কি সে আকুল আগ্রহ! মৃত্যুর হাত হ'তে ছিনিয়ে নিতে কি সে বিরাট পক্ষব্যাপী দ্বন্দ্ব।

সুভা ও তার মায়ের স্নেহ, স্নিগ্ধ শ্যামলোজ্জ্বল ওয়েসিসের মত, শুষ্ক, নীরস হাহাকারে ভরা আমার মরুভূমি-প্রাণে, কিছুক্ষণের জন্য সুখ শান্তি দিত বটে, কিন্তু এত বড় বিপুল জগতে আরতো কেউ, কোন দিন, ভুলেও দুটো মিষ্টি কথা বলেনি, এমন সুখ, এমন আনন্দ দেয়নি! এই অনাত্মীয়া নারীর আত্মীয়ার মত স্নেহদানের কথা মনে হ'তেই, চোখ ছাপিয়ে জল উথলে উঠল।

আমার চোখে জল দেখে, মিস্ হালদার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "একি হাসতে হাসতে কান্না; ব্যাপার কি?"

খানিক পরে, আবেগটা কমলে, তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে, গাঢ়স্বরে বল্লাম, —"এ জিনিসটা আমার কাছে এমনি অপূর্ব্ব, অমূল্য যে, ভিখারীর কাছে রাজভোগ যেমন! কোন দিন যা' পাইনি, আজ তার মধুর, স্বর্গীয় আস্বাদনে আনন্দের, তৃপ্তির জল আপনি উথলে উঠেছে যে।"

মিস হালদার হাসির চেষ্টা করে বল্লেন, "কোন দিন, কারো কাছে পান নি?"—তাঁর চোখ কেন জানিনা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লাম,—"পেয়েছিলাম ২৮ বছরের মধ্যে ৮।১০ দিন মাত্র। আরো বলতে যাচ্ছিলাম, তাঁর সজল, আনত মুখ দেখে বিস্মিত ভাবে থেমে গেলাম। মিস হালদার কাঁদছেন কেন? বুকটা তোলপাড় করতে লাগল। তাঁর এলাইত চুলের দু' এক গোছা আমার মুখে, বুকে এসে পড়েছিল। আমি অবাক হ'য়ে তাঁর মুখপানে চেয়েছিলাম। হঠাৎ কোন কথা না বলে তিনি উঠে গেলেন। কারণ বুঝতে না পেরে নীরব, নিস্পন্দভাবে শুয়ে ভাবতে লাগলাম,—বেরিয়ে গেলেন কেন? রাগ করলেন কি?

কি অদ্ভুত, মানুষের এই মন। একটু আদর যত্নে, এতখানি অভিমান কেমন ক'রে যে তার ভেতর গোপনে, নিঃশব্দে সঞ্চারিত হ'য়ে উঠে, একটু অনাদরে, একটু তাচ্ছিল্যে, সে যে এমনি ক'রে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে, প্রকাশ্যে, সকলের সামনে ছড়িয়ে পড়ে, তাতো কোন দিন জানতাম না। ভাবতেও পারিনি! রাগ কি আজ এই নূতন দেখছি যে ব্যথা পাব? দুঃখিত হবার যে কিছু নেই, তাতো সে যে এই ২৮ বছরে ভাল রকমেই বুঝেছি। তবে কেন আজ প্রাণ এমন কাতর হ'চ্ছে! শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে এই কথাটাই কেবল ভাবতে লাগলাম,—ক'দিনের স্নেহে, কি করে আমার প্রাণ এতখানি ভরে উঠলো যে, আজ তার উপর দাবী করতে ছুটেছি? জীবনে আর এক জনের কাছে ঠিক এই দাবীই করতে গিয়ে, অপমানিত ভিক্ষুকের মত বিতাড়িত হয়েছি! কিন্তু সে অপমানের মধ্যে একটা আনন্দ ছিল, সান্ত্বনা ছিল,—সুভা সত্যিই আমায় ভাল বাসতো। আজ এই অজ্ঞাত নারীর কাছে, কিসের আশায় আপনাকে এত ছোট, হীন করতে গেলাম,— মনে হ'তেই লজ্জায় ঘৃণায়, অপমানে ম'রে যেতে ইচ্ছে হ'লো।

(৩)

কতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম জানিনা, হঠাৎ ডাক্তারের তিক্ত কটুস্বরে চমকে উঠলাম,—"শুনতে পাচ্ছ হে ?"

প্রকৃতিস্থ হ'য়ে, বললাম,—"আজ্ঞে, কি বলছেন ?"

মুখখানা বিকট-শিকট ক'রে, হাত নেড়ে ব্যঙ্গস্বরে ডাক্তার বলে উঠলেন,—"কি বলছেন ? কানের মাথা খেয়েছ নাকি ? পাজী, বদমায়েস উল্লুক কাঁহা-কার। নার্সের সঙ্গে যদি ও রকম কর তো, কালই দূর করে দেব !—

ব্যাপার কি, বুঝতে না পেরে, হতভম্বের মত খানিক চুপ করে থেকে, আস্তে, আস্তে বলতে গেলাম,—"আজ্ঞে, আমি কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার—কথা শেষ করবার পূর্ব্বেই ডাক্তার লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে বললেন "কি আমার কথার উপর কথা ? ড্যাম, শুয়ার। আজ রাতটা যাক, কাল তোকে কে এখানে রাখে দেখছি—বলে পদশব্দে বাড়ী ও আমার বুক কাঁপিয়ে চলে গেলেন। ভয়ে, বিস্ময়ে অপমানে বিহ্বলের মত বহুক্ষণ পড়েছিলাম,—পাঁড়েজীর ডাকাডাকিতে চেয়ে দেখলাম "মিস্ হালদার এলেন নাকি ?" তিনিই আমার খাবার আনতেন। আজ তিনি আসেন নি—ঠাকুর নিয়ে এসেছে।

পাঁড়েজী চুপি চুপি, আমার কাণের কাছে মুখ এনে যা বল্লে তাইতে এইটুকু বোঝা গেল,—তাঁর ও ডাক্তার সাহেবের মধ্যে যে একটা সম্বন্ধের চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত হ'তে যাচ্ছে, আমি যেন তার মধ্যে না থাকি ? সেখানে, তাঁদের পতিপত্নীর গণ্ডীর মধ্যে ঢোকা আমার অনধিকার প্রবেশ হবে। আর তাতে আমার নিজের ভয়ঙ্কর বিপদের সম্ভাবনা। ক্ষিধে নেই বলে ঠাকুরকে তার এই সতর্ক করার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বিদেয় করে শুয়ে পড়লাম ; ডাক্তারের রাগের হেতুটা বুঝে লজ্জায় মরে গেলাম।

সত্যই তো আমি কেন তাদের সুখের বিঘ্ন হব ? আমি তার কে ? আমার জন্য কেন সে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করতে যাবে ? ছি। ছি। কি নির্ব্বোধ আমি ? নিজের উপর যত রাগ হ'লো, তার দশগুণ বেশি হ'লো মিস্ হালদারের উপর। ট্রেনের কলিসনে কত লোকত মরেছে ? আমিও না হয় মরতুম। কেন সে আমায় তুলে এনে, এমন সেবা যত্ন করে বাঁচালে ? আসুক সে একবার, দেখছি ?—সারারাত ঘুমই হ'লো না, ছটফট করে রাত কাটালাম।

রাত্রের এত যে রাগ, এত যে তিরস্কার করবার সঙ্কল্প, সকাল হ'তেই সব কোথায় উড়ে গেল। তার আসার আশায় অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলাম। ১২টার পর, তাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই, কম্পিত বক্ষে পাশ ফিরে শুলাম। কিছুতেই কথা কব না! কাছে এসে, নিতান্ত সহজ স্বরে মিস হালদার বল্‌লেন, "কেমন আছেন ?"

জোর করে চুপ করে রইলাম,—উত্তর দিলাম না।

"একটার সময় ঔষধ খেতে হবে,"—বলে চলে যাবার উপক্রম করতেই পাশ ফিরে বল্লাম,—"আমি ওষুধ খাব না।"

এক মুখ হেসে, মিস হালদার বল্লেন,—"কি ফিরলেন যে বড় ?—তা' হঠাৎ পুরুষের লক্ষণটা প্রকাশ পেল কেন ? অপরাধ ?"

অভিমান ক্ষুব্ধ স্বরে বললাম—"এমন করে অপমানিত করা"—যেন শুনতে পাননি, এমনি ভাবে কথাটা ঝেড়ে ফেলে, কাছে এসে বসে তিনি বল্‌লেন,—"হাঁ, ভাল কথা ! কাল যে মেয়েটির কথা বলছিলেন, সে কি আপনাকে বড্ড ভালবাসে ? নামটি কি তার—বলছিলেন ?"

সুভার নাম নিয়ে, অপরে নাড়া চাড়া করে আমার তা' আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তাই বললাম—"কি হ'বে তার নাম শুনে ?"

মিস হালদার হেসে বল্লেন,—"না, হবে না বিশেষ কিছু ! শোনবার সখ মাত্র ! আপনাদের কথা জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। আজ নইলে তো আর সময় হ'য়ে উঠবে না ! তাই জিজ্ঞাসা করলাম !"—বুকটা আমার ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌ল ! আজ নইলে শোনা হবে না ?" তার মানে ? রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বল্‌লাম—"কেন আপনি কি চ'লে যাচ্ছেন ?"

"আমি কোথায় যাব, বলুন ? আপনাকে যেতে হবে যে, খবর পান নি ?" ব'লে মিস হালদার একটু হাসলেন।

জানি আমায় যেতে হবে ! কিন্তু আজই ! এত শীঘ্র ! শুষ্ক স্বরে বললাম—"কই না !" আমার প্রাণ তখন কি রকম করছিল তা অন্তর্যামিই জানেন !

মৃদু হেসে মিস হালদার বলিলেন,—হাঁ আজই—তিনটের সময় !" আমি চুপ করে বাইরে চেয়ে রইলাম,—কোন কথা বলবার শক্তি আমার তখন ছিল না।

আমার শুষ্ক মুখ শূন্য উদাস দৃষ্টি মিস হালদার বোধ হয় লক্ষ্য করেছিলেন, তাই স্নিগ্ধ মৃদুস্বরে বল্‌লেন,—"সত্যি কি আপনার কেউ নেই ?" জানালা হ'তে চোখ ফিরিয়ে, আমার কাতর দৃষ্টি তাঁর উপর ফেললাম, বহুক্ষণ নীরবে, নত মুখে বসে থেকে, হঠাৎ মুখ তুলে হেসে, তিনি বলে উঠলেন,—"ভারি মজা হবে তা'লে কিন্তু ?"

হাসি দেখে আমি চমকে উঠলাম ! প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা ক'রে মরণোন্মুখ বিজয়ী যোদ্ধা যেমন হাসে, ঠিক তেমনি হাসি ! আমার মুখের পানে চেয়ে, হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে মিস হালদার বল্‌লেন,—"কেন আপনাকে যেতে হবে জানেন ?"

সবটা না জানলেও, কতকটা জানতাম, তবু যেন জানিনা ভাবে ঘাড় নেড়ে বললাম—"না।"

ক্রূর হাসি হেসে, শুষ্ককণ্ঠে, মিস হালদার বললেন,—"শুনে আপনার ভারি আমোদ হবে, বোধ হয়। আপনি—আপনি—"একটু থেমে শক্ত হ'য়ে দৃঢ়স্বরে বললেন,—"আপনি আমার প্রণয়ী কি না !" মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরে উঠতেই দুহাতে মাথা চেপে ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম।

(৪)

দুর্ব্বল মস্তিষ্কে হঠাৎ এত বড় কথার আঘাতটা বোধ হয় সহ্য হয়নি।

কারণ সন্ধ্যার সময় পর্য্যন্ত কি ঘটেছে কিছুই জানিনা,—মনে নেই। সহজ জ্ঞান ফিরে এলো মিস হালদারের কোমল স্পর্শে। চোখ চাইতেই, তিনি বলে উঠলেন,—এই যে। আঃ। যে ভয় আমার হ'য়েছিল। গাঢ়, কাঁপা কাঁপা স্বরের ভেতর দিয়ে স্নেহ, করুণা ও উদ্বেগ একসঙ্গে বেরিয়ে অসবার জন্যে যে ঠেলাঠেলি করছে তা বেশ বুঝতে পারলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমি এখন কোথায় ?"

চাইতেই বুঝেছিলাম,—হাঁসপাতালে নেই। একটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, সাদাসিদা সজ্জিত প্রশস্ত ঘরে,—পালঙ্কে শুয়ে।

উত্তর না দিয়ে, মিস হালদার ওষুধের গ্লাসটা মুখে ধরলেন। সেটা খেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—চাক্‌রী ছেড়ে দিয়েছেন তাঁ হ'লে ?"

মিস হালদার হেসে উত্তর দিলেন,—"আমার জন্যে এ অবস্থায় আপনি রাস্তায় দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন আর আমি আপনার জন্যে সামান্য চাকরী ছাড়তে পারব না ?"—কথাটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসুনেত্রে তার মুখপানে চেয়ে রইলাম। তিনি তেমনি হেসে বললেন,—"মনে নেই বুঝি ? বাঃ বেশ যা হোক ? সমস্ত হাঁসপাতালে হুল স্থূল পড়ে গেল। কি যে গোঁ ধরলেন কিছুতেই এখানে থাকব না। উঃ। কি সে জেদ। আর কি সে চেঁচানি —আচ্ছা একটা নার্সের জন্যে অমন চেঁচামেচি করতে লজ্জা করেনি ?"—হাসতে, হাসতে, বল্লেন,—আমার কিন্তু ভারি লজ্জা হ'য়েছিল,—আর—উচ্চ হাসি চাপতে না পেরে মুখে আঁচলটা গুজে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন! বুঝলাম হাঁসপাতাল ছাড়বার জন্য কেলেঙ্কারী করে এসেছি। তাই বাধ্য হয়ে অনাথ অসহায় আমার জন্য একে চাকুরী ছাড়তে হয়েছে। দারুণ লজ্জার কথা হলেও কি একটা অজানা মাধুর্য্যের অনুভূতিতে আমার সর্ব্বশরীর পুলকে কাঁটা দিয়ে উঠলো। কৃতজ্ঞতায় চোখের জলে বুক ভেসে গেল।

মিস হালদার ব্যস্ত হয়ে বললেন,—"এই দেখ! কান্না কেন আবার ? আপনি অন্য কোথাও গেলেও আমার চাকরী ছেড়ে দিতে হ'তো।" কাঁদতে, কাঁদতে বললাম,—আমার জন্যই আপনার মাথা নীচু হলো। এত অপমান আমার জন্যই সইতে হ'লো।"

"দুধটা আনছে না কেন। দেখে আসি—"বলে মিস হালদার দ্রুতপদে চলে গেলেন।

(৫)

আট দশ দিন পরে একদিন বিকালে, হাঁসপাতালের ডাক্তার এসে ডেকে পাঠাতে মুরলা নেমে গেল। তার সঙ্গে কি কথা হ'লো জানিনা,—ঘরে চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম, চেঁচামেচিতে বারান্দায় আসতেই ডাক্তারের কথা শুনতে পেলাম। উত্তেজিত স্বরে তিনি চেঁচিয়ে বললেন,—একটা রাস্তার ভিক্ষুককে দিয়ে, আমার এত অপমান ? বিয়ে করব বলে কথা দিয়ে শেষে কিনা একটা হাঘোরের সঙ্গে—"

মুরলার গলা এতক্ষণে শুনতে পেলাম—সেও উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল,—"ভদ্রলোকের ছেলেকে, আমার অতিথিকে আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে যা তা

বলবেন না। সাবধান হয়ে কথা বলুন। যান আপনি, আমি আপনাকে কখন বিবাহ করতে চাই নাই। যান—

গর্জ্জনে ছাদ ভেঙ্গে ফেলবার উদ্যোগ করে, ডাক্তার বললেন,—"কি বিয়ে করবে না? অমনি নাকি? ঘনশ্যাম রায়কে চেন না! চুক্তি ভঙ্গের নালিশ করব জাননা? চালাকি নাকি!—"

স্থির দৃঢ়স্বরে মুরলা বল্লে,—"আমি কোন দিন আপনাকে বিয়ে করতে চাইনি", "বলিনি তার প্রমাণ ঢের আছে। আর নালিশ করতে চান আদালত খোলা আছে, চলে যান। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করলে জমাদারকে ডাকতে বাধ্য হব, তা বলছি।"

ডাক্তার আর একবার গর্জ্জনের হুঙ্কার দিতেই মুরলা চীৎকার করে ডাকল —"হীরাসিং এই বাবুকে বাহারমে লে যাও।"—হীরাসিং পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রুদ্ধ ক্রোধে ফোঁস, ফোঁস করতে করতে ডাক্তার চলে গেলেন।

স্তম্ভিত হয়ে সেইখানে থামে ঠেস দিয়ে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, আমারই জন্যে এই দুইটি প্রণয়ীর চিরবিচ্ছেদ ঘটতে দেখে ঘৃণায় লজ্জায় রাগে নিজেকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হলো। ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে এসে মুর্চ্ছিতের মত অবসন্ন ভাবে শুয়ে পড়লাম। ঠিক করলাম—আর এখানে নয়। অপমানের বোঝা আর ভারী করা হবে না। কাল সকালেই পালাতে হবে।

রাত্রে গল্প করতে করতে একসময় আমি বললাম,—"দেখুন আপনাকে গোটাকতক কথা জানান আমার কর্ত্তব্য।"

মুরলা হেসে বলে উঠলো,—"কৃতজ্ঞতার কথাতো? উঃ বিষম কর্ত্তব্য, অতি অবশ্য করণীয়—আচ্ছা ক্ষোভ থাকে কেন, বলুন।"

একটু জোর করেই আমি বললুম,—"ঠাট্টাই করুন আর যা করুন—আমার জীবনের জন্য সত্যিই আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি দয়া করে তুলে না আনলে—"

কথা শেষ করতে না দিয়ে সে যেন আপনমনেই বলে উঠল—ভাগ্যি ঝাঁঝা হ'তে সে ট্রেনে আমি আসছিলুম তা নইলে কি হতো।—"

কথাটা মনে করে যেন সে শিউরে উঠলো। একটু থেমে বল্লে,—"আর শুধু আপনি একা নন তো, কত লোকে সাহায্য পেয়েছে—"উত্তেজিত ভাবে আমি বলে উঠলাম—"তা হতে পারে। কিন্তু তারা কি এমনি পেয়েছে। এমনি সমস্ত মন প্রাণ—"

হঠাৎ তার পাংশু মুখের উপর নজর পড়তেই কাতর ভাবে বললাম—"পৃথিবীতে আমার যে কেউ নেই, এমন যে আমি কখন পাইনি মুরলা।"

কদিন হ'তেই লক্ষ্য করছিলাম মুরলার স্বভাব সুন্দর মুখে একটা কিসের যেন কালো মেঘের ছায়া ঘনিয়ে উঠছিল। হাসি তামাসার হালকা বাতাস সেটাকে এক চুলও সরাতে পারেনি। আমার কথায় সে মেঘটা যেন আরো জমাট বেধে উঠলো খানিক চুপ করে থেকে মুরলা ধীরেধীরে বললে—আমায় তোমার আপনার হবার অধিকার দেবে কি?"

কথাটার মধ্যে কি শুনলাম কি পেলাম জানিনা, সহসা তার হাতটা সজোরে চেপে ধরে চীৎকার করে বলে উঠলাম—সুভা। পাষাণি রাক্ষসি।—”

হাত ছাড়াবার চেষ্টা মাত্র না করে মুরলা ম্লান হেসে বললে—হাতটা ভেঙ্গে যাবে যে।—”

চমক ভাঙ্গলে চেয়ে দেখি—সত্যিই তার ফুলের মত নরম হাতটি কালো হয়ে উঠেছে। কাল সিটে পড়ে গেছে। নিজের এই অস্বাভাবিক বর্ব্বরতায় লজ্জায় ক্ষমা চাইতেও পারলাম না। নীরবতার গুরুভার অসহ্য হয়ে উঠছিল, মুরলার শান্ত মৃদু স্বরে বেঁচে গেলাম।—“ডাক্তার এসেছিলেন জানেন?”

কয়লার ধোঁয়ায় রুদ্ধশ্বাস মানুষ বাইরের খোলা বাতাসে এসে যেমন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে, আমিও তেমনি লজ্জা সঙ্কোচের নীরব পীড়নের বাইরে এসে কথা কয়ে বাঁচলাম। বললাম—হাঁ।—কিন্তু তাঁর সঙ্গে ওরকম করাটা উচিত হয়নি।”

হেসে মুরলা বললে—সব শুনেছেন তা’হলে। তা উচিত হয়নি কেন?”

প্রাণপণে সঙ্কোচের শেষ বাঁধনটা ছিঁড়ে বললাম—বিয়ের কথাবার্ত্তা যখন ঠিক হয়েছিলো তখন ভাঙ্গাটা ঠিক হয়নি। অন্ততঃ আমিও তাই মনে করি।”

মুরলা গম্ভীর হয়ে বললে—“আমিত কোন দিন তাঁকে কথা দিইনি।”

“মুখে না দিতে পার, আকারে ইঙ্গিতে হয়ত জানিয়েছ”—বলে উত্তরের আশায় রুদ্ধশ্বাসে রইলাম।

“না তাও জানাইনি। তবে উনি যদি তা বুঝে থাকেন ত অন্যায় বুঝেছেন। তার জন্যেত দোষী বা দায়ী আমি নই।”

আঃ বুক থেকে যেন একখানা ভারী পাথর নেমে গেল। খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ সে বলে উঠল—“আপনি আমার পরিচয় জানতে চেয়ে ছিলেন না সে দিন?” এই আকস্মিক প্রশ্নে আমি বিচলিত হয়ে উঠলাম আপনাকে সামলে নিয়ে বললাম—কিন্তু আপনিত বলতে চাননি।”

মুরলা বলিল তখন সময় হয়নি, আজ সে সময় হয়েছে। তুমি আমায় চেন—আমি সুভা; তোমার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করে তোমাকে দেশছাড়া করেছিলুম—মনে আছে? কিন্তু নিজেও দেশে থাকতে পাইনি। গ্রামের লোকের উৎপাতে আমায় নিয়ে মা কলকাতা পালিয়ে আসেন। সেখানে কোন ভদ্রলোকের দয়ায় এই ধাত্রী বিদ্যা শিখি। মা মারা গেলে চাকরী নিয়ে তিন বছর এখানে এসেছি। নানারূপে ঘনশ্যাম ডাক্তার আমাকে বিয়ে করবার ইচ্ছে জানিয়ে আসছিলো। কিন্তু আমি কোন কথা বলিনি। তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমার জীবন সঙ্গী হতে পারে না, একথা বোধ হয় তুমিও অস্বীকার করবে না। কিন্তু আমি জানি কোন দিন তোমার লালসার মুখে তুলে ধরতে পারব না, তুমি আমার সমস্ত জীবন জুড়ে আছ বটে কিন্তু সমাজ পরিত্যক্ত এদেহ তোমায় দিতে পারবনা—দিবার যোগ্যও এ নয়।

আমার শরীরের সমস্ত কাজ এক সঙ্গে বোধ হয় বন্ধ হ’য়ে গিয়েছিল। বহুক্ষণ পরে নিশ্বাস পড়ার শব্দে চমকে উঠলাম। খানিক স্তব্ধ হ’য়ে থেকে ও বিহ্বলভাবে বলিলাম,—“সত্যই তুমি সুভা?”

আর্দ্রস্বরে সুভা বলিল,—“আমায় ক্ষমা করো। তোমায় প্রত্যাখ্যান

করায় যে এত কষ্ট, তাতো আগে জানিনি। আজ দশ বৎসর দিন রাত তোমার অভাব বুঝেছি, বারবার তোমায় চেয়েছি, কিন্তু তোমায় নিতে পারিনি, আজও পারব না।"

ঝর ঝর ক'রে তার চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। আমার কথা বলবার শক্তি লোপ পাচ্ছিল, তবু জোর করে বললাম,—কেন ?"

কাঁদতে কাঁদতে সুভা বল্লে,"তখনো যে জন্যে এ তুচ্ছ দেহটা দিতে পারিনি, আজও সেই জন্যেই পারব না। জানি বটে, মা আমার সতী সাধ্বী ছিলেন কিন্তু সমাজ যখন তাঁকে পতিত করেছে, তখন কি করে—

উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলাম—"চাইনা সমাজ, চাইনা কাউকে—সুভা ! সুভা ! ধরা যদি দিলে, তবে কেন আবার উড়ে যেতে চাও ? আমি তোমায় ছাড়ব না,—কিছুতেই না।"

চখের জলে বুক ভাসিয়ে, সুভা বল্লে, "আমায় ক্ষমা কর, ওগো আমায় ক্ষমা কর ! সর্ব্বস্ব তোমায় দিয়েছি, শুধু এইটে পারব না।"—আমার আদর্শ দেবতাকে তুচ্ছ এর জন্যে ছোট হ'তে দিতে পারব না।" চোখ বুজে বল্লে "লুকিয়ে বিয়ে করবে ? ছি ! কেন ? এ দেহটার দাম কি জগতে এতই বেশি যে, এর জন্যে সমাজকে উপেক্ষা করবে ? প্রবঞ্চক হবে ? ছি ! তা আমি তোমায় হ'তে দেব না !"

উগ্রকণ্ঠে বলে উঠলাম, "তবে, তবে কি সারাজীবনটা এমনি উদ্দেশ্য হীন উচ্ছৃঙ্খল ভাবে, হাহা করে দশদিক ভরিয়ে, কুকুরের মত, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাটাতে হবে ?"

শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে সুভা বল্লে, না ! সেই জন্যেই আমি চাকরী ছেড়ে দিয়েছি। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে তোমায় দেব না। আমার দেবতার পায়ের তলায় বসে, তাঁকে তাঁর উপযুক্ত কাজই করাব।"

বিস্মিতভাবে শুধুলাম,—"কি করাবে ?"

"আবেগ কম্পিত, স্পষ্টস্বরে সে বলতে লাগলো. "কি করবে ? বাংলায় কি কাজের অভাব আছে, প্রভু ? চেয়ে দেখ দেখি এই দেশ—প্রতি গ্রামে, গ্রামে দুর্ব্বলের আর্ত্ত চীৎকার, দীন দরিদ্রের কাতর, মর্ম্মস্পর্শী, আকুল প্রার্থনা ; পীড়িতের রোগ যন্ত্রণার কাতরতায়, অন্নহীনের, বস্ত্রহীনের মর্ম্মবেদনায় বাংলার বায়ু কেঁদে, কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাণ দিয়ে শোন, কোটী কোটী কণ্ঠের কাতর, আকুল প্রার্থনা ! এস প্রভু, দু'জনে এই দুঃস্থ, ক্লিষ্ট, পীড়িত দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করি। এস প্রভু, এস আমার দেবতা ! দেবতার প্রাণ নিয়ে, বিশ্বের মঙ্গল মন্দিরে আপনাকে বলি দিতে এস।

স্তব্ধ, বিস্মিত, মুগ্ধনেত্রে চেয়ে দেখি, জগদ্ধাত্রীর স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে সুভার মুখ উদ্ভাসিত। নয়ন হ'তে স্নেহ, করুণা, প্রীতি যেন গলে, গলে, পড়ছে। দু'হাত বাড়িয়ে, তাকে ধরতে উঠতেই, সুভার কম্পিত দেহ অলসভাবে আমার প্রসারিত বাহুদ্বয়ের মধ্যে এলিয়ে পড়ল।

গল্পলহরী

ষষ্ঠ বর্ষ, } আষাঢ়, ১৩২৫ { ৩য় সংখ্যা

ডাক্তার সাহেব

(লেখক—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল)

(১)

রায় সাহেব বিলাত হইতে ডাক্তারি পাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বালিগঞ্জে প্র্যাকটিস্ চালাইবেন স্থির করিয়া সেখানে একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন। তাঁহার দেশ কোথায়, তাঁহার বংশ পরিচয় কি, এ অঞ্চলের কেহই তাহা অবগত ছিল না। তিনি নিজে কখনও কাহাকে এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই। প্রতিবেশীরাও সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু প্রশ্ন করা ভদ্রতাসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করে নাই।

প্রথম প্রথম নূতন পাশ করা ডাক্তারের ভাগ্যে সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে—নৈরাশ্য ও বিদ্রূপ লাভ, রায় সাহেবও তাহা হইতে নিস্তার পান নাই। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার পশার বেশ জমিয়া উঠিতে লাগিল। স্থানীয় একজন ধনী জমীদারকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করায় বালিগঞ্জে তাঁহার নাম ডাক খুব বাড়িয়া গেল। তিনি ঐ অঞ্চলের বহুদিনের পুরাতন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। পরন্তু তাঁহার সুন্দর আকৃতি, ভদ্র ব্যবহার এবং মিষ্ট আলাপের গুণে স্থানীয় সকলেরই তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং ব্যবসাক্ষেত্রে ও সামাজিক জীবনে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার বন্ধুরা ও রোগীরা কেবল একটি বিষয়ে তাঁহার দোষ লক্ষ্য করিত, ডাক্তার সাহেব অদ্যাবধি অবিবাহিত। তাঁহার আর্থিক অবস্থা ত বেশ স্বচ্ছল, অথচ বিবাহ না করিবার কারণ কেহই উপলব্ধি করিতে পারিত না।

প্রথম প্রথম অনেকে ভাবিত, এবার ডাক্তার সাহেব নিশ্চয় পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবেন, কিন্তু বৎসর শেষ হইয়া গেল অথচ তাহাদে আশা পূর্ণ না হওয়ায় সকলেই স্থির করিল, ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় রহস্য আছে। কিন্তু অনেকে অনেক মাথা ঘামাইয়াও সে রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিল না। তাহারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বিফল হইলে, একদিন হঠাৎ পাড়ায় রাষ্ট্র হইল যে ইঞ্জিনীয়ার যামিনী মিত্রের ভগিনী ললিতার সহিত ডাক্তার সাহেবের বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

ললিতার পিতা কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বেই তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বিলাত ফেরত ইঞ্জিনীয়ার যামিনী এখন পিতার অগাধ ধনসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া নিজের ব্যবসা চালাইতেছেন। ললিতাকে তিনি বড়ই স্নেহ ও আদর করিতেন। ললিতারও রূপ-গুণের প্রশংসা পাড়ার সকলেই করিত। কোনও সান্ধ্য সম্মিলনে ডাক্তার সাহেবের সহিত ললিতার আলাপ পরিচয় হয়। তাহাই ক্রমে ঘনিষ্ঠ সম্ভাবে পরিণত হয়। দু'জনে পরস্পরের প্রতি খুব আসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বৈশাখ মাসেই বিবাহের কথাবার্ত্তা সব পাকা হয় এবং আষাঢ়ের মধ্যভাগেই বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল।

জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই ডাক্তার সাহেব কি এক পত্র পাইয়া বিষণ্ণ বদনে মিত্র সাহেবের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। ললিতার সহিত নিভৃতে দেখা করিয়া প্রায় একঘণ্টা তাঁহার সহিত কথা কহিলেন। দু'চার দিনের মধ্যেই পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে ডাক্তার সাহেব আর ললিতাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহেন। তাঁহার এই অভদ্র আচরণে সকলেই তাঁহার উপর রাগান্বিত হইলেন। ললিতার দাদা মিত্রসাহেব ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া দু'চার জনের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন যে, এ অপমানের প্রতিশোধ তিনি নিশ্চয়ই লইবেন। ললিতাকে ডাক্তার সাহেবের উপর রাগ করিতে কেহ কখনও শুনে নাই বটে, কিন্তু তদবধি কেহ আর তাহার মুখে হাসি লক্ষ্য করে নাই। নিষ্কর্ম্মা লোকেরা এই ব্যাপার লইয়া নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী পাড়ায় অনেক কুৎসা রটাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

ডাক্তার সাহেবের বাড়ীর লোকজনের মধ্যে একজন বাবুর্চ্চি ও দু'জন চাকর। রাত্রে চাকরবাকরেরা ঘুমাইয়া পড়িলেও তিনি তাঁহার পাঠাগারে

প্রত্যহই অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া বই পড়িতেন। এই পাঠাগারের একটি দরজা বাগানের দিকে ছিল। বেশী রাত্রে কোনও লোক ডাকিতে আসিলে এই দরজায় ধাক্কা মারিত। চাকরবাকরেরা ঘুমাইয়া পড়িলেও তাহাদের ঘুমের আদৌ ব্যাঘাত হইত না; তাহারা এ সম্বন্ধে কিছুই টের পাইত না।

সেদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের ১২ই তারিখ, রাত্রি প্রায় দশটার সময় রামনিধি চাকর বাড়ীর কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া পাঠাগারে ঢুকিয়া দেখিল ডাক্তারসাহেব তাঁহার চিরাভ্যস্ত প্রথানুযায়ী আরাম কেদারায় শুইয়া বই পড়িতেছেন। সে আর কিছু না বলিয়া নিজের ঘরে ঘুমাইতে গেল। কিন্তু অর্দ্ধঘণ্টা পরেই বাড়ীর ভিতর হইতে একটা চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইল। সে কিছুক্ষণ বিছানার উপর উঠিয়া অপেক্ষা করিল, কিন্তু সেরূপ শব্দ আর দ্বিতীয়-বার শুনিতে পাইল না। তখন তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মনিবের পাঠাগারের নিকট আসিল। দেখিল ভিতরের দিকের দরজা ও জানালা সবই বন্ধ। তখন সে দরজায় জোরে ধাক্কা মারিল। ভিতর হইতে প্রশ্ন আসিল,—"দরজায় ধাক্কা মারে কে?"

"আজ্ঞে, আমি রামনিধি।"

"এত রাত্রে এখানে কেন? যা তোর ঘরে শুগে যা।" ঘরের ভিতর হইতে উত্তর আসিল। কিন্তু সে স্বর তাহার মনিবের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর হইতে একটু যেন পৃথক্ বলিয়া তাহার বোধ হইল। সে বাহির হইতে উত্তর করিল,—"আমার মনে হল আপনি বুঝি আমাকে ডাকছেন।" এ কথার আর কোনও উত্তর আসিল না। রামনিধিও আর অপেক্ষা না করিয়া নিজের ঘরে শুইতে গেল। কিন্তু তাহার মনে কি রকম একটা খট্‌কা রহিয়া গেল।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় রামবাবু ডাক্তারসাহেবকে ডাকিবার জন্য তাঁহার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্ত্রী সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত। রাত্রে রোগীর অবস্থা খারাপ হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দিবার জন্য ডাক্তার সাহেব রামবাবুকে বলিয়া আসিয়াছিলেন। ডাক্তার সাহেবের বাড়ীর ফটক পার হইবামাত্র রামবাবু দেখিলেন ইঞ্জিনীয়ার মিত্র সাহেব বাহির হইয়া আসিতেছেন। গ্যাসের আলোতে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন মিত্র সাহেবের মুখের ভাব বড়ই উত্তেজিত এবং তাঁহার হাতে

একটা মোটা লাঠি। রামবাবুকে বাড়ীর ফটকের ভিতর ঢুকিতে দেখিয়া মিত্র সাহেব বলিয়া উঠিলেন,—"ডাক্তার সাহেব বাড়ী নেই মশাই।"

"আপনি কেমন করে জানলেন?"

—"আমি এইমাত্র ডেকে ফিরে আসছি। সাড়া শব্দ পেলাম না।"

"তাঁর পাঠাগারে ঐ যে আলো জ্বলছে দেখতে পাচ্ছি।"

"আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু তিনি ওখানে নেই।"

"নিশ্চয়ই শীঘ্র বাড়ী ফিরবেন। তাহলে একটু অপেক্ষা করি গে।"

এই বলিয়া রামবাবু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া মিত্র সাহেবও স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

রামবাবু ডাক্তারের পাঠাগারের নিকট আসিয়া ভিতরে আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন। তিনি দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা মারিলেন কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও যখন বিফল হইলেন, তাঁহার মনে সন্দেহ হইল যে ঘরের ভিতর এরূপ আলো জ্বালাইয়া ডাক্তার সাহেব নিশ্চয়ই বাহিরে বা শয়নগৃহে যান নাই। বোধ হয় বই পড়িতে পড়িতেই কেদারার উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। পরে জানালার উপর উঠিয়া ঘরের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিলেন।

টেবিলের উপর একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছে। আলোর জোরে ঘরটি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। টেবিলের উপর ডাক্তার সাহেবের পুস্তক ও কাগজপত্র ছড়ান রহিয়াছে। ঘরের ভিতর কোন লোকই নাই, কেবল মেজেতে সতরঞ্চির উপর কি একটা লম্বা সাদা জিনিষ পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথম দর্শনে উহা বস্ত্রখণ্ড বলিয়াই রামবাবুর মনে হইল, কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে উহা মেজের উপর শায়িত কোনও মনুষ্যের হস্ত। ভয়ে তাঁহার সমস্ত দেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। তাঁহার সন্দেহ হইল নিশ্চয়ই ঘরের ভিতরে কিছু সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া চাকরদের ডাকাইলেন এবং একজনকে থানায় খবর দিতে পাঠাইয়া অপরকে সঙ্গে লইয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

জানালা হইতে একটু দূরে টেবিলের পাশেই ডাক্তার সাহেবের অসাড় দেহ মেজের উপর বিস্তৃত রহিয়াছে। শেষ প্রাণবায়ু বহুপূর্ব্বেই নির্গত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার একটা চোখ কাল হইয়া গিয়াছে এবং মুখে ও ঘাড়ে

আঘাতের দাগ রহিয়াছে। নিশ্চয়ই কেহ তাঁহাকে গুরুতর প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার গায়ে একটা সাদা সার্ট ও পায়ে চটি জুতা। জুতার তলা একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সতরঞ্চির উপর জুতার তলার কাদার দাগ রহিয়াছে। ইহা যে হত্যাকারীরই পদচিহ্ন তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে লাগিল। হত্যাকারী নিশ্চয়ই পাঠাগারের ভিতর ঢুকিয়া ডাক্তারকে হত্যা করিয়া অলক্ষিতে পলাইয়া গিয়াছে। এই সব নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া পুলিসের লোক স্থির করিল যে হত্যাকারী নিশ্চয়ই পুরুষ মানুষ কিন্তু তাহার বেশী তাহারা আর কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না।

ঘরের ভিতরের কোনও জিনিষই চুরি যায় নাই। টেবিলের উপর ডাক্তারের সোণার ঘড়িটি ঠিক রহিয়াছে। আলমারির ভিতর তাঁহার ক্যাশ বাক্স ছিল, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তাহাতে ঠিক চাবি দেওয়া আছে। এক্ষেত্রে রামবাবুর কথা মত কেবল একজনের উপরই সন্দেহ হইতে পারে, তিনি হচ্ছেন ইঞ্জিনীয়ার যামিনী মিত্র। অনতিবিলম্বে পুলিস তাহাকেই হত্যাপরাধে ধৃত করিল।

(২)

সমস্ত সহরে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ডাক্তার সাহেবের জন্মভূমি বা পূর্ব্বপুরুষগণের নাম ধাম কেহই জানে না। এই অপরিচিত ব্যক্তির এরূপ করুণ জীবনাবসান এবং একজন উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ারের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। বিচারের দিন আদালতঘর নানা লোকে পরিপূর্ণ হইল। সরকারী ব্যারিষ্টার প্রথম তাহাদের মামলা বেশ গুছাইয়া বলিলেন। তাহাদের সাক্ষীগণেরও সাক্ষ্য লওয়া হইল। নিম্নে সেই সবের সংক্ষিপ্ত সার প্রদত্ত হইল।

আসামী তাহার ভগিনী ললিতাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। এবং ডাক্তার সাহেবের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে যে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছিল এবং এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা যে লোক সম্মুখে অনেকবার প্রকাশ করিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে জনকতক লোক সাক্ষ্য দিল। পরে রামবাবুর সাক্ষ্যই আসামীর বিরুদ্ধে বড় জোর হইয়াছিল। তিনি রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তাঁহার স্ত্রীর অসুখের জন্য ডাক্তার সাহেবকে ডাকিতে আসেন, তখন তিনি আসামীকে ডাক্তারের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়াছিলেন। আসামীর মুখের ভাব উত্তেজিত,

তাহার হাতে একটা মোটা লাঠি ছিল। ডাক্তার সাহেব বাড়ী নাই বলিয়া সে রামবাবুকে ফিরিয়া যাইতে বলে, কিন্তু তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন থাকায় তিনি অপেক্ষা করিতেই স্থির করেন। তাহার পরই রামবাবু গিয়া দেখেন ঘরের মেঝের উপর ডাক্তারের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। ভৃত্য রামনিধিও সাক্ষ্য দিল যে, রাত্রি ঠিক তখন কয়টা তাহা সে বলিতে পারিবে না, তবে ১০টা বা এগারটার সময় সে একটা কাতর চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া মনিবের পাঠাগারে আসিয়া দরজায় ধাক্কা দেয়, কিন্তু ভিতর হইতে কে তাহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিল। কণ্ঠস্বর তাহার মনিবের সাধারণ স্বর হইতে যেন একটু পৃথক্ বলিয়া তখন তাহার মনে হইয়াছিল। তাহার কিছু পরেই প্রায় আধ ঘণ্টা হইবে, রামবাবুর চীৎকারে সে জাগিয়া উঠে। আসামীর এক চাকরকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল যে, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি এগার-টার পর তাহার মনিব বাড়ী ফিরিয়া আসেন। একজন সাক্ষ্য দিল, ডাক্তার সাহেব যে অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত পাঠাগারে জাগিয়া বই পড়িতেন তাহা আসামী জানিতেন এবং সেই জন্যই ঐ সময় সুবিধাজনক ভাবিয়া সে ডাক্তার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করে। ঘরের সতরঞ্চির উপর জুতার দাগ সম্বন্ধে পুলিসের লোক সাক্ষ্য দিল যে, হত্যাকাণ্ডের পরদিন প্রাতেই সে আসামীর বাড়ী খানাতল্লাস করিতে গিয়া গত রাত্রে যে জুতা পায়ে দিয়া সে বাহির হইয়া-ছিল, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল, জুতার তলা কর্দ্দমাক্ত এবং সতরঞ্চির উপর কাদার দাগগুলো আসামীরই জুতার তলার দাগের মতন বলিয়া তাহার মনে হয়। সরকারী পক্ষের মামলা ইহাতেই শেষ। ব্যাপার দাঁড়াইল এইরূপ যে, আসামীই ডাক্তারের বাড়ী আসিয়া পাঠাগারে প্রবেশ করে এবং তাঁহাকে গুরুতর প্রহার করে। তাহাতেই ডাক্তার সাহেবের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যন্ত্রণায় কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠেন, তাহা শুনিয়াই রামনিধি ছুটিয়া আসে। আসামীই তখন মৃত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর অনু-করণ করিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করে। পরে চলিয়া যাইবার সময় রামবাবুর সহিত আসামীর সাক্ষাৎ হয় এবং ডাক্তার সাহেব বাড়ী নাই বলিয়া তাঁহাকে ভাগাইয়া দিবার চেষ্টা করে। শ্রোতৃবৃন্দ এই সব শুনিয়া স্থির করিল যে, আসামীর বিরুদ্ধে যদিও কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই বটে, তবুও এই সব অভিযোগ খণ্ডন করা তাহার পক্ষের ব্যারিষ্টারের বড়ই দুরূহ হইবে।

পক্ষান্তরে এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আসামীর জবাব, মিত্র সাহেব এক তেজী ও উদ্ধত হইলেও, তাঁহার সরলতা জন্ম সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। তিনি যে এরূপ একটা গর্হিত কাজ করিতে পারেন, তাহা কাহারও বিশ্বাস করা উচিত নহে। অবশ্য সাংসারিক কোনও ঘটনার আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ডাক্তারের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন,—ডাক্তারের সহিত তাঁহার ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধের কথা তিনি আদৌ উল্লেখ করেন নাই,—এবং ডাক্তারের সহিত আলোচনার প্রসঙ্গটাও যে প্রীতিকর ছিল না, তাহাও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় তিনি ডাক্তার সাহেবের সহিত দেখা করিতে আসেন। কিন্তু পাঠাগারের দরজায় জোরে ধাক্কা মারিয়াও কাহার কিছু সাড়াশব্দ পাইলেন না। তখন বাড়ী ফিরিবার সময় ডাক্তার সাহেবের ফটকের কাছে রামবাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ডাক্তার সাহেব বাড়ী নাই ভাবিয়াই সরল অন্তঃকরণেই তিনি রামবাবুকে সে সংবাদ দেন। তাঁহার মনে অন্য কোনও কুভাব ছিল না। তিনি সোজা বাড়ী ফিরিয়া আসেন। ডাক্তারের মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। পূর্ব্বে ডাক্তার সাহেবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু পরে বিশেষ কোনও কারণ বশতঃ, তাহা তিনি উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করেন না,—তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। সেই বিষয়ই ভাবিতে ছিলেন বলিয়া তাঁহার মুখের ভাব তখন একটু গম্ভীর ছিল। প্রত্যহই সন্ধ্যায় বাহির হইবার সময় তিনি ঐ মোটা লাঠি হাতে করিয়া বাহির হন। ডাক্তার সাহেবের উপর তাঁহার সবিশেষ ক্রোধ ও আন্তরিক ঘৃণা ছিল বটে, এবং তাহারই বশীভূত হইয়া তিনি অপমানের প্রতিশোধ লইবার অভিমত লোকসমক্ষে প্রকাশও করিয়াছিলেন কিন্তু এরূপ ভাবে প্রতিশোধ লইবার কথা তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবেন নি। পরন্তু রামনিধি যে রাত্রে কখন তাহার মৃত মনিবের কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়াছিল, তাহা সে ঠিক বলিতে পারে না। তাহার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে রামবাবুর চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া তাহার পুনর্ব্বার ঘুম ভাঙিয়া যায়। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় ডাক্তার সাহেবের মৃত্যু হয়। তিনি এগারটার সময় ডাক্তার সাহেবকে ডাকিতে আসিয়া দেখা পান নাই; রামবাবুও বলিয়াছেন প্রায় এগারটার সময়ই তাঁহার সহিত আসামীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি যে ডাক্তারকে হত্যা করিয়া আধ ঘণ্টা ঘরের ভিতর বসিয়া

ছিলেন, ইহা আদৌ সম্ভব নহে। জুতার দাগের সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই সেদিন সন্ধ্যার পর খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য যাহারাই সে রাত্রে পথে বাহির হইয়াছিল, তাহাদেরই জুতার তলা কর্দ্দমাক্ত হইয়া গিয়াছিল। আর সমবয়স্কদের জুতার তলার দাগ প্রায় সবই একরকমের।

মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া হাসপাতালের ডাক্তারেরা বলিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তি বহুদিন হইতেই হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন, তাঁহার ফুস্‌ফুস্ খারাপ হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্যই আঘাতটা সাধারণ সবলব্যক্তির পক্ষে গুরুতর না হইলেও তাঁহার মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার সাহেবের যে কখনও হৃদ্‌রোগ ছিল, তাহা পূর্ব্বে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই।

এবার আসামীর পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য লওয়া আরম্ভ হইল। প্রথমেই আসামীর ভগিনী ললিতাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিতে দেখিয়া উপস্থিত জনসাধারণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইহারই সহিত ডাক্তার সাহেবের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল এবং সেই সম্বন্ধ ডাক্তারের প্রস্তাবে ভাঙ্গিয়া যাওয়াতেই ক্রোধের বশীভূত হইয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য আসামীই যে ডাক্তারকে হত্যা করিয়াছে, ইহাই পুলিশের মোকদ্দমা। কিন্তু পুলিশ ললিতাকে ইহার মধ্যে কোনও বিষয়ে জড়ায় নাই।

ললিতা ধীরে অথচ স্পষ্টভাবে নিজের বক্তব্য বলিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সবাই বুঝিতে পারিল যে, সে একটু অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি সংক্ষেপে ডাক্তার সাহেবের সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধের কথা বলিলেন কিন্তু কি কারণ বশতঃ উহা ভাঙ্গিয়া যায়, সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করিলেন না। তবে তাহাতে ডাক্তার সাহেবের কোনও দোষ ছিল না। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা ভিতরের কথা সব না বুঝিয়া বৃথা ডাক্তারের উপর ভয়ানক চটিয়া গিয়াছিলেন এবং প্রায়ই বলিতেন যে, এ অপমানের যথাসাধ্য প্রতিশোধ লইবেন। ভ্রাতার রাগ নরম করিবার জন্য সে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এই দুর্ঘটনা ঘটিবার দিন সন্ধ্যাতেও সে আসামীকে ডাক্তার সাহেবের প্রতি ভীষণ রাগ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছিলেন।

ললিতার এই পর্য্যন্ত বক্তব্য শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল—একি, ইনি যে এক প্রকার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিতেছে! কিন্তু আসামীর ব্যারিষ্টার তাহাকে

পরবর্ত্তী যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তরেই আসল কথা সব বাহির হইয়া পড়িল। সে কথা আজ পর্য্যন্ত কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই।

আসামীর ব্যারিষ্টার ললিতাকে প্রশ্ন করিলেন,—"আপনার কি বিশ্বাস হয় যে আপনার দাদা এ হত্যাব্যাপারে লিপ্ত?"

জজসাহেব এ প্রশ্ন শুনিয়া এজলাস হইতে বলিয়া উঠিলেন,—"আমি সাক্ষীকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে দিতে পারি না। আমরা এখানে সত্যাসত্য ঘটনার বিচার করতে এসেছি, কার কি বিশ্বাস, তাতে আমাদের দরকার নেই।" "আচ্ছা বেশ, আমি অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি,—আসামী এ কাজ করেছে কিনা, আপনি জানেন?"

"হাঁ জানি, তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

"আপনি কি রকম করে তা জানলেন?

"কারণ ডাক্তার সাহেব এখনও জীবিত আছেন।"

এ উত্তর শুনিয়া সমস্ত আদালত ঘরের মধ্যে একটা উত্তেজনার স্রোত বহিয়া গেল। ব্যারিষ্টার সাহেব কিছুক্ষণ পরে আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি রকমে জানলেন যে, ডাক্তার সাহেব এখনও বেঁচে আছেন?"

তিনি যে তারিখে মারা গেছেন বলে আপনারা ঠিক করেছেন, তার পরের তারিখে লেখা চিঠি তাঁর নিকট হতে আমি পেয়েছি।"

"সে চিঠি আপনার নিকট আছে?"

"হাঁ আছে, কিন্তু সে চিঠি আমি আদালতে দেখাতে ইচ্ছা করি না।"

"চিঠির খামখানা আছে?"

"হাঁ, এই যে।"

"কোন্ পোষ্ট আফিসের ছাপ?"

"লাহোরের।"

"তারিখ?"

"১৪ই জ্যৈষ্ঠ।"

"আপনি হলপ করে বলছেন যে এ হাতের লেখা ডাক্তার সাহেবের?"

"নিশ্চয়ই।"

সরকারী পক্ষের ব্যারিষ্টার তখন তাঁহাকে জেরা করিতে উঠিলেন,—"পুলিশে যখন হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করে, তারপর আপনি এ পত্র পান?"

"হাঁ।"

"আপনি সেটা তাহলে পুলিশের নিকট দেখান নি কেন? তাহলে ব্যাপার এতদূর গড়াত না?"

"ডাক্তার সাহেব অনুরোধ করেছিলেন চিঠিখানা গোপন রাখতে।"

"তবে আজ আপনি সে কথা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করলেন কেন?"

"দাদাকে রক্ষা করবার জন্য।"

এইখানেই তাঁহার সাক্ষ্য শেষ হইল। সরকারি ব্যারিষ্টার তখন চিঠির খামটা আদালতে দাখিল করিতে প্রার্থনা করিলেন। তিনি হাতের লেখা পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আনাইয়া প্রমাণ করাইয়া দিবেন যে, এটি সম্পূর্ণ জাল। আসামীকে বাঁচাইবার জন্য এই মিথ্যা প্রমাণ গঠিত হইয়াছে। ডাক্তার সাহেবের বন্ধুরা ও রোগীরা তাঁহার মৃতদেহ সনাক্ত করিয়াছে।

তখন আসামীর পক্ষের ব্যারিষ্টার জজকে বলিলেন,—"আমি আর জনকতক সাক্ষী ডাকতে চাই, তারা ডাক্তার সাহেবের হাতের লেখা সনাক্ত করবে।"

জজ সাহেব উত্তর করিলেন,—"আজ আর নয়। কাল আপনার সাক্ষীদের আনবেন। কেবল ডাক্তারের হাতের লেখা সনাক্ত করলেই হবে না, তিনি যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে এই মৃতদেহ কার সে বিষয়েও আপনাকে সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে হবে। আজ এই পর্য্যন্ত।"

আসামীর ভগিনীর সাক্ষ্য লইয়া দেশময় একটা সরগোল পড়িয়া গেল। তাহার সাক্ষ্য কতদূর সত্য, এই লইয়া সকলে আলোচনা করিতে লাগিল। আর ডাক্তার সাহেব যদি যথার্থই বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পাঠাগারে যে ব্যক্তির দেহ পাওয়া গিয়াছে ডাক্তার সাহেবই খুব সম্ভবতঃ তাহাকে খুন করিয়া গা ঢাকা দিয়াছেন। মৃতব্যক্তি দেখিতেও কি ঠিক ডাক্তার সাহেবের মতন! ললিতা ডাক্তার সাহেবের চিঠিখানি আদালতে দাখিল করিতে অসম্মত হইতেছেন। তাহার কারণ বোধ হয়, সে পত্রে ডাক্তার সাহেব তাঁহার নিকট নিজের দোষ স্বীকার করেছেন। সে পত্র দাখিল করিয়া ভাইকে বাঁচাইতে গেলে, ডাক্তার সাহেবকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়া দেওয়া হয়।

(৩)

পরদিন বিচারালয় দর্শকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার মহা ব্যস্ততার সহিত ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি একজন আইন

প্রবীন ব্যবসায়ী ; এতদিন কোন মোকদ্দমাতে তাঁহাকে এরূপ বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। তিনি ঘরে ঢুকিয়াই বিপক্ষের ব্যারিষ্টারের সহিত কি গুজ গুজ করিলেন। তাহার ফলে উপস্থিত সকলেই লক্ষ্য করিল যে তাঁহার মুখে একটা বিস্ময়ের রেখাপাত হইল।

আসামীর ব্যারিষ্টার জজসাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হুজুর, কাল আমি যাদের সাক্ষী দেব বলেছিলাম, আজ আর তাদের ডাকতে ইচ্ছা করি না।"

জজ সাহেব উত্তর করিলেন,—"কিন্তু কাল আপনার সাক্ষী যা বলে গেছেন, তাতে ত প্রমাণের ভার সব আপনার উপর।"

"আমার পরবর্ত্তী সাক্ষী এ বিষয়ে চূড়ান্ত সাক্ষ্য দেবে।"

"তাকে ডাকুন।"

"আমি ডাক্তার রায় সাহেবকে ডেকে পাঠাচ্ছি।" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"ইনি অনেক মকোদ্দমায় আশ্চর্য্য কথা বলিয়া হাকিম বিপক্ষের ব্যারিষ্টার, হাকিম ও মামলাবাজগণকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু এত অল্প কথায় এরূপ কৌতূহল ও বিস্ময় কখনও উৎপন্ন করিতে পারেন নাই।

ডাক্তার সাহেব, যাঁহাকে মৃত বলিয়া সকলের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল, তাঁহাকে স্বশরীকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহাদের মুখ দিয়া আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। তবে পূর্ব্বের অপেক্ষা ডাক্তার সাহেবের শরীর একটু রোগা হইয়া গিয়াছে, তাঁহার মুখে চিন্তার রেখা পরিস্ফুট। জজকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে তিনি তাঁহার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন,—

"আমি কোনও কথা আপনাদের নিকট গোপন করিব না, সে রাত্রে যা ঘটেছিল, তা যথাযথ বলে যাবো। আমি যদি ঘুণাক্ষরেও পূর্ব্বে টের পেতাম যে, আমারই দোষে নির্দ্দোষ ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ যাদের আমি পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসি, তারা বিপদে পড়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই এতদিন এখানে হাজির হ'তাম। কিন্তু আমি কিছুই টের পাই নি।

"আমার পিতা পশ্চিমে ব্যবসা করিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের আর্থিক অবস্থা বড়ই খারাপ হয়। আমরা যমজ ভাই সরোজনাথ, আকারে প্রকারে ঠিক আমারই মতন দেখতে ছিল। আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকলে,

খুব নিকট আত্মীয়ও আমাদের পৃথক করতে গোলে পড়তো। আমি বিলাত থেকে ডাক্তারি পাশ করে ফিরে আসবার পূর্ব্বেই আমার পিতা মারা যান। বাড়ী এসে দেখি, আমার একমাত্র ভাই সরোজ সঙ্গদোষে পড়ে, তার স্বভাব চরিত্র একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে। আমাদের চেহারার সাদৃশ্যের জন্য আমি এমন বিপদে পড়লাম যে, সে কোনও অন্যায় কাজ করলে, লোকে আমাকে সন্দেহ করে বসতো। তাকে সৎপথে আনবার জন্য ঢের চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কোনও ফল হয় নি। সে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলে। এমন কি একটা অতীব গর্হিত কাজ করে নিজেই আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে সকলকে বলে বেড়াতে লাগলো। আমার প্রাণে ধিক্কার জন্মিল। আমি তখন দেশ ত্যাগ করে বালীগঞ্জে ডাক্তারি করবার উদ্দেশ্যে এসে উপস্থিত হই।

"ভেবেছিলাম এখানে সে আর সন্ধান নিয়ে আমাকে বিরক্ত করতে পারবে না। কিন্তু কাল বেশ মনের শান্তিতে ছিলাম। কিন্তু জানি না কি রকমে সন্ধান পেয়ে আমাকে এখানে সে পত্র দিল যে, অর্থের অভাবে তার কষ্টে দিন যাচ্ছে। শীঘ্রই সে বালীগঞ্জে চলে আসছে। চিঠি পেয়েই ভয়ে আমার দেহ শিহরে উঠলো। যখন এখানকার সন্ধান সে পেয়েছে, তখন নিশ্চয়ই এখানেও আমাকে জ্বালাতন করতে আসবে। তখন মিত্রসাহেবের ভগিনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা প্রায় পাকাপাকি হয়ে গেছ্লো; কিন্তু ভাবলাম সরোজ এখানে এলে নিশ্চয়ই আমার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অভদ্র ও অন্যায় ব্যবহার করবে। এই ভয়েই তাদের কোনও রকমে বিপদ থেকে দূরে রাখবার জন্যই আমি বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিই। কিন্তু মিত্র সাহেব ভেতরের কথা সব না বুঝে বৃথা আমার উপর সন্দেহ করে রাগান্বিত হন। আমার নিজের কষ্ট যতই হোক, যাদের আমি ভালবাসি, আমার জন্য তাদের কোনও কষ্ট ভোগ করতে না হয়, এই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

"চিঠি পাবার দু'চার দিন পরেই একদিন রাত্রে ভাই আমার স্বশরীরে এসে উপস্থিত হন। চাকর বাকরেরা কেউ জেগে ছিল না। আমি একলা পাঠাগারে পড়ছিলাম। রাত্রি তখন দশটা বেজে গেছে। সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঘরের ভেতর তাকাল। আমাদের চেহারার সাদৃশ্য এত বেশী যে তখন মনে হল যেন আরসিতে নিজের মুখ দেখছি। আমি তাকে দেখেই আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। এই ভায়ের দুর্ব্যবহারেই দেশ ত্যাগ

করে আমাকে চলে আসতে হয়। ইনিই আমাদের নির্ম্মল কুলে কালি ঢেলে দিয়েছেন। যাহোক দরজা খুলে দিয়ে তাকে ভেতরে আসতে বল্লাম।

"কাছে আসতেই তার চেহারার উপর আমার নজর পড়লো। দেখেই বুঝতে পারলাম দেহের ভেতর তার নিশ্চয়ই কোন খারাপ রোগ জন্মেছে। তার পোষাক-পরিচ্ছদ মলিন ও ছিন্ন। এ থেকেই তার আর্থিক অবস্থা আমার সম্যক উপলব্ধি হল। মুখ দিয়ে ভর ভর মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। তার চোখের কোণে কালসিটে পড়েছে, মুখেও ঘাড়ে প্রহারের দাগ রয়েছে। বোধ হয় মাতাল অবস্থায় সম্প্রতি রাস্তায় মারামারি করে এসেছে। এসেই আমার উপর তম্বি তাম্বা করতে লাগলো। আমি টাকার উপর শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছি, আর সে অর্থাভাবে কোনও দিন আধ পেটা, কোনও দিন অনাহারে দিন যাপন করেছে। বন্য পশুর মতন ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে অভদ্র ভাষায় কেবল টাকার তাগাদা করতে লাগলো। আমি অনেক কষ্টে নিজকে সংযত করে রেখেছিলাম। আমি যতই চুপ করে থাকি, তার রাগের মাত্রা ততই বাড়তে থাকে। সে চীৎকার করতে লাগল, আমাকে পুনঃপুনঃ অভদ্রভাষায় গালি দিল, মুখের কাছে ঘুষি পাকিয়ে হাত নাড়তে লাগলো, ইচ্ছা যেন ঘুঁষা বসিয়ে দেয়। হঠাৎ তার সারা দেহ থরথর করে কেঁপে উঠলো। সে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে আমার পায়ের নীচে মেজের উপর পড়ে গেল। আমি তাকে তুলে আরাম কেদরার উপর শুইয়ে দিলাম। পরে তার নাম ধরে চেঁচিয়ে কত ডাকলাম, কিন্তু কোনও সাড়া পেলাম না। তাহার দেহ অসাড়, হিম। নাড়ী পরীক্ষা করে দেখলাম, হতভাগ্যের জীবন-লীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে, তার রোগজীর্ণ হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হয়ে গেছে।

"মৃতদেহের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেম। মনে হল যেন ভীষণ স্বপ্নরাজ্যে আমি বিচরণ করছি। এমন সময় রামনিকি ভেতর দিকের দরজায় এসে ধাক্কা মারলে। আমি তাকে চলে যেতে বল্লাম। কিছুক্ষণ পরে আবার কে একজন এসে বার দিকের দরজায় ধাক্কা দেয়। কিন্তু আমি সাড়া না দেওয়ায় চলে গেল।

"মিত্র সাহেবের ভগ্নীর সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেবার পর হতেই এই স্থানটার প্রতি আমার কেমন একটা আন্তরিক ঘৃণা জন্মেছিল। জীবনটা এক মস্তবড় ভার বলে মনে হত। সুখের সব আশা ভরসাই নির্ম্মূল হয়ে

গেছে। স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষ ফলমূলে শোভিত হইবার পূর্ব্বেই স্বহস্তে ছেদন করে ফেলেছি। অবশ্য ভায়ের মৃত্যুতে আমি অনেকটা নিরাপদ হলাম বটে, কেলেঙ্কারি ও অপবাদের ভয় আর রইলো না, কিন্তু দুঃখময় অতীতের স্মৃতি কিছুতেই মন হতে মুছে ফেলতে পারলাম না। আর এমন একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগের প্রলোভন কেন ত্যাগ করি? ' আমার ভায়ের মৃতদেহ দেখলে আমি যে মারা গেছি, তা সকলেই বিশ্বাস করবে।

"ভাইকে কেউ এখানে আসতে দেখে নি। তার খোঁজ খবরও বড় কেউ রাখে না। তার সঙ্গে পোষাক পরিবর্ত্তন করলে সকলেই মনে করবে ডাক্তার সাহেবই মরে পড়ে রয়েছে। নগদ টাকাও আমার কাছে যথেষ্ট ছিল। মুহূর্ত্তমধ্যেই প্রকৃতিস্থ হয়ে স্থির করলাম, এস্থান ত্যাগ করে, দূর দেশে গিয়ে নূতন করে জীবনযাত্রা আরম্ভ করবো।

কাজেও তাই ঘটলো। তার পোষাক পরিচ্ছদ পরে অলক্ষিতে বাড়ী ত্যাগ করে চলে গেলাম। পরে পঞ্জাবে যাওয়াই স্থির করে ট্রেণে চড়ি। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, আমার মৃত্যু নিয়ে এতটা হৈ চৈ হবে, আর এর জন্য নিরীহ লোকদের এত কষ্ট ভোগ করতে হবে। আলাময়ী স্মৃতির কঠোর উৎপীড়নের হাত হতে উদ্ধার লাভের, দুঃখ কাহিনীপূর্ণ জীবনের এ অধ্যায় টাকে একেবারে বিস্মৃতির সাগরে ভাসিয়ে দেবার ব্যর্থ উদ্দেশ্যেই আমি এই কৌশল অবলম্বন করি। কিন্তু বিদেশে গিয়ে আমার মনের উত্তেজনা অনেকটা শান্ত হলো। বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাওয়ায় মিত্র সাহেবের ভগিনী কিন্তু আমার উপর আদৌ রাগ করেন নি। 'তাঁর প্রতি সহানুভূতিতে আমার অন্তঃকরণ পূর্ণ হয়ে গেল। তখন সকল কথা খুলে তাঁকে একখানি পত্র লিখলাম, কিন্তু বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি, যেন সে চিঠি তিনি কাকেও না দেখান।

"পরশু দিন সংবাদপত্রে আমি এ বিষয় পড়ি। পড়েই প্রথম গাড়ীতে কলিকাতা চলে আসি।"

ডাক্তার সাহেবের এই বক্তব্যের পর আর সাক্ষীর দরকার হইল না। বিচারও শেষ হইল। পরে ডাক্তারদের পরীক্ষানুযায়ীই স্থির হইল যে, মৃত-ব্যক্তি বহুদিন যাবৎ হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিল, পরে মানসিক উত্তেজনার আধিক্যবশতঃই তাহার হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। তজ্জন্য কাহাকেও দোষী করা যাইতে পারা যায় না।

ডাক্তার সাহেব পুনর্ব্বার বালিগঞ্জেই বসবাস করিয়া ডাক্তারি ব্যবসা চালাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মিত্র সাহেবও ভুল ধারণার বশীভূত হইয়াই যে তাঁহার উপর বৃথা রাগ ও অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি ডাক্তার সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার বন্ধুভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। আশা করি গল্পের শেষ ভাগটুকু আর বলা নিষ্প্রয়োজন, তবে এখনও যিনি বুঝিতে পারেন নাই, একখানি দৈনিক বাঙ্গালা সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশটুকু পড়িলেই তাহা তাঁহার সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইবে,—

"গত ১৪ই আষাঢ় বালিগঞ্জ নিবাসী প্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় সাহেবের সহিত বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার জে, মিত্রের ভগিনী ললিতাদেবীর শুভ বিবাহ বিশেষ জাকজমকের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের করুণ প্রেম কাহিনী প্রায় সকলেই অবগত আছেন। অনেক বাধাবিঘ্নান্তে ইঁহাদের এই মধুর মিলন চিরমধুময় ও চিরসুখময় হউক, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।"

অপত্য-স্নেহ

(১)

(লেখক—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়)

একটা পথের কুকুর। কেহ তাহার নাম জানিত না, হয় ত কোন কালে কেহ তাহার নামকরণও করে নাই। সেই কিন্তু দিনুর সৌভাগ্যের প্রধান কারণ।

সারাদিনটা দিনুর নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটিয়া যাইত। পাঁচ বৎসরের বালকের পক্ষে দ্বারপ্রান্তে সারাদিনটা চুপ করিয়া বসিয়া কাটান হয় ত সশ্রম কারাবাসের অপেক্ষাও কঠিন বোধ হইত। বেলাবার সময় কাটাইবার মত একটা খেলানা অবধি ছিল না। সে যদি দুই পা আগাইয়া যাইতে পাইত তাহা হইলেও একটা আস্তাবল দেখিয়া কতকটা তৃপ্ত থাকিতে পারিত। আস্তাবলে কয়েকটা ঘোড়া দিবারাত্রই বাঁধা থাকিত; তদ্ব্যতীত ঘোড়ার জল খাইবার চৌবাচ্চায় এক চৌবাচ্চা জল থাকিত। বালক সেখানে যাইতে

পাইলেও হয়ত ঘোড়া দেখিয়া চৌবাচ্চার জলে সিগারেটের বাক্স ভাসাইয়া কোন রকমে দিন কাটাইতে পারিত; কিন্তু মুস্কিল হইয়াছিল এই যে তাহার সে হুকুমটুকু অবধি ছিল না। একা তাহাকে চুপ করিয়া দ্বারপ্রান্তে বসিয়া থাকিতে হইত।

অন্যান্য বালকেরা যখন খেলায় মত্ত হইয়া চীৎকার করিত ও তাহাকে ডাকিতে থাকিত তখন তাহার এই ভাবে নীরবে বসিয়া থাকা আরও কষ্ট-কর হইয়া উঠিত; কিন্তু উপায় ছিল না! দীনু বাহির হইলেই যে বৃদ্ধ দেবেন কামার বাহির হইয়া আবার তাহাকে পূর্ব্ব স্থানে টানিয়া আনিবে এবং সাজাস্বরূপ তাহার কাণ মলিয়া দিবে এ কথাটা তাহার ভালই জানা ছিল।

শিশু হইলেও দীনু এটা কতকটা বুঝিত যে দেবেন কামার স্বেচ্ছায় তাহার খেলার প্রতিবন্ধকতা করিতে চাহে না; দীনুকে দেখিবার ভার তাহার স্কন্ধ হইতে অপসৃত হইলেই বরং সে বাঁচে।

আরও ছোট বেলায় তাহার মা মারা যায়। দীনুর মায়ের কথা প্রায় মনেই পড়িত না।

দীনুকে এই ভাবে সারাদিন বসাইয়া রাখার জন্য একমাত্র তাহার পিতা-কেই দোষী করা যায়। গত সপ্তাহে সে একবার তাহার এই নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী পার হইয়া আস্তাবল অবধি গিয়াছিল; পিতা দেখিতে পাইয়া তাহাকে স্নেহ-তীরস্কার ও চুম্বনে ব্যস্ত করিয়া ফিরাইয়া আনে। প্রকৃত তিরস্কার সে দীনুকে একটুও করে নাই; তবে বৃদ্ধ কামারের সহিত সে যে ভাবে বকাবকি করিয়া-ছিল তাহা দেখিয়া বেচারা দীনু অবধি ভয় পাইয়া গিয়াছিল এবং আর কোন দিন গণ্ডী পার হইবে না বলিয়া মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিল। কলের কাজ সারিয়া তাহার পিতা বাসায় ফিরিয়াই তাহাকে লইয়া বেড়াইতে যাইত, মধ্যে মধ্যে অল্প দামের দুই একটা খেলানা কিনিয়া দিত; কিন্তু মুস্কিল হইয়াছিল এই যে একটা রাত্রির পর আর একটা রাত্রি আসিতে বড়ই বিলম্ব হইত; এই দীর্ঘ সময়টা কাটাইয়া দিবার মত দিনুর কোন কিছুই ছিল না।

সেদিন প্রভাতে দীনু দ্বারে উঠিবার সিঁড়িতে বসিয়া নানারূপ খেলা খেলিবার কল্পনা করিতেছিল। প্রভাতসূর্য্য একটু একটু করিয়া পথের অপর পার্শ্বের বাড়ীগুলার মাথা অবধি উঠিয়াছিল, তাহার ফলে দীনু রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া ধাপের পর ধাপ নামিয়া অবশেষে শেষ ধাপে

পৌঁছিয়াছিল। ভিতরে দেবেন কামারের হাতুড়ী অশ্রান্ত ভাবে ঠক্ ঠক্ ঠক্ করিয়া যাইতেছিল। সে সিঁড়ির উপর বসিয়া হাতুড়ীর তালে তালে ভূমে পা ঠুকিতে ছিল।

এমন সময়ে বড় ঝাঁকড়া কাল চুলওয়ালা একটা পথের কুকুর আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল;—যেন ব্যাপারটা কি তাহাই সে জানিতে চাহে। কুকুরটা সাধারণ কুকুরের মত বিজ্ঞ হইলেও বুঝি কি একটা নূতন খেলার আভাষ পাইয়াছিল; তাই সে যখন দেখিল দীনু তাহাকে লক্ষ্যই করিতেছেনা তখন প্রথমটা সে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিয়া আনন্দ প্রচার করিতে চাহিল. তাহার পর দীর্ঘ-জিহ্বা বাহির করিয়া রহিল এবং অবশেষে সম্মুখের পা দুইটা প্রসারিত করিয়া দীনুর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যাকুল আগ্রহে খেলার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এবার দীনু তাহাকে না দেখিয়া পারিল না। সে তাহার ক্ষুদ্র করদ্বয় প্রসারিত করিয়া ডাকিল,—"আ—আ—কুকুল আ।"

প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কুকুরটা তাহার প্রসারিত কর আঘ্রাণ করিল তাহার পর সস্নেহে তাহার মুখখানা চাটিয়া দিল। ওঃ কি মজা! বালক খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল;—মনে হইল সুন্দর এই খেলার সাথীটী! এবার আর মাটীর পুতুল নহে, বৃহৎ জীবন্ত কুকুর! তাহার পরই কুকুরটা লাফাইয়া দুই পদ চলিয়া গেল আবার পরক্ষণেই তাহার কাছে ফিরিয়া আসিল। তাহার দৃষ্টিতে একটা সাদর নিমন্ত্রণের ভাব বালককে যেন ক্রমাগত তাহারই দিকে টানিতেছিল। আর দীনুকে রাখে কে? সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে দেবেন কামারও সে সময় একজন খরিদ্দারের সহিত কথায় ব্যস্ত ছিল, কাজেই সেও দীনুর কোন কার্য্য দেখিতে পাইল না।

কুকুর ধরিবার প্রলোভনটা দীনুর পক্ষে একেবারেই সম্বরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে যাইবামাত্র কুকুরটা আবার খানিকটা অগ্রসর হইল, কিন্তু তখনই সে আবার ফিরিয়া আসিল, তবে দীনুর হাতের বাহিরে; সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে চীৎকার করিয়া উঠিল; আবার সে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইল; দীনুকে ধরিতে দিবে না ইহাই যেন তাহার উদ্দেশ্য। দীনু ক্রমেই উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছিল। আর তাহারইবা দোষ কি? কোন্ নিঃসঙ্গ বালক এমন খেলার সাথী পাইলে ছাড়িয়া দেয়? গলি পার হইয়া ক্রমে সদর রাস্তায় তাহারা আসিয়া পড়িল; কুকুরটা আনন্দ-

চীৎকার করিতে করিতে একবার অগ্রসর হইয়া পরক্ষণেই ফিরিতে ছিল আর তাহার পিছনে পিছনে বালক,—"আ—আ—কুকুল খা!" করিতে করিতে ছুটিতেছিল।

আনন্দ থাকিলে পথ চলিতে কষ্ট হয় না। বৈকালে কিন্তু দীনু অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; আর এক পাও অগ্রসর হইবার তাহার ক্ষমতা ছিল না; সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ক্ষুধা! পথে দুই একজন প্রৌঢ়া রমণী বালকের সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া দুই একটা মিষ্টান্ন তাহার হাতে দিয়াছিল। কিন্তু কুকুরের পিছনে ধাবমান, সারাদিন অভুক্ত বালকের সে দুইটা মিষ্টান্নে কি হইবে? সে যে পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; এ কথাটা কাহারই মনে হয় নাই, তাহার কারণ পথের ধারে নিত্যই অমন শত শত বালক দেখিয়া থাকে; খেলার মাদকতায় সে যে পথ হারাইয়া ফেলিতে পারে একথাটা দীনুরও বুদ্ধিতে যোগায় নাই।

সন্ধ্যার ঈষৎ পূর্ব্বে অফিস ও কলের লোকে যখন পথ গুলজার হইয়া উঠিতে লাগিল তখন তাহার বাড়ীর কথা, পিতার কথা মনে পড়িয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরিতে আরম্ভ করিল। এবার কিন্তু দীনু পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল আর কুকুরটা তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। বহুদূর চলিয়াও পথটা তাহার পরিচিত বলিয়া মনে হইল না; তখন সে পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিল। এদিকের পথটা আরও নূতন; বড় বড় বাড়ী,—এ সব কাহাদের?

এই সময় আবার দেবতাও বাদ সাধিলেন। বর্ষার মেঘগুলা উড়িয়া যাইতে যাইতে বৃষ্টি ঢালিতে আরম্ভ করিল। বালক কাঁদিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু পথে সে শব্দ শুনিবার মত তখন একজনও লোক ছিল না। এদিকে বিশ্রামটাও দীনুর একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল; পা দুইটা তাহার ব্যথায় টন্ টন্ করিতেছিল এবং চক্ষের সম্মুখে ধোঁয়ার মত পুঞ্জীভূত অস্পষ্টতা আসিয়া জমিয়াছিল।

সম্মুখেই একটা দালানওয়ালা বড় বাড়ী। দীনু সেই দালানে উঠিয়া এক কোণে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া পড়িল;—সে আর বসিতেও পারিতেছিল না; কুকুরটাও তাহার কাছ ঘেঁসিয়া শুইয়া পড়িল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে একখানা রবারটায়ার কম্পাস গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। পরক্ষণেই একজন যুবক ও একটী যুবতী গাড়ী

হইতে নামিয়া দালানে উঠিলেন। শব্দ শুনিয়া কুকুরটা উঠিয়া বসিল, দীনু কিন্তু একটুও নড়িল না, সে তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রমণী সুন্দরী ও কৃশা, কিন্তু মুখখানি তাঁহার গভীর শোকে মলিন। তাঁহাদের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে দেখিয়া কুকুরটা বালককে আগুলিয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া নবাগতদ্বয় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন, পরক্ষণেই যুবক একটা দেশলাই জ্বালিলেন। আলোটা নিদ্রিত বালককে সম্পূর্ণ রূপে দেখাইয়া দিল। তাঁহারা দেখিলেন সুন্দর একটী শিশু কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইতেছে; তাহার একটা হাত মাথার পার্শ্বে পড়িয়া আছে, মুষ্টিবদ্ধ অপর হস্তের উপর তাহার কোমল কপোল ন্যস্ত রহিয়াছে।

যুবতী বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ দেখ একটী ছোট ছেলে! আহা,কি সুন্দর ছেলেটিগা! আর একটা কাটি জ্বালো,—জ্বালো শীগ্‌গির!"

যুবক যখন দ্বিতীয় বার দেশলাই জ্বালিতে উদ্যত হইলেন, বালক তখন স্বপ্নে কথা কহিতেছিল। যুবতী অগ্রসর হইয়া বালকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

অশ্রুজড়িত স্বরে তিনি বলিলেন,—"ঐ দেখ ছোট হাতখানি, মাথার কোঁকড়া চুলগুলি, ঠিক যেন আমার দেবু! গলার স্বরও ঠিক দেবুর মত। বাছা যেদিন আমাদের ছেড়ে যায়, সেদিন যেমন করে সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বকেছিল, এও ঠিক তেমনি ক'রে বক্‌ছে।"

রমণীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, চক্ষে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

"কেঁদে আর কি ক'র্‌বে বল? তার চেয়ে বরং চল ছেলেটিকে ঘরে নিয়ে যাই, তারপর যখন ওর মা বাপ খুঁজতে আসবে, তখন দিয়ে দিলেই হবে; এতক্ষণ তারা হয়ত কত খুঁজছে।"

যুবক সাবধানে দীনুকে কোলে তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইলেন; কুকুরটা বারম্বার চীৎকার করিতে লাগিল। যুবক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, —"তুইও বাড়ীর ভেতর আয়, নইলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় কর্‌বি এখুনি।"

(২)

দীনু যখন আপনার অন্যায় বুঝিতে পারিয়া বাড়ী ফিরিতে চাহিতেছিল; দীনুর পিতা প্রেমচাঁদ তখন কলের কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল।

প্রেমচাঁদ লোকটা বেশ হাতে-বহরে। বয়সও অধিক নহে। কিন্তু মুখখানি তাহার দুঃখ ও চিন্তার ছাপ খাইয়াছিল। পথে চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে সে মৃদু হাস্য করিতেছিল; ক্ষণিকের জন্য তাহার মুখের চিন্তা ও দুঃখের ভাব অপসৃত হইয়া আনন্দের ভাব প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার একটু কারণও ছিল; সেটা মাহিনার দিন; সেদিন হপ্তায় সে দুই টাকা অধিক পাইয়াছিল; সাহেব তাহার কাজে তুষ্ট হইয়া "হপ্তা" বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। অধিক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলে তাহার পুত্র দীনু যে সুখে থাকিবে এই চিন্তায় স্নেহ বশতঃ পিতার অন্তর পুরিয়া উঠিয়াছিল। না হইবেই বা কেন? আর তাহা ছাড়া দিন দিন যে তাহার মাহিনা বাড়িবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? যদি তাহা হয়, তবে হয়ত কালে সে কামারের ভাড়াটিয়া কুটরী ত্যাগ করিয়া একখানা ছোটখাট বাড়ী ভাড়া লইতে পারিবে এবং চাইকি দীনুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন দাসীও নিযুক্ত করিতে পারে!

অকস্মাৎ পথে যাইতে যাইতে একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল;—সে ভাবিল আজ এই যে দুইটা টাকা সে বেশী পাইয়াছে ইহা হইতে দীনুর জন্য একটা খেলানা কিনিয়া লইয়া গেলে কেমন হয়? দুই একবার ইতস্ততঃ করিয়া সে একটা উজ্জ্বল আলোকময় দোকানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

দোকানী প্রশ্ন করিল,—"কি চাই মহাশয়?"

"এই এটা কত? বলিয়া সে একটা ছোট ঢোলকের মূল্য জানিতে চাহিল।

প্রেমচাঁদ বাসার দ্বারে পৌঁছিয়া ক্রীত ঢোলকটী পিছনে গোপন করিয়া সিঁড়িতে উঠিল;—ইচ্ছা, অকস্মাৎ বালকের সম্মুখে খেলেনাটী বাহির করিয়া তাহাকে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু প্রবেশ পথে বালকের সাড়াশব্দ পাইল না।

বোধ হয় বৃষ্টি আসিয়াছিল বলিয়া বালক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এই মনে করিয়া সে অগ্রসর হইল।

প্রেমচাঁদকে দেখিবামাত্র দেবেন তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া কাজে মন দিল,—যেন তাহাকে লক্ষ্যই করে নাই, এমনি তাহার ভাবটা!

প্রেমচাঁদ, পাছে দেবেন কামার ঢোলকের কথাটা পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশ

করিয়া দেয়,এই ভয়ে তাহাকে তাড়াতাড়ি সাবধান করিয়া দিল,—"কামারের পো, কোন কথা কহিল না।"

আনন্দের আতিশয্যে প্রেমচাঁদ দেখিতেই পাইল না যে তাহার কথা শুনিয়া দেবেনের মুখখানা পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে! দেবেন কাজ ছাড়িয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

সে শুনিল পিতা ডাকিতেছে,—"দীনু! ও দীনু!" কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রেমচাঁদ আবার বলিল,—"লুকিয়ে থাকিস নি বাবা, দেখ তোর জন্যে কি এনেছি!"

দেবেন বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিল, প্রেমচাঁদ জামা কাপড় বিছানা সরাইয়া দীনুর অনুসন্ধান করিতেছে। সত্য কথা বলিতে কি, যে সকল স্থানে বিড়ালও আত্মগোপন করিতে পারে না প্রেমচাঁদ সেরূপ স্থান সকলও অনুসন্ধান করিতে বাকি রাখে নাই। তাহার পরই তাহার দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। দেবেন তাড়াতাড়ি নিরীহের মত আপনার কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। পরক্ষণেই প্রেমচাঁদ তাহার দোকান ঘরে প্রবেশ করিল।

"কামারের পো, আমার ছেলে?"

দেবেন চোখ তুলিয়া প্রেমচাঁদের জিজ্ঞাসু নেত্রের দিকে চাহিয়া রহিল; কোন কথা বলিল না।

প্রেমচাঁদ ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল।

সে আগ্রহ-ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—"কখন হারিয়েছে?"

"সকাল থেকে।"

"সকাল থেকে!" কথাটা তাহাকে চাবুকের মতই আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল।

পরক্ষণেই খেলার ঢোলটা সশব্দে কামার দেবেনের পৃষ্ঠে পড়িয়া শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। তাহার পরই সে দেবেনের গলা ধরিয়া তাহাকে ভূপাতিত করিয়া লাথি ও চড় মারিতে আরম্ভ করিল।

দেবেনের সৌভাগ্যক্রমে, আঘাতের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া তাহার অপরাপর ভাড়াটিয়া সে স্থানে আসিয়া পড়িল। সকলের সমবেত চেষ্টায় প্রেমচাঁদের কবল হইতে দেবেন মুক্তি পাইল।

পরক্ষণেই প্রেমচাঁদের ক্রোধটা শোকে পর্য্যবসিত হইল। দেবেন তখন ব্যথা-কম্পিত-কণ্ঠে আপানার যে কোনই দোষ নাই, নানা ছাঁদে ঘুরাইয়া

ফিরাইয়া সেই কথাটাই প্রমাণ করিতে চাহিতেছিল। পুত্র হারা পিতা শূন্য মনে সেগুলা শুনিয়া গেল, একটা কথাও বলিল না, তাহার পর ধীরে ধীরে দোকান ঘর ছাড়িয়া সে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। কি যে করিবে তাহা সে কখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রাণের মধ্যে তখন শুধু বাছাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার একটা দুর্জ্জয় বাসনা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য সে আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিল না।

পূর্ণ চারি ঘণ্টাকাল সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল, দূর হইতে কোন সুন্দর মুর্ত্তি বালক দেখিলেই সে দীনু মনে করিয়া তাহার নিকট ছুটিয়া যাইতেছিল। মধ্যে মধ্যে পথে থামিয়া সে জিজ্ঞাসা করিতেছিল,—"একটা কুকুরের সঙ্গে একটী ছোট ছেলেকে এদিকে আসতে দেখেছ?" ঘটনাটা অতি সাধারণ; সহরের কত ছোট ছোট ছেলে কুকুর লইয়া খেলা করিয়া থাকে। প্রেমচাঁদ দুই একটা সন্ধানও পাইল, কিন্তু শেষ অবধি সন্ধান করিয়া কোথাও তাহার দীনুর সন্ধান পাইল না। রাত্রি দশটার পর সে কতকটা হতাশ হইয়াই বাসায় ফিরিয়া আসিল। তখনও সে সম্পূর্ণ আশা ত্যাগ করিতে পারে নাই; প্রভাতের আলোকে আবার নূতন করিয়া সন্ধান আরম্ভ করিবে স্থির করিয়া রাত্রির মত সে বিশ্রাম গ্রহণ করিল।

(৩)

প্রভাতে উঠিয়াই সে আবার দীনুর সন্ধানে বাহির হইল; সেদিন আর তাহার কাজে যাওয়া হইল না; দীনুকেই যদি না পাওয়া যায় তবে টাকা উপায় করিয়া সে কি করিবে?

দিনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশা হতাশায় পরিণত হইল; কিন্তু তথাপি সে অনুসন্ধান ত্যাগ করিল না। বাঁচিবার সাধের মতই দীনুকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ইচ্ছাটা তাহার অন্তরের মধ্যে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল! সারাদিন তাহার আহার করিবার অবধি অবসর হয় নাই; পাছে সময় নষ্ট হয়। রাত্রে কোনরূপে দুইটা অন্ন মুখে তুলিয়া সে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করিল; সারাদিনের পরিশ্রমের পর সে আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না।

দুইটা দিন এই ভাবে ব্যর্থ অনুসন্ধান করিয়া সে একেবারেই নিরাশ হইয়া পড়িল; সেদিন সন্ধ্যার সময় সে আর অনর্থক অনুসন্ধান করিতে বাহির না হইয়া কলের এক সহকর্ম্মীর বাড়ী বেড়াইতে গেল। উদ্দেশ্য বন্ধুর সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা।

বন্ধু শক্তিনাথ সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। প্রেমচাঁদের জন্য সহানুভূতিতে তাহার অন্তর পুরিয়া উঠিল। সে বলিল—"পুলিশেও কোন সন্ধান করতে পারলে না ?"

"পুলিশে ? পুলিশে ত আমি যাইনি।"

"সে কি হে ? এই দু'তিন দিন অনর্থক ঘুরে ম'রছ, তবু পুলিশে একবার খোঁজ করনি ? চল এখুনি আমার সঙ্গে, রাইটারের সঙ্গে আমার ভাব আছে, এখনি একটা হেস্ত নেস্ত হ'য়ে যাবে'খণ।"

দুই জনে তখনই বাহির হইয়া পড়িল।

রাইটার কনেষ্টবল তখন সবে মাত্র কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সকল কথা শুনিয়া বলিল,—"বোস, আমি দারোগা বাবুকে একবার জিজ্ঞেস ক'রে আসছি।

তাহারা দাওয়ায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রেমচাঁদের মনে হইতে লাগিল লোকটা যেন একযুগ হইল গিয়াছে।

কয়েক মিনিট পরেই রাইটার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"ছেলেটীর সন্ধান পাওয়া গেছে, ৬৯নং সতীশ বাবুর ষ্ট্রীটে শা-বাবুদের বাড়ী সে আছে। তিন দিন হোল বোধ হয়, সা বাবু আমাদের সে কথা রিপোর্ট ক'রে গেছেন। বোধ হয় তাঁরা তোমার ছেলেকে পোষ্যপুত্র ক'রতে চান।"

কথাটা শুনিয়া প্রেমচাঁদ হাসিয়া উঠিল। তাই কখনও হয় গা ! তাহার ছেলে ! কিন্তু তাঁহারা ধনী ! না এ কথার কোন আবশ্যক নাই, সারা পৃথিবীর বিনিময়েও সে দাদুকে দিবে না।

পরদিন সকালেই সে সা-বাবুদের বাড়ী যাত্রা করিল। দ্বারবান কিন্তু প্রথমে কিছুতেই প্রেমচাঁদকে বাড়ী ঢুকিতে দিল না, তাহাদের চীৎকার শুনিয়া অবশেষে বাড়ীর মালিক স্বয়ং বাহিরে আসিলেন। প্রেমচাঁদকে দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, কেন এই অপরিচিত আজ তাহার দ্বারস্থ হইয়াছে।

তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"আপনি কি চান ?"

প্রেমচাঁদ ভদ্রলোক দেখিয়া কতকটা শান্ত হইল,—"আজ্ঞে আমার ছেলেটি—"

"ও ! তা আসুন না ভেতরে।"

প্রভাত বাবু প্রেমচাঁদকে লইয়া গিয়া বৈঠকখানা ঘরে বসাইলেন, তাহার পর প্রশ্ন করিলেন,—"ছেলেটী আপনার ক'দিন হ'ল হারিয়েছে ?"

"আজ বুঝি চার দিন হ'ল।"

"খাসা ছেলেটী আপনার, হারাল কি ক'রে?"

"আজ্ঞে, দুঃখের কথা আর বলেন কেন? সকালে বেরুই, আর সন্ধ্যের সময় আমি কল থেকে ফিরে আসি; বাছাকে আমার সারাদিন একলাটি থাকতে হয়; যে কামারের বাড়ী আমরা ভাড়াটে আছি, সেই ছেলেটার ওপর একটু নজর রাখে। সে দিন কখন যে সে কুকুরটার সঙ্গে খেলতে খেলতে চলে এসেছে তা আর সে দেখতেই পাইনি। আপনি কি ক'রে তাকে পেলেন?"

প্রভাত বাবু কেমন করিয়া দীনুকে পাইয়াছিলেন, সবিস্তারে তাহা বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—"আমাদের দেবকুমার ঠিক আপনার ছেলেটীর মত সুন্দর ছিল, ঠিক ওম্‌নি কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি, ওম্‌নি গাল ভরা হাসি, খাশা বাড়ন্ত গড়ন। আপনার ছেলেকে পাবার দুদিন আগে সে আমাদের বুক ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেছে; আপনার দীনুকে পাওয়ায় তবে আমার স্ত্রীকে কতকটা শান্ত ক'তে পেরেছি।"

এই সময় দীনুর কুকুরটা দীর্ঘ জিহ্বা বাহির করিয়া সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। নবাগত প্রেমচাঁদকে দেখিয়া সে যেন কতকটা বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল; দুই একবার তাহার আঘ্রাণ লইয়া সে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। প্রভাত বাবু বলিলেন, "ঐ—ঐ সেই কুকুর, ওরই সঙ্গে দীনু এসেছিল।"

প্রেমচাঁদ কুকুরটার দিকে চাহিয়া রহিল। সে তাহার উপর রাগ করিবে কি সন্তুষ্ট হইবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

প্রেমচাঁদ ক্রমেই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, অবশেষে আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া বলিল,—"দীনুকে তা হ'লে আনিয়ে দিন, আমায় যেতে হবে।"

"আপনি দীনুকে নিয়ে যেতে চান? কিন্তু তা ত' হবে না; তার যে বড্ড অসুখ ক'রেছে। সেদিন জলে ভিজে পরদিন থেকেই তার জ্বর দেখা দিয়েছে।"

প্রেমচাঁদের হৃদয় উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়া উঠিল,—"অসুখটা কি বাঁকা রকমের?"

"না সোজা-সুজি জ্বর, ভাববার বিশেষ কিছু নেই।"

"একবার দেখতে পাই না?"

"হ্যাঁ চলুন না!"

অবশেষে পুত্রকে দেখিয়াই প্রেমচাঁদকে রিক্তহস্তে ফিরিতে হইল। রুগ্ন পুত্রকে আনিবার জন্য সে আর জিদ করিল না। সেত সারাদিন কাজে থাকিবে, তবে বাছাকে দেখিবে শুনিবে কে? দ্বারপ্রান্ত হইতে দেখিয়া আসিয়াছিল প্রভাত বাবুর পত্নীর ক্রোড়ে শুইয়া দীনু পরম নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে, সে সে সুখ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে চাহিল না।

(৪)

পরদিন সকালে উঠিয়া প্রেমচাঁদ যখন কাজে গেল, তখন শুনিয়া বিস্মিত হইল যে বিনা আবেদনে কামাই করায় তাহার চাকুরী গিয়াছে।

বড় বাবুর কাছে অনুসন্ধান করায় তিনি রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন,—"আজকালের বাজারে চাকরীটা হেনস্তার জিনিষ নয়। বাঙ্গালীর উন্নতি কি সাধে হয় না, যেই দুটাকা মাইনে বেড়েছে অমনি মদ খেয়ে তিন তিন কামাই ক'রে ব'সলে।"

কথাটা শুনিয়া অন্তর তাহার বিষাদে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু সেটা কেবল ক্ষণিকের জন্য। লোকটা বলে কি? সে মদ খাইয়া এ তিন দিন পড়িয়াছিল? মনে মনে একটু কষ্টের হাসি হাসিয়া সে ভাবিল—"হুঁ, মদই বটে!" যাহা হউক ইহাতে সে অধিকক্ষণ দুঃখিত রহিল না; সে ভাবিল,—"জগতে আরও সহস্র কাজ রয়েছে; আর তা ছাড়া ভগবান তাকে সামর্থ্য দিতে কার্পণ্য করেন নি, তবে কাজ গেছে ভেবে অনর্থক ব্যথা পায় কেন?"

একে একে সে অনেকগুলা কল ও অফিসে কাজের সন্ধানে ঘুরিয়া আসিল; কিন্তু না, সকল স্থানেই ঐ এক কথা,—"কাজ কম। লোক তার চেয়ে ঢের বেশী আছে; আমরাই লোক ছাড়াবার চেষ্টা ক'রছি। নতুন লোক আর নেব না।" ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল। প্রেমচাঁদ কিন্তু নিরাশ হয় নাই। সন্ধ্যার সময় যে দীনুকে দেখিতে যাইবার কথা আছে, এই কথাটা মনে করিয়াই সে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সে যখন প্রভাত বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল, দীনু তখন দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেছিল। শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্নেহ-কাতর পিতা কতক্ষণ অবধি চাহিয়া চাহিয়া বালকের সুকুমার মুখখানি দেখিল। তাহার পর সে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাড়াই-

তেই প্রভাত বাবু বলিলেন,—"ছেলেটীকে আমরা রাখতে চাই, একটু কথাটা ভেবে দেখবেন।"

প্রেমচাঁদ কথাটা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিল না;—"তা নাকি কখনও হয়! তার ছেলে! নিশ্চয়ই ঠাট্টা ক'রে প্রভাতবাবু কথাটা বলেছেন।"

কিন্তু দিনের পর দিন যতই সে প্রভাতবাবুর বাটী যাতায়াত করিতে লাগিল ততই সে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে লাগিল যে প্রভাতের সেদিনকার কথাটা তামাসা নহে; পরন্তু একান্ত আন্তরিক। পিতার অসম্মতিতে দম্পতির জিদ্‌টা যেন দিন দিন বাড়িয়াই উঠিতেছিল। কথাটায় পিতার প্রাণে অসন্তোষের অন্ত ছিল না; সে তাঁহাদিগকে বলিল,—"দীনুকে ঘন ঘন আপনাদের সঙ্গে দেখা ক'রতে পাঠাব, মাঝে মাঝে এসে সে আপনাদের কাছে থাকবে।" কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা তুষ্ট হইতে পারিলেন না। ফলে দাঁড়াইল এই যে প্রেমচাঁদ প্রথমে এই ধনী দম্পতীকে যে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল এখন তাহার সেই কৃতজ্ঞতাটা ভয়ে পর্য্যবসিত হইল। শুধু একটী কারণে সে তখন দীনুকে লইয়া যাইতে পারিতেছিল না। সেটি দারিদ্র্য। চাকুরিটী যাওয়ায় তাহার হাতে প্রায় কিছুই ছিল না, সুতরাং এ অবস্থায় পুত্রকে আনিয়া সে খাওয়াইবে কি?

যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াও সে একটা কাজ জুটাইতে পারিল না। সকল স্থানেই সে একই উত্তর শুনিল,—"সময়টা মন্দা পড়েছে, আমরাই লোক তাড়াচ্ছি।"

তাহার যে চাকুরী নাই বা হাতে পয়সা নাই একথা সে প্রভাতবাবুকে বলে নাই। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সে দীনুকে দেখিতে যাইত, যেন কাজ কর্ম্ম সারিয়া সে আসিতেছে। এইরূপ কথায় দীনুকে সে জাগ্রত অবস্থায় এক দিনও দেখিতে পাইত না কিন্তু তথাপি অন্য উপায় ছিল না। প্রভাত বাবু জানিতে পারিলে দীনুকে রাখিবার পক্ষে তিনি আরও অখণ্ড যুক্তি খাটাইবেন; প্রেমচাঁদ আর যুক্তি খণ্ডনে সম্মত নহে।

সে মাসের ঘর ভাড়া চুকাইয়া দিবার পর প্রেমচাঁদের হাতে এমন অর্থ রহিল না যে এক সপ্তাহের বেশী আহার চলে। চাকুরী নাই বলিয়া ত পেট বুঝিবে না! বার বার ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সে অনেকটা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু চাকুরী না হইলে রুগ্ন পুত্রের ঔষধ পথ্য কি করিয়া চলিবে? কথাটা ভাবিয়া তাহার চিন্তার অবধি রহিল না। বহুক্ষণ পরে

তাহার একটা কথা মনে পড়িল,—হাঁ উপায় আছে! কিন্তু তাহাতে তাহার আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তা হউক, তবু বাঁচার ত একটা গতি হইবে।

তাহার এক দূর সম্পর্কীয় ভাই ছিল;—সে বেশ সঙ্গতিপন্ন। প্রেমচাঁদ স্থির করিল তাহারই নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিবে। সেই দিনই সে ভাইয়ের নামে একখানা পত্র ছাড়িয়া দিল।

প্রভাত বাবু একদিন প্রস্তাব করিলেন ছেলেটীর স্বাস্থ্যের জন্য তাহার দিন কয়েক বায়ু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। প্রেমচাঁদ তাহাতে বিশেষ কিছু আপত্তি করিল না। পুত্রের যে এখন কয়েক দিন অবধি তাহাকে ভার গ্রহণ করিতে হইবে না, এই চিন্তাটা তাহাকে অনেকটা শান্তি প্রদান করিল।

সেদিন দীনুকে লইয়া প্রভাত বাবু বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিমে যাত্রা করিলেন। প্রেমচাঁদ সেদিন কাজ কামাই করিয়াছে এই অছিলায় সকালে আসিয়া কতক্ষণ দীনুর সহিত কাটাইয়া গিয়াছিল। বালক তাহার কথা মোটে ভুলে নাই;—ওঃ! সে কি আগ্রহেই তাহার ক্রোড়ে উঠিয়া বসিয়াছিল! প্রেমচাঁদ বহুক্ষণ বসিয়া বসিয়া তাহার সহিত নানা অবান্তর কথা কহিল, তাহার পর ছল ছল নেত্রে হাসিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় সে শক্তিনাথের বাড়ী বেড়াইতে গেল। শক্তিনাথ খুটাইয়া খুটাইয়া দীনুর কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার পর প্রেমচাঁদ চাকুরী পাইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু এতদিনেও সে কোন কাজ পায় নাই শুনিয়া সে দুঃখিত হইল।

"দেখ, প্রভাত বাবু যখন দীনুকে নিতে চাচ্ছেন তখন ওঁর কাছেই ওকে দিয়ে দাও; তা হ'লে ওর আখেরের কথা আর ভাবতে হবে না।"

প্রেমচাঁদের মনে হইল ইহা অপেক্ষা যদি সে তাহার গালে একটা চড় মারিত তাহা হইলেও বোধ হয় সে এতটা ব্যথিত হইত না। বক্তা যদি শক্তিনাথ না হইয়া অন্য কেহ হইত, তবে বোধ হয় সে তাহাকে প্রহার করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। কথাটা সে বলিল কেমন করিয়া? সে না পুত্রের পিতা! প্রেমচাঁদ স্থির করিল আগে ভায়ের নিকট হইতে টাকাটা সে পাউক, তাহার পর সকলকে দেখাইয়া দিবে; পুত্র স্নেহ কাহাকে বলে!

দীনুকে যেদিন ফিরাইয়া পাইবার কথা, তাহার পূর্ব্বদিন প্রেমচাঁদ ভ্রাতার নিকট হইতে ঈপ্সিত পত্র পাইল। সাগ্রহে পিয়নের নিকট হইতে খামখানা লইয়া ছিড়িয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি পত্রখানা বাহির করিতেই তাহার পদপ্রান্তে একখানা নোটের মত কাগজ পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি সেটা তুলিয়া লইয়া দেখিল একখানা পাঁচ টাকার নোট!

পত্রখানা খুলিয়া পাঠ করিল। প্রথমের অনেকটা অংশ উপদেশ ও তিরস্কারে পূর্ণ, শেষের দিকে লেখা ছিল,—

"তোমার পুত্রকে লইয়া চলিয়া আইস। এখানে আমার খামারে কাজ কর্ম্ম দেখিলে, আমিই তোমাদের পিতাপুত্রের ভরণ পোষণ করিব—এই সঙ্গে টিকিটের জন্য ৫৲ টাকা পাঠাইলাম; হাতে বেশী টাকা না থাকায় অধিক পাঠাইতে পারিলাম না।"

উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া প্রেমচাঁদ বসিয়া রহিল। হায়, আজ তাহার শেষ আশাও ভস্মসাৎ হইয়াছে! জীবনযুদ্ধে সে আজ পরাজিত; —তবে আর কি করিবে? কি করিতে পারে সে?

পরদিন অতি প্রত্যুষেই সে শয্যা ত্যাগ করিয়া আপনার সামান্য জিনিষ কয়টা বাঁধিয়া লইল। তাহার পর দেবেন কামারের নামে দুই ছত্র পত্র লিখিয়া সে জিনিষপত্র লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সে যখন প্রভাত বাবুদের বাটীতে উপস্থিত হইল, তখন প্রভাতবাবু সবে মাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতেছেন। প্রেমচাঁদকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, —"আসুন, দীনু আপনার ভারি সুন্দর হয়েছে, আনাচ্ছি তাকে।"

বাধা দিয়া প্রেমচাঁদ বলিল,—"থাক, আমি সে জন্যে আসিনি; আজ আমি আমার সর্ব্বস্বকে আপনাদের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে এসেছি। দেখবেন বাছার যেন......। অশ্রু তাহার কণ্ঠ রোধ করিল।

প্রভাত বাবু বলিলেন,—"একবার দেখা ক'রবেন না?"

প্রেমচাঁদ বলিল,—"আজ্ঞে না, আমি আসি তাহ'লে।"

অশ্রু টল টল চক্ষে প্রভাত বাবু নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি তখন ভাবিতে ছিলেন কি সে বিষম বেদনা, যাহাতে কাতর হইয়া হৃদয়-তন্ত্রীর মত প্রিয় পুত্রকে পিতা এমন করিয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে?

একাল সেকাল

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

(লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(৩০)

বধূজনোচিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, লজ্জাসম্ভ্রম, সংযমশিক্ষা বা সুখসুবিধায় শোভার লেশমাত্র অভিজ্ঞতাও ছিল না, বিধিনিষেধের গণ্ডীর বাহিরে দাঁড়াইয়া ইচ্ছার অনুকূলে কাজ করিয়া করিয়া হৃদয় তাহার বন্ধনকে এড়াইত, শুধু তাহাই নহে, একান্ত ভাবে ঘৃণাও করিত। প্রথম শ্বশুর গৃহে পা বাড়াইয়াই সে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, উজ্জ্বল আলোর নিকট হইতে কে যেন জোর করিয়া অন্ধকূপের দিকে টানাটানি করিয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্লান্ত করিয়া তুলিল। পাড়াগায়ে পা ফেলিয়া পল্লীরমণীগণের আচার ব্যবহার, আলাপ পরিচয়ে উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতায় সে আপন ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিল। ঘোমটা খোলা বধূকে দেখিয়া যে অট্টহাস্য ও কানাকানির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতেই সে দমিয়া চমকিত হইল। "ওমা কি বেহায়া গা" হবেইত, সহুরে মেয়ে না;" ইত্যাদি অস্পষ্ট অথচ শ্রুতিগোচর বিষাক্ত কথায় শোভার অসন্তুষ্ট অন্তঃকরণ একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। তবু কিন্তু এই অসভ্য বর্ব্বর লোকগুলির বিরুদ্ধে সে কথা বলিতে কেমন ঘৃণা বোধ করিল, হয়ত ক্ষণিকের জন্য অতখানি সাহসও তাহার হইল না। শ্বেত স্বেদে কপাল ঘামিয়া উঠিল। শোভা উঠিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে যে ঝি আসিয়াছিল, তাহার দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল—"চল্‌ত, আমায় একটা নিরিবিলি যায়গায় নিয়ে, এ অসভ্য হট্টগোলে যে তিষ্ঠানই দায় হয়েছে।"

মুচ্‌কি হাসিটা এবার মুখের বাহির হইয়া পড়িল, শ্বশ্রু মহামায়া অবাক্ হইয়া চাহিয়াছিলেন, বিস্ময়ে বিষাদে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। ঝী তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল—"নিয়ে চল না দিদিবাবুকে একটা নিরিবিলি জায়গায়।"

"তাইত" বলিয়া গৃহিণী দৃষ্টি নামাইয়া লইলেন, "মার আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে না মা, তা একটু দাঁড়াও, এই নন্দ এল বলে, স্ত্রী-আচার এ যে না কল্লেই নয় মা।"

কুরুচি ও কুশিক্ষা শোভার শিরায় শিরায় যেন ম্যালেরিয়ার বিষ ছড়াইতে

ছিল। এবারও ঝিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিল, "বল না, ওদের, এতটা আমি বরদাস্ত কর্ত্তে পারি না।"

কথাটা কাণে কাণে প্রবেশ করিয়া যখন এমন সাধের বিবাহটার প্রতি পুরাদস্তর অশ্রদ্ধা ঘোষণা করিতেছিল, তখন গৃহিণী মহামায়া আর আপনাকে সাম্‌লাইতে না পারিয়া একেবারে বধূর হাত ধরিয়া ফেলিলেন, কোমল অথচ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"ছিঃ মা, বের কনে, তার মুখে নাকি এমন সব কথা সাজে!"

শোভাও গরম হইয়া উঠিল, তীব্র কণ্ঠেই উত্তর করিল, "সাজে কি না সে আমি বুঝ্‌ব, সালিশী কর্ত্তে কাউকে ডেকে পাঠাইনি!"

হাত ছাড়িয়া গৃহিণী বসিয়া পড়িলেন। তিরস্কারের ও সমবেদনার একটা অস্ফুট কলরব ঘরখানাকে মুখরিত করিয়া তুলিল। শোভা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া দুই পা বাড়াইয়া ঝীকে লক্ষ্য করিয়াই বলিল,—"কাঠ হয়ে যে বড় দাঁড়িয়ে রয়েছিস, ঘর ছেড়ে যাবি কিনা বলত?"

ধীর পাদ-বিক্ষেপে পুলিনবিহারী প্রবেশ করিলেন। শান্ত স্বর কোমল করিয়া বলিলেন—"কি মা, মন টিক্‌ছে না? কেন?"

শোভার বুকটা যেন বার আনা রকমের হাল্কা হইয়া গেল, কেন যে নিজেও জানে না, এই লোকটিকে দেখিলে তাহার মনের গতি কেমন বেসুরা গাহিয়া উঠে, এবার সেও সহজ স্বরে বলিল,—"জানেন ত আপনি এত সব, গণ্ডগোল আমি কোন দিনই বরদাস্ত কর্ত্তে পারি না!"

"তা নয়ত, মাকে আমার এখনকার মত ছেড়েই দাও, ছেলে মানুষ, নূতন জায়গা, একটু সামলিয়ে নিক্।" ইহা বলিয়া পুলিনবিহারী গৃহিণীর শুষ্ক মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া অনেকটা বিমনা হইয়া পড়িলেন।

গৃহিণী ক্ষুদ্র শ্বাস ত্যাগ করিলেন, ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া ক্ষুণ্ণ স্বর খাট করিয়া বলিলেন,—"এমন অনাছিষ্টিই আমি কর্ত্তে দি কোন্ সাহসে, বাপপিতামহর কাল থেকে যে আচার চলে আস্‌ছে, তা না কল্লে যে বাছার আমার অমঙ্গল হবে।"

"অমঙ্গল কেন হতে যাবে, দুমিনিট আগুপাছু কল্লেই আচারের ব্যতিক্রম হবে, এমনত কোন খানে লেখাও নেই, নয়ত মাই আমার এতটুকু সহ্য কর্‌বে, তা বলে তোমার মনে কিছু কষ্ট দিতে পারে না, আর জানত মা, কাজ কর্ত্তে গেলে পূরণ বাদ দিয়ে চলে না, বিশেষতঃ এ সকল কাজে অন্যথা কল্লে,

গুরুজনের মনে একটা খট্‌কাই থেকে যায়, কি কাজ, নিজের একটু কষ্টের জন্যে অতটা জঞ্জাল টেনে এনে। আপন শরীর বৈত নয়, ও যে সয়ালেই সইতে পারে, তা যা কি করবে, নিজের একটু কষ্ট স্বীকার করে ও'র মনে যেন আঘাত লাগ্‌তে দিও না।" বলিয়া তিনি যেন টোপের সহিত বড়সিটি মাছের গলায় গাথিয়া দিয়া খেলিবার জন্য স্ত্রীকে রাখিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। শোভাও আর কথা বলিল না, যাদুকরের মন্ত্রের মত পুলিনবিহারীর কথাগুলি যেন ক্ষণেকের জন্য তাহাকে ইহাদের মুঠার ভিতর টানিয়া নিল।

(৩১)

হাল্কা ভারকে দ্বিগুণ করিয়া দিল, স্ত্রী আচার। দুষ্কর হইলেও শোভা এই অত্যাচারটা সহ্য করিল কেবল পুলিনবিহারীর আদেশে। কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের গর্জ্জনটা সকলকেই সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। ফুলশয্যার সময়ও শোভা গুম হইয়া বসিয়া রহিল, এদিকের অত্যাচারের যেমন অভাব ছিল না, তাহার অভিমানও তেমনি সদলবলে দেহ মন হাড় গোড় পর্য্যন্ত আটিয়া ধরিতেছিল। এই অভিমানের গায়ে আঘাত করিয়া বারুদে আগুন ধরাইল; নন্দকিশোর নিজে। অনেক রাত্রিতে নীরস শুষ্কমুখে সবাই যখন ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল, তখন সে বলিয়া উঠিল—"এ তোমার কি কাণ্ড, এতগুলো লোক এমন করে টানাটানি কল্লে; তোমার মুখ দিয়া একটি কথাও বেরুল না, এই অপমানটা যে কল্লে এতে তোমার অধিকার।"

শোভা জ্বলিয়া উঠিল, রুদ্ধ জলটা যেন বাঁধ ভাঙ্গিয়া স্রোতের মুখে ধাওয়া করিয়া চলিল। বলিল—"অধিকার আমার কোথায় কতখানি সেত আমি কাউকে জিজ্ঞাসাও করিনি, আর কাণের গোড়ায় এত ঘ্যান ঘ্যানান আমি সইতেও পারি না।"

ক্রমবিস্ময়ে নন্দকিশোরের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, প্রথম পত্নী সম্ভাষণে তাহার একি কঠোর পরীক্ষা! নিজের রূঢ় কথার জন্য অনুতপ্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিল,—"জিজ্ঞাসা নয়ত তুমি করই নি, কিন্তু আমায় ত উপযাচক হয়ে না বলে দিলেও চলে না, ভার যখন নিয়েই এসেছ, তখন বইতে পারি না পারি সে বিচারও কর্ত্তে পারব না?"

শোভা কোন প্রকারেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, এতবড় ভারটা সে কখন কোন্ মুহূর্ত্তে এই চির অপরিচিত অশিক্ষিত লোকটির হাতে তুলিয়া

দিয়াছে। নিজের সম্বন্ধে তার এমনই কি অভাব হইয়াছিল যে, আপন অধিকার অনধিকার পর্য্যন্ত সে বুঝিতে পারিবে না। তীব্র কণ্ঠে উত্তর করিল,—'নিজের শুতে যায়গা নেই শঙ্করাকে ডাকে' এও যে দেখছি তাই। কাজ নেই আর অতত্তে, নিজের ভার যখন হাল্কা বলে মনে হবে, তখন নয় এই মুখ্যু পাড়ায় রাশী কৃত জঞ্জাল ঘাড় পেতে নিও, তবু যেন আমার ভার বইয়ে এমন আশাও ক'র না, আর আমি এমন অক্ষম নৈ যে, আর একজনের ঘাড়ে ভার চাপাতে যাব, আর আমার ভার বৈবে, এমন আশা তোমার আছে, সে কথাও কিছু আমি বিশ্বাস করি না।"

এত গুলি কথার উত্তরে নন্দকিশোরের মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না, সে একবার মাত্র সেই পূর্ণাবয়বা সৌন্দর্য্যমণ্ডিতা পত্নীর দিকে দৃষ্টি করিয়া দুই হাত সরিয়া বসিল; মনে মনে বলিল—"এত রূপ এমন ভাবে অস্পৃশ্য করে দিও না ভগবান্, যদি এনে উপস্থিতই করেছ, তবে কেন কাঁটার বেড়ায় ঘিরে রাখ্‌বে, ভোগেই যদি না লাগ্‌তে দিলে ত প্রলোভন বাড়িয়ে লাভ।" আস্তে আস্তে অপমানের কালিমাটা মুছিয়া নবোঢ়া বধূর দোষগুলি ঢাকিয়া দিবার উদ্দেশ্যে ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"সে সব বিচার বিতর্ক নয়ত এখন থাক, কিন্তু এতগুলো লোক, এদের দুটো মিষ্টি কথায় তুষ্ট কর্ত্তে পাল্লে তাতে কৃপণতা করাই কি ভাল হয়েছে?"

"পারি না আমি এসব বর্ব্বরতার প্রশ্রয় দিতে, যত সব ভূত পেত্নী চারদিক থেকে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।"

"তাই নাকি?" বলিয়া নন্দকিশোর একটা ক্ষুদ্র শ্বাস ত্যাগ করিল। শঙ্কিত দৃষ্টিটা মুক্তবাতায়নে ঘরখানার চারিদিকে ঘুরাইয়া লইয়া শোভার হাত ধরিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—"ছিঃ, অমন কথা মুখেও এন না, ওতে পাপ হবে, সবাই যে তোমার গুরুজন, আজ হ'ক, কাল হ'ক, নয়ত দুদিন বাদেই হ'ক, ওদেরই তোমায় আপন ক'রে নিতে হবে।" এরা কেউত আমার পর নয়।"

"তোমার পর নয়, তা বলে আমি যে এদের মাথায় করে নেব, এমন কথা ভেবে থাকত সেটা তোমার মস্ত ভুলই হয়েছে। সে হবে না, হতে পারেও না। যেমন তোমরা তেমনই দেখ্‌ছি আপন লোক জুটেছে।" বলিয়া শোভা একবার সেই উজ্জ্বল হেম-প্রদীপ প্রদীপ্ত গৃহের দিকে দৃষ্টি করিয়া, ফুলশয্যার ফুলগুলি দুই হাতে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া পাশের বালিশটার উপর

উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"দাদাবাবু, শেষটা তোমার মনে এই ছিল, আমায় এমন ভূতের দেশে পাঠিয়ে দিলে।"

নন্দকিশোরের মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। ফুলশয্যার ফুলগুলি বিপদের শঙ্কায় শুষ্ক হইয়া উঠিল। বাহিরের পূর্ণচন্দ্রের কর কেমন ম্লান দেখা যাইতেছিল, সে ভবিষ্যৎ ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া দুইহাতে বুক চাপিয়া ধরিল। ধীরপদে শয্যা ছাড়িয়া শূন্যপ্রাণে শূন্য ছাদে গিয়া দাঁড়াইল। একটা দুর্দ্দম শ্বাস তাহার নাসারন্ধ্র বাহিয়া বাহির বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া গেল। সহসা সে বলিয়া উঠিল,—এ কি করতে কি কল্লে বাবা, কালশাপ বরণ করে ঘরে আন্‌লে, এর দংশনে ত সংসার শুদ্ধ জ্বলে যাবে।"

(৩২)

রাতটা কোন রকমে কাটিলত, দিন কাটিতে চাহে না, চায়ের পিপাসায় শোভার গলা শুকাইয়া গিয়াছে। এমন একটা মানুষ সে খুঁজিয়া পায় না, যাহাকে দুটা কথা বলিবে ; সবাই যেন কেমন দূরে দূরে মুখ ভার করিয়া চলিয়া যাইতেছে। শোভা বুঝিল, তাহারই আচরণে বাড়ীশুদ্ধ বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে, ভয় ভাবনা শোভার ছিল না, এর জন্য তিলমাত্র দুঃখিত বা কুণ্ঠিত হইবে এমন স্বভাবও তাহার নহে, তবু যেন একটা বিষাক্ত দংশনে তাহার মন বিকৃতিতে ভরিয়া উঠিতেছিল, উঠিতে বসিতে আহারে আচরণে যেন কেমন একটা অসুখ, কতবড় অসুবিধা, কোন দিকেই শোয়াস্তি ছিল না, পাখা নাই, গ্রীষ্মের তাপে প্রাণ আইঢাই করিতেছে, বসিবার চেয়ার নাই, শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া কোমর ধরিয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বোপরি ত চায়ের অভাবই তাহার পিপাসা শ্বাসকষ্টকে স্তব্ধ করিয়া তুলিয়া দেহ মন বেতাল বিস্বাদ করিয়া দিয়াছে। মহামায়া ধীরে সঙ্কুচিত পদে গৃহে প্রবেশ করিলেন, শঙ্কান্বিত স্বরে আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—"এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠনি, কেন ঝী মাগিরা তোমার কোন খবর করে নি?"

কথার ভঙ্গীতে শোভার জবাব দিতেই ইচ্ছা হইল না, মহামায়া আবার বলিলেন—"আমিত এত করে ওদের বলে দিয়েছিলাম, তবুও একটি বার এদিক পানে আসেনি? দেখ মা, চাকর দাসী ওরা—ছোট লোক, ওদের সঙ্গে একটু বুঝে ব্যবহার ক'র। যাই, আমি কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

শোভা নড়িল না, তাহার ব্যবহারের দোষ! ফুলিয়া ফুলিয়া সে একগুণকে

দশ গুণ করিতে লাগিল। অনতিকাল পরে ঝী আসিয়া বলিল—"চল বৌদি, হাত মুখ ধোবে।"

শোভা এবার কথা বলিল—বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁরে তোরা বুঝি সবাই আমায় বয়কট করেছিস।"

পাড়া গেঁয়ে ঝি কথাটা তেমন বুঝিল না, ভীতস্বরে বলিল—"চল মা, এরপর আবার গিন্নি মা গালি গালাজ করবে, এত বেলা হয়েছে, হাত মুখ ধোওনি।"

"হাত মুখ আমি ধুয়েছিরে, তার জন্ত তোকে নাক শিট্‌কাইতে হবে না, কিন্তু তুই আমায় এক পেয়ালা চা এনে দিতে পারিস!"

ঝী স্তম্ভিত হইয়া গেল, বলিল—"ওমা, এ বাড়ীর কেউ যে নারায়ণ পূজ না হ'তে জলটুকু মুখে দেয় না, তা ছাড়া চা এ বাড়ীতে আনতেই মানা, দাদাবাবু যে চার নামে ক্ষেপে ওঠেন।"

শোভার আর কথা বলিবার প্রবৃত্তি হইল না, কাল হইতে চা না খাইয়া অস্থিমজ্জা যেন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"যা আর শালিসী কর্ত্তে হবে না, পারিসত তোর দাদাবাবুকেই একবার ডেকে দিস।"

খিল খিল করিয়া হাসিয়া, ঝী বলিয়া উঠিল—"সেত আমি পেরে উঠ্‌ব না, এ বাড়ীতে কিন্তু এ সব অনাছিষ্টির যায়গা নেই।" বলিয়াই সে দ্রুত পদে চলিয়া গেল।

ঘণ্টাখানিক পরে নন্দকিশোর যখন গৃহে প্রবেশ করিল, তখনও শোভা ঠিক সেই ভাবেই পড়িয়াছিল, সেই গর্ব্বিতা পত্নীর দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল—"এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠনি, বেলা যে নটা বাজতে চল্ল।"

শোভা জবাব করিল না, তাহার নিরুপায়-পতিত জীবনের ক্লেদগুলি গলিয়া চোখ বাহিয়া পড়িতেছিল। নন্দকিশোর বিস্মিত হইল, ব্যথিতকণ্ঠে বলিল—"কেন তোমায় কি কেউ ডেকেও দেয়নি!"

"সে খোজে কারুত প্রয়োজন দেখছিনা, আর উঠে বস্‌ব কোথায়, তেমন একটা বৈঠকখানাও ত এত বড় জমিদার বাড়ীতে নেই।"

"না তা নেই, মেয়েদের বস্‌বার জন্তে বৈঠকখানা, সে চল আজও এদেশে চলে নি?"

"তার মানে?" বলিয়া শোভা উঠিয়া বসিল, বাহিরের দিকে তাকাইয়া

আবার বলিল—"তার মানে, মেয়েরা ঘরে পোরা থাক্ ; বা পিঞ্জরার পাখীর মত—না থাক্‌বে তাদের নড়বার অধিকার, না থাক্‌বে স্বচ্ছন্দ-মনে দু পা মজে বস্‌বার শক্তি,—কেমন না ?"

নন্দকিশোর স্বাভাবিক স্বর খাট করিয়া বলিল—"ঝগড়া কর্ত্তে আমি আসিনি, যা নেই তার জন্যে অনুযোগ করে তোমারও কিছু লাভ হবে না, আর নেইত আঁটি নিয়ে টানাটানি করে কি কর্‌বে ; এখন যা আছে, তাই নিয়ে যাতে সুখে থাক্‌তে পার তার চেষ্টা কর গিয়ে,যাও।"

শোভা কথাটা বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিয়া, শ্লেষের স্বরে উত্তর করিল—"এখানে থাক্‌ব সে মনে করে আমি আসিও নি, থাকা কিছুতেই হ'তেও পারে না, দুদিন এসেছি, চা টুকু খেতে পাই না, এর মধ্যেই প্রাণ যে আমার খাবি খেয়ে উঠ্‌ছে।"

"রোজ চা খাও না কি ?"

"কোন্ ভদ্রলোকে আবার চা না খেয়ে থাকে, তাত জানি না ?"

"তবু, আমরা খাই না।"

"যেমন জানোয়ারের—"বলিতে বলিতে শোভা থামিয়া গেল, এতবড় কথাটা মুখের গোড়ায় আসিয়া পড়ায় সেও যেন একটু কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল।

নন্দকিশোরও যেন আর পারিয়া উঠিতে ছিল না, বিবাহিতা স্ত্রীর নিকট পুনঃ পুনঃ অপমানিত হইয়া তাহারও গায়ের রক্ত গরম হইয়া উঠিতেছিল, তবু সে শান্ত স্বরেই বলিল—"যাই বল, চা এ বাড়ীতে কেউ খায় না, কখনও খেতে পাবে এমন আশাও আমি রাখি না, বিশেষ করে আমারই ওতে শ্রদ্ধা নেই।"

"কারণ ?" বলিয়া শোভা গম্ভীর হইয়া বসিল। নন্দকিশোর বলিল—"এ সকল বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে বাদ-বিচার কর্‌ব, তেমন প্রবৃত্তিও আমার নেই ; প্রয়োজন আছে বলেও আমি মনে করি না, কারণ মেয়েরা চিরকালই ঘরের কাজে লেগে থাক্‌বে, পুরুষ যা মানা কর্‌বে, সে সম্বন্ধে তর্ক করা—বা তার ওপর কথা বলা সেত তেমন মানিয়ে ওঠে না।

ইহার উত্তরে কথাটি বলে এমন প্রবৃত্তি শোভার ছিল না, বেনা বনে, মুক্তা ছড়ানর ন্যায় তাহার কথার গুরুত্ব কেহ বুঝিবে এ ধারণা তাহার এখানে পা দিয়াই লোপ পাইয়াছে। তবু সে শ্লেষের স্বরেই বলিল—"তা হলে আমাদের নিয়ে তোমরা কি কর্‌তে চাও।"

"যা চিরকাল সবাই করে এসেছে।"

"ঝি চাকরাণী—কেমন না ?"

"আর্য্য রমণীরা ঐ দাসী হতেই বড় ভালবাসত, তারা স্বামীর সেবা করে তার সুখ শান্তি ব্যবস্থায় যে সুখ, যে শোয়াস্তি পেত, তা কিন্তু হাজার বছরে তোমরা পাবে না।"

"তারা সুখ পেত কিনা সে কথা কিছু আমি জিজ্ঞেস করিনি, আর তা জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজনও নেই, মানুষ যে সাধ করে দাসীগিরি করে ; আর তাতেই সুখ পায়, এ হয়ত খুব একটা আহাম্মুককেই তুমি বোঝাতে পার, আমায় পারবে না। কিন্তু দাসীগিরি ত করাবে, সঙ্গে সঙ্গে পিপাসায় বুক শুকিয়ে গেলে খেতে পাবে না, এই নাকি তোমাদের আদালতের বিধি ?"

খেতে কেন পাবে না, এত খাবার জিনিষ, সবই তোমার জন্যে রয়েছে, তুমিই খেতে কষ্ট পাবেত—"

শোভা বাধা দিল, ঝঙ্কার দিয়া বলিল—"কাজ নেই অততে, আগেত চা না খেয়ে বুক শুকিয়ে গেল।"

"এতই কষ্ট ত তারি নয় বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। কিন্তু এও খাটি কথা যে এ বদ অভ্যাসটা তোমায় ত্যাগ কর্ত্তে হবে।"

"বদ অভ্যাস ?" বলিয়া শোভা উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"অভ্যাসটা বদ, কিসে শুনি ?"

নন্দকিশোর মুচ্‌কি হাসিল। হাসিটা শোভার গায়ে বিষ ছড়াইয়া দিল। তাহার এত কালের উচ্চশিক্ষার উপর এমনই বিষাক্ত বাণ বর্ষণ, শোভা মুখ নীচু করিয়া রহিল। নন্দকিশোর বলিল—"বের কনে তুমি, তোমার কেন এত কুতুহল, যা তোমার দরকার বরং তাই চেয়ে নেবে, এই পর্য্যন্ত।"

বিবাহের বধূ, তাই বলিয়া যে তার কোন কথা বলিবার নাই, কোন যুক্তি-তর্ক খাটিবে না, বিবাহের মধ্যে এত অধীনতা, এত বন্ধন রহিয়াছে জানিলে শোভা জীবনে বিবাহে স্বীকৃত হইত কিনা সন্দেহ। রুক্ষ স্বরে বলিল—"বের কনে বলে তার কি ভালমন্দ বিচার করবার শক্তিও থাকতে পারে না, ভিক্ষার ঝুলি হাতে করে বের কনের পরের ঘরে ঢুকতে হবে, এমন শাস্তর আমার জানা ছিল না, কেউ আমায় বলেও দেয়নি।"

"ছিঃ তা কেন ? ভিক্ষে কেন করতে যাবে, পরিজনের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া সেও যে বড় ভাগ্যের কথা। আর তুমি জান না, এমন বিষয়

হয়ত কতই রয়েছে। এখনও জান্‌তে তোমার অনেক বাকি। তা যাক, চা করে পাঠিয়ে দিতে বলে দিচ্ছি।" বলিয়া নন্দকিশোর বাহিরে যাইতে-ছিল। শোভা বলিল—"শোন।"

নন্দকিশোর ফিরিয়া দাঁড়াইল, শোভা গম্ভীর হইয়া প্রশ্ন করিল—"তা হলে তোমরা কেউ চা খাওয়া পসন্দ কর না।"

"না।" বলিয়া নন্দকিশোর আবার পা বাড়াইল।

"থাক, কাজ নেই ওতে, আমিও খাব না।"

স্বর শুনিয়া নন্দকিশোরের বিস্ময়ের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। বধূ আনিতে গিয়া পিতা যে কেবল মাত্র একখানি বিলাস প্রতিমা আনিয়া হাজির করিয়াছেন, তাহা নহে, এযে কেউটে সাপ, যাহাকে দংশন করিবে, সেই বিষের জ্বালায় ছটফট করিবে, যে সংসারে প্রবেশ করিবে, তাহাকেই ছারে খারে দিবে, স্পর্শ মাত্রে স্পৃষ্ট বস্তু দগ্ধ করিয়া তবে ছাড়িবে। নন্দকিশোর হতাশ হইল। বিষণ্ণ অন্তঃকরণের ভাব লুকাইয়া রাখিয়া বলিল—"খাবেনা সে কথা খুবই ভাল, কিন্তু অভিমান নয়ত ?"

"অভিমানই কেন হবে না, ভাল কাজ তুমিই কেন তার পেছনে লেগেছ।"

"ভাল কাজ, কিসে ?"

"নয় কিসে ?"

"এই ধর, এটা একটা আত্মকৃত ব্যাধি, অভ্যাস করেছ বলেই একমুহূর্ত্তের অভাবে বুক শুকিয়ে উঠ্‌ছে, তা ছাড়া দোষ ওর আরও অনেক আছে।"

"কিন্তু গুণ যে তার চেয়েও ঢের বেশী।"

নন্দকিশোর শোভাকে আর বলিতে না দিয়া নিজেই বলিল—"বিচার আমি তোমার সঙ্গে কর্ত্তে চাই না, সে আগেই বলেছি, সময়ে হয় ত নিজেই টের পাবে, আজ যাকে গুণ বলছ, সেটা মহাদোষ, তাছাড়া মোটা কথায় যে উপাদানে চাটা তৈরি হয়, তাতে এদেশের কেউ যদি ও খায় ত, নিজের শরীরটাই নষ্ট করা হবে।" বলিতে বলিতে সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের রৌদ্রতপ্ত দিনের আলোটা যেন তাহার বিষাদ মনের উপর একটা হাহাকারের প্রতিধ্বনি করিয়া তাহার মুহ্যমান মনের গতিকে একেবারে অসার করিয়া দিল।

(৩৩)

শরীর ও মনের সহিত নিরবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ করিয়া ক্ষত-বিক্ষত দেহে নির্ম্মল

কলিকাতার বাসা বাটীতে আসিয়া অসার হইয়া পড়িল। দুই দিন যেন তাহার আহার ছিল না, নিদ্রা কখনও হইয়াছে কি না সে জ্ঞানও দেখা দেয় নাই। স্বপ্নের ঘোরে কেবলই চিন্তা করিয়াছে, সে কি করিবে, কি তাহার উদ্দেশ্য, কি যে তাহার পরিণতি। জল কাটিয়া জলে ঢালিবার মত, তাহার সকল কার্য্য, সমস্ত উদ্যম, এক কথায় বিফল হইয়া যাইতেছে, এমনই অকর্ম্মণ্য জীবন লইয়া কি কাজ হইতে পারে। বিদেশে আপনার বলিতে তাহার কেহই ছিল না, এক শোভা, সেদিন ঐ ভাবে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া সে যে সে দোরও বন্ধ করিয়াছে। কোথায় যাইবে, কাহার কাছে হাত পাতিলে অন্তত মুষ্টিভিক্ষাও মিলিবে। সে যেরূপ ব্যবহারই করুক, শোভার তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, সে পরের মেয়ে, আজ হউক, কাল হউক পরের বধূ হইয়া পরের ঘরে যাইবে, তবে কোন্ লোভে, কিসের আশায় সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া সে একটা বালুকাময় মরুতে আসিয়া দাঁড়াইল। এখানে চীৎকার করিয়া ডাকিলে সাড়া দেবে, এমন কেহ নাই, হস্তাঙ্গুলী নাড়িয়া সহানুভূতি দেখাইবে,এমন প্রত্যাশাও সে করিতে পারে না। মা নাই, বাপ নাই, আপন বলিতে কেহই নাই, যে একবারের জন্যও তাহার ক্ষুধিত হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি করিবে। ক্ষুধায় প্রাণ বাহির হইয়া গেলে কেহ এক মুষ্টি অন্ন দিয়া জিজ্ঞাসা করিবে না, এই যে পিপাসায় বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, কৈ একবিন্দু জল দিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করে না, তবে কোন্ আশায় কি প্রলোভন,তাহাকে ঘর ছাড়া করিল। চিরস্নেহময় মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্যুত করিয়া দিগ্‌ভ্রান্তের মত রাজ্যের একটা দুরতিক্রমনীয় দেশে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। নির্ম্মল আর ভাবিতে পারিল না, দুই দিন পরে যখন গাছে গাছে সন্ধ্যার পাখী ডাকিয়া গেল, পাড়ায় পাড়ায় সান্ধ্য-আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা নিনাদিত হইল, পথ বাহিয়া বেল ফুলের মালা হাকিয়া ফেরিওয়ালায় এ দিক্ ও দিক্ আনাগোনা করিতেছিল, নির্ম্মল বায়ু যখন জানালা গলাইয়া গৃহ মধ্যে মাতৃহস্তের মতই কোমল ভাবে নির্ম্মলের কপালে হাত বুলাইয়া দিল, তখন সে উঠিয়া বসিল, অবসন্ন মনকে ঝাড়া দিয়া খাড়া করিয়া লইয়া বলিল, "না যাই, একবার দেখাই করে আসি, শোভা শিক্ষিতা, আমার মনের গতি বুঝে অবশ্যই মাপ করবে।"

অনেক দূর তাহাকে যাইতে হইল না, পথের মোড় ছাড়িয়া ট্রামে উঠিবে, ঠিক এই সময়ে সতীশের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। দূর হইতে সতীশ ডাকিয়া

বলিল,—"কেও নির্ম্মলবাবু না, কবে এলেন, শরীর যে আপনার বড্ড খারাপ দেখছি, দেশে গিয়ে কোন অসুখ করেছিল নাকি ?"

নির্ম্মল হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, তাহার পা কাঁপিতেছিল, একপা সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"অসুখ তেমন কিছু করে নি, তবে দেশে গিয়ে থেকেই শরীরটা তেমন ভাল হচ্ছিল না, আর মন—"

"তা কবে এলেন, বাড়ী থেকে এবার হয় ত সবাইকে নিয়ে এসেছেন।"

"না" বলিয়া থামিল, হতাশক্ষুব্ধ স্বরে বলিল,—"আর কেউ আসেন নি, আপনারা ভাল আছেন সতীশবাবু ?"

"তা একরকম কেটে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছিলেন, চলুননা আমার বাসায়, দুদণ্ড গল্প করা যাবে, শোভা এখানে নেই, একলাটি—

সতীশ আর বলিতে পারিল না, নির্ম্মলের শুষ্কমুখের ক্ষুধিত দৃষ্টিতে সে ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল। টলিতে টলিতে অগ্রসর হইয়া নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল,—"শোভা এখানে নেই, কৈ তার ত কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার কোন কথা ছিল না।"

"না, কথা যদিও তেমন ছিল না, তবু হঠাৎ একটি মনোমত পাত্র পেয়ে আর বের বিলম্ব কর্ত্তে সাহস হল না।"

নির্ম্মল সব কথাগুলি শুনিতে পাইল না, কে যেন জোর করিয়া তাহার কর্ণরন্ধ্র টিপিয়া ধরিল, তাহার পায়ের নীচেকার পৃথিবী যেন ঘুরিতেছিল, পথের মাঝটায় সে অবসের মত বসিয়া পড়িল। একটা আগুনের হল্কা যেন তাহার শরীরের চারদিক্ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, নিশ্বাস টানিতে গিয়া দেখিল, সে প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সতীশ এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে বেদনায় কাতর হইতেছিল। কি দুর্ভাগ্য এই দেশের, যাহারা শিক্ষার অভিমানে আপনাকে পৃথিবীর সার বলিয়া মনে করে, তাহারাই এত ভ্রান্ত, এত হীনচরিত্র, এই এম এ, বি এ, পাশ লোকগুলির প্রতি তাহার যে একটা আন্তরিক অনুরাগ ছিল, তাহা এক মুহূর্ত্তেই লোপ পাইয়া গেল, ঘৃণাকুটিল চক্ষে একবারমাত্র নির্ম্মলের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"এঃ, আপনি যে পথের মাঝখানটায় বসে পড়লেন, চলুন না আমাদের ওদিকে !"

অতি কষ্টে নির্ম্মল উত্তর করিল,—"আজ আর হয়ত যেতে পাচ্ছি না, শরীরটা হঠাৎ কেমন খারাপ ঠেক্‌ছে, দয়া করে যদি একখানা গাড়ী ডেকে দেন !"

"তবে তাই ভাল।" বলিয়া সতীশ একটা গাড়ী ঠিক করিয়া জোর করিয়া ধরিয়া নির্ম্মলকে তাহার মধ্যে পূরিয়া দিয়া নমস্কার করিয়া বলিল,—"তবে আসুন, কিন্তু এমন অবস্থায় বিদেশে একলাটি এসেছেন, এটা কিন্তু তেমন ভাল কাজ হয় নি।"

নির্ম্মল জোর করিয়া শ্বাস চাপিয়া ধরিল—মনে মনে বলিল,—"আমি ভিন্ন আমার যে আর কেউ নেই।"

সতীশ উত্তর না পাইয়া ফুটপাথ ধরিল, বলিয়া গেল "পারেন ত সময়ান্তরে একবার দেখা করবেন, এখন আসি।"

গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। নির্ম্মলের বাড়ীর গোড়ায় আসিয়া ডাকিল—"বাবু নেমে আসুন।"

নির্ম্মলের পা দুখানা যেন একটা আছাড়ে খোড়া হইয়া পড়িয়াছিল। অতিকষ্টে সে গাড়ী হইতে নামিল। কলের পুতুলের মত পকেট হইতে একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"এই দারোয়ানজি, ধরত আমার বড় অসুখ করেছে।"

(ক্রমশঃ)

বিপ্লব

(লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শাস্ত্র ও সমাজ।

...াছে; এই

পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থায় স্থির হইল, পরেশ ... কথায় উভয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সে শাস্ত্রানুসারে দৈব ... কথা একটাও হয় নাই। পরেশও এই শাস্ত্রাদেশ মানিয়া লইল। কেননা সে বুঝিয়াছে ... ান্য সমাজ হইতে হিন্দুসমাজের ইহাই বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্ব টুকুর জোরেই হিন্দুসমাজ অজস্র উৎপীড়ন ও অত্যাচারের মধ্যেও এতকাল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই বিশেষত্ব টুকু অস্বীকার করিয়া পরেশ হিন্দুসমাজের মর্য্যাদায় আঘাত করিতে পারিল না। সে শাস্ত্র-বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইল, এবং সেই সঙ্গে পিতার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ উদ্দেশ্যে বৃষোৎসর্গ ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদির আয়োজনও করিল।

এই আয়োজনে হরিধন ঘোষাল, সার্ব্বভৌম মহাশয় এবং আরও দুই চারি জন প্রবীণ ব্যক্তি পরেশের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইলেন। পরোপকারার্থে তাঁহাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম দর্শনে পরেশ মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না। ইঁহাদের চেষ্টায় আয়োজনের কোন ত্রুটীই রহিল না। এক্ষণে কায়স্থ নবশাখ মিলিয়া প্রায় চারিশত লোকের আহারের আয়োজন হইল। সার্ব্বভৌম-গৃহিণী, ঘোষাল মহাশয়ের ভগ্নী ও বিধবা কন্যা, মধু চক্রবর্ত্তীর মাতা প্রভৃতি মহিলাবৃন্দ দুই-তিন দিন পূর্ব্বেই আসিয়া পরেশের গৃহে অধিষ্ঠিত হইলেন, এবং কেহ ভাঁড়ারের ভার, কেহ রন্ধনশালার কর্ত্তৃত্ব, কেহ বা পান সাজিবার ও খাওয়াইবার দায়িত্ব এবং কেহ কেহ সকল কার্য্যেই উপদেশ দানের গুরুতর কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়া বাড়ী জাঁকাইয়া তুলিলেন। তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা এবং তাঁহাদের সহচর ছোট বড় ছেলে মেয়েদের

অসাময়িক ক্রন্দনের নিবৃত্তি ও যথাসময়ে আহারের বন্দোবস্ত করিতেই তারা-সুন্দরী এমনই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, আর কোন দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর তাঁহার আদৌ রহিল না। যদিই বা অবসর ক্রমে কখন কোন বিষয়ে একটু লক্ষ্য করিতে যাইতেন, তবে সমাগতাগণ ব্যস্তসমস্ত ভাবে প্রবল সহানু-ভূতির সহিত বলিয়া উঠিতেন। "তোমাকে কিন্তু দেখতে হবে না মা, কিছু দেখতে হবে না। আমারা যখন আছি তখন তোমার ভাবনা কিছু। তুমি শুধু ব'সে ব'সে দেখ, তোমার এই রোগা হাত দু'খানায় কত জোর।"

এই বলিয়া তাঁহারা কে কোথায় একা তিন ঘণ্টার মধ্যে তিন শত ডাকিল—"বাবু নেমে আসুন করিয়া দিয়াছিলেন, ভাঁড়ারের কর্ত্তৃত্ব লইয়া নির্ম্মলের পা দুখানা যেন এক শত লোক খাওয়াইয়াছিলেন। অনঙ্গসহায় হৃষ্টকণ্ঠে সে এর মধ্যে বিশমণ মাছ ছাঁকিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সগৌরবে বিবৃত করিতে থাকিলেন। অগত্যা তারাসুন্দরীকে তাঁহাদের এই প্রমাণ সদৃশ প্রশংসাপত্রের উপরই নির্ভর করিতে হইল।

সন্ধ্যার পর অনুপমা আসিলে তারাসুন্দরী আদর করিয়া বধূকে ঘরে লইলেন, এবং তাহার হাতে চাবির গোছাটা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "বাঁচলাম মা, তবু একটা দিকে নিশ্চিন্ত হলাম।"

অনুপমা কিন্তু হঠাৎ সবচেয়ে বড় দিকের ভারটা পাইয়া সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। ইহার উপর আগন্তুকা প্রবীণা ও নবীনারা আসিয়া যখন মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহার আগমনে এই শ্রীহীন বাড়ীটা হঠাৎ শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল, এবং এই শ্রীটুকু তাঁহারা বহুপূর্ব্বেই দেখিবার আশা করিলেও এখন তাহা দেখিয়া যেন মনের প্রীতি সম্পাদন করিলেন, তখন অনুপমা লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিল না।

ভিতরে অনুপমাকে লইয়া রমণীবৃন্দ যখন এইরূপে স্ব স্ব হৃদয়ের উল্লাস ব্যক্ত করিতেছিলেন, তখন বাহিরেও একটা গোলযোগ চলিতেছিল।

নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া পরেশ ক্লান্তদেহে বৈঠকখানায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তখন সার্ব্বভৌম মহাশয় বাঁ হাতে হারিকেন লণ্ঠন এবং ডান হাতে বাঁশের লাঠিটা লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পরেশ বলিল, "আসুন, আমি ভেবেছিলাম রাত্রে আর আসবেন না।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় লণ্ঠনটা নিবাইয়া একপাশে রাখিতে রাখিতে বলিলেন,

"ব্রাহ্মণ, আসবে না ? না এলে কি চলে ? মাঝে আর কালকের দিনটা। একি আর পরের কাজ, এ যে বল্‌তে গেলে আমার নিজের ঘরের কাজ।
"গোবিন্দ—মধুসূদন !"

অতঃপর সার্ব্বভৌম মহাশয় আসন পরিগ্রহ করিলেন, এবং কাঁধের চাদরটা কোলের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিমন্ত্রণ সব হ'য়ে গেছে তো ? কোথাও বাদ পড়ে নি ?"

পরেশ বলিল, "না। নিমন্ত্রণ সেরে আমি এই মাত্র এসে বসছি।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "যাক্, এখন [illegible] ইচ্ছায় কাজটা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেই হয়। তা হয়েই যাবে, আমরা যখন আছি, তখন সে[illegible]। তোমার কোন চিন্তাই নাই। ওহে রামচরণ, একটা ক[illegible] গেছে, এই

পরেশ বলিল, "এখন দেখুন, এদিকে আ[illegible] কথায় উভয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ,

মুখটা উচু করিয়া সার্ব্বভৌম গর্ব্বস্ফীত [illegible] কথা একটাও হয় নাই। সার্ব্বভোম যে কাজে হাত দিয়েছে, সে কাজে ত্রুটি ! হাঃ হাঃ হাঃ।

সার্ব্বভৌম হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। পরেশ একটু লজ্জিত হইল। হাস্যবেগ সম্বরণ করিয়া সর্ব্বভৌম গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ত্রুটী কিছুই হবে না বাবাজী, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তবে—"

শেষের এই 'তবে' কথাটায় এমন একটা টান দিয়া, মুখ খানাকে এমন বিশ্রী করিয়া সার্ব্বভৌম হঠাৎ থামিয়া গেলেন যে, পরেশ তাহাতে শঙ্কিত না হইয়া থাকিতে পারিল না; সে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

সার্ব্বভৌম একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিরল-কেশ মস্তকে হস্তাকর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "কি জান বাবাজী; পাঁচজন নিয়ে কাজ; আর সকল লোকের মতি-গতি সমান নয়। এর ভিতর ভাল লোক আছে, মন্দ লোকও আছে। আর এই ভাল-মন্দ লোক নিয়েই সমাজ। বুঝলে কি না।"

পরেশ কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না, শুধু তাহার উৎকণ্ঠা আরও বর্দ্ধিত হইল। সার্ব্বভৌম তখন কতকটা ইতঃস্তত ভাব দেখাইয়া কথায় অনেক ঘোর পেঁচ আনিয়া পরেশকে ইহাই বুঝাইয়া দিলেন, যে, শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলে পরেশ দৈব পৈত্র্য কার্য্যে অধিকারী হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে সমাজে ব্যবহার্য্য হইবে বলিয়া সকলে স্বীকার করিতেছে না। সুতরাং তাহারা পরেশের গৃহে আসিতে সম্মত নহে।

পরেশ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। কয়েকদিন পূর্ব্বে যে সমাজের উদারতায় তাহার মনটা শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, এক্ষণে সেই সমাজের নানা বীভৎস মূর্ত্তি দর্শনে ঘৃণায় তাহার প্রত্যেক শিরা উপশিরা পর্য্যন্ত যেন সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। সে শুধু সার্ব্বভৌমের মুখের উপর একটা ঘৃণাপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

রামু তামাক সাজিয়া আনিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয়ের হাতে দিল, এবং পরেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "তো[illegible]কে কি আজ খেতে হবে না!"

পরেশ কোন উত্তর করি[illegible] রামু একটু দাঁড়াই[illegible] থাকিয়া রুষ্টস্বরে ব[illegible] "বাপ মায়ের ছরাদ করলে লোকে নিজের খাওয়া দাওয়া এ[illegible]

ডাকিল—"বাবু নেমে আসুন[illegible] "যাচ্ছি।"

নির্ম্মলের পা দুখানা যেন এ[illegible]ঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রামু চলিয়া গেল। সা[illegible]চকটে সে[illegible] কলিকায় গোটাকতক ফুঁ দিয়া, হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। পরেশ সহসা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে আমাকে কি করতে হবে?"

মুখের কাছ হইতে হুঁকাটা একটু সরাইয়া সার্ব্বভৌম ব্রস্তভাবে বলিলেন, "করতে কিছুই হবে না, কিছু সামাজিক দণ্ড দিলেই সব গোল মিটে যাবে।"

পরেশ। প্রায়শ্চিত্তটা কি দণ্ড নয়?

সার্ব্ব। সেটা হচ্ছে শাস্ত্রীয় দণ্ড, এটা সামাজিক।

পরেশ। শাস্ত্র ও সমাজ দু'টা কি পৃথক?

সার্ব্ব। পৃথক্ নয়, দুয়েই এক, একেই দুই। তবে কি জান বাবাজী, লোকাচারও একটা শাস্ত্র। অনেক স্থলে কেবল শাস্ত্রকে মান্য করলেই হয় না, লোকাচারকেও মেনে চলতে হয়।

পরেশ ভ্রূকুটী করিল। সার্ব্বভৌম গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কি জান বাবাজী এর ভিতর চক্রান্ত আছে। ঐ যে হরি ঘোষাল, ওকে তুমি সহজ লোক মনে করো না। ঐ তো এতখানি গোলযোগ বাধিয়েছে। ওর স্বভাব চরিত্র কিছু ভাল না, নিজে সত্য গোয়ালিনীর দরজায় দিনরাত পড়ে থাকে, অথচ পরের একটু ছিদ্র পেলে—"

বাধা দিয়া পরেশ বিরক্তির সহিত বলিল, "কে কোথায় পড়ে থাকে, তা

জানবার জন্য আমার একটুও আগ্রহ নাই। তবে যিনি এ গোলযোগ তুলেছেন, "তাঁকে বলবেন, আমি সামাজিক দণ্ড হিসাবে এক পয়সাও দেব না।"

সার্ব্বভৌম স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাহার কঠোর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এত উদ্যোগ আয়োজন সব পণ্ড করবে?"

পরেশ ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত করলে পিতার পিণ্ডদান কার্য্য পণ্ড হবে না। তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "বেশ বুঝে দেখ বাবাজি শ'খানেক টাকার জন্য— ।"

উত্তেজিত কণ্ঠে পরেশ বলিল, "একটী পয়সা দিয়েও আমি আছে, এই নীচতাকে প্রশ্রয় দেব না।" কথায় উভয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ,

পরেশ দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। কথা একটীও হয় নাই। ডাকিয়া লণ্ঠনটা জ্বালিয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে প্রস্থান করিলেন।

পরেশ সমাজিক দণ্ড দিতে অস্বীকৃত হইয়াছে শুনিয়া সমাজে একটা বড় গোলযোগ বাধিয়া গেল। কেহ বলিল, "দণ্ড না দিলে ম্লেচ্ছের ঘরে কে খাবে?"

কেহ বলিল, "যখন প্রাচিত্তির করবে তখন আবার দণ্ড দিতে যাবে কেন?"

যে স্পষ্টভাষী সে বলিল, "তা না দিলে যাঁরা সমাজের কর্ত্তা, তাঁদের পেট ভরবে কেন?"

নির্ব্বোধ বলিল, "কিন্তু সে কথাটা আগেই তাকে খুলে বলা উচিত ছিল।"

বুদ্ধিমান্ বলিল, "না বললেও তার এ কথাটা বোঝা উচিত ছিল। সে তো আর ছেলে মানুষ নয়।"

আগন্তুক রমণীগণ পরেশের সহিত আর কোন আত্মীয়তা সূচক সম্পর্ক দেখিতে না পাইয়া বিষণ্ণ চিত্তে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যাইবার সময় তাঁহারা শুধু পরেশ নয়, পরেশের পিসীর মতও কৃপণ লোক যে আর কখন দেখেন নাই এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গেলেন। তারাসুন্দরী কাঁদিতে লাগিলেন, পরেশ কিন্তু অচল অটল হইয়া রহিল। রামু পরেশকে তিরস্কার করিয়া, সার্ব্বোভৌম ঠাকুরকে গালাগালি দিয়া মনের ঝাল মিটাইতে লাগিল।

উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ ব্যর্থ গেল না। পরেশ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পিতার শ্রাদ্ধকর্ম্ম সম্পন্ন করিল। রামু নিজ গ্রামের ও আশ-পাশের গ্রামের ইতর লোকদিগকে ডাকিয়া খাওয়াইয়া দিল। আর সার্ব্বভৌম, ঘোষাল মহাশয় প্রভৃতি প্রবীণ সামাজিকগণ, পরেশ সমাজ ছাড়িয়া কিরূপে গ্রামে বাস করিবে তাহারই চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রজ. [illegible] এ[illegible]

[illegible] স্বামি সম্ভাষণে।

ডাকিল—"বাবু নেমে আসুন [illegible]

নির্ম্মলের পা দুখানা যেন এ[illegible]

[illegible]কটে সে[illegible] পিসীমা ?"

"তোমার বাবাকে কিন্তু গাল না দিয়ে থাকতে পার্ব্ব না বাছা। ছেলেটা ঘুরে ফিরে এলো, আর তুমি উনানশালে ব'সে কচ্চো কি ?"

অনুপমা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া একখানা কাঠ উনানে গুঁজিয়া দিতে দিতে মৃদু স্বরে বলিল, "দুধটা পড়ে আছে, জ্বাল দিয়ে রাখছি।"

একটু রাগত স্বরে পিসীমা বলিলেন, "এই তরেই তো বাছা, আমার মুখ দিয়ে ভাল কথা বের হয় না। বলি, এত দিন তোমার কোন্ মাসী পিসী এসে দুধ জ্বাল দিত লো ?"

মুখ নীচু করিয়া অনুপমা মৃদু হাসিল। পিসীমা কাছে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "নাও, ওঠ, দেখ ওর পান জল কি চাই।"

অনুপমা উঠিল না, নীরবে নতমুখে বসিয়া একখানা কাট লইয়া নাড়িতে চাড়িতে লাগিল। পিসীমা স্বরটাকে একটু উচ্চ করিয়া বলিলেন, "ব'সে রইলে যে, ওঠো না। হ্যাঁ দেখ বাছা, এদ্দিন আমি সব দেখে শুনে এসেছি, কিন্তু আর আমি তা পারবো না বলে রাখছি; আমার শোক তাপের শরীর, চিরদিন কি তোমাদের সংসার ঠেলে মরবো ? এখন তোমরা নিজের সংসার নিজে দেখে শুনে নাও।"

অগত্যা অনুপমা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ধীরে ধীরে রন্ধনশালা হইতে

বাহির হইল। বাহির হইতে তাহার পা দুইটা যেন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অনুপমা এ বাড়ীতে পাঁচ ছয় দিন আসিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে একদিনও তাহার স্বামীসম্ভাষণ হয় নাই। কাজের গোলমালেই কয়দিন কাটিয়া গিয়াছে। এই কয় দিনে তাহার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, কথাবার্ত্তাও যে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু ঠিক স্বামী স্ত্রীর মত কথাবার্ত্তা একদিনও হইয়া উঠে নাই। পরেশ [illegible] প্রয়োজনীয় জিনিষ বা টাকা পয়সা চাহিয়াছে, অনুপমাও তাড়াতাড়ি তাহা বাহির করিয়া দিয়াছে। পরেশ তাহা লইয়া চলিয়া গিয়াছে, অনুপমাও অন্য কাজে মন দিয়াছে, এই মাত্র। ইহার ভিতর স্বামী স্ত্রীর মত কথা—[illegible] কথায় উভয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, প্রাণের নিবিড় আবেগ উথলিয়া উঠে, [illegible] কথা একটীও হয় নাই। উভয়ের হৃদয় উভয়ের নিকট অপরিচিতই রহিয়া গিয়াছে।

আজিও সেই অপরিচিত হৃদয় লইয়া সহসা পরিচিতের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে অনুপমা যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বক্ষের অস্বাভাবিক স্পন্দন সে কিছুতেই থামাইতে পারিল না।

আঁচলে মুখখানা ভাল করিয়া মুছিয়া, কাপড়টা বেশ গুছাইয়া পরিয়া অনুপমা যখন স্পন্দিত বক্ষে কম্পিত পদে পরেশের ঘরে ঢুকিল, পরেশ তখন জামা কাপড় ছাড়িয়া খোলা জানালার কাছে একখানা চৌকীর উপর বসিয়াছিল। টেবিল ল্যেম্পের উজ্জ্বল আলোকে ঘরের সকল জিনিষই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। মৃদু বাতাসে খাটের উপর মশারির ঝালরটা ঝির ঝির করিয়া কাঁপিতেছিল।

পরেশ দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল। অনুপমার পদশব্দে একবার ফিরিয়া চাহিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল। অনুপমা ঘরে ঢুকিয়া এক পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিল। কি করিবে, কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

কিন্তু এমন ভাবে চুপ করিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায়? অগত্যা অনুপমাকে কথা কহিতে হইল। সে বহুকষ্টে সঙ্কোচের ভাবটাকে চাপিয়া এক প্রকার জোর করিয়াই বলিয়া ফেলিল, "পান চাই?"

কথাটা কিন্তু এমনই অমানুষিক, এমনই বেখাপ্পা শুনাইল যে অনুপমা

নিজের কথায় নিজেই লজ্জিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। লজ্জায় তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল।

পরেশ ফিরিয়া চাহিয়া মৃদু হাসিল; বলিল, "এমন সময়ে আমি পান খাই না।"

অনুপমা মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা হইল, ঘর হইতে ছুটিয়া পলায়, কিন্তু পা দুইটা যেন উঠিতে চাহিল না। অগত্যা সে নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া পায়ের বুড়া আঙ্গুলটা মেঝেতে ঠুকিতে লাগিল। পরেশ তাহার এই বিপন্ন অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে বলিল, "এক গ্লাস জল দিয়ে যাও।"

ঘরে কুজায় জল ছিল। অনুপমা জল গড়াইয়া গ্লাস হাতে দাঁড়াইয়া রহিল। গ্লাসটা হাতে দিবে, কি পাশে রাখিবে, ইহা স্থির করিতে পারিল না। পরেশ মুখ ফিরাইয়াছিল, সুতরাং সে অনুপমার ইতস্ততঃ ভাবটুকু লক্ষ্য না করিয়াই গ্লাস লইবার জন্য হাত বাড়াইল। অনুপমা ধীরে ধীরে গিয়া স্বামীর হাতে গ্লাস দিতে উদ্যত হইল; কিন্তু তাহার হাতটা সহসা এমনই কাঁপিয়া উঠিল যে, গ্লাস স্বামীর হাতে না পৌঁছিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। পড়িবামাত্র কাচের গ্লাস ঝন্ ঝন্ শব্দে শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। জলে ঘর ভাসিতে লাগিল। অনুপমা লজ্জায় সঙ্কোচে যেন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর ব্যস্তভাবে আঁচল দিয়া মেঝের জল তুলিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। পরেশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "হাঁ, হা—ওকি কর; এখনি হাতে পায়ে কাচ ফুটিয়ে আবার একটা অনর্থ ক'রে বসবে?"

এবার অনুপমার লজ্জার পরিবর্ত্তে ভয়ানক রাগ হইল। দৈবাৎ গ্লাসটা পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া সে কি এমনই অপদার্থ যে, মেঝের এই জলটুকুও পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিবে না? সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, আর জলে মেঝেটা ভাসিয়া যাইবে? তাহার বলিতে ইচ্ছা হইল, "না গো ডাক্তার বাবু, আমি হাতে পায়ে কাচ ফুটাইয়া তোমাকে একটুও ব্যতিব্যস্ত করিব না। আমি কাজ করিতে জানি।"

কিন্তু একটা দোষ করিয়া সে এত বড় স্পর্দ্ধার কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। শুধু দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া নিঃশব্দে ধীরে ধীরে কাচের টুকরা গুলিকে এক পাশে সরাইয়া আঁচল দিয়া জল মুছিতে লাগিল। পরেশ মৃদু

হাসিয়া বলিল, "পরের কথা শুনে আর কখনো সাহেব সুবোর ঘরে এমন ক'রে এসো না।"

পরেশ কথাটা সামান্য পরিহাসের ভাবেই বলিয়াছিল, অনুপমা কিন্তু সেটাকে তীব্র শ্লেষ বলিয়াই বুঝিয়া লইল। সে যেন ইচ্ছা করিয়া এ ঘরে আসে নাই, আসিতে ভয় বা সঙ্কোচ বোধ করে। শুধু পিসিমার প্রেরণাতেই আজ আসিয়াছে। স্বামীর যেন ইহাই নিশ্চিত ধারণা। এই ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য কতকগুলা কথা তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিল। অনুপমা কষ্টে বাক্যস্রোতকে সংযত করিয়া রাখিল। সে ধীরে ধীরে মেঝে মুছিয়া ফেলিল, এবং কাচের টুকরা গুলিকে একটী একটী করিয়া আঁচলে তুলিয়া লইল। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অতিমাত্র ব্যস্তপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পরেশ যেমন চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল।

কাচচূর্ণগুলাকে নর্দ্দমার পাশে ফেলিয়া দিয়া অনুপমা কাপড় ছাড়িল, এবং চোখে মুখে জল দিয়া মনটাকে স্থির করিয়া লইল, তখন স্বামীর জলপানেচ্ছার কথা মনে পাড়িল। মনে পড়িতেই সে তাড়াতাড়ি পিসীমার ঘর হইতে জল গড়াইয়া লইয়া গমনোদ্যত হইল। কিন্তু ঘরের দরজার কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং পুনরায় জল লইয়া যাওয়া উচিত কি অনুচিত, ইহাই ভাবিতে লাগিল। তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান উচিত হইলেও লজ্জায় পা যেন উঠিতে চাহিল না। সে জলের গ্লাস হাতে দরজার উপর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পিসীমা রন্ধনশালার দরজা হইতে উকি দিয়া বলিলেন, "কে দাঁড়িয়ে? বৌমা?"

অনুপমা উত্তর দিল, হাঁ।"

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরেশকে জলটল দিয়েছ?"

মৃদুস্বরে অনুপমা বলিল, "জল খাবে না।"

পিসীমা বলিলেন, "তবে এসে ময়দাটা মেখে দাও। আমি ততক্ষণ তরকারীটা চাপিয়ে দিই।"

অনুপমা জলের গ্লাসটা পুনরায় ঘরে রাখিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

স্বামী ও স্ত্রী, ইহা হইতে নিকট সম্পর্ক আর কি আছে? তবে এই

নিকট সম্পর্কীয়ের কাছে যাইতে, তাহার সহিত কথা কহিতে এত লজ্জা কেন? প্রথম প্রথম কি এমনই লজ্জা হয়? কে জানে। কিন্তু এই লজ্জার ফলে যদি উভয়ের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ ধারণার ব্যবধান আসিয়া পড়ে, স্বামী যদি মনে করেন, আমি তাঁহার সম্মুখে যাইতে অনিচ্ছুক, সাহেব বলিয়া আমি তাঁহাকে ঘৃণা করি, ভয় করি। ছি ছি, সে কি ভয়ানক ধারণা? না না, যেমন করিয়া হউক, তাঁহার এই ধারণাকে দূর করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণারই বা মূলে কি? দোষী কি সে একাই! কৈ, তিনিও তো তাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটুও আগ্রহ প্রকাশ করেন না, বরং এমনই একটা ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকেন, যাহাতে মনে হয়, তাহাকে তিনি কিছুমাত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন না। তবে নিষ্প্রয়োজনীয় রূপে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া ফল কি? ইহাতে হয় তো শুধু আপনার দৈন্যই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু তিনি যে তাহাকে অপদার্থ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার এই ধারণাটুকু দূর করিয়া দেওয়া কি উচিত নয়?

সমস্ত রাত্রির মধ্যে অনুপমা একবারও ঘুমাইতে পারিল না, শুধু স্বামীর ও নিজের মধ্যে কোন্‌টা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে তাহারই আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি কাটাইয়া দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাগ না অনুরাগ?

পরদিন অপরাহ্নে পরেশ ডাকে বাহির হইবার জন্য কাপড় ছাড়িতে আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই দরজার কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। অনুপমা তখন ঘরের মাঝখানে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একাগ্রচিত্তে কি একটা দেখিতেছিল। মাথায় কাপড় ছিল না; কালো মেঘের মত এলায়িত চুলগুলা পিঠ ঢাকিয়া টেবিলের উপর লুকাইয়া পড়িয়াছিল; তাহারই পাশ দিয়া নিটোল গণ্ডদেশের সুগৌর আভা ঠিক মেঘের পাশে সৌদামিনীর দীপ্ত ছটার

হ'য় বোধ হইতেছিল। মুখের অপর কোন অংশ দেখা না গেলেও ওষ্ঠাধরের একপ্রান্ত দিয়া যে প্রসন্নতার একটু স্নিগ্ধ হাস্য উছলিয়া উঠিতেছিল, পরেশ মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

পরেশ গলার একটু শব্দ করিতেই অনুপমা চমকিত ভাবে পিছন ফিরিয়া চাহিল, এবং পশ্চাতে দরজার উপর পরেশের হাস্য সমুজ্জ্বল মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তখন অসম্ভব ব্যস্ততার সহিত আপনার অসংযত গাত্রবস্ত্র সংযত করিতে প্রবৃত্ত হইল যে, পরেশ হা হা করিয়া না হাঁসিয়া থাকিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে বলিল, "ছি ছি, করলে কি, শেষে সাহেবকে মুখখানা পর্য্যন্ত দেখিয়ে ফেললে ?"

অনুপমা মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এমন একনিষ্ঠ হ'য়ে কি ওটা দেখছিলে ?"

অনুপমা তাড়াতাড়ি খানকতক বই কাগজ দিয়া দ্রষ্টব্য বস্তুটাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিল। পরেশ কিন্তু ছাড়িল না, সে একেবারে টেবিলের ধারে আসিয়া বই কাগজ গুলা সরাইয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "ওঃ, এই ফটোখানা দেখছিলে ?"

লজ্জায় অনুপমার মুখখানা, রাঙ্গা হইয়া উঠিল ; সে মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিল। পরেশ বলিল, "জলজ্যান্ত মানুষটা ফেলে তার ফটোখানার উপর এত আগ্রহ কেন ?"

অনুপমা ঘোমটা একটু সরাইয়া স্বামীর মুখের উপর একটা রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। পরেশ বলিল, "ওখানা বিলেতে থাকবার সময় তুলে ছিলাম, তাই সাহেবী পোষাক। এবার কলকাতায় গেলে বাঙ্গালীর পোষাকে একখানা ফটো তুলিয়ে আনব। সাহেবী পোষাকে আমাকে মোটেই মানায় না, না !"

অনুপমা চাপা গলায় মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "মানায় না বৈ কি ?"

একটু চাপা হাসি হাসিয়া পরেশ বলিল, "মানায় ? তবে এখন থেকে না হয় সাহেবী পোষাকই পরবো।"

অনুপমা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না না, সাহেবী পোষাক আবার কেন ?"

পরেশ নীরবে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। অনুপমাও নতমস্তকে আঙ্গুল দুইটা টেবিলের উপর ঘষিতে থাকিল।

একটু পরে পরেশ বলিল, "কিন্তু তুমি বড় অন্যায় কাজ করেছ। সাহেবের ঘরে ঢুকেছ, ঘরের জিনিষ পত্র সব ছুঁয়েছ, সাহেবের সঙ্গে কথা কয়েছ। লোকে শুনলে তোমায় আবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

অনুপমা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া স্বামীর মুখের উপর কৃত্রিম কোপপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

ট্রাঙ্কের উপর যেখানে বাহিরে যাইবার জামা কাপড়গুলো বিশৃঙ্খল ভাবে জড়াজড়ি করিয়া পড়িয়া থাকিত, পরেশ সেইদিকে যাইয়াই একটু বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "আমার কাপড় চোপড় সব কোথায় গেল ?"

মৃদু হাসিয়া ধীরস্বরে অনুপমা বলিল, "চুরী গেছে।"

পরেশ বলিল, "চুরী গেলে তো চলবে না, আমাকে যে এখনি বাহিরে যেতে হবে।"

মুখ তুলিয়া অনুপমা বলিল, "এমন সময় আবার বাইরে যাওয়া কেন ?"

সহাস্যে পরেশ বলিল, "ঘরে থেকেই বা হবে কি ?"

অনুপমা মুখ নামাইয়া লইল। একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে হবে ?"

"কেশের হাটে রোগী আছে।"

"ফিরবে কখন্ ?"

"বোধ হয় রাত হবে।"

"না না, রাত ক'রো না, সকাল সকাল ফিরে এসো।"

পরেশের মুখ চোখের উপর দিয়া একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব আনন্দের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "ভাল, তোমার এই প্রথম অনুরোধটা রক্ষা করবার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করবো।"

অনুপমা একটু হাসিল। পরেশ বলিল, "এখন কাপড় চোপড় গুলা—"

অনু। বললাম তো চুরী গেছে।

পরেশ। কিন্তু চোর সামনে আছে। আর সে চোরের শাস্তি কিরূপে দিতে হয়, তাও আমি জানি।

পরেশ হাত বাড়াইয়া অনুপমার হাতখানা ধরিতে গেল। অনুপমা একটু পশ্চাৎপদ হইয়া দেওয়ালের পার্শ্বে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। পরেশ দেখিল, সেখানে কাঠের আলনা আসিয়া বসিয়াছে, এবং তাহারই উপর জামা

কাপড়গুলি স্তরে স্তরে সুসজ্জিত ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। মৃদু হাসিয়া পরেশ বলিল, "ওখানে আবার ওগুলা রাখলে কেন?"

মুখখানা ভারী করিয়া অনুপমা বলিল, "ভাল না দেখায়, যেখানে ছিল সেইখানে এনে রেখে দাও।"

পরেশ বলিল, "সে তুমি না বললেও হবে। কেন না—"

কথাটা শেষ না করিয়াই পরেশ থামিয়া গেল; তাহার প্রফুল্ল মুখখানা সহসা গম্ভীর হইয়া আসিল। অনুপমা উদ্বিগ্নচিত্তে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

পরেশ বলিল, "তোমাকে ক'দিনের করারে আনা হয়েছিল। তোমার খুড়া মশায় বোধ হয় শীগ্‌গীর নিয়ে যাবেন।"

অনুপমা মুখ নামাইয়া রহিল। পরেশ তাহার আনত মুখখানার উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "যখন করার করে এনেছি, তখন জোর করে রাখা উচিত নয়। তবে তুমি যদি যাব না বল—"

অনুপমা দাঁতে দাঁত চাপিয়া ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পরেশ কাপড় ছাড়িয়া ডাকে বাহির হইল।

গ্রামান্তরে ডাক ছিল। রোগী দেখিয়া পরেশ যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরে ডাক্তারখানায় না গিয়া একেবারে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীটা অন্ধকার, শুধু তাড়ার ঘরের দরজায় একটা প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহারই কাছে বসিয়া পিসী তারা-সুন্দরী মালা ফিরাইতেছিলেন। পরেশের পায়ের শব্দ শুনিয়া তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "কেরে পরেশ এলি?"

পরেশ উত্তর দিল, "হাঁ।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "রামু কোথায় গেল, ঘরের আলোটা জেলে দিত।"

পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইল। তারাসুন্দরী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "মনে করলাম, বৌটা এল, একটু নিশ্চিন্দি হলাম। কিন্তু তা কি হবার যো আছে? পোড়ারমুখো মিন্‌সে এসে নিয়ে গেল, তবে ছাড়লো। হতচ্ছাড়া হাড়হাবাতে মিন্‌সে। আচ্ছা থাক সে মেয়ে নিয়ে, দেখি আমি এর শোধ নিতে পারি কি না।"

পরেশ নীরবে দাঁড়াইয়া সিঁড়িরপায়ে জুতার আগাটা ঠুকিতে লাগিল।

তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "বৌমারই বা কি আক্কেল! এত করে বললাম, 'বৌমা, তোমার ঘর, তোমার দোর, তোমার সংসার, তোমার কি এখন পরের ঘরে থাকা সাজে?' তা কিছুতেই শুনলে না, বললে, কাকার অপমান করবো? যেমন কাকা, তেমন ভাইঝি। আচ্ছা আচ্ছা, আমিও যদি এর শোধ না নিই তবে আমার নাম তারা বামনীই নয়! লক্ষ্মীছাড়া অধঃপেতে হাড়হাবাতে মিনসে!"

পরেশ আর দাঁড়াইল না, উপরেও উঠিল না, দ্রুতপদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইল।

কম্পাউণ্ডার হরিচরণ তখন দৈনিক কাজ শেষ করিয়া সবেমাত্র সিগারেটটী ধরাইয়াছিল, এমন সময় হঠাৎ ডাক্তারবাবুকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মুখের সিগারেটটা বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিল। পরেশ চেয়ারখানা টানিয়া বসিয়াই বলিল, "আজকার ওষুধের হিসাবটা দেখি।"

হরিচরণ সিগারেটটা আলমারীর নীচে ফেলিয়া দিয়া ব্যস্তভাবে হিসাবের খাতা আনিয়া হাজির করিল। ল্যাম্পের আলোকটাকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়া পরেশ খাতা দেখিতে দেখিতে বলিল, "এর মধ্যে আর কেউ এসেছিল?"

হরিচরণ উত্তর করিল, "কৈ, না।"

পরেশ খাতাটা সরাইয়া রাখিয়া একখানা ডাক্তারি বহি খুলিল। হরিচরণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "খানিক আগে একটী মেয়ে এসেছিল।"

একটু চড়া সুরে পরেশ বলিল, "তবে যে বললে কেউ আসে নি?"

হরিচরণ দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কে সে? কাদের মেয়ে?"

হরিচরণ শঙ্কাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, "তা জিজ্ঞাসা করি নি। তাকে খানিক বাদে আসতে বলে দিয়েছি।"

ক্রুদ্ধস্বরে পরেশ বলিল, "খুব বুদ্ধিমানের কাজই করেছ। একটা মেয়েছেলে; সে রাত্রে আবার ছুটে আসবে, অথচ এমন বুদ্ধিমান ছোকরা তুমি যে, তার নাম ঠিকানাটা পর্য্যন্ত জেনে নিতে পারলে না। ফুল!

হরিচরণের মুখের উপর একটা তিরস্কারপূর্ণ কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া

পরেশ অস্থির হস্তে ডাক্তারি বহির পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। হরিচরণ ভয়ে ভয়ে আলমারির পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

"ডাক্তার বাবু!"

পরেশ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। চাহিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সহসা দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। দেখিল, একটী পনের ষোল বছরের মেয়ে, যুবতীও নয় কিশোরীও নয়, এমনই একটী মেয়ে আসিয়া দরজার উপর দাঁড়াইয়াছে। রূপ—রূপে যদি কিছু মাধুর্য্য থাকে, তবে তাহা সেই অস্ফুট যৌবনা কিশোরীর সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোক তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে। উদ্বেগে আশঙ্কায় মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে, অযত্ন বিন্যস্ত কোঁকড়া কোঁকড়া কয়েকগাছা চুল আসিয়া গালের পাশে পড়িয়াছে, যেন ফোটা ফুলের গায়ে নিবিড় শ্যাম পল্লবের অন্তরের দেহ এলাইয়া দিয়াছে। টানা টানা ভাসা ভাসা চোখ দুইটা হইতে শুধু একটা অব্যক্ত কাতরতা ফুটিয়া উঠিতেছে। পরেশ ক্ষুব্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে এই অপরূপ লাবণ্যময়ী কিশোরীর দিকে চাহিয়া রহিল।

ডাক্তারকে আপনার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া কিশোরী লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া, মৃদু করুণ কণ্ঠে বলিল, "আমার মার বড় ব্যামো। ডাক্তার বাবু, দয়া করে একবার যাবেন?"

তাহার কথায় পরেশের যেন চমক হইল। আপনার অভদ্রতায় আপনি লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল; ব্যগ্রস্বরে বলিল, "চলুন, কোথায় আপনাদের বাড়ী?"

কিশোরী বলিল, "দক্ষিণ পাড়ায় রমানাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী।"

"আপনার মার কি অসুখ?"

"জ্বর, বোধ হয় বিকার হয়েছে।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীর মুখখানা ভয়ে যেন সাদা হইয়া গেল। পরেশ হরিচরণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হারিকেনটা জ্বেলে দাও। রামু কাকাকে ডেকে ওষুধের বাক্স নিয়ে এঁদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবে। যতক্ষণ না আমি ফিরি, ততক্ষণ ডাক্তারখানা বন্ধ কোরো না।"

হরিচরণ তাড়াতাড়ি হ্যারিকেন জ্বালিয়া দিল। রোগ পরীক্ষার যন্ত্রাদি পকেটেই ছিল। পরেশ হাত দিয়া সেগুলা একবার টিপিয়া দেখিল, তারপর হ্যারিকেন লইয়া দ্রুতপদে কিশোরীর সহিত প্রস্থান করিল।

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে হরিচরণ আলস্য ভাঙ্গিয়া হাই তুলিয়া তুড়ি দিল। তারপর পরিত্যক্ত সিগারেটটা খুঁজিয়া লইয়া, চেয়ারের উপর জাঁকিয়া বসিল, এবং সিগারেট ধরাইয়া তাহাতে মৃদুমন্দ টান দিতে দিতে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল,—

"তুমি কাদের কুলের বৌ,
'গো তুমি কাদের কুলের বৌ।"

(ক্রমশঃ)

গল্পলহরী

ষষ্ঠ বর্ষ, } শ্রাবণ, ১৩২৫ { ৪র্থ সংখ্যা

অদৃষ্টের ফের

(লেখক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ)

আমি পতিতা, আমি দেশের ও দশের চক্ষে অতি হেয়. আমার কথা কি আবার লিখিয়া মাসিকের উদর ভরাইতে হয়!

কি করিয়া আমার এই পতন হইল, তাহা বলিবার পূর্ব্বে আমার একটু পরিচয় দিব। কলিকাতার নিকট চন্দননগরে আমার জন্ম স্থান। আমার পিতা সবজজও ছিলেন না, সরকারী উকীলও ছিলেন না; একজন সামান্য ত্রিশ টাকা মাহিনায় সওদাগরী আফিসের কেরাণী। কিন্তু বড় চাকরীর সঙ্গে পিতৃস্নেহের যে গভীরতা বাড়ে এত বড় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এখনও বাহির হয় নাই। সুতরাং তাঁহার অগাধ পিতৃস্নেহে বর্দ্ধিত হইবার পক্ষে আমার কোন অভাব ছিল না। পিতামাতার আমিই একমাত্র সন্তান; আমি তাঁহাদিগের নয়নের মণি, স্নেহের পুত্তলি, অঞ্চলের নিধি গৃহের শোভা হইয়া উঠিয়াছিলাম;—এক দণ্ড আমাকে চক্ষের আড়াল করিয়া তাঁহারা থাকিতে পারিতেন না। বাল্যের সেই সব কথা মনে হইলে, এখন স্বপ্ন বোধ হয়।

পাড়ার লোকে বলিত. সুখী (আমার নাম সুখদা, লোকে সুখী বলিয়া ডাকিত) বয়সকালে একটা ডানাকাটা পরী হইবে। আমার রূপ লইয়া বর্ষীয়সীদিগের মধ্যে প্রায়ই নানারূপ আলোচনা হইত। সে সব আলোচনার, বিষয় আমি তখন ভাল বুঝিতে পারিতাম না;—মোটের উপর বুঝিতাম আমার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহা অপর মেয়েদের নাই। রূপ, যৌবন প্রভৃতির কথা আমি ভাল বুঝিতে পারিতাম না। যখন এই সব কথা লইয়া প্রৌঢ়াগণের মধ্যে জল্পনা কল্পনা হইত, এবং আমার মা গর্ব্ব অথচ বিনয়

মিশ্রিত ভাষায় তাহাদিগের উদ্দেশ্যে বলিতেন,—"মা আমার সামান্য মেয়ে নয়, সাক্ষাৎ ভগবতী, তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন মাকে সৎপাত্রে অর্পণ ক'রে সব বজায় রেখে যেতে পারি।" তখন আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কেবল মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতাম,—কিছুই বুঝিতে পারিতাম না।

এইরূপে সুখে ও আনন্দে জীবনের প্রভাত, মধুর বাল্য কাটিয়া গেল। আমি ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিলাম। রূপ যৌবনের কথাগুলি এখন একটু একটু বুঝিতে পারি। নিজের মধ্যে ত এরমধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আর সেই অবাধ-মুক্ত-গতি নাই, প্রাতে ফুল তুলিবার জন্য সাজি হাতে যথেচ্ছা গমনাগমন নাই। ছুটিয়া গিয়া পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া খেলিতে পারিনা, পাড়ার রামদা ও শ্যামদাকে দেখিলে অজস্র অকারণ প্রশ্নে তাহাদের জ্বালাতন করিয়া তুলিতে পারি না; বরং তাহাদিগের কথার উত্তর অতি সংক্ষেপে সারিয়া, অতি সঙ্কুচিত ভাবে সরিয়া পড়ি। ইহা ত বাহিরের কথা। ভিতরে ভিতরেও একটা ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তখন বেশ বুঝিতে পারিতাম, বাল্যের মত মনটা আর লঘু নাই। বাল্যে বাতাসের মত মনটা সমস্ত পদার্থ স্পর্শ করিয়া যাইত, কিন্তু কোন কিছুর দাগ বসিত না। আর এখন ঠিক তাহার উল্টা। মন যাহার পশ্চাতে একবার ছুটে, তাহাতেই জড়াইয়া পড়িতে চায়। অত্যন্ত সংকোচের সহিত বাহিরের সমস্ত পদার্থ হইতে আপনাকে টানিয়া আনিবার জন্য যে সংগ্রাম, সে এই প্রথম। সমস্ত চিত্তবৃত্তিগুলি ফুটিয়াছে, অথচ তাহাদের কোন অবলম্বন নাই। মানুষ এ অবস্থায় বেশী দিন থাকিতে পারে না।

আমাকেও বেশী দিন এ অবস্থায় কাটাইতে হইবে না বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। মা প্রতিদিনই বাবাকে সুপাত্রের সন্ধান করিতে বলিতেন; পিতাও এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কিন্তু আজকালকার দিনে ২০।২৫৲ টাকায় একজন বি, এ পাশ করা কেরাণী পাওয়া যায়; সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর সাহেবের ত্রিশদিনে ৯০ বার বিচিত্র গালি শুনিয়া মাসকাবারের দিন ২০।২৫৲টি টাকা পাইলেই যাহারা অতিমাত্র সন্তুষ্ট হয়, তাহারাই একটি দিন রাত্রে, ছাঁতনা তলায় টোপর মাথায় দিয়া দাঁড়াইলে ৬০০।৭০০৲ হাজার টাকা খেসারদ চাহিয়া বসেন। আমার পিতা দরিদ্র, কিন্তু তাঁহার সন্তান-বাৎসল্য পুরা মাত্রায়ই ছিল, এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন সুপাত্র ভিন্ন কন্যা সম্প্রদান করিবেন না। কিন্তু এ বাজারে শুধু সন্তান বাৎসল্য ও

প্রতিজ্ঞাতেই কন্যা পার হয় না। সুতরাং দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু আমার বরের কোন কিনারাই হইল না।

দেখিতে দেখিতে আমি চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিলাম। পিতামাতা উভয়েই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু উপায় কি? দিন দিন পিতার ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, মুখে কে যেন কালি মাখাইয়া দিল। মাতার মেজাজটা অত্যন্ত খিটখিটে হইয়া উঠিল; কারণে অকারণে মা বাবার উপর অত্যন্ত চটিয়া যাইতেন, দশটা কড়া কথা শুনাইয়া দিতেন; তার পর সমস্ত দিনটা কাঁদিয়া কাটিয়া দাঁতে দাঁত দিয়া পড়িয়া থাকিতেন, কেহ তাঁহাকে জলস্পর্শও করাইতে পারিত না। এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে লাগিল। আমাকে কেহ কিছু না বলিলেও আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমি পোড়াকপালীই এই সংসারের সমস্ত শান্তি নষ্ট করিতেছি।

এই সময়ে দেশে পণ গ্রহণ প্রথার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন চলিল। মেয়েরা পিতামাতাকে ঋণের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য কাপড়ে আগুন লাগাইয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল, এ সংবাদও আমার নিকটে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না।

সমাজের দোষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা তখনও আমার না হইলেও, এ কথা মধ্যে মধ্যে মনে হইত, যে হতভাগী নিরহ পিতামাতার-গলগ্রহ হইয়া সংসারের শান্তি নষ্ট করে, আর ভবিষ্যতে পিতামাতার জন্য একটা দুর্ব্বহ ঋণের বোঝা রাখিয়া যায়, তাহার এইরূপে আত্মহত্যা করা ব্যতীত উপায় নাই। হায়! তখন কেন আমি পুড়িয়া মরিলাম না, তাহা হইলে ত আজ আমায় আর কুলত্যাগিনী হইয়া পিতামাতার উচু মাথা হেঁট করাইতে হইত না।

দিনগুলি বেশ নিঃশব্দেই কাটিতে লাগিল, কত স্থান হইতে আমায় দেখিতে আসিল। পাত্রী দেখিয়া কে না সুন্দরী বলিয়াছে? কিন্তু শুধু রূপে বাঙ্গালার মেয়ে পার হয় না। বর পক্ষীয় লোকেরা আমার পিতার নিকট হইতে একটি ফুটন্ত যৌবনা সুন্দরী কন্যা ব্যতীত আর বড় বেশী কিছুর আশা নাই দেখিয়া একে একে সকলেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। কন্যাভারগ্রস্থ দরিদ্র পিতার মর্ম্মবেদনা-জনিত দীর্ঘশ্বাস ও নীরব অশ্রুপাত কাহারও তিলমাত্র সুখ শান্তি নষ্ট করাইতে বা একটু সামান্য সমবেদনার উদ্রেক করাইতে পারিল না। একদিন পিতা সন্ধ্যার সময়ে আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ

গিন্নী, আমি এক মতলব ঠিক করিয়াছি। আমাদের এই পৈত্রিক ভিটাখানি বন্ধক দিয়া ২০০০৲ হাজার টাকা পাইতে পারি। উপস্থিত ঐ টাকা ব্যয় করিয়া সুধীর বিবাহ দেওয়া যাক্। তারপর চল আমরা কলিকাতার নিকটে কোন একটা স্থানে সামান্য একখানি ঘর ভাড়া করিয়া থাকিগে। ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিয়া, একটু টানিয়া সংসার চালাইলে, কিছু কিছু স্থিতি হইবার সম্ভবনা; তাহা ছাড়া আমার শীঘ্র মাহিনা বাড়িবারও সম্ভাবনা আছে। সুতরাং বুঝিয়া চলিতে পারিলে বছর কয়েকের মধ্যে দেনা শোধ হইলেও হইতে পারে। ইহা ভিন্ন ত অন্য উপায় দেখিনা।" কথার উত্তরে, মা কি বলিয়াছিলেন মনে নাই। কারণ পিতার প্রস্তাবে আমি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই ভদ্রাসন—যাহার ক্রোড়ে আমরা আজন্ম লালিত, যাহা পৃথিবীর মধ্যে আমাদিগের একমাত্র মাথা গুজিবার স্থান, যাহার প্রতি ধূলিকণার সহিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্র স্মৃতি মিশিয়া রহিয়াছে, সেই ভদ্রাসন আমার জন্য হাত ছাড়া করিয়া আমার এমন স্নেহময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতাকে পরের দ্বারে দ্বারে আশ্রয়ের জন্য ঘুরিতে হইবে, আর আমি পোড়াকপালী পিতামাতার জীবনের শেষ আশ্রয় কাড়িয়া লইয়া সুখী হইব ধিক আমাকে!

সে রাত্রে আমার নিদ্রা হইল না। সমস্ত রাত বিছানায় শুইয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিলাম, কিন্তু চিন্তাই সার, কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারিলাম না। আমি সংসারের কণ্টক, পিতামাতার শেল, আমার মাথায় বজ্রাঘাত হউক বলিয়া বিধাতার নিকট কত প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা সে প্রার্থনা শুনিলেন না। সমস্ত রাত বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিয়া চক্ষের জলে উপাধান ভিজাইয়া ফেলিলাম, দেবতার নিকট কত মিনতি করিলাম, কিন্তু সবই বৃথা। পিতামাতার দুঃখের এক তিলও কমিল না। জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম অনন্ত আকাশের কোলে দ্বাদশীর চাঁদ অস্ত যাইতেছে। প্রভাত হইতে আর বিলম্ব নাই। এই সময়ে আমার ঘাড়ে ভূত চাপিল। মনে করিলাম আমাকে লইয়াই যত গোল। এ সংসারে আমি না থাকিলে ত আর কোনই গোল থাকে না। তবে কেন এ গৃহ ত্যাগ করিয়া আমি চলিয়া যাই না! আপনারা হয়ত মনে করিবেন একটা পঞ্চদশ বর্ষীয়া বাঙ্গালীর মেয়ের এ চিন্তা কোথা হইতে আসিল? কিন্তু সে দিন আর নাই। এখন বাঙ্গালীর মেয়ে আগুণে পুড়িয়া মরিতে পারে, আর একটা

মেয়ে বাপ মায়ের দুঃখ দেখিয়া আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া, শেষ জীবনে পিতাকে পথের ভিক্ষুক অপেক্ষাও হীন হইতে কল্পনা করিয়া গৃহত্যাগ করিতে পারে না? আপনারা যাহাই ভাবুন, যদি কেহ আমার স্থায় ভুক্তভোগী থাকেন, যিনি পিতামাতার হৃদয়ের অসীম স্নেহে আচ্ছন্ন হইয়া জীবনের ১৫টি বৎসর কাটাইয়াছেন, যে জননী আপনি না খাইয়া সন্তানকে খাওয়াইয়াছেন, যে পিতা কন্যার সুখের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিতে পরাঙ্মুখ নন, আর সে কন্যার যদি পিতৃগত জীবন হয়, তিনি বুঝিবেন এরূপ কল্পনা অস্বাভাবিক নয়। অপরে কি বুঝিবে?

সেই কালরাত্রে আমি গৃহত্যাগ করিলাম—তখন কে জানিত স্ত্রীলোকের দাঁড়াইবার স্থান পৃথিবীতে নাই। আমি ষ্টেশনের পথ চিনিতাম, সেই পথ ধরিয়া বরাবর ষ্টেশনে আসিয়া বর্দ্ধমানের একখানি টিকিট কিনিলাম। কোথায় যাইব, কি করিয়া জীবন কাটিবে এসব চিন্তা তখন আমার মনে ছিল না, গৃহত্যাগ করিয়া পালাইতে হইবে, এই চিন্তায় তখন আমায় একমাত্র বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল।

গাড়ীতে চড়িয়া আমার কতকটা চমক ভাঙ্গিয়াছিল। কাজটা হয়ত ভাল হইল না; এ কথাও একবার মনে হইয়াছিল; কিন্তু তাহা সাময়িক। তখন একটা নেশায় যেন আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু সে কথা যাক্। বর্দ্ধমানে গাড়ী আসিয়া যখন থামিল, তখন বেলা ১১টা। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া কি করিব? কিন্তু গাড়ীতে বসিয়া চিন্তা করিয়া কোন ফল নাই জানিয়া, আমি গাড়ী হইতে নামিলাম। নামিলাম ত; কিন্তু আমার গন্তব্য স্থান কোথায়? প্লাটফরমের এক পার্শ্বে আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। কত লোক ছুটাছুটি করিতেছে। আমার সেদিকে লক্ষ্য নাই। তখন আমি ভাবিতে ছিলাম, একটা আবেগে আমি একি সর্ব্বনাশ করিয়া বসিলাম।

আমি এ অবস্থায় কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলাম জানি না। যখন একটি খর্ব্বাকার বাঙ্গালী যুবক আড়নয়নে বঙ্কিম নয়নবাণ হানিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগো বাছা, কোথায় যাবে" তখন আমার চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখিলাম, বাবুটীর মাথায় রেল কর্ম্মচারীর টুপি, চক্ষে রাত্রি জাগরণ জনিত কালিমা, মুখে মদনের শরাঘাত জনিত ব্যথা। দেখিয়া আমার বুক শুকাইয়া গেল, স্বর কণ্ঠে আটকাইয়া রহিল; অনেক চেষ্টার পর বলিলাম 'জানিনা।"

বাবুটি কি মনে করিলেন বলিতে পারি না, আমার মনে হইতে লাগিল ছুটিয়া বাড়ী পালাইয়া যাই।

বাবুটি চলিয়া গেলেন। দুই চারি মিনিট পরেই একজন খালাসীর সহিত তিনি আবার দেখা দিলেন। আমার নিকটে আসিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ, তোমায় দেখিয়া কুলবধু বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার চালচলন সন্দেহ জনক। আমরা তোমাকে পুলিসের হেপাজতে রাখিব। তুমি এ খালাসীর সহিত যাও। আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।" এই কথা বলিয়া তিনি পাহারাওলাকে ইসারায় কি বলিয়া গেলেন। তখন বুঝি নাই, এখন বুঝিতেছি, তাহা আমার সর্ব্বনাশ করিবার আদেশ বলিতে হয় বল, ষড়যন্ত্র বলিতে হয় বল। আমি একে নানা ভাবনায় মুহ্যমান, তাহার উপর এই বিপদ। আমি ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলাম। কিন্তু হায়, পরের দুঃখে সহানুভূতি কোথায়? একদিন আমার পিতার দুঃখে কেহ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নাই; আজ আমার দুঃখ দেখিয়াও অভাগিনীর দুঃখ দূর করিবার জন্য একটি অঙ্গুলিও কেহ তুলিল না। অগত্যা আমাকে খালাসীর অনুসরণ করিতে হইল।

ষ্টেশনের বাহিরে একটি ছোট পাকা বাড়ীর একটি ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে আমায় লইয়া গিয়া সে চলিয়া গেল। যাইবার কালে বাহির হইতে শিকল বন্ধ করিয়া গেল, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমি একবার ঘরের চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। ঘরে একটি লোকের শয়নের উপযোগী একখান খাট, খাটের উপর ধপ্‌ধপে একটি চাদর দিয়া সযত্নে শয্যাটি ঢাকা রহিয়াছে। ঘরের অপর কোনে একটি মৃতপাত্রে জল ছিল, আর তাহারই পার্শ্বে একখানি থালা, একটি ঘটি আরও দুই এক খানি বাসন ছিল। প্রাচীর গাত্রে দুই একটি বিলাতী অর্দ্ধ উলঙ্গিনী রমণীর চিত্র। খাটের নিচে একটি বোতলের মধ্য হইতে কিসের একটা তীব্র গন্ধ বাহির হইতেছিল। আমি সাহসে ভর করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য সেটাকে বাহিরে আনিলাম। দেখিলাম তাহার গায়ে বড় বড় অক্ষরে "বিষ" এই কথাটি লেখা রহিয়াছে। এইত আমার বিপদের সুহৃদ, জীবনের সুখ, আর্ত্তের সহায়, দুঃখিনীর আশ্রয়, এস এস বঁধু আমার অধরে অধর দিয়া হৃদয়ের জ্বালা দূর কর।

বিপদে আমি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম, বিষের নাম দেখিয়াই আমি সেই বোতলের মধ্যস্থ তরল পদার্থ খানিকটা এক নিশ্বাসে পান করিয়া

ফেলিলাম। মানুষ ও দেবতা এক যোগ করিয়া, আমার সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। আমি ফাঁদে পড়িলাম। বোতলটি রেক্টিফায়েড্ স্পীটের বোতল, সেই জন্য তাহার গাত্রে বিষ লিখা ছিল, কিন্তু তাহার ভিতরে তীব্র হলাহল, বিলাতী সুরা। বাবুটির বিলক্ষণ পানদোষ ছিল। কিন্তু তিনি প্রায়ই গাটের পয়সা খরচ করিয়া শূড়ীর পেট ভরাইতেন না। চাহিয়া চিন্তায় সেটা সংগ্রহ হইত, সেটাকে এইরূপ এই বোতলের ভিতর রাখিতেন। আমার দুরদৃষ্ট যে আমি সেই ফাঁদে স্বেচ্ছায় যাইয়া ধরা দিলাম।

তোমারা যেন কেহ মনে না কর, যে আমার দোষ স্খালনের জন্য উকালতি করিতেছি। মানুষের বিচার আর আমি চাহি না। যদি মাথার উপর একজন সর্ব্বদর্শী দেবতা থাকেন, একবার জানিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার বিচারে কি বলে!

আমি নেশায় প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম! যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, ততক্ষণ আমি মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিয়া ছিলাম। তারপর নেশায় কত কি খেয়াল মাথার মধ্যে আসিয়াছিল। একবার মনে হইয়া ছিল, যেন আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সেদিন আমার ফুলশয্যা। আমি সাজিয়া আমার বরের জন্য বসিয়া আছি, কিন্তু বসিয়া বসিয়া রাত বাড়িয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তিনি আর আসিলেন না। আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমার কান্নার সঙ্গে সঙ্গে সেই পূর্ব্ব কথিত বাবুটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমাকে তদবস্থায় দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "কি বিবিজান, আগে হইতেই কাজ গুছাইয়া রাখিয়াছ। আমি মনে করিয়াছিলাম পোষ মানাইতে বিস্তর বেগ পাইতে হইবে। কিন্তু তুমি যে বাবা একেবারে শিকারী বিড়াল। তা বেশ।" আমার মনে হইল যেন আমার সেই প্রাণ বধূয়া আসিয়াছেন। আমি অমনি তাহাকে ধরিবার জন্য লাফ দিয়া উঠিলাম। কিন্তু হঠাৎ পাদস্খলন হওয়ায় মাথায় দারুণ আঘাত পাইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া মাটিতে আবার পড়িয়া গেলাম।

যখন আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। চক্ষু চাহিয়াই দেখিলাম বাবুটি আমার মাথার নিকট বসিয়া সযত্নে আমার শুশ্রূষা করিতেছেন। মানুষ যে অপরের জন্য আপনার স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে, আপনার হৃদয় ঢালিয়া অপরকে যত্ন করিতে পারে তাহার উদাহরণ এই প্রথম দেখিলাম। সে সময়ে আমার মনে যে কত দ্বন্দ্ব চলিতে

ছিল, কত বিভিন্ন ভাবের লহর যে আমার চিত্ত বেলা-ভূমিতে উঠিয়াছিল, তাহা কথায় বলিতে পারি না। একথায় আপনারা আমাকে যাহাই মনে করুন, আজ সব কথা বলিতে বসিয়া আর মিথ্যা বলিয়া পাপের বোঝা বাড়াইব না।

সেই ঘরে আমি এক বৎসর ছিলাম। পরে জানিতে পারিয়া ছিলাম, বাবুটির নাম যোগেন্দ্রনাথ, বাবুটির নিবাস কামার হাটী; বর্ত্তমানে তিনি রেল পুলিসের দারোগা। দূর হইতে তাঁহাকে যত ভীষণ বোধ হইয়াছিল, কাছে কাছে থাকিয়া দেখিলাম তিনি মোটেই ভয়ানক নন। আমার নিকট হইতে জীবনের সমস্ত ঘটনা শুনিয়া, তিনি আমাকে ভগ্নীর ন্যায় নিকটে রাখিয়াছিলেন। কোনদিন একটু অসম্মানের কথা বলা দূরের কথা, আমাকে এতটুকু অভাব জানিতে দেন নাই। এক প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসমান দুর্ব্বলচিত্ত যুবক কি করিয়া এত বড় মনের জোরের পরিচয় দিল বলিতে পারি না, ইহা একেবারে অস্বাভাবিক। কিন্তু অনেক অস্বাভাবিক ও অনৈসর্গিক ঘটনাও সময় সময়ে ঘটিয়া থাকে, আমার জীবনই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। সেই প্রথম দিনে তাঁহাকে প্রথমে মদনশর পীড়িত অবস্থায় দেখিয়া আমার আসন্ন বিপদের কল্পনা করা, তাহার পর তাঁহার ফাঁদে পড়িয়া তাঁহার কু-অভিপ্রায়ের হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য বিষ পানে আত্মহত্যার চেষ্টায় কুলকামিনীর সুরা পান এবং বর্ত্তমান অবস্থায় আমার প্রতি ভ্রাতৃযোগ্য সম্মান, ব্যবহারাদি প্রদর্শণ করা—এই দুইটা বিচিত্র ও সম্পূর্ণ বিভিন্ন ঘটনায় যোগেনদার (আমি তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছি) এমন এক অদ্ভুত চরিত্র আমার সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছিল যে আমি নিজেই তাঁহার চরিত্রের দুটা অংশের সামঞ্জস্য করিতে পারি নাই; অন্যের কথা আর কি বলিব। যোগেন দা আমায় প্রায়ই বলিতেন "সুখী, বোন, এক নিমিষে আমায় যে কেহ এতটা আয়ত্ত করিতে পারিবে, একথা আমি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই; প্রথম দর্শনেই আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম; আজ আমার প্রেম পুড়িয়া ঠিক খাঁটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একথা আমি বুক ঠুকিয়া বলিতে পারি বটে; কিন্তু আমার জীবনের গতি যে আজ ফিরিয়াছে, সে পরিবর্ত্তনের মধ্যে তোমার প্রভাবই পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে। সেই জন্য তোমায় ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, ভয় হয় জীবনের আলো তুমি চলিয়া গেলে, আবার আমি বিপথে গিয়া পড়িব।" প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময়ে দুই ভাই বোনে বসিয়া এইরূপ কত

কথাই হইত। কোন দিন আবার যোগেনদা বলিতেন, 'যে প্রেম মানুষকে দেবতা করিতে পারে না, সে প্রেম ত প্রেম নয়, সে যে মোহ। আজ আমার এই পরিবর্ত্তনে—আমিই সব চেয়ে সুখী বটে, কিন্তু আমার সুখের সব চেয়ে প্রধান কারণ হচ্চে আমার এত বড় পরিবর্ত্তনটা; আমি তোমাকে যথার্থই ভালবাসি, আর সে ভালবাসা কষ্টিকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহাতে কামনার লেশ মাত্র নাই।" আবার কোন দিন হয়ত বলিতেন, "আচ্ছা সুখী, তুই কি যাদু জানিস্, নইলে আমার একি পরিবর্ত্তন হ'ল বল দেখি, আমি যে নিজেই নিজেকে বিশ্বাস করিতে পারি না," বলিয়া বিস্ময়-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। যোগেনদাদার পরিবর্ত্তনে তাঁহার বন্ধু বান্ধব মহলেও বেশ আলোচনা চলিত, কেহই এত বড় একটা সমস্যায় সমাধান করিতে পারিত না। অনেকেই ইহাকে ভণ্ডামি বলিয়াই প্রথমে প্রথমে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল; আমি কিন্তু যোগেনদার দুঃখ দেখিয়া বুঝিতাম আর যাহাই হউক এ ব্যাপারে যোগেনদা একটুও ভণ্ডামি করেন নাই। আর কেহ বিশ্বাস করুক বা নাই করুক আমি তাঁহাকে সর্ব্বান্তকরণে বিশ্বাস করিয়া ছিলাম। আমি জানিতাম এইরূপ একএকটা ঘটনার পর আঘাতে মানুষের চরিত্রের এক একটা দিক হঠাৎ ফুটিয়া উঠে। ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই।

একটি বৎসর বেশ কাটিয়া গেল। কোন অসুখই ছিল না, মধ্যে মধ্যে মা বাপের জন্য বড়ই মন খারাপ হইত। কিন্তু কালে সবই সহিয়া যায়, আমিও মা বাবার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। দিনান্তে কোন দিন বা একবার তাঁহাদিগের কথা মনে হইত, কোন দিন হইত না। এ অবস্থায়ও এক-রূপ মন্দ ছিলাম না, কিন্তু এটুকু সুখ বিধাতার সহ্য হইল না? যোগেনদা একদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিয়া বার দুই বাহে ও বমি করিলেন। প্রথমে আমি বুঝিতে পারি নাই, সামান্য ব্যাপার বলিয়াই উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম কাল আসিয়া যোগেনদাকে ধরিয়াছে। সমস্ত রাত জাগিয়া তাহার সেবা করিলাম, রাত্রে একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য নিদ্রা যাইলাম না, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যোগেন দার প্রাণপক্ষী অনন্তে মিশাইয়া গেল। আমি আবার অশ্রয় শূন্য হইলাম।

যোগেনদার হাতে শ চারেক টাকা ছিল, মৃত্যুর পূর্ব্বে যোগেনদা সেটা আমার হাতে দিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন "ভাখ, সুখী তোর জন্য কিছু করিয়া

যাইতে পারিলাম না, এই যৎসামান্য রহিল, রাখিয়া দে, ঈশ্বর তোর ভাগ্যে যেমন অনন্ত দুঃখ লিখিয়াছেন, তাহা সহ্য করিবার শক্তিও তোকে দিয়াছেন, তুই একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবি না, সে ভরসা আমার আছে। বোন্ ঈশ্বরে মন রাখিস, আমি চলিলাম, কিন্তু ওখানে গিয়াও তোকে ভুলিতে পারিব না, প্রত্যহ সন্ধ্যায় উকি মারিয়া কি করিতেছিস্ দেখিয়া যাইব।" যোগেনদাকে মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার ভাবনা কতকটা আচ্ছন্ন করিয়াছিল, আমার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি এই সামান্য ইঙ্গিতে আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তোমরা হয়ত এইবার বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছ। আমার জীবনের কথা একখানি মহাভারত; একবার বলিতে আরম্ভ করিলে, শেষ হয় না। কিন্তু তোমাদের ধৈর্য্য থাকিবে কেন? সুতরাং এইবার শেষ করিয়া ফেলা যাক।

বর্দ্ধমান হইতে আশ্রয় চ্যুত হইয়া আমি কোথায় দাঁড়াইব, সুতরাং বাড়ী ফিরিতেই মনস্থ করিলাম। কিন্তু হায় বাঙ্গালীর মেয়ে একবার বাড়ীর, বাহিরে পা দিলেই যে চিরকালের জন্য তাহার পক্ষে সে পথ বন্ধ হইয়া যায় এ কথাত পূর্ব্বে জানিতাম না।

বাটী ফিরিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। একদিনে কি পৃথিবীর সমস্ত ওলট পালট হইয়া গিয়াছে! পিতামাতার আর সে স্নেহ নাই, দীর্ঘ অদর্শনের পর তাঁহাদের বড় আদরিণী কন্যাকে পাইয়া বক্ষে ধরিলেন না, বরং কন্যাকে কালামুখী বলিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া ঘুরিলাম' কিন্তু আশ্রয় দেওয়া দূরের কথা, সকলেই আমার রূপ যৌবন লইয়া এমন কুৎসিৎ বিদ্রূপ করিতে লাগিল যে মাটির সহিত মিশিয়া যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। বাল্যে আমার গৃহকর্ম্মে পটুতরে জন্য সুখ্যাতি ছিল, এরূপ অবস্থা দেখিয়া কোন গৃহস্থের বাটীতে দাসীপনা করাই স্থির করিলাম। আমার জীবনের সব আশা শেষ হইয়াছে, যতদিন অন্য জগৎ হইতে একটা তলব না আসে, ততদিন একটা আশ্রয় প্রয়োজন। এই আশ্রয়ের জন্য যদি কোন গৃহস্থের বাটীতে গতর খাটাইতে হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আর একবার সমস্ত গৃহস্থের বাড়ী ঘুরিয়া আসিলাম কেহই স্বামী পুত্রের সঙ্গে এই কালসাপিনীকে একটু স্থান দিতে ও সাহস করিল না; বরং গ্রামের প্রবীণেরা গোপনে মতলব আঁটিয়া আমাকে গ্রাম ছাড়া করিবার নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

দেশের অসৎচরিত্র যুবকের দল রাত্রদিন আমায় কুপথে লইয়া যাইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতেও সঙ্কুচিত হইল না। শেষে তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয় দেখিয়া, তাহারা যখন আমার উপরে বলপ্রয়োগ করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল, তখন আর গ্রাম পরিত্যাগ করা ভিন্ন উপায় রহিল না।

চন্দননগর পরিত্যাগ করিয়া আজ ছয় মাস কত স্থানে ঘুরিয়াছি। স্ত্রীলোকের রূপ ও যৌবন যে তাহার এত শত্রু তাহা আগে কে জানিত? দুইদিন উপবাসের পর কতবার একটু আশ্রয় পাইয়া হাতে স্বর্গ পাইয়াছি, বাড়া ভাত খাইতে বসিয়াছি, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অত্যাচারের ভীষণ আয়োজন দেখিয়া, চক্ষের জল আঁচলে মুছিয়া, বড় ক্ষুধার অন্ন ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়াছি। এ পোড়া রূপ, যৌবন নিপাত যায়না কেন? আমি ত জগতের চক্ষে পতিতা, কুক্কুরী অপেক্ষাও হীনা, কিন্তু ওগো তোমরা আমায় বলিয়া দাও, আমি কি করিয়া জীবন কাটাইব? সুখে থাকিতে চাহিনা, দুই সন্ধ্যায় এক মুঠা শাক-অন্ন খাইয়া একটা ক্ষুদ্র কুড়ের একটি কোনে মাথা গুজিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পড়িয়া থাকিব, যেখানে কেহ আমায় জ্বালাতন করিতে আসিবে না, এমন উপায় ও এমন একটুকু স্থান আমার জন্য করিয়া দিয়া, তোমাদের চিরসঞ্চিত বিদ্রূপ ও প্রাণভরা ঘৃণা যতবার পার আমার উপর বর্ষণ করিও, অপত্তিসূচক একটি কথাও আমার মুখ হইতে বাহির হইবে না।

বিপ্লব

(লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

নবম পরিচ্ছেদ

সমাজ চ্যুতা

রমানাথ ভট্টাচার্য্য যাদব সার্ব্বভৌমের নিকট জ্ঞাতি। রমানাথের পিতা কাশীনাথ বাচস্পতি দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। দশ বারো ক্রোশের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর ছিল না, অধ্যাপক বিদায় স্থলে তাঁহার সমান উচ্চ বিদায়ও কেহ পাইত না। বহু দূরদেশ হইতে অনেকে

তাঁহার নিকট স্মৃতিশাস্ত্রের পাঠ লইতে আসিত। সার্ব্বভৌম মহাশয়ও ইঁহার নিকটেই ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক স্থলেই আপনাকে কাশীনাথ বাচস্পতির ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া উচ্চ সম্মান লাভ করিতেন।

এতাদৃশ বিখ্যাত পণ্ডিত কাশীনাথ কিন্তু পুত্র রমানাথকে সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিলেন না, তিনি পুত্রকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিতে মনস্থ করিয়া তাহাকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। অধ্যাবসায় সম্পন্ন রমানাথ প্রবেশীকা পরীক্ষায় বৃত্তি লইয়া কলিকাতায় গিয়া এফ, এ পড়িতে লাগিল।

যে বৎসর রমানাথ এফ, এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল, সেই বৎসর কাশীনাথ স্বর্গারোহণ করিলেন। অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেও কাশীনাথ কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ব্যতীত আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চানিরত চিত্তে অর্থ সঞ্চয়ের চিন্তা স্থান পায় নাই, যাহা উপার্জ্জন করিতেন, ছাত্রমণ্ডলীর ভরণপোষণেই তাহা ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। সুতরাং পিতার মৃত্যুতে রমানাথকে পড়া ছাড়িয়া অর্থ চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে হইল। সে যুবতী স্ত্রী ও শিশুকন্যা শৈলজাকে রাখিয়া কলিকাতায় কার্য্য-স্থলে যাত্রা করিল। যাইবার সময় খুল্লতাত সার্ব্বভৌমের উপর দেখাশোনার ভার দিয়া গেল। রমানাথ প্রতি মাসে একবার করিয়া বাড়ী আসিত, এবং রবিবার থাকিয়া সোমবারে চলিয়া যাইত। স্ত্রী কাত্যায়নী শুধু রূপে নহে, গুণেও লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন। সুতরাং দরিদ্র রমানাথের সংসারে সুখ শান্তির অভাব ছিল না।

কিন্তু সহসা একদিন এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সাংসারিক সুখ শান্তি তিরোহিত হইবার উপক্রম হইল। কাত্যায়নীর রূপের খ্যাতিই তাহার মূল। এই যুবতী ব্রাহ্মণকন্যার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে অনেক পাপিষ্ঠেরই পাশব প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত, এবং সেই প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য তাহারা সুযোগ অন্বেষণ করিত।

সুযোগ একদিন মিলিল। কাত্যায়নী একা থাকিতে ভয় পাইতেন। বলিয়া প্রতিবেশী বলাই বারিকের মা আসিয়া কাছে শুইত। সেদিন কাজের অছিলায় বলায়ের মা শুইতে আসিতে পারিল না। কাত্যায়নী আলো জ্বালিয়া রাখিয়া আধ ঘুমন্ত, আধ জাগ্রত অবস্থায় ভয়ে ভয়ে রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন।

রাত্রি যখন গভীর, তখন বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হওয়ায় কাত্যায়নী দরজা খুলিতেই এক ব্যক্তি সবেগে ঘরে ঢুকিয়া কাত্যায়নীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কাত্যায়নী চিনিল, সে দীনুঘোষের পুত্র শিবুঘোষ। কাত্যায়নী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সে চীৎকারে শিশুকন্যা জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু শিবু তাহাতে ভীত বা নিরস্ত হইল না। কাত্যায়নী মিনতি করিলেন, ভয় দেখাইলেন, ধর্ম্মের দোহাই দিলেন, কিন্তু কামোন্মত্ত পিশাচ তাঁহার কথা কাণে তুলিল না, পাশব প্রবৃত্তির তাড়নায় সে আপনার পাপরিপুর চরিতার্থতা সাধনে যত্নবান হইল। কাত্যায়নীও পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে আপনার সর্ব্বস্ব রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে যখন হতাশ হইয়া পড়িলেন, তখন উন্মত্তপ্রায় হইয়া পাশের ঘটীটা তুলিয়া পাষণ্ডের মস্তকে সবলে আঘাত করিলেন। সে প্রচণ্ড আঘাতে পাপিষ্ঠের মাথা কাটিয়া গেল, ঝর ঝর রক্ত ঝরিতে লাগিল। সে দুই হাতে মাথা চাপিয়া ছুটিয়া পালাইল। কাত্যায়নী আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, সংজ্ঞাহীন ভাবে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। পাপিষ্ঠের ক্ষত মুখ নিঃসৃত রক্তে তাহার পরিধেয় বস্ত্র রঞ্জিত হইয়া গেল।

কাত্যায়নীর চীৎকারে প্রতিবাসীদের অনেকেই সজাগ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উঠিয়া লাঠীসোটা লইয়া রমানাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর দিকে ছুটিল। তাহারা আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা কাত্যায়নীর চোখে মুখে জল দিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল, এবং তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া একটা কুৎসিত সিদ্ধান্ত করিয়া ঘরে ফিরিল।

পরদিন এই ব্যাপার লইয়া গ্রামে প্রবল আন্দোলন চলিতে লাগিল। কেহ কেহ শিবুকে পুলিশে দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল, কেহ কেহ এই লজ্জাজনক ঘটনাকে চাপিয়া যাইতে পরামর্শ দিল। সংবাদ পাইয়া রমানাথ ঘরে আসিল। সে পত্নীর মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। পত্নীর কথায় নিজের দৃঢ় বিশ্বাস হইলেও সে কিন্তু লোকের বিকৃত ধারণাকে দূর করিতে পারিল না। তাহারা কাত্যায়নীকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে, তাহার কাপড়ে রক্তের দাগ স্পষ্ট দেখিয়াছে। সুতরাং শিবুঘোষ কর্ত্তৃক কাত্যায়নীর ধর্ম্ম যে নষ্ট হইয়াছে এ সম্বন্ধে তাহাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ধর্ম্মচ্যুতা পত্নীকে

ত্যাগ করিবার জন্য রমানাথকে পরামর্শ দিল। রমানাথ অনন্যোপায় হইয়া খুল্লতাত সার্ব্বভৌমকে ধরিয়া বসিল। সার্ব্বভৌম মহাশয়ও কিন্তু কাত্যায়নীকে ত্যাগ করা ছাড়া অন্য উপদেশ দিতে পারিলেন না। স্ত্রীলোকের সতীত্ব সর্ব্বস্ব; যাহার সে সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, সমাজ সেই ধর্ম্মহীনা রমণীকে স্বীয় অঙ্কে স্থান দান করিতে পারেনা। শাস্ত্রও এ বিষয়ে সমাজেরই মতের পোষক।

রমানাথ কিন্তু খুল্লতাতের উপদেশ মানিয়া লইতে পারিল না। সুতরাং সমাজ কত্যায়নীর সহিত রমানাথকেও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। রমানাথ কিন্তু ইহাতে ভীত হইল না, সে স্ত্রীকন্যাকে লইয়া জন্মভূমির সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা বাসী হইল।

চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা আয়ে তিনটী প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন কোনরূপে চলিতে লাগিল, কিন্তু শৈল যখন দশ ছাড়াইয়া এগারোয় পা দিল, তখন রমানাথ তাহাকে পার করিবার কোন উপায়ই দেখিতে পাইল না। ইহার মধ্যে আরও দুই তিনটী সন্তান অতিথিরূপে তাহাদের সংসারে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ঠিক অতিথিরই মত অল্পদিন মাত্র থাকিয়া তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। শুধু শৈল একাই মাতাপিতার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল হইয়া তাঁহাদের স্নেহ ও ভালবাসা অধিকার করিয়া রহিল। স্নেহ ও সান্ত্বনার একমাত্র আধার সেই কন্যাকে রমানাথ উপযুক্ত শিক্ষা দিতেও পরাঙ্মুখ হইল না। কিন্তু শেষে সেই কন্যার পরিণাম কিরূপ সুখকর করিয়া দিবে ইহাই তাহার প্রবল চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল।

পরিশেষে রমানাথ স্থির করিল, দেশে জমি জায়গা যাহা কিছু আছে সব বেচিয়া মেয়ের বিবাহ দিবে। কিন্তু এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না, তাহার পূর্ব্বেই কলিকাতায় নবাগত প্লেগের আক্রমণে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিল। বিধবা হইয়া কাত্যায়নী সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়িলেন। তিনি আর কলিকাতায় থাকিতে পারিলেন না। কন্যাকে লইয়া তিনি দেশের বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। দেশের ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছিল; কাত্যায়নী তাহা মেরামত করিয়া লইলেন। তাঁহার হাতে যাহা কিছু ছিল, ইহাতেই সব শেষ হইয়া গেল

জমিজায়গা যাহা ছিল তাহাতে দুইটী প্রাণীর সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু আট দশ বৎসরের বিনা তত্ত্বাবধানে তাহার অধিকাংশই

পরহস্তগত হইয়াছিল। সার্ব্বভৌম মহাশয়ও কতক জমি অধিকার করিয়াছিলেন। কাত্যায়নী ও তাহার কন্যাকে সমাজে গ্রহণ না করিলেও তাহাদের জমি জায়গা গ্রহণ করিতে কেহই দ্বিধা বোধ করিলেন না।

কাত্যায়নী পরহস্তগত সম্পত্তির উদ্ধারের কোন উপায়ই দেখিতে পাইলেন না। কেহ কেহ মোকদ্দমা করিতে পরামর্শ দিল। কিন্তু মোকদ্দমা করিবার উপযুক্ত লোকবল বা অর্থবল কিছুই তাঁহার ছিলনা। সুতরাং যেটুকু সম্পত্তি পরের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, সেইটুকু লইয়াই তিনি কষ্টে কন্যার ও আপনার ভরণপোষণ চালাইতে লাগিলেন।

কলিকাতায় বরং শৈলর বিবাহের আশা ছিল, কিন্তু দেশের সমাজে তাহার আর কোন আশাই রহিল না। সমাজচ্যুতা ধর্ম্মভ্রষ্টার কন্যাকে কে বিবাহ করিবে? কাত্যায়নী খুড়শ্বশুর সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট গিয়া কাঁদাকাটা করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয়ও উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। কিন্তু সে উপায় কাত্যায়নীর মনঃপূত হইল না। হীন ঘরে মূর্খ কুচরিত্র পাত্রের হস্তে তিনি কন্যাকে সমর্পণ করিতে পারিলেন না। তিনি স্বামীর নিকট শুনিয়াছিলেন, কন্যাকে বরং আজীবন কুমারী রাখিবে, তথাপি অপাত্রের হস্তে তাহাকে অর্পণ করিবে না, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। কাত্যায়নী স্থির করিলেন, তাহাই হউক, অপাত্রের হাতে পড়িয়া সারাজীবন দুঃখ ভোগ করা অপেক্ষা মেয়ে কুমারীই থাকুক। তাঁহার বাপের পিসী যে কুমারী অবস্থাতেই সত্তর বৎসর বয়সে মারা গিয়াছিলেন। বিধাতার মনে থাকে, সুপাত্র জুটে, বিবাহ হইবে। নচেৎ আজীবন কৌমার্য্যব্রত পালন করিবে।

কাত্যায়নী এইরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন বটে, কিন্তু শৈলর বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, প্রতিবাসিনী দিগের তাহার বিবাহের চিন্তায় আহার নিদ্রা ত্যাগের উপক্রম হইল। এত বড় মেয়ে ঘরে রাখিয়া রমা ভট্টাজ্যির স্ত্রী যে কিরূপে পেটে ভাত দিতেছে, ইহাই ভাবিয়া সকলে অ শ্চর্য্যান্বিত হইল। কেহ বা ইহাতে কলিকাতাবাসের প্রত্যক্ষ কুফল প্রমাণিত করিল, কেহ বা তাহার নষ্ট দুষ্ট স্বভাবের উল্লেখ করিয়া তাহাতে যে সবই সম্ভব ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া লইল।

কাত্যায়নীর কাণেও অনেক কথা আসিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কোন কথাতেই কাণ দিলেন না। যেমন চুপ করিয়া ছিলেন, তেমনই রহিলেন। তাঁহার পাড়া বেড়ান অভ্যাস না থাকিলেও অনেক নবীনা প্রবীণা তাঁহার

বাড়ীতে বেড়াইতে আসিত এবং আত্মীয়তায় ভাণ করিয়া তাঁহাকে যে সকল কথা শুনাইয়া যাইত, তাহাতে তিনি গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

এদিকে শৈল পঞ্চদশে পদার্পণ করিল। বসন্তের আগমন সম্ভাবনায় সমগ্র বনানী যেমন একটা আকস্মিক পুলকে শিহরিয়া উঠে, বনের সকল পাখীই একসঙ্গে কলতানে ডাকিয়া উঠে, সর্ব্বত্র একটা উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়; যৌবনের সঞ্চার সম্ভাবনায় শৈলর সমগ্র দেহের মধ্যেও তেমনই একটা আকস্মিক শিহরণ দৃষ্ট হইল; প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যেন একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল, অস্ফুট অঙ্গ গুলা ধীরে ধীরে প্রস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল. দেহে ও মনে সর্ব্বত্র একটা নবীনতার উচ্ছাস বহিয়া চলিল।

কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাত্যায়নী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। হায় ভগবান্! এক জনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি অপরকে করিতে হয়? মাতার পাপে কন্যাকেও কি এই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে?

কাত্যায়নী কন্যার বহির্গমন বন্ধ করিয়া দিলেন। পল্লীগ্রামে স্নান করিতে, কাপড় কাচিতে, জল আনিতে বাহিরে যাইতে হয়। সাধ্যসত্ত্বে কাত্যায়নী সে সময়ও কন্যাকে একা যাইতে দিতেন না, নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন।

শৈলও খুব শান্ত শিষ্ট মেয়ে। তা ছাড়া মাতার মানসিক ব্যথাও সে আপনার অন্তরে অনুভব করিতে শিখিয়াছিল। সুতরাং বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সে বাটীর বাহির হইত না। রমানাথের অধ্যয়ন স্পৃহা ছিল। সে অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহার মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ ছিল। মাতা ও কন্যা সেই সকল গ্রন্থ লইয়া সময় যাপন করিত। বাহিরে যাইবার বিশেষ প্রয়োজনও হইত না।

একদিন কিন্তু সে প্রয়োজন হইল, এবং সে দিন শৈল মাতার আদেশ, লজ্জা সঙ্কোচ সব ত্যাগ করিয়া একা বাটীর বাহির না হইয়া থাকিতে পারিল না। মানসিক দুশ্চিন্তায় ও সাংসারিক কষ্টে কাত্যায়নীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাঁহার জ্বর হইত, কিন্তু সে জ্বর তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না, স্নানাহারের নিয়মও মানিয়া চলিতেন না। ইহার ফলে

শীঘ্রই তিনি এরূপ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন যে, তাঁহার সংজ্ঞা পর্য্যন্ত লোপ পাইল। ভয়ে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সে ডাক্তার আনিতে ছুটিল।

দশম পরিচ্ছেদ

স্নেহের দাবী

পরেশ গিয়া দেখিল, রোগ তেমন কঠিন নয়, জ্বরটা খুব প্রবল হওয়ায় রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে। তবে একেবারে যে আশঙ্কা নাই এমন নহে, বুকের একদিকে নিমোনিয়ার আক্রমণের আশঙ্কা আছে। শৈল উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখলেন, ডাক্তার বাবু?"

পরেশ সংক্ষেপে উত্তর দিল, "ভয় নাই।"

একটু পরে রামু ঔষধের বাক্স লইয়া আসিলে পরেশ ঔষধ দিল; বুকে একটা মালিস দিয়া বুক বাঁধিয়া দিল। তারপর রামুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি ঘরে যাও কাকা, বাক্সটা এখানেই থাক্।"

রামু জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি?"

পরেশ বলিল, "একজনের এখানে থাকা দরকার।"

রামু। আমি থাকলে চলবে না।?"

পরে। তুমি তো ওষুধ খাওয়াতে পারবে না।'

শৈল তাড়াতাড়ি বলিল, "ওষুধ আমি খাওয়াতে পারব; সেজন্য আপনার রাত জাগবার দরকার নাই।"

পরেশ বলিল, "রাত্রিতে পাঁচ ছয় বার ওষুধ খাওয়াতে হবে। আপনি কি রাত জেগে—"

শৈল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সে আমি খুব পারবো।"

পরেশ তখন কোন্ সময়ে কোন ঔষধ খাওয়াইতে হইবে শৈলকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। রামু তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া,—ফিরিয়া আসিয়া দাবার উপর শুইয়া রহিল।

অনেক রাত্রিতে কাত্যায়নীর একটু চৈতন্য হইল, কিন্তু তিনি যেন বড় ছটফট করিতে লাগিলেন। শৈল ভয় পাইয়া রামুকে জাগাইল, এবং ডাক্তার বাবুকে খবর দিবার জন্য মিনতি করিতে লাগিল। এত রাত্রিতে পরেশকে জাগাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও শৈলের কাতরতা দেখিয়া রামু

থাকিতে পারিল না ; সে একটু বিরক্তভাবেই উঠিয়া পরেশকে ডাকিতে চলিল।

পরেশ আসিয়া দেখিল, ভয়ের কোন কারণ নাই, জ্বরের বিচ্ছেদ হই-তেছে, এবং তজ্জন্যই রোগীর অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইতেছে। এক দাগ ঔষধ দিতেই কাত্যায়নী স্থিরভাবে ঘুমাইয়া পড়িলেন। শৈল ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বলিল, "মার অস্থিরতা দেখে আমার বড্ড ভয় হ'য়েছিল, সেই জন্যই আপনাকে আবার—"

বাধা দিয়া পরেশ বলিল, "সেজন্য আপনার কুণ্ঠিত হ'বার কোন দরকার নাই। আপনি তো স্ত্রীলোক, ছেলেমানুষ এ অবস্থায় অনেক প্রাচীন লোকেও ভয় পেয়ে থাকে।

রাত্রি আর অল্পই ছিল, সুতরাং পরেশ অবশিষ্ট রাতটুকু সেইখানেই বসিয়া কাটাইয়া দিতে ইচ্ছুক হইল। শৈল একখানা হাতভাঙ্গা চেয়ার আনিয়া দিল। পরেশ তাহাতে বসিয়া রহিল। শৈল মাতার শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে পাখা নাড়িতে থাকিল। পরেশ বলিল, "আমি যখন জেগে আছি, তখন আপনার আর জেগে থাকার দরকার কি ?

শৈল বলিল, "তা হোক, আমার ঘুম আসছে না।"

কিন্তু খানিক পরেই পাখাটা হঠাৎ হাত হইতে পড়িয়া গিয়া যখন নিদ্রায় আগমনবার্ত্তা জানাইয়া দিল, তখন পরেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি অস্বীকার করলেও ঘুমটা যখন জোর ক'রেই আসতে চাইছে, তখন তার সঙ্গে লড়াই করার চেয়ে, শুয়ে পড়া কি ভাল নয় ?"

লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া শৈল বলিল, "না থাক্।"

পরেশ বুঝিতে পারিল, তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া নিজে নিদ্রাসুখটুকু উপ-ভোগ করিতে শৈল রাজি নহে। এদিকে ঘুমও তাহার চোখ দুইটার উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়িতেছিল না। এই উভয় সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য পরেশ তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দিল। শৈল কোথায় কতদূর পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, তাহাদের স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর নাম কি, তাহারা কলি-কাতা ছাড়িয়া কতদিন দেশে আসিয়াছে, কলিকাতা অপেক্ষা দেশ প্রীতিকর কি না, ইত্যাদি অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। শৈল সংক্ষেপে মৃদুস্বরে সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকিল। তারপর পরেশ আপনার বিলাত যাত্রার কথা পাড়িল। জাহাজে চড়িয়া কিরূপে কতদিনে সমুদ্র উত্তীর্ণ

হইয়াছিল, বিশাল সাগরের ভীম-মূর্ত্তি দেখিয়া কেমন ভীতিমিশ্রিত আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, একদিন তরঙ্গের আঘাতে জাহাজ দোদুল্যমান হইয়া যাত্রীদের হৃদয়ে কিরূপ আশঙ্কার সঞ্চার করিয়াছিল, বিলাতের স্বাধীন প্রকৃতি ইংরাজরমণীদের চরিত্র কিরূপ মধুর, তাঁহারা বিদেশী ভদ্র লোকদের প্রতি কেমন সদ্ব্যবহার করেন, ইত্যাদি নানা কথার অবতারণা করিল। শৈল নত মস্তকে বসিয়া মুগ্ধচিত্তে তাহা শুনিতে লাগিল।

বাহিরে কোকিল, দহিয়াল, শ্যামা সমস্বরে ডাকিয়া উঠিল; গবাক্ষপথে উষার আলোকের সঙ্গে প্রভাত বায়ু ঝির ঝির করিয়া আসিয়া শৈলর অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিল; রামুর দীর্ঘ আলস্য-ত্যাগ শব্দের সহিত গলার থক্ থক্ শব্দ শোনা গেল। পরেশ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "ঘুম ভাঙ্গিলে একদাগ ওষুধ খাইয়ে দেবেন। আমি ন'টার সময়ে আসছি।"

পরেশ চলিয়া গেল। রামু ঔষধের বাক্স লইয়া তাহার অনুসরণ করিল। শৈল মাতার শিয়রে বসিয়া পরেশের ইংরাজরমণীদের প্রশংসার কথাগুলা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল।

একটু বেলা হইলে কাত্যায়নীর ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি চোখ মেলিয়া ডাকিলেন, "শৈলি!"

শৈল তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "কেন মা?"

কাত্যায়নী বুকের বাঁধনে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসব কি?"

শৈল বলিল, "থাক্ মা, ও ডাক্তার বাবু বেঁধে দিয়ে গেছেন।"

একটু বিস্ময়ের সহিত কাত্যায়নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার? কোন্ ডাক্তার?"

শৈল বলিল, "পরেশ ডাক্তার।"

কন্যার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাত্যায়নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই বুঝি তাকে ডাকতে ছুটেছিলি?"

মুখ নীচু করিয়া শঙ্কিত স্বরে শৈল উত্তর দিল, "তোমার যে বড্ড অসুখ হ'য়েছিল মা।"

"আমার মাথা হয়েছিল; বলিয়া কাত্যায়নী পাশ ফিরিয়া শুইলেন। শৈল বিবর্ণমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরে কাত্যায়নী মুখ ফিরাইয়া রুষ্টস্বরে বলিলেন, "তুই কোন্ লজ্জায় গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে ডাক্তার ডাকতে গেলি বল দেখি?"

শৈল অধোমুখে নিরুত্তর। কাত্যায়নী বলিলেন, "ডাক্তারের ভিজিট, ওষুধের দাম দিয়েছিস্ ?"

শঙ্কা জড়িত স্বরে শৈল উত্তর দিল, "না।"

কাত্যায়নী দাঁতে দাঁত চাপিয়া রোষরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তুই কি আমার মান ইজ্জত সব না খুইয়ে ছাড়বি না?"

শৈল মায়ের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া, ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাত্যায়নী একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সহসা বাহিরে জুতার শব্দ পাইয়া শৈল ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, এবং ব্যস্তভাবে আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। কাত্যায়নী মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিলেন।

পরেশ দরজার বাহিরে জুতা রাখিয়া ঘরে ঢুকিল, এবং শৈলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এই যে ঘুম ভেঙেছে, এখন কেমন আছেন?"

শৈল কোন উত্তর করিল না; কাত্যায়নীও নীরবে রহিলেন। পরেশ শয্যার নিকট অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, "হাতটা দেখি।"

কাত্যায়নী হাতটা সরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মেয়েটা নেহাৎ নির্ব্বোধ, একটুতে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি আপনাকে ডেকে এনেছে। আপনার ভিজিট আর ওষুধের দাম কত হয়েছে?

মৃদু হাসিয়া পরেশ বলিল, "ডাক্তারদের ভিজিট দিনে এক রকম, রাত্রে অন্য রকম। রাত্রে দুবার এসেছি; দুবারে আট টাকা হিসাবে ধরলেও ষোল টাকা, আর ওষুধের দামও চারটে টাকা হবে।"

কাত্যায়নী বলিলেন, "আমরা বড় গরীব, এত টাকা দেবার ক্ষমতা নাই।"

তারপর কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাক্সে দশ টাকার একখানা নোট আছে, বের করে দাও।"

শৈল একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কাত্যায়নী তাহা বুঝিয়া তাহার দিকে এমন তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন যে, সে আর না উঠিয়া থাকিতে পারিল না। সে বাক্স খুলিয়া নোট খানি আনিয়া পরেশের সম্মুখে রাখিল। পরেশ দাঁড়াইয়া শুধু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কাত্যায়নী বলিলেন, "আর আমার হাতে একটি টাকাও নাই। এই নিয়ে আমাকে ঋণমুক্ত করুন।"

পরেশ মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া বলিল, "এতো কালকার ধার শোধ হলো। কিন্তু আজকার ওষুধের দাম, ভিজিট?"

কাত্যায়নী বলিলেন, "আমি আর ওষুধ খাব না।"

"কেন খাবেন না?"

"ওষুধের দাম দেবার সঙ্গতি আমাদের নাই।"

"এখন হাতে না থাকে, পরে দেবেন।"

"পরেও কোথাও হ'তে টাকা আসবার উপায় নাই।"

"কিন্তু ওষুধ না খেলে আপনার অসুখ বাড়তে পারে।"

"কতদূর বাড়তে পারে?"

"মৃত্যু পর্য্যন্ত।"

"তাতে আমার কোন বিশেষ ক্ষতি নাই।"

"আপনার ক্ষতি না থাকলেও আপনার মেয়ের বোধ হয় যথেষ্ট ক্ষতি আছে।"

কাত্যায়নী একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইলেন। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়ের ক্ষতি কি আপনার ক্ষতি নয়?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাত্যায়নী বিষাদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ঐ মেয়েটাই আমার গলগ্রহ।"

সহাস্যে পরেশ বলিল, "অন্ততঃ এই গলগ্রহের জন্যও আপনাকে বাধ্য হ'য়ে ওষুধ খেতে হবে।"

কাত্যায়নী চুপ করিয়া রহিলেন। পরেশ একটু অপেক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলেন?"

রুক্ষস্বরে কাত্যায়নী বলিলেন, "আপনি বিনামূল্যে ওষুধ দেবেন?"

পরেশ। ব্যবসায়ীরা মূল্য না নিয়ে জিনিষ দিতে পারে না।

কাত্যা। কিন্তু বলেছি তো, আমার মূল্য দেবার ক্ষমতা নাই।

পরেশ। টাকা ছাড়া আরও অনেক রকমে মূল্য দেওয়া যেতে পারে।

কাত্যায়নী পরেশের দিকে একবার বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি?"

মৃদু হাসিয়া পরেশ উত্তর করিল, একটু স্নেহ, যাহা টাকা দিয়ে পাওয়া যায় না।"

কাত্যায়নী কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। পরেশ নোট খানা

তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া পায়ের ধূলা লইল। কাত্যায়নী মুখের কাপড়টা সরাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমি শুনেছিলাম বাবা, তুমি বিলেতে থেকে এসে পূরো সাহেব হ'য়েছ।"

পরেশ হাসিয়া উঠিল; বলিল, "সাহেব কি মানুষ নয় মা?"

কাত্যায়নী স্নেহসজল দৃষ্টিতে তাহার হাস্য প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পিসী ভাইপো।

"বাবা হরিচরণ, ও হরি, হরি; ওরে হরে, ও হতভাগা!"

মুখের কাছ হইতে থেলো হুঁকাটা সরাইয়া হরিচরণ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "হুম্।"

"হুম্! এতক্ষণ কি কাণের মাথা খেয়েছিলি?"

হুকাটা ডান হাত হইতে বাঁ হাতে লইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া চড়া স্বরে হরিচরণ বলিল, "দেখ পিসীমা, তোমার জ্বালায় একটু ভাববারও যো নাই।"

পিসীমা মুখখানাকে বিকৃত করিয়া উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "ইস্, উনি ভাবচেন? তোর আবার ভাবনাটা কিসের বল্ তো?"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে বিকৃত স্বরে হরিচরণ বলিল, "না, আমার কি আর কিছু ভাবনা আছে?"

অব হাতটা নাড়িয়া পিসীমা বলিলেন, "নাই ই তো। সংসারের চা'লে ডা'লে নুনে তেলে কিসে আছিস্? খাস্ দাস্ ফুর্ত্তি করে বেড়াস্।"

রাগে চোখ কপালে তুলিয়া হরিচরণ বলিল, "কি আমি অমনি খাই? টাকা দিয়ে খাই।"

পিসীমা বলিলেন, "ভারী তো টাকা! আড়াই টাকায় একটা লোকের দু'বেলা খাওয়া হয়?"

হরিচরণ বলিল, "আলবৎ হয়। তোমার ঐ ডাঁটা চচ্চড়ি ভাত, আড়াই টাকায় সাত বেলা করে খাওয়া হয়।"

ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা শুনিয়া পিসীমা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; গালে হাত দিয়া বিস্ময়প্লুত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ!"

হরিচরণ মাথা দোলাইয়া জোর গলায় বলিল, "ওঃ কি, আসচে মাস হতে নিজে রেঁধে খাব। পয়সা দিয়ে কেন ছাই পাঁশ খেতে যাব?"

পিসীমা ঈষৎ অভিমানের সুরে বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে! কে তোকে ছাই পাঁশ খেতে সাধছে বাপু।"

হরিচরণ ঘাড় নীচু করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "সাধবে আবার কে? কেন হাত পুড়িয়ে খাব, তুমি পিসী, আপনার লোক, তুমিও দুপয়সা পাও, আমারও খাওয়া চলে, তাই তোমার কাছে খেতে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি তো তা নও।"

পিসীমা বলিলেন, "কি নই? আপনার লোক নাই?"

হরি। সম্পর্কে আপনার লোক হলেও, সে রকম কাজ তো কিছু কচ্চো না।

রাগে গর্জ্জন করিয়া পিসীমা বলিলেন, "কচ্চি না কি? মত্তে মত্তে দু'বেলা রেঁধে দিচ্চি, কোথায় জল, কোথায় পান, যায় তামাকটী, কয়লাটীর পর্য্যন্ত যোগাড় করে রাখছি।"

হরি। তবে তো আমার মাথা কিনে ফেলেছ?

পিসী। তা ছাড়া আবার কত্তে হবে কি? পায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে নাকি?

পিসীমার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হরিচরণ বলিল, "আমি যেন তাই বলছি। তা ছাড়া যেন করবার আর কিছুই নাই?"

পিসীমা বলিলেন, "কি আছে ভাই খুলেই বল্না।"

মাথা নীচু করিয়া হরিচরণ আপন মনে গোঁ গোঁ করিতে করিতে বলিল, "খুলেই বল্ না! সকল কথা বুঝি খুলে বলা যায়? এই যে চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হতে চললো, কিন্তু সে ভাবনা কি কারো আছে?"

পিসীমা এবার ভ্রাতুষ্পুত্রের রাগের কারণটা বুঝিতে পারিলেন। তিনি হাসি চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ের কথা বলছিস্?"

রোষগম্ভীর কণ্ঠে হরিচরণ বলিল, "না, আমার শ্রাদ্ধর কথা বলছি।"

পিসীমা বলিয়া উঠিলেন, "বালাই, সাট! তা বাছা, তোর বিয়ের কথা কি আমি ভাবি না? দিন রাতই ভাবচি।"

হরিচরণ বলিল, "হাঁ, ভাবচো বৈকি, ভাবলে এদ্দিন কবে হয়ে যেত।"

পিসীমা বলিলেন, "আমি ভাবি কি না তা তুই কি জানবি, যিনি অন্তর্যামী

তিনিই জানেন। তা শুধ্ ভাবলেই তো হবে না, এ তো কুলীনের বিয়ে নয়, তোরা যে ছোরিত্তিরি, টাকা দিতে হবে।"

হরি। হলেই বা দিতে, সে আর কত?

পিসী। কত কি, কম-সম করে ধ'রলেও, পণে গয়নায় পাঁচ ছ'শোর তো কম নয়!

"তবেই হয়েছে" বলিয়া হরিচরণ ম্লান মুখে মাথা চুলকাইতে লাগিল। পিসীমা বলিলেন, "কি করবো বল, আমার কি তেমন সঙ্গতি আছে? কাজেই চুপ করে আছি। তা নৈইলে তোর ভাবনা আমি দিন রাত ভাবি। তুই আমাকে যাই মনে কর হরি, আমি কিন্তু তোকে আপনার বলেই মনে করি।"

ঈষৎ অনুতাপের স্বরে হরিচরণ বলিল, "তা কি আমি জানি না পিসীমা, তুমি পিসী, আমি ভাইপো, এতো আর পাতানে সম্পর্ক নয়। তবে আপনার লোক বলেই রাগের মাথায় দু'চার কথা বলে ফেলি। পরকে কি কেউ বলতে যায়।"

পিসীমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা তো বটেই। তা বলেছিস্ বলেছিস্। এখন উঠে কলুবাড়ী হতে তেলটা নিয়ে আয় দেখি।"

হরিচরণ তামাক না খাইলেও হুকাটা এতক্ষণ ধরিয়াই ছিল; এখন হুকাটা রাখিয়া ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, তা যাচ্চি। কিন্তু একটা কথা বলছিলাম—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে, বস না।"

পিসীমা আসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্মুখে বসিলেন, এবং কথাটা কি জানিবার আশায় উৎসুক নেত্রে হরিচরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হরিচরণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আচ্ছা পিসীমা, ঐ যে ভটচাজ্যিদের মেয়েটা থুবড়ো হয়ে রয়েছে, শুনছি তার বিয়ে হবে না।"

পিসীমা বলিলেন, "হবে কোথা হতে, ওর মায়ের যে দোষ আছে। ওরা এক ঘরে হয়ে আছে, এক ঘরের মেয়েকে কে ঘরে নেবে?"

ঈষৎ বিরক্তভাবে হরিচরণ বলিল, "রেখে দাও এক ঘরে; ও সব বাজে কথা। আমি ও কথা মানি না। তুমি ঐ মেয়েটী দেখতে পার? বোধ হয় পয়সা কড়ি কিছু লাগবে না।"

পিসীমা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে হরিচরণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঐ মেয়েটা!"

হরিচরণ গম্ভীরভাবে বলিল, "কেন, দোষ কি? এক ঘরে? সে আমি চালিয়ে নেব।"

বিস্মিত কণ্ঠে পিসীমা বলিলেন, "কিন্তু ওরা দেবে কেন?"

উত্তেজিত কণ্ঠে হরিচরণ বলিল, "দেবে কেন? বিয়ে হচ্চে না, আর বলে দেবে কেন?"

পিসীমা একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "বিবাহ না হলেও তোকে—"বাধা দিয়া হরিচরণ বলিল, "কেন, আমি কি? আমার কি রূপ নাই; না গুণ নাই? আমি লেখাপড়া জানি না?"

মাথা নাড়িয়া পিসীমা বলিলেন, "তা জানিস্ বৈকি, তবে তোর অবস্থা ত তেমন নয়?"

ক্রুদ্ধভাবে হরিচরণ বলিল, "অবস্থাটা এমন মন্দই বা কি? পুরুষের দশ দশা, কখনও হাতী, কখনও মশা। আজ কম্পাউণ্ডার আছি বলে তুমি কি মনে কর, আমি চিরকালই এই দশ টাকা মাইনের কম্পাউণ্ডারি করব? হরিচরণকে তো তুমি চেননা পিসীমা, আমি কি শুধু কম্পাউণ্ডারি কচ্চি, তলে তলে আমি ডাক্তারীর আগু অন্ত সব জেনে নিচ্চি। আর একটা বছর, এক বছর পরেই দেখবে, হরিচরণ এলাপাত ডাক্তার্ এইচ্ সি, চট্টোপাধ্যায় সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ডাক্তারখানা খুলে বসেছে।"

ভবিষ্যতের আশায় হরিচরণের মুখটা যেমন উজ্জল হইয়া উঠিল, পিসীমার মুখটা তেমন হইল না। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "বেশ তো, সেই দিনই হোক্, তখন তোকে বিয়ের তরে ভাবতে হবে কেন? তখন কত লোক এসে পায়ে ধরে সেধে দেবে।"

নাসা কুঞ্চিত করিয়া হরিচরণ বলিল, "সে তো আর আজই দিচ্চে না। এখন আপাতত তুমি ঐটা দেখ না। মেয়েটি দেখতেও বেশ সুশ্রী, ডাগর ডোগরও বটে।"

পিসীমা বলিলেন, "কিন্তু বাছা, ওরা যে মত করে, এমন তো মনে হয় না।"

মুখভঙ্গী করিয়া হরিচরণ বলিল, "সাধ করে কি বলি, তোমার ব্যাভার আচরণ কিছুই আপনার লোকের মত নয়। তুমি কোথায় তাদের মত করাবে, তা নয় নিজেই দিন থাকতে গেয়ে উঠলে, তারা মত করবে না।"

হরিচরণ উঠিয়া চাদর খানা কাঁধে ফেলিল, এবং চটী জুতাটা পায়ে দিয়া রাগে জোরে জোরে পা ফেলিতে ফেলিতে বাড়ীর বাহির হইল; পিসীমা ডাকিয়া বলিলেন; "চললি যে রে, তেলটা এনে দিয়ে যা।"

"আমার বেলা গেছে" বলিয়া হরিচরণ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। পিসীমা রাগে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমিও ওবেলা পিণ্ডী চটকাব ভাল করে।"

আর সকলের মত হরিচরণও একদিন পিতা ভোলানাথ তলাপত্রের গৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, এবং তাঁহার আবির্ভাবে সূতিকাগৃহ আলোকিত না হইলেও শিশুসুলভ উচ্চক্রন্দন শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার বর্ত্তমান অন্নদাত্রী পিসীমা শঙ্খনাদ দ্বারা ভ্রাতার বংশধরের শুভ আবির্ভাব পল্লী মধ্যে প্রচারিত করিতেও ছাড়েন নাই। তারপর শুক্লপক্ষের শশিকলার মত না হইলেও বয়োবৃদ্ধির সহিত হরিচরণ একটু একটু বর্দ্ধিত হইয়া মাতাপিতার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। নরহরি আচার্য্য তাহার কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, বালকের লগ্নের পঞ্চমে ক্রুর গ্রহের দৃষ্টি থাকায় উহার বিদ্যা-লাভ হইবে না, তবে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হইবে।

পিসীমা ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "তা বিদ্যে না হোক, অমনি আমার মুখ্যু সুখ্যু হয়ে বেঁচে থাক।"

তাহাই হইল। দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পাঠশালায় যাতায়াত করিয়া হরিচরণ শিশুশিক্ষা তৃতীয়ভাগের এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া লইল। তবে দ্বিতীয় নামতাটা আয়ত্ত করিবার জন্য পৃষ্ঠদেশে গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাত জনিত কালশিরা পড়িয়া গেল। কোষ্ঠির ফল মিথ্যা হইবার নহে। সুতরাং বিদ্যা বিষয়ে কিছু না হইলেও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনে হরিচরণ একজন অসামান্য পণ্ডিত হইয়া উঠিল। দুধের কড়ার সরটুকু বজায় রাখিয়া কিরূপে দুগ্ধটুকু উদরসাৎ করা যায়, এবং সেই পরিমাণ জল দিয়া লোকের সন্দেহ অতিক্রম করিতে হয়; ঘোষেদের গাছের আম, মাইতিবুড়ীর মাচার কুমড়া কিরূপে হস্তগত করিয়া গুরুমহাশয়কে উপহার দিয়া তাহার রোষ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, মাতার গুপ্তভাণ্ডে রক্ষিত পয়সাটী কি উপায়ে আত্মসাৎ করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ে হরিচরণ রীতিমত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে লাগিল।

ভোলানাথ যজমান ও স্কুলের সেক্রেটারী রামজীবন দত্তকে ধরিয়া ছেলেকে

স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। আঠার বৎসর বয়সে হরিচরণ যখন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইল, এবং বয়াধিক্যে গুম্ফ শ্মশ্রু তাহার মুখমণ্ডল অধিকার করিয়া ফেলিল, তখন জ্বরবিকারে হঠাৎ একদিন বাপের কাল হইল। অগত্যা হরিচরণ স্কুল ছাড়িয়া দিল।

আরও দুইটী ছোট ভাই ছিল। তাহাদের মধ্যে যেটী বড় ও উপবীত সে যজমানদের দরজায় ঘুরিয়া বহুকষ্টে সংসার চালাইতে লাগিল। হরিচরণ ইংরাজীনবীশ, সুতরাং সে চালকলা বাঁধার অপমান স্বীকার করিতে পারিল না। সে তেরী করিয়া, সিগারেট ফুঁকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আর মধ্যে মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে প্রহার ও মাতাকে গালি দিয়া, রাগে ভাতের হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া দরিদ্র সংসারের দুঃখ কষ্টকে আরও বাড়াইয়া তুলিত। শেষে মাতার তিরস্কারে, প্রতিবেশীদের গঞ্জনায় বিরক্ত হইয়া, আপনার উদরান্নের সংস্থান আপনি করিতে পারে কি না তাহা সকলকে দেখাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া কুড়ি বৎরর বয়সে হরিচরণ গৃহত্যাগ করিল। এবং অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে নেউকীপাড়ার হীরু ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার পদে বাহাল হইল।

হীরু ডাক্তারের তখন এমন একটী লোকের দরকার ছিল, যে কম্পাউণ্ডার-রূপে ডাক্তারখানায় বসিয়া থাকে, অথচ গাভী দুইটীর সেবা, হাটবাজার করা, ছেলে ধরা, সময়ে এক ছিলিম তামাক সাজা, এ সকল কাজই করিতে পারে। হরিচরণ তাঁহার সকল কাজ করিতে স্বীকৃত হইয়া পেটভাতার চাকরীতে নিযুক্ত হইল। তবে সে ডাক্তারবাবুকে এইটুকু স্বীকার করাইয়া লইল যে, তাহাকে কম্পাউণ্ডারী একটু একটু শিখাইতে হইবে। ..

চারি বৎসরে কুইনাইন মিকশ্চার, ফিবার মিকশ্চার, প্রস্তুত করিতে শিখিয়া এবং কতকগুলা ডাক্তারী ঔষধের নাম মুখস্থ করিয়া লইয়া হরিচরণ ডাক্তারবাবুর কাছে মাহিনার দাবী করিয়া বসিল। ডাক্তারবাবু মাহিনা দিতে স্বীকৃত হইলেন না; হরিচরণ কাজে জবাব দিল।

এই সময়ে পরেশ নূতন ডাক্তারখানা করিয়া একজন কম্পাউণ্ডার খুঁজিতে-ছিল, হরিচরণ গিয়া কর্ম্মপ্রার্থী হইল। পরেশ তাহার পরীক্ষা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিল না বটে, কিন্তু আপাতত অভিজ্ঞ কম্পাউণ্ডার পাইবারও উপায় ছিল না। এ দিকে ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীর ভিড় এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, শুধু তাহাদের নাড়ী টিপিয়া ব্যবস্থা করিতেই বেলা দশটা বাজিত;

অগত্যা পরেশ মিক্‌শ্চার ঘরে অভিজ্ঞ হরিচরণকেই রাখিয়া দিল। তাহার বেতন দশ টাকা ধার্য্য হইল। অন্যান্য ঔষধ আবশ্যক মত পরেশ নিজেই প্রস্তুত করিয়া দিত, অথবা হরিচরণকে সম্মুখে বসাইয়া প্রস্তুত করাইত। তবে পয়জন্‌ (বিষাক্ত) ঔষধের আলমারীতে তাহাকে হস্তার্পণ করিতে দিত না, সে আলমারীর চাবীটা নিজের কাছেই রাখিত।

হীরু ডাক্তারের বাড়ীতে চাকরী করিবার সময় তাঁহার বাড়ীতেই হরিচরণের খাওয়া দাওয়া চলিত। কিন্তু পরেশের বাড়ীতে সে বন্দোবস্ত ছিল না। তা ছাড়া বিলাত ফেরতের ঘরে খাইতেই হরিচরণ রাজী ছিল না। তবে খাওয়ার জন্য তাহাকে বেশী ভাবিতে হইল না। নেউকী পাড়ার গায়েই সেখপুরগ্রামে তাহার পিসীর শ্বশুরবাড়ী। শ্বশুর বাড়ীতে শ্বশুর গোষ্ঠীর কেহ ছিল না, শুধু কতকগুলা জমি জায়গা ছিল; আর সেই গুলা আগলাইয়া পিসীমা একা পড়িয়া ছিলেন। হরিচরণ গিয়া তাঁহার আশ্রয় লইল।

কিন্তু দুই চারি দিনেই হরিচরণ বুঝিতে পারিল, পিসীমা বাজে খরচের নিতান্ত বিরোধী। জমিজায়গা ও তাহার উপস্বত্বে সঞ্চিত টাকাগুলা ভোগ করিবার লোক না থাকিলেও এবং ভবিষ্যতে তাহা পাঁচভূতের ভোগ্য হইলেও পিসীমা আপাততঃ ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য তাহা খরচ করিতে নিতান্ত কাতর। অগত্যা পিসীমার সঙ্গে খোরাকীর বন্দোবস্ত হইল। অনেক দর কসাকসির পর হরিচরণ আড়াই টাকা হিসাবে খোরাকী দিতে স্বীকৃত হইল। আড়াই টাকায় দুই বেলা খোরাকী হওয়া অসম্ভব হইলেও শুধু ভাইপো বলিয়াই পিসীমা ইহাতে রাজী হইলেন। হরিচরণ দূর ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পিসীমার বাড়ীতেই আহার ও বাসের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। পিসীমা রাত্রে চোরের ভয় হইতে নিশ্চিন্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

কুসুম-রেণু।

(লেখক—শ্রীজীব কাব্যতীর্থ।)

(১)

যখন বৃদ্ধ হরিরাম চাটুয্যে অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গলাভ করিলেন তখন তার বিরাট সম্পত্তি কাহার ভোগে আসিবে ইহা দেবনগর গ্রামবাসী আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেরই চিন্তার বিষয় হইল। সকলেই জানিত—বৃদ্ধ তাহার একমাত্র দৌহিত্রকে স্বচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। এ জন্য বহুদূরে তাঁহারই জমিদারীর অন্তর্গত এক বন্যস্থানে তাহাকে গোমস্তার মত করিয়া পাঠান হইয়াছে। দৌহিত্রটীও যথার্থ অশান্ত ও উদ্ধত ছিল।

কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্ত্তন মানবের বুদ্ধির অগোচর। এই কয়েক বৎসর ভীষণ ব্যাঘ্র ভল্লুকের দেশে থাকিয়া দৌহিত্র হারাধন বেশ্ শান্ত শিষ্ট হইয়াছে। স্বভাবের উগ্রতা একেবারে নাই, মনুষ্যত্বের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চরিত্র নির্ম্মল হইয়াছে। বিলাসিতা নাই, অপব্যয় নাই; সে দুরন্ত অসন্তোষ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা একেবারেই পলাইয়াছে। মনোযোগের সহিত হিসাব নিকাশ দেখিত। প্রজাদের সহিত কর্ম্মচারী কয়জনের সহিত বেশ্ সদ্ব্যবহার করিত। আবার শরীর রক্ষার জন্য ব্যায়াম করিয়া, ধর্ম্ম রক্ষায় জন্য অনুষ্ঠান করিয়া নিজের কর্ত্তব্য পরায়ণতার পরিচয় দিত। সকালে বিকালে কোদালি দ্বারা জমি খোঁড়াই তাহার ব্যায়াম ছিল। যদি কেহ বলিত বাবু আপনি কেন জমি খুঁড়িতেছেন? আজ বুড়া মরলেই কাল আপনি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। তখন কি এ কাজ মানায়?

হারাধন তখনই উত্তর দিত—পরের সম্পত্তির আশায় থাকিয়া আমি ত আত্মহত্যা করিতে পারি না! অলস, রোগী, বিলাসী হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল। কোদাল পাড়িলে শরীরের স্বাস্থ্য ও ফসল দুইই লাভ হয়—এমন এক ঢিলে দুই পাখী মারা আমি মন্দ মনে করি না।

আর কেহ কিছু বলিত না। পরস্পর কর্ম্মচারিরা বলাবলি করিত—

হারাধন বাবু মনের দুঃখে কোদাল পাড়েন ! একে বুড়া দেখিতে পারে না—তার পর আবার এই বয়সে এখনও বিবাহের নাম গন্ধ নাই। দুঃখের আর অপরাধ কি ?

এদিকে চাটুয্যে মহাশয়ের সম্পত্তি-সমস্যাটা কেহই যখন সমাধান করিতে পারিল না, তখন সকলের বিস্ময়ের সহিত সহসা সেই দুর্দ্দান্ত দৌহিত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারিরূপে দেবনগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের লোক মৃত হরিরামকে ছিঃ ছিঃ করিতে লাগিল। নাস্তিক অপরিণামদর্শী, অর্থকীটের সম্পত্তির পরিণাম ঐরকম হওয়াই ত উচিত, এই ভাবে হরিরামের মৌখীক সপিণ্ডকরণ সম্পন্ন হইল। কিন্তু হারাধন ত আর পূর্ব্বের হারাধন নাই। সে কয়েক দিনের মধ্যেই গ্রামবাসীর সহিত বেশ মিলিতে মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে। আত্মীয়দিগের পরামর্শ পূজ্যবর্গের উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল। গ্রামবাসী বিস্মিত হইল। তখন দেবনগরে ৺ হরিরামের সুখ্যাতি দেখে কে ? লোকটার কি বুদ্ধি, কি বিবেচনাই ছিল। দেখদেখি দৌহিত্রটীকে কেমন শুধরাইয়া লইল। এখন হারাধন সত্যই হারাধন। কি বিনয়। কি চরিত্র। দুই এক জন বলিল—ওহে, ৺হরিরাম চাটুয্যে একজন ঈশ্বর জানিত লোক ছিলেন। ভিতরে ভিতরে তিনি কঠোর সাধনা করিতেন। ভারি লোকটা গেছে।

ক্রমে ক্রমে সকলেই হারাধনকে ভালবাসিতে লাগিল। হরিরাম চাটুয্যের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াও বেশ আড়ম্বরের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল।

যাহা হউক, বুড়ার শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণের ভোজ খাইয়া, দেবনগর গ্রামবাসী তৃপ্ত হইল না। হারাধনের বিবাহ ভোজ খাইবার জন্য তাহারা ব্যাকুল হইল। আত্মীয়গণ সর্ব্বদাই হারাধনকে বিবাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল।

সেদিন ঠাকুরদা সম্পর্কের এক বৃদ্ধ আসিয়া বলিলেন—ও হারু আমাদের এখন গঙ্গামুখো পা, কোন্‌দিন আছি, কোন দিন নেই, বিবাহটা শীঘ্র ক'রে ফেল। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হউক। হারাধনের এক বন্ধু রহস্য করিয়া বলিল—"ও ঠাকুর দাদা, আপনার এখনও পাঁচটা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হয় নাই ? ভাবনাকি একেবারে আমকাঠের সঙ্গে হ'বে।"

বৃদ্ধ বলিলেন—দূর শালা। এখন তোদের ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়।

আমাদের হল ভীষ্মের। আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় কেমন করে তৃপ্ত হবে জানিস্ শালা? তবে শোন—বিয়ের গান বাজনা শুনে কাণের তৃপ্তি, এই এক। সন্দেশ রসগোল্লা খেয়ে জীবের তৃপ্তি এই দুই। ফুল আতর গোলাপ জল শুঁকে নাকের তৃপ্তি, এই তিন। যখন বরযাত্রী সাজব তখন ভাল কাপড় চোপড় প'রে গায়ের তৃপ্তি এই চার। আর এই বিয়ের বাজী আলো রোসনাই দেখে চোখের তৃপ্তি, এই পাঁচ।

আর যে টুকু বাকী থাকিল সে টুকু আপনার নাতবৌয়ের মুখখানি দেখলে সম্পূর্ণ হ'বে—এই ছয়।

বৃদ্ধ বলিল—দুর শালা, ওটাও পাঁচের মধ্যে।

(২)

জমিদার হারাধনের সুখ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। অনেক আইবুড়া মেয়ের বাপ মা হারাধনকে জামাই করিবার জন্য নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। যারা দরিদ্র তারাই কেবল বামনের চাঁদ ধরার মত অত বড়লোক জামাই করিবার সাধ করিল না।

এদিকে ঘটকের উপর ঘটক আসিয়া হারাধনের বাটী গরম করিয়া তুলিল। ঘটকগণ ছড়া বাঁধিয়া গাইল—

"কি ক'ব রূপের কথা ঘটকেরই ঘোরে মাথা
সেখানে সে ভাবে মনে মনে।
সর্ব্ব কর্ম্ম পরিহরি কঠোর তপস্যা করি
পাই যদি হেন কন্যা ধনে।
ফুল ঘেরা কালকেশ যেন রাধা মথুরেশ
যমুনায় সাঁতারিয়া যায়।
তার পাশে মুখ খানি কে যেন চাঁদেরে আনি
ঢাকিতে তগারদল চায়।" ইত্যাদি

হারাধনের মাতামহী বিবাহ ব্যাপারের প্রধান কর্ত্রী। তিনি কত সম্বন্ধই শুনিলেন, কিন্তু কাহাকেও নিরাশ করিতে পারেন না। কি জানি যদি ভাল মেয়েটি ফস্কে যায়। সকলকেই বলেন—"দেখি বাবা, পরামর্শ করে কোনটী হয়।"

শ্যামপুরের নামজাদা ধনী সুরেশ বাবু হারাধনটীকে তাঁহার জামাতৃরূপে পাইবার জন্য একটু উৎসুক হইলেন। কেননা তাঁর ঘটকের মুখে একটু আশার কথা পাইলেন, অবশ্য তাহাকে কেহ তেমন কোন আশা দেয় নাই। 'ঐ দেখি বাবা পরামর্শ করে, কি হয়' এই টুকু তাহাকেও বলা হইয়াছিল, তাহাতেই সে আশান্বিত হইয়াছিল। আর তিনি যখন তাঁর নিজের অর্থ কন্যার রূপ, বিষয় সম্পত্তির কথা ভাবিলেন, তখন ঘটকের কথাটা খুব অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হইল না। মনে মনে বলিলেন—আমার ঘটককে আর তারা আশা দিবে না? বিবাহ যদি করিতে হয় ত আমার কন্যা অপেক্ষা উপযুক্ত পাত্রী আর কে আছে? অন্তঃপুরে পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন এবং দেবনগর গ্রামে তাঁহার কর্ম্মচারী নবীন বাবুকে সম্বন্ধ পাকা করিয়া আসিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শুধু ঘটকের দ্বারা কি কার্য্য হইতে পারে? বিশেষতঃ এই সব ধনবানের গৃহে।

নবীন বাবু বেশ সভ্যভব্য ভদ্রলোক। তিনি কোনপ্রকার নেশার ধার ধারেন না, মায় চা পর্য্যন্ত খান না। কোনরকম বিলাসিতা নাই, ধর্ম্মে অনুরাগ আছে শরীরটী, বেশ দৃঢ়। প্রৌঢ়ও হইলেও তিনি জ্যোতি হীন নহেন। তিনি আসিয়া হারাধন ও তাহার বন্ধুগণকে সুরেশবাবুর কন্যাটী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার আচরণ, কথাবার্ত্তায় সকলেই সন্তোষ লাভ করিলেন। শেষে কথা হইল কন্যাটী একবার দেখায় দোষ কি? এবং একবার দেখাই উচিত। হারাধন ও তাহার মাতামহী সেই কথা অনুমোদন করিলেন। আগামী শুক্রবার দুইবন্ধুর সহিত হারাধন কন্যা দেখিতে যাইবে স্থির হইল।

(৩)

হারাধন নিজের রুচি বন্ধুবর্গের সহিত ঠিক মিলিত না বলিয়া, হারাধন বন্ধুবর্গকে বিবাহাদি বিষয়ে খুব বিশ্বাস করিতে পারিত না। তাই দুই বন্ধুর সহিত সেও শ্যামপুরে সুরেশবাবুর বাটি ক'নে দেখিতে আসিয়াছে। বন্ধু দুইটীর মধ্যে একটী বিবাহিত ও অপরটী অবিবাহিত। বিবাহিতটী একটু প্রবীণ, অবিবাহিতটী বেশ একটী টুকটুকে বি, এ পাশ করা নব্য যুবক। এই উভয় বন্ধুর সহিত হারাধন অন্তঃপুরের একটী অংশে ক'নে দেখিতে গেলেন। পথ প্রদর্শক স্বয়ং সুরেশবাবু।

উহারা আসিয়া দেখিল—যেন একখানি প্রতিমা সাজান হইয়াছে। চেয়া-রের উপর বসিয়া সুরেশ বাবুর কন্যা যেরূপ লাবণ্য ফুটাইতেছিল, তাহা অনির্ব্বচনীয়। হারাধন একবার দেখিয়াই দৃষ্টি আনত করিল আর অবি-বাহিত বন্ধুটী অনিমেষনয়নে সেই রূপ-সুধা পান করিতে লাগিল। হারাধন যে দৃষ্টি নামাইয়া লইল, তাহার কারণ শুধু সৌন্দর্য্যের আধিক্য নহে—তাহার নিকট একটী বড় বিষদৃশ লাগিল। সুরেশ-দুহিতার প্রতি অঙ্গ যৌবনের ভাব-তরঙ্গে উচ্ছলিত, ভোগবিলাসে সমৃদ্ধ, এ সময়ে কুমারীর বেশ, বালিকার বেশ তাহার তৃপ্তিদায়ক হইল না, তাই সে চক্ষু ফিরাইয়া লইল। পিতার ইঙ্গিতে কন্যা উঠিয়া একজনকে প্রণাম করিল। যাহাকে প্রণাম করিল—সে সেই অবিবাহিত বন্ধুটী। হারাধনের বিলাস-হীন বেশভূষায় বোধ হয় কুমারী তাহার মাথা নত করিতে পারিল না। পিতার বারংবার কঠোর ইঙ্গিত সত্ত্বেও কন্যা আর কাহাকেও প্রণাম করিল না।

পিতা একটু অপ্রস্তুত হইলেন। তখনই প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—"মা আমার বড় লাজুক কিনা। বার বার উঠিতে বসিতে লজ্জা করেন। আচ্ছা মা আচ্ছা, ঐ হ'য়েছে ঐ হ'য়েছে।

হারাধনের একটু কেমন যেন বোধ হইল।

তখন বিবাহিত বন্ধুটী জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম কি?"

কন্যা বলিল—"শ্রীমতী কুসুমসুষমা দেবী।"

"কতদূর পড়া হ'য়েছে?"

আমি এবার ইচ্ছা করিলে এণ্ট্রান্স একজামিনেশনে এপিয়ার (appear) হইতে পারিতাম।

"আচ্ছা বেশ; তোমার হাতের লেখা দেখব।"

কুসুম ডাকিল—রেণু, আমার দোয়াত কলম খাতাখানা আন ত?

রেণু একটী অপরিচিতা বালিকা, পাশের ঘরে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া-ছিল। অতি মৃদুস্বরে 'দিদি আন্‌ছি' বলিয়া অল্পক্ষণ পরেই দোয়াত কলম ও একখানি খাতা আনিয়া অতি ধীরে কুসুমের পাশের টেবিলে রাখিয়া দিয়া আবার ধীরপদে এবং সলজ্জভাবে নিম্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার পূর্ব্ব স্থানে গিয়া দাঁড়াইল। রেণুকে দশবৎসরের বালিকা বলিয়া বোধ হইল।

কুসুম খাতা খুলিয়াই রাগের সহিত বেশ চড়া গলায় বলিল—"রেণু, তোকে যা ভেঙ্গে না বলব, তুই সেটাতেই গোলমাল করবি? stupid, ভাল

করে লেখা পড়া না শিখলে চাষার চেয়ে অধম হয়ে যেতে হয়। দেখি—কি খাতা এনেছিস্। আমার মোটা Exercise bookটা আন্‌বার বুদ্ধি যোগাল না। এখাতায় কি লেখা যায়? এই বলিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে সে তাহার খাতা আনিতে গৃহান্তরে প্রস্থান করিল। রেণু ভয়ে জড়সড় হইয়া আরও সরিয়া গেল।

কুসুমের কণ্ঠস্বরে ও পাদক্ষেপে এমনই একটা দম্ভ ও নির্লজ্জতা প্রকাশ পাইল যে তাহাতে সকলেই যেন অসন্তুষ্ট হইলেন।

সুরেশ বাবু বলিলেন—"মা আমার বড় আদরের মেয়ে কিনা! আর বড় ছোট এখনও তেমন লজ্জা করিতে শিখে নাই। তবে এদিকে বেশ শান্ত শিষ্ট। এর আচরণে সন্তুষ্টই হইবেন সন্দেহ নাই। বড় মোলায়েম প্রকৃতি। তিনি পূর্ব্বে যে, কন্যার লজ্জাশীলতার কথা বলিয়া ছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইলেন।

সুরেশ বাবুর এই কথায় কেহই আপ্যায়িত হইল না। হাতের লেখা দেখিয়া সকলেই প্রীতি প্রকাশ করিলেন। সুরেশ বাবু নিশ্চিন্ত হইলেন।

ইতি পূর্ব্বেই পাড়ার দু'চারজন ভদ্রলোক সুরেশ বাবুর বৈঠকখানায় আসিয়াছিলেন—তাঁহাদের উদ্দেশ্য, জামাইটীকে দেখেন এবং সুরেশ বাবুকে আপ্যায়িত করেন। বৈঠকখানায় নবীন বাবু ও বাটীর অন্যান্য দু'চার জন কর্ম্মচারীও সমবেত হইয়াছেন, এমন সময়ে বন্ধুদ্বয়ের সহিত হারাধন সেখানে আসিলেন। সুরেশ বাবুও অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন।

১ম ভদ্রলোক বলিলেন—সুরেশ বাবু! আপনার জামাতাটী বড় শান্ত শিষ্ট দেখিতেছি।

সুরেশ বাবু বলিলেন—শান্ত শিষ্ট? বড় উদার, বড় উচ্চ হৃদয়! নবীনচন্দ্র ওঁদের সেদিন কত সুখ্যাতি করলে।

২য় ভদ্রলোক বলিলেন—তা আর হ'বে না। বলে কার জামাই হচ্চেন। কথাই আছে "নরাণাং মাতুলক্রমঃ।"

কেহ কেহ একটু হাসিলেন।

১ম ভদ্রলোকটী বলিলেন—হারাধন বাবু, আপনি কোন্ কালে এম, এ পাশ করেন?

হারাধন। আমি কোন পাশ করি নাই। ঘরে বসিয়া একটু ইংরাজী ও অল্প সংস্কৃত শিখিয়াছি।

১ম ভদ্রলোক। ওঃ! সংস্কৃত ঘরে বসিয়া পড়িয়াছেন, একদিনও স্কুলে গেলেন না? আশ্চর্য্য ত'! সুরেশ বাবু, আপনার জামাইটী রত্ন! রত্ন!

৩য় ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি ত চন্দননগরেই থাকিতেন?

হারাধন। আজ্ঞে না।

৩য় ভদ্রলোক। পল্লীগ্রামে থাকা আপনাদের কি পোষায়? কলিকাতায় নিশ্চিতই থাকিতেন?

হারাধন। আজ্ঞে না। আমি বাঁকুড়াজেলার এক বন্যস্থানে থাকিতাম। বোধ হয় সেখানে হাওয়া খেতে গিয়েছিলেন। বড় লোকের সখই এক আলাদা।

হারাধন। আজ্ঞে না। আমার মাতামহের জমি জারাত দেখ্‌তাম। আর নিজে যতটুকু পার্‌তাম জমি খুঁড়ে চাষ আবাদ কর্‌তাম।

সুরেশ বাবু, আপনার জামাতাটী বড় গুণের ছেলে। নিজ হাতে চাষ—কি আশ্চর্য্য! কি মহত্ত্ব! এই নইলে লক্ষ্মীর দৃষ্টি হয়?

৪র্থ ভদ্রলোকটী বলিলেন—আপনার মাতামহ আপনাকে বড় ভাল বাস্‌তেন—আহা! তিনি যদি আজ বেঁচে থাক্‌তেন! সুরেশ বাবুর কন্যাকে নাত বউ দেখে গেলে বড় আনন্দে দেহত্যাগ কর্‌তেন।

হারাধন। আজ্ঞে না, আমাকে তিনি তেমন ভাল বাসিতেন না। কারণ আমি প্রথমে বড় দুর্দ্দান্ত ছিলাম। সেই জন্যইত আমাকে ঐ দেশে পাঠিয়ে ছিলেন।

হ্যাঁ তা হ'লেই হ'ল—বলি সম্পত্তির অধিকারী ত আপনাকেই ক'রে-ছেন—কি বল রাজেন্দ্র?

হ্যাঁ তা বৈকি, ভালবাসাত ঐখানেই বুঝা যায়। আরও এই প্রকার বহু কথাবার্ত্তার পর বিবাহের দিন স্থির করিবার প্রস্তাব হইল।

হারাধনের মাতামহীর মত না লইয়া কিছুই স্থির হইবে না। এই জন্য তিনদিন পরে পত্র দিবার অঙ্গীকারে হারাধন বন্ধুদ্বয়ের সহিত বিদায় লই-লেন। সুরেশ বাবু নবীনচন্দ্রকে সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। নবীনচন্দ্র অল্পদূর গিয়াই বলিলেন—আমি হয়ত আপনাদের বাটী পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইতাম, কিন্তু এক্ষণে আমাকে ফিরিতে হইল। আমার এক নির্ব্বোধ মেয়ে আছে। আজ কুসুমের কাছে বুঝি নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য একটু ভর্ৎসনা খাইয়াছে, তাই

নাকি বড় কাঁদছে। একে নির্ব্বোধ তায় বালিকা, তাকে আবার আমার বাটী না রাখিয়া আসিলে বাবুদের বড় বিরক্ত করিবে। আপনাদের কথা-বার্ত্তা শেষ না হওয়ায় এতক্ষণ কোথায়ও যাইতে পারি নাই।

হারাধন বলিল—ওঃ আপনার কন্যার নাম কি রেণু?

আমরা যাকে আপনাদের কনের কাছে দেখিলাম?

হাঁ, সেই আমার মেয়ে।

তবে যান। তাকে কাঁদাবেন না।

নবীনচন্দ্র চলিয়া যাইলে—অবিবাহিত যুবকটী হারাধনের দিকে চাহিয়া হাস্য করিলেন। হারাধন জিজ্ঞাসা করিল—কিহে হাসিলে যে?

না—কিছু না—তুমি ভারি দয়ালু—না না কিছু না।

(৪)

তিনদিন পরে এক পত্র আসিল। তাহাতে বিবাহের কোন কথাই নাই। কেবল নবীন বাবুকে পাঠাইলে, তাহার মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইতে পারিবেন, এই মাত্র লেখা ছিল। নবীনচন্দ্রকে সেই দিনই পাঠান হইল।

কৃয়া ডাকিয়া সুরেশ-গৃহিণী কন্যার অলঙ্কারের বায়না দিলেন।

হারাধনের চির দিনের আশা, অন্তরের কল্পনা—প্রথমতঃ সে লজ্জাশীলা স্ত্রীর স্বামী হয়, দ্বিতীয়তঃ বালিকা বিবাহ করে, কারণ স্ত্রীলোকেরা যৌবন প্রাপ্ত হইলেই, তাদের হৃদয় একপ্রকার গঠিত হইয়া যায়, তখন আর তাহা-দিগকে স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী সহধর্ম্মিণী গড়িতে পারা যায় না। বালিকার মন যেমন ইচ্ছা গঠিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে. যদি তেমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায়। তাই হারাধন কুসুমের পাণিগ্রহণে অনিচ্ছুক, বিশেষতঃ তাহার ব্যবহার হারাধনের ভাল লাগে নাই।

মাতামহী সব শুনিলেন—তিনি তখনই সুরেশ দুহিতার বিবাহে বিশেষ অমত প্রকাশ করিলেন।

নবীন বাবু ফিরিয়া গিয়া সুরেশবাবুকে যেমন এই সংবাদ দিলেন—তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—কি আমার কন্যা নির্লজ্জা, গর্ব্বিতা?—বলিতে বলিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীর অনুরোধ এখনই চুপ করুন। চীৎকার করিয়া কোন লাভ নাই, শুধু মেয়ের কলঙ্ক রটান। যাতে সত্বর বিবাহ হইয়া যায় তার জন্য অন্য পাত্র স্থির

করুন, বিবাহের পর যত ইচ্ছা বা যা ইচ্ছা গালি দিবেন। এখন টাকা না খুঁজিয়া বিদ্যার অন্বেষণ করুন, তা হ'লেও অনেকটা মানরক্ষা হইবে।

কন্যার একটু মত জানিতে পারিয়া—সুরেশ-গৃহিণী হারাধনের সেই বন্ধু-টীর সন্ধান করিতে উপদেশ দিলেন। স্বামী বলিলেন—হাঁ ঠিক বলিয়াছ—তা' হ'লেই অপমানের চূড়ান্ত হইবে।

হারাধনের সেই অবিবাহিত বন্ধুটী কখনও এ বিবাহ তাহার ভাগ্যে যে ঘটিবে তাহা কল্পনায়ও আনে নাই। সে নিরাশ প্রেমিকের মত হয় ত' প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিল, সুরেশচন্দ্রের কন্যা না পাইলে জীবনে সে বিবাহ করিবে না। কেন না মধ্যে সে চন্দ্রশেখরের প্রতাপচরিত্রের মস্ত একটা সমালোচনা লিখিয়াছিল।

যাহা হউক, সে প্রথম শুভদিনেই কুসুমকে পত্নীরূপে পাইল। এবং সানন্দচিত্তে ঘরজামাই হইতে স্বীকৃত হইল। সুরেশচন্দ্র তখন পাড়ার লোক-দের বলিলেন—ওহে—তোমাদের ত এতদিন বলি নাই; ঐ হারাধন না—কি ঐ-যে, যে মেয়ে দেখ্‌তে এসেছিল, তাকে আমার মেয়ে একেবারে পছন্দ ক'রে নি। অথচ এই আমার জামাই নগেন—তার বন্ধু হ'য়ে এসেছিল, একে দেখেই আমার মেয়ে আপনি প্রণাম করূলে। তার পর ধনুকভাঙ্গা পণ—নগেন ভিন্ন আর কা'কেও সে বিয়ে করূবে না। কি Romance! এসব পূর্ব্বজন্মের ব্যাপার কিনা!

"বলেন কি ম'শায়? এ যে জাতিস্মরা"

"আমার স্ত্রী বল্লেন যে—এমন সরস্বতী মেয়ে ঐ আকাট মুর্খের হাতে পড়্‌বে? তারপর নগেনের সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা হ'লে তাতে কেউ না কি বলে-ছিল যে, নগেন বড় বাবু আর ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার খনি। তাতে আমার স্ত্রী বল্লেন যে—ওটা বিএ, এম, এ পাশ করলেই হয়। ওটা সুলক্ষণ।

হাঁ তা তিনি ঠিক্ ব'লেছেন। এই বলিয়া পাড়ার ভদ্রলোকগণ, যতীন্দ্র-মোহনঠাকুর প্রভৃতির গল্প বলিল। গুরুদাস বাবুর ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার উদাহরণ দিল। আর বলিল—আমরা ত' সেদিন ব'লেছিলাম যে, সে বেটা একটা চাষা নইলে নিজে মাটী খুঁড়ে চাষ দেয়, আবার বল্‌তে একটু লজ্জাও করূলে না। বেটা নির্লজ্জও খুব।

সানন্দে সুরেশ বাবু বলিলেন—দেখুন ও বিবাহটা হ'লে লোকে একেবারে ছিঃ ছিঃ করূত আর ব'লত বানরের গলায় মুক্তার মালা।

হাঁ হাঁ ঠিক্ ব'লেছেন। আহা! এ যেন সোণার সোহাগা।

(৫)

নবীন বাবু যাহা কল্পনা করেন নাই—চিন্তার পথে আনেন নাই—তাহাই ঘটিল। জমিদার হারাধন—দরিদ্র কন্যা রেণুর পাণিগ্রহণ করিল।

রূপগর্ব্বিতা নির্লজ্জা বিলাসিনী যুবতী অপেক্ষা হারাধন—লজ্জাশীলা কোমলস্বভাবা নির্ধনগৃহের বালিকার মধুরতা অনুভব করিল। এই টুকুই রুচির প্রভেদ। সেই রুচির জন্যই ইচ্ছা করিয়া এই অযোগ্য মিলন মাথায় পাতিয়া লইল। সকলে বিস্মিত হইল।

সুরেশচন্দ্র এ সংবাদ পাইতে না পাইতে নবীনচন্দ্রকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। বৈঠকখানায় তিনি একদিন সকলকে বলিলেন—ও রকম চাষাভূষোলোকের ঐ নব্নে পব্নের মত হাবা বোবা মেয়ে ছাড়া আর কি জুটবে বলত'? ও মেয়েটা তবু আমার মেয়ের কাছ থেকে একটু আধটু শিক্ষা পেয়েছে তাই মনুষ্যসমাজে আছে, নইলে এতদিন গাছের ডালে ডালে বেড়াত? যেমন কাটগোঁয়ার চাষা, ক অক্ষর গোমাংস—তেমনই জুটেছে। ব'লে উনুনমুখো দেবতা; তার ছাইএর নৈবেদ্য।

অন্য সকলে বলিল—"তার আর সন্দেহ কি? নইলে কুসুম ছেড়ে রেণুতে গড়াগড়ি? হা! হা! হা!

জনরব—সুরেশ বাবুর গৃহ হইতে জগতের জীবনদায়িনী হাস্যদেবতা এই দিন হইতেই নাকি হারাধনের গৃহে চির-নির্ব্বাসিতা হইয়াছিল। অন্তঃপুরে, সুরেশবাবুর বড় আদরের কন্যা—স্বামীর সহিত কলহমদিরায় বিভোর হইয়া হাস্যদেবতার অর্চ্চনা করিতে পারিল না। গৃহের অন্যান্য পরিজনও সাহস করিয়া সে দেবতার আবাহন করিতে পারিল না। অচিরেই সুরেশের সুখের অট্টালিকা বিষাদ-রাক্ষসের লীলাস্থল হইল।

কে বলিবে—এ কঠোর পরিণামের জন্য কে দায়ী? অদৃষ্ট—না শিক্ষা?

একাল সেকাল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(৬৩)

অনেকক্ষণ আকাশের গায়ে তারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণা বাতাস সারা গায়ে মধ্যরাত্রির শিশির মাখিয়া মন্দগতিতে চলিতেছিল। প্রাসাদের গায়ে গায়ে শ্বেত জ্যোৎস্না লোটাইয়া পড়িতেছে। নির্ম্মল গবাক্ষপথে দৃষ্টি করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল, শুভ্র জ্যোৎস্না যেন তাহারই জন্য অগ্নিকণা বহিয়া আনিতেছিল। শুষ্ককণ্ঠে অস্ফুট স্বরেই বলিল—"বিমল! এমন করেই নাকি জীবনটাকে আমার বিফল করে দিতে হয়, তবুত স্মৃতি পুছে ফেল্‌তে পাচ্ছি না, তোমার যদি বিন্দুমাত্র শক্তিও থাকৃত, আমায় ধরে রাখ্‌বার, তবেত আজ আমার এমন দশা হত না।" কথার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের কড়া নড়িয়া উঠিল, এত রাত্রি কাহারও আগমন আশঙ্কায় নির্ম্মল শয্যায় পড়িয়া হাপাইতেছিল, বেহারা সেলাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই কাতর স্বরে বলিল—"কেন বারণ করে দিতে পারিস্‌নি, এত রাত্তিরে অসুখ নিয়ে আমি কারুর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে পারিনা।"

"অপরাধ ওর মোটেও নেই" বলিতে বলিতে পলিতকেশ বৃদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিলেন, নমস্কার করিয়া বলিলেন "যত অপরাধ এই বুড়র, সন্তানের মমতা, এ অসময়েও আপনাকে কষ্ট দিতে—"

বৃদ্ধের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজসজ্জা, শান্ত সৌম্যমূর্ত্তির কাতরতা, নির্ম্মলের মন সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সম্ভ্রমসহকারে নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মধ্যপথেই জিজ্ঞাসা করিল—"বলুন কি প্রয়োজন আপনার?"

"মেয়েটি আমার বড্ড কষ্ট পাচ্ছে, দয়া করে…"

নির্ম্মল আবারও বাধা দিল, বলিল—"অত করে কেন বল্‌তে হবে, কাজত আমাদের এই।"

বৃদ্ধ সঙ্কুচিত স্বরেই বলিলেন—"এই নিকটেই, ভাবলুম, এত রাত্তিরে আর কাকে খুঁজ্‌তে যাই, আপনি কাছটিতে রয়েছেন।"

ক্ষিপ্রহস্তে জানালা হইতে একটা সার্ট টানিয়া পড়িয়া লইয়া "চলুন। বলিয়া নির্ম্মল বৃদ্ধের অনুগমন করিল। চলিতে চলিতে রোগের বিবরণ জানিয়া লইবে এ ইচ্ছা লইয়াই সে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু বৃদ্ধের ব্যস্ততায় আর তাহা ঘটিয়া উঠিল না, একেবারে রোগীর শয্যার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া সে বিস্মিত হইয়া পড়িল। সুপরিষ্কৃত ধব্‌ধবে শয্যার উপর ষোড়শী রমণী উৎসুকনেত্রে পথপানে চাহিয়া যেন কাহারও অপেক্ষা করিতেছিল, রমণীর নিটোল শরীরে যে কোন দিন রোগ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া এমন অনুমান করাও নির্ম্মলের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। গবাক্ষ-সংলগ্ন উদ্যানের সুবাসিত বায়ু রমণীর সরুপেড়ে কাপড়ের এক কোণ লইয়া নাড়িয়া দিতেছে, এ পাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘরখানা নিপুণহস্তে সজ্জিত, মার্জ্জিত মেঝে দীপের আলোতে ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। পাশের ল্যাম্পটায় তেলের আলো স্নিগ্ধ শিখা বিতরণ করিতেছে, একটা নীরব শান্তি যেন এই নবাগত অতিথির আতিথ্যের জন্য বাড়ীখানা ঘেরিয়া রহিয়াছে! মুহূর্ত্তে নির্ম্মলের তপ্তপ্রাণ শীতল হইয়া উঠিল, তরুণীর দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিতেই সে কেমন একরকমের লজ্জা পাইয়া ক্ষীণ হাস্যের সহিত মস্তক নত করিল। রমণী পিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল—"বাবা, এলে, এই রাত্তিরে তোমার জন্য ভেবেই যে বেদনা আমার বড্ড বেড়ে যাচ্ছিল।"

বৃদ্ধ কন্যার কথায় কাণ না দিয়া নির্ম্মলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এই একটি মেয়ে আমার, সকাল থেকেই মাথার বেদনায় ছট্‌ফট্‌ কচ্ছিল, ঘণ্টা-খানি হয়, ওরই চীৎকারে আর তিষ্ঠাতে না পেরে আপনায় ডাক্‌তে গেলুম।"

রমণীর রমণীয় মুখে হাসির মধুর রেখা দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল। শান্ত পরিষ্কৃতস্বরে বলিল—"তেমন কিছু নয় ডাক্তারবাবু, কথায় বলেনা, স্নেহ অনিষ্টের আশঙ্কা করে, এও সেই, বিশেষ করে বাবা আমার, তার মেয়েটির একটু কিছু দেখ্‌লেই হাঁপিয়ে ওঠেন, আমার যেন আর পান থেকে চুণ খস্‌তে নেই।"

"অমন ক'রে রোগ গোপন কর না নীলিমা?" বলিয়া বৃদ্ধ পাশের চেয়ারটা টানিয়া আনিয়া তাহাতে বসিয়া পড়িলেন।

নীলিমা বলিল—"তা রোগত, মাথা ধরা, অষুধ দিতেও কোন কসুর হচ্ছে না, এখন ত ওডিকোলন দিয়ে একটু আছিও ভাল।"

নির্ম্মলের সাড়া ছিল না, কে যেন তাহার নয়ন ও মনের গোড়ায় পৃথিবীর

সেরা রত্ন আনিয়া হাজির করিয়া দিয়াছে। সে যেন এতক্ষণ একমনে কড়িকাঠ গণিতেছিল, না ছিল তাহার বাহ্য অভিব্যক্তি, না ছিল আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া, এইবার রোগের পরিচয় শেষ হইতেই চমক ভাঙ্গিল, নীলিমার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া সে আর তাহা ঘুরাইয়া লইতে পারিল না। জড়িত স্বরে বলিল—"রাতও ত তিনটা বেজে গেছে। আর ঘণ্টা দু'তিন বই ত নয়। এখনকার মত ওডিকোলন দিয়েই দেখুন, দরকার হয়ত সকালে দেখে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন করে দেব।"

"সেই ভাল।" বলিয়া নীলিমা থামিতেই বৃদ্ধ ব্যস্তভাবে বলিল—"একবার নাড়ীটা!"

নির্ম্মলের রোগপরীক্ষার মত শক্তি ছিল কি না জানি না, তখনকার মত কিন্তু তাহাকে উত্তর করিতে হইল—"নাড়ী আর কি দেখ্‌ব, মাথা বেদনা বৈত নয়।"

"বাবার আমার ঐ রকম ব্যস্ততা।" বলিয়া নীলিমা ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উঠিল। সে হাসি নির্ম্মলের বুকের উপর মৃদু টিপ দিয়া তাহাকে দ্বিগুণ অশান্তির মধ্যে টানিয়া আনিল। বৃদ্ধ ব্যগ্র কণ্ঠেই বলিলেন—"না না ডাক্তার বাবু, আপনি ওর কথা মোটেও—"

নির্ম্মল বিনয়ের সহিত উত্তর করিল—"কেন লজ্জা দিচ্ছেন। অত ব্যস্তই কেন হচ্ছেন। বলেছি ত, রোগী দেখাই আমাদের কাজ।"

"রাত ত শেষ হয়ে এল, কষ্ট আপনাকে যতটা দিয়েছি, তাই যথেষ্ট, আর কেন?" বলিয়া নীলিমা ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাইল।

নির্ম্মল উত্তর করিল—"কিন্তু এতে ত কষ্ট মনে করবার যোটি আমাদের নেই। সে কথা যাক; এখন নয় আসি।"

বলিতে গিয়া নির্ম্মলের মনটা যেন ছাৎ করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে এই বাড়ীখানার প্রতি তাহার এমনই একটা মমতা জন্মিয়াছিল, যাহার মাদকতায় ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়াই বুক কাঁপিতে লাগিল। বৃদ্ধ ব্যস্তভাবেই বলিলেন—"ষ্টেথিসকোপটা, বুকটা।"

"থাম কি যে বকৃছ।" বলিয়া বাধা দিয়া নীলিমা শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নির্ম্মলের প্রতি তাকাইয়া বলিল—"তাই আসুন, দেখবেন সকালে আসতে যেন ভুল হয় না, নমস্কার।"

বৃদ্ধ বুকপকেট হইতে একখানা নোট বাহির করিয়া নির্ম্মলের হাতে দিতে

যাইতেই সে দুইপা পিছাইয়া গেল। কাতর কণ্ঠে বলিল—"ভিজিট আমায় দিতে হবে না, এ সামান্য রোগ, আর কষ্টও ত কিছু হয় নি!"

বৃদ্ধ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন, মস্ত একটা খট্‌কা যেন তাঁহাকে আঘাত করিতেছিল। দীন নয়নে কন্যার প্রতি দৃষ্টি করিতেই নীলিমা বলিল—"ঐটি আপনি করবেন না। টাকাটা না নিলে বাবার মনে একটা খট্‌কাই থেকে যাবে। তিনি হয়ত মনে করবেন, মেয়ের তাঁর কি শক্ত ব্যামোই হয়েছে।" বলিয়া পিতার হাতের নোটখানা টানিয়া আনিয়া নির্ম্মলের হাতে গুঁজিয়া দিল। নির্ম্মল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ধীরপদক্ষেপে সিঁড়ির দিকে যাইতে যাইতে বুক কাঁপাইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

(৩৪)

বাড়ীতে পা বাড়াইয়াই দেখিল, পূর্ব্ব দিক্ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে, শিশুর মত সরল হাসি লইয়া প্রকৃতি যেন প্রভাতকে বরণ করিয়া লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। শীতল বাতাসে নির্ম্মলের সারাশরীর পুলকিত হইল, উদ্বিগ্ন মনে শয্যায় আশ্রয় তাহার কেমন কেমন ঠেকিতেছিল, ঝুলবারাণ্ডায় ইজিচেয়ারে অবশশিথিল দেহভার রক্ষা করিয়া সে প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায়, জীবনযুদ্ধে হাড়গুদ্ধ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এতক্ষণ পরে তাহার অশান্ত চক্ষু শ্রান্ত হইয়া আসিল। নির্ম্মল ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাত রৌদ্রের প্রথম কিরণপাতে সতীশ ডাকিল—"নির্ম্মলবাবু!"

দুই হাতে চোখ রগ্‌ড়াইতে আরম্ভ করিয়া বিস্মিত নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি, এমন সকালে?"

ধীরে ধীরে সতীশ উত্তর করিল—"আপনি হয়ত এতে বড় বিস্মিত হচ্ছেন, কিন্তু আমার পক্ষে যে সকাল-সন্ধ্যে সবই সমান। জানেন ত ঘুরে বেড়ান আমার একটা কেমন বদ অভ্যেস, খেয়াল হল, মনে কল্লুম, কালকে আপনাকে ঠিক ঐ ভাবে বিদেয় দিয়ে খোঁজটিও করিনি, কাজটা তত ভাল হয় নি, তাই এই পথেই বেরিয়ে পড়েছি।"

"বসুন, হাত মুখ ধুয়ে আস্‌ছি।" বলিয়া নির্ম্মল বাহির হইতেছিল। বাধা দিয়া সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"কোন জরুরি কাজ আছে কি? নৈলে কোন দিন ত আটটার আগে আপনাকে ঘুম থেকে উঠতে দেখিনি।"

"একটা কেশ।" বলিতে বলিতে নির্ম্মল কেমন হইয়া পড়িল। সতীশ সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"এরি মধ্যে কেশ! দুদিন নয় ত শরীরটাকে সেরেই নিন না?"

নির্ম্মল জবাব না করিয়া হাতমুখ ধুইবার অছিলায় বাহির হইয়া গেল। নীলিমার বাড়ী হইতে আসিয়া অবধি ঠিক এই সময়টির জন্যই সে আশা কশিয়া রাখিয়াছিল, এমন সময়ে সতীশের এই ঘনিষ্ঠতা তাহার বিষের মত মনে হইল, কিন্তু হাতমুখ ধুইয়া ঘরে ঢুকিয়া যখন দেখিল, সতীশের উঠিবার মত কোন আয়োজনই নাই, বেয়ারাও চা আনিয়া হাজির করিয়াছে, অগত্যা তাহাকে বসিতেই হইল। শিষ্টাচারের খাতিরে সতীশের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল—"তা হলে চা—"

সতীশ মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল—"ঐটি আমায় মাপ কর্ত্তে হবে, চা ত আমি খাই না।"

নির্ম্মলের মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল, একটু কড়া স্বরেই বলিল—"কদ্দিন ত্যাগ কর্লেন?"

"গ্রহণই কোন দিন করিনি, তা ত্যাগই আবার কেন কর্ত্তে হবে।"

"তেমন পরিচয় ত আপনার বাড়াতে একদিনও পাই নি।"

"হাতে হাতে ধরে দেবার মত সুবিধাও হয়ত কোন দিন জোটে নি।"

"না" বলিয়া নির্ম্মল থামিল। সতীশ হাসিয়াই বলিল—"তা বলে আপনি কেন কুণ্ঠিত হচ্ছেন, হয়ত আমারই কেমন একটা বদ ধারণা, যে বাঙ্গালীর ঘরে এ সকল সংক্রামক ব্যাধির স্থান, না হলেই হয় ভাল।"

"কিন্তু আপনিও এথেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এমন কথা বল্লে, সেটে খাটি সত্যি হবে, এমনও ত আমি স্বীকার কর্ত্তে পারি না।"

"খাটি সত্যি কেন, সেটে আগাগোড়া মিথ্যেই বলা হবে, সে আমি মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকার কচ্ছি।" শোভার জন্যে মতের বিরুদ্ধেও আমাকে অনেক কাজ কর্ত্তে হয়েছে। জানেন ত তার মনে কষ্ট দিতে আমি সম্পূর্ণ ই অপারগ ছিলাম।"

উত্তর করিয়া কথা বাড়াইবার মত মনের অবস্থা নির্ম্মলের ছিল না, আপন মনে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বেয়ারাকে ডাকিয়া বলিল—"জামা কাপড়গুলো দিয়ে যাত।"

সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"তা হলে এখন যাই, ভেবেছিলাম, কটা

কথা আপনাকে বল্‌ব, তা এখুনি বেরুতে হচ্ছে, বাজে কথায় সময় নষ্ট করাটা সঙ্গতও হবে না, আপনিও কিছু বরদাস্ত কর্ত্তে পারবেন না, কি বলেন ?”

নির্ম্মল এবারও জবাব করিল না, সতীশ বাহিরের দিকে পা বাড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিল—“আমাকে বন্ধু বলে মনে কর্‌বেন, এত আশাও আমি করিনা, আমার কথা ভাল লাগবে সেও কিছু সম্ভব নয়, তবু কি জানেন, দুদিনের পরিচয় হলেও বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে, একাটি আপনার কল্‌কাতা বাস সঙ্গতই হচ্ছে না, আমরা এখানে থেকে থেকে পাকা হয়ে উঠেছি, তাতেই জানি, লোভকে আস্কারা দিলে কল্‌কাতা সহরে পদেপদেই ঠক্‌তে হয়, তাতে না থাকে সুখ সুবিধা, না থাকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান।”

এই অযাচিত উপদেশের সঙ্গে যে শ্লেষটা জড়িত ছিল, অন্য সময় হইলে নির্ম্মল তাহা কোন প্রকারেই হজম করিতে পারিত না, এখন এই আপদ বিদায় করিতে পারিলেই হয়, মনে করিয়া মনের আগুন মনেই চাপা দিয়া রাখিল। হ্যাট কোট পড়িয়া সে অন্য মনস্কের মত বাহিরের দিকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া শ্লেষের সহিতই বলিল—“সময় এখন আমার বড়ই কম, উপদেশ যা দেবার থাকে সময়ান্তরে যদি আসেন ত আপনিও আপনার মনের কথা বলে হাল্কা হবেন, পারি ত আমিও তা হজম কর্ত্তে কসুর কর্‌ব না।”

ইহার পর আর কথা চলে না। সতীশ আবারও দুইপা বাড়াইয়া বলিল—“রাগই করেন, আর গালই দেন, এই ত আপনার শরীর যেন আধখান্না হয়ে গেছে, হাট্‌তে গিয়ে রাস্তায় যাকে পড়ে যেতে হয়, তার রোগীর বাড়ী ঘোড়া সেও যে এক বিড়ম্বনা, আর অভাবও আপনার হাতগড়া, নৈলে কাজই কি ছিল, এত তাড়াহুড়র।”

নির্ম্মল দ্বিরুক্তি না করিয়া বিকৃত মুখে বাহির হইয়া গেল। সতীশ আপন মনেই বকিতে লাগিল—“বরাত মন্দ হলে হয়ত বাড়ীর ভাত ফেলেও পরের দোড়ে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, নৈলে যে নির্ম্মলবাবুকে দশবার ডেকে রোগীর বাড়ীতে পাওয়া যায় নি, তারই কেন এ পরিবর্ত্তন, এ যে শিকারী বেরাল, শীকার দেখলে লোভ সাম্‌লিয়ে থাক্‌বে, এমন ধৈর্য্যও ওদের নেই।” বলিতে বলিতে সেও পথে বাহির হইয়া পড়িল। পাশের পথের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল—“এবার জুটেছে ঠিক, এদের না আছে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান, না

আছে, বিবেক, টোপে যখন একবার গাথ্‌তে পেরেছে, তখন আর ছাড়িয়ে পালাবার জোটি নেই, এখন খেলিয়ে তুলিতে যা সময়টুকু লাগে। তাই ত ভাবছিলাম, ডাক্তার বাবুর আমাদের এত কর্ত্তব্য কার্য্যে মন পড়ে গেল কেন!" বলিতে বলিতে অন্য দিকে মুখ করিয়া সে গন্তব্য পথেই চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

দেবী ডাকু।

(লেখক—শ্রীযোগিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।)

যখন বিমলেন্দু বাবুর কন্যা নিভাননী—ওরফে নিভা—যোগেশ বাবুর বাড়ী হইতে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা। একে অন্ধকার রাত্রি তাহার উপর নির্জ্জনতা ও শৈত্যের কঠোর সমাবেশ সময়ের কৃষ্ণত্ব যেন আরও ঘনাইয়া তুলিতেছিল। বালিকার প্রত্যেক পদবিক্ষেপ প্রতিমুহূর্ত্তে আয়ত্ত—সাহসের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল।

কি দেখিয়া বালিকা মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল; বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিল। আবার বালিকা সাহস সঞ্চয় করিয়া অপেক্ষাকৃত মন্থর ও গুরুপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিমলেন্দু বাবু মাখনপুরের একজন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি। স্রোতস্বতী গর্গীনদী চারিদিক হইতে মাখনপুর সহরটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মধ্যে সৌন্দর্য্যপূর্ণ সহরটি কৃতবিদ্য চিত্রকরের স্বহস্তাঙ্কিত মনোমত ছবিখানির মত শোভা পাইত। আজ কয় বৎসর হইতে প্লেগরোগ সহরটীকে হতশ্রী করিতে বসিয়াছে। এ বৎসর সেই রোগ করালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইহাকে প্রায় শ্মশানে পরিণত করিয়াছে—যে গৃহে একবার প্রবেশ লাভ করিতেছে তাহার শেষ প্রাণটিকে পর্য্যন্তও গ্রাস না করিয়া ছাড়িতেছে না।

নিভাননী বিমলেন্দু বাবুর একমাত্র কন্যা। সে সুন্দরী, বয়স অষ্টাদশ বৎসর। বিদ্যাশিক্ষার অন্তরায় হইবে ভাবিয়া ও আরও নানা কারণে প্রজাপতি আজিও তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হন নাই।

গ্রামে রোগীর সংবাদ পাইলেই নিভাননী তাহার শুশ্রূষার জন্য ছুটিয়া যায়। বিমলেন্দু বাবু বাধা দিতে গাইলে তাহার উজ্জ্বল শুকতারার মত চক্ষু দুটী নিষ্প্রভ হইয়া আসে, মুখে অব্যক্ত বেদনার করুণ চিত্র ফুটিয়া উঠে—বিমলেন্দু বাবু অন্তরের অন্তস্তলে কি এক অজানা বেদনা উপলব্ধি করিয়া কন্যাকে তাহার ঈপ্সিত কার্য্যে বাধা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন, অমনি পিছাইয়া আসেন। বালিকা নিজের কাজে বাহির হইয়া যায়; আর তাহার গুরুতর পরিশ্রমের পারিতোষিক স্বরূপ এক এক গৃহের করুণ চিত্র বুকে করিয়া ফিরিয়া আসে।

ইতিপূর্ব্বে সে তাহার প্রিয়সখী হেমপ্রভার সহিত একসঙ্গে দেশের ও দশের কাজে লাগিয়া যাইত—সকলের সুখ দুঃখের ভার দু'জনে সমানভাবে ভাগ করিয়া লইত—কিন্তু আজ সে সেই সুখটীকেও চিরজন্মের মত ছাড়িয়া সকল গুরুভার একাই বহন করিয়া গৃহে ফিরিতেছে।

গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া সে ধীরে ধীরে দ্বার উন্মুক্ত করিল; দেখিল টেবিলের উপর তখনও সেজ জ্বলিতেছে আর উহার এক পার্শ্বে বৃদ্ধ বিমলেন্দু বাবু তখনও চেয়ারে বসিয়া তন্ময় হইয়া কি ভাবিতেছেন।

বালিকার পদশব্দে বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গিল, তিনি বালিকার করুণ কাতর মুখের উপর চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভা কেমন আছে? নিভা!"—হেমপ্রভা সকলের নিকট 'প্রভা' নামেই অভিহিত হইত।

বালিকা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাষ্পজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিল, "সে আর এ জগতে নেই, বাবা!" উদ্দাম নয়নোচ্ছ্বাস প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য সে অবিলম্বে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

সে ধীরে ধীরে আপন কক্ষে প্রবেশ করিল। এবং নিদ্রার সাহায্যে মানসিক দুর্ভাবনার হাত হইতে কিছুক্ষণের জন্য নিষ্কৃতি পাইবার আকাঙ্ক্ষায় শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল—মন যখন নিদ্রার জন্য ব্যগ্র হয় নিদ্রাও যেন তাহাকে দূরে রাখিতে চায়। ঘরের আলোটি যে নিস্তেজ করিয়া দিতে হইবে সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না।

বালিকার উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক ছিলেন। তারপর

ধীরে ধীরে কন্যার অনুবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন তাহার নিভা যেন নিদ্রাদেবীর বৃথা আরাধনা করিতেছে; তাহার প্রস্ফুটিত কমলসদৃশ মুখখানি পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে—তাহার উপর এক দুর্ভাবনার গভীর রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিভা! এখুনি শুলি যে? কিছু খাবি নে?"

কন্যা অতি ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "না, বাবা!"

"কেন, কি হয়েচে রে? ওঠ, ওঠ, রাত উপোসী থাকিস নে বুঝলি? রাত উপোসে হাতীও পাড়ু হ'য়ে পড়ে। ওঠ মা ওঠ; ভেবে আর কি করবি বল।"

"না বাবা! আজ আমার শরীরটে তত ভাল নেই।"

"কেন, কি হয়েচে মা?"

"না, এমন কিছু না, মাথাটা ধরেছে আর—"বালিকা একটি ঢোক গিলিল।

"আর কি?"

বালিকা কি যেন চাপিয়া রাখিতে চাহিতেছিল কিন্তু আর পারিল না। একটি ঢোক গিলিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "আর আমি বাঁচব না, বাবা! আজ আমিও সেই মূর্ত্তি দেখচি।" বালিকা আর বলিতে পারিল না; গাত্রবস্ত্রে নিজের মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধের শরীর কাঁপিয়া উঠিল; এক ভবিষ্য আশঙ্কার দুর্ভাবনা হৃদয়ের অন্তরতম কপাটে আঘাত করিল। বৃদ্ধ প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন—নয়নদ্বয় নিঃশব্দে দুই ফোঁটা অশ্রু ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রানের ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করিল।

এবার প্লেগরোগ যখন প্রবল প্রতাপে মাখনপুরের ধ্বংস বিধানে বদ্ধ পরিকর, তখন সে অঞ্চলে এক দৈবমূর্ত্তির আবির্ভাব চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কেহ বলে সে স্ত্রীলোক, কেহ বলে সে পুরুষ; ফলকথা তাহার অবয়ব মানব সদৃশ—সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত। সুস্থ শরীরেও যে ব্যক্তি শয্যাপার্শ্বে এই মূর্ত্তির আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়াছে তাহাকে ইহজগতে বার ঘণ্টার অধিক অতিবাহিত করিতে হয় নাই এবং রাস্তাঘাটে সম্মুখ দিয়া সেই মূর্ত্তির দ্রুত গমনও অচিরে রোগাক্রান্ত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ এইরূপ প্রবল জনশ্রুতি ও তদ্দেশবাসীদিগের বদ্ধমূল বিশ্বাস।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ ছিলেন, পরে কন্যাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "তুই কি পাগল হ'লি ? নিভা। ও সব কিছু না।"

"বাবা। আপনি আমায় বৃথা বোঝাতে চেষ্টা করবেন। আজ যখন প্রভাকে জন্মের মত ত্যাগ করে বাড়ী ফিরছিলুম তখন আমি স্পষ্ট দেখলুম সেই মূর্ত্তি আমার সামনে দিয়ে চলে গেল।

"দূর পাগলি! ও কোন ছায়া টায়া দেকিচিস্; সেই জন্যেই ত বলি যে অমন অন্ধকারে যাওয়া আসা করিস নে—তা আমার কথা শুনবি নে ত!"

"বাবা! নিজের চোখকেও কি অবিশ্বাস করবো ?"

বৃদ্ধের মন দমিয়া আসিল; স্তোকবাক্যে কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে আর তাঁহার প্রাণ চাহিল না। তিনি কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

এবৎসর প্লেগরোগের প্রাবল্য দেখিয়া বৃদ্ধ পূর্ব্ব হইতেই সংসার যাত্রায় নিজের নামটি খরচ লিখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন। একে বৃদ্ধ বয়স তাহার উপর শারীরিক দৌর্ব্বল্য, মানসিক দুশ্চিন্তা ও আত্মগ্লানি বৃদ্ধকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল,—আবার যখনই ভাবিতেন তাঁহার অন্তিম সময় সন্নিকট তখনই মনে হইত এ সংসারে আসিয়া কত না পাপ সঞ্চয় করিয়াছেন ও তাহার কত না নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে।

আজ যখন বুঝিলেন যে তাঁহার এই জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁহার নয়নের মণি, পরাণ পুত্তলি কন্যাটিও তাঁহাকে ফাঁকি দিবার বন্দোবস্ত করিতেছে তখন তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। হৃদয়ের ভাব চাপিয়া রাখিবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও উদ্দাম নদীর মত কুল ছাপাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

বৃদ্ধ একটি সুদীর্ঘ এবং সুগভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "নিভা! এসব আমারই কৃত পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল।"

কন্যা কোন উত্তর করিল না।

বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার নিজের দোষেই আজ আমি তোকে হারাতে বসেছি নিভা।—নিভা!—শরৎকে তোর মনে পড়ে ?"

বালিকা একটি ছোট্ট করিয়া উত্তর দিল, "হুঁ"।

"পড়বে না ? সে যে তোকে বড় ভাল বাস্‌তো নিভা!—তুইও যে তাকে প্রাণের সহিত ভাল বাস্‌তিস্ তাও জান্‌তুম—আর সেই ভালবাসাই এখন কাল হ'ল!

বালিকা মুখ ফিরাইল। সে দিকে বৃদ্ধের দৃষ্টি ছিল না নতুবা দেখিতে

পাইতেন মুক্তার ন্যায় দুই বিন্দু উত্তপ্ত অশ্রু নিভার গণ্ড বহিয়া উপাধানে লুকাইয়া গেল।

কিছুক্ষণের জন্য কক্ষ নিস্তব্ধ ছিল; বৃদ্ধ আবার আরম্ভ করিলেন, "নিভা! আজ তোকে তার কথা কিছু ব'ল্‌বো, না হ'লে আমার পাপের ভার আরও দশগুণ বেড়ে উঠবে।

শরতের বিষয়?—সে যাই হোক, ভাল হোক, মন্দ হোক, তাই শুনবার জন্য বালিকার প্রাণ আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল। সে বালিসের উপর মাথাটি আরও একটু তুলিয়া শুইল।

"নিভা! জানিস্ত শরতের পিতা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন?"

"জানি।"

"তিনি মৃত্যুকালে তাঁর অতুল ধনের অধীশ্বর ক'রে তাঁর একমাত্র পুত্রটিকে আমার হাতে সঁপে দেন; সে সমস্ত ধন আজও আমার চোর কুঠরীতে ভরা আছে।—এসব খবরও তুই রাখিস কি?"

"রাখি।"

"সেও আজ আট বছরের কথা। আমি সেই সমস্ত ধন লোভে করতলগত কার—আর আমি এমনি নৃসংশ যে পাছে কালে সেই শরৎই আমার সকল সম্পত্তির অধীশ্বর হয়—তাই তাকে অর্থোপার্জ্জনের অছিলায় বাড়ী হতে তাড়িয়ে দি—এমন কি এ ঘরে তার আসবার অধিকারও নেই। সেই অবধি সে নিরুদ্দেশ। তখন সে উনিশ বছরের বালক ছিল। (নিভাননী তাহার গলবিলম্বিত স্বর্ণহারের শরৎ—প্রদত্ত—অমূল্য—দুলকিটি আবেগভরে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল) এও তোর মনে পড়ে কি?"

"পড়ে।"—নিভাননী বড় শান্ত ও মধুর প্রকৃতির; অন্তরের অসহ্য যন্ত্রণাও সে হাসির স্রোতে ভাসাইয়া দিত। সে এতদিন এত সহ্য করিয়াও নিজের সকল কর্ত্তব্যই সাধন করিয়াছে—কাহাকেও তাহার অন্তরের দ্বারে পৌঁছাইতে দেয় নাই।

বালিকা আজ বড় অধীর। সে যেন অনুভব করিতেছে—তাহার জীবন প্রতিপলে মৃত্যুর দ্বারে অগ্রসর হইতেছে। তাই সে আজ সকল কাজই সংক্ষেপে সারিতে চায়। সে অধীর ভাবে বলিয়া উঠিল "বাবা, আর কিছু থাকে ত শেষ করে নিন।"

বালিকা কিছুক্ষণের জন্য উৎকর্ণ হইয়া কি শুনিতে লাগিল—পরক্ষণে বলিয়া উঠিল, "কা'র পা'র শব্দ শোনা যাচ্ছে না ?"

এ শব্দ বৃদ্ধের কর্ণে পৌঁছাইল। বৃদ্ধ এক একবার পদশব্দ শোনেন আর কন্যার মুখের দিকে চাহিতে থাকেন। শব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল—কন্যাও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল।

এবার গৃহদ্বারে সিকলের শব্দ হইল ঠন্ ঠন্; ক্রমে অর্গলযুক্ত কবাট ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হইল—বালিকা চক্ষু মুদ্রিত করিল।

* * * * *

এক সুবলিষ্ঠ সংবদ্ধ পেশী পুরুষ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

উহার পরিধানে শীত নিবারণী গরম পায়জামা; গায়ে গরম সার্টের উপর গরম ওয়েষ্ট কোট; মাথায় সাফা। হস্তে স্বর্ণবলয়; কণ্ঠে গিনির হার। দেখিলে ন্যূনাধিক ত্রিশবৎসরের বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানী বলিয়া বোধ হয়।

ঈদৃশ সময়ে অপরিচিত ব্যক্তির অযাচিত আগমন বৃদ্ধকে কথঞ্চিৎ সশঙ্ক করিয়া তুলিল; তিনি হৃদয়ের সমস্ত সাহস একত্র কেন্দ্রীভূত করিয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোম্ কোন্ হ্যায় ? ইস্ বখৎ তুমনে—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া সেই নবাগত ব্যক্তি বিকৃত স্বরে উত্তর করিল, "রহ জায়িয়ে বাবুজি ! হামরা নাম 'দেবী ডাকু'।"

সম্মুখে উদ্যত ফণা বিষধর দেখিলেও তিনি এতদূর বিস্মিত হইতেন না; এই অপ্রত্যাশিত পরিচয় প্রদানকারীর আগমনে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

মনে পড়িল মাস খানেক আগেকার কথা ! প্লেগ তখন সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। তাহার নামে—শুধু তাহার নামে কেন ? তদ্দেশস্থ প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরই নামে এক একখানি হাত চিঠি আসিয়াছিল। তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :

মহাশয় !

আমার নিকট প্লেগ রোগের অমোঘ ঔষধ আছে। যে কেহ প্রত্যেক রোগীর জন্য তাহার তাৎকালিক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দিতে স্বীকৃত হইবে, আমি সেই রোগীকে রোগ মুক্ত করিব। বিফল কামে মূল্য ফেরৎ। আজ হইতে পনর কুড়ি দিনের মধ্যে যথা সম্ভব সকলেরই সহিত সাক্ষাৎ করিব।

দেবী ডাকু—

পুঃ—অসতের সহিত আমি অসদ্রূপই ব্যবহার করিয়া থাকি। দেবী।

আরও মনে পড়িল এই 'দেবী ডাকু'র অদ্ভুত ডাকাইতির কথা; আর ইহার হস্তে পুলিসদিগের ততোধিক লাঞ্ছনা। বৃদ্ধের সুর বদলাইয়া গেল।

বৃদ্ধ দেবী ডাকুকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বলিলেন, "হামারা গোস্তাকি মাফ্ কি জিয়ে গা। হাম আপ্‌কো (এইবার বৃদ্ধ 'আপ্' বলিয়া সম্বোধন করিল) নেহি পয় চেনে থে। আপ্‌কেয়া হামারা লেড়্‌কী কে আচ্ছা করনে কে লিয়ে আ গেঁয়ে।"

দেবা বিদ্রূপভাবে উত্তর করিল, "আপ্ কেয়া দোস্‌রা কুছ সমঝতে থে।"

"নেহি, নেহি। মরণে ইয়ে কয়রাহু কি আগার আপ হামারা বিটিকো আচ্ছা কর দিজিয়ে গা তো হাম হামরা আধা হিস্বা কেয়া—পুরা সম্পৎ—আপকো দে দুঙ্গা। ইয়ে বিটিকে লিয়ে হাম জানতক দেনেমে তৈয়ারী হুঁ।"

"জি!" বলিয়া দেবা একটি শ্লেষপূর্ণ উত্তর দিল।

দেবী আর কাল বিলম্ব করিল না। আপন 'আঙ্গরাখার জেব' হইতে কি এক লাল বর্ণের গুঁড়া বাহির করিয়া কিয়ৎ পরিমাণ ব্রাণ্ডির সহিত গুলিয়া বালিকার মুখে ঢালিয়া দিল।

বালিকা অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করিল।

কিছুক্ষণ পরেই বালিকার অধর কাঁপিতে লাগিল; নিশ্বাস প্রশ্বাস নাতি-শ্বাসে পরিণত হইল—ক্রমে কণ্ঠে আসিয়া শেষ হইতে লাগিল। মৃত্যুর এক ভয়ঙ্কর ছায়া বালিকার সমস্ত মুখ ছাইয়া ফেলিল।

বৃদ্ধ কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ সকল দৃশ্যই দেখিতে লাগিলেন।

এবার বালিকা একটি গভীর শ্বাস ত্যাগ করিল—অধর কম্পন বন্ধ হইল—সমস্ত শরীর স্থির হইয়া গেল।

দেবী ধীরে ধীরে বালিকার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎই নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তাঁহার অজ্ঞাতসারে মুখ হইতে বাহির হইল, "যাক! সব শেষ হ'য়ে গেল।"

ক্ষণকালের জন্য কক্ষে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। উভয়ের দৃষ্টিই বালিকার সেই ম্লান মুখের উপর।

হঠাৎ দেবী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মৃত্যু! এখানে তোমার স্থান নাই—এস্থান প্রেম ও শান্তির।"

বালিকার অধর আবার কাঁপিয়া উঠিল; সে চক্ষু মেলিল। একবার বৃদ্ধের প্রতি তাকাইয়া সে দেবীর প্রতি বিস্মিত নয়নে চাহিল। পরক্ষণেই দেবীর প্রতি হাত দু'খানি বিস্তার করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "শরৎ! এত-দিন কোথা ছিলে?"

শরৎ তাহার হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিল।

বালিকা আর বলিতে পারিল না। এত দিন যে সমস্ত কষ্ট সে হৃদয়ের নিভৃত গুহায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল আজ তাহা এই অল্পমাত্র সুখের উত্তপ্ত আঁচে গলিয়া গিয়া সহস্রধারে তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঝরিতে লাগিল।

কিশোরি! আজ তোমার এ অশ্রু দুঃখের না সুখের কে জানে?

বৃদ্ধ ভাবিতে লাগিলেন আমি জাগ্রত না সুপ্ত? এই ঘটনা পরম্পর প্রকৃত না স্বপ্ন-দৃশ্য কাব্যের এক এক গর্ভাঙ্ক।

বৃদ্ধ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—দুই হস্তে আবেগভরে শরতের গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি শরৎ? এত পরিবর্ত্তন! আমি তোমায় চিন্‌তে পারি নি, শরৎ! (মন বলিল, "তুমি পারনি কিন্তু তোমার নিভার ভুল হয় নি; এক বাদ্যের পৃথক তন্ত্রী বইত নয়—একের স্পন্দনে অপরটি বাজবেই ত! প্রাণে প্রাণ আপনিই ধরা পড়ে।) আমায় ক্ষমা করো, শরৎ! তোমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেচি—তার জন্য ক্ষমা চাইতেও লজ্জা বোধ হয়। শরৎ! আজ তোমায় আমার সম্পত্তি সমস্ত তোমায় দিলাম। আমায় ক্ষমা ক'রো।"—বৃদ্ধ আর বলিতে পারিলেন না, বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

শরৎ বাধা দিয়া বলিল, "আপনার কাযের জন্য আপনি ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর"—যুবক নিভার হাত দু'খানি আর একটু চাপিয়া ধরিল—"আমি আপনার ধনের প্রত্যাশী নই। নিজ পুরুষকার বলে আজ যে সম্পত্তি করতলগত কর্‌চি তা হ'তে আর আমায় বঞ্চিত কর্‌বেন না।"

"উপেক্ষিতা"

লেখিকা—শ্রীমতী শরদিন্দু সরকার

(১)

বর্ষাকাল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বর্ষণোদ্যত মেঘপুঞ্জের মধ্যে রৌদ্রালোক বালকের হাসি কান্নার মতই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। সূর্য্যাস্তের ম্লান কিরণটুকু তখনও সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলে নাই।

সওদাগর আপিসের কর্ম্মাবসানে ক্লান্ত দেহে যখন প্রাণকৃষ্ণ বাবু বাড়ীর প্রাঙ্গণে সবে মাত্র পা দিলেন—তখন সরোজবালা একখানি আসন পাতিয়া তাহারই জলযোগের আয়োজন করিয়া একটী ঘটীতে জল এবং তদুপরি একখানি গামছা রাখিয়া তাহারই অপেক্ষায় বসিয়াছিল। প্রাণকৃষ্ণ বাবু জুতা ছাড়িবামাত্র সরোজবালা হাসি মুখে ব্যস্ত হইয়া স্বামীর পদধৌত করিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইতেই প্রাণকৃষ্ণ বাবু রুক্ষস্বরে কহিল "থাক্ থাক্, তোমার আর অত ভক্তি দেখাতে হবে না।" স্বামীর এই রূঢ় বাক্যে সরোজবালার মুখের হাসি যেন কোথায় মিলাইয়া গেল, অপ্রতিভ হইয়া দুইপদ পিছাইয়া আসিল, মুখে কথা যেন সরিল না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রাণকৃষ্ণবাবু বাহিরে অতি সরল অমায়িক লোক হইলেও বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সে সরলতাটুকু কোথায় চলিয়া যাইত। তিনি যে পত্নীকে ভাল বাসিতেন না তাহা নহে—তবুও কেন যে এরূপ হইত তাহা তিনি নিজেও সময় সময় বুঝিতে পারিতেন না।

সরোজবালা ধনীপিতার একমাত্র আদরের কন্যা, স্বামীর এই উপেক্ষা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত।

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে ফাল্গুনের এক রজনীতে নির্ম্মল আকাশে চাঁদের আলোয় প্রাণকৃষ্ণবাবুর সহিত সরোজবালার চিরজীবনের সুখ দুঃখের বিনিময় হইয়া গিয়াছে। প্রাণকৃষ্ণবাবু তখন সবে বি, এ, পড়িতেছিল, পিতার একমাত্র সন্তান—অবস্থাও বিশেষ অসচ্ছল ছিল না, তাহার উপর সৌন্দর্য্য—চরিত্র, সরোজবালার কোন ভাগ্যহীনা সখীর ও আত্মীয় স্বজনের গর্ব্ব উদ্রেক

করিতে সহজেই সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু শ্বশুরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। প্রাণকৃষ্টবাবু এই সুদূর বিহার অঞ্চলে এক সওদাগর আপিসে কার্য্য গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চাশ টাকা মাহিনায়—সংসারের খরচবাদে মাসের শেষে আর একটী পয়সাও রাখিতে পারিতেন না। উপরোক্ত দুই চারি টাকা ধারও হইয়া যাইত, এই পতি পত্নীর সংসারে কিরূপে যে এত খরচ করিয়া ফেলিত তাহা সে মোটেই বুঝিতে পারিত না। পত্নীকে অলঙ্কার গড়াইবার জন্য বা কোনও সৌখিন দ্রব্য কিনিবার জন্য কিছুই দিতে পারিতেন না বলিয়া সে নিজেও যে মনে মনে দুঃখিত হইত না তাহা নহে। ইহা সত্বেও কোন রূপে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিত না।

প্রাণকৃষ্টবাবু সকালেই এক কাপ চা পান করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া যাইতেন এবং বেলা দশটাতে বাড়ী ফিরিয়া নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া আপিস ছুটিত—আপিসান্তে সন্ধ্যায় জলযোগের পর সরোজবালাকে কথাটি বলিবার অবসর না দিয়াই আবার বাহির হইয়া যাইতেন, রাত্রি ন'টার কম কোনও দিন তাহাকে বাড়ী ফিরিতে দেখা যায় নাই।

বাড়ী আসিয়াই আহারাদির পর আবার আপিসের কাগজপত্র লইয়া বসিতেন। পাওনাদারগণের তাগাদা বা বাক্যজ্বালা সরোজবালাকেই সকল সময় সহ্য করিতে হইত, সে বিষয়ে কর্ণপাত করিবার মত অবসর প্রাণকৃষ্ট বাবুর ছিল না, বা ইচ্ছা করিয়াই কর্ণপাত করিতেন না। সরোজবালার এসব প্রায় গা সওয়া হইয়া গিয়াছিল, এজন্যে সে বিশেষ দুঃখিতা না হইলেও মাঝে মাঝে কি যেন সন্দেহের ছায়া তাহার হৃদয় মধ্যে উঁকি দিয়া উঠিত, এবং একখানি কাল মেঘ সঞ্চিত হইয়া তাহার সমস্ত হৃদয়টাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। একটু সামান্য অভিমান থাকিয়া থাকিয়া তাহার হৃদয়ে কেন যে জাগিয়া উঠিত—তাহা সে মোটেই বুঝিতে পারিত না। নীরবে সমস্ত বেদনা বুকে চাপিয়া সংসারের কাজগুলি সারিয়া যাইত. কোনও দিন এতটুকু এদিক ওদিক হইতে দেখা যায় নাই। সে দিনও পাওনাদারগণ দুইচারিটা রূঢ়বাক্য শুনাইয়া দিয়া গিয়াছে, সে বাক্যজ্বালা তখনও সে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারে নাই, আজ সেই কথাই স্বামীকে বলিবার জন্য তাহার প্রাণটা যেন ছট্ ফট্ করিতেছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, প্রাণকৃষ্টবাবু প্রতিদিনের মত সেদিনও তাহাকে সে সুযোগ না দিয়াই বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

নিরুপায় হইয়া সরোজবালা বহুক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিল। এ বিষয় লইয়া কোন দিনই কেহ কাহাকেও অভিযোগ করিত না, তবুও দুইজনেই এইরূপে হৃদয়ে বিষ ধারণ করিয়া দিনগুলি অতিবাহিত করিত, এজন্য দুইজনের মধ্যে সদ্ভাব কোন দিনই দেখা যাইত না।

(২)

রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়া গিয়াছে, আহারাদির পর, প্রাণকৃষ্টবাবু শয়ন কক্ষে ঢালা বিছানায় প্রদীপের আলোতে এক রাশি কাগজ লইয়া অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে দেখিতে ছিল। ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া সরোজবালা ঘরে প্রবেশ করিল। এবং জানালাটা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া বাটা হইতে ডিবা ভরিয়া পান আনিয়া স্বামীর সম্মুখে রাখিয়া প্রদীপের সলিতাটাকে অনাবশ্যক উস্‌কাইয়া আরো একটু উজ্জ্বল করিয়া স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণে বৃথা চেষ্টা করিল। অবশেষে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল "তোমার কাগজ দেখা হলো কি? আজ আমার একটা কথা বলবার আছে যে।" প্রাণকৃষ্টবাবু কাগজ হইতে চক্ষু না তুলিয়াই কহিল "হুঁ, আর হলো ব'লে।" সরোজ বুঝিল যে, তাহার এখনও অনেক দেরী, প্রায়ই এই উত্তর সে পাইয়া থাকে, কিন্তু তাহার এই 'হলো বলে' আর শেষ হয় না, অগত্যা সে অনাবশ্যক গৃহের সজ্জিত জিনিসগুলি আবার ভাল করিয়া ঝাড়িয়া সাজাইতে লাগিল, এবং অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও প্রাণকৃষ্টবাবুর কার্য্য শেষ হইবার লক্ষণ না দেখিয়া একবার কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল "দেখ পাওনাদাররা আজ বড়ই তাগাদা দিয়ে গেচে, আর কত দিনই বা তাদিকে ফেরান যায়।" প্রাণকৃষ্টবাবু পূর্ব্ববৎ সংক্ষেপে উত্তর দিল "তাতে হয়েচে কি?" সরোজবালার ইচ্ছা হইল বাক্যালাপের এইখানেই উপসংহার করিয়া শয়ন করে, কিন্তু সে তাহা করিল না, আবার ধীরে ধীরে কহিল "তাতে হয় নি ত কিছু, কিন্তু আমাকে ত সে কথাগুলো শুনতে হয়।" পঠিত কাগজে অঙ্গুলির অগ্রভাগ চিহ্নিত রাখিয়া পত্নীর মুখের প্রতি চাহিয়া, শ্লেষের স্বরে প্রাণকৃষ্টবাবু কহিল "তোমায় যদি শুনতে এতই কষ্ট হয় তবে নয় কানে তুলো দিয়ে থেকো।"

অভিমানের স্বরে সরোজবালা কহিল "কিন্তু তারা তা বুঝে কই।" কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি পত্নীর উপর স্থাপিত করিয়া রহস্যের স্বরে প্রাণকৃষ্ট বাবু কহিল

"তুমিই নয় সেটা বুঝিয়ে দিও।" প্রাণকৃষ্ট বাবুর দৃষ্টি এবং স্বর কৌতুকপূর্ণ দেখিয়া সরোজবালার অন্তরের অভিমান মুখে চোখে ছড়াইয়া পড়িল, স্বামীর এই গুপ্ত আঘাতের বিদ্যুৎ তাহার আহত বক্ষে বাজিল, সে দৃঢ় কণ্ঠে কহিল "সেটা মুখে বলা যত সহজ, বোঝান তত সহজ নয়, তার চেয়ে আমি যদি না থাকতুম তাহলেই সব চেয়ে ভাল হ'ত।" পত্নীর অভিমানাহত মুখের উপর হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া পঠিত কাগজে নিবদ্ধ করিয়া কহিল "সেই পুরোন কথাগুলো শুন্‌বার আমার মোটেই আগ্রহ নেই, তার চেয়ে সোজা কথায় বলনা কেন আমার স্ত্রী না হয়ে কোনও ধনীর স্ত্রী হলেই বেশী সুখী হতে। কিন্তু সে দোষটা ত আমার নয় সরোজ, সেই অবিবেচক বিধাতার দোষ।" কথা শেষ করিয়াই সে পত্নীর দিকে চাহিয়া দেখিল। সরোজ তখন পিছন ফিরিয়া শয়ন করিয়াছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার বলিল "রাগ হলো বুঝি? একটুতেই রাগ, এইজন্যেইত দূরে দূরে থাকতে চাই!" সে আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করিল। সরোজবালা অচিরে নিদ্রিতের ভাণ করিল। যদিও সে খুব জোর করিয়াই দুই চক্ষু বুজিয়া রাখিল, তবু তাহার মুদ্রিত নেত্রের দুই পাশ দিয়া বিন্দুর পর বিন্দু জল গড়াইয়া মাথার বালিসটাকে ভিজাইয়া তাহার মনটাকে কঠিন করিয়া তুলিতেছিল। এই দম্পতীর মধ্যে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। প্রাণকৃষ্ট বাবু ভাবে এ অতিশয় বাড়াবাড়ি। আর সরোজবালা স্বামীর হৃদয়হীনতা নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়া জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া পড়ে, এবং নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া মনে মনে জ্বলিয়া জীবনটাকে বিষময় করিয়া তুলে। অথচ এ বেদনার কোন বিশিষ্ট কারণও দেখাইবার ছিল না। সরোজবালা লেখা পড়াও বেশ জানিত, নাটক নভেল সে রাশি রাশি পাঠ করিয়াছে, কিন্তু তাহার মত ভাগ্য-হীনা নায়িকা কোন বইয়ে সে এ পর্য্যন্ত দেখিতে পায় নাই। সে দেখিয়াছে সরলার স্বামী সরলাকে কত ভাল বাসে। তাহার সইয়ের স্বামীর কত কাজ, তবু সই যখন বাপের বাড়ী আসে তখন চিঠিতে চিঠিতে তাহার বাক্স বোঝাই করিয়া দেয়। গোলাপ জলের স্বামী গোলাপ জলকে এক দণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারে না। আর সে এত ভাল বাসিয়াও স্বামীর একটুও ভাল বাসা পাইল না, এমনই ভাগ্যহীনা সে! সরোজবালার রূপের প্রসংশা সকলেই করিয়া থাকে, নিজেকে সুন্দরী বলিয়াই তাহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু যেরূপ স্বামীর চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না—তাহার মূল্য

কিসের! সে স্তন স্বামীকে বশে আনিতে পারিল না তাহা গন্ধহীন ফুলের মতই অনাবশ্যক।

সরোজবালার মনে সুখ ছিল না, তাহার হৃদয়ের জ্বালা হৃদয়ে চাপিয়া কোনও রূপে দিনগুলি অতিবাহিত করিত, স্বামীকে তাহা কোনও দিনই জানিতে দিত না। তার পরই হঠাৎ একদিন তাহার শরীরে ক্ষয় রোগ দেখা দিল। অল্প আয়, গরীবের অত কেন,—ভাবিয়া প্রথম প্রথম রোগ গোপন করিয়া সংসারের কাজ পূর্ব্ব মতই করিতে লাগিল। ফলে একটু একটু করিয়া রোগ বাড়িয়া যাইতে ছিল।

(৩)

সেদিন সকালে প্রতিবেশীকন্যা কমলা আসিয়া তাহার বিষাদ ম্লানিমা জড়িত মুখের প্রতি চাহিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল "বৌদি, তোর মুখ খানা দিন দিন এত শুকিয়ে যাচ্চে কেন বল্‌ত ভাই?" সরোজবালা তখন সবে তরকারীর ডালা লইয়া তরকারী কুটিতে বসিয়াছে, কমলার কথা শুনিয়া ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল "দুর মুখ শুখনো হবে কেন? রাত্রে ঘুম হয় নি তাই।" সে হাসিল বটে, কিন্তু তাহার সেই হাসির সঙ্গে যে একটা বেদনা মিশ্রিত রহিয়াছে—কমলা তাহা কিছুতে ভুলিতে পারিতেছিল না, সে মৃদু হাসিয়া কহিল "তুই আমাকে লুকাচ্চিস্ বৌদি, আমায় বল্‌বি না ভাই?" একটা চাপা নিঃশ্বাসে হৃদয় কম্পিত করিয়া সরোজ কহিল "কি আর বল্‌বো ভাই? কিছুই হয়নি ত।" কমলা বুঝিল—সে নিশ্চয়ই কোনও কথা গোপন করিতেছে, এবং সে কথা বলিবার তাহার মোটেই ইচ্ছা নাই। কিন্তু সেও সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহে। একটু থামিয়া সে আবার অভিমানের স্বরে কহিল "আচ্ছা ভাই, বলিস না, আমিও শুনতে চাই না, আমি বুঝেচি—দাদার সঙ্গে তোর ঝগড়া হয়েচে, নয় কি বৌদি?"

বেদনা স্থানে আঘাত লাগিলে নিপীড়িত ব্যক্তি যেমন করিয়া তাকায়—সরোজবালাও তেমনি করিয়া কমলার মুখের প্রতি চাহিল—কোন উত্তর দিতে পারিল না। কমলা তাহার মনোভাব বুঝিয়া বলিল "দেখ্ বৌদি, ঠিক ধরেচি কিনা? এত কেনলা, একটু ঝগড়া হয়েচে—তাতেই যেন একবারে মুশড়ে পড়েচিস, ছিঃ বৌদি ঘর কত্তে এমন হয়েই থাকে তা বলে কি এতই অভিমান কত্তে হয় ভাই?" কমলার শান্ত্বনায় মনের বেদনা দূর না হইয়া আরো অধিক উছলিয়া পড়িতে চাহিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া উনুনে

ঝোলটা চড়াইয়া দিয়া সাবধানে চোখের জল মুছিল। এবং কমলার দিকে ফিরিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল "স্বামীর উপরে কি রাগ কত্তে আছে ভাই? আমি রাগ করিনি, শরীরটে তত ভাল নাই।" সে মুখে একথা বলিল বটে, মন কিন্তু তাহাতে ঠিক সায় দিল না। সরোজবালাকে ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে না পারিয়া কমলা ক্ষুণ্ণ মনে কহিল "আমি হয়ত ভুলই বুঝেছিলুম, কিছু মনে করিস্ না ভাই। আমি এখন তবে যাই বৌদি, আবার ওবেলা আসবো'খন।" কমলা চলিয়া গেল।

প্রাণকৃষ্ট বাবু প্রতি দিনের মত সেদিনও আপিসে চলিয়া গেল, পত্নীর অভিমানদীপ্ত মুখের পানে চাহিয়াও চাহিল না। অভিমানিনী সরোজবালা কোন দিনই স্বামীর নিকট কিছুই চাহে নাই—বরং নিজের প্রাপ্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া নিজেই মনস্তাপে দগ্ধ হইয়াছে এবং নিষ্ঠুর বিধাতাকে অভিসম্পাত করিয়াছে। কিন্তু আজ স্বামীর উপেক্ষা তাহার অন্তরে শেলের সমানই আঘাত করিল—এই জীবন মরণের সন্ধি স্থলে আসিয়াও স্বামীর এক বিন্দু স্নেহের আশা সে করিতে পারিল না। সে দুই হস্তে নিজের বুকটা জোরে চাপিয়া ধরিল, এবং বিছানায় যাইয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

(৪)

একটানা জীবন স্রোতে নূতনত্বের সম্ভাবনায় দুইদিন সরোজবালার শরীরটা একটু ভালই মনে হইতে ছিল কিন্তু সে ভাব অধিক দিন স্থায়ী হইল না। জ্বর প্রতিদিনই বাড়িতে ছিল, শরীর ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া পড়িতেছে, দেহ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া বিছানায় মিলাইয়া আসিতেছে, প্রাণকৃষ্ট বাবু তাহা লক্ষ্য করিল। ডাক্তার বায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন, সরোজবালার রোগ যে চিকিৎসার অতীত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে প্রাণকৃষ্ট বাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, তবুও আশা ত্যাগ করিলেন না, পত্নীকে কোন্ স্থানে লইয়া গেলে শীঘ্র আরাম হইবার সম্ভব তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পশ্চিম আকাশের শেষ রক্ত আভা গবাক্ষ পথে গৃহে প্রবেশ করিয়া মুমূর্ষুর শেষ হাসি টুকুর মতই একবার উজ্জ্বল হইয়া মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল। প্রাণকৃষ্ট বাবু নিঃশ্বাস ফেলিয়া জানালাটা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। সেদিন রবিবার, সন্ধ্যায় মেঘেরও বিস্তৃত আয়োজন। বাতাস বেগে বহিতেছে। ঘনপুঞ্জ মেঘরাশির মধ্য দিয়া ম্লান জ্যোৎস্না সরোজবালার

শয্যায় মুখে চোখে, অর্দ্ধমুক্ত জানালা দিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সরোজবালা জাগিয়াই ছিল, ঘুমায় নাই। প্রাণকৃষ্ট বাবু ডাক্তারকে লইয়া রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "সরোজ, ঘুমুলে নাকি? ডাক্তার বাবু এসেচেন যে।" মুহূর্ত্তের তরে সরোজবালা লুপ্ত চেতনা যেন ফিরিয়া পাইল, স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করিতেই দুই নেত্রের পাশ দিয়া অশ্রু রাশি ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। প্রাণকৃষ্ট বাবু কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন কাঁদচ তুমি? কি হচ্চে তোমার? স্বামীর স্বর ও দৃষ্টি দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সরোজবালা চমকিত হইয়া নিজের দুর্ব্বল হস্তখানি বাড়াইয়া স্বামীর হাতখানি বুকের উপরে চাপিয়া ধরিল, এবং ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ স্বরে কহিল "বড় দুঃখেই যাচ্চি আমি, তুমি আবার বিয়ে করো—প্রার্থনা সুখী হও।" সে আর বলিতে পারিল না; চক্ষু মুদ্রিত করিল। প্রাণকৃষ্ট বাবু ব্যস্ত হইয়া জানালাটা খুলিয়া দিয়া ত্বরিত বেগে যাইয়া ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। ভোরের আলো সরোজবালার বিবর্ণ ম্লান মুদ্রিত চোখে শীর্ণ ওষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বাবু নিজ কর্ত্তব্য শেষ করিয়া ব্যস্ত ভাবে বাহির হইয়া গেলেন।

প্রাণকৃষ্ট বাবু দেখিলেন তখন ওপ্রাণ বায়ু বাতাসের সঙ্গে মিশাইয়া যায় নাই। তাড়াতাড়ি একটু গঙ্গাজল পত্নীর মুখে ঢালিয়া দিলেন। মুখখানা ঈষৎ নড়িয়া উঠিল, আশান্বিত হইয়া মস্তকে বাতাস দিতে দিতে কহিল—"তোমার কি বড়ই কষ্ট হচ্চে সরোজ?" সরোজবালা চক্ষুর্ম্মীলিত করিয়া ধীরে ধীরে কহিল "না, কষ্ট নয়, এই দুঃখ রইলো তোমার স্নেহের যোগ্য কোন দিনই হ'তে পারলুম না।" আবার সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। তখন শুকতারা নিস্প্রভ হইয়া উষার আরক্ত আলোক আস্তরণের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, ভোরের পাখিগুলা জাগিয়া সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঠাণ্ডা বাতাস সরোজবালার মৃদু নিঃশ্বাসের মতই তাহাকে ঘেরিয়া ধীরে ধীরে বহিতেছিল। প্রাণকৃষ্ট বাবু কপালে হাত দিয়া দেখিলেন কপাল ঠাণ্ডা হিম হইয়া গিয়াছে। তাহারও কপাল বাহিয়া ঘাম ঝরিতেছিল, হাত পা যেন অবশ হইয়া আসিতে ছিল, মুখে কথা বাহির হইতে ছিল না। দুই বাহুর স্নেহ নিবিড় বেষ্টনে সরোজবালার মৃত দেহটাকে জড়াইয়া ধরিয়া কপোল তলে কপোল রাখিয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্যের ন্যায় ডাকিল "সরোজ" জ্ঞান হইবার পরে শুনিতে পাইল একজন প্রতিবেশী বলিতেছে "লোকটা নিশ্চয়ই পাগল

হয়ে যাবে।” সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া পার্শ ফিরিয়া শয়ন করিল এবং ভাবিল সরোজবালার এই শোচনীয় মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? সরোজবালার এই শোচনীয় পরিণাম প্রাণকৃষ্ট বাবুকে শুধু ব্যথিত করিল না অনুতাপেরও যথেষ্ট সুযোগ আনিয়া দিল। পত্নীর প্রতি যে ঠিক উচিৎ মত ব্যবহার করিতে পারে নাই আর সেই দুঃখেই যে সরোজবালাকে পলে পলে দগ্ধ করিয়া তিল তিল করিয়া তাহার শরীর ক্ষয় করিয়াছে, সেই কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রাণকৃষ্ট বাবুর মনে আজ আসিতেছিল। হায় সরোজ! তুমি ভুল বুঝিয়াই চলিয়া গেলে? যদি মুহূর্ত্তের তরেও ভাবিয়া যাইতে যে এ হৃদয়েও ভাল বাসার অভাব ছিল না। স্নেহের ফল্গুনদী এ হৃদয়ের তলে তলে প্রবাহিত থাকিয়াও তৃষিতের শুষ্ক কণ্ঠে বিন্দুমাত্র বারি দিয়াও সিক্ত করিতে পারিল না। সে অভাবে নহে শুধু অক্ষমতার দোষে। দাঁত থাকিতে লোক দাঁতের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না। প্রাণকৃষ্ট বাবু যখন মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা অনুভব করিতে ছিলেন। সরোজবালার রূপ, গুণ, ধৈর্য্য, প্রতিদিনের ঘটনা আজ তাহার মনে পড়িয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে ছিলেন। এমন সময় বৃদ্ধ মুখুজ্জে মহাশয় আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া কহিলেন “উঠে এস হে, উঠে এস, কুলিনের ঘরে আবার বৌয়ের জন্য দুঃখু—একটা গেছে দশটা আসবে।” প্রাণকৃষ্ট বাবুর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, মনে মনে ভাবিল “এমনটী আর হবে না।”

ষষ্ঠ বর্ষ, } ভাদ্র, ১৩২৫ { ৫ম সংখ্যা

বিধির বিধান

(লেখক—শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী)

১

সে বছর পূজার চা'র পাঁচ দিন আগে ভীষণ ঝড়-তুফানে নৌকাযাত্রীদের পদ্মাবক্ষে যেমন সর্ব্বনাশ করিয়া দিয়া গেল, দস্যু-সর্দ্দার আব্বাস আলিরও তেমনি পৌষের ঘটা আরম্ভ হইল। তুফান একটু কমিতেই সে দলবল লইয়া, অশান্ত নদীবক্ষে স্বচ্ছন্দে ছোট ডিঙ্গিখানা খুলিয়া দিয়া ভাসমান বাক্স, পেঁটরা, সিন্দুক, কাপড়ের গাঁইট প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে লাগিল।

চৈত্র বৈশাখে পদ্মায় অনেকবার অনেক রকম তুফানের কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু তেমন অসময়ে—দুর্গোৎসবের চার পাঁচ দিন আগে—তেমন প্রলয়-কাণ্ড আর কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া প্রাচীনেরাও স্মরণ করিতে পারেন না। পূজার ছুটিতে পূর্ব্ববঙ্গের বহু বিদেশবাসী ভদ্রলোক স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ও জিনিষপত্র লইয়া কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন। সহসা প্রচণ্ড পদ্মার বক্ষের উপরে সেই প্রলয়কাণ্ডের অভিনয়ে তাঁহাদের যে কি সর্ব্বনাশ করিয়া দিয়া গেল, তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়।

নির্ভীক দস্যুদল যখন নৌকা ভাসাইয়া দিল, তখন ঝড়-তুফান থামিলেও—নদী রণ-মুখী। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, প্রলয়ের শত চিহ্ন বহিয়া উদ্দাম বেগে ছুটিতেছিল। ভগ্নাবশেষ নৌকার অজস্র চিহ্ন, রাশি রাশি নানা প্রকারের দ্রব্য সামগ্রী এবং শত শত নর নারী ও বালক বালিকার মৃতদেহ শোলার মত সারা নদীময় বিছাইয়া ভাসিতেছিল।

আব্বাসের দল মহা উৎসাহে প্রথমতঃ কয়েকটা বাক্স, সিন্দুক উঠাইল, তার পরে মৃত নারীদেহ সকল হইতে নানা প্রকার মূল্যবান অলঙ্কারসকল

সংগ্রহ করিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে ডিঙ্গিখানা প্রায় বোঝাই হইয়া উঠিল। তখন হঠাৎ আব্বাস হাঁকিল—"বাঁয়ের ওই চড়াটায় না' ধর।"

বর্ষার পদ্মা কূল-কিনারা ভাসাইয়া ছুটিলেও, মাঝে মাঝে অনেক ছোট বড় চড়ায় জল খুব কমই থাকে। ভাগ্যবলে তেমন জায়গায় গিয়া উঠিতে পারিলে মজ্জমান লোকের আর জীবনের আশঙ্কা থাকে না।

সর্দ্দারের আদেশে তেমনি একটা চড়ায় ডিঙ্গিখানা লইয়া যাইবামাত্রেই জন দুই তিন দস্যু আশ্চর্য্য হইয়া এক সঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিল—

"ওরে অনেক গয়না—পাঁচ হাজার টাকার মাল হবে।"

অমনি পাঁচ সাত জন লাফাইয়া জলে পড়িল। সেখানে সদ্যমুদ্রিত পদ্ম ফুলটির মত একটি সুন্দরী যুবতীর দেহ চড়ায় ঠেকিয়া, অল্প জলে তরঙ্গের তাড়নায় লুটোপুটি খাইতেছিল।

তাহার সর্ব্বাঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কারের রাশি। দেখিয়া সকলে তাড়াতাড়ি করিয়া খুলিতে গেল, অমনি আব্বাস ধমক দিয়া কহিল—"খবরদার, সরে দাঁড়া।"

ধমক খাইয়া দস্যুগণ একটু সরিয়া পরস্পর চোখ টেপাটিপি করিয়া ঈষৎ হাসিল। একজন চাপা গলায় কহিল—"চেহারা দেখে সাহেব গলে গেছে রে! কিন্তু বাবা মিছে আশা, ও কখন সাবাড় হয়ে গেছে।"

ইতিমধ্যে সর্দ্দারকে নামিয়া একদৃষ্টে যুবতীর পানে আন্‌মনে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, একজন পশ্চাৎ হইতে কহিল—"আজকের দিনে একটা লাশের পিছুতে এমন করে দেরী করলে বহুৎ লোকসানি হবে সাহেব।"

আব্বাস মুখ ফিরাইয়া কহিল—"এ লাশ নয়—মরেনি, এ আমি বাজী ফেলে বলতে পারি। জলে ডোবা ঢের দেখেছি—নিশ্চয় এ বাঁচবে। তোল্ নায়ে।"

সকলে মিলিয়া তখনি ধরাধরি করিয়া যুবতীর দেহ ডিঙ্গির উপর তুলিল। তখন আব্বাস আবার কহিল—"এখনি আগুন চাই, অনেক হিকমতের দরকার, খোদার মর্জ্জিতে এ ঠিক বাঁচবে। শীগ্‌গির বেয়ে ঘরে চল।"

সেদিন তেমন লুণ্ঠনের সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া তখনি ঘরে ফিরিতে অনেকের ইচ্ছা না থাকিলেও, সর্দ্দারের আদেশ কেহ অমান্য করিতে সাহস করিল না, সংজ্ঞাহীনা যুবতীকে লইয়া দ্রুতগতিতে ডিঙ্গি বাহিয়া ঘরে ফিরিয়া চলিল।

(২)

একদিন পরে, শ্রীহট্ট জেলার "আমজোড়া" গ্রামের গোবিন্দ মজুমদার বরিশালে পাটের চালান দিয়া পদ্মাবক্ষে তেমন সর্ব্বনেশে তুফানের হাত এড়াইয়া যখন নির্ব্বিঘ্নে সুস্থ শরীরে ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন তার উৎকণ্ঠা-কাতর বুড়ী মা এবং নিঃসন্তান পত্নীর যত না আনন্দ হইয়াছিল, তার চেয়ে বেশী আনন্দ হইল—যখন সে চোরের মত সন্তর্পণে একটি সোণার চাঁদ অপোগণ্ড মৃতপ্রায় শিশুকে আনিয়া তাহাদের কোলে দিয়া চুপি চুপি কহিল—"এই নাও এবারকার ব্যাপারের মুনাফা।"

শিশুটির বয়স তিন বছরের বেশী নয়, দেখিতে রাজপুত্রের মত। জলে ডুবিয়া নিস্তেজ—মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেও, সেই পাণ্ডুর মুখের বিবর্ণতার ভিতর দিয়াই—মেঘে ঢাকা চাঁদের আলোর মত—যে স্নিগ্ধ সুষমাটুকু ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছিল, তাহা সাধারণ গৃহস্থের ঘরে দুর্ল্লভ। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া মা জিজ্ঞাসা করিল—"আহা হা, কার বাছারে ? এযে রাজপুত্তুর ! একে কোথায় পেলি বাবা ?"

গোবিন্দ একবার সচকিতে চারিদিকে চাহিয়া খাটো স্বরে আবার কহিল "কার তা কেমন করে জানবো মা ? কিন্তু বড় ঘরের যে, তাতে আর সন্দেহ নেই। এবারে রাক্ষসী পদ্মা কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করেছে তার ঠিকানা নেই—নদীর দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়, জলের উপর যেন সব ঝরা ফুল ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু আমার উপর দয়া করে যখন এ রত্নটি নিজের হাতে তুলে দেছে—তখন এ আমারই ছেলে।"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এ আমারই সাত রাজার ধন মাণিক—আর কারুর নয় !" বলিয়া তাহার সহধর্ম্মিনী বুকভরা আবেগে শিশুকে শাশুড়ীর কোল হইতে তুলিয়া লইয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিল।

দেখিয়া মা পুনরায় পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁরে তা পরে আবার কোন কিছু গোল হবে না তো ? এর পরে কিন্তু পরের হাতে তুলে দিতে হলে ও ছুঁড়ী আর বাঁচবে না।"

পুত্রের জবাব দিবার পূর্ব্বেই বধূ কহিল—"না মা, এ আমার বুকের ধন, কার সাধ্যি যে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেবে ?"

গোবিন্দ আশ্বাস দিয়া কহিল—"ভাবছ কেন মা—কে জানবে ? আমি রটিয়ে দেব—হাজার টাকা দিয়ে এক গরীব স্বজাতের ঘর থেকে কিনে

এসেছি। মাঝি মাল্লারা সব আমারই চাকর, এক তারা ছাড়া আরও কেউ জানে না—তা তাদের সব ঠিক করে ফেলেছি, টাকায় কিনা হয়?"

কথাটা ঠিক। পরদিনই গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে—মজুমদার এবার পাটের চালান দিয়া আসিবার সময়ে এক গরীব জাতির ঘরের একটি সোণার চাঁদ ছেলেকে পোষ্যপুত্র লইবার জন্য হাজার টাকা নগদ গণিয়া দিয়া কিনিয়া আনিয়াছে।

কেউ বা বিশ্বাস করিল—কেউ বা করিল না, কানাঘুসা করিতে লাগিল। কিন্তু গোবিন্দ চালাক লোক—তাহারও উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। মাস খানেক পরে ছেলেটি একটু সুস্থ সবল হইয়া উঠিলেই সে এমন ধুমধাম ঘটা করিয়া তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিল যে, পাড়ার মন্দ লোকেরাও তাহার মুক্ত-হস্ত-ব্যয়ে এবং ভূরি-ভোজনে খুসী হইয়া তাহার বিপক্ষে মুখ বন্ধ করিল।

গোবিন্দের তিন পুরুষের পৈত্রিক চালানী ব্যবসায়ে মা-লক্ষ্মী তাঁহার সোণার ঝাঁপিটি একেবারে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিলেন। জায়গা-জমী, ঘর-বাড়ী, চাকর-দাসী—কিছুরই অভাব ছিল না। অভাব যা কিছু ছিল তা কেবল একটি পুত্র-সন্তানের। এত কালের পর একেবারে নির্ব্বংশ হইয়া তাহার তিন পুরুষের সোণার রাজ্যপাট যে বরবাদ হইয়া যাইবে—এই চিন্তা-টাই তুষের আগুণের মত দিবারাত্রি দগ্ধ করিত। সুতরাং একটি সন্তান-লাভের আশায় সে যে কত খরচ করিয়া কত কি করিত তার সংখ্যা নাই।

কিন্তু যখন কিছুতেই ষষ্ঠী ঠাকরুণ আর মুখ ফিরাইলেন না এবং তাহাদের ও প্রৌঢ়াবস্থা প্রায় শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন নিরাশচিত্তে অগত্যা একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণের ইচ্ছা সকলেরই প্রবল হইয়া উঠিল। এমন সময়ে এইরূপ অসম্ভাবিতরূপে ভগবান যে তাহাদের সে বাসনা পূর্ণ করিয়া দিবেন তা তারা স্বপ্নেও ভাবে নাই।

সুতরাং ভগবানের সে করুণার দান তাহারা হৃষ্টচিত্তে মাথা পাতিয়া লইল। ক্রমে বছর খানেকের মধ্যেই বালক "রাধাবল্লভ" নামে গোবিন্দের পুত্র বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত হইয়া পড়িল।

(৩)

পূজার ছুটীতে হরনাথ বসু স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাড়ী আসিবেন বলিয়া যখন পূর্ব্বেই চিঠি লিখিয়া দিলেন, তখন সে চিঠি পাইয়া তাঁহার বিধবা জননী ও

ভগ্নীর প্রাণে আনন্দের শতধারা ছুটিল। পনের-কুড়ি দিন আগে হইতেই এই দুইটি বিধবাতে মিলিয়া তাহাদের হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ যত্ন ঢালিয়া দিবা-রাত্রি অকাতর পরিশ্রমে নানাবিধ খাবার দাবার প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

বাস্তবিকই সম্বৎসর পরে এইরূপ প্রিয়-সমাগমের প্রত্যাশাতেই বাঙ্গালীর গৃহে একটা আনন্দময় নবজীবনের সূচনা জাগিয়া উঠে বলিয়াই বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা অতুলনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহোৎসব।

কিন্তু সে বৎসর সেই আনন্দময় দুর্গোৎসবে পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থানেই যেরূপ পাষাণভেদী হাহাকার ও রোদনের রোল উঠিয়াছিল তাহাতে দুর্গোৎসবকে শ্মশানোৎসবে পরিণত করিয়া দিয়াছিল। বিশেষতঃ বিক্রমপুরের তো কথাই নাই।

এখানকার প্রায় পনের আনারও বেশী ভদ্রলোক বিদেশবাসী চাকরী-জীবি। তাঁহাদের অধিকাংশই আবার কর্ম্মস্থানে স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করেন, বৎসরান্তে পূজার ছুটিতে একবার করিয়া গৃহে যান। দেশের বাড়ীতে, বৃদ্ধা জননী, অনাথা ভগ্নী বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনগণ থাকেন। হরনাথের গৃহেও তেমনি তাঁহার বিধবা মা-বোন থাকিতেন, তিনি নিজে কর্ম্মস্থানে প্রায়ই সস্ত্রীক বাস করিতেন এবং বছরে একবার কি বড় জোর দুইবার—বেশী দিন ছুটী পাইলে সকলকে লইয়া দেশে গিয়া বেড়াইয়া আসিতেন।

হরনাথ বাখরগঞ্জে ওকালতি করিয়া উপার্জ্জনও করিতেন যথেষ্ট, সুতরাং দেশের ঘর বাড়ী বড় মানুষেরই মত এবং মা-বোন ছাড়া সেখানে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং লোকজনেরও অভাব ছিল না।

দুর্গাপূজা কাছাইয়া আসিয়াছে, হরনাথের গৃহেও তাঁহার স-পরিবারে প্রত্যাগমনের আশায় আনন্দের ধূম পড়িয়া গেছে, কিন্তু সহসা তাঁহাদের সে আনন্দের ভাতি ম্লান করিয়া দিয়া সকলেরই মুখে একটা উৎকণ্ঠার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। চতুর্থীর দিন সন্ধ্যাবেলায় হরনাথের বৃদ্ধা মাতা মালা জপিতে জপিতে বুড়া গোমস্তাকে ডাকিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ বাবা নিতাইচরণ, আকাশের গতিক যে ক্রমেই খারাপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাবা কি হবে ?"

নিতাইচরণ অনেক দিনের লোক—বাড়ীর ছেলেপুলের মত, অনেক সময়ে সে কর্ত্রীর উপর জোর করিয়াও কথা কহিত। আশ্বাস দিয়া কহিল—"ভয় কি মা, পূজোর সময়ে মহামায়ী কি এমনটাই করবেন ? এ দুর্য্যোগ সকালেই কেটে যাবে।"

"আহা তাই বল বাবা। এ সময়ে সবাই বিদেশ থেকে মাগ্-ছেলে জিনিষ পত্তর নিয়ে ঘরে আস্‌ছে—পদ্মার মাঝখানে এই তুফানে পড়লে কি আর রক্ষা থাকবে?"

"কিছু ভয় নেই মা—তোমরা খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে শোও গিয়ে, আকাশ ছেড়ে যাবে।"

নিতাইচরণ ভরসা দিল বটে কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখিয়া নিজের মনে ভরসা বাঁধিতে পারিল না। দুর্য্যোগও থামিল না—বরং পরদিন সকাল হইতে বেগ আরও প্রবল হইতে লাগিল।

পদ্মার তীর হইতে ক্রোশ দুই দূরে একটা নদীর তীরবর্ত্তী একখানি গ্রামে হরনাথের বাস। বর্ষাকালে সেই নদী দুই কুল ছাপাইয়া গাঁয়ের ক্ষেত, খামার, পথ ঘাট ডুবাইয়া অনেকের ভিটার পাশ দিয়া উঠানের উপর দিয়া থৈ থৈ করিয়া বহিলেও শীতকালে তাহাতে এক কোমরের বেশী জল থাকিত না। সুতরাং এখানকার লোকেরাও তাহাতে অভ্যস্ত। বর্ষাকালে ঘরে ঘরে নৌকা—ছোট ছোট ছেলেরা, এমন কি ছোট ঘরের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত অবাধে নৌকা বাহিয়া এখানে-সেখানে যাতায়াত করে, সুতরাং জলের ভয় কাহারই নাই।

কিন্তু সেবার সেই চতুর্থীর রাত্রি হইতে তুফানের বেগে যখন তাহাতে প্রবল তরঙ্গ উঠিয়া লোকের ঘরে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল এবং দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইলেও পদ্মার ভীষণ গর্জ্জন শত শত কামান গর্জ্জনের মত সারারাত ধরিয়া গ্রামের উপর দিয়া বহিয়া গেল, তখন পঞ্চমীর সকাল বেলায় গ্রামবাসী সকলেরই মুখ দারুণ উৎকণ্ঠা ও ভয়ে পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিল। সেই গ্রামের ভিতরেই যখন তুফানের এমন প্রতাপ, তখন, নাজানি পদ্মায় কি প্রলয়ের অভিনয় চলিতেছিল?

পঞ্চমীর দিন সারাদিন ধরিয়া দুর্য্যোগ সমানভাবে থাকিয়া সন্ধ্যার সময়ে যেন অল্প একটু কমিয়া আসিল। সেদিন মহা আতঙ্কে গ্রামের কাহারও বাড়ীতে বড় একটা হাঁড়ী চড়িল না—সকলেই নিজ-নিজ আত্মীয় স্বজনের ভাবনায় আকুল—তাহারা সবাই বিদেশ হইতে ঘরে আসিতেছে, নাজানি পদ্মায় কার কি সর্ব্বনাশ ঘটিল!"

হরনাথের জননী ও ভগ্নি সারাদিন উপবাসে থাকিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে ক্রমাগত ঠাকুর দেবতাকে ডাকিতেছিলেন। বিকালে আর থাকিতে

পারিলেন না। বুড়ী পাগলিনীর মত হইয়া নিতাইচরণের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন—"হাঁ৷ বাবা নিতাই, হরনাথের ষষ্ঠীর দিন এসে পৌছুবার কথা না?"

নিতাই একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—"হাঁ৷ মা, তেমনিই তো চিঠিতে লেখা ছিল।"

ীর দিন না বেরুলে তো ষষ্ঠীর দিন এসে পৌছুতে পারে না। তা হলে—"

বৃদ্ধা আর বলিতে পারিলেন না, উচ্ছ্বসিত অশ্রুর আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। নিতাইচরণ আশ্বাস দিয়া কহিল—"দুর্য্যোগ দেখে কর্ত্তা কখনই বেরোবেন না, বিশেষ যখন স্ত্রী-পুত্র জিনিষ পত্তর নিয়ে বরাবর নৌকায় আসবার কথা।"

"আর যদি বেরোবার পরে তুফান আরম্ভ হয়ে থাকে?" বলিয়া বৃদ্ধা আবার হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। নিতাই ধমক দিয়া কহিল—"আগে থাকতে কেঁদে অমন করে অকল্যাণ ডেকে আনবেন না, তার চেয়ে ঠাকুর ঘরে বসে দেবতাদের কাছে মাথা খুঁড়ুন গিয়ে।"

পরদিন সন্ধ্যার সময় হরনাথ ছিন্ন, সিক্ত এক বস্ত্রে পাগলের মত গৃহে আসিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন—"মা গো, তোমার সর্ব্বস্ব সর্ব্বনাশী পদ্মার গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়ে এলুম। তোমার বউ গেছে, নলিনী গেছে, হরিদাস গেছে, রাক্ষসী সবাইকে পেটে পুরে কেবল আমাকেই একা উগ্‌রে দেছে।"

বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

(৪)

মাস দুই পরে ফরিদপুর জেলার কামারপাড়া গ্রামে এক ভয়ানক ডাকাতী হইয়া সে অঞ্চলের সমস্ত পুলিশকে জাগ্রত করিয়া তুলিল। জেলা হইতে খোদ পুলিশ সাহেব পর্য্যন্ত আসিয়া দেশময় মহা হৈ চৈ বাধাইয়া দিলেন। চারিদিকে অন্বেষণ এবং ধর-পাকড়ের ধূম পড়িয়া গেল।

পদ্মা-তীরবর্ত্তী একটা থানার বড় দারোগা হরিশবাবু সন্ধ্যার পরে থানা হইতে একাকী বাহির হইয়া বাসার দিকে চলিয়াছিলেন, এমন সময়ে রহিমবক্স সেই নির্জ্জন পথের ধারে একটা গাছের আড়াল হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া সুমুখে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

রহিম পুরাতন দাগী—ডাকাতী মোকদ্দমার আসামী হইয়া দুইবার জেল

খাটিয়া আসিয়াছিল, সুতরাং স্থানীয় পুলিশের সকলেই তাহাকে চিনিত। হরিশবাবু মনে মনে ঈষৎ ভীত হইয়া কহিলেন—"কি রহিম এমন সময়ে হঠাৎ এমন ভাবে এখানে কেন?"

"হুজুরের কাছেই বিশেষ দরকারে।" বলিয়া রহিম একবার সচকিতে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল।

সন্দেহে সন্দেহে দারোগা বাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"কেন বল দেখি, কি ব্যাপার?"

"আগে আল্লার কিরে জবান দিন যে আমাকে বাঁচাবেন, আমি ভারি একটা কাণ্ডের সন্ধান দিতে এসেছি।"

হরিশবাবু একটু ভাবিয়া জবাব দিলেন—"আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করছি, যদি তোমার বিশেষ কোন গুরুতর অপরাধ না থাকে, আমি যথাসাধ্য তোমায় রক্ষা করবার চেষ্টা করবো।'

"তবে শীগ্‌গির এক বড় ঘরের হিঁদুর মেয়েকে রক্ষা করবেন চলুন। বেশী লোক চাই—একেবারে চারদিক বেড় দিতে হবে। কামারপাড়ার ডাকাতির মালও পাবেন আর সঙ্গে সঙ্গে এই দু' মোকদ্দমার আসামীদেরও গ্রেপ্তার করতে পারবেন।"

"কোথায় কি হয়েছে, কে আসামী সব কথা ভেঙ্গে বল।" হরিশবাবু ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিলেন।

রহিম আবার একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া খুব নীচু স্বরে কহিল—"এবার পূজোর আগে তুফানে পদ্মায় যখন বহুৎ লোকের সর্ব্বনাশ করে দেয়, তখন আব্বাস আলির সঙ্গে আমরা সবাই ভাসা-মাল ধরবার জন্যে বেরিয়েছিলুম। সেই সময়ে এক গা গহনাভরা এক বড়মানুষের ঘরের বৌকে একটা চরের উপর অজ্ঞান অবস্থায় পেয়ে আমরা ডিঙ্গিতে তুলে নিয়ে আসি—নৌকার উপরেই তার একটু একটু জ্ঞান হচ্ছিল। আব্বাস তাকে নিজের ঘরে নিয়ে তুল্লে। আব্বাসের মায়ের তদবিরে দু-এক দিনের ভিতরেই মেয়ে মানুষটি সেরে উঠ্‌ল।"

হরিশবাবু কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারপর, তারপর, কার ঘরের বৌ—কি হল তার?"

"সেই কথাই তো হুজুরকে কইতে এসেছি—আজ তার সর্ব্বনাশ হতে চলেছে, রক্ষা করতে চান তো শীগ্‌গির চলুন।"

"তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে সব ব্যাপারখানা খুলে বল—কোথায় সে এখন ?"

"আব্বাসের খপ্পরে। সেরে উঠে, মেয়ে মানুষটি কেঁদে কেটে ভারি সোর গোল লাগিয়ে দেয়। বিক্রমপুরে ঘর, পদ্মায় তার ছেলে মেয়ে, খসম সব তুফানে পড়ে কে যে কোথায় ভেসে গেছে, ঠিকানা নেই। বেঁচে আছে কি না তাই বা কে জানে ? সে তো একেবারে পাগলের মত হয়ে উঠে।"

'থানায় খবর দিয়ে জিম্মা করে দেয়নি কেন, তা হ'লে তো এতদিনে একটা হদিস পাওয়া যেত।"

"সেই তো আসল কথা। আব্বাসের তো মতলব তা নয়, সে জোর করে তাকে নিকা করবে বলে ঘরে আট্‌কে রেখেছে, কেবল তার মায়ের জন্যে এতদিন পারেনি। এদিকে সে বেচারা একেবারে অন্ন জল ছেড়ে তো মড়ার মত হয়েছে—ভাল হিঁদুর ঘরের মেয়ে আমাদের মুসলমানের ঘরে খাবেই বা কেন ? কেবল আব্বাসের মা দিনরাত কাছে কাছে থেকে, নানা রকমে ভরসা দিয়ে বুঝিয়ে একটু একটু কাঁচা দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। মায়ের ডরে কিছু করতে না পেরে সয়তান আব্বাস তাকে ঘরে পৌঁছে দেবার ছল করে আজ সেখান থেকে ভাঙ্গার চরে নাজিমের ঘরে এনে আট্‌কে ফেলেছে। এই রাতেই জোর করে নিকা করে তার সর্ব্বনাশ করবে।"

"বটে ?" বলিয়া হরিশবাবু বিষম ক্রোধের ভরে একবার ঠোঁট কামড়াইলেন, তারপরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কামারপাড়ার ডাকাতির কথা কি বল্‌ছিলে ?"

"হুজুর তার আর বেশী বলব কি, নাজিমের গোয়াল ঘরের ভিতরটা খুঁড়্‌লেই অনেক মাল দেখ্‌তে পাবেন—গহনার কতক 'নারাণগঞ্জের' পিয়ারী পোদ্দারের ঘরে—বাকী 'নারসের' গোলাম চৌধুরীর হাতে গেছে।"

"এও তবে তোরাই করেছিস্ ?"

"সবই যখন কবুল দিলুম, তখন আর মিথ্যা কইবো না—আমিও ওই হারামীর দলে ছিলুম—তবে—আল্লার কিরে—এখন ফাঁক হয়েছি।"

"কেন, বখরায় কম মিলেছে বুঝি ?" বলিয়া হরিশবাবু একটু শ্লেষের হাসি হাসিলেন।

"না হুজুর—দোহাই খোদার! জানিনা—আপনাদের হিঁদুর ঘরের সতী

মেয়েদের কি গুণ আছে! রূপ দেখে প্রথমে আব্বাসের মত আমিও পাগল হয়েছিলুম, হাতাবার চেষ্টায় ছিলুম। কিন্তু—কিন্তু সতীমায়ের ভাব দেখে আর কান্না শুনে আমার ভিতরের ময়লাগুলো সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—আমি বিলকুল বদলে গেছি। সয়তানের হাত থেকে মাকে আমার উদ্ধার করে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্যে জান কবুল করেছি। এখন আপনার দয়া—আমায় রাখ্‌তে হয় রাখুন জেলে দিতে হয় দিন, কিন্তু মাকে আমার রক্ষা করুন—মাকে আমার রক্ষা করুন।"

রহিমের মুখখানা হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হইয়া চোখ দুটো জলে ভরিয়া আসিল, দেখিয়া হরিশবাবু আশ্চর্য্য হইলেন, দৃঢ়স্বরে কহিলেন—"তোমার কোন ভয় নাই রহিম, আমি নিশ্চয় তোমায় বাঁচিয়ে দেব। কিন্তু এ কথা মনে রেখো—জীবনে আর কখনো অসৎপথে যেওনা। এখন আর দেরী নয়—চল আমার সঙ্গে।"

দারোগা বাবুর আর বাসায় যাওয়া হইল না, তখনি থানায় ফিরিয়া আসিয়া যথোচিত বল সংগ্রহ করিয়া লইয়া দ্রুতগতি "ভাঙ্গার চরের" দিকে চলিলেন।

সতীর সহায়—মা সতীরাণী! দুরাত্মা আব্বাসের কবলে পড়িয়া পতিপুত্র-হারা অভাগিনীর যখন শেষ সর্ব্বনাশ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হরিশবাবু আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিলেন, সমস্ত দলবলসহ আব্বাসকে বাঁধিয়া থানায় লইয়া চলিলেন।

(৫)

দশবছর পরের কথা। বিকাল বেলা কাছারী হইতে ঘরে ফিরিয়া হরনাথ যখন দেখিলেন যে কমলা তাঁহার কথা ঠেলিয়া জগবন্ধু সরকারের ভাই-পো বালক রাধাবল্লভকে কাছে বসাইয়া ছেলের মত আদর করিয়া খাওয়াইতেছেন তখন মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

রাত্রে শুইতে আসিয়া পত্নীকে কহিলেন—"আর কেন কমলা? তোমায় এত করে মানা করি—তুমি কি কিছুতে মান্‌বে না? কে কোথাকার পরের ছেলে—তাদের নিয়ে এত আদর-ওপিক্ষে করে শেষটা কি আবার মায়ায় জড়িয়ে কেঁদে মরবে? আমি কাল থেকে আর কোন ব্যাটাকে বাড়ী ঢুকতে দেব না।"

কমলা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—রুদ্ধকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—

"আর কাউকে না আসতে দেও—রাধাবল্লভকে কিছু বলোনা, তোমার দুটি পায়ে পড়ছি গো।"

পদতলে পতনোন্মুখ পত্নীকে দুই হাতে ধরিয়া তুলিয়া পাশে বসাইয়া কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন বল দেখি, রাধাবল্লভ তোমার কে?"

"ওগো, ও যে আমার ঠিক সেই হতভাগার মত, এতদিন থাকলে ঠিক অমনিতরই যে হত গো?" বলিয়া কমলা আবার ফোঁপাইতে লাগিলেন।

ছোট একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বড় দুঃখে ঈষৎ হাসিয়া হরনাথ জবাব করিলেন—"ভুল কমলা, সব ভুল—এ সংসারটাই মস্ত ভুলের ব্যাপার, এই ভুলে ডুবে যত ভুলে থাকতে পারা যায়, ততই মঙ্গল। আর কেন, সে সব ভুলে যাও—অতীত মুছে ফেল, আমাদের কেউ কখনো হয়নি—কেউ কখনো ছিলনা ভাব, নইলে উপায় নেই। ভগবানের যদি সেই ইচ্ছাই থাকবে, তবে আমাদের মাথায় এমন বাজ পড়বে কেন? পাঁচ বছরের করে নলিনীকে—তিন বছরেরটি করে হরিদাসকে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও এক দিনে—এক সময়ে—এক লহমায় রাক্ষসী পদ্মার পেটে বিসর্জ্জন দেব কেন? আমিত তোমারও আশা করিনি। কেবল বুড়ো মা-বোনের পুণ্যির জোরে পাগল হয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়িনি বৈ তো নয়। নইলে আমার তখন কি অবস্থা—দু-তিনটে মাস কেমন করে যে কেটেছিল, ভাবতে পার কি? তবু দয়াময়ের খুব দয়া বলতে হবে যে হরিশ সে সময়ে ফরিদপুরে ছিল, এক রাক্ষসীর পেট থেকে বেঁচে যখন আর এক সয়তানের হাতে পড়েছিলে—তখন সেই অকপট বাল্যবন্ধু আমার, তোমাকে উদ্ধার করে আমাকে নবজীবন দান করেছিল। যদি ভাগ্যে থাকতো—তবে এই দশ বছরের ভিতরে তাদের ও কি এমনি করে ফিরে পেতুম না?"

কমলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন—"ওগো মন বোঝে না যে! যেদিন থেকে এই ছোঁড়াকে দেখেছি সে দিন থেকে এই তুষের আগুন আবার জ্বলে উঠেছে—কিছুতে আর ভুলতে পারছিনি। আমার হরিদাসের মুখখানি যেন কেটে এনে বসিয়ে দেছে। তুমি একদিন ছোঁড়াকে কাছে বসিয়ে ভাল করে দেখ—তারপর পার যদি আমায় ভুলতে বলো!"

"সাধে বলি? আমি কি খোঁজ না নিয়েছি ভাব? সীলেটে বাড়ী, নীচ কায়েত, দোকানী-পশারী ব্যবসাদারের ছেলে। এখানে এক জ্ঞাতি খুড়োর আড়ত আছে, দেশে তেমন ভাল ইস্কুল নেই বলে তার কাছে থেকে পড়তে

এসেছে। দুদিন বাদে একজামিনটা হয়ে গেলে দেশে গিয়ে বাপের কারবারে লেগে যাবে—এখানকার সম্পর্কও ফুরুবে। তখন সে তোমার জ্বালার উপর জ্বালা আরো বাড়্‌বে কমলা ?"

হরনাথ পত্নীকে প্রবোধ দিলেন বটে, কিন্তু নিজের বুকের মাঝখানটাতে যে কেমন একটা অজ্ঞাত বেদনা আঘাত করিতেছিল—সেটাকে আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। সহসা উচ্ছ্বসিত আবেগে পত্নীর গলা ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কমলা, কমলা—ওঃ!"

(৬)

মাতুলালয়ে প্রতিপালিত পিতৃ-মাতৃহীন বিজয়েন্দু যখন ভবিষ্যতের উচ্চাশা বুকে বাঁধিয়া কোটালপাড়ার জমীদার নবীন বোসের একমাত্র তনয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে বধূর হৃদয়ের মাঝখানে কোন একটা স্থানে ভগবান এমন একটু ঠুক করিয়া ঘা দিয়া ক্ষত করিয়া রাখিয়াছেন—যাহা সারা জীবনেও শুকাইবার নহে।

বিবাহের পর হইতে তিনি বরাবর শ্বশুর বাড়ীতে থাকিয়াই এম-এ পাশ করিয়া শ্বশুরের চেষ্টাতেই ডেপুটিগিরি পাইয়াছেন বটে, কিন্তু দাম্পত্য ব্যাপারে তেমন উচ্চাসনের অধিকারী হইতে পারেন নাই। জমীদারের একমাত্র সন্তান বলিয়া তাঁহার স্ত্রী যে মুখরা, অহঙ্কারী, স্নেহহীনা বা স্বামীর প্রতি অযত্নবতী তা নয়, বরং যে যে গুণে স্ত্রীলোককে আদর্শ রমণীরত্ন বলিয়া আখ্যা দেয়—সে সকলই প্রচুর পরিমাণে তাহাতে বিদ্যমান ছিল, তবু কেমন বরাতের ফের—যে জিনিষটায় তাঁহাদের দাম্পত্য সুখের পথে পাঁচীলের মত একটা আড়াল তুলিয়া দিয়াছিল—সেটা তাহার প্রফুল্লতা-হীনতা এবং সংসারে একেবারে স্পৃহাশূন্যতা।

উপড়াইয়া ফেলা লতাটিকে আবার রোপন করিয়া নিত্য জলসেক করিলেও তার নুয়ে-পড়া পাতাগুলি যেমন শীঘ্র আর সজীব হইয়া উঠিতে চাহে না এই পত্নীটিকেও তেমনি স্বামী অগাধ স্নেহে বুকে তুলিয়া লইলেও তার প্রফুল্লতার বিশেষ কোন লক্ষণই দেখা যাইত না। নিতান্ত প্রাণশূন্য কলের পুতুলের মত সে আপনার সাংসারিক কর্ত্তব্যসকল সম্পন্ন করিয়া যাইত মাত্র।

বিজয়েন্দু ডেপুটী হইয়া বিদেশে বিদেশে নানা স্থানে অনেকবার তাহাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়াছেন। কিন্তু স্বাধীন সংসারের একমাত্র গৃহকর্ত্রী হইয়াও

তার স্বভাব বদলায় নাই—বিজয়েন্দুর যা কিছু মনক্ষোভ কেবল সেই জন্য। অবশেষে গর্ভবতী পত্নীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া তিনি বাখরগঞ্জে বদলী হইয়া আসিয়া হরনাথের বাসার গায়েই বাসা ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলেন।

হরনাথের সহিত বিজয়ের বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও, এই দুইটি ব্যথিত চিত্ত নবীন ও প্রবীনে বেশ একটু বন্ধুত্বের গাঢ় সদ্ভাব স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। গৃহলক্ষ্মী শূন্য বাসায় যত্ন-আত্মিত্যি এবং খাবার দাবার কষ্ট বলিয়া হরনাথ নূতন ডেপুটীকে প্রায়ই যখন তখন আপনার বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া খাওয়াইতেন। এই উপলক্ষে কমলারও তাঁহার উপর এমন একটু স্নেহ জন্মিয়া গিয়াছিল যে লজ্জা সরম ছাড়িয়া মায়ের মত কাছে বাসয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন। বিজয়েন্দুও 'মা' বলিয়া ডাকিয়া তাঁহার স্নেহের প্রতিদান করিতে ছাড়িতেন না।

সেদিন রাত্রে সেই রকম কাছে বসিয়া খাওয়াইতে খাওয়াইতে কমলা বিজয়কে কহিলেন—"হ্যাঁ বাবা, খোকাতো চার মাসের হ'ল, এইবার বৌমাকে এখানে আন না কেন? আমাদের বড় দেখতে ইচ্ছা করে।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিজয়েন্দু কহিলেন—"কি আর দেখবেন মা, সে যে কি তা আমি এতদিনেও বুঝলুম না। ঠিক যেন একটা কলের পুতুল—প্রাণ আছে কিনা বোঝবার জো নেই। তাকে নিয়ে কি করে সংসার চলবে আমি খালি তাই ভাবি মা। বিশেষ; শ্বশুর মশাই মারা যাবার পর থেকে যেন আরও জবুথবু হয়ে পড়েছে। তাই ভাবি সে যত তফাতে থাকে সেই ভাল।"

"সে কি কথা বাবা—মানুষ তো? তুমি আনাও তাকে—আমি একবার বুঝে দেখি। এই তো একবাড়ী বল্লেই হয়—তোমার সংসারের ভাবনা কিছু নেই—আমি সব গুছিয়ে দেব। আনাও তাকে—আমি আর একলা থাকতে পারিনি।"

বলিতে বলিতে গলা ভারি হইয়া চক্ষু সজল হইয়া আসিল। কোনমতে সামলাইয়া লইয়া কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন। কিন্তু বিজয়েন্দুর কাছে মনের ভাব লুকাইতে পারিলেন না—সেই বেদনায় অদৃশ্য তাঁহার মনেও আঘাত দিল। তিনি চকিতে একবার আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়াই মুখ নীচু করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

পরদিনই বিজয়েন্দু, পত্নীকে পাঠাইয়া দিবার জন্য শাশুড়ীর কাছে টেলিগ্রাফ করিলেন।

(৭)

সেই দিনের পর হইতে হরনাথেরও মনের ভাব আপনাআপনি বদলাইয়া রাধাবল্লভের উপর যে কেমন করিয়া একটা টান জন্মিয়াছিল, তা তিনি নিজে বুঝিতে না পারিলেও—পাড়ার আর পাঁচজন লোক পারিয়াছিল, এবং রাধাবল্লভের খুড়াও তা বেশ টের পাইল সেইদিন, যেদিন তার গদীতে হঠাৎ একজন কর্ম্মচারীর বসন্ত হইলে, হরনাথ তাড়াতাড়ি আসিয়া কহিল—"ওহে সরকার মশাই, তোমার এখানে কার বসন্ত হয়েছে শুনছি না ?"

হরনাথ বড়মানুষ—সেখানকার একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক, সকলেই চিনিত। বিশেষ তাঁহার দুর্ভাগ্যের পর হইতে সকলেরই একটা অযাচিত সহানুভূতি পড়িয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

তাঁহাকে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া গৌর সরকার সসম্ভ্রমে বসিবার আদেশ দিয়া কহিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, পরশু একজনের দেখা দিয়েছে, আজও আবার একজনের খুব জ্বর হয়েছে। কে জানে—কার মনে কি আছে ?"

হরনাথ উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন—"সর্ব্বনাশ, তা'হলে রাধাবল্লভকে আর তো এখানে রাখা উচিত হয় না।"

"আজ্ঞে, তাইতো ভাবছিলুম—পরের ছেলে, তায় আবার তার বাপের কুড়িয়ে পাওয়া—" বলিয়াই হঠাৎ অপ্রস্তুত হইয়া সামলাইয়া লইয়া ঢোক গিলিয়া কহিল—"আজ্ঞে এই অনেক টাকায় কেনা বুকের পাঁজরার মত।"

হরনাথের বুকের ভিতরটা একবার ধড়াস্ করিয়া উঠিল, কিন্তু অত লোকের সামনে আর কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তখনকার মত বালককে সঙ্গে করিয়া নিজ বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। বলিয়া আসিলেন সে ব্যারাম একেবারে না সারিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত সে তাঁহার বাড়ীতেই থাকিবে। গৌর সরকারও তেমনতর ছোঁয়াচে ব্যারামের সময়ে পরের ছেলের ভার পরের ঘাড়ের উপর বিনা চেষ্টায় চাপাইবার তেমন সুবিধা পাইয়া আর অমত করিল না।

কিন্তু তখন হইতে হরনাথের মনে গৌর সরকারের সেই কথাটা অনবরতঃ জাগিতে লাগিল। দিন দশেক পরে হঠাৎ একদিন নিদ্রিত বালকের পৃষ্ঠদেশে

একটা ক্ষত চিহ্ন দেখিতে পাইয়া একটুখানি বিমনা হইয়া কি ভাবিলেন, তারপর আস্তে আস্তে তার ডান হাত খানি তুলিয়া দেখিয়াই একটু অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বালকের ডান হাতের কনুয়ের উপরে—ভিতর দিকে কাল উল্‌কির চিহ্নে একটি ইংরাজী 'এইচ্' (H) অঙ্কিত ছিল। আস্তে আস্তে হাতখানি নামাইয়া রাখিয়া হরনাথ তাড়াতাড়ি বিজয়েন্দুর নিকটে গেলেন।

দুই জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া গোপনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাহার ফলে ডেপুটিবাবু তৎক্ষণাৎ আরদালি পাঠাইয়া গৌর সরকারকে ডাকাইয়া আনিলেন।

অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনজনে বসিয়া বিস্তর কথাবার্ত্তার পর যখন সরকার বিদায় হইল, তখন হরনাথের মুখমণ্ডলে একটা অদম্য আনন্দের ভাতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

(৮)

আজ আর কমলার বিশ্রাম নাই। বিজয়েন্দুবাবুর পত্নী আসিবে বলিয়া তিনি সারাদিন ধরিয়া তাঁহার সংসার হাজার রকমে গুছাইয়া দিতেছেন।

বিকাল বেলা সদরে গাড়ীর শব্দ পাইবামাত্র কমলা তাড়াতাড়ি 'বৌ-মাকে' আগু বাড়াইয়া আনিবার জন্য অন্তঃপুরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্ষণপরেই একটি কচি ছেলেকে দুই হাতে বুকে লইয়া লম্বা ঘোমটায় শিশুর প্রায় আধখানা ঢাকিয়া একটি যুবতী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। দেখিয়াই কমলার বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন ধড়ফড়্ করিয়া উঠিল। "এস, মা ঘরের লক্ষ্মী এস বলিয়া তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বৌয়ের কোল হইতে শিশুকে লইতে গেলেন। সেই সময়ে বৌয়ের মাথার উপর হইতে বারানসী ওড়নার ঘোম্‌টা খসিয়া পড়িল। তার কপালে যুগল ভ্রূর মাঝ-খানে টিপের মত একটা বড় তিল, মুখখানির শোভা যেন শতগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিল।

কমলা চমকাইয়া উঠিলেন, মুখ হইতে একটা অস্ফুট চীৎকার বাহির হইল। ক্ষণকাল কাঠের পুতুলের মত নির্ণিমেষ-নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া "মা, মা, নলি—আমার হারানিধি" বলিয়া উচ্চ চীৎকার করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বধূও এক দৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিল। তাড়াতাড়ি বুকের ছেলেকে ওড়না

জড়াইয়া সেইখানে নামাইয়া রাখিয়া মূর্চ্ছিত কমলার বুকের উপর পড়িয়া "মা, মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হরনাথ এবং বিজয়েন্দু দু'জনেই বাহির বাটীতে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ চীৎকার এবং ক্রন্দন শুনিয়া তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়া দেখিলেন—অপূর্ব্ব সংঘটন! সন্ধ্যার পরে ঘুমন্ত খোকার পাশে মায়ে-ঝিয়ে বসিয়া যখন হাজার রকমের কথা কহিতে কহিতে একবার হাসিতেছিল—একবার কাঁদিতেছিল, তখন ধীরে ধীরে হরনাথ ও বিজয়েন্দু রাধাবল্লভকে লইয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিয়াই কমলার চোখের জল আবার শত ধারায় উথলিয়া উঠিল। মুছিতে মুছিতে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—

"একটিকে পেলুম, আজ যদি আমার সেটিকেও পেতাম?"

হরনাথ উচ্ছ্বসিত আনন্দের ভরে জবাব দিলেন—"সেটিকেও কি সত্যই ফিরিয়ে চাও কমলা?"

কমলা নির্ব্বাক হইয়া বিস্ফারিত চক্ষে স্বামীর পানে চাহিলেন।

"তবে এই নেও কমলা, আমাদের সেই হারানো মাণিক।" বলিয়া রাধাবল্লভকে পত্নীর কোলের উপর বসাইয়া দিয়া আবার কহিলেন—"সত্যিকার চাওয়া কখনো নিষ্ফল হয় না, তার সাক্ষী দেখ ভগবানের এই অপার দয়া।"

একদিনের এই আশ্চর্য্য ঘটনায় সে পত্নীর পূর্ব্ব স্বভাব একেবারে বদলাইয়া সম্পূর্ণ নূতন—আনন্দময়, লীলাচঞ্চল করিয়া দিয়া গেল, তাহাতে ডেপুটিবাবু যেমন প্রাণ খুলিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন, তেমন আর জীবনে কখনও দেন নাই।

বিপ্লব

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হরিচরণের দৌত্য

হরিচরণ পিসীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ডাক্তারখানায় গেল না, ভিন্ন পথে ভট্‌চাজ্যি পাড়ায় চলিয়া শৈলদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। শৈল তখন গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত ছিল, কাত্যায়নী ঘরের দাবায় পিঁড়া ঠেশান দিয়া বসিয়া মালা ঘুরাইতেছিলেন। হরিচরণকে দেখিয়া তিনি সোজা হইয়া বসিলেন, এবং "এস বাবা এস" বলিয়া নিকটস্থ ছোট পিঁড়াখানা একটু ঠেলিয়া দিলেন। হরিচরণ আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কেমন আছেন ?"

সহাস্যে কাত্যায়নী বলিলেন, "আজ অনেকটা ভাল আছি। আমাদের আর থাকাথাকি বাবা, যেতে পারলেই হয়।"

বিজ্ঞের ন্যায় মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে হরিচরণ বলিল, "অমন কথা বলবেন না। যেতে তো একদিন হবেই, তবে যে ক'দিন থাকতে পারা যায়, সেই ক'দিনই লাভ।"

কাত্যায়নী বলিলেন. "আমাদের এখন লাভের পালা নয় বাবা, লোকসানের পালা।"

হরিচরণ বলিল, "লোকসান হ'লেও তা সয়ে থাকতে হবে। ধরুনন। আপনি গেলে মেয়েটী দাঁড়াবে কোথায় ?"

বিষাদগম্ভীর স্বরে কাত্যায়নী বলিলেন, "মেয়েটাই হ'য়েছে আমার পায়ের বেড়ী। ওর তরে আমার মরণেও শোয়াস্তি নাই।"

হরিচরণ একটু ঝাঁকিয়া বসিয়া বলিল, "সে কথা ঠিক। অত বড় মেয়ে আইবুড়, আমাদের গাঁয়ে হ'লে এত দিন মুখ দেখাবার যো থাকত না।"

কাত্যায়নী একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। হরিচরণ মুখ তুলিয়া কাত্যায়নীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি রকম পাত্র চান ?"

কাত্যায়নী দুঃখ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আর রকম সকম চাই না বাবা, যা হয় একটা পাওয়া গেলে মেয়েটার গতি করে দিই।"

পাশের ঘরের দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হরিচরণ বলিল, "তা হ'লেও ধরুন, যার তার হাতে দেওয়া চলে না। আপনার এমন চমৎকার মেয়ে, এত রূপ!"

বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে কাত্যায়নী বলিলেন, "ছাই রূপ! অমনতর কপাল নিয়েও মেয়ে মানুষ জন্মে?"

কাত্যায়নী মুখ ফিরাইয়া লইলেন। হরিচরণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আর তা হ'লে অসুখ কিছু জানতে পারেন নি?"

কাত্যা। না, তবে উঠে দাঁড়ালেই মাথাটা যেন ঘুরে পড়ে।

হরি। ওষুধ খেয়ে খেয়ে মাথা গরম হ'য়ে গেছে।

কাত্যা। কিন্তু পরেশ তো তবু ওষুধ খাওয়াতে ছাড়বে না!

একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া হরিচরণ বলিল, "ডাক্তারদের ঐ একটা রোগ, বিশেষ নূতন ডাক্তারদের। রোগীকে সহজে হাতছাড়া কত্তে চায় না।"

কাত্যায়নী কোন উত্তর করিলেন না। হরিচরণ বলিতে লাগিল, "চিকিৎসা হিসাবে অনেকদিন আগেই আপনার ওষুধ বন্ধ করা চলতো। আমিও তো আজ দশ বচ্ছর এই নিয়ে কাটাচ্ছি, এর হাটবদ্দ জানতে আমার আর বাকী নাই।"

কাত্যায়নী তাহার দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া আগ্রহে বলিলেন, "বলতো বাবা, আমিও তো তাই বলি যে, ব্যারাম সেরে গেছে, আর ওষুধ কেন? কিন্তু মেয়েটাও সে কথা শুনবে না, পরেশ তো নাই। এখনো পর্য্যন্ত শিশিভরা ওষুধ গেলাচ্চে।"

হরিচরণ মুখ মুচকাইয়া একটু হাসিল; বলিল, "কি জানেন, ওটা হচ্চে ডাক্তারদের ব্যবসাদারী, তিন দিনে রোগী সেরে উঠলে ব্যবসা চলবে কেন? আপনার মেয়ের দোষ কি বলুন, ওকে ডাক্তার যেমন বোঝাচ্চে, তেমনি বুঝচে। আমি বিলেত যাইনা বটে, কিন্তু পাঁচজন বড় ডাক্তারের কাছে ঘুরে ফিরে এ সম্বন্ধে আমারও এক আধটু জ্ঞান জন্মেছে।"

পরেশের নিন্দায় যেন ঈষৎ মর্ম্মাহত হইয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "কিন্তু পরেশ কি ব্যবসাদার? আর আমাদের সঙ্গে ব্যবসাদারী করে তার লাভ কি?"

গম্ভীরভাবে হরিচরণ বলিল, "লাভ যে কি তা আপনি আমি কি জানব বলুন। সে কথা তিনিই বলতে পারেন। তবে এখনো তাঁর দু' বেলা—"

পাশের ঘরের দরজার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই হরিচরণ সহসা থামিয়া গেল। দরজার উপর দাঁড়াইয়া শৈলজা এমনই ভ্রূকুটীভীষণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিল যে, কথা বলা দূরের কথা, হরিচরণ আর বসিতেও সাহস করিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং "সন্ধ্যা হয়ে এল, এখন আসি" বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

শৈল আসিয়া মাতার পাশে দাঁড়াইল; এবং ক্রোধগম্ভীরস্বরে বলিল, "লোকটা কি নেমকহারাম মা?"

কাত্যায়নী বলিলেন, "কিন্তু একটা কথা ও ঠিক বলেছে, আমার আর ওষুধ খাবার দরকার নাই। কাল হ'তে আমি কিন্তু আর ওষুধ খাচ্ছি না বাছা।"

রাগতভাবে শৈল বলিল, "না খাও না খাবে, কিন্তু ঐ মিথ্যুক লোকটা এবার এলে এমন তো শুনিয়ে দেব না!"

কাত্যায়নী শুধু বলিলেন, "ছিঃ!"

সে দিন ডাক্তারবাবু একটু দূরবর্ত্তী গ্রামে ডাকে গিয়াছিলেন। সন্ধার পূর্ব্বে তাঁহার ফিরিবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং ডাক্তারখানায় যাইতে হরিচরণের তেমন ত্বরা ছিল না। শৈলদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে গগণ কামারের কামারশালে বসিয়া তামাক খাইল; ধনু মুদীর দোকান হইতে একটা সিগারেট লইল; বেচু মাইতির গাছের দুইটা পেয়ারা পকেটে পুরিল। এইরূপে সংস্থানকার্য্য সম্পন্ন করিতে করিতে সে যখন ডাক্তারখানার দরজায় উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

ডাক্তারখানার দরজায় উপস্থিত হইয়া হরিচরণ দেখিল দরজা খোলা। আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে দরজার সম্মুখে আসিয়া দেখিল, ডাক্তারবাবু স্বয়ং টেবিলের সম্মুখে দাড়াইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। ভয়ে হরিচরণের মুখ শুকাইয়া গেল। সে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকিয়া চাদরখানা রাখিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইল। পরেশ একবারমাত্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় স্বীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

ঔষধ প্রস্তুত করিয়া পরেশ বাহিরে আসিল। বাহিরে লোক বসিয়াছিল, তাহার হাতে ঔষধ দিয়া পরেশ ঘরে ঢুকিয়া আপনার চেয়ারে বসিল। হরিচরণ আলো জ্বালিয়া দিল। পরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

হরিচরণ আমতা আমতা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, পেটের যন্ত্রণায়, বড় কামড়ানি—"

পরেশ এমনই তীব্র দৃষ্টিপাত করিল যে, হরিচরণ আপনার পাড়ার বিবরণটা সম্পূর্ণ করিতে পারিল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ বলিল, "শক্ত কেস, তাড়াতাড়ি ওষুধের দরকার ব'লে প্রেস্‌ক্রুপশান্ লিখে তিনটের সময় লোকটাকে পাঠিয়ে দিয়েছি। ভাগ্যে তাড়াতাড়ি আমি এসে পড়লাম, নয় তো ওর ওষুধ পেতে রাত দশটা বাজতো।"

পরেশ উঠিয়া বাহিরে আসিল। হরিচরণ দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া উঁকি দিয়া যখন দেখিল, ডাক্তারবাবু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন সে ফিরিয়া চেয়ার অধিকার করিয়া সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিয়ের কথা

তারাসুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে পরেশ, আজ বিকেলে কোথাও যাস্‌না যেন।"

বিস্মিতভাবে পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল দেখি পিসীমা?"

পিসীমা বলিলেন, "কেন আবার? একটু দরকার আছে।"

পরেশ বলিল, "কিন্তু আমারও অনেকগুলো রোগী আছে পিসীমা!"

ঈষৎ ক্রুদ্ধকণ্ঠে পিসীমা বলিলেন, "আছে আছেই, দিনরাত রুগী আর রুগী।"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "ডাক্তারদের রুগীই যে লক্ষ্মী। রুগীর অভাবেই হবে তাঁদের অনাহার।"

পিসীমা রাগিয়া বলিলেন, "যারা লক্ষ্মীছাড়া তাদের অনাহার। তোর কিসের অভাব বল্ তো? নাড়ী টিপে না বেড়ালে কি তোর খাওয়া চলবে না?"

মৃদু হাসিয়া পরেশ বলিল, "খাওয়া বেশ চলবে, কিন্তু দিন যে চলবে না পিসীমা।"

পিসীমা বলিলেন, "তা না চলে না চলবে। এখন যা বললাম, ওবেলা বাড়ীতে থাকবি বুঝলি।"

পরেশ বলিল, "তা বেশ বুঝেছি, কিন্তু কেন, সেইটাই বুঝতে পাচ্চি না।"

পিশিমা বলিলেন, "ওবেলা মানিকগঞ্জ হ'তে ক'জন ভদ্রলোক আসবে ?"

পরেশ যেন অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "ভদ্রলোক ? আমাদের বাড়ীতে ?"

"কেন, এটা অভদ্রের বাড়ী নাকি ?"

"খুব ভদ্রেরও বাড়ী নয়, বিলাত ফেরত্তের বাড়ী।"

"রেখে দে তোর বিলাত ফেরত। পয়সার জোরে কত মুচি চলে যায়।"

"বল কি পিসীমা, একেবারে মুচি ?".

পিসীমা হাত বাড়িয়ে বলিলেন, "মুচি বলব না ত কি বলবো ? কত বামুন কায়েত কত ছোট কাজ ক'রে পয়সার জোরে চলে যাচ্ছে।"

মৃদু হাসিয়া পরেশ বলিল, "কিন্তু বিলেত ফেরতটা চলে না পিশিমা, তুমি সমাজকে সে দোষটা দিতে পারবে না।"

পিসীমা মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "চলে নাই বা কিসে ? এই যে দাদার শ্রাদ্ধে বামুন পণ্ডিতরা লুচী খেলে না বটে, কিন্তু কাজ করিয়ে বিদেয় নিয়ে গেল তো ?"

সহাস্যে পরেশ বলিল, "রজতখণ্ডে দোষ নাই "পিসীমা।"

"আর এই যে কত বড় বড় বামুন তোর হাতের জল খাচ্ছে।"

"সে ঔষধ ব'লে। শাস্ত্রে আছে—ঔষধার্থে সুরাপানং।"

পিসীমাও এবার হাসিয়া ফেলিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুই এক ছেলে বাপু, তোর সঙ্গে কথায় পারবার জো নাই। যাই হোক, মোদ্দা ওবেলা ঘরে থাকবি।"

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কথাটা কি পিসীমা ?"

পিসীমা বলিলেন, "অপর কথা আর কি, তোকে দেখতে আসবে।"

পরেশ শিহরিয়া উঠিল, তাহার মুখখানা মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া আসিল। কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাকভাবে থাকিয়া সে গম্ভীরস্বরে ডাকিল—"পিসীমা !"

পিসীমা কার্য্যান্তরে গমনোদ্যত হইয়াছিলেন। পরেশের ডাকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলছিস্ ?"

"পরেশ মাথাটা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "এত তাড়াতাড়ি কেন ?"

"তাড়াতাড়ি আবার কোন্‌খানটায় দেখলি ? আজ দেখতে এলেই কি আজই বিয়েটা হয়ে যাবে ?"

"তা দেখাশোনাটাও না হয় দিন কতক পরেই হ'তো।"

"দিন কতক পরেও যখন হবে, তখন এখন হ'তেই দোষ কি ?"

"তবু।"

পরেশের মুখের দিকে চাহিয়া পিসীমা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখ্ পরেশ, তুই যা ভাবচিস্, আমিও যে তা ভাবি নাই, এমন নয়। কিন্তু সে হবে না। গোবিন্দ আকুলি—সেই চোক খেগো মুখপোড়া কিছুতেই পাঠাবে না।"

পরেশ ধীর নম্রস্বরে বলিল, "কিন্তু তাতে তার দোষ কি পিসীমা ?"

পিসীমা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দোষ নাই ? বৌমার সম্পূর্ণ দোষ আছে। তার সোয়ামীর ঘর, সে যদি আসে, তাকে কি ধরে রাখতে পারবে ? আমি তাও চেষ্টা দেখেছি, গুপীর মাকে চুপি চুপি তার কাছে পাঠিয়েছি। কিন্তু সে বলে কি জানিস্, খুড়ো খুড়ীর কথা ঠেলে কি যেতে পারি ?"

পরেশ বলিল, "ঠিকই বলে। গুরুজনের অপমান ক'রে আসা, সেটা কি ভাল ?"

পিসীমা রোষকম্পিত স্বরে বলিলেন, গুরুজন ? মেয়েমানুষের সোয়ামীর চাইতে গুরুজন আর কে আছে রে ? দু'পাত ইংরিজী প'ড়ে তুই আজ আমাকে লঘু গুরু শেখাতে এসেছিস্।"

পরেশ চুপ করিয়া রহিল। পিসীমা তাহার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তারা কিছুতেই পাঠাবে না, সেও আসবে না।"

পরেশ নিরুত্তর। পিসীমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তা বাছা, তুমি যেমন ভাল বুঝবে করবে। মোদ্দা আমার একটা গতি করে দাও। দাদা স্বর্গে গেছেন, আমি কি চিরকাল এই নরকে প'ড়ে তোমাদের সংসার ঠেলবো। আমার কি ইহকাল পরকাল ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই নাই ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া পরেশ বলিল, "ধর্ম্মকর্ম্ম করবার তো কোন বাধা দেখছি না পিসীমা।"

পিসীমা আক্ষেপসূচক স্বরে বলিলেন, "কি ক'রে করবো ? এই সংসারে

থেকে ? কপাল আমার ! দশবার হরিনাম কত্তেই সময় পাই না। আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে। আমি আর তোদের সংসার ঠেলতে পারবো না তা বলছি।"

কথা শেষ করিয়াই পিসীমা রুষ্টভাবেই গৃহ ত্যাগ করিলেন। পরেশ চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সম্মুখে ডাক্তারি মাসিক পত্রখানা অনাদৃত ভাবে পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যার সময় পরেশ পিসীমার কাছে গিয়া বলিল, "আমি এখন তা হ'লে ছুটী পেতে পারি পিসীমা? আজ আর বোধ হয় কোন ভদ্রলোকই আসছেন না।"

পিসীমা ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলিলেন, "কি জানি বাছা, তাদের নিজ্জস আসবার কথা ছিল। কেন যে এলো না তাতো বলতে পারি না।"

সহাস্যে পরেশ বলিল, "তুমি আর কেমন ক'রে বলবে পিসীমা; ভদ্রলোকের কথা ভদ্রলোকেরাই বলতে পারেন।"

পিসীমা একটু ভাবিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি বুঝেচি পরেশ, এর ভিতর লোক আছে। গাঁয়ের ঐ মুখপোড়াড়াই গিয়ে ভাঙ্গচি দিয়ে এসেছে। আচ্ছা দিক্ ভাঙ্গচি, আমিও করালী চাটুয্যের বোন, দেখি আমি ভাইপোর আবার বিয়ে দিতে পারি কি না।"

পরেশ বলিল, "তা তুমি পারবে পিসীমা, আমি কিন্তু একবার ঘুরে আসি।"

পরেশ প্রস্থানোদ্যত হইল। পিসীমা ডাকিয়া বলিলেন, "এমন তিন সন্ধ্যে বেলা আবার কোথায় যাবি.?"

পরেশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর দিল, "একবার ভট্‌চায্যিপাড়ায় যাব।"

"সাব্‌ভোমের বাড়ী নাকি ?"

"না, তাঁর জ্ঞাতি রমা ভট্‌চাজ্যির বাড়ী। রমা ভট্‌চাজ্যির স্ত্রীর অসুখ।"

"অসুখ কি খুব বেশী ?"

"না, যা হয়েছিল তাও প্রায় সেরে এসেছে। সমস্ত দিন যাওয়া হয়নি, এই সময় একবার দেখে আসি।"

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওর মেয়েটী কত বড় হ'য়েছে রে ?"

পরেশ বলিল, "তা খুব, যতটা বড় হওয়া উচিৎ নয় ততটাই হ'য়ে পড়েছে।"

একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া পিসীমা বলিলেন, "ঐ এক হতভাগী। বিয়ের কিছু হ'লো ?"

পরেশ বলিল, "কিছুই না। তুমি যোগাড় ক'রে দিতে পার পিসীমা ?"

পিসীমা সহাস্যে বলিলেন, "পারব না কেন ? আমি আবার কি না পারি।"

পরেশ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "দোহাই পিসীমা, আর কিছু পার বা না পার, এইটী তোমাকে পারতেই হবে। আর তা হলেই বুঝব, তুমি একটা মেয়ের মত মেয়ে বটে।"

হাসিতে হাসিতে পিসীমা বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, আমি কত বড় মেয়ে তা একদিন তোকে দেখিয়ে দেব।"

পরেশ আর কিছু না বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিল। পিসীমা বলিলেন,—"মেয়েটীকে অনেকদিন দেখি নাই। একবার আসতে বলিস না।"

পরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "রক্ষে কর পিসীমা, আর তোমার বিয়ের যোগাড় কত্তে হবে না। একেই বেচারারা একঘরে হয়ে আছে। তার উপর তোমাদের বাড়ীতে এসে আবার শূন্যঘরে হ'য়ে দাঁড়াবে।"

পরেশ হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। তারাসুন্দরী উঠিয়া মালা ছড়ার অনুসন্ধান করিতে করিতে গ্রামের পরশ্রীকাতর লোকগুলাকে সত্বর সংসার হইতে অপসারিত করিবার জন্য যমরাজকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

জনরব—হরিচরণের ভবন।

গ্রামে একটা জনরব উঠিল, রমানাথ ভট্‌চাজ্যির মেয়ের সঙ্গে পরেশের বিবাহ হইবে। জনরবটা ক্রমেই এত প্রবল ভাব ধারণ করিল যে ইতর ভদ্র সকলের মুখেই কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ ইহাতে বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না। কেহ বলিল, ইহা কি সম্ভব ? কেহ বলিল, অসম্ভবই বা কি, যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।

জনরবের একটু মূলও ছিল। তারাসুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। দেশে মেয়েরও অভাব ছিল না। কিন্তু বিলাত ফেরত

সুতরাং সমাজচ্যুত পরেশকে মেয়ে দিতে কেহই সাহসী হইতে ছিল না। দুই একজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কপাল ঠুকিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু শেষে যখন তাহারা শুনিল, পরেশের প্রথমা স্ত্রী বর্ত্তমানে, এবং ইচ্ছা করিলেই সে আসিয়া স্বামীর ঘর করিতে পারে, তখন অগত্যা পিছাইয়া পড়িল। তারাসুন্দরীরও জেদ বাড়িতে লাগিল, যেমন করিয়া হউক, পরেশের বিবাহ দিতেই হইবে। তিনি ঘটকদিগকে বেশী বিদায়ের লোভ দেখাইতে লাগিলেন।

ঠিক এই সময়ে পরেশ যখন রমা ভট্চাজ্জির মেয়ের কথাটা মনে করিয়া দিল, তখন তারাসুন্দরী যেন একটা সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন। তিনি রামুকে দিয়া মা ও মেয়েকে বেড়াইতে আসিবার নিমন্ত্রণ করিলেন।

কাত্যায়নী তখনও সম্পূর্ণ সারিয়া উঠেন নাই বটে, কিন্তু নিমন্ত্রণের মধ্যে তিনি যেন আশার একটু ক্ষীণ আশ্বাস পাইলেন। সুতরাং একদিন আহারান্তে কাত্যায়নী মেয়েকে লইয়া পরেশের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তারাসুন্দরী পাল্কী পাঠাইবার কথা বলিয়াছিলেন, কাত্যায়নী কিন্তু তাহাতে মত দিলেন না, হাঁটিয়াই আসিলেন।

তারাসুন্দরী তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইলেন। উভয়ের মধ্যে সুখ দুঃখের অনেক কথা হইল। কাত্যায়নীর দুঃখে তারাসুন্দরী সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।

তারপর তিনি শৈলকে দেখিয়া, তাহার মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। শৈল সারাবাড়ীখানা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। সেদিন পরেশ বাড়ীতে ছিল না, গ্রামান্তরে ডাকে গিয়াছিল। শৈল তাহার ঘরে ঢুকিয়া ঘরের প্রত্যেক জিনিষ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল। টেবিলের উপরে কয়েকখানা ইংরাজী ডাক্তারী বই এবং মাসিকপত্র ছিল। শৈল অনেক খুঁজিয়াও তাহাদের মধ্য হইতে একটাও কবিতা বা গান বাহির করিতে পারিল না। ভাবিল, ডাক্তার বাবুর প্রাণটা কি নীরস!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাত্যায়নী বিদায় হইয়া ঘরে গেলেন। রামু সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তাঁহাদিগকে বাড়ী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিল।

শুধু এই একদিন নয়, আরও দুই চারিদিন এইরূপ যাতায়াত হইল। এই যাতায়াতে কাত্যায়নীর সহিত একটা সৌহৃদ্য স্থাপিত হইল মাত্র, তা ছাড়া আর বিশেষ কোন কথা হইল না। লোকে কিন্তু কাত্যায়নীর এই যাতায়াতটা

খুব আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছিল। সুতরাং তাহারা শীঘ্রই ন্যায়ের অনুমানখণ্ডের সাহায্যে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইল যে, এই সমাজচ্যুতা বিধবা এতদিন পরে আপনার অরক্ষনীয়া কন্যারত্নটীকে সমাজচ্যুত পরেশের হস্তে সমর্পণ করিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিবে। সিদ্ধান্তটা ক্রমে এক মুখ হইতে পাঁচমুখে স্থান পাইল।

গুজবটা কাত্যায়নী ও শৈলের কানে গেল, তারাসুন্দরীও শুনিলেন। কিন্তু কেহই কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। পরেশ আপনার কাজ লইয়াই ব্যস্ত ছিল, জনরবের দিকে তাহার মনোযোগ ছিল না। সার্ব্বভৌম মহাশয় কিন্তু একদিন এইদিকে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। পরেশ রোগী দেখিয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন সার্ব্বভৌম রাস্তায় তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে বাবাজী, বিয়েটা কত দিনে হচ্চে ?"

পরেশ শুনিয়া বিস্মিত হইল। সার্ব্বভৌম সহাস্যে বলিলেন, "বেশ, মেয়েটারও বিয়ে হচ্চিল না, তার জাতিরক্ষা হবে, অথচ—গোবিন্দ আকুলির ভাইঝিও তো ঘর করলে না। আমি অনেকবার গোবিন্দকে বলেছিলাম, ওহে মেয়ে পাঠিয়ে দাও। বিলাতেই যাক আর যাই করুক, বিয়ে তো হয়েছে। গোবিন্দ কেমন যে এক রোখা মানুষ, কিছুতেই শুনলে না। বল্লে—যার যাত নাই তার সঙ্গে আবার সম্বন্ধ কি'। তা বাবাজি, তোমাকে তো সংসার ধর্ম্ম করতে হবে। অতি উত্তম, অতি উত্তম ! শুনে বড়ই সন্তুষ্ট হলাম। তবে ঘরটা একটু দোষস্থ এই যা। করালী ভায়ার ছেলে হ'য়ে—যাক্ বিধাতার ভবিতব্য। সকলই তাঁর ইচ্ছা।"

পরেশ শুধু মৃদু হাস্যে তাঁহার কথার উত্তর দিল।

বাড়ী ফিরিয়া পরেশ পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে বিয়ের সব ঠিকঠাক করে ফেলেছ পিসীমা ?"

তারাসুন্দরী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "করি নাই, এইবার ক'রবো।"

পরেশ ঈষৎ রাগতভাবে বলিলেন, "কিন্তু ঐ দোষী ঘর ছাড়া আর ঘর পেলে না ?"

গর্জ্জন করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "কে বলে দোষী ? আমি জানি কোন দোষই নাই।"

"কিন্তু পাঁচজনে বলে তো ?"

"পাঁচ জনে বলে তাই তুইও বলবি? তুইও ঐ মেয়েকে ঘরে আনতে পেছুপা হবি? তুই না করালী চাটুজ্যের ছেলে?"

পরেশ মাথা নীচু করিল। তারাসুন্দরী বলিলেন, "আমি কিন্তু ঐ মেয়েকেই ঘরে আনবো পরেশ, তাতে তুই কি, গুরু এসে বল্লেও শুনবো না।"

পরেশ নিরুত্তর হইল। বাস্তবিক যে দোষীর ঘরের মেয়ে বলিয়া শৈলকে বিবাহ করিতে পরেশের আপত্তি ছিল তাহা নহে, কিন্তু সে এমন একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছিল, যাহাতে সে কোন্ দিকেই কিছুমাত্র অকলঙ্ক খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এক স্ত্রীসত্ত্বে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে তাহার আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না, অথচ পিসীমার কথাটাকেও সে ঠেলিতে পারিতেছিল না। একে তো গুরুজনের কথার উপর কথা কহিবার অভ্যাস তাহার আদৌ ছিল না, ইহার উপরে পিসীমার কথা না শুনিলে তিনি যে কিরূপ অনর্থ বাঁধাইয়া বসিবেন, পরেশ তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারিত না। অথচ পিসীমার আদেশ পালন করিতে গিয়া এমন একটা ভয়ানক অন্যায় কার্য্য সে যে কিছুতেই সম্পন্ন করিতে পারিবে না ইহা সে স্থির জানিত। সুতরাং পরেশ উভয় সমস্যার মধ্যে পড়িয়া যখন হাবুডুবু খাইতেছিল, তখন যে কোন একটা সামান্য বাধা দেখিতে পাইলে তাহাকেই পিসীমার সম্মুখে খুব বড় করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু পিসীমাও সহজে ছাড়িবার পাত্রী ছিলেন না; তিনি পরেশের উপস্থাপিত বাধাগুলাকে ফুৎকারে তৃণখণ্ডের ন্যায় উড়াইয়া দিতেছিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া পরেশ হতাশ হইয়া পড়িতেছিল। তাহার এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল, সে গিয়া অনুপমাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলে, এবং এখানে আসিয়া থাকিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করে। কিন্তু ছিঃ, স্ত্রীর কাছে এতটা হীনতা স্বীকার! তাহা ছাড়া অনুপমা নিতান্ত বালিকা নয়, সে কি এসকল কথা বুঝে না? সে কি জানে না যে, এদেশের রমণীরা স্বামিগৃহে বাস করিতে অসম্মত হইলে পুরুষ অনায়াসেই একাধিক বিবাহ করিতে পারে? জানিয়া শুনিয়াও যখন সে চুপ করিয়া আছে, তখন তাহাকে বুঝাইতে যাওয়াই বৃথা।

পরেশ কোন দিকেই কোন উপায় দেখিতে পাইল না। জগৎ শুদ্ধ যেন তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জোর করিয়া তাহার দ্বারা এমন একটা

অন্যায় কাজ সম্পন্ন করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। অধিক কি, এই কার্য্যে সে যাহার প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হইবে বলিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছে, সেই অনুপমা পর্য্যন্ত যেন নির্ম্মমভাবে তাহাকে অন্যায়ের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। জগতের কেহই তাহার অনুকূলে দণ্ডায়মান হইতেছে না।

পরেশ জানিত না, একজন শুধু তাহার অনুকূলে দাঁড়াইয়া ছিল। সে তাহারই কম্পাউণ্ডার হরিচরণ।

হরিচরণ যখন জনরবটা শুনিল, এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে শৈল ও তাহার মাতার যাতায়াত প্রত্যক্ষ করিল, তখন সে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল, এবং কি উপায়ে এই বিবাহে বাধা দেওয়া যায় তাহারই চিন্তায় বিভোর হইল। সে অনেক চিন্তার পর পিসীর শরণই গ্রহণ করিল, এবং পিসীকে জোর করিয়া ধরিল, ইহার একটা উপায় করিতেই হইবে, নতুবা হরিচরণ হয় গলায় দড়ি দিবে, নয় বিবাগী হইবে।

হরিচরণের উদ্বন্ধন মৃত্যুতে বা সংসার ত্যাগে তত্টা ক্ষতি বিবেচনা না করিলেও পিসীমা তাহাকে নিরাশ করিলেন না; আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ওরে বাছা, তোকে গলায় দড়িও দিতে হবে না, বিবাগীও হতে হবে না। আমি না পারি কি? তবে বাছা, তোমাকে কথামত চল্‌তে হবে।"

একান্ত ব্যাকুলতার সহিত হরিচরণ বলিল, "তুমি জলে ডুব্‌তে বললে জলে ডুববো পিসীমা, আগুনে ঝাঁপ দিতে বললে তাই দেব।"

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তবে ক্ষান্ত ঠাকরুণের ক্ষমতাটা একবার দেখ্।"

বাস্তবিকই ক্ষান্ত ঠাকরুণের ক্ষমতা একটু ছিল। তিনি সাধারণ স্ত্রীলোকের মত শুধু কলহে এবং অন্নধ্বংশে নিপুণা ছিলেন না। বিষয়বুদ্ধিও তাঁহার এক আধটু ছিল। গ্রামের চাষা ভূষারা তাহার কাছে শুধু তিন পয়সা সুদে টাকা ধার করিতে আসিত না, অনেক সময়ে বিষয় কার্য্যেরও পরামর্শ লইতে আসিত। ঘরাও বিবাদে তাহারা প্রায়ই ক্ষান্তঠাকুরাণীকে মধ্যস্থ মানিত। তাঁহার মধ্যস্থতায় বিবাদ কোথাও মিটিত, কোথাও বা বেশী বাঁধিয়া যাইত। তবে সে বিরোধে ক্ষান্তঠাকরুণ নিরপেক্ষ থাকিতেন, এবং উভয় পক্ষকেই পরামর্শ প্রদানে আপ্যায়িত করিতেন। গ্রামের বৌঝিদের কাছে তাঁহার খুব নাম যশ ছিল। বিশ্বাসও যথেষ্ট ছিল। কেহ গোপনে ধান চাল বেচিয়া

পাঁচ টাকা হাতে করিতে পারিলে তাহা নিরাপদে রক্ষার জন্য ক্ষান্ত ঠাকরুণের কাছে গচ্ছিত রাখিত। ক্ষান্ত ঠাকরুণ তাহা তিন পয়সা সুদে ধার দিয়া মহাজনী করিতেন। তাহার পর যাহার টাকা, প্রয়োজন মত সে তাহা ফিরাইয়া লইত, কিন্তু উপস্বত্বটা ক্ষান্তঠাকরুণেরই থাকিত। কখন কখন গচ্ছিত টাকাও ফিরাইয়া দিতে হইত না। এইরূপে তিনি হাতে কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

ঘটকালীতেও ক্ষান্তঠাকরুণের পারদর্শিতার অভাব ছিল না। দূর দূরান্তরে যাতায়াত না করিলেও আশপাশের গ্রামের অনেক ছেলে মেয়ের বিবাহে তিনি ঘটকালী করিয়াছেন। তবে বয়স হওয়ায় আর পারিয়া উঠিতেন না বলিয়া কাজটা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। হরিচরণের অনুরোধে পরিত্যক্ত কাজটা আবার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

(ক্রমশঃ)

হবু সাহিত্যিক নিধিরাম।

(শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল)

আজ রবিবার; আফিসের ছুটি! নিধিরাম দুপুর বেলা শিশিবোতল বিক্রীওয়ালাকে ডাকিয়া পুরাতন ছেঁড়া কাগজপত্র বিক্রয় করিতে করিতে এক টুক্‌রা কাগজের উপর তাহার হঠাৎ নজর পড়িল। এটুকু "ভাগীরথী" নামক নব প্রকাশিত মাসিকের একটি ছিন্ন পত্র। কাগজটুকুর উপর একবার চোখ বুলাইতেই সে একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। লেখাটুকু কবিতা,—পড়িয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু বেশী আশ্চর্য্য হইল লেখার নীচে লেখকের নাম দেখিয়া,—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস। এাঁক, এযে আমাদের গোব্‌রা দেখ্‌ছি! গোব্‌রা আবার কবি হইল কবে! যে গোবরার মাথায় কেবল গোবর ভরা ছিল বলিয়া শিক্ষক ও সহপাঠী ছাত্রবৃন্দ "গোবর গণেশ" বলিয়া তাহাকে কতই না বিদ্রূপ উপহাস করিত, সেও কবি হইয়া উঠিয়াছে, মাসিকের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে; আর সে, যাহার বাঙ্গালারচনার শক্তি পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক

শতমুখে প্রশংসিত হইত, যাহার পরীক্ষা কাগজে প্রবন্ধের ভাব ও ভাষা ছাত্র-মহলে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিত, সে কিনা "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" রহিয়া গেল !

তাহার মনটা যেন হঠাৎ কি একরকম হইয়া গেল। কাগজবিক্রীতে আর তাহার বড় মন লাগিল না। কাগজওয়ালার সঙ্গে আর বেশী দর দস্তুর না করিয়া সে যে দাম বলিল, তাহাতেই রাজি হইল। কাগজওয়ালারও আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। যে নিধিরামবাবু অন্যদিন আধ পয়সা লইয়া দরের কশাকসি করিতেন, তাঁহার আজ একি ভাবান্তর উপস্থিত হইল! সে চার আনা সেরের স্থলে তিন আনা সেরে কাগজ পাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া গেল।

নিধিরাম আর সব পুরাতন কাগজ বিক্রী করিয়া দিয়া কেবল মাসিকের সেই ছিন্নপত্রটুকু রাখিয়া দিল। পরে কি ভাবিয়া মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্রে সেটুকু লইয়া ছাতি মাথায় বাড়ীর বাহির হইল। পথে আর কোথাও না থামিয়া একেবারে গোবরা ওরফে গোবর্দ্ধনের বাড়ী গিয়া হাজির হইল। দুপুর রৌদ্রে হঠাৎ বহুকাল পরে পুরাতন বাল্যবন্ধুকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে উপস্থিত দেখিয়া গোবর্দ্ধন হতভম্ব হইয়া গেল। পরস্পর কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর নিধিরাম আর বাজে কথায় সময় নষ্ট না করিয়া একেবারে কাজের কথা পাড়িল। সেই লেখাটুকু গোবর্দ্ধনকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে, একি তোর লেখা ?" গোবর্দ্ধন একগাল হাসিয়া উত্তর করিল,—"হাঁ ভাই, তোর কাছে কোথা হতে এলো? আমি যে মাঝে মাঝে ভাগীরথী পত্রিকায় কবিতা লিখে থাকি।" আর যায় কোথা! নিধিরাম তাহাকে ধরিয়া বসিল, মাসিকপত্রে কবিতা ছাপাইবার secret টুকু তাহাকে বলিয়া দিতে হইবে। এই সঙ্গে সে নিজের বাঙ্গালা লিখিবার ক্ষমতার বিষয়ও উল্লেখ করিতে ছাড়িল না। একবার স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষায় বাঙ্গালার দিন "পরিশ্রম" শীর্ষক প্রবন্ধ সে এতই সুন্দর লিখিয়াছিল যে, পরীক্ষক মহাশয় স্বয়ং ক্লাসে সকল ছাত্রের সম্মুখে খাতা পড়াইয়া শুনাইয়া ছিলেন। সে কথা বোধ হয় গোবরার মনে আছে। পাঠকগণের অবগত্যর্থে আমরা নিম্নে তাহার একটু অংশ উদ্ধার করিয়া দিলাম ;—

"বঙ্গের তপনে পবনে যে বিদ্যাসাগরের সুখ্যাতি মুখরিত, বঙ্গের অনিলে সলিলে সে বিদ্যাসাগরের কীর্ত্তিকলাপ উদ্ভাসিত, বঙ্গের ভূকানে বিমানে যে

বিদ্যাসাগরের বিদ্যাবত্তা বিস্তৃত, তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র কি ছিল? বায়ুকে জিজ্ঞাসা কর, সে প্রবল ঝটিকায় উত্তর দিয়া বলিবে,—"পরিশ্রম"। আকাশকে জিজ্ঞাসা কর মেঘ গম্ভীরনাদে উত্তর দিয়া বলিবে."পরিশ্রম।" পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা কর, সে ভূমিকম্পে উত্তর দিয়া বলিবে, "পরিশ্রম।" স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও আমাদের ন্যায় হস্তপদাদি-সংযুক্ত মানব ছিলেন। তিনিই বা কেন এত উচ্চে, আর আমরাই বা কেন এত নিম্নে? এ জবাবহ প্রশ্নের আর কি উত্তর হইতে পারে?—"পরিশ্রম।"

আবার অন্য এক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরে "সরস্বতী পূজা" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া সে কিরূপ পণ্ডিতমণ্ডলীর মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল, দেবদেবীর পূজা সম্বন্ধে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের গভীর গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল—সে সব কথা গোবরা নিশ্চয়ই এত শীঘ্র ভুলে নাই। জনসাধারণের হিতার্থে নিধিরামের এ প্রবন্ধেরও একটু উদ্ধার করিবার লোভ আমরা সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

সরস্বতী পূজা।

সরস্বতী পূজা দুর্গাপূজারই অনুরূপ—দুর্গাদেবীর ন্যায় ইনিও সিংহবাহিনী। অনেকের মত—ইনিই দুর্গা, অন্য মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন। শরৎকালে সরস্বতী পূজার ধূম। সাধারণতঃ বঙ্গের বাহিরে কখন এই পূজার সাড়া পাওয়া যায় না। তবে কোন ভক্ত জ্ঞানান্বেষী যদি কোন দূর দেশে ইঁহাকে টানিয়া লইয়া যায়, তবে সে ভিন্ন কথা। দেশায় কুমারই এই দেবীর সৃজন কর্ত্তা—কারণ সরস্বতী দেবী নিজেই এই মর্ত্ত্যভূমিতে অবতরণ করেন না, কুমার কামার দ্বারা ইহাকে অবতীর্ণা করাইতে হয়। তারপর ইঁহার আকৃতি অতি চমৎকার, —দুই পদ, দশ বাহু—তবে মাথা রাবণ রাক্ষসের ন্যায় দশ বিশটা নয়—একটাই। অন্যান্য সমস্ত অবয়ব মনুষ্যাকৃতি। কারণ সৃজনকর্ত্তা নিজেই জানেন না যে, এই স্বর্গীয় মূর্তিটীর প্রকৃত অবয়ব কিরূপ। এই সময়টা বঙ্গদেশের যেন এক উপাদেয় বস্তু। সকলেই আনন্দস্রোতের মাঝে অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া একটু স্বর্গীয় হাওয়া গায়ে লাগাইয়া লয়। এই পূজায় কোন কোন স্থলে যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতিরও যথেষ্ট আয়োজন হয়। বাই খ্যামটা যে বাদ যায়, তা' নয়; তবে আজকাল জ্ঞানের আলোক পড়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কিছু কমিয়া আসিয়াছে। ভগবানের

কৃপায় এই সমস্ত পবিত্র উৎসবাদি ধীরে ধীরে পুনরায় সৌরভময় হইয়া উঠিতেছে। অনেকে বলেন রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতির্ম্ময় আলোকেই এই অন্ধকার ক্রমে পশ্চাৎপদ হইবে।

গোবর্দ্ধন সব শুনিয়া মনে মনে খুব হাসিতে লাগিল। কিন্তু বাহিরে কোনও ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল,—"ভাই, এ আর বেশী কথা কি! তোমার বাঙ্গালা লেখবার যা ক্ষমতা তাতে তোমার লেখা নিশ্চয়ই মাসিকে প্রকাশিত হবে। আর এর একমাত্র secret হচ্ছে, সম্পাদকের খোসামোদ ও তার পত্রিকার শতমুখে প্রশংসা করা। সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে মুখে সব কথা বলিতে লজ্জা করে, সেই জন্য রচনার সঙ্গে পত্রে খুব করে সম্পাদকরে আমড়া গেছে করতে পারলে লেখা নিশ্চয়ই বেরুবে।" দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ আশা ভরসা লইয়া অনেক আলোচনা করিল। পরে নিধিরাম বন্ধুর উপদেশবাণী ও উন্নতির মূলমন্ত্র জপিতে জপিতে বাড়ী আসিল।

সেদিন সমস্ত রাত্রি তাহার ঘুম হইল না। কেবল স্বপ্ন দেখে যেন পত্রিকায় তাহার লেখা বাহির হইয়াছে। সে বাড়ীর সকলকে তাহা দেখাইতেছে, পকেটে করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতেছে, আফিসে সতীর্থদের দেখাইবার জন্য সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে, রাত্রে প্রণয়িনীকে ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখাইয়া কৃতার্থ হইতেছে, তাহারও স্বামীগর্ব্বে বুক স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। পত্রিকাখানি সে কিছুতেই কাছ ছাড়া করিতে পারিতেছে না। রাত্রে শুইবার সময়ও সেটিকে মাথার বালিসের নীচে করিয়া শুইয়া আছে।

পরদিন প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করিয়া নিধিরাম কাগজ কলম লইয়া মাসিক পত্রিকার জন্য কিছু লিখিতে বসিল। কিন্তু পদ্য লেখে, কি গদ্য লেখে, এই লইয়া সে বড়ই ফাঁপরে পড়িল। মা আসিয়া বলিলেন, "বাজারের সময় হয়েছে, বাড়ীতে কিছুই নেই।" নিধিরাম কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল,—"শরীরটা আজ ভাল নয়, যাহোক করে সেরে নাও।" কিন্তু সমস্ত সকাল মাথা ঘামাইয়াও নিধিরাম কি লিখিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। তবে সৃষ্টির পর বিশ্বসাহিত্যক্ষেত্রে কাব্য যেমন প্রথম স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল, নিধিরামেরও তরুণ হৃদয় তন্ত্রীতে কবিতার ঝঙ্কার প্রথম বাজিয়া উঠিল। নবীন লেখকের মনে ভাব ও কল্পনার উদ্দাম ক্রীড়া ও নৃত্য

চলিতে থাকে ও তাহার কবিতা লিখিবার আশা বড়ই বলবতী হইয়া উঠে। নিধিরামও কবিতাসুন্দরীর প্রভাব এড়াইতে পারিল না। সে কবিতা লিখিবে স্থির করিয়া বিষয় নির্ব্বাচনে ব্যাপৃত হইল। এমন সময় হঠাৎ ঘড়িতে টং টং করিয়া নয়টা বাজিতেই তাহার চৈতন্য হইল, আফিস যাইবার সময় হইয়াছে। মনিবের রক্তবর্ণ চক্ষুর জ্বালাময়ী দৃষ্টির উত্তাপে তাহার কবিতার উৎস প্রখর সূর্য্যতাপে শিশিরবিন্দুর ন্যায় শুকাইয়া গেল। এ বেলার মতন গভীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে বাধ্য হইয়া সাহিত্যচর্চ্চা হইতে বিরত হইতে হইল।

সন্ধ্যার সময় আফিস হইতে আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া নিধিরাম আবার কবিতা রচনায় গভীর মনোনিবেশ করিল। কিন্তু সেই একই গোলযোগ,—কি বিষয়ে লেখে? বর্ষাকাল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে মেঘ ডাকিতেছে; পার্শ্ববর্ত্তী এক গৃহস্থের পোষা ময়ুরটা মেঘের ডাকে তালে তালে আনন্দে ডাক ছাড়িতেছে। নিধিরামের স্ত্রী সম্প্রতি পিত্রালয়ে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে ও কবিতা লেখার ঝোঁক চাপায় নিধিরামের বিরহজ্বালা শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। তখন কেবল সেই ভাবই তাহার মনের মধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠিয়া "বিরহ" সম্বন্ধেই কবিতা লিখিতে তাহাকে উৎসাহিত করিল। নিধিরাম ভাবিল, আজ সে দ্বিতীয় মেঘদূত কাব্যের সৃষ্টি করিবে। সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সারারাত জাগিয়া সে কয়ছত্র কবিতা লিখিল। কবিতাটি কোনও এক বন্ধুর উদ্দেশে লেখা। কবিতাটির কিয়দংশ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। সমস্তটুকু এখনও উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। পাঠকবর্গের উৎসাহ পাইলে ভবিষ্যতে সেই লুপ্তরত্নোদ্ধার করিতে আমরা বিশেষ চেষ্টা করিব।

বিরহ।

(সখার প্রতি)

সখারে,

তার যে বিরহ জ্বালা সহিতে না পারি রে,
সে যে আমার হৃদয় পুরে,
আসন করে,
রেখেছে তার ছবিটী গুয়াইয়া রে,

সখারে,

যবে নিকটে তাহার থাকিতাম শুয়ে রে,
তখন সে কত যে আদরে
বক্ষেতে মোরে
লইত টানিয়া, তা' বলিব কেমনে রে !

সখারে,

যখন ডাকিত মোরে আনন্দ অন্তরে
"প্রাণেশ্বর ! কোথা যাও তুমি"
তখন আমি
পারিতাম না যাইতে কোথাও চলিয়া রে !

সখারে,

আচম্বিতে পুনরায় আহা দেখিয়া মোরে,
চঞ্চল চরণে আসিয়া সে.
আমার পাশে,
চুম্বিত গণ্ডেতে কত, কহিব কেমনে রে !

সখারে,

কিন্তু আজ এই সুদূর দেশে কেমনে রে,
সখা, কিসে দিবস শর্ব্বরী
তারে না হেরি,
বুঝনা কেমনে কাটাচ্ছি দিন গুণি রে ।

সখারে,

অথবা কিরূপেই বা সে কাটায় দিন রে,
না জানি সখা, কতই ব্যথা
পাইছে সেথা,
আমার বিহনে বিষাদ অন্তরে সে রে ।

সখারে,

আর মোরা দুইজনে, দুই বাহু তুলে রে,
তার লাগি ভবেশের কাছে,
সে যেন মিছে,
ব্যথা না পায়, এই প্রার্থনা করি রে !

কবি কেবল সখার নিকট নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই, আবার প্রণয়িনীর হিত কামনার বন্ধুর সহিত একত্র 'দুই বাহু তুলিয়া ভবেশের নিকট প্রার্থনা' করিবারও বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। একেই বলে অপার্থিব দাম্পত্য প্রেম!

শেষ রাত্রে কবিতার ঝোঁক একটু কমিয়া যাইতে, নিধিরামের খানিকটা সুখনিদ্রা হইল। কিন্তু প্রাতে উঠিয়াই সে সম্পাদককে পত্র লিখিতে গিয়া আবার এক মহা ফাঁপরে পড়িল। গোবর্দ্ধন বলিয়া দিয়াছে, খুব তোষামোদ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে, কারণ লেখা যেমনই হউক না কেন, ঐ পত্রের উপরই লেখা ছাপা নির্ভর করিতেছে। শিরোনামা হইতে আরম্ভ করিয়া পত্রের শেষে নাম সহি পর্য্যন্ত সে বড়ই বিব্রত হইল। অনেক কষ্টে, এক ঘণ্টার পর বহু কাটাকুটি করিয়া, বর্ষাকালে গলদঘর্ম্ম হইয়া নিধিরাম পত্র রচনা শেষ করিল। বিবাহের পর প্রণয়িনীকে যখন সে প্রথম রবি বাবু, দ্বিজেন্দ্র বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া বটতলার প্রেমপত্র পর্য্যন্ত সমস্ত কবিতা ও গান উজাড় করিয়া ষোলপৃষ্ঠাব্যাপী এক পত্র লিখে তাহাতেও বোধ হয় তাহার এত কষ্ট হয় নাই। পত্রখানি দাঁড়াইল এইরূপ,—

মহামহিম মহিমার্ণব "ভাগীরথী" সম্পাদক মহোদয় করকমলেষু—

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং—

সম্পাদক মহাশয়! অদ্য ডাকযোগে মল্লিখিত "বিরহ" শীর্ষক ক্ষুদ্র কবিতা আপনার ভাগীরথীর শ্রী অঙ্গে উপহৃত হইল। জানি না, এ উপহার গৃহীত হইবে কিনা। কবিতা লিখিবার অভ্যাস আমার নাই। তবে এ আশাটী বহুদিন যাবৎ হৃদয়ে পোষিত হইলেও সময় ও ভাব এতদুভয়ের অভাব বশতঃ লিখিতে পারি নাই। আজ একটু অবসর পাইয়া লিখিলাম। আবাল্যকাল বীণাপাণি মন্দিরে যাতায়াত করিতেছি, কিন্তু কখনও বীণাপাণির সেবা করিয়া সন্তোষলাভ করিতে পাই নাই, আজ যদি খেয়াল হইল তবে শ্রীভাগীরথীর সলিলসিঞ্চিত ক্ষুদ্র কবিতা-কুসুম বীণাপাণির শ্রীপদে অর্পণ করি না, কিন্তু শ্রীভাগীরথীর সলিল লাভ কি এ কুসুমের ভাগ্যে ঘটিবে? যাহা হউক, আমি পাঠাইলাম।

প্রথম উদ্যমে যাহা লিখিলাম, জানি তাহা ভ্রমপূর্ণ কিন্তু আপনাদের ন্যায় বীণাপাণির ভক্তের নিকট এ ভ্রমসকল পরিমার্জ্জিত হইয়া "ভাগীরথী"তে

স্থান পাইবে, এই আশায় পাঠাইলাম। আশা করি আমার প্রার্থনা অরণ্যে রোদন হইবে না।

ভবদীয় কৃপাপ্রার্থী
শ্রীনিধিরাম শর্ম্মা।

আফিস যাইবার পথে কবিতাসমেত পত্রখানি নিধিরাম ডাকে ফেলিয়া দিল। পরদিন হইতেই উত্তরের আশায় সে প্রত্যহ পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিত। পোষ্টপিওন আসিলেই তাহাকে তাগাদা করিতে লাগিল। যদি ভুলে আসে পাশে কাহারও বাড়ীতে তাহার পত্র ফেলিয়া দিয়া গিয়া থাকে, এই জন্য সেখানেও অনুসন্ধান করিত। কিন্তু প্রায় ১৫ দিন হইয়া গেল, অথচ কোনও উত্তর আসিল না। নিধিরাম প্রমাদ গণিল। শেষে তাহার অগতির গতি, মাসিক সমুদ্রের একমাত্র কাণ্ডারী গোবর্দ্ধনের নিকট পরামর্শ জানিল যে, রচনার সহিত অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিট না পাঠাইলে, সম্পাদকেরা পত্রের উত্তর দেন না। কারণ এরূপ উত্তর দিতে গেলে, তাঁহাদের খরচের অন্ত থাকে না।

নিধিরাম সে বিষয়ে আর বিশেষ মনোযোগ না দিয়া দ্বিতীয় কবিতা রচনায় মন দিল। তখন তাহার মানসসমুদ্রে ভাব-তরঙ্গ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে বারিরাশির ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। এবার সে ভাবিল, একটি হাসির কবিতা লিখিতে হইবে। তাহার স্ত্রী পিতৃ-গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। একদিন রাত্রে প্রণয়িনী পান খাইয়া বিম্বাধর লাল করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার হাতে তখন একটি ছোট ডিপে, মধ্যে মধ্যে তাহা হইতে একটু একটু দোকতা তুলিয়া গালে ফেলিতেছে। নিধিরামের অমনি মাথায় গেল এই দোকতা সম্বন্ধে এক হাস্যরসাত্মক কবিতা লিখিতে হইবে। কবিতার শিরোনামা দিল,—"দোকতার ইতিহাস।" এবার গতবারের ন্যায় তাহাকে ছন্দ মিলাইবার জন্য বেশী বেগ পাইতে হইল না। অল্প আয়াসেই লেখা শেষ হইল। নিজের রচনাশক্তি ক্রমশঃ যে বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহার অকাট্য প্রমাণ হাতে হাতে পাইয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। আসল কবিতাটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়া আমরা তাহার খসড়া সংগ্রহ করিয়া যাহা উদ্ধার করিতে পারিয়াছি, নিম্নে সেটুকুই প্রকাশিত হইল। কাব্যরসজ্ঞ পাঠকগণ এটুকু পড়িয়াই বুঝিবেন সমস্ত রচনাটুকু উদ্ধার

না হওয়ায় বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্য কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু সে আপশোশ আর এখন করিয়া কোনও লাভ নাই। অরসিক ভাগীরথী সম্পাদকই ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।

দোকতার ইতিহাস।

(১)

তামাক চুরুট নস্যি দেখি
মিন্সেগুলোর এঁকচেটে
মরবার দাখিল হয়েছিল
মাগারা সব দম ফেটে।

(২)

শেষকালে কোন নেশাখোর
বুদ্ধির গোড়ায় জল ঢেলে
মেয়েগুলোর কচি কচি
মাথা খাবার কল খোলে!

(৩)

দোকতা ছিল একা—তাতে
পানের মসলার ভাঁজ দিয়ে
তৈরি হলো উদ্ভট এক
"গুণ্ডি"-দোকতা নাম নিয়ে

(৪)

পরে এলো কাশী থেকে
কৌটা করা 'সুরতি'
কি ছাই আছে, জানি নাক,
তাই খেয়েই ফুরতি।

(৫)

দেখতে দেখতে বাজারেতে
বাহির হল 'জরদা',
ছেলে বুড়ো সবার তখন
গেল চোখের পরদা।

(৬)

ছেলেদের নস্তি ছিল,
মেয়েদের হলো দোক্তা
অপরং বা কিং ভবিষ্যতি
যা হবার শেষ হোক্‌তা।

কবিতা শেষ করিয়া নিধিরাম পত্র লিখিতে বসিল। ভাবিল, বোধ হয় পত্র লিখিবার দোষেই গতবার তাহার কবিতাটি প্রকাশিত হয় নাই; সেইজন্য এবার আরও মোলায়েম করিয়া সরল ভাষায় পত্র লিখিল।

মহাত্মন্!

বড় আশায় বুক বাঁধিয়া কবিতাখানি আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম। শত শত সনামধন্য কবিদিগের কল্পনা-কুসুম-হারে যে "ভাগীরথীর" অঙ্গ বিভূষিত, যাহাদের সৌরভ তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া "ভাগীরথী" বাস্তবিকই ভাগীরথীর ন্যায় প্রাণমন বিমোহিনী কুলুকুলুতানে প্রবাহিতা, "দোকতার ইতিহাস" শীর্ষক এই ক্ষুদ্র কবিতা কুসুমটী সেই ভাগীরথীর উদ্দেশেই উৎসর্গীকৃত হইল।

মৎসদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির চয়িত এই ক্ষুদ্র কুসুমকলিকাটি যে "ভাগীরথীর" অঙ্গে স্থান পাইবার উপযুক্ত নয়, তাহা জানি। যদি বলেন জানিয়াও এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে কেন, তবে বলিব,—পাপীর কি গঙ্গা-স্নানে অধিকার নাই? পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর সলিলসিঞ্চনে মহাপাপীর কলুষ গাত্রে যদি বিমল জ্যোতির বিকাশ না হইত—পুণ্যসলিলা জাহ্নবী যদি কেবলমাত্র পুণ্যবানদিগেরি পবিত্র অঙ্গ ধৌত করিতেন—তাহা হইলে কে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিত? পরম পবিত্র রামনামে যদি রত্নাকরের ন্যায় মহাপাপীর উদ্ধার সাধন না হইত, তাহা হইলে, তাঁহার মাহাত্ম্য কোথায় থাকিত?

এই সাহসে বুক বাঁধিয়া ক্ষুদ্র কবিতা প্রেরণ করিলাম। সম্পাদক মহাশয়, জীবনের প্রথম উদ্যমে চয়িত—এই ক্ষুদ্রকবিতাকুসুম যদি "ভাগী-রথীর" অঙ্গে স্থান পায়, তাহা হইলে জীবন ধন্য মনে করিব।

পরিশেষে মনে রাখিবেন, ইহা যুবকের প্রথম উদ্যমের ফল। যদি কোথাও ভ্রম দেখেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক ইচ্ছামত ভাব ও ভাষা পরিবর্ত্তন করতঃ সংশোধন করিয়া দিবেন, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।

আপনাদের সহানুভূতি ও উৎসাহ না পাইলে, আমারও উদ্যম "will be nipped in the bud" পত্রখানিও অনুগ্রহপূর্ব্বক মুদ্রিত করিবেন। ইতি—

আপনারই একান্ত অনুগত
শ্রীনিধিরাম শর্ম্মা।

পত্রখানি এইখানে শেষ করিয়া তাহার তৃপ্তি হইল না। সে শেষে "পুনশ্চ" দিয়া আর এইটুকুও যোগ করিয়া দিল।

পুনশ্চঃ—এই কবিতাটি আমার এক বন্ধুর হাত দিয়া কবি-সম্রাট রবিবাবুর নজরে পড়ে। তিনি ইহা পড়িয়া অনুকূল অভিমত প্রকাশ করাতেই আপনার নিকট পাঠাইতে সাহসী হইয়াছি। আশা করি, আপনার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী মহাপুরুষ কবিতাটি প্রকাশ করিয়া এ দীনের চিত্তে কাব্যরচনা বীজের স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিবেন। আমার অন্যান্য কবিতা, যেগুলি সম্বন্ধেও রবিবাবু অনুকূল মত দিয়াছেন, তাহাও পরে আপনার নিকট যথাসময়ে উপস্থিত করিতে পারিব বলিয়াই আশা রাখি। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহ। তবে যদি একান্তই আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার বিশালকায় শ্রেষ্ঠ পত্রিকার এক কোণে, এমনকি বিজ্ঞাপনের উপরে হইলেও কোন ক্ষতি নাই—ইহাকে একটু স্থান দিতে না পারেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ফেরত দিবেন। সঙ্গে অর্দ্ধআনার ডাকটিকিট পাঠাইলাম।

ভাগীরথী সম্পাদকের রসবোধ সম্বন্ধে নিধিরামের দারুণ সন্দেহ থাকিলেও, তিনি যে একজন সুরসিক লোক তাহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। তিনি নিধিরামের কবিতাটি ধন্যবাদের সহিত ফেরত দিয়া পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় পূজার রং চংয়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পত্রখানি বেনামা ছাপাইয়া দিয়া কবির অভিলাষ আংশিক পূরণ করিলেন। সেই সংখ্যার পত্রিকা পড়িয়া নিধিরাম কবিতা লেখা ছাড়িল। ভাবিল, কবিতার খাঁটি রস গ্রহণ করিবার লোক এ দেশে বড়ই বিরল। জনসাধারণে উপন্যাস ও নাটকেরই বিশেষ আদর করিয়া থাকে। এই ভাবিয়া সে কথাসাহিত্যরচনায় মন দিল। বহুদিন সে আর মাসিক পত্রিকায় কোনও লেখা পাঠাইল না। কেবল লিখিয়াই যাইতে লাগিল। পরে একদিন একটা ক্ষুদ্র উপন্যাসের খানিকটা কাপি লইয়া "ভাগীরথী" সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিল। প্রবন্ধের সঙ্গে এই মর্ম্মে পত্র দিল যে,—

"আমি সাহিত্যানুরাগে বর্দ্ধিত হইতে হইতে আমার হৃদয়ের নিম্নতর স্তর হইতে একটি অতি ক্ষুদ্র উপন্যাস সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে বাহির করিতে মনস্থ করিয়াছি, এবং উহা সর্ব্বপ্রথমেই মহাশয়ের করকমলে অর্পণ করিতে অভিলাষী। আশা করি, সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে আজ্ঞা হইবেক।

প্রতিমাসে দুই কি তিন পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করিয়া আপনার নিকট পাঠাইব—যদি দয়াপ্রকাশে আপনার "ভাগীরথী" মাসিকপত্রিকার একপ্রান্তে একটু স্থান দেন, তবে এ নগণ্য ব্যক্তি চিরকৃতার্থ হইবে জানিবেন। আপনার কৃপায় যদি সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে শিক্ষা পাই, চিরদিনের জন্য ঋণপাশে আবদ্ধ থাকিব।

এতদ্ব্যতীত আমি আরও পাঁচখানি উপন্যাস ও চারখানি নাটক লিখিয়াছি। ক্রমশঃ সে সবও আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। আপনাকে আগামী পাঁচ ছয় বৎসর পত্রিকায় প্রকাশার্থ গল্প ও উপন্যাসের জন্য অন্যত্র চেষ্টা করিতে হইবে না। এখন এটুকু আগামী সংখ্যাতেই ছাপাইয়া আমাকে বাধিত করিবেন। আপনার অনুগ্রহদৃষ্টির আশায় পথ চাহিয়া রহিলাম।

উপন্যাস রচনার নমুনা উদ্ধার করিয়া আর কাহারও বিরক্তি উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করি না। তবে বলা বাহুল্য যে, তাহাও নিধিরামের সময়-বৈগুণ্যে ফিরিয়া আসিল। নিধিরামের ধৈর্য্য এবার একেবারে সীমা ছাড়িয়া গেল। সে মহা খাপ্পা হইয়া উঠিল, এবং সম্পাদকের নির্ব্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার কথা পরিচিত বন্ধুসমাজে স্বগর্ব্বে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে নিধিরামের সুবুদ্ধি হইল। সে ভাবিল আর মাসিকপত্রে না লিখিয়া এবার একেবারে গ্রন্থকাররূপে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সাহিত্যজগতকে বিস্মিত ও আলোড়িত করিয়া দিবে। তদনুযায়ী সম্পাদকের খোসামুদি ছাড়িয়া দিয়া প্রকাশকের বাড়ীতে ধন্না দিতে আরম্ভ করিল। যতপ্রকার উপায় আছে, সে প্রকাশকের নিকট পুস্তকপ্রকাশ সম্বন্ধে প্রস্তাব করিল। প্রথম বলিল, খরচ সব প্রকাশকের, লাভ আধাআধি। তারপর, তাহার ভাগে সিকি, তারপর লাভের কোনও অংশ সে চায় না, কেবল বই বাহির হইলে, পঞ্চাশখানি বই তাহাকে দিতে হইবে, পরে পঁচিশখানি, পরে দশখানি, পরে তাহার নিজের জন্য কেবলমাত্র একখানি, কিন্তু তাহাতেও যখন প্রকাশক

এই কাগজমাগ্‌গির বাজারে এমন বই ছাপাইতে অস্বীকৃত হইল, তখন সে বলিল, আচ্ছা, কাগজের দামটা আমি দিব, বাকি সব খরচ আপনার। কিন্তু তাহাতেও যখন প্রকাশকের মন টলিল না, তখন নিধিরাম নিরস্ত হইল। তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইল, সংসারে সমজদার লোক বড়ই বিরল। সে প্রতিজ্ঞা করিল, আর কাহারও খোসামুদি সে জীবনে কখনও করিবে না। মন দিয়া চাকুরিতে উন্নতি করিতে সে বদ্ধপরিকর হইল। তদ্দ্বারা পয়সা জমাইয়া সে নিজে সম্পাদক, লেখক, সমালোচক ও গ্রন্থকার এই চারমূর্ত্তিতে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া ক্ষেত্রজাত আগাছা-সমূহ চিবাইয়া খাইবে।

নিধিরামের সাহিত্যচর্চ্চার গতি আমরা আজ এখানেই শেষ করিতে বাধ্য হইলাম। নিধিরাম আফিসের সাহেবের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিবার জন্য খুব মন দিয়া চাকুরি করিতেছে। পরে যদি আবার কোনও সন্ধান পাই ত, যথাসময়ে তাহা পাঠকবর্গের অবগত করাইতে চেষ্টা করিব। এ অসম্পূর্ণ জীবনীর জন্য অধীন লেখকের সকল ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

পাশের খবর

(শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

(১)

"বলি অম্বিক, কি হয়েছে, গালে হাত দিয়ে বসে কি ভাবছিস্ ?"

অম্বিকের চমক ভাঙ্গিল। গাল হইতে হাত নামাইয়া মার দিকে ফিরিয়া চাহিল, বলিল, "না মা, এমন কিছু নয়, এই যে ওবে লাহোরে একজামিন দিতে যাবে তাই খরচপত্রের কথা ভাবছি। বেটাদের অনাছিষ্টি। সব জায়গায় ৪।৫ দিনে একজামিন শেষ হয়ে যায় আর এ পাঞ্জাব কি না তাই একমাস লাগবে। এত দিন সেখানে থাকবার খরচ—"

"এই যে সেদিন ৬০৲ টাকা ধার কর্‌লি ?"

"সে তো ফি জমা আর কলেজের মাইনেতেই গেল।"

"এত খরচ যখন, তোদের আফিসে একটা চাকরি জুটিয়ে দিলেই তো হত ?"

"চাকরি জুট্‌লে কত টাকা আর মাইনে হ'ত মা ? ২৫৲ টাকার বেশী তো হ'ত না। তাতে কি আমার এই হা হা দশা ঘুচ্‌তো ? এ আমার বরাত। সেরোকে তো পড়াতেই পাল্লুম না। ওবেটা এণ্ট্রান্স, এফ. এ, তে ফাষ্টডিবিসনে ভাল করে পাস করেছে, বি, এ, টা যদি পাস করে অন্ত কিছু না হ'ক্‌ আমাদের আফিসে ৬০৲ টাকার চাকরি তো হবে, তারপর আফিসের একজামিনটা দিলে ১২৫৲ টাকা মাইনে হবে।" বলিতে বলিতে অম্বিকাচরণের বদনমণ্ডল যেন প্রফুল্ল হইয়া আসিল।

সারদাচরণ যখন তুই বৎসরের বালক তখন তাহাদের মাতৃবিয়োগ হয়। পিতা পুনর্ব্বার বিবাহ করিলেন কিন্তু অভয় হইবার ৩।৪ বৎসরের ভিতর পিতা অম্বিকের উপর সংসারের সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। পিতা পুত্রে ডাকখানার হিসাব বিভাগে আফিসে কর্ম্ম করিতেন। কলিকাতা হইতে উহার একটি অংশ যখন দিল্লি আসিল তখন ইঁহাদেরও আসিতে হইয়াছিল। যত দিন বাপ বর্ত্তমান ছিলেন ততদিন বিশেষ কোন ভাবনাই ছিল না। তাঁহার অবর্ত্তমানে সামান্ত ৪৫৲ টাকা বেতনে অম্বিকের পক্ষে এত

বড় সংসার চালান বড়ই কঠিন হইয়া উঠিল। সেই জন্য সারদার আর এফ, এ, পড়া হইল না। ২৫৲ টাকা বেতনেই আফিসে ঢুকিতে হইল।

অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে যায়। কয়েকবৎসর পরে আফিসে বেতন বৃদ্ধির এক নূতন বন্দোবস্ত মঞ্জুর হইয়া গেল। তাহার ফলে সারদার ৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু এণ্ট্রান্স পাস করা না থাকায় অম্বিকাচরণকে একই বেতনে "খ" অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীতে পড়িয়া থাকিতে হইল। এই শ্রেণীতে ৫০৲ টাকার উপর আর বেতন বৃদ্ধি হইবে না। এইটি তাহার, তাহার কেন বাড়ী-ঘরদোরের মায়া ছাড়িয়া, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করিয়া যাহাদেরই এই অজানা দেশে আসিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রাণে বড় লাগিল।

সাংসারিক ভাবনায়, আর্থিক কষ্টে, দেনার যাতনায় আর আফিসের এই অপ্রত্যাশিত ও অচিন্তিত শ্রেণীবিভাগজনিত মনোকষ্টে অম্বিকের বার্দ্ধক্য আসিয়া পড়িল। কেহ মহানুভূতি দেখাইয়া কেহ বা বিদ্রূপ করিয়া কত কথাই শুনাইতে লাগিল। অম্বিক সে সকল বিশেষ করিয়া কাণে লইত না। আফিসের কাজ সারিয়া বাটী আসিত, আপনার দুঃখে আপনিই দিন কাটাইত। মেঘাচ্ছন্ন দিনে বিদ্যুৎ চমকাইবার মতন তাহার মনে মধ্যে মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা আসিত—অভয় বি, এ, পাস করিবে, ভাল চাকরি পাইবে, দুঃখ ঘুচিবে।

অভয় ভাবিত পরীক্ষাটা এত শীঘ্র শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অম্বিক ভাবিত কই মার্চ মাস যে আর যেতে চায় না। মার্চ যাবে, এপ্রিল যাবে, তারপর মে—এখনও ঢের দেরী, আর তো দেরী সহ্য হয় না। হারু খুড়ো যে টাকার জন্য বড়ই তাগাদা লাগাইয়াছেন। ১৫ই এপ্রিলের ভিতরে সুদে আসলে টাকা না দিতে পারিলে কার্ত্তিক বিশ্বাস নালিশ করিবে লিখিয়াছে। গোপাল ময়রার ছেলের বিবাহ, হরে মুদি মাতৃদায় জানাইয়াছে, তাহাদের পাওনা টাকাগুলি তো না দিলে নয়। আবার দুই তিন জায়গা হইতে বিবাহের নিমন্ত্রণের পত্রও আসিয়াছে। আত্মীয়স্থল, আইবুড়ো ভাতের টাকা পাঠান উচিত কিন্তু উভয়ের লাহোর যাইবার খরচই যে আজও যোগাড় হইল না বা হইবার কোন আশাও যে পাওয়া গেল না। তাই আজ অম্বিক আফিস হইতে আসিয়া বারাণ্ডায় বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে অকূল পাথার দেখিতেছিল, কোন কিনারাই পাইতেছিল না। দুই ছিলিম তামাক বদলান হইল তবুও

অম্বিক হাত পা ধুইতে উঠিল না। বাড়ীতে সকলেই ভাবিল আফিসে কি একটা গোলযোগ হইয়াছে। অম্বিকের সম্মুখে কেহ আসিতে সাহস করিল না। অভয় যখন তৃতীয় বার তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল তখন অম্বিক রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল "ওরে, তামাক সেজেই সময়টাকে নষ্ট করে দিবি! আর কেউ না পারে আমি কি এক ছিলিম তামাক সেজে খেতে পারি নি? তোর এক এক মিনিট সময় যে আমার হাজার হাজার টাকা বলে মনে হয় রে।"

"এখন যে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে; একটু বেড়িয়ে আসব তাই তামাকটা সেজে দিয়ে যাই।"

"ওই! সেই কথাইতো বলছি, বলি, আমাদের মত গরীব লোকের বিশ্রাম কি? তার উপর তোমরা পোড়ো ছেলে, পড়্‌বে আপনার কাজ করবে, তাতে কষ্ট বোধ কি?"

দাদার খিটখিটে স্বভাব অভয়ের জানা আছে, সে তামাক দিয়া আপনার কাজে চলিয়া গেল।

পরদিন ৬॥ টার সময় আফিস হইতে আসিয়া অম্বিক দেখিল অভয় তখনও পড়িতেছে। "ওরে অত করে পড়ে শেষে কি সব পণ্ড করবি? মাঝে মাঝে একটু বিরাম দিতে হয়। যা দিকি একবার সন্তোষ বাবুর বাড়ী, গোটাকতক টাকা দেবেন বলেছেন।" অভয় মনে মনে একটু হাসিল। নানা রকম ভাবনায় দাদার মানসিক অবস্থা ঐরূপই হইয়াছে—সে কারণ দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিল—"হাঁ যাই।"

(২)

টাকার যোগাড় হইল বটে, কিন্তু অম্বিকের ভাবনা কমিল না। অভয় ছেলে মানুষ, একরাত্রও গৃহ ছাড়া অন্যত্র থাকে নাই। ঐ দূর দেশে কি করিয়া একলা থাকিবে? কোথায় থাকিবে, খাওয়ার কি বন্দোবস্ত করিবে? এই সকল কথা তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। অন্যান্য ছেলেরা কি বন্দোবস্ত করিয়াছে, অভয় তাহাদের কাহারও সহিত থাকিতে পারে কি না এই সব সম্বন্ধে প্রত্যহই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত। তাহাদের কোনও একটি প্রফেসার উপস্থিত লাহোরে আছেন, তিনিই সকল ছেলেদের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন এইরূপ জবাব অভয় দিত।

"ওহে, তা বলে কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়? একবার তাঁকে লিখেই দেখ না কি বলেন, আর দিন পনর বইতো নেই।"

"হাঁ, তাঁকে লিখেছিলাম, তিনি জবাব দিয়াছেন একটি কলেজের বোর্ডিংএ আমাদের থাকিবার ও খাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।"

দেখিতে দেখিতে প্রায় ৯।১০ দিন কাটিয়া গেল। পরীক্ষার আর ৫।৬ দিন মাত্র বাকী আছে। সারদা আসিয়া দাদাকে বলিল "অভয় পরশু লাহোর যাইবে বলিতেছে কিন্তু পরশু যে সংক্রান্তি।"

"অ্যাঁ, বলিস্ কি? "পক্ষান্তে নিষ্ফলা যাত্রা মাসান্তে মরণং ধ্রুবং।" কেন কাল কি?"

"কাল ত্র্যহস্পর্শ, দিকশূল, উত্তরে যোগিনী।"

"তা এতদিন সব ঘুমুচ্ছিলে? তেমন হয়, আজ কাল যাক না কেন?"

"গোছ গাছ হয় নি, সময়ও নেই। আর আজকের দিনই বা ভাল কই? কতদিন ওরে বল্লুম। এই যে আরও অনেকে গেল, ৯।১০ দিন থাকতে ভাল দিন ক্ষণ দেখে তারা তো গেল।"

"কথাটা কি জান? যা হবার তাই হয়. নিয়তি কেহ খণ্ডাইতে পারে না, তবুও লোকে দিনক্ষণ দেখে। আর কিছু না হ'ক, ভাল দিনটি হলে মনে কোন গোল থাকে না।"

"হাঁ. মনটা প্রফুল্ল থাকলে কাজ সহজে সিদ্ধ হয়। শুভদিনে যাত্রা করা হয়েছে, ফল শুভই হ'বে এই রকম আশাই মনে হয়।"

"তা ওর মনে যদি কোন গোল না ওঠে, তা হলেই হল। জিজ্ঞাসা করে দেখ।"

একথা বলিল বটে কিন্তু অম্বিক নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। সেই রাত্রেই গৃহান্তরে থাকিয়া অভয়ের যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিল। পরদিন সে লাহোর রওনা হইল। তৃতীয় দিন রবিবার চিঠি বিলির সময় চলিয়া গেল কিন্তু অভয়ের পৌঁছ সংবাদ আসিল না। আফিসের ঠিকানায় পত্র দিয়া থাকিবে—এইরূপ অনুমান করা হইল। সোমবার আফিসে কোন পত্র মিলিল না, অম্বিক বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িল। তার করিতে হইলে কাকে করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। বাটী আসিয়া মা ও সারদাকে ডাকিয়া পরামর্শ করিল। সারদা রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল "তোমার যে দাদা অনাছিষ্টি ভাবনা। অত বড় ছেলে কোথাও গেলে যদি অত ভাবতে হয়, তবে তাকে জানোয়ার করে ঘরে বসিয়ে রেখে দিও। আজ তার এক্জামিন আরম্ভ হয়েছে, কাল নিশ্চয়ই পত্র আসবে। না আসে, তখন একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

সারদার কথায় অম্বিক চুপ করিল বটে কিন্তু তার মন যেন বলিতেছিল "পক্ষান্তে নিস্ফলা যাত্রা মাসান্তে মরণং ধ্রুবং।" কথার কথা বলিয়া কথাটাকে উপেক্ষা করিতে পারিল না।

"হ্যাঁ মা, মা কালীর অক্সিটা সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল তো? তার জবাব পাইয়া যখন বুঝিল মা কালীর অক্ষ্যি, নিরঞ্জনের বিল্বপত্র প্রভৃতি সকলই দেওয়া হইয়াছে তখন অম্বিক একটু নিরস্ত হইল।

মঙ্গলবার সারদার কাছে অভয়ের পত্র আসিল। অভয়ের প্রফেসার মহাশয় বাসা ঠিক করিয়া দিতে না পারায় তাহাকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছে। সমস্তদিন এখান সেখান করিয়া ঘুরিতে হইয়াছে কিন্তু কোন ফল হয় নাই। অবশেষে কালী বাড়ী উঠিয়াছিল, সেখানেও ঘর খালি ছিল না। দয়াপরবশ হইয়া কোন ভদ্রলোক তাঁহার বৈঠকখানাখানি কয় দিনের জন্য ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হওয়ায় সেই রাত্রেই সেই খানে উপস্থিত হয়। কিন্তু দিনের বেলায় অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাহার জ্বর হয়। পরীক্ষাস্থলে ঠিক সময়ে হাজির হইতে পারে নাই, যাহা হউক পরীক্ষা দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু ভাল লিখিতে পারে নাই। সারদা দাদাকে পত্রের মর্ম্ম কিছু কিছু জানাইল কিন্তু সকল কথা বলিল না।

পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে, অভয়ের আজ আসিবার কথা। ৭টা হইতে অম্বিক ঘর বাহির করিতেছে, ক্রমে ৯টা বাজিল অভয় আসিল না। হয়ত গাড়ী আসিতে বিলম্ব হইতেছে, আধ ঘণ্টা হউক এক ঘণ্টা হউক একেবারে দু দু ঘণ্টা লেট! অম্বিক উপর হইতে নামিয়া গলির মোড় পর্য্যন্ত পাদচারণা করিতে লাগিল। কিছু পরে সারদা একলা ফিরিয়া আসিল। অভয় আসে নাই শুনিয়া অম্বিক বলিল "একটা কিছু গোলমাল নিশ্চয়ই হয়ে থাক্‌বে! অদিনে অক্ষণে যাওয়া, তোমরা কেমন এক রকম সকল কথাই উড়িয়ে দাও। যাক, বল্লে তোমাদের রাগ হবে।" বলিতে বলিতে ঘটনাচক্রে এক টিকিট বাবুর সহিত সেই খানেই দেখা হইয়া গেল। তাঁহার কাছে অম্বিক শুনিল অমৃতসরের কাছে কোথায় দুইটা গাড়ীতে বড় ভারী ঠোকাঠুকি হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল, সে সমস্ত রাত্রি চক্ষু বুজিতে পারিল না, শাস্ত্রের সেই কথাটাই বার বার মনে পড়িতে লাগিল "—মাসান্তে মরণং ধ্রুবং।"

যাহা হউক পরদিন অভয় নিরাপদে বাটী আসিল। একে একে তাহার

কষ্টের সকল কথা, জ্বর হওয়া, পরীক্ষাস্থলে যাইতে বিলম্ব, কত কষ্টে হলে প্রবেশলাভ প্রভৃতি বিস্তারিত করিয়া দাদার কাছে বলিল। "ও সব তো জানা কথাই তোমরা তো মানবে না, এখন কাপড় চোপড় ছাড় গে।" বলিয়া অম্বিক ধূমপান করিতে লাগিল।

(৩)

পরীক্ষার ফল বাহির হইবার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল অম্বিক ততই ব্যগ্র হইয়া পড়িল। দেবদেবীর উদ্দেশে কতই মানত করিল, মাথা খুঁড়িল। আফিসে কয়েকটা কর্ম্ম খালি হইয়াছে, শীঘ্র শীঘ্র পরীক্ষার ফল বাহির হইলে অভয়ের জন্য ৬০৲ টাকার একটি পদ যোগাড় করা বোধ হয় অসম্ভব হইবে না।

"কই রে, ওরে, কই আজ তো শনিবার, খবর এল কি? একবার কলেজে গিয়ে দেখনা।"

"কলেজে যাব যদি ফেল হয়ে থাকি?"

"ফেল হবি কেন? কোন একজামিনে ফেল হস্‌নি, আর এইটেয় ফেল হবি?"

"শুনছি আসছে শুক্রবার রেজল্ট বেরুবে।"

আফিসে শীঘ্রই লোক লওয়া হইবে আর বিলম্ব করা যায় না। অভয়েরও এক দরখাস্ত পেশ করা হইল। বি, এ, পাশ করিলে ৬০৲ টাকা মাহিনা দিতে সাহেব প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু হায়, মানুষ যাহা করে তাহা যে হয় না, বিধাতা যাহা লিখিয়াছেন তাহা যে অখণ্ডনীয়। সে লেখার কাছে গরীব বলিয়া সহানুভূতি নাই, ধনী বলিয়া উপরোধ নাই। অভয় ফেল হইয়া গেল। অম্বিকের সকল আশা একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। আফিসে এখন ২৫৲ টাকার অধিক মাহিনা হইবে না। দেনাদারেরা কেহ কেহ নালিশ করিয়াছে, কেহ কেহবা নালিশ করিবে করিবে করিতেছে। আর এই যুদ্ধ বিগ্রহের সময় দুই ভাইএ যাহা পান তাহাতে সংসার খরচেরই যে সঙ্কুলান হয় না। আর একবার পড়াইবার জন্য সকলেই জিদ্ ধরিল! অম্বিকের অবস্থা কি তাহা জানিয়াও যেন লোকে বুঝিতে চাহিল না। নিজের সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া অনেক সময় লোকনিন্দাভয়ে অনেককে অনেক কাজ করিতে হয়। বৈমাত্রেয় ভাই, লোকের একটা কথা বলে ফেলাও আশ্চর্য্য নয়। বিশেষতঃ ইহারই মধ্যে যখন কেহ কেহ বলিতেছে

"ফেল হবে না, ছেলেটা বাজার করবে না পড়বে ?" যাহা হউক ৮টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত অম্বিক শুইয়া তামাক সেবন করিতে করিতে সাত পাঁচ কতই ভাবে কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না।

একদিন ঐরূপ ভাবিতেছে, মা আসিয়া বলিলেন "অম্বিক এই একটা চিঠি এয়েছে, দেখত কার ?" অম্বিক পত্রখানি খুলিল, পড়িল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, আবার রাখিয়া দিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন "কার চিঠি ?"

"কিশোরী বোসের চিঠি—তাঁহারা মেয়ের বিবাহ অন্যত্র দিবেন। একটি ছেলে এবার কলিকাতায় বি, এস্‌সি, পরীক্ষায় ভাল পাশ করিয়াছে, তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন।"

"এ কেমন ধারা কথা ? পাকা দেখা সব ঠিক ! অভয় আমার কি দোষ করলে ? তখন তো কত খোসামোদ কত সুপারিস করে ধরেছিল। ছেলের একজামিন দেবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতেই পারছিল না ?"

মাতার ক্রোধ দেখিয়া অম্বিক তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। "মা, যে লোকটা দেড় হাজার টাকা নগদ দেবে সে মেয়েটার কি হবে একবার ভেবে দেখে দেবে না ? একে তো তোমাদের এই অবস্থা, তার উপর ছেলেটা যদি পাশ করতে পারতো তা হলে না হয় বুঝতো—করে খাবে। তা পাঞ্জাবের বি-এই পাশ করতে পারল না। তারা যদি সেই দামে কলিকাতার ভাল পাশ করা ছেলে পায়, তবে কেন তোমার ছেলেকে নেবে মা ?"

পরীক্ষা ক্রমশঃ যতই কেন কঠিন হউক না পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অখ্যাতি বাঙ্গালার লোকের নিকট যাইবার নয়। স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর উর্দ্ধে উঠাও যাহাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই তাহারাও পাঞ্জাবের পাসের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে দ্বিধা করে না। অভয় গৃহান্তরে কি করিতেছিল, মা ও দাদার কথোপকথন সব শুনিল, মনে বড় আঘাত পাইল। সে স্থির করিয়াছিল দাদার যে অবস্থা তাহাতে তাহার আবার পড়া অসম্ভব, বিশেষতঃ প্রিন্সিপাল মহাশয় যখন আর তাহাকে ফ্রিষ্টুডেণ্ট (অবৈতনিক) লইতে পারিবেন না। সুতরাং ২০৲ টাকাই হয় আর ২৫৲ টাকাই হয় চাকরিই সে করিবে। কিন্তু আজ তাহার বড় জিদ জন্মাইল যেমন করিয়াই হউক সে পাস করিবেই। পাস না করাতে আজ ৩ বৎসরের সম্বন্ধ একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল।

(৪)

অভয়ের কাতরোক্তিতে, তাহার ব্যগ্রতায় প্রিন্সিপাল মহোদয়ের দয়া হইল।

তিনি তাহাকে প্রাইভেটে B. A. পরীক্ষা দিবার অনুমতি আনাইয়া দিলেন। অভয়ও দিন্‌কে দিন্ রাতকে রাত গ্রাহ্য না করিয়া পড়া শুনা আরম্ভ করিয়া দিল। দুই এক ঘণ্টা টিউসনি করিয়া আপনার বই কেনা প্রভৃতি খরচ চালাইতে লাগিল দাদার নিকট কাগজ কলমেরও পয়সা চাহিতে কুণ্ঠা বোধ করিত।

ভাইএর বিবাহ দিয়া দেড় হাজার টাকা পাইলে অম্বিক দেনা শোধ দিবে, মেয়ের ২।১টা গহনা বাকি ছিল সে গুলি না দিলে মেয়েটাকে শ্বশুর বাড়ী লইয়া যাইতেছে না, সেই কটি গহনা গড়াইয়া দিবে এইরূপ আশা করিয়াছিল। কিন্তু অম্বিকের অদৃষ্ট গুণে সকলই উল্টা হইল। ৬।৭ মাসের ভিতর দেশের ভদ্রাসন পাওনাদারেরা ক্রোক দিল, আফিসের মাহিনা attach করিল। অভয় আর কেমন করিয়া পড়ে? তাহার জন্যই তো এত দুরবস্থা হইতেছে। সে চাকরি করিবে দাদাকে জানাইল—অম্বিক বলিল "দূর তাও কি হয়? আমাদের বংশে যে একটাও গ্র্যাজুয়েট নেই। বি, এ, পাস করলে অবস্থা ফিরে যাবে। না হলে আমরা তো কষ্ট পেয়ে গেলুম আর তুইও চিরকাল পাবি। এ কষ্ট ঘুঁচিবে না। আর কটা মাস আছে বৈতো নয়, মন দিয়ে পড়। তুই বি, এ, পাস করতে পারলিনি এটা আমার বড় কষ্ট।"

প্রকৃতই অম্বিক যখনই শুনিত অমুক অমুক বি, এ, পাস হইয়াছে, তাহার মনে একটা বেদনা উপস্থিত হইত, তাহার ভাই পারিল না। কখন মনে হইত কলিকাতায় পড়িলে নিশ্চয়ই পাস হইত। সেখানকার পরীক্ষা সহজ, পড়া শুনাও ভাল হয়, না হ'লে এখানকার চেয়ে সেখানে শতকরা অত বেশী ছেলে কেন পাস করবে? কখনও ভাবিত পরীক্ষকেরা উহাদের কলেজের উপর আক্রোশ করিয়া উহাকে—উহাকে কেন ২।১টি ভাল ভাল ছেলেকেও—ফেল করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে আগ্রহ করিয়া খবর লইত—পূর্ব্ব-বৎসরের পরীক্ষকগুলি এ বৎসরও আছেন কিনা?

যাহা হউক দেখিতে দেখিতে পরীক্ষার সময় আসিয়া পড়িল। পরীক্ষাও হইয়া গেল। এবারে অভয় লাহোরে থাকিবার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া শুভ দিন দেখিয়া শুভক্ষণে পরীক্ষাস্থলে যাত্রা করিয়াছিল। পরীক্ষা দিয়া যথাসময়ে খুব স্ফূর্ত্তি করিয়া বাটী ফিরিল। কিন্তু বাটী আসিয়া দেখে দাদা শয্যাশায়ী, মেজদাদা ও মা কাছে বসিয়া রহিয়াছেন, সকলেই বিমর্ষ।

বাড়ীতে যেন সকলেই বিষণ্ণ। মেজদাদার নিকট শুনিল যেদিন দাদা, জামাই আবার একটি বিবাহ করিয়াছে খবর পান সেইদিন হইতে মুখ দিয়া খুব রক্ত উঠিতে থাকে। তারপর জ্বর হয়, এখন শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। অভয়ের প্রাণ উড়িয়া গেল, মনে মনে বলিল "ভগবান একি করিলে!"

(৫)

অনেকে বাহ্যতঃ আশ্বাস দিলেও অম্বিকের বুঝিতে বাকি ছিল না যে তাহাকে কাল রোগে ধরিয়াছে। এতগুলি বাচ্ছা কাচ্ছা কোথায় দাঁড়ায়? স্ত্রীপুত্রের জন্য একটি টাকারও সংস্থান করিতে পারে নাই। ভদ্রাসনটি ছিল তাহাও বিক্রয় হইয়া গেল। কে তাহাদের মানুষ করিবে? অভয়ের উপর এত আশা ছিল সেও তো গেল। এই সব ভাবিতে ভাবিতে অম্বিকের অসুখটি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যথাসম্ভব চিকিৎসা করান হইল, কোন ফল ফলিল না। অম্বিক বিবেচক লোক সবই বুঝিতে পারিত। তাই প্রায়ই অভয়কে বলিত "ওবে পাস করতে পারলিনি, আর পড়তে পাবিনি, এখন যে ঘাড়ে বোঝা পড়বে।" অভয় চক্ষু মুছিয়া বলিত "দাদা, কি বলছ? অসুখ কি কারো হয় না?"

"না ভাই এ রোগ যেন শত্রুরও না হয়।"

অভয় প্রাণপাত করিয়া দাদার সেবা করিত। সারদার আফিস কামাই না হয় এজন্য তাহাকে রাত্রে কাছে বসিতে দিত না, সে ভাল না থাকিলে রোগীর চিকিৎসা পথ্য হইবে না, ছেলেমেয়েরা খাইতে পাইবে না। স্ত্রী কাছে আসিলে, হয় অম্বিকের চক্ষে জল আসিত না হয় স্ত্রীর চক্ষে জল আসিত। কখন কখন অম্বিক বলিয়া উঠিত "ভয় কি? এই যে ওবে রইল সেরো রইল। এরা কি তোমাদের তাড়িয়ে দেবে?" অভয় বৌদিদির দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারিত না, চক্ষের জল গণ্ড বহিয়া আপনি পড়িত। অভয় মুখ ফিরাইয়া লইত।

"কই রে ওবে, আজ তো শনিবার, কই তোর খবর এল না, এবারেও ফেল হলি বুঝি?"

"শুনলুম ইংরাজীর কাগজ আবার re-examination হচ্ছে। বড় শক্ত করে দেখা হয়েছিল। অনেক ছেলে ফেল হয়েছে।"

"তবে আর আশা নেই।"

* * * * *

এক সপ্তাহের ভিতর অম্বিকের রোগ অত্যন্ত বাড়িল। জ্বর প্রায় ১০৪°।৫° উঠে, কাশি খুব এমন কি চামচ করিয়া দুধ খাওয়াইবার অবসর পাওয়া যায় না। কখনও জ্ঞান থাকে কখনও থাকে না। Deliriumএ কত কথাই বলে। সে সব শুনিলে মনে হয় যেন জ্ঞানতই বলিতেছে। কখন সারদাকে কখন অভয়কে ধমকাইতেছে, কখনও ছেলেকে লইয়া আদর করিতেছে। কখনও কাজ লইয়া আফিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সহিত ঝগড়া করিতেছে। কখনও কখনও 'আজ কালকার ছেলেদের উপর রাগ করিয়া কত কি বলিতেছে। রোগীর কাছে যাহারাই থাকিত তাহারাই তাহাকে সেই সংস্কৃত বচনটি কখন সমস্তটি কখনও একটি চরণ কখনও বা কিছু বদল করিয়া "মাসান্তে নিষ্ফলা যাত্রা পক্ষান্তে মরণং ধ্রুবং" আবৃত্তি করিতে শুনিতে পাইত। জ্ঞান হইলে মধ্যে মধ্যে ভাইদের বলিত "দেখ্ ভাই, ছেলেদের হাত ধরে বড় বৌকে দোরে দোরে না বেড়াতে হয়।" কখন সারদা কখন অভয় ধমক দিয়া উঠিত, অম্বিক চুপ করিত।

ছয় বৎসরের বালক জীবন ছল ছল চোখে বাপের কপালে হাত দিল। অম্বিক চাহিয়া ডাকিল "জীবে" কোলে টানিয়া লইতে পারিল না। অভয়ের এক হাত ধরিয়া বলিল "ওরে, জীবনকে তোকে দিয়ে গেলুম।" অম্বিকের গাত্র বহিয়া অশ্রুধারা পড়িল। অভয় কাঁদিতে কাঁদিতে দাদার চক্ষু মুছাইয়া দিতে লাগিল। জীবন জিজ্ঞাসা করিল—"কাকা, বাবা কাঁদ্‌ছে কেন?" অভয় জবাব দিতে পারিল না। হাত নাড়িয়া তাহাকে ঘর হইতে চলিয়া যাইতে বলিল।

ইহার পর অম্বিকের আর জ্ঞান হইল না। পরদিন সকাল হইতে অম্বিকের গলায় ঘড় ঘড় আওয়াজ হইতে লাগিল। শ্বাসপ্রশ্বাসের কেমন একটা বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল। ডাক্তারেরা Remitent fever বলিয়া চলিয়া গেলেন দুধ ভিতরে যাইতেছে না, গাল বহিয়া বাহিরেই পড়িতেছে। অনেক লোকই দেখিতে আসিলেন। প্রায় ১১।১১॥টার সময় হিন্দুস্থানী গলায় কে ডাকিল—"অভয়বাবু, অভয়বাবু!" অভয় বারাণ্ডা হইতে দেখিল, তাহাদের সহপাঠী দয়ালচাঁদ। সে অভয়কে দেখিয়া বলিয়া উঠিল "মিঠাই খেলাও।" অভয় রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "ক্যা বাত?" দয়ালচাঁদ বলিল "First class পাস হো গি—" ভিতর হইতে "ওরে ওরে" বলিয়া সারদা প্রভৃতি ডাকিয়া উঠিল।

অন্দর ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতেই হৃদয়বিদারক কান্নার রোল উঠিল। আর এ জন্মে দাদাকে পাশের খবর শুনাইতে পারিল না।

একাল সেকাল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(৩৫)

নির্ম্মল নীলিমার পিতা আনন্দমোহনের সঙ্গে তাঁহারই বাহিরের ঘড়ে উপস্থিত হইয়া দেখিল, নীলিমা চারিদিকে চেয়ার ঘেরা টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম লইয়া দাঁড়াইয়া উৎসুক দৃষ্টিতে পথের পানে চাহিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই সে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—"আসুন ডাক্তারবাবু।"

আনন্দমোহন কন্যার এই আচরণে যুগপৎ বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া ব্যস্ত স্বরে বলিলেন—"একি নীলিমা, তুমি যে বড় উঠে বসেছ।"

"কত সময়ই শুয়ে থাকি?" বলিয়া নীলিমা নির্ম্মলের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল—"বলুন না, ভোরের বেলা বেদনাটা কেমন বেড়ে উঠেছিল, বাবা তাই ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলেন।"

পাশের চেয়ারদুখানাতে পরে পরে নির্ম্মল ও আনন্দমোহনবাবু বসিয়া পড়িলেন। নির্ম্মল দেখিতেছিল, নীলিমার বেশভূষার পরিপাট্যের অভাব নাই, সদ্যঃ সংযত কোকরাণ চুল হইতে ফুর ফুর করিয়া গন্ধ বাহির হইতেছে। হাত-কাটা কেম্ব্রিজের উপর সরুপেড়ে সদ্যঃ ধৌত ফরাস টাঙ্গার মিহি কাঁপিরখানা বাতাসের আগে দুলিতেছে। হাব ভাব বিলাস বিভ্রমের মধ্যেও একটা মনোমত্তান ইচ্ছাকৃত জড়িমা যেন বয়াজের রূপশোভা দ্বিগুণ করিয়া তুলিয়াছে, হাতে প্রেম বলয়, কর্ণের দোদুল্যমান কুণ্ডলে প্রভাত রবির কিরণ পড়িয়া তাহাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, ঘরে বাতাসের অভাব ছিল না, তবু বৈদ্যুতিক পাখার বিরাম নাই। নীলিমা চা ঢালিয়া চিনি মিশাইয়া পিতার নিকট এক পেয়ালা সরাইয়া দিয়া ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"চা খাবেন হয়ত?"

এইমাত্র চা পান করিয়া আসিয়াছিল বলিয়া যদিও নির্ম্মলের মোটেই পিপাসা ছিল না, তবু সে ভদ্রতার খাতিরে বলিল—"কেন খাব না, খাবার জিনিষ পেয়ে নাকি পরিত্যাগ কর্ত্তে আছে।"

পেয়ালাটা নির্ম্মলের হাতে দিয়া নীলিমা মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল"—শুনেছি, আপনাদের দেশে নাকি চায়ের প্রচলন নেই।"

"দেশের সঙ্গে আমার সম্বন্ধও বড় কম, কাজেই সেখানকার প্রচলন থাকা না থাকায় বেশী কিছু আসেযায় না।" বলিয়া সে চামচে চা লইয়া ফু দিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

নীলিমা কটাক্ষ করিয়া বলিল—"দয়া করে একটু যদি বসেন ত খানকত পাউরুটি ?" বলিয়া সে জ্বলিত ষ্টোভের নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া ছুড়ি দিয়া পাউরুটি কাটিতে আরম্ভ করিল।

নির্ম্মল স্মিতহাস্যে বলিল—"লোকে বলে,না, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বয়, নৈলে রোগী দেখ্‌তে এসেত এমন আহার জোটে না।"

নীলিমা ততক্ষণে পাউরুটিতে মাখন মাখিয়া এনামেলের রিকাবিতে করিয়া আনিয়া নির্ম্মলের নিকট রাখিয়া দিয়া নিজেও একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাদের দেশে কেন চা খায় না বল্‌তে পারেন ?"

আনন্দমোহনবাবু পেয়ালা রাখিয়া একখানা ইংরাজী সংবাদপত্রে মন দিয়াছিলেন, মুখ তুলিয়া বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"এ তোমার কি রকম প্রশ্ন নীলিমা, সবাইকে যে খেতে হবে তার মানে।"

"মানে আবার কি ?" বলিয়া নীলিমা মৃদু হাসিল। নির্ম্মল বলিল—"খায় না এমন কথাই কেন বলি, যাদের জোটে না; তারা ঐ কথা বলে বাহাদুরি করে।"

দেখিতে দেখিতে দিনের আলো বাড়িয়া চলিয়াছিল, নীলিমা চাপান শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"এখন ত বেশ ভাল আছি, কিন্তু এই বেদনাটা যেন আমার অস্থিমজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে, সময় অসময় নেই, এক একদিন একেবারে চেপে ধরে।"

আনন্দমোহনবাবু সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া কন্যার কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন—"সত্যি ডাক্তারবাবু, এ যেন এক বিপদ্ হয়েছে, আপনি যদি একটু চেষ্টা করে—"

বৃদ্ধের মুখের কথা শেষ হইতে পাইল না, আভা ও মালতী আসিয়া উপস্থিত হইতেই নীলিমা অভ্যর্থনা করিয়া নির্ম্মলের পরিচয় দিয়া বলিল—"ইনি নতুন ডাক্তার হয়ে এসেছেন, আমাদের বাড়ীর পাশেই থাকেন।"

আভা এই অসম্ভব সমাবেশে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, নীলিমা সঙ্কুচিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"ডাক্তার বাবুর হয় ত এখন সময় হবে না।"

নির্ম্মল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সৌজন্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কেন বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে ?"

"প্রয়োজন কৈ না তেমন কিছু নেই ?" বলিয়া নীলিমা থামিল।

অল্প হাসিয়া নির্ম্মল বলিল—"কাজ যদি নাই থাকে, তবু কিছু বিনা প্রয়োজনে কেউ বসে থাকে না।"

আভা হাসিয়া বলিল—"দেখ্‌ছে না, আমাদের একটি লোকের অভাব হচ্ছে।"

নির্ম্মল মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল, আনন্দমোহনবাবু বলিলেন—"আমার এই মেয়েটি যে দেখ্‌ছেন, এর কিন্তু অদ্ভুত প্রকৃতি, সারা সকাল বেলাটা ও তাস নিয়ে থাকৃতে ভাল বাসে, লোক না জুট্‌লেই খোজাখুজির ধুম পড়ে যায়।"

তিনি তিনটি যুবতীর সহিত তাস খেলিতে হইবে ভাবিয়া নির্ম্মলের যেন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল, সহসা সে উত্তর করিতে পারিল না, নীলিমা ভদ্রতা করিয়া বলিল—"না না সে কেমন করে হবে, সকাল বেলা, ওর হয়ত হাতে কাজ রয়েছে, কাজ নষ্ট করে কিছু ধরে রাখা চলে না।"

কাজ যে নির্ম্মলের মোটেও ছিল না, তাহা সে বলিতে পারিল না, প্রভাতের এই অযাচিত আনন্দের প্রসঙ্গটাকে ত্যাগ করাও যেন তাহার পক্ষে শক্ত হইয়া উঠিল। আভা ঘরের পাশে চৌকীর উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল—"কাজত সারাজীবন কর্ব্বেন, এমন আনন্দত সহজে মিল্‌বে না।"

দেখিতে দেখিতে মালতী ও নীলিমা গিয়া বসিল, একটা কোণা খালি দেখিয়া নির্ম্মল আর কথা বলিল না, ধীরে ধীরে স্থান অধিকার করিল। এই যুবতীসংসর্গে কেমন যেন তাহার বুকটা একটু কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সে অতি অকিঞ্চিৎকর, দেখিতে দেখিতে খেলা জমিয়া উঠিল, হাস্যপরিহাসে নির্ম্মলের অবসন্ন মনের কালিমা ধৌত হইয়া গেল, শোভার অভাব তাহাকে যে প্রবল পীড়া দিতেছিল, ইহাদিগের সহিত মিশিয়া তাহা যেন অনেকটা

কমিয়া গেল, প্রথম প্রথম নির্ম্মলের কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, ক্রমে এক দুই করিয়া যখন কয়েকবার খেলা হইয়া গেল, আর ক্রমাগত হারিয়া সে মহা আনন্দ অনুভব করিতেছিল, তখন নীলিমা বলিল—"শুধু লেখাপড়া করে মানুষের কোন জ্ঞান হয় না।" বলিয়া সে মুচকি হাসিল।

"সে কথা আপনার স্বীকার করি।" বলিয়া নির্ম্মল তাহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মনের গতি সংযত করিয়া তাস দিতে চেষ্টা করিতেছিল। তখন বেলাও হইয়াছে, খেলাও বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, ঠিক সে সময় সতীশ প্রবেশ করিয়া বলিল—"আসল কথাটাই যে ভুল হয়েছিল, নির্ম্মলবাবু।" বলিয়া আনন্দমোহবাবুকে নমস্কার করিয়া বলিল—"এই নির্ম্মল-বাবুটি আমাদের বন্ধু, ওকে নেমন্তন্ন কর্‌বার জন্যে পিসীমা আমার পেছনে লেগে পড়েছেন, কদিন ত পেরে উঠিনি, আস্‌ছে রবিবারে নাকি তাঁর কি ব্রত—"

আনন্দমোহনবাবু এতক্ষণ একটা খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিয়া-ছিলেন, নির্ম্মলের নমস্কারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"বসুন বসুন, তবুত দেখা হল, আপনি যে এমুখো আর হতে চান না।"

নীলিমার সরল হাস্যময় মুখ যেন সতীশের আগমনে ম্লান হইয়া উঠিয়া-ছিল, নির্ম্মলের প্রাণটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতেছে, প্রভাত হইতেই এই সতীশ যে তাহার পিছন লাগিয়াছে, ইহাতে তাহার মন ক্রোধে লাল হইয়া উঠিতেছিল, তবু সে এতগুলি লোকের কাছে ইহার প্রতিবাদ করা অসঙ্গত মনে করিয়া সহসা উঠিয়া পড়িয়া একটা ইংরাজি কাগজ টানিয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিল। সতীশ নীলিমার দিকে চাহিয়া ভ্রূকুটি করিল, নির্ম্মলকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল —"তা হলে নির্ম্মলবাবু।"

নির্ম্মল মুখ তুলিল না, অনিচ্ছায় বলিল—"পিসীমাকে বল্‌বেন, আমি ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হব।" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আনন্দমোহন-বাবুকে বলিল—"তা হলে এখন আসি।"

নীলিমা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সে যেন সতীশের এই বেয়াদবীর প্রতিশোধ লইবার জন্যই নির্ম্মলের সম্মুখে বলিল—"মাঝে মাঝে যদি এসে খোঁজ করে যানত বড় উপকার হবে।"

আনন্দমোহনবাবুও সায় দিয়া বলিলেন—"মাঝে মাঝে কি, আজ বিকালে একবার যে না এলেই নয়।"

নির্ম্মল যেন সতীশকে কাটাইয়া বিদায় হইতে পারিলে বাচে; কাজেই তাড়াতাড়ি পা বাড়াইয়া বলিল—"তা আসব।" বলিয়া সে একবার মাত্র নীলিমার ভার মুখের দিকে সস্পৃহ দৃষ্টি করিয়া বাহির হইয়া চলিল, "আমিও যাচ্ছি" বলিয়া সতীশ তাহার অনুগমন করিতে নীলিমা বলিল—"দেখ বাবা, এই সতীশবাবুকে আমি মোটে পসন্দ করি না, তুমি কেন ওকে এমন ভাবে বাড়ী ঢুকতে দাও।"

আনন্দমোহন আকাশ হইতে পড়িলেন, সতীশের প্রতি কন্যার এই বিরক্তির কারণ তিনি খুজিয়া পাইলেন না। নীলিমা আবার বলিল—"শেষটা বাধ্য হয়ে আমাকে বারণ কর্ত্তে হবে, তাতে কিছু ওরও মান বাড়বে না, তোমারও ভাল লাগবে না।"

তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ বাধা দিয়া বলিলেন—"ছিঃ নীলিমা, অমন কাজ না কি করে, এই সতীশ যে আমার বন্ধুপুত্র!"

"সে হক বাবা।" বলিয়া নীলিমা মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল, আনন্দমোহনবাবু বিস্ময়ে বিষাদে কাগজের দিকে মুখ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

(ক্রমশঃ)

ষষ্ঠ বর্ষ, } আশ্বিন, ১৩২৫ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অপরাধীর বৃত্তি

(লেখক—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়)

মোনাকো একটী ক্ষুদ্র রাজ্য!

ফ্রান্স ও ইতালীর প্রান্তভাগে, ভূমধ্য সাগরের উপকূলে সেটী অবস্থিত। মোনাকোর অধিবাসিসংখ্যা অনেক ক্ষুদ্র গ্রাম্যাপেক্ষা অধিক। সর্ব্বসমেত সাত হাজার। রাজ্যটী তাহাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলে প্রত্যেকের অংশে এক একর করিয়াও পড়িত কিনা সন্দেহ! কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজ্যটীরও একজন প্রকৃত রাজা ছিলেন; রাজার বাসের জন্য রাজপ্রাসাদ ছিল; সভাসদ, মন্ত্রী, ধর্ম্মযাজক, সেনাপতি ও সৈন্য সমস্তই এ রাজ্যে ছিল।

সৈন্যদলটী তেমন বড় নহে; সৈন্যসংখ্যা মোট ষাট জন; কিন্তু তাহা হইলেও সেটী একটী সেনাদলও বটে! অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় এখানেও কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল; তামাক, মদ প্রভৃতির শুল্ক আদায় হইত; 'জিজিয়া' করেরও প্রবর্ত্তন ছিল। অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় এখানেও লোকে নেশা করিত, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা এতই অল্প, যে রাজা সে কর লইয়া কোন মতেই পারিষদ প্রভৃতির খরচ যোগাইতে পারিতেন না। সেই জন্য দেখিয়া শুনিয়া তিনি অন্য উপায়ে কর আদায়ের প্রবর্ত্তন করিলেন। এই বিশেষ রাজস্ব জুয়ার আড্ডা হইতে আদায় হইত। লোকে জুয়া খেলিত, তাহাতে হার বা জিত যাহাই হউক না কেন আড্ডাধারী মোট খেলার টাকার উপর একটা মোটা রকম লাভ পাইত; এই আয় হইতে তাহাকে রাজকোষে একটা মোটা রাজস্ব দিতে হইত। তাহার নিকট হইতে এত অধিক কর লইবার একটা

বিখ্যাত ফরাসী গল্পলেখক Guy De Maupassut এর গল্প হইতে অনূদিত।

কারণও ছিল ; সমগ্র ইউরোপের মধ্যে এটী ছাড়া আর এরূপ জুয়ার আড্ডা একটীও ছিল না, সুতরাং আড্ডার মালিকও ইহাতে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিত। পূর্ব্বে জার্ম্মাণরাজ্যে এরূপ জুয়ার আড্ডা ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সে প্রথা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উঠিয়া যাইবার কারণ, খেলার শোচনীয় পরিণাম। লোকে ভাগ্যপরীক্ষা করিতে আসিয়া প্রায়ই জুয়ার মুখে আপনার সর্ব্বস্ব ধরিয়া দিত এবং সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িত। কেহ কেহ পরের গচ্ছিত ধন লইয়া ভাগ্যপরীক্ষা করিতে আসিয়া সকলগুলি হারিয়া দারুণ নৈরাশ্যে-পিড়ীত-হৃদয়ে গৃহে ফিরিত ; অবশেষে হয় জলে ডুবিয়া না হয় বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়া হতভাগ্যগণ নৈরাশ্য, দুঃখ ও অপমানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইত। কাজেই বাধ্য হইয়া জার্ম্মাণসম্রাট্ এ প্রথা তুলিয়া দিবার আদেশ দিলেন। মোনাকো রাজ্যে কিন্তু খেলাটা সমান ভাবেই চলিতে লাগিল ; তাহাকে বাধা দিবার কেহ ছিল না ; সুতরাং নিরুপদ্রবে তিনি জুয়ার একাধিপত্য করিতে লাগিলেন।

এখন হইতে জুয়াড়িরা জুয়া খেলিতে মোনাকো রাজ্যে আসিতে লাগিল। তাহারা খেলায় হারিয়াই যাক, বা জিতিয়া যাক, রাজার ইহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি ছিল না। একটা প্রবাদ আছে "সাধু উপায়ে প্রাসাদবাস করা যায় না।" মোনাকোরাজ জানিতেন, কাজটা অতি ঘৃণ্য, কিন্তু উপায় নাই! তাঁহাকে মান বাঁচাইয়া চলিতে হইবে ত। তামাক ও মদের শুল্ক লওয়াটাই কি ভদ্রোচিত! এমনি করিয়া তিনি রাজ্য চালাইতেছিলেন। জীবনের গোণাদিন কটা তাঁহার এই ভাবেই কাটিতেছিল। তাহা বলিয়া তাঁহার রাজ্যে কোন উৎসবেরই ক্রটি হইত না ; টাকার অপব্যয়ও যে না হইত এমন নহে।

তাঁহারও মুকুটোৎসব আড়ম্বর অনুষ্ঠিত হইত। তাঁহার রাজ্যেও গুণীর পুরস্কার, দোষীর সাজা এবং প্রথম অপরাধীর ক্ষমা লাভ হইত। অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় তাঁহারও মন্ত্রণাসভা, আইন কানুন, আদালত, পুলিস সকলই ছিল ; সৈন্যদেরও রীতিমত যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া হইত। সবই ছিল বড় রাজ্যের আদর্শ মত, তফাতের মধ্যে কেবল মোনাকোর কাজগুলি ক্ষুদ্র!

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মোনাকোরাজ্যের একজন অধিবাসী খুন করার অপরাধে ধৃত হইয়াছিল। সে রাজ্যে, লোকগুলি শান্তিপ্রিয়, এমন দুর্ঘটনা সে রাজ্যে পূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই। মহা আড়ম্বরে বিচারকগণ একত্রিত

হইয়া আইন অনুসারে এই ঘটনার বিচার আরম্ভ করিলেন। আদালত বিচারক, বাদী, ব্যারীষ্টার এবং জুরিতে পূর্ণ হইয়া গেল। মহাতর্কের সহিত বিচারকার্য্য আরম্ভ হইল ; অবশেষে আইনানুসারে বিচারক বিচারফল প্রকাশ করিলেন, অপরাধীকে ফাঁসি দেওয়া হইবে! এ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে সকল কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া গেল। তাহার পর রাজার নিকট বিচারের ফল লেখা কাগজখানি আনিয়া দেওয়া হইল। রাজা বিচারফল পড়িয়া সহি করিয়া দিলেন; বলিলেন,—"আইনে যখন বল্‌ছে, ওর ফাঁসিই হওয়া উচিত, তখন ফাঁসিই দাও।"

সারা কার্য্যটার মধ্যে একটা ছিট্ রহিয়া গেল;—মোনাকোরাজ্যে গিলেটিন বা ফাঁসির কোন ব্যবস্থা ছিল না, কোন মাহিনা করা ঘাতকও ছিল না; তবে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হয় কি করিয়া? মন্ত্রণা সভা কথাটা আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া জানিতে হইবে, একজন দক্ষ ঘাতক ও একটী গিলোটিন তাঁহারা পাঠাইতে পারেন কিনা এবং পারিলেই বা কি খরচ পড়িবে। যথাসময়ে পত্র পাঠান হইল। এক সপ্তাহ পরে উত্তর আসিল; ফরাসী গভর্ণমেণ্ট লিখিয়াছেন, একজন দক্ষ ঘাতক ও একটী গিলেটিন পাঠাইতে ১৬০০০, টাকা খরচ পড়িবে। পত্রখানি রাজাকে দেওয়া হইল। কথাটা তিনি বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিলেন ষোল হাজার টাকা! ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি বলিলেন,— "হতভাগার জীবনের দাম যে এত হবে না! এর চেয়ে সস্তায় কাজ সারা যায় না? এতে ষোল হাজার টাকা দিতে হ'লে লোক পিছু প্রায় দু'টাকার ওপর কর আদায় ক'র্‌তে হবে। তা কেউ বরদাস্ত ক'রবে না; শেষে বিদ্রোহ হ'তে পারে।"

কর্ত্তব্য অবধারণের জন্য আবার মন্ত্রণাসভা আহূত হইল। সে সভায় স্থির হইল ইতালীর গভর্ণমেণ্টকেও ঐ মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করা হইবে। ফরাসীরাজ্য স্বায়ত্ত শাসনের অধীন অন্য রাজার প্রতি তাহাদের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই, কিন্তু ইতালী-গভর্ণমেণ্টত' সেরূপ নহেন, তিনি হয়ত কাজটা সস্তায় করিয়া দিতে পারিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহাকে পত্র লেখা হইল এবং পরের ডাকেই তাহার উত্তর মিলিল।

ইতালী গভর্ণমেণ্ট লিখিয়াছেন, সানন্দে তাঁহারা একজন দক্ষ ঘাতক এবং একটী কল পাটাইতে সম্মত আছেন। পাথেয় প্রভৃতি সমেত ইহাতে মোট

খরচ পড়িবে ১২০০০, টাকা। হাঁ ইহা সস্তা বটে কিন্তু তবুও অনেকগুলা টাকা যে! বদমাসটার জীবনের মূল্য যে ইহার অর্দ্ধেকও নহে! ইহাতেও লোক পেছু প্রায় দুই টাকা করিয়া কর আদায় করিতে হইবে। আবার মন্ত্রণাসভা আহুত হইল। কি করিয়া কার্য্যটা অল্পব্যয়ে সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে, সভায় তাহারই মীমাংসা চলিতে লাগিল। প্রশ্ন উঠিল সৈন্যের মধ্যে কেহ কাজটা করিয়া দিতে পারে কিনা? সেনাধ্যক্ষ আহুত হইলে প্রশ্ন করা হইল,—"আপনার সৈন্যদলে এমন একজনও নাই যে, এই হতভাগ্যকে তরবারির আঘাতে হত্যা করিতে পারে।"

সেনাধ্যক্ষ সৈন্যদিগকে কথাটা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কোন সৈনিকই এ কার্য্য করিতে সম্মত হইল না। তাহারা বলিল—"কি ক'রে একাজ ক'র্‌তে হয় আমরা জানি না; কখনও আমাদের শেখানও হয়নি।"

তবে করা যায় কি? মন্ত্রিগণ আবার ইহার উপায় চিন্তা করিতে একত্রিত হইলেন। এই ঘটনাটার নিষ্পত্তির জন্য একটা কমিশন নিযুক্ত হইল, তাহার পর একটা কমিটি এবং সর্ব্বশেষে একটা সাব কমিটীও বসিল। শেষে স্থির হইল, সকলের চেয়ে সোজা উপায়, অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা রধ করিয়া আজীবন কারাবাসের আদেশ। ইহাতে রাজার ক্ষমাগুণের পরিচয়ও দেওয়া হইবে এবং কাজটাও স্বল্পব্যয়ে সুসম্পন্ন হইবে।

রাজা এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন এবং সেই মত কার্য্য হইতে লাগিল। ইহাতেও কিন্তু সকল গোলযোগের অবসান হইল না। একটা বন্দী আজীবন রুদ্ধ থাকিবার মত কারাগার কই? লোকটাকে রাখা যায় কোথা? একটা ক্ষুদ্র গৃহে, বন্দীদিগকে দিন কয়েক রাখিয়া দিবার মত স্থান, এখানে আজীবন একটা লোককে রাখা যায় কি করিয়া? এ গৃহত সেরূপ দৃঢ় ও সুরক্ষিত নহে। বহুকষ্টে একটা স্থানে রাখিবার মত কক্ষ পাওয়াগেল। কর্ত্তৃপক্ষগণ যুবক বন্দীকে সেই গৃহে বন্ধ করিয়া তাহার পাহারার জন্য একজন লোক নিযুক্ত করিল। প্রহরী বন্দীকে পাহারা দিত এবং রাজকীয় রন্ধনশালা হইতে নিত্য তাহার আহার আনিয়া দিত।

বন্দী মাসের পর মাস সেই স্থানেই কাটাইয়া দিতে লাগিল। ক্রমে পূর্ণ এক বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন রাজা রাজ্যের আয় ব্যয় হিসাব দেখিতে গিয়া একটা নূতন খরচ আবিষ্কার করিলেন।—সেটা বন্দীর ভরণপোষণ ব্যয়;—তিনি দেখিলেন এ ব্যয়টাও নিতান্ত অল্প নহে! ইহার জন্য একজন

স্বতন্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করিতে হইয়াছে, তাহার মাহিনা ব্যতীত খাই খরচও আছে। ইহাতে বার্ষিক প্রায় ৬০০৲ টাকার উপর খরচ পড়িয়া গিয়াছে! আরও দুঃখের বিষয় এই যে, বন্দী এখনও যুবক এবং সম্ভবতঃ আরও পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিবে। ইহা অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না। বৎসরে এতগুলো টাকার অপব্যয়! না না কিছুতেই তাহা হইতে দেওয়া হইবে না। কাজেই আবার মন্ত্রণাসভা আহুত হইল।

রাজা বলিলেন,—"হতভাগাটার সাজার অন্য উপায় কর,—খরচটা যাতে কম পড়ে। যে মৎলব করা হয়েছিল, এখন দেখ্‌ছি তাতেও যথেষ্ট খরচ প'ড়ছে।"

সমবেত মন্ত্রিগণ কথাটা ভাল করিয়া বিবেচনা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"আমাদের মতে প্রহরীকে বিদায় দেওয়াই উচিত।" অপর একজন বলিলেন,—"কিন্তু অপরাধী যদি পলায়?"

"যাক্ না, যা ইচ্ছে তার করুক্ গে।"

কথাটা রাজাকে জানান হইল; তিনিও এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। প্রহরীকে বিদায় দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ অপরাধী কি করে তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

ব্যাপারটা দাঁড়াইল এইরূপ।—বন্দী আহারের সময় বাহিরে আসিল এবং প্রহরীকে দেখিতে না পাইয়া আপনিই রাজকীয় রন্ধনাগার হইতে আপনার আহারীয় আনিয়া ভোজন করিল। তাহার পর বন্দিশালায় প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিল। পরদিনও ঠিক ঐ ভাবেই কাটিল। ঠিক সময়ে গিয়া সে আহার্য্য লইয়া আসিল; কিন্তু পলাইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। তবে করা যায় কি? আবার কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে বসিলেন।

তাঁহারা স্থির করিলেন, বন্দীকে স্পষ্ট ভাষায় চলিয়া যাইতে বলিবেন যে, তাঁহাদের তাহাকে কোন আবশ্যক নাই। পরামর্শ মত বন্দীকে ডাকিয়া পাঠান হইল।

বিচারক প্রশ্ন করিলেন,—"তুমি পালাও না কেন? আর প্রহরী নেই, কেউ তোমায় বাধা দেবে না, যেখানে ইচ্ছে যেত পার, রাজারও তাতে কোন আপত্তি নেই।"

বন্দী বলিল,—"কোন চুলোয় আমি যাব? যাবার যায়গাই বা কোথায়?

আমি যে কিছু ক'র্‌ব সে পথও আপনারা বন্ধ ক'রেছেন। প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ে আমার ইহ কালের সকল আশা নির্ম্মূল ক'রেছেন। যেখানেই যাব, লোকে আমায় দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে। তা' ছাড়া এখন আমার আর খেটে খাবারও সামর্থ্য নেই, আমার সব দিক্ আপনারা নষ্ট ক'রে দিয়েছেন। আপনারা বলুন, এটা কি ভাল হ'য়েছে? প্রথমতঃ আপনারা আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন, কিন্তু প্রাণদণ্ড ক'র্‌লেন না; সে গেল; আমি তাতে কোন কথাই বলিনি। তারপর আপনারা আমায় যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়ে একজন প্রহরীর জিম্মায় রাখলেন; দিনকতক বাদে তাকেও ছাড়িয়ে দিলেন; আমি নিজে গিয়ে খাবার এনে খেতে লাগ্‌লুম! এতেও আমি কোন অসন্তোষ প্রকাশ করিনি। কিন্তু এখন আপনারা আমায় সত্যিই তাড়িয়ে দিতে চান! আমি এতে মোটেই সম্মত নই। আপনারা যা ইচ্ছে কর্‌তে পারেন, আমি কোন মতেই নড়্‌চি না।"

তবে করা যায় কি? আবার মন্ত্রণাসভা আহুত হইল। এখন কি উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহারই তর্ক চলিতে লাগিল। লোকটা ত' যাইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করে না! সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন,—এ যে ভীষণ ভাবনার কথা! এখন মুক্তির একমাত্র উপায় লোকটাকে একটা বৃত্তি দেওয়া। কথাটা রাজার গোচর করা হইল। মন্ত্রিগণ বলিলেন,—এ ছাড়াত মুক্তিলাভের অন্য কোন উপায় দেখ্‌তে পাই না।" তাহাই হইল। বৎসরে বৎসরে ৬০০, ছয়শত টাকা অপরাধীর বৃত্তি ধার্য্য হইল।

বন্দী সকল কথা শুনিয়া বলিল,—"বেশ এতে আমি রাজী আছি, কিন্তু সময় মত টাকাটা পাওয়া চাই। তা না হ'লে নড়্‌চি না!"

সেইরূপই স্থির হইল। বৃত্তির এক তৃতীয়াংশ বন্দীকে অগ্রীম দেওয়া হইল। টাকাগুলি পকেটে ফেলিয়া বন্দী সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া গেল। যে স্থানে আসিয়া সে বাস আরম্ভ করিল, সেটা রেলপথে মোনাকো রাজ্য হইতে মাত্র পোনের মিনিটের পথ!

নূতন স্থানে সে সুবিধা মত একটা জমি কিনিয়া একটা বাগান ও বাড়ী করিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিল। এখন হইতে সে বেশ সুখেই জীবন কাটাইতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মমত মোনাকোয় গিয়া সে বৃত্তি লইয়া আসিত।

টাকাটা হাতে পাইলেই একবার জুয়ার আড্ডায় যাইয়া দুই তিন টাকার জুয়া খেলিত ; কোন বার জিতিত, কোন বার হারিয়া আসিত।

সুখের বিষয় লোকটা এমন কোন রাজ্যে অপরাধ করে নাই, যেখানের কর্ত্তৃপক্ষ অপরাধীর প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত নহেন।

পল্লী-গেজেট

(লেখিকা—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা মুখোপাধ্যায়)

(১)

"তোর যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, বেলা তিন পোর হতে চল্'ল এখন আমি ঘাটে বসে তোর সঙ্গে দুনিয়ার গল্প করি আর কি? তোর এত খপরেই কাজ কি লা? আমার এখনও আহ্নিক হয়নি। ঘরে যাব, রাঁধ্‌ব বাড়্‌ব খাবো। তোদের আর কি বল্ না? পেটটি মোটা ক'রে ঘাটে কাপড় কাচতে এসেছিস্ বই'ত নয়। নে তুই আর বকিস্‌নি, সর্ সর্ আমি ডুব দিয়ে নিই। কোথা কার হতচ্ছাড়ী হাড়হাবাতী গা, গায়ে জল ছিটিয়ে দিলে? তুই কি চোকের মাথা একেবারে খেয়েছিস না কি? ঘাটে বসে পূজো কচ্চি দেখতে পাচ্ছিস্‌নি। তবে রে হারামজাদী, আঁটকুড়ীর বেটী, আমার সঙ্গে ঠাট্টা? আয় দেখি তোকে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিই। পোড়া যমেরও মরণ নেই? এমন গয়ার পাপ সব ভুলে রয়েছে গা!"

"ওলো, ও ছোট বৌ চল্লি নাকি? একটু দাঁড়ানা? আমার হয়ে গেছে, এই জপটা হয়ে গেলেই হয়। কাল রাত্রে মিত্তিরদের বাড়ী অত কান্না কাটী উঠেছিল কিসের রে? ওমা কোন্ ছেলেটা? যেটা রেঙ্গুনে কর্ম্ম করত? তার বউ ছুঁড়ীর যা ঠ্যাকার? বড় মানুষের বেটীর অহঙ্কারে আর মাটীতে পা পড়ত না। বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। আমি একদিন মর্ত্তে মিত্তির বাড়ী একটু তেল চাইতে গিয়েছিলুম, তা গিন্নি মাগীকে সামনে না দেখতে পেয়ে বউ ছুঁড়ীকে যেমন বলিছি, আগুনখাকী অমনি ফোঁস করে উঠেছে। ওমা বল্লে কি জানিস? এ মাগী কে গা? এমন অসভ্যত' দেখিনি। আরও কত কি বল্লে মা, তা আমি অত শুনতেও পেলুম না, আর

অত ছাই মনেও নেই। আমার তখন রাগে গা জ্বলছে। আমায় কিনা মাগী বলা? হারামজাদী খান্‌কীর বেটীর এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি তখুনি সেখানে দাঁড়িয়ে তার চৌদ্দ পুরুষের খপর শুনিয়ে দিলুম। গিন্নী মাগী আমার গলা শুনে দৌড়ে এল। কত হাতে পায়ে ধর্ত্তে এল; আমার কি তাতে গায়ের জ্বালা মেটে গা। আমার তখন ইচ্ছা কচ্ছিল, আঁশবটী পেড়ে বউ ছুঁড়ীকে কেটে ভাগা' দিই। আমি তার চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করতে করতে বাড়ী ফিরে এলুম। খানিক চাদে দেখি গিন্নি মাগী একবাটী সরষের তেল আর এক খানা বড় থালে করে মস্ত এক সিধে নিয়ে এসে হাজির। তা যাক মা। মাগীরিই গেল। বউ ছুঁড়ীর আর কি বল? তার ত রাজরাজত্বি। ওমা তুই চল্লি যে লো, একটু দাঁড়ানা আমি আহ্নিকটা সেরে নেই।"

"বড় মানুষের বউ বলে অহঙ্কারে ফেটে মচ্চেন। আমার কথাটা গ্রাহ্যির মধ্যেই এল না। একটু দাঁড়াতে বল্লুম তা আর পাল্লেন না। মর্ মর্ আপদ এসে জুটলি কেন? আমি কি ডাকৃতে গেছলুম নাকি!"

"ওলো ও নলু! তুই কবে এলি লো? এরি মধ্যে যে ফিরে এলি? সবে ত' এই সেদিন শ্বশুর বাড়ী গেলি। বর রাগ করেছে নাকি? সেদিন যে তোর পিসি পাড়ায় গেয়ে গেল, জামাই আমাদের নলুকে ছেড়ে থাকৃতে পারে না, মোটে পাঠাতে চায় না।"

"ওমা তুমি যে এত বেলায়, আমি এই তোমার নলুকে দেখে আশ্চর্য্যি হয়ে গেছলুম। আহা দুধের মেয়ে অতদিন কি শ্বশুরবাড়ী থাকৃতে পারে? জামাই শুনছি বড্ড ভাল বেসেচে' মোটে পাঠাতে চায় না। জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে বেঁচে থাক, ওই ঘর জন্ম জন্ম করুক। তাই বলে কি তোমার মার প্রাণ বোঝে মা? তোমার কাছে এখন দুমাস রাখ। সেদিন যে কুমড়োর ডগা পাঠিয়ে দিছলি মা, ঠিক যেন আখের গুড়। তা দিস্‌মা দিস্ তোদের খেয়েই ত বেঁচে আছি। আহা তোর মত দয়ার শরীর কি আর আছে? গায়ের যত গরীব দুঃখী প্রতিদিন দুহাত তুলে তোদের আশীর্ব্বাদ করে। আজ কি কি রান্না হল?"

চল মা, এই যে আমারও হয়েছে, কথায় কথায় বেলা হয়ে গেল, টের পায়নি মা, কখন যে রাঁধব আর কখন যে পোড়ার মুখে দুগ্‌'রাস্ দেব, তার ঠিক নেই। সবি ঘুচে গেছে পোড়া পেটের জ্বালা আর ঘোচেনা।"

(২)

"বলি ও সেজ বৌ ঘরে আছিস? আমি পাড়াময় তোকে খুঁজে এলুম। ও মা তুই যে ঘরে দোর দিয়ে চোদ্দ পো হয়েছিস তা কি করে জানব? তোর তামাক পোড়ার কৌটটা কোথা গেল লা, আমি হাটবারে তামাক কিনতে ভুলে গিয়েছিলুম, আমার তামাক পোড়া একেবারে ফুরিয়ে গিয়েছে। আজ যে এখনও কেউ আসেনি দেখছি? উঠান দিয়ে কে আসছে বল্ দেখি, খেঁদির মা না? ও খেঁদির মা কি হয়েছে; শুনিছিস্ এইবার যে হাটে হাঁড়ী ফাঁক হয়েছে। মুখুজ্যেদের নলিনীকে শ্বশুরবাড়ী থেকে বিদায় করে দিয়েছে শুনিছিস্! সেদিন মিত্তিরদের বাড়ী ওদের বাড়া হেমতারিণী কিরকম গেয়ে গেল শুনিছিলি? আমাদের নলিনীকে জামাই একদণ্ড চোখের আড়াল করে না, রূপেগুণে একেবারে মোহিত হয়ে গেছে, শাশুড়ী এত ভালবাসে যে, বুক থেকে নামাতে চায় না, তার শ্বশুর একেবারে সোণার পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছে, কত কথাই শুনলুম। তা আমি কি কখনও লোকের কথায় থাকি বাছা? আমি আপন জ্বালা নিয়ে জ্বলে পুড়ে মচ্চি, সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। পোড়া লোকে পাঁচ কথা বলে, ইচ্ছে করি শুনবনা, তবুও কাণের ভেতর সেঁধোয়। কি হয়েছিল তা কি ক'রে বলব বাছা? তবে নলিনীর সেজ ননদ আমাদের ছোট বৌয়ের পিস্তুতো ভায়ের শালি হয়, ছোট বৌ বুঝি বাপের বাড়ী গিয়ে কি শুনে এসেছে, তাই কি ছাই বলছিল। তা আমার বাছা কি অত মনে থাকে। তোরাত' জানিস জামাই পাঁচটা পাশ করা, কোম্পানীর মস্ত চাকরী করে, কত কুড়ী টাকা মাইনে পায়। হরিদাস মুকুজ্যে অনেক তপস্যা করে তবে অমন জামাই পেয়েছিল," আজ কালকার দিনে দু হাজার টাকায় অমন জামাই মেলা ভার। আজকাল-কার ছোড়া গুলোর দুপাতা ইংরেজি পড়লিই যেমন মাথা খারাপ হয়ে যায়, জামাই ছোড়ারও নাকি তাই হয়েছিল। তিনি নাকি পাশ টাশ করে দিব্যি করেছিলেন যে, বিয়ে করবেন না, আইবুড়ো থাকবেন। তার পর বাছা, ত্রিশ না বত্রিশ বছর বয়সে হরিদাস মুখুজ্যের বরাতের জোরে তার নাকি বিয়ে কর্ত্তে মত হয়েছিল। বাপ মা অনেক দেখে শুনে মুখুজ্যেদের নলিনীকে পছন্দ করে, তারপর জামাই নিজে দেখে নলিনীকে পছন্দ করেন। বিয়ের পরে দুবছর কেটে গেল, তাতে ত বাছা কোন কথা শুনতে পাইনি। কি করে যে কি হলো তাও বুঝতে পাল্লুম না। নলিনী দু একবার শ্বশুরবাড়ী

এলো গেল, শুনলুম শ্বশুরবাড়ীতে নলিনীর খুব সুখ্যাত হয়েছে, তারপর দেখি নলিনী একেবারে বাড়ী এসে হাজির। এই সবে শ্বশুরবাড়ী গিয়েছে, আজ সকালে দেখি নলিনী তার মার সঙ্গে ঘাটে গা ধুতে আসছে।"

"ভিতরের কথা কি করে জানব বাছা, তাই কি লোকের সঙ্গে দুদণ্ড কথা কইবার অবসর পাই। সব ঘুচে গিয়েছে, পোড়া পেটের জ্বালা ঘোচে কই, ছোট বৌ সেদিন বলছিল শুনছিলুম পোড়ার মুখো মেয়ে নাকি জামাইকে বলেছে যে বিয়ে হবার আগে তার নাকি আর একজনের সঙ্গে ভাব হয়েছিল। আজকালকার ছুড়ীগুলো যেন কিরকম এক নূতন ধারা। ওই যে কি ছাই গুচ্ছের আপদ বালাই পড়ে, তার নাম নাটক বা নভেল, তাতেই দেশের সর্ব্বনাশ হচ্চে। আমারাও তো বাছা এককালে ছোটছিলুম, একেবারে ত এত বড়টা হইনি গা? আমরাও ছেলে বেলা কত বউ বউ খেলিছি, কত ব্যাটা ছেলের সঙ্গে খেলা ধুলা করিছি। কই এমন সর্ব্বনেশে কথাও তো কখনও শুনিনি, তা মুখ দিয়ে বেরোবে কি? ওই যে ও পাড়ার পূর্ণ চাটুয্যে উকিল, তার বড় ছেলে ইন্দু, ছেলে বেলা মুখুয্যে বাড়ী খেলতে আসতো। তখন নাকি নলিনীর সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল, মেয়ে নাকি বাক্যি দত্ত হয়েছিলেন যে, ইন্দু ছাড়া কাকেও বিয়ে কর্ব্বেন না। এমন সর্ব্বনেশে মেয়েও ত বাপের জন্মে দেখিনি বাছা? শুনিছি সেকালে রাজ কন্যাদের স্বয়ম্বর হতো, এ যে দেখছি কলিকালের স্বয়ম্বর। তা একালে কি ও সব পদ্যি আছে বাছা। যা করিছিস তা করছিস, মর্ত্তে সে কথাটি আবার বরের কাছে বলতে যাওয়া কেন, বল্ দেখি? প্রথম প্রথম নলিনীর স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, নাকি বড্ডই ভাল বেসেছিল, কিন্তু যেদিন থেকে জামাই এ কথা শুনেছে, তার পর দিন থেকে আর নলিনীর মুখ দেখেনি। শাশুড়ী মাগী কি করে, দুচার দিন দেখে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। কি জানিস বাছা এখনও ওপরে ধর্ম্ম আছেন, এখনও রাত দিন হচ্চে, চন্দ্র সূর্য্যি উঠছে। বড় মানুষের ঘরে ভাইঝির বিয়ে হয়ে, পাঁচটা পাশ ওয়ালা জামাই পেয়ে, মুখুজ্যেদের হেমতারিণী ধরা খানাকে একেবারে সরা দেখে ফেলেছিল। ভগবান হাতে হাতে তার ফল দেখিয়ে দিলেন। হেমতারিণী যখন পাড়ায় পাড়ায় ভাইঝির ঐশ্বর্য্যির কথা গেয়ে বেড়াচ্ছিল, তখন আমার কিন্তু বাছা মোটেই ভাল বোধ হয়নি। ঐ দেখলি বাছা এই জন্যিই ত বলি, না দেখতে দেখতে পোড়া বেলার কপালে আগুন লাগলো। আজ আসি লো

সেজ বৌ। তুই ঘাটে গা ধুতে যাবি নাকি, আমার আজ যেতে একটু দেরী হবে।

(৩)

বলি ও নতুন খুড়ী, বাড়ী এলে কবে? তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, তুমি বাড়ী না এলে কি মানায় গা। এই দশ বচ্ছর পরে বুঝি আমাদের মনে পড়েছে? কোন দেশে তোমরা থাক বাপু? সেখানে নাকি চিরকালই শীতকাল?

বরফ পড়ে কিগো? সে আবার কেমন ধারা? এমন দেশেও মানুষে ইচ্ছে করে যায়! হ্যাগা, বরফ মাথায় পড়ে মানুষের মাথা ভেঙ্গে যায় না? আমরা কি অত শত জানি বাছা, না জন্মে কখনও বরফ দেখেছি। এই মুখুয্যেদের নলিনীর বেতে মস্ত মস্ত বড় লোক বরযাত্রী এসেছিল, তাদের পোড়ার মুখে নাকি বরফ ভিন্ন জল রোচেনা। তাই হরিদাস মুখুজ্যে রেলের গাড়ী করে কল্‌কেতা থেকে বরফ আনিয়ে ছিল, ওদের হেমতারিণীর কি কম অহঙ্কার মা? সেই বরফ হাতে করে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে বেড়ালে বাছা? বাবা কি হিম গো? একটুখানি হাতে নিয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলুম। ধন্যি মেয়ে বাছা তুমি। সেই বরফের দেশে কি করেই থাক?

শুনিনি আর বাছা সবই দেখ্‌ছি সবই শুনছি। ঐ একরত্তি মেয়ে নলিনী তার পেটে এত বিদ্যে? আমাদের কালে অত শত ছিল না বাছা। বাপ মা ধরে এক হাড় হাবাতের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছিল, জন্মে ত তার মুখ দেখলুম না, পোড়ারমুখো মলো, মরে বাদ সেধে গেল। হয়েছিল কি জান খুড়ী? তুমি ত আমার পেটের মেয়ের মত। তোমায় ত সেদিন হতে দেখলুম। নলিনী বের আগে ও পাড়ার পূর্ণ্য চাটুয্যে উকিলের বড় ছেলে ইন্দু, তার সঙ্গে খেলতো! ইন্দু নলিনীর চেয়ে দু তিন বছরের বড় হবে! কিন্তু দেখতে ইন্দুকেই ছোট দেখাত; সেই এক মেয়েমুখো ছেলে আছে আমাদের গাঁয়ে, তার খেলা ধুলা উঠা বসা সবই মেয়েদের সঙ্গে। আমি বাছা মেয়ে মুখো লোক দেখতে ভালবাসি না। ইন্দু দিন রাত্তিরই মুখুয্যেদের বাড়ী পড়ে থাকতো, নলিনীর সঙ্গে তার বড় ভাব ছিল। একদিন বাছা বউ বউ খেল্‌তে খেল্‌তে ইন্দু নাকি দিব্যি করে ছিল, নলিনী ছাড়া আর কাউকে বে করবে না, আর নলিনীও দিব্যি করেছিল যে ইন্দু ছাড়া আর কারু গলায় মালা দেবে না। নলিনীর যখন বের সম্বন্ধ হয় তখন নলিনী নাকি তার

মাকে বলেছিল যে সে ইন্দু ছাড়া আর কাউকে বে করবে না ; তা মা মাগী মেয়ের কথা শুনে রাজী হয়ে ছিল, পুণ্য চাটুয্যে নাকি ছড়া লেখে ! আজ কাল বাজারে নাকি তার মস্ত নাম ? সে ছেলের কথা শুনে হরিদাস মুখুয্যের বাড়ী যেয়ে ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছিল ? ছেলের কথা তার নাকি ভ্যারি মনে লেগেছিল ! কিন্তু হরিদাস মুখুয্যে তখন কিছুতেই পুর্ণ চাটুয্যের ছেলের সঙ্গে নলিনীর বে দিতে রাজি হ'ল না। বল্লে ইন্দুর বাপ তো নতুন উকিল, এখনও বাড়ীতে একটা পাকা ঘর করতে পারে নি, সে আমার নলিনীকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবেই কি, আর শোয়াবেই বা কোথায় ? পুর্ণ চাটুয্যে বড়ই দুঃখিত হয়ে ফিরে গেছলো ; হরিদাস মুখুয্যে পণ করে বসেছিল যে পাশকরা ছেলে আর বড় লোকের ছেলে ভিন্ন মেয়ের বে দেবে না। দিয়েও ছিল তাই, জামাই পাঁচটা পাশ করা ; মস্ত বড় লোকের ছেলে, কিন্তু তা হ'লে কি হবে বাছা ; ছুড়ীর কপালে যে বিধাতা পুরুষ সুখ লেখেন নি। দিনকতক বাদে সোয়ামীকে বলেছে যে "বিয়ে হলে কি হয়, আমি তোমার পরিবার নই। আমি আর একজনের কাছে বাক্যি দত্তা।" জামাইটা না তাই শুনে ফুলে রাগে সাতখানা হয়ে, মেয়েটাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। হরিদাস মুখুয্যের এমন সাধের মেয়ে এখন হাত কামড়ে মচ্চেন। জামাই মেয়েকে ত্যাগ করেছে, আর নাকি নেবে না। মেয়েও ধন্যি মেয়ে, বাপ মার সাক্ষাতে বল্‌ছে যে আমি আর শ্বশুর বাড়ী যাব না। দেখ বাছা হরিদাস মুখুয্যের বোন হেমতারিণীর বড় অহঙ্কার, সেই জন্যই দর্পহারী মধুসূদন এমনি করে তার দর্প চূর্ণ করলেন।"

"দেখ খুড়ী, তুমি সেবারে যে সেই গরম বনাতখানা দিয়েছিলে, সেখানা যে কি গরম, তা আর কি বলবো, আর নরম যেন মকমল। সেই খানা গায়ে দিয়ে এই দশ বচ্ছর শীতের হাত থেকে বেঁচে গেলুম মা। তোরা শীতের দেশে থাকিস্ কিনা বাছা, তাই এত গরম জিনিস চিনিস ? তোর সেই বনাতখানা মা, আজও সেলাই করে গায়ে দিচ্চি। এবার যখন দেশে আসবি মা, তখন আমার জন্যে আর একখানা সেই রকম বনাত নিয়ে আসিস ? এনেছিস্ বুঝি ? তাড়াতাড়ি কি ? যখন হয় দিলিই হবে। বেঁচে থাক মা, তোমার বাড় বাড়ন্ত হোক, চিরকাল গরীব দুঃখীকে প্রতি-পালন কর।"

(৪)

"হ্যাঁলা ছোট বউ বলি তোর কি আক্কেল ? আমি বুড়ো মানুষ পরশু-দিন ঘাটে তোকে একটু দাঁড়াতে বল্লুম তা দাঁড়াতে পাল্লিনি। আমাদের ও বাড়ীর ছোট খুড়ী এসেছে, তাই একবার কাল দেখা করতে গেছলুম; ছোট খুড়ীর বড় দয়ার শরীর ভাই, এই দেখ্না কেমন একখানা দামী বনাত দিয়েছে, মুখুয্যে বাড়ীর হেমতারিণীকে দেখাতে যাচ্চি।"

ওদের জামাই এসেছে বুঝি, কেন কিসের জন্যে ? তবে না শুনলুম নলিনীকে ত্যাগ করেছে, আর নেবে না। মুখুয্যেদের কর্ত্তা বুঝি নিজে জামাই আন্‌তে গেছলো ? তা জামাই তো বড় ভাল মানুষ বাপু, একবার ডাকতেই শুড় শুড় করে এলো, তা কি জানিস্ ভাই, মেয়ে মানুষ তেমন হুসিয়ার হলে পুরুষের টিকি ধরে সাত সমুদ্রের জল খাওয়াতে পারে। ওমা, কি জাঁহাবাজ মেয়ে গো, সটান বলে দিলে 'ও আমার সোয়ামী না ? তার পর ? হরিদাস মুখুয্যে কি কর্ত্তে লাগলো ? আমার ভাই একবার হেম-তারিণীর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছে। জামাই ছোড়া আছে না চলে গেছে ? তার তো খুব সহ্যি ভাই ? নলিনী যদি আমার মাগ হতো তাহলে আমি এতক্ষণ তার বুকে ছুরী বসিয়ে নিজে আত্মঘাতী হতুম।

* * * *

সেজ বউ কতক্ষণ এসেছিস্ ? গাঁয়ের নতুন খপর শুনেছিস্ ? মুখুয্যেদের নলিনীকে যে কাল খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না; ধন্যি মেয়ে বাবা। মাতৃকুল পিতৃকুল, শ্বশুরকুল তিন কুল উজ্জ্বল কল্লে। জামাইটা নাকি এখনও যায় নি ? ওমা কি নির্লজ্জ বেহায়া পুরুষ মানুষ গো ? মাগিটা কেঁদে মচ্চে, হরিদাস মুখুয্যে আর হেমতারিণী এখানে ওখানে খুঁজে বেড়াচ্চে। হেম-তারিণী এখনও বলে বেড়াচ্চে 'আমাদের নলু তেমন মেয়ে নয়, সে নিশ্চয়ই আর নেই; হরিদাস মুখুয্যে আশ পাশের পাঁচ সাতখানা গাঁ ঘুরে এলো, তাকে পাবে কোথায়, সে হয়ত এতক্ষণ কল্‌কেতা পৌঁছে গেছে। কে আসচে না, মিত্তিরদের বড় গিন্নি না। ও বড় বৌ এত বেলায় কি মনে করে ? মুখুয্যেদের বাড়ীর নতুন খপর শুনিচিস্ ? কি বল্লি ? চাটুয্যেদের ইন্দুকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্চে না ? তবে যা ভেবে ছিলুম তাই ঠিক।"

* * * *

ওরে আজ কোন্ ভাতার খাগী শতেক্‌খোয়ারির মুখ দেখে উঠে ছিলুম

যে সমস্ত দিনটা জলে পুড়ে মলুম। আটকুড়ীর বেটা দারোগা, আমার বলে কিনা সাক্ষী দিতে হবে, হারামজাদা খান্‌কীর ব্যাটা তোর মা মাসী যে সাক্ষী দিব। হয়েছে আমার মুণ্ডু আর পিণ্ডী, সকালবেলা নাইতে এসেছি ঘাটে এসে দেখি জলের 'উপর কি একটা ভাস্‌চে। তাই দেখে আমি তো চীৎকার করে দাপিয়ে মরি। মিন্‌সেগুলো এসে যখন সেটা তুললে তখন দেখি মুখুয্যেদের নলিনী, আর চাটুয্যেদের ইন্দু। ইন্দু ছোড়া মরে গেছে তবু নলিনীর চুলের মুটো এমনি শক্ত করে ধরে আছে যে কেউ ছাড়াতে পাল্লে না। জামাই ছোড়া এখনও যায়নি, মড়া দুটো নাকি গরুর গাড়ী করে সহরে নিয়ে গেল। ছোড়া নাকি চন্দন কাঠ দিয়ে সে দুটোকে পোড়াবে। পূর্ণ চাটুয্যে মিন্‌সে পাগল হয়ে বেড়াচ্চে।

ওরে দেখতে দেখতে যে সন্ধ্যে হয়ে গেল, ও ছোট বউ দাঁড়া ভাই, তোর পায়ে ধরি, ও সেজ বৌ একটুখানি দাঁড়া, এইখানে যে ভেসে উঠেছিল রে। ও ভাল খাগিরা, ও আঁটকুড়ীরা এই বুড়ো বামনীকে ঘাটে ফেলে কোথায় চল্লি? ও বা—বা—গো—গে—লু—ম গো—রাম—রা—ম—মা—বে—ম্মা—রক্কে—রা—ম রা—ম।

অনুতপ্ত

(লেখক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

১

জোড়াসাঁকোর মুখুজ্জেদের বৈঠকখানাতে রবিবার বেলা ২টার সময় যখন পাশা খেলা পূরাদস্তুর চলিতেছিল, তখন বোকা আসিয়া তাহার কাকা বিপিনবাবুকে খবর দিল "জামাইবাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু হরদিন তাহার সঙ্গে আসে নাই। কোথায় চলিয়া গিয়াছে।"

"সে কি?" বলিয়া বিপিনবাবু পাশা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে "ব্যাপার কি, ব্যাপার কি" বলিয়া মহা হৈ চৈ আরম্ভ করিয়া দিলেন। বিপিনবাবু কাহারও কথায় কোন জবাব না দিয়া সরাসর বাটীর ভিতর

চলিয়া গেলেন। সিঁড়ীতে উঠিতে উঠিতে শাশুড়ী জামাইএর বচসা কিছু কিছু তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

"অত বড় খোট্টা মিন্‌সে আমাদের বাসা চিনে আস্‌তে পারবে না, এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা। আমাদের জেঠীর দরওয়ানদের কতটুকু কতটুকু ছেলে, একেলা আসে একেলা যায়—"

"বাবা, অত বুদ্ধি না হলে—

"বৌদিদি কি হয়েছে? কি হে প্রমথ, কি বল্‌ছ?" বলিতে বলিতে বিপিনবাবু দালানে প্রবেশ করিলেন।

"হবে আর কি আমার মাথা—হরদিনকে নিয়ে বাজারে গেল, বল্লে মাজী সহর দেখবো। মনে কল্লুম প্রমথ যাচ্ছে, তা সঙ্গে যাক্ না কেন? আমারই ঝকমারি। সে যে সঙ্গ ছাড়া হয়ে কোথায় গেল, তা আর ফিরে দেখল না।"

"দেখব না কেন?"

"থাক বাবা থাক্, আর পরিচয় দিও না।"

"অ্যাঁ বল কি? এখন উপায়? তার মা যে তাকে কিছুতেই আস্‌তে দেবে না। কত কষ্টে বুড়ীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবে ওকে এনেছিলুম। তার মার ধারণা কলকেতায় আড়কাটিতে ধরে নিয়ে যায়। কথাও বড় মিথ্যে নয়। এখন তাকে কি বলব? কিহে সঙ্গে নিয়ে গেলে, সঙ্গে করে আনতে পারলে না? কোথায় কোথায় গিয়েছিলে বল দেখি।"

"বড় বাজার হয়ে আমাদের জেঠিতে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে আমি এগিয়ে সে পেছিয়ে ছিল। হাবড়া পুলের মোড়ে এসে দেখি সে পেছনে নেই। কত খোঁজ করলুম, কত লোককে জিজ্ঞেস করলুম।"

"পুলিশে খবর দিলে না কেন?"

"অত বিদ্যে থাক্‌লে তো? অখদ্যে অবধ্যে আমার মেয়েটা ছিল, তাই হাত পা বেঁধে জলে ফেলে—

বিপিনবাবু বিরক্ত হইয়া বৌদিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন "আঃ"—"না ঠাকুর পো, তাই কি কোন একটা চুলো আছে?"

"ওকি বলছ বৌদি?" বলিতে বলিতে বিপিনবাবু তাঁহাকে দালান হইতে ঘরে লইয়া গেলেন। প্রমথও চলিয়া গেল। মা ও কাকাকে দেখিয়া আনদা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিল। ইহা বিপিনবাবুর চক্ষু এড়াইল

না। তিনি বলিলেন "গেনি, ও ঘর থেকে আমার জামাটা আর জুতো জোড়াটা নিয়ে আয় ত মা।"

জ্ঞানদা চলিয়া গেলে বিপিন বাবু বৌদিদিকে বুঝাইয়া বলিলেন, "ঘর-জামাই হ'লেও সে জামাই তো বটে, তাকে অমন করে বলা ভাল হয় নি। গরীব বলে ও রকম বল্লে মেয়ের যে লাগে। দেখে শুনেই তো দেওয়া হয়েছে, এখন রাগ করলে চল্‌বে কেন?

বিপিন বাবু পাড়ার ২।১ জন ছেলেকে লইয়া হরদিনের অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িলেন। . . .

(২)

নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতার কোনও সওদাগর আফিসে ৬০।৭০৲ টাকা বেতনে চাকরি করেন। তাঁহার ৪টি কন্যা ও ৩টি পুত্র। কন্যা কয়টিরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিশেষ সঙ্গতি না থাকায় মেয়েদের বিবাহে বিশেষ কিছু খরচপত্র করিতে পারেন নাই, সুতরাং মানুষের মতন একটিও জামাই হয় নাই। অপর জামাইগুলি কোনও মতে দিন গুজারণ করিতে পারে, ভদ্রাসনও আছে; কিন্তু সেজ জামাই না জানে লেখাপড়া, না আছে তাহার ভদ্রাসন। সুতরাং তাহাকে ঘরজামাই থাকিতে হইয়াছে।

বিবাহের পর নবীনবাবু জামাইএর লেখাপড়ার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ঘরজামাইএর যেরূপ হয় ইহারও তাহাই হইয়াছিল। কন্যা জ্ঞানদা বড়ই সুশীলা, সমস্তদিন রান্না প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকে। মা বাপের কোন কিছুরই ত্রুটি না হয় সে জন্য দিনরাত সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তাহারা দুজনে যে বাপ মার গলগ্রহ সে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল—বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই সে বড় কুণ্ঠিত, সদাই বিষণ্ণ।

চাকরটিকে সঙ্গে করিয়া না আনাতে প্রথমকে উদ্দেশ করিয়া পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিতেছে, হাসাহাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেছে। প্রাণে আঘাত লাগিলেও জ্ঞানদা কাহাকেও কিছু বলিতে সাহসী হইল না। নিজের মাই যে জামাইকে অকথ্য কুকথ্য বলিতেছেন। "ভিখারীর স্থান আছে কিন্তু তাহাদের কোথাও স্থান নাই। ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ভাল, তবু নিঃস্ব হইয়া কেহ যেন শ্বশুর বাড়ী বাস না করে।" জ্ঞানদার মনে কত কথাই উঠিতেছিল আবার মনেই সেগুলি লয় পাইতেছিল। "কেনই বা চাকরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল, যদি তাহাকে না পাওয়া যায়, এ অখ্যাতি চিরকাল থাকিবে।" জ্ঞানদা মা কালীর

পূজা মানিল কতই মাথা খুঁড়িল। আপন মনে অন্যমনস্কে কত কি ভাবিতে লাগিল। জুতার শব্দে চমক ভাঙ্গিলে ফিরিয়া দেখিল প্রমথ আল্‌না হইতে জামা লইয়া পরিতেছে। তাহার মুখ ভার, চক্ষু লাল, প্রকৃতি গম্ভীর। প্রমথ মুর্খ, নিঃস্ব হইলেও সুশ্রী সদানন্দ পুরুষ। আজ তাহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া জ্ঞানদার বুঝিতে বাকী রহিল না যে মার কথাগুলি তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে কত লাগিয়াছে! সে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল "জামা পরছ, কোথায় যাবে?"

"চুলোয়" বলিয়া প্রমথ ঘর হইতে বেগে বাহির হইয়া গেল। জ্ঞানদা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; সদর দরজার দিয়া বাহির হইবার শব্দ পাইয়া আঁচলে চক্ষু মুছিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

কলিকাতা সহরে চাকর হারাইয়াছে বলিয়া অন্বেষণ করাও বড় বিপদ। সহানুভূতি করা দূরে থাকুক লোকে ঠাট্টা তামাসা করে মজা দেখে। যাহা হউক প্রমথ যে যে রাস্তায় গিয়াছিল, সেই সব রাস্তায় এবং তার আশ-পাশের গলিগুলিতে বিপিন বাবু অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না; ক্লান্ত হইয়া বড় বাজারের পুলিশে খবর দিয়া আর কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, প্রভৃতি ভাবিতে ভাবিতে বাটীতেই ফিরিলেন। বাটীতে প্রবেশ করিতে না করিতে তাঁহার ছোট ভাইপো বলিয়া উঠিল "কাকা বাবু, হরদিন এসেছে।"

"কৈ রে কৈ?" মনিবের কথা শুনিয়া হরদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপিন বাবু বলিয়া উঠিলেন, "ব্যাটা গিছলি কোথা? খুব তক্‌লিফ্‌টা দিলি যা হ'ক। বাড়ী ফিরলি কি করে?"

হরদিন পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া মনিবকে দিয়া বলিল, "এইটে আমার কাছে ছিল, তাই তো বাসায় আসতে পারলুম। এই বলিয়া জামাইবাবুর সঙ্গছাড়া হইতে বাড়ী আসা পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক সকল বৃত্তান্ত মনিবের নিকট বর্ণনা করিল।

"যা বেটা যা, কি ভাবনা যে হয়েছিল তা তুই জানবি কি করে। মুখস্ত কর্‌ বেটা, এ গলিটার নাম বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। এ জায়গাটাকে জোড়া-সাঁকো বলে, বুঝেছিস্‌? মোড়েই মদের দোকান; তার সামনে চিঠি ফেলবার বাক্স, বুঝলিতো? উপস্থিত সকলে হাসিয়া উঠিল। হরদিনও বোধ হয় মনিবের ষ্টারী শুনিয়া মনে মনে হাসিয়াছিল, মুখে দু একবার "জি" "হুজুর" মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইল।

(৩)

বিপিনবাবুর জামাই আসিয়াছে। বাড়ীতে ইতিমধ্যেই খুব ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে, জ্ঞানদাকেই রাঁধিতে হইতেছে, কিন্তু আজ যেন কাজে তাহার মন বসিতেছিল না। তজ্জন্য মার কাছে গঞ্জনারও ত্রুটী হইতেছিল না। "যেমন বাবা তেমনি দেবী, কোনও যুগ্যতাই নেই। কপির ডালনাটা নুনে পুড়িয়ে দিলি, এখন জামাইটা খাবে কি দিয়ে? পারতো পোলাওটা ধরিয়ে ফেল। কেবল মুখ সর্ব্বস্ব। যদি না পার্ব্বি তো বল্লিনি কেন, ঊর্মিই না হয় রাঁধতো।"

"কপির তরকারীতে নুন ঊর্মিইতো দিয়েছিল মা।"

"কেন তোমার গতরে কি আগুন লেগে গিছলো?' ও ছেলেমানুষ জানে কি? লোকের মেয়ে দেখলে চোখ জুড়োয়—আর আমার মেয়ে দেখলে সর্ব্বশরীর জ্বলে ওঠে। তেলের বাটিটেও কি উর্মি ফেলেছে, না গামছা খানা উর্মি পুড়িয়েছে?" জ্ঞানদা কোন উত্তর করিল না,—চুপ করিয়া রহিল, নিজের অদৃষ্টকে মনে মনে ধিক্কার দিল।

রাত্রি ১০টার সময় যখন সকলে আহারে বসিলেন নবীনবাবু বলিলেন "কৈ প্রমথ বসল না যে?" ছেলেরা বলিয়া উঠিল "প্রমথ কোথায় গেছে এখনও আসে নি।"

বিরক্তভাবে নবীনবাবু বলিলেন "তাঃ, কোথায় গেল?"

"যাবে আর কোন চুলোয়? গিলতে আসবেহ এখন।"

"আঃ," বলিয়া নবীনবাবু গৃহিনীর দিকে চাহিলেন, কিছুই বলিলেন না।

বিপিন ও বিনোদের সহিত নানা বিষয়ে গল্পগুজব করিতে করিতে আহার শেষ করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন।

ক্রমে মেয়েদের আহারের উদ্যোগ চলিল। বিপিনবাবুর স্ত্রী বলিলেন "দিদি, জামাইটা কোথায় গেল একবার খোঁজ খবর নিলে না, ছেলেদের কাকেও না হয় পাঠিয়ে দাও না?"

"হ্যাঁ, পড়াশুনা কামাই করে ওরা ঐ করুক! তুই বুঝছিসনি, ও যাবে কোথায়, আজ না আসে কাল আসতেই হবে।"

সকলে আহারে বসিল। জ্ঞানদা বসিল না—তাহার পেট ভার। তাহার মা বলিয়া উঠিল "হাঁ হাঁ, জানি, আজকালকার মেয়ে কি না?"

জ্ঞানদা মার ধাত জানিত, কথার জবাব দিল না। মনে ভাবিল "একটা চাকর খুঁজতে বাটীশুদ্ধ; এমন কি পাড়ার লোক ছুটলো, আর জামাই

খোঁজ করতে গেলে ছেলেদের পড়ার খেতি হবে ?" কোন সকালে আজ ভাতে ভাত খেয়ে বেরিয়ে গেছে সমস্ত দিন গায় উপর দিয়ে গেল, একটু জল পর্য্যন্তও নয়। সে কি করিয়া খায় ? প্রমথর ভাত ঢাকা রহিল। এই আসে এই আসে করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানদা জাগিয়া রহিল। কতই ভাবনা তাহার মনে আসিতে লাগিল, যদি সে সত্যই আর না আসে ? দালানের জানালার কাছে বসিয়া বসিয়া জ্ঞানদা ঘুমিয়া পড়িল। যখন চেতনা হইল দেখিল প্রভাত হইয়াছে। "ছি ছি ঘুমিয়ে পড়লুম, যদি ডেকে ডেকে ফিরেগিয়ে থাকে ?" কোথায় গেল, কি খাইল কৈ আশ্রয় দিল প্রভৃতি ভাবনায় জ্ঞানদাকে আকুল করিয়া তুলিল।

(৪)

প্রমথ কুলীনের ছেলে, নিঃস্ব মূর্খ,বটে কিন্তু বড় অভিমানী, শাশুড়ীর কথার প্রতিশোধ তাহাকে লইতেই হইবে। সে প্রতিজ্ঞা করিল—যদি বিবাহ করিয়া জোড়ে গিয়া তাহার শাশুড়ীকে দেখাইতে পারে তবেই তাহার নাম প্রমথ মুখুজ্যে। প্রতিজ্ঞা তো করিল,কিন্তু উপস্থিত সে খায় কোথায় ? হাতে একটিও পয়সা নাই। তাহার মামী তাহাকে যাইবার জন্য কতদিন বলিয়া পাঠাইতেছিলেন কিন্তু সে নানা ওজর আপত্তি দেখাইয়া কাটাইয়া দিতেছিল। সেখানে যাইতে ইচ্ছা ছিল না, বাপের সহিত তাহার মামার কোন্ কারণে মনান্তর ছিল, সেজন্য জীবিতাবস্থায় তাহার বাপ কখনও তাহাদের মামার বাড়ী পাঠাইতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর একবার সে গিয়াছিল, কিন্তু মামার বিষয় সম্পত্তি তাহাকে না দিয়া অপরকে উইল করিয়া দিয়াছেন শুনিয়া সে আর কখনও মামার বাড়ী যায় নাই। উপস্থিত এখন কোথায় যায়, কি করে, তাহার বড়ই ভাবনা হইল। নানা রকম ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি ১০ টার সময় ভবানীপুর কাঁসারী পাড়ায় তাহার মামার বাড়ীতেই আসিয়া উপস্থিত হইল। মামীর যত্ন, লোকজনদের এত আদর অভ্যর্থনা তাহার কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। পরদিন আহারাদির পর প্রমথর মামী বলিলেন "পেমা, তোরে কতদিন ডেকে পাঠাচ্ছি, এই বেলা বিষয়-আশয় দেখে নিলে শেষে কষ্ট পেতেসনি। আমার শরীর তো এই ভগ্ন হয়েছে, এখন না হয় দিনকতক গঙ্গাস্নান করি, আর বিশ্বেশ্বরের নাম নি। উইলের প্রোবেট—"

"আমি দেখে শুনে নোবো কি মামি ? মামাতো রাখালের নামে—"

"রাখাল কোথাকার কে? এসে জুটেছিল, 'মা মা' করতো, আমরাও ছেলের মতন যত্ন করতুম। আর সেও বাবা আজ কমাস ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে।' বলিতে বলিতে মামি কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রমথ বুঝিল পালক-পুত্র, রাখাল আর ইহলোকে নাই। তাই আজ সে হঠাৎ এই এত বড় বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছে—এই জন্য তার এত যত্ন আদর অভ্যর্থনা! "ভগবান নিশ্চয়ই আছেন। আমার কোন চুলোয় জায়গা নেই, লোকে আমার সঙ্গে মেয়ের বে দিত না? দেখব দেখব।" প্রমথ মনে মনে কতই আস্ফালন করিল। উপস্থিত শ্বশুর বাড়ীর কথা গোপন রাখিয়া মামির সহিত নানা বিষয়ে গল্পগুজব করিতে লাগিল।

(৫)

সকালেও যখন প্রমথ আসিল না, মা বাপও খোঁজ খবর লইবার নামও করিলেন না, জ্ঞানদা অগত্যা ছোট ভাইকে চুপি চুপি একটু খোঁজ লইবার জন্য অনুরোধ করিল। প্রমথ যেখানে যেখানে যায়, যে যে তাহার বন্ধু বান্ধব আছে, মন্মথ সেই সেই স্থানে যাইল, সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেহই কোন খবর দিতে পারিল না। চীৎপুর জোড়াসাঁকো, চোরবাগান, নূতন বাজার প্রভৃতি স্থানে রাস্তায় রাস্তায় অনেক খুঁজিয়া বেড়াইল—কোন ফল ফলিল না। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া ১১টার সময় বাটী ফিরিল।

"হ্যাঁ রা মোনে, আজ বুঝি স্কুলে যাবিনি? এর মধ্যেই হয়ে গেল, এখনও তো বয়েস আছে।"

"মা, এই মুখুজ্যে মহাশয় কোথায় গেছে তাই খুঁজতে গিছলুম।"

জ্ঞানদা যে ভয় করিতেছিল তাহাই হইল। ভাইকে ইসারায় কি বলিল সে চুপ করিয়া গেল।

"তোরে কে খুঁজতে বল্লে? সেত আর কচি খোকা নয়, যে পথ হারিয়ে ফেলেছে, আসতে পারছে না। তেজ করে—"

"খুঁজতে বলবে কে? আমি নিজেই ইচ্ছে করে গেলুম।"

"হাঁ, তাহলে স্কুলটায় আর যেতে হবে না?"

"একটা লোক রাগ করে গেল তাকে তোমরা ডাক্‌লে না। সে যাহোক জামাইতো বটে—"

"যার তিনকুলে কেউ নেই তার এত রাগ কেন? হাড় জ্বালিয়ে খেলে। এত লোকের মেয়ে মরে আমার মেয়েটা মরে না।"

জ্ঞানদার চক্ষে জল আসিতেছিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে রান্না ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, ভাবিল মা ঠিক কথাই বলেছে। "ভগবান, আমার মরণ কেন হয় না ?"

স্নান করিয়া উঠিতে না উঠিতেই মন্মথ চীৎকার করিয়া বলিল "সেজদি ভাত বাড়।"

"এই যে বেড়েছি, আয় না।"

"এ কি, গলদা চিংড়ী যে! আহা মুখুজ্যে মশাই বড় ভালবাসে দিদি, কোথায় যে রাগ করে গেল? আচ্ছা, একবার জেঠীতে গিয়ে খবর নিলে হয় না ?"

ভগ্নস্বরে জ্ঞানদা বলিল "না ভাই।" মন্মথ দেখিল দিদির চক্ষুতে জল! কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বিপিনবাবুর স্ত্রী উপর হইতে বলিলেন "ওদিদি, বিনোদ চসমা ফেলে গেছে, আজতো কলেজে তার কিছুই পড়া হবে না।"

মন্মথর মা জবাবে বলিলেন, "এই যে মোনা স্কুল যাচ্চে, ওরে মোনা চসমাটা দিয়ে আসিস রে, বাছার কতই কষ্টই হচ্ছে।"

"হ্যাঃ, আমি ঐ করে বেড়াই? কোথায় আর্য্যমিশন আর কোথায় রিপন কলেজ!"

"এই যে এতক্ষণ কোন মিশনে গিয়েছিলে বাবা' কিছু বলছিনি তাই।"

জ্ঞানদা বলিল "যা না ভাই।"

মন্মথ স্কুলে চলিয়া গেলে মেয়েরা সকলে আহারে বসিল। বসিল না কেবল জ্ঞানদা। খুড়ীমা খুড়তুতো বোন সকলেই জিদ্ করিলেন। খুড়তুতো বোন উমাশশী বলিয়া ফেলিল "মুখুজ্যে মশাই চলে গেছে বলে দিদির আহার নিদ্রা ত্যাগ।"

জ্ঞানদা মনে মনে ভাবিল—চলে যাবার জায়গা থাকলে ভাবনা কি?

রাগ হইলেও গায়ের রাগ গায়ে মারিয়া সে বলিল "আমি বসলে কে দেবে ভাই ?"

"একেবারে নিয়েই বস না।"

যখন সকলে কিছুতেই ছাড়িল না, তখন একটা কাঁসীতে কতকগুলা ভাত একধারে একটু ডাল গোটাকয়েক কুমড়া ভাজা লইয়া জ্ঞানদাও বসিল।

"কইরে গেনি, তুই তরকারী কিছু নিসনি—মাছ নিসনি ?"

"খুড়িমা, কতকগুলো তরকারি আমি ভালবাসিনি।"

জ্ঞানদার মা বলিয়া উঠিলেন "নে ছোট বৌ, তুই বোস্। আধিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনি।"

জ্ঞানদা যে কেন তরকারি লয় নাই বিপিনবাবুর স্ত্রী অনুমানে বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু না বলিয়া নিজের পাত হইতে মাছের তরকারি তুলিয়া দিয়া বলিলেন "আজ যে একাদশী মা, আজ কি নিরিমিষ খেতে আছে?"

প্রমথ যাহা ভালবাসিত আজ যে সেই সবই হইয়াছে। সে আজ উপবাসী—জ্ঞানদা কি করিয়া ও সব মুখে দেয়? কিন্তু খুড়ীমার কথায় গা শিহরিয়া উঠিল। দ্বিরুক্তি না করিয়া সেও আহারে বসিল।

(৬)

দেখিতে দেখিতে কয়েক দিন কাটিয়া গেল প্রমথ আসিল না। নবীনবাবু একটু ভাবিত হইয়া পড়িলেন। যে সওদাগর আফিসে সে সরকার ছিল সেখানে খবর লইলেন, তাহার বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথাও কিছু সংবাদ পাইলেন না। কি করিবেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। আফিস হইতে আসিবার সময় হঠাৎ একদিন মনে হইল মদারহাঠে তাহার এক দূরসম্পর্কীয় কাকা আছেন। তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। প্রায় কুড়িদিন পরে পত্রের জবাব আসিল—প্রমথ তাঁহার বাটী যায় নাই। সে তাহার মামার অগাধ বিষয় পাইয়াছে তিনি শুনিয়াছেন,তবে উপস্থিত সে যে কোথায় আছে তাহা তিনি জানেন না। নবীনবাবুকে ভবানীপুরে খবর লইতে বলিলেন। পত্র পড়িয়া নবীনবাবু স্ত্রীকে শুনাইলেন। সকল কথা জ্ঞানদার কানে গেল। হাতজোড় করিয়া মা কালীর উদ্দেশে পটের দিকে চাহিয়া বলিল "হে মা কালী যেন তাই হয় মা। মুখ তুলে চেও মা!"

"আহা একবার ভবানীপুরে যাও না, দেখ না সেখানে আছে কিনা? সে যদি না জান্‌তে পেরে থাকে, তাহলে লোকে যে সব ফাঁকী দেবে?"

"ফাঁকী দিলেই হল—তার যে মামী বেঁচে।"

"তবে?"

"তবে, কি?"

"তবে সে কি করে বিষয় পেলে?"

"আহা তার মামা উইল করে রেখে গেছে।"

"তাই হবে। সে নিশ্চয় সন্ধান পেয়ে থাক্‌বে তাই গেছে নইলে সেত

তেমন ছেলে নয়। তোমাদেরই বা কি আক্কেল জামাইটা কোথায় গেল খোঁজ নিলে না ?”

“খোঁজ নিচ্চিনিতো এ সব খবর কোথেকে আস্‌চে ?”

“ওরে গেনি শুনেছিস্‌ প্রমথ খুব ভারী বিষয় পেয়েছে।”

“আজ আফিসের ফেরত একবার ভবানীপুরে যাও না ?”

“এখন বাজারের পয়সা দাও বাজারতো করে আনি, পরে ভেবে যাহা হয় করবো।”

“বাজার থেকে একটু ভাল মাছ এনো। গেনির কি হয়েছে মোটেই খেতে পারে না। বিশ্রী চেহারা হয়ে যাচ্ছে। বলি আমি না হয় একবেলা রাঁধি তা কিছুতেই শোনে না।”

নবীন বাবু বাজারে চলিয়া গেলেন।

“ওরে ছোট বৌ শুনেছিস্‌ প্রমথ বিষয় পেয়েছে—তার মামার।”

“সত্যি নাকি দিদি ? আহা তা ভাল ? বেচারীকে যতই কিছু বলনা মুখে যেন রা নেই বাছার।”

“হাঁ ভাই, লেখাপড়া শেখেনি তা নইলে জামাইএর মত জামাই। আর তার দোষ দেব কি, তার বাপইতো তাকে স্কুলে দেয় নি লেখাপড়া শেখায়নি —না হলে বাছার আমার বুদ্ধি খুব।”

“তাই বুঝি সে আসে নাই ?”

“হয়ত হঠাৎ খবরটা পেয়েছে তাই চুপি চুপি চলে গেছে ! আজ তোর ভাসুর তাকে নিয়ে আসতে যাবে। ছোট বৌ, তুই যে সেদিন মাংস রেধেছিলি আজ আবার রাঁধ না। প্রমথ সেদিন ছিল না. আহা সে বড় মাংস ভাল বাসে। সে সেদিন খেলে না, মনটা যে কি করছিল, বলতে পারিনি।”

(৭)

নবীন বাবু আফিস চলিয়া গেলে প্রায় ১১॥০ টা ১২ টার সময় একখানি গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। ছেলে মেয়েরা ছুটিয়া বাহিরে দেখিতে আসিল। সকলেই “মুখুজ্যে মশায়” “মুখুজ্যে মশাই” করিয়া মহা গোল আরম্ভ করিয়া দিল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য জ্ঞানদার মা খুড়ী উপর হইতে নামিয়া আসিতেছেন এমন সময় বিপিন বাবুর ছেলে আসিয়া বলিয়া উঠিল “মা মুখুজ্যে মশাইএর বৌ এসেছে।”

"সে কিরে!" বলিতে বলিতে তাহারা দুই জনেই নামিয়া আসিলেন। নববিবাহিতা স্ত্রীকে লইয়া ভিতরে আসিয়া প্রমথ বলিয়া উঠিল "বিশ্বাস না হয় এই দেখুন। আমার আবার কে বে দেবে? আমার বাবার জায়গাই বা কোন চুলোয়?"

সকলেই স্তম্ভিত। কে কি বলিবে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। প্রমথ চকিতের ন্যায় চলিয়া গেল। রাস্তার উপরের বারাণ্ডায় জ্ঞানদা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দে তাহার চমক ভাঙ্গিল, সে ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

নবীন বাবু রাত্রি ১০টার সময় বাটী ফিরিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যমনস্কভাবে বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে বিপিন বাবু আসিয়া দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভবানীপুরে গিয়াছিলেন নাকি?"

"হাঁ গিয়েছিলুম তো।"

"প্রমথ আবার বে করেছে?"

"হাঁ। তোরা জান্‌লি কি করে?"

"বৌ নিয়ে এসেছিল যে।"

"এঁ্যা? কি আস্পর্দ্ধা! তার আস্পর্দ্ধাই বা বলি কেন? তোমার বৌদিদি যে রকম তাকে বল্‌তো, তার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করতো, তা মানবের অসহ্য। কুলীনের ছেলে খেতে পাক না পাক্, কেউ কোথায় থাক না থাক—তার বের ভাবনা কি? এখন তো এত বিষয় পেয়েছে।"

"যা হবার তাতো হয়ে গেছে, এখন আর ভেবে কি হবে? আগে টের পেলে না হয় বাধা দেওয়া যেত। এখন ঐখানে বনিয়ে সনিয়ে থাকতে হবে।"

"আমিও তার মামিকে—"

নবীন বাবুর স্ত্রী একেবারে সপ্তমে চড়িয়া আসিয়া বলিলেন, "কি সেই ছোট লোকদের ঘরে আমি মেয়ে পাঠাব? কখখন নয়, আমি বেঁচে থাক্‌তে নয়।"

"দেখ্ বিপিন, তুই একবার দেখ্। আমি কি বল্‌ব বল্‌দিকি? তা হলে এমনটা হবে কেন? আজ মেয়েটা কোথায়—"

"একবার এখানে এলে হয়, খেঙ্‌রে বিষ ঝেড়ে দেব।"

"বৌদি, থাম। এখন যাও! আজই সে নিতে আস্‌বে না, তুমিও পাঠাচ্ছ না, রাগতো হবারই কথা তবে কি জান সকলের বুদ্ধি একরকম হয় না। এখন তোমার কাজে যাও, পরে দেখা যাবে।"

* * * * *

প্রায় দেড় বৎসর হইতে চলিল প্রমথ জোড়াসাঁকোর কোনও খবর লয় না স্ত্রীর ভয়ে নবীনবাবুও প্রমথর কোন খবর লন না। জ্ঞানদা এখনকার মেয়ে হইলেও লিখিতে পড়িতে জানিত না, সুতরাং ইচ্ছামত পত্র লিখিতে পারিত না। কখনও কখন মন্মথকে দিয়া পত্র লেখাইত, কিন্তু কোন পত্রের জবাব আসিত না। সতীনকে পত্র দিলে সেও জবাব দিল না। জ্ঞানদা হতাশ হইয়া নিরস্ত হইল। দিন দিন সে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। পারুক না পারুক সমস্তদিন মুখটি বুজিয়া সংসারের সমস্ত কাজই তাহাকে করিয়া যাইতে হইত। ত্রুটি হইলে মা রাগ করিত, নানা কু কথা শুনাইয়া দিত। কয়েকদিন ধরিয়া জ্বর হইতেছে, তথাপি তাহার নিস্কৃতি নাই। ক্রমে তাহাকে শয্যাশায়ী হইতে হইল। নবীনবাবুর এক বন্ধু হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স ঘরে রাখিতেন তাঁহার কাছে হোমিওপাথিকের বইও থাকে। তাঁহারই ঔষধ দেওয়া হইল। জ্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল জ্ঞানদা যন্ত্রণায় অস্থির হইল ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। হোমিওপ্যাথিক ঔষধে রোগ সারিতে বিলম্ব হয় বটে কিন্তু একেবারে radical cure হয় সে কারণ চিকিৎসা বদলান হইল না। পথ্য কেবলমাত্র দু'বেলা জলসাগু।

"সাগু যে আর খেতে পারি না মা? ডালিম খেজুর কিছু পাওয়া যায় না?"

"ওঃ বড় মানুষের স্ত্রী কিনা, ডালিম আসপাতি না হ'লে রোচে না!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জ্ঞানদা সাগুই খাইল। মন্মথ ঘরে বসিয়া পড়িতেছিল। মার জবাব শুনিয়া তাহার বড়ই কষ্ট হইল, কিন্তু মার কথার উপর কথা বলে বাটীতে এমন সাধ্য কাহারও নাই। তাহার বড়ই ইচ্ছা হইল দিদিকে ডালিম প্রভৃতি কিনিয়া দেয়। কিন্তু তাহার হাতে তো একটিও পয়সা নাই। দিদির বাক্সে পাঁচটি টাকা আছে, মুখুজ্যে মহাশয়ে চাকরি হওয়ায় মা কালীর পূজা মানত ছিল; সে টাকা দিদি তাহাকে লইতে দিল না। "নারে যেন ও টাকা নিসনি ভাই। তোরা বেঁচে থাক আমার

ভাবনা কি ভাই ? পারিস যদি যার টাকা, তাকে দিস্, বলিস্ যেন মানত পূজা দেওয়া হয়।"

মন্মথর বড়ই কষ্ট হইল। সে ভাবিল দিদির অসুখের খবর পাইলে মুখুজ্যে মহাশয় নিশ্চয় আসিবে। সে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া প্রমথকে একখানি পত্র লিখিল। ঘটনাচক্রে মন্মথর ছোটভাই পত্রখানি মাকে দেখাইল। জ্ঞানদা যে সে চিঠিখানি লেখাইয়াছে তাহা তাহার অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না। অযথা কুকথা মেয়েকে যথেষ্ট বলিলেন। জ্ঞানদা উপুড় হইয়া কাঁদিতে লাগিল। "ভগবান এত পাপ করিয়াছি যে এত শাস্তিতেও তাহার খণ্ডন হইল না। আর যে পারি না হরি।"

কয়েকদিন পরে জ্ঞানদা অচৈতন্য হইয়া পড়িল। নবীন বাবু ডাক্তার আনিলেন। রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন, "এখন আর কি হবে, মেরে ফেলে নিয়ে এসেছেন।"

নবীন বাবু কাঁদিয়া ডাক্তার বাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করাইয়া লইলেন। কিন্তু ঔষধ পথ্য এখন খাবে কে ?

যে প্রমথ একদিন ১৫৲ টাকার সরকারের চাকরির জন্য লালায়িত ছিল সে আজ অতুল ধনসম্পত্তি অধিকারী—জমীদার প্রমথ বাবু। তাহার ইঙ্গিতেই এখন ওরকম ১৫৲ টাকার মাহিনার কত চাকর ঘুরিতেছে। একদিন যে প্রমথ সমস্তদিন ঘুরিয়া অবসন্ন হইয়া সন্ধ্যাকালে শশুরালয়ে ফিরিবার সময় ট্রামের আরোহীদিগের প্রতি কতই কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত, ছয়টি পয়সা খরচ করিবার যার সামর্থ ছিল না, আজ সে মোটরগাড়ী না চড়িয়া বাহির হয় না। কালের গতি।

সান্ধ্য ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রমথবাবু সরকারকে হুকুম দিলেন ৮টার সময় ষ্টার থিয়েটারে যাইবেন গাড়ী যেন প্রস্তুত থাকে। এমন সময় ম্যানেজার মহাশয় একখানি পত্র দিয়া বলিলেন "জোড়াসাঁকো থেকে একটী ছেলে এই পত্রখানি আর পাঁচটি টাকা দিয়া গিয়াছে।"

"আঃ আবার এসব উৎপাত কেন ? ম্যানেজার মশায় কতদিন বলছি জোড়াসাঁকোয় আমার সম্পর্ক নেই। তবু তো আপনি শোনেন না" বলিতে বলিতে বাবু পত্রখানি কোটের পকেটে রাখিলেন।

ম্যানেজার মহাশয় বলিলেন "কি করবো, ভদ্রলোকের ছেলেকে তাড়িয়ে দি কি করে ? আজ্ঞে আর নাহয় কাকেও আসতে দেব না।"

"টাকা কিসের ? কেন দিল ?"

"আজ্ঞে তাওতো কিছু বল্লে না।"

"চুলোয় যাক পরে দেখা যাবে।"

থিয়েটারে যাইবার ব্যস্ততায় প্রমথর পত্রখানি পড়িবার অবকাশ হইল না। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া কোনও মতে কিছু গলধঃকরণ করিয়া স্ত্রীকে লইয়া মোটরে বহির হইয়া পড়িল। এত তাড়াতাড়ি সত্বেও একটি দৃশ্য অভিনয় হইয়া যাইবার পর তাহারা থিয়েটারে উপস্থিত হইল। প্রমথর বড়ই রাগ হইল। রাগ হইল প্রথমতঃ জোড়াসাঁকোর নামে, দ্বিতীয়তঃ ম্যানেজার মহাশয়ের বেহিসাবী কাজে, তৃতীয়তঃ গরীব সরকারের উপর।

ভ্রমর অভিনয়। থিয়েটারে লোকে লোকারণ্য। একই অভিনয় নানা লোকের মনে নানারকমের ভাব আসিতেছে। কেহ গোবিন্দলালের দোষ দেখিলেন কেহ ভ্রমরের ত্রুটী বুঝিলেন, কেহ বঙ্কিম প্রতিভার আশ্চর্য্য বিকাশ দেখিয়া বিস্ময়াপ্লুত হইলেন কেহ অভিনেতৃগণের কৌশল দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন, কেহ বা ব্যথিত হইলেন। কেহ কেহ আবার মিথ্যা ভুলিয়া সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। ভ্রমরের মতন হইতে তাহার মতন মরিতে কত স্ত্রীলোকের মনে দুরাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। যাহার মনে যাহাই হউক না কেন অভিনয়, যথারীতি চলিল।

ভ্রমরের তেজ, ভ্রমরের কষ্ট ভ্রমরের বিষাদ আজ প্রমথর চমক ভাঙ্গিয়া দিল। জ্ঞানদার কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে শাশুড়ীর উপর রাগ করিয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানদাকে কেন ত্যাগ করিল ? একে একে অতীতের সকল কথাগুলি তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। সে যে কত অন্যায় করিয়াছে, সহসা আজ যেন তাহা বুঝিতে পারিল। ম্যানেজার মহাশয় যে পত্রখানি দিয়াছিলেন হয়ত সেটি জ্ঞানদারই হইবে। অস্থির হইয়া একে একে কোটের সকল পকেটগুলিই অন্বেষণ করিতে লাগিল, পত্র মিলিল না। সে যে কোট বদলাইয়া আসিয়াছে। এখন তো তাহার একটি মাত্র সার্টই অবলম্বন নয়, আর জ্ঞানদাকেও সেটি রাত্রে সকলের অজ্ঞাতে সাবান দিয়া পরিষ্কার করিয়াও দিতে হয় না। যাহা হউক অভিনয় প্রমথর আর আদৌ ভাল লাগিল না, মনে হইল কতক্ষণে সে বাটী ফিরিবে !

ভ্রমর মরিল, প্রমথও থিয়েটার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বাটী আসিয়া

পত্রখানি বাহির করিল, পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মেঝের উপর পদচারণা করিতে লাগিল।

নীহার জিজ্ঞাসা করিল, "ওরকম করছো কেন, শোবে না ?"

প্রমথ বলিহ—"হাঁ।"

প্রমথ শুইল, কিন্তু তার নিদ্রা আসে কই ? যেই একটু তন্দ্রা আসে অমনি হয় থিয়াটারের ভ্রমরের সেই মৃত্যু, না হয় মন্মথের পত্রের কথা মনে পড়ে। "মেজ দিদি যদি কোন অপরাধ তোমার কাছে করে থাকে তুমি ক্ষমা করিও। সে আর কিছু চাহে না।" তন্দ্রার আবেশেও সে ইহা পড়িল। নীহার বলিল "কই তুমি ঘুমাও নি।" প্রমথ চীৎকার করিয়া ডাকিল "মন্মথ মন্মথ।"

নীহার বুঝিল প্রমথ স্বপ্ন দেখিতেছে তাহার গা ঠেলিল মুখে হাত দিল দেখিল প্রমথর গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতেছে বলিল "তোমার কি হয়েছে ?"

প্রত্যুষে উঠিয়াই কাপড় চোপড় পরিয়াই যেই দ্রুত বাহির হইবে সজোরে মাথায় কপাট লাগিয়া প্রমথ বসিয়া পড়িল। নীহার ছুটিয়া আসিয়া মাথায় জল দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কি হয়েছে ? কোথায় যাচ্চ ?" "যমের বাড়ী" বলিয়া রাগে গরগর করিতে করিতে প্রমথ বাহির হইয়া পড়িল। নীহারের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, প্রমথ ফিরিয়াও দেখিল না। ভোঁ ভোঁ করিয়া মোটর ছুটিল বটে, কিন্তু অদৃষ্ট, কিয়দ্দূর আসিতে না আসিতে কল বিগড়াইয়া গেল, মোটর চলিল না। ভাড়াটিয়া গাড়ীও মিলিল না। প্রমথ পদব্রজেই চলিল, মাঠে আসিয়া ট্রামে উঠিল। বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীটের মোড়ে নামিল। কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন কাঁপিতেছিল, পা যেন উঠিতেছিল না, তাহার শ্বশুরের বাড়ীর নিকটে যাইতে না যাইতে সেই নিদারুণ হরিধ্বনি শুনিল। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল ৭।৮ জন লোক সিক্তবস্ত্রে আসিতেছে, জলপূর্ণ ঘট হাতে মন্মথও কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের সহিত আসিতেছে। কিছুদূরে পাষাণভেদী কান্নারোলও শুনিতে পাইল। প্রমথ দাঁড়াইতে পারিল না, বসিয়া পড়িল বলিল "সব ফুরিয়ে গেল।"

বেগারে বউ

(লেখক—শ্রীরমেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ)

(১)

নেহাইত গোবেচারী গদাধর বিমর্ষমুখে বাড়ী আসিয়া মাকে বলিল "মা! তোরা যে আমায় বিয়ে কত্তে বলিস্, গ্রামের সবাই বলে যে বিয়ে কল্লে বৌ মারে, আজ আমি তা' নিজে দেখে এসেছি। থাক্ বিয়ে ক'রে কাজ নেই, আর ত মার খেতে পারি না মা।"

কার্য্যে নিযুক্তা মাতা বলিলেন 'ওরে পলপ্লেয়ে! তোর আর এজন্মে বুদ্ধি শুদ্ধি হবে না, বৌতে কি মারে, না ভালবেসে খেতে দেয়, আমি ত বুড়ো হ'য়েছি, আজ বাদে কাল গঙ্গায় যাব, তোকে খেতে দেবে কে? বুড়ো হতে চল্লি, ভাত মেখে খেতে শিখ্‌লিনে, আমি কি আর চিরকাল তোকে মেখে খাওয়াব, না তেল মেখে নাইয়ে দেব? আর তোকে মারেই বা কে? তুই কারো খাস্ না পরিস্, না কোন ড্যাক্‌রার একচালায় বসৎ করিস; যে মারে, তাকে দুঘা দিয়ে আস্‌তে পারিস্‌নে, তার পর আমি ঝগড়া' করে বুঝ্‌তে পারি, মগের মুল্লুক আর কি ;—"

অশ্রুকণ্ঠী মাতা পুত্রের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন। "আহাহা আমার দুধের ছেলে, কিছু বোঝে না,—এ পোড়া গাঁয়ের লোক, এত লোক থাক্‌তে আমার ছেলেকে, আহাহা! এই যে একটা নতুন দাগ দেখ্‌ছি বাবা, আজ আবার কে মেরেছে? চল দেখি একবার দেখে আসি, সে কেমন বাপের বেটা, আর আমিইবা কেমন লোকের মেয়ে? চেনে না বেটারা বাঞ্ছারাম পণ্ডিতের মেয়েকে? আজই না হয় অবস্থা খারাপ হয়েছে, হাতের নোয়া খুই-য়েছি ;—তাইতে কি আমার সোয়ামীর দাপট্ লোকে ভুলেছে নাকি? সে চোলোক মিত্তিরকে এ দশ গ্রামের লোকে না চিন্‌ত কে?

হঠাৎ স্বামীর অপভ্রংশ নামে মিত্র বিধবা জিভে কামড় খাইয়া চুপ করি-লেন। বলা বাহুল্য তাহার স্বামীর নাম ছিল গোলোক মিত্র।

গদাধর বলিল "মা! আজ মতি বাবুর বাড়ী যাত্রা গান হবে, তাই আমি সকাল থেকেই সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমায় দেখে বাবু বল্লেন, গদা মাণিককে

সঙ্গে নিয়ে যা ;—গ্রামে নেমন্তন্ন করে আয় ;—সবাইকে বলিস্, বেলা পাঁচটার পর গান হবে।"

মা। "কোন্ মাণিক ?"

গদা। "বাবুর নাতি। নেমন্তন্ন কত্তে হ'লে নিজেদের একজন যেতে হয় কিনা, তাই ঐ মাণিককে নিয়ে নেমন্তন্ন কত্তে গেলুম। সব বাড়ী নেমন্তন্ন করে, চাটুয্যে বাড়ী নেমন্তন্ন কত্তেই হলধর চাটুয্যে তেড়ে এসে আমার পিঠে ঘা কতক দিয়ে বল্লে, বেটা এসেছে শুদ্দুর বাড়ী থেকে নেমন্তন্ন কত্তে ;—আমার নিবেদন এই যে অন্ন ;—তা' বলে কিনা পাঁচটার পর গান শুনতে যেও, যত ছোট লোকের কাণ্ড হ'য়েছে এই গাঁয়ে, তার পর মা, তাদের চাকর আমায় বল্লে ,তুমি রাগ ক'রো না, বাবুর মেজাজ ঠিক নেই, মাঠাকুরোণের বোনের ছেলের অন্নপ্রাশনে বাবু আটটী বৈ টাকা দিতে পারেন নেই, তাই নাকি বাবুর কপালে আজ দু এক ঘা হ'য়েছে। তাই ত বলি মা, বিয়ে ক'রে কাজ নেই, বৌ এলেও মার্ব্বে, এখন বাইরে খাচ্ছি, এরপর ঘরে এলেও খেতে হবে, এইত বেশ আছি।"

মা। "না বাবা ! তুই কারো বেগার দিতে যাস্নি। বাড়ীতে ভাল হ'য়ে থাক্, আমি এই মাসেই তোর বে দেব, কিছু নেই নেই ব'লেও এখনও যা আছে, চাষবাস দেখে খেতে পাল্লে তোর মত দশটা পেট চল্বে, এখন ভাত খাবি আয়, তার পর গান শুনতে যাবি।"

খাইয়া গদার গান শুনিতে যাইতে একটু রাত্রি হইল। স্থানাভাবে এক কোণে দাঁড়াইবামাত্র শুনিতে পাইল "কেরে, মাগীমুখো মিন্সে ! এত জায়গা থাক্তে, এসেছে মেয়েদের মাঝে গান শুন্তে, মর্তে আর জায়গা পেলে না ; কাণে যাচ্ছে না দেখ, মুখপোড়া কালা নাকি ? দে দেখি সবাই মড়ার গায় থুথু দে দেখি।

তাহারই উদ্দেশ্যে বাণ প্রয়োগ দেখিয়া গদা মহাপুরুষ বাক্য অবলম্বন করিল।

"ও বাবা ! মেয়ে মানুষে শুধু মারে না আবার থুথু দেয়, তাইত মাকে বলি যে বিয়ে ক'রে কাজ নেই, তা মা একেবারেই নাছোড়।"

চিন্তিত গদা স্থানান্তরে যাইতে উদ্যতপ্রায়, এমন সময়ে দূরে একটী সুসজ্জিতা বালিকার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। বালিকা মা, মা বলিয়া কাঁদিতেছে। গদার প্রাণে বাজিল, মাতৃউপদেশ বিস্মৃত হইয়া তাহার নিকটে গিয়া বলিল "তুই গান না শুনে কাঁদ্ছিস্ কেন ? কেউ কি মেরেছে ?"

বালিকা। "হাঁ, মা মেরেছে, ঘুম পাচ্ছে ব'লে মাকে বল্লুম যে মা, চল্ বাড়ী যাই, মা বল্লে দিনে ঘুমুতে বলেছিলুম, তখন মনে ছিল না? সারাটা দিন পাড়ায় টো টো করে ঘুরে বেড়িয়েছিস্, এখন যা বাড়ী যেয়ে শুয়ে থাক্‌গে, আমি যেতে পারব না;—আমি একা যেতে পার্‌ব না বল্‌লে মা আমায় একটা ধাক্কা দিয়ে বল্লে, যা—এখানে গোল করিসনে, গান শুন্‌তে দে।"

গদা। "তোমাদের কোন্ বাড়ী গা?"

বালিকা। "ঐ সামনের গাঁয়েই আমাদের বাড়ী, একইত গ্রাম, তবে আমরা সেনপাড়া বলে ডাকি, আমার বাবার নাম জীবন বাবু, তুমি তাঁকে জান?

গদা। "তুমি বাড়ী চিনে যেতে পার্‌বে?

বালিকা। "হ্যাঁ, পার্‌ব, কিন্তু অন্ধকারে ভয় করে, ঐ যে কেলোদের সেই পাকুড় গাছে একটা বেহ্মদত্তি থাকে, সেইখান দিয়ে পথ কিনা, তাই ভয় করে, তা তুমি যদি সেখানে একটু দাঁড়াও ত যেতে পার্‌ব, বাবা বাড়ী আছে, বাড়ী ছেড়ে ত আর সবাই আস্‌তে পারে না, তাই;—তুমি একটু দাঁড়াও, আমি রাম রাম কত্তে কত্তে চলে যাই, রাম রাম বল্লে বেহ্মদত্তি আসতে পারে না, না?

গদা। "চল তোমায় বাড়ী রেখে আসি, ছেলে মানুষ একা যেতে পার্‌বে না, আমার সঙ্গে এস।

বালিকা গদার পশ্চাৎ গমন করিল। কিছু দূরে গিয়া বালিকা "রাম, রাম, বলিয়া উঠিল।

গদা। "ঐ বুঝি সেই গাছ?"

বালিকা। "হাঁ! কিন্তু এখন ত দেখা যাবে না, সবাই ঘুমুলে তবে গাছ থেকে নাম্‌বে। সেদিন কেলোর পিসি রাত্তিরে বাইরে এসেছিল, তাই দেখলে যে বেহ্মদত্তি আকাশ সমান মাথা উঁচু করে ঐ গাছে এক পা আর ওপাড়ার সরি দিদিদের বড় আম গাছে এক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাই না দেখে ভয়ে একেবারে ঘরে কপাট দিলে, তাদের ছাদের উপর নাকি খড়ম পায় দিয়ে হেটে বেড়ায়, একদিন কেষ্ট—এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল "কেরে—ভুতি নাকি? রাত্তিরে কোথা যাচ্ছিস?"

অকস্মাৎ স্বনামে অভিহিতা বালিকা "ওরে! মা, রে! গেলুম রে, বেহ্মদত্তি আমার খেলে রে। আমার গয়না কেড়ে নিলেরে। বলিয়াই ত্রস্ত হেতু

পথভ্রষ্টা হইয়া বাগানের দিকে দৌড়িল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় গদাও তাহার অনুসরণ করিল।

কার্য্যোপলক্ষে বালিকার মেসো রাধানাথ বাবু সেই সময়ে বালিকাগৃহে যাইতেছিলেন, অন্ধকারে বালিকার কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভূতি নাকি?" কিন্তু ভয়প্রযুক্ত স্বর চিনিতে না পারিয়া মেসোকে ব্রহ্মদৈত্য ঠিক করিয়া গহনাপ্রিয়া বালিকা, জীবন হইতে গহনা চুরির অধিক আশঙ্কায় পথ-ভ্রষ্টা হইল ; বালিকার নাম ভূতি।

রাধানাথ বাবু প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, পরে তাঁহার স্পষ্ট অনুভব হইল ভূতির পশ্চাতে একটী পুরুষ দৌড়াইতেছে। গহনালোভে নিশ্চয় কোন ব্যক্তি ভূতিকে হরণ করিতেছে, ঠিক করিয়া ছড়িহস্তে তাহার অনুসরণ করিলেন। অনায়াসেই গদার কেশরাজি তাঁহার মুষ্টিগত হইল। চির মুষ্ঠ্যাঘাতাভ্যস্ত পৃষ্ঠদেশ, প্রথমে ছড়ি পরে মুষ্টির আস্বাদ প্রাপ্ত হইলেও মাতৃপিতৃ কুযশ শ্রবণে আপ্যায়িত-শ্রবণ পুনরায় মাতাপিতার অপযশ শ্রবণ করিল। স্ত্রীলোক ব্যতীত ব্রহ্মদৈত্যও যে মুষ্ঠ্যাঘাত করে, এতদিনে সে তাহা বুঝিল। স্ত্রীলোকেরই শুধু অপরাধ নয়, ভাবিয়া যেন স্ত্রীলোককে একটু প্রশংসা করিল। বালিকার সহিত কথোপকথনে যখন সে ব্রহ্মদৈত্যকে মানুষ বলিয়া জানিল, তখনও সে বুঝিল না, কি অপরাধে তাহার এই পৃষ্ঠবেদনা। হায়! অবিমৃশ্যকারী মানব!

গদাধর গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মাতাকে সমস্ত বলিল। জননী, পুত্রের লাঞ্ছনায় দুঃখিতা হইয়া রাধানাথ বাবুর চতুর্দ্দশ পুরুষকে অধঃপাতে যাইতে এবং নিরপরাধিনী বালিকাকে বাজারে প্রকাশ্যে ঘরভাড়া করিতে জরুরি আদেশ করিয়া পুত্রের পৃষ্ঠে একটু গরম তেল মালিসের ব্যবস্থা করিলেন। পুত্র পৃষ্ঠব্যথায় ব্যথিতা এবং কোন্দলোন্মুখা জননী চীৎকার ব্যতীত মনোগ্লানির উপশম অসম্ভব বিবেচনায় পুত্রের উপরই গালিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। তোকে রোজ রোজ বলি যে তুই পরের বেগার দিতে যাসনে, কিছুতেই তুই শুনবিনি, তা বেশ হ'য়েছে, আরও দু'চার ঘা দিলে আরও সন্তুষ্ট হতুম, মার বাক্য গুরুবাক্য, তা না শুনলে এ হতেই হবে ;—

"গুরুর কথা না শোনে কানে,
প্রাণ যায় তার হেচ্‌কা টানে।"

(২)

এই ঘটনার পরে আরও তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। শত চেষ্টায়ও গদার বিবাহ হয় নাই। একদিন অতি প্রত্যূষে গদাধর নদীর পার দিয়া মামা বাড়ী হইতে বাড়ী আসিবার সময় দেখিতে পাইল একটী স্ত্রীলোক নদীর চড়ায় শুইয়া আছে। বিশিষ্ট বুদ্ধিমান না হইলেও এ যে শুইবার স্থান নহে একথা গদাধর তখনই বুঝিল। [illegible] তৎপর গদাধর তখনই চড়ায় নামিয়া স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া বুঝিল নদীতে ডুবিয়া ইহার জীবনান্ত হইয়াছে।

জলে ডুবিলে লোকের কি প্রক্রিয়ায় জ্ঞান হয় কিছু পূর্ব্বে [illegible] দেখি-য়াছে এবং ইহাও শুনিয়াছে যে জলে ডুবিলে সহসা মৃত্যু হয় না। দৃষ্ট চিকিৎ-সায় অভিজ্ঞ এবং শ্রুত ধারণায় স্থির নিশ্চিত গদাধর তাহার চিকিৎসা আরম্ভ করিল। ভগবান সরল যুবকের শ্রম এবং বিশ্বাস নষ্ট করিলেন না, নাক মুখ দিয়া কতকগুলি জল বাহির হইবার পরেই রোগিনী খুব জোরে একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। এইবার গদা দ্বিগুণ উৎসাহে তাহার শুশ্রূষা আরম্ভ করিল। কিছুকাল পরে বেশ একটু চৈতন্য হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে স্কন্ধে করিয়া সেই গ্রামেই তাহার মাতুলের শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহাদের আনীত ডাক্তারের চিকিৎসা এবং গদার অবিরত শুশ্রূষাগুণে রোগিনী শীঘ্রই সুস্থা হইয়া গরম দুগ্ধ পানান্তে নিদ্রিতা হইল। প্রথমে অতি-ব্যস্ততা বশতঃ গদাধর রোগিণীকে না চিনিলেও শেষবার চিনিল যে, সে ভূতি। গদা আত্ম পরিচয় দিল না।

এদিকে গত রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণের মুক্তিস্নানের সময় লোকের অত্যন্ত ঠেলাঠেলিতে সন্তরণানভিজ্ঞা ভূতি মায়ের অজ্ঞাতে নদীতে ডুবিয়া যায়, স্নানান্তে মাতা ভাবিলেন বুঝি পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভূতি বাড়ী ফিরিয়াছে। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল। ভূতির পিতা জীবনবাবু একমাত্র কন্যার অনুপস্থিতিতে চিন্তিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আলো ও লাঠি লইয়া কন্যার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। পাড়ায় ভূতির খেলার সঙ্গিনী যাহারা ছিল তাহাদের মধ্যে একজনকে কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সঙ্গিনী কিছু জানে না, স্নানের সময়ে ভূতির সহিত তাহার সাক্ষাৎও হয় নাই; কিন্তু ভাবিল যদি বলে যে সে জানে না, তবে হয়ত বলিবে 'তোর সঙ্গে নাইতে গেল আর তুই জানিস্‌নে' হয়ত হাতের লাঠিদ্বারা এক ঘা দিতেও পারে, সুতরাং সে মিথ্যা কথা বলিল। "ভূতি দিদিত আগেই ও পাড়ার ঐ—ঐ রেণু

পটলির সঙ্গে এসেছে।' উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই বালিকা অন্তর্হিত হইল।

অনতিবিলম্বে জীবনবাবু কন্যার সন্ধানে গ্রামের মধ্যে চলিলেন। বালিকা কথিত রেণু পটলিকে তিনি চিনিতেন না, সুতরাং প্রতি গৃহেই সন্ধান আরম্ভ করিলেন কিন্তু কেহই গমন ব্যতীত প্রত্যাগমনের সংবাদ দিতে পারিল না। নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনার সম্ভব বিবেচনায় নদীতে অনুসন্ধান করাই স্থির করিলেন। গ্রামের দুই একটী লোকের সাহায্যে নৌকার চেষ্টায় বহির্গত হইবেন এমন সময় অকস্মাৎ প্রবলবেগে ঝড় আরম্ভ হইল। এই অবস্থায় কেহই তাহার সহিত নৌকার চেষ্টায় যাইতে স্বীকৃত হইল না, তবে ঝড় থামিলে নিশ্চয়ই যাইবে এই আশায় আশান্বিত করিল। জীবনবাবুর স্ত্রী পবনদেবকে দই খই'এর প্রলোভন দেখাইয়া ঝড় থামাইবার জন্য কাতরস্বরে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু 'ন রাত্রৌ দধি ভোজনম্' পাছে এই শাস্ত্র বাক্যের অন্যথা হয় বিবেচনায় পবনদেব সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যাহা হউক ভোরের সামান্য পূর্ব্বে ঝড় থামিবামাত্র জীবন বাবু আত্মীয় স্বজন সহ কন্যানুসন্ধানে নৌকা যাত্রা করিলেন; বহুদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া ভগ্নমনে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য নদীতে অনুসন্ধান সময়ে ভূতি, গদার আত্মীয়গৃহে বিরাজিতা।

ভূতির মৃত্যুতে স্থির নিশ্চিত আত্মীয়গণ, চৈত্রমাসের ঢাকের আওয়াজকে তিরস্কৃত করিয়া প্রতিবেশী কর্ণে প্রবেশ করাইল এবং ডুবিয়া যাইবে পূর্ব্বে জানিতে পারিলে যে তাহাকে কিছুতেই নদীতে যাইতে দিতেন না, ক্রন্দন প্রসঙ্গে তাহারও উল্লেখ করিতে ছাড়িলেন না। ভূতির মাতার মর্ম্মস্পর্শী চিৎকারে কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। প্রতিবেশীগণ জীবনবাবুকে সংসারের অসারত্ব এবং বিপদ্‌কালে ধৈর্য্যাবলম্বনই বুদ্ধিমানের কার্য্য ইত্যাদি বুঝাইয়া শোক সম্বরণ করিতে উপদেশ দিলেন। কেহ সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া কাশী যাইতে, দুই একটী লোভী ব্রাহ্মণ কুশপুত্তলিকা করিয়া কন্যার সৎকার করিতে উপদেশ দিলেন। বুদ্ধিমান জীবন বাবু সমস্তই শুনিলেন কিন্তু কাহারও কথার উত্তর দিলেন না। তিনি পুত্রহীন, একমাত্র কন্যার অভাবে যে তাহার পারলৌকিক কার্য্যের আশা লোপ পাইল তাহাতে তিনি বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার পয়সার অভাব নাই, কন্যাকে বিবাহ

দিয়া জামাইকে গৃহে রাখিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিবেন এই আশার বশবর্ত্তী হইয়া কন্যাকে এতদিন অবিবাহিতা রাখিয়াছিলেন। কেন তাহাকে বিবাহ দিলেন না, কেন রাত্রিতে তাহাকে নদীতে যাইতে অনুমতি দিলেন ইত্যাদি নানাকথা মনে উদয় হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা তাহাকে অলক্ষে শ্লেষ করিল।

দম্পতীর শোকের বেগ একটু উপশমিত হইলে প্রতিবেশী,প্রতিবেশিনীগণ দুই এক পায়ে সরিতে লাগিলেন। যাইবার সময়, অমন সুন্দর মেয়ে যে আর জন্মায় না, মা কালীর চুলের চেয়ে'যে ভূতির চুল ভাল ছিল এবং ভূতির শোকে যে তাহাদের মধু, বাদল কেহই বাঁচিবে না ইত্যাদি নানা কথায় ভূতির প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া আত্মীয়তার পরিচয় দিতেও ছাড়িলেন না।

এমন সময়ে পাল্কিতে ভূতি, পশ্চাতে গদার আবির্ভাব হইল। দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলেন, আলোক বর্ত্তমানে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। এই সমস্ত কারণ বিদ্যমানেও জীবন বাবু কেন যে কন্যাকে দেখিতে পাইলেন না তাহা তিনি বুঝিলেন না। মাতা কন্যাকে ক্রোড়ে লইতে ছুটিলেন কিন্তু পথিমধ্যেই তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। কথাটী বাত্যাহত অগ্নির ন্যায় গ্রামে তৎক্ষণাৎ ছড়াইয়া পড়িল। রান্ধুনী রান্না কলহকারিণী, কলহ, ক্রীড়ানিরত বালক ক্রীড়া, পূজারতা বৃদ্ধা পূজা রাখিয়া কাল্পনিক ভূত-বিশিষ্টা ভূতিকে দেখিতে ছুটিলেন। ভূতিকে দেখিয়া কেহ আন্তরিক সুখ কেহ বা দুঃখ অনুভব করিলেন। কিন্তু মুখে কেহই ভালবাসার ওজন কমাইলেন না। যিনি প্রতিবেশী সঙ্গে কলহ করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়াছেন তিনি বলিলেন "ওগো! ভূতির যদি এই বয়সে মন্দই হবে, তবে আমাদের শালগ্রামকে রোজ রোজ আড়াইসের চালের ভোগদিই কি মিছে-মিছি? এখনও দেবতা বামুন আছে, সব লোপ পায় নাই। আমি কত মিনতি করে ভূতির কল্যাণে একটা পাঁঠা মনত করেছি, তা এদের যখন,—"

কথায় বাধা দিয়া পুরোহিত গৃহিণী বলিলেন "তা আর বল্‌তে বাছা, বল্লে বিশ্বেস যাবে না, এই পূজোর সব আয়োজন ক'রে এঁদের পূজো কত্তে বল্লুম, তাতে উত্তর কল্লে, দেখ্ ভগবান্ যেন বল্‌ছেন ভূতি ভাল আছে, ভয় নেই, তা' দেখ তুমি ভাল দেখে বারশটী তুলসী নিয়ে এস দেখি, বাণেশ্বরের মাথায় দেই, কি জান বাছা;—এই কথা না শুনে, আমি তখনই দৌড়ে গিয়ে তুলসী নিয়ে এলুম, তার পর উনি কত স্তব স্তুতি করে ভূতির কল্যাণে পূজো কল্লেন,

তাইত ভূতি আমার ফিরে এল, নইলে জলে ডুবলে কি আর বাঁচে ;—ঐ দেখ্‌লে না সেবার মদনা কামারের ছেলেটার কি হ'ল ? ডুবাতে ডুবতে ত তুল্লে ; তা কি জান, এই ব্রহ্মতেজ চাই, সবাই বলে, ওঁদের মত বামুন আর আজ কাল বড় একটা দেখা যায় না, ওঁরা একটা কথা বল্লে, দেবতারা তা না শুনে পারে না।

নিজের প্রাধান্য নষ্ট ভয়ে পূর্ব্ব পরিচিতা বিধবা বলিলেন "হ্যাঁগো, হাঁ, তোমার সোয়ামীর জন্যই সব হচ্চে, আমাদের শালগ্রামের কল্যাণে কিছুই হয় না, গাঁজার ঝোঁকে কখন কি বলে তার ঠিক নেই, সে আবার ভূতির কল্যাণে শান্তি ক'র্‌বে। বলি শিব পূজায় আবার তুলসী লাগে নাকি ? হদ্দ ক'রে খেলে, ভগবান তার কাণে কাণে বল্লে সে ভয় নেই ;—ভগবান্ ত আর কথা বল্‌বার লোক পেলে না, এই আমরা রয়েছি, মেজবৌ রয়েছে, এদের না ব'লে, বল্লে কিনা একটা গাঁজাখোর বামুনকে ; ভগবান ত বলে নাই, বলেছে নেশায়, কি বলিস্ মেজবৌ ?" মেজবৌ মুখে কিছু না বলিয়া চক্ষুদ্বারা বাক্যের সমর্থন করিলেন। ইহারই নাম বিনাতারে টেলিগ্রাম।

পুরোহিত গৃহিণীর চীৎকারের মাত্রা পর্দা ছাড়াইয়া উঠিল। "তবে রে ভাতারখাকির ভাতার খাকি ! আমার সোয়ামী গাঁজা খেয়ে পড়ে থাকে, শিবপূজো কত্তে জানে না, আচ্ছা, এখনই আমি তাকে ব'লে দিচ্ছি, দেখি তোরা কেমন ক'রে এ গাঁয়ে থাকিস ? যার যজমানের দোরে ভিক্ষে ক'রে খোল ভরিস্, তারই নিন্দে। শিবপূজোয় ত তুলসী লাগে না, বলি, শালগ্রাম আবার পাঁঠা খেতে আরম্ভ ক'ল্ল কদ্দিন থেকে ? যত বড় মুখ তত বড় কথা— আজ তোর ঐ শালগ্রাম দিয়ে বাট্‌না বাট্‌ব তবে ছাড়্‌ব।" ক্রমেই ঝগড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া মাতা পিতা প্রভৃতি কেহই মল মূত্রাদির আস্বাদ গ্রহণ না করিয়া ছাড়িলেন না, পূর্ব্ব পুরুষের উদর তৃপ্তির সহিত বোধ হয় কলহের শান্তি হইল।

কন্যা প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জীবন বাবু সমবেত ব্যক্তি-দিগকে বলিলেন "দেখুন আমি কন্যার অত্যাহিতে স্থির নিশ্চিত হইয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলাম সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া কাশীবাস করিব। ভূতিকে আবার দেখিব এ ধারণা ভ্রমেও মনে স্থান দেই নাই ; বুঝিলাম একমাত্র গদাধরের জন্যই কন্যা আবার ঘরে আসিল। একদিন এই গদাধর আমার কন্যার উপকারার্থে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইয়াছিল। ইহার এই

উপকারের কোনও কৃতজ্ঞতা না দেখাইলে ভগবানের নিকট পাপী হইতে হইবে। আমি জানি গদাধর দরিদ্র হইলেও জাত্যাংশে আমাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। স্থির করিলাম, ইহাকে জামাতা করিয়া পুত্রের ন্যায় পালন করিব। যদি ইহার মায়ের অনুমতি ক্রমে ইহাকে আমার গৃহে রাখিতে পারি ভালই, না হইলেও, নিকট গ্রামবাসী বলিয়া সর্ব্বদা ইহার তত্ত্বাবধানের ব্যাঘাত হইবে না।

আগামী কল্যই ইহার বন্দোবস্ত করিব ভাবিয়াছি। আমি এত দিন যে মিলনের অপেক্ষা করিতেছি, প্রজাপতি আজ তাহা মিলাইয়া দিলেন। মাতা ব্যতীত গদাধরের সংসারে আর কেহ নাই, সুতরাং তাহাকে অতি অল্পেই নিজ সন্তান তুল্য করিতে পারিব। আপনাদের যদি এ সম্বন্ধে কোনও কিছু বলিবার থাকে বলুন। কেহ সন্তুষ্ট চিত্তে কেহ বা অসন্তোষের সহিত জীবন বাবুর বাক্য সমর্থন করিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় পরশ্রী-কাতর ব্যক্তিগণ সমালোচনা করিতে ছাড়িলেন না। কেহ গদার, কেহ বা জীবন বাবুর নির্ব্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। কেহ বা পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে দরিদ্র গদা অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিল বলিয়া কর্ম্মফল সম্বন্ধে দুই একটী শাস্ত্রীয় কথা বলিলেন। দুই একটী নব্যযুবা কর্ম্মফল খণ্ডাইয়া পুরুষকার স্থাপনের চেষ্টায় হাত ঘুরাইলেন। কেহ বা 'বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি' শ্লোকের এক চতুর্থাংশ আওড়াইয়া, জীবন বাবুর বিনাশ যে অতি সত্বর তাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিলেন।

জীবন বাবু গদাধরকে কাছে বসাইয়া সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। গদাধর অকপটে সমস্তই বলিতে লাগিল, তাহার রাত্রিতেই বাড়ী আসিবার ইচ্ছা ছিল, মাকে ছাড়িয়া থাকিতে তাহার কষ্ট হয়, কিন্তু বৃষ্টির জন্য আসিতে পারে নাই, বৃষ্টি উপশমের পরেই সে রওনা হইয়াছে, তখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই, নদীর চড়ায় ভূতিকে পাইয়াছিল ইত্যাদি কিছুই গোপন করিল না। জীবন বাবু সমস্ত শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, ভাবী জামাতার পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "বাবা। তোমার উপকার জীবনের ভুলবার নয়, তুমি আহার ক'রে বাড়ী যাও, আমি কাল সকালে তোমাদের বাড়ী যেয়ে তোমাকে দেখে আস্‌বো। আমার পুত্র নেই, আজ হ'তে তুমিই আমার পুত্র হ'লে, ভূতির সঙ্গে তোমার বে দিয়ে তোমাকে এই বাড়ীতে রা'খ্‌বো, তুমি আমার সম্পত্তি দেখ্‌বে, আজ হ'তে এ সম্পত্তি তোমার হ'ল, আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবি হ'য়ে এই ভিটের প্রদীপ জ্বেলো।"

বিবাহের নামে গদার প্রাণের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল; 'মারের ভয়ে বিবাহে অস্বীকৃত', একথা বলিলে হয়ত জীবন বাবু তাহাকে বোকা ভাবিবে, বিবেচনায় গদা কিছু বলিল না। এ দিকে আবার সম্পত্তির লোভ, নিজের জন্য নহে, মায়ের জন্য। মাতৃভক্ত গদা ভাবিল সম্পত্তি তাহার হইলে মায়ের কষ্ট ত দূর হইবে, না হয় সে মধ্যে মধ্যে দু'এক ঘা খাইবে, আর কতই বা মারবে? ভুতির ত নরম হাত;—কত খোল বাজান হাত, গাঁজাটেপা হাত, যাহার পিঠ নরম করিতে পারে নাই, ভুতির হাতে সে পিঠের কি করিবে? মোট কথা মায়ের সুখের জন্য সে কিল, চড় প্রভৃতি খাইতে মনস্থ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে আবার বর সাজিবার সখ উপস্থিত হইল, বাঃ। কেমন মাথায় টোপর, কেমন নূতন জুতা, মোজা, কাপড় বাঃ! এত বেশ, বাঃ! গদা মানস চক্ষে তাহার বর বেশ দেখিয়া আহ্লাদে আটখান্ হইল, মূর্চ্ছা যাইবার ভয়ে শক্ত হইয়া বসিল।

চর্ব্ব-চুষ্য আহার করিয়া গদা বিদায় গ্রহণ করিল। রাস্তা হইতে ডাকিল "ওমা, মা!" "কি বাবা? এসেছিস্, আমি ভাবনায় অস্থির হ'য়েছি, খাওয়া হয়েছে ত? তোর ছোট মামা ভাল আছে ত? ফোঁড়া অমনি গলে গেছে, না, অস্তর কত্তে হ'য়েছে? মানুকে সঙ্গে আন্‌লিনি কেন? সে আস্‌বার জন্য কাঁদলে না?" মাতা উদ্‌গ্রীব নেত্রে পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিসের মানু আর ছোট মামার ফোঁড়া, গদা বলিল, "মা তুই যে আমায় বেগার দিতে বারণ করিস্, আজ হইয়াছে, হুঁ হুঁ, তা এখন বল্‌ব না—বল্লেই তুই মাটিতে পড়ে যাবি, হুঁ কাল সকালে জান্তে পার্‌বি।"

গদা শুনিয়াছিল হঠাৎ অত্যন্ত সুখ বা দুঃখের সংবাদ শুনিলে লোকে মূর্চ্ছা যাইতে পারে। নিজে ভুক্তভোগী নহে, তাহার সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান;—

"অন্ধ জাগো—কিবা রাত্র কিবা দিন"

"ওরে, সে কিরে, তবে কি চন্দর আমার ফোঁড়া অস্তর কত্তেই মারা গেছে, ওরে একি হ'ল রে! ওরে আমার চন্দর রে! তোর দিদিকে ছেড়ে কোথা গেলিরে! আমি যে তোকে চোখের দেখা দেখ্‌লুম্ না রে!" জননী চীৎকার ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। গদা ক্রন্দনের কারণ বুঝিল না—বিস্মিতনেত্রে জননীর দিকে চাহিয়া রহিল। কয়েকটী প্রতিবেসিনী ক্রন্দন শুনিয়া তথায় আসিলেন। অনেক কষ্টে গদাধর মায়ের ক্রন্দন নিবৃত্ত

করিল। কি করিয়া সে ভূতিকে বাঁচাইয়াছে, বিবাহ সম্বন্ধে জীবন বাবুর মতামত, সম্পত্তি তাহার হইলে মায়ের কষ্ট দূর হইবে ইত্যাদি সমস্ত বলিয়া মাতাও প্রতিবেসিনীদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিল। প্রতিবেসিনীগণ অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। এইরূপ একটা জনরব কিছুপূর্ব্বে মাতা শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গদা সম্বন্ধে কিছুই শুনেন নাই, সুতরাং কিছু বিশ্বাস করিলেন কিছু বা করিলেন না বরং পুনরায় তাহার কথার অবাধ্য হইয়া বেগার দিয়াছে বলিয়া যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। গদা কথা বলিল না, ভাবিল 'মা বড় বোকা'।"

পরদিন প্রাতে কয়েকটি বন্ধুর সহিত জীবন বাবু গদাধরের পর্ণকুটীরে দেখা দিলেন। গদাধরের জননী তাহাদের যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করিয়া দুই একজন প্রতিবেসীকে ডাকিয়া আনিলেন। আসিবার সময় প্রতিবেসী গৃহ হইতে তামাকের উপকরণাদি আনিতেও ভূলিলেন না। জীবন বাবু গদাধরের পরোপকার প্রভৃতি গুণের কথা উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিলেন এবং তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিবেন ইত্যাদি সমস্ত বলিয়া ভাবী বৈবাহিকার মতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

গদাধরের জননী হাতে স্বর্গ পাইলেন। এইবার গদার কথা তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। আনন্দে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। এতদিন চেষ্টা করিয়া একটি দরিদ্রের কন্যা যে ঘরে আনিতে পারে নাই, আজ বিনা চেষ্টায়—ধনীর একটী সুশ্রী কন্যা তাহার ঘর আলো করিতে আসিতেছে, এ কি কম ভাগ্যের কথা—আজ তাঁহার স্বামী থাকিলে তাঁহার কত আনন্দই হইত ইত্যাদি ভাবিয়াই তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

অনেক কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল, তিনি যত দিন জীবিত থাকিবেন তত দিন গদা প্রকাশ্য ভাবে ঘর জামাই থাকিতে পারিবে না, তবে অধিকাংশ সময় শ্বশুর বাড়ী থাকিয়া এখন হইতেই বিষয় সম্পত্তি বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিবে। মাসের শেষেই বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

যথাসময়ে জীবন বাবু প্রেরিত বরবেশ পরিধান করিয়া বাজী বাজনার সহিত গদাধর বিবাহ করিতে চলিল। মাতা পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। টুকটুকে বউ আনিয়া ঘর আলো করিবার এবং বউএর সহিত লক্ষ্মী আসিয়া ধান চালে গোলা ভরিবার আদেশ করিয়া পুত্রকে পাল্কীতে তুলিয়া দিলেন। আহ্লাদে গদার বুক সাত হাত ফুলিয়া

উঠিল। "বাঃ! এ ত বেশ, কেমন সুন্দর চক্‌চকে জামা, কেমন জুতা, বাঃ! কত লোক দেখ্‌তে আস্‌ছে, এমন বাজনা বাঃ! এমন বিয়ে রোজ হ'লেইত বেশ হয়, বাঃ!" প্রত্যহ দৃষ্ট ঘর বাড়ী বাগান ইত্যাদি গদার চক্ষে নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

শুভ লগ্নে দুই হাত একত্র হইলেই গদার শরীর কাঁপিয়া উঠিল। মন্ত্র পড়িতে গলা কাঁপিতে লাগিল। সকলে মনে করিল উপবাসে ঐরূপ হইয়াছে।

বাসর ঘরে মেয়েদের আমদানী দেখিয়া গদার মায়ের কথা মনে পড়িল। "এত লোক কিজন্য এখানে আসিয়াছে, সে তাহা বুঝিল না। গদা জন্মে কখনও বাসর দেখে নাই কারণ বরাবরই সে মেয়েদের ভয় করিত। দুর্গা পূজায় স্নাত ছাগের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে গদা আসনে বসিল, বাঃ রে, কথা না কিছু না, কোথা থেকে একখানা সালঙ্কৃত হাত এসে তাহার কান মলিয়া দিল, কিছু পরে দু' দিক হ'তে দু'খানা, বেশ তা এ ত বড় জ্বালা;— আবার গালে ঠোনা মাচ্ছে দেখ।

এইবার গদা মায়ের উপর যথার্থই চটিল। এই সব হ'বে জেনেই ত মাকে বারণ করেছিলুম যে মা বিয়ে দিও না, তা, মা কেঁদেই একাকার। কাণমলা খাবার সময় ত খেতে হ'চ্চে না, পরে পরে ভূত ছাড়াতে সবাই পারে, আবার শালা ব'লে গাল দিচ্ছে দেখ।'

প্রতিকারাসমর্থ গদা নিরবে সমস্তই সহ্য করিতে লাগিল। স্ত্রী-আচারের পর বৃহৎ থালায় জল খাবার দেখিয়া ভোজন পটু গদা সমস্ত লাঞ্ছনা ভুলিয়া মায়ের উপর সন্তুষ্ট হইল এবং দর্শন মাত্রই তাহার ক্ষুধা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। ছোলা, নারিকেল সন্দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষীরের পুলি প্রভৃতি কিছুই বাদ দিবে না ঠিক করিল কিন্তু পূর্ব্বে খাইবার জিনিস পরে খাইলে হয় ত ইহারা মূর্খ, ভোজনে অনভিজ্ঞ ইত্যাদি ভাবিবে, মনে করিয়া খাবার পর্য্যায় ঠিক করিতে লাগিল। বাস্তবিকই গদা খাইবার পূর্ব্বাপর জানিত না, খাবার পর্য্যায় তাহার ইচ্ছাধীন ছিল।

জামাইয়ের খাইতে বিলম্ব দেখিয়া নারীগণ মনে করিল, নূতন জামাই বলিয়া খাইতে লজ্জা করিতেছে, তাহারা জানিত না গদা লাজুক হইলেও ভোজন বিষয়ে তাহার চক্ষের পরদা বড় কম।

বাসরে গ্রাম্য সম্পর্কে ভুতির এক খুড়িমা ছিলেন, জামাইকে ভোজন

করাইবার জন্য সম্মুখে বসিয়া বলিলেন "থাক্ বাবা, এ সব কিছু খেয়ে কাজ নেই, এই ক্ষীরের পুলি দুটো খাও।" গদা অনুরোধ রক্ষা করিল। অন্য একটায় হাত দিবে এমন সময়ে তিনি আবার বলিলেন "থাক্ বাবা, ওটা খেও না, ঐ সরবতটুকু খাও।" বেশ, তাহাই হইল, আবার একটা ধরিবে, এমন সময় আবার তিনি বলিলেন "থাক্ বাবা উপোসের পরে ওটা খেলে অসুখ কর্ব্বে, তুমি এই ক্ষীরের সন্দেশটা খাও।"

এইবার গদার ভয়ানক রাগ হইল, ভাবিল "আমি ছোলা, খুট, নারিকেল, চিনি, আম, কাঁঠাল কিছু বাদ দেবো না ভাবলুম, কোথা হ'তে একটা উৎপাৎ এসে বলে কিনা, এটা খেয়ো না, ওটা খেলে অসুখ কর্ব্বে, আত্মীয়তা ক'র্‌বার আর জায়গা পেলে না, খেলে আবার অসুখ করে, এ ত কখনও শুনি নেই, ভাল জ্বালা—"

গদার ভাবে সকলে ঠিক করিল আহারে বুঝি আর তাহার স্পৃহা নাই। সকলে একসঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া তৎক্ষণাৎ সমস্তই থালা হইতে তুলিয়া আহার করিতে লাগিল। থালা শূন্য দেখিয়া গদা মনে মনে ভয়ানক চটিয়া গেল।

পল্লীগ্রামের বাসর জাগিবার প্রথা এখন প্রায় দেখা যায় না। নারীগণ লুচি সন্দেশে পেট ভরিয়া লক্ষ্যে অলক্ষ্যে পানের থলিতে হাত, মুখ ভরিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিল।

লুচির ঘি ভাল নয়, দুধ সস্তা সত্ত্বেও সন্দেশ ভাল হয় নাই, কমলা দশবার চেয়েও একটী রসগোল্লা পায় নাই, এর চেয়ে শান্তর বিয়ের খাওয়াটা অনেক ভাল হইয়াছিল, একটা গরুর হাতে মেয়ে পড়িল, ইত্যাদি সমালোচনায় সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। একজন বলিল 'তা' ভাই! ভূতিকে কিন্তু গয়না দিয়েছে বেশ, বালাজোড়া যেন টোটা, গড়নও বেশ!" তাহাতেও নিস্তার নাই "তুই জীবন বাবুর চালাকি কি বুঝবি? কল্‌কাতার গয়না, সোনা নয় গিল্‌টি, বড়লোকের বুদ্ধি—পাতায় পাতায়—"

এদিকে সস্ত্রীক গদাধর বাসরে বিরাজিত। এইবার বোধ হয় ভাত, লুচি ইত্যাদি খাইতে পারিবে ভাবিয়া গদাধর একটু আশ্বস্ত হইল কিন্তু ভাতের পরিবর্ত্তে পান লইয়া আসিয়া শাশুড়ী শুইবার অনুমতি দিয়া প্রস্থান করিলেন। আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা আশায় থাকিয়া গদা ক্রমেই বাড়ীর নিস্তব্ধতা অনুভব করিতে লাগিল, এইবার বুঝিল সকলেই বিশ্রাম করিতেছে। কিন্তু

বিশ্রামে ত আর তাহার পেট ভরিবে না, উপবাসে দ্বিগুণ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। পত্নীকে ডাকিয়া খাবার আনাইবে ভাবিল কিন্তু নিদ্রিতা বিবেচনায় তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিল না, আলো লইয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে আহারান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। একটী ধামায় অনেকগুলি মুড়্‌কী দেখিয়া গদা তাহা খাইতে আরম্ভ করিল। অল্পে অল্পে তাহা শেষ করিয়া পিপাসা নিবারণার্থ জল অনুসন্ধান করিয়াও যখন পাইল না, তখন লজ্জা ত্যাগ করিয়া পত্নীকে ডাকিল "ওগো, ঘুমিয়েছ নাকি? একটু জল এনে দিতে পার?"

ভূতি মশারীর মধ্য হইতে গদার এই সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া রাক্ষস জ্ঞানে এতক্ষণ ভয়ে চুপ করিয়াছিল, এইবার আক্রমণ তাহারই উপর দেখিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া এক লম্ফে বাহিরে আসিল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার আরম্ভ করিল "ওগো, মাগো।" চীৎকার শুনিয়া সকলে একত্র হইয়া ব্যাপার জানিতে চাহিলে, ভূতি বলিল একধামা মুড়কী খেয়ে তোমাদের জামাই আমাকে খেতে এসেছে, ব'লব কিমা, আজ বিয়ে হ'ল, আজই আমার সঙ্গে কথা ব'লছে, কি লজ্জা; --তোমরা আমায় যা' ব'লেছ আমি তাই ক'রেছি, আমি ত কথা বলিনি।"

সকলেই ব্যাপার বুঝিল। গদা আরও কিছু আহার করিয়া শয়ন করিল।

পরদিন মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়া গদাধর সস্ত্রীক বাড়ীতে উপস্থিত হইল। মাতা প্রতিবেসিনীদিগের সাহায্যে পুত্রবধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। বাড়ীতে আহারাদির ঘটা পড়িয়া গেল। সকলেই নব বধূর প্রশংসা করিতে লাগিলেন, মাতা হাসিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন বাবা, বউ, মনের মত হ'য়েছে ত? বউ মারে না ত?"

গদা। "হ্যাঁ, মারে না বৈ কি, কাল রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে বউএর গায়ে হাত পড়েছিল, তা এমনি একটা ধাক্কা দিয়ে হাতখানা ছুড়ে দিলে, এখনও ব্যথা হয়ে র'য়েছে। তা, মা, তুই ত ব'লেছিলি বউ আদর ক'রে খেতে দেয়, তা' আমি এক রাত্রিতেই বেশ বুঝতে পেরেছি, মুড়্‌কী খেয়ে জল চাইলুম, আমাকে যে বেকুপ্‌টাই কল্লে, তা আর কি ব'লব। এই ত গেল বৌএর কথা;—বিয়ের পরই কতকগুলি মেয়ে এসে এমনি জোরে কাণ

মলে দিলে, এখনও লাল হ'য়ে র'য়েছে।" মাতা একটু হাসিয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন। গদা ভাবিল "মা, হা'স্‌ল কেন?"

পাকস্পর্শের পর গদা সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে গেল। দশ বার দিন পরে আসিয়া মাকে বলিল "মা, তুই যে আমায় বেগার দিতে বারণ করিস্, দেখ দেখি বেগারে কেমন কাজ হয়। প্রথমে মা'র খেতে হয় বটে, কিন্তু শেষে কেমন বড়লোক হওয়া যায়, দেখ্ দেখি? প্রথম ত অমন বৌ পাওয়া গেল, তারপর জীবন বাবু তাঁর সর্ব্বস্ব কি যেন ক'রে বৌকে দিয়ে কাশী চল্লো তাঁর ত আর পুত্র সন্তান নেই।"

মাতা। কি ক'রে, উইল ক'রে নাকি?

গদা। "হ্যাঁ, মনে হ'য়েছে উইল ক'রে, তা' তোর পুত্রবধূর হ'লেই আমার হ'ল, কেমন? হ্যাঁ মা, বৌকে তুই কি ব'লে ডাক্‌বি?"

মাতা হাসিয়া বলিলেন "বেগার দিয়ে তা'কে পেয়েছিস্, তার নাম রইল "বেগারে-বৌ"। আমি ঐ নামেই ডাক্‌ব, কেমন?"

গদা। "মা আজ আবার সেখানে যেতে ব'লেছে, হাঁ, মা, তোর কি আমায় ছেড়ে থাক্‌তে কষ্ট হয়?"

মাতার চখে জল আসিল। ইতিপূর্ব্বে গদা এ কথা ভ্রমেও বলে নাই। মৃদু হাসিয়া বলিলেন "না, বাবা কষ্ট হবে কেন? দু'একদিন পরে এসে আমাকে দেখে যাস।" গদা প্রস্থান করিল।

বাড়ী যাইবে যাইবে ভাবিলেও, খাবার কথা মনে করিয়া আর তাহার যাওয়া হইল না। অতি কষ্টে লোভ সংবরণ করিয়া বলিল "মা, তোর কথাই ঠিক, বউতে বড়ই যত্ন করে। পরশু রাত্রে অন্ধকারে পা' মচ্‌কে গে'ল, বউ সারা রা'ত জেগে পা' টিপে দিলে, বাতাস দিলে, আরও কত কি কল্লে, চুন হলুদ গরম ক'রে পায়ে দিয়ে দিলে, কত যে যত্ন কল্লে, মা! তা' আর কি ব'ল্‌ব, বলে কিনা আমায় বড় ভালবাসে, হাঁ, মা, তোর চেয়েও কি বেশী ভাল বাসে?"

মা। হ্যাঁ, তা' বাসে বৈ কি, মেয়েত নয়, যেন লক্ষ্মী, বেঁচে থাক্ সাবিত্রীর মত সতী সাধ্বী হ'য়ে, পতি পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করুক, এই দেখে যেতে পাল্লেই আমার সুখ; কাল একবার বেগারে বৌকে নিয়ে আসিস, কত দিন মা'কে দেখি নাই।"

গদা। "মা, এক দিন যে তুই তাঁকে বাজারে যেতে বলেছিলি মনে আছে? এখন বুঝি আর ব'ল্‌বিনি, কেমন?"

মা। "চুপ্‌ চুপ্‌ ও কথা ব'ল্‌তে নেই, শুনলে লোকে হাস্‌বে।"

গদা চুপ করিবার কারণ না দেখিলেও নিস্তব্ধ হইল।

একাল সেকাল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(৩৫)

বিমলা সন্ধ্যার প্রদীপ দিয়া ঠাকুর নমস্কার করিয়া শ্বশুরের শয্যার পাশে বসিয়া ধীরে ধীরে পায়ে হাত বুলাইতেছিল। সদানন্দ কষ্টের শ্বাস ত্যাগ করিয়া ডাকিলেন—"মা!"

"কেন বাবা?" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বিমলা কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিল।

সদানন্দ বলিলেন—"কিছু ভেবনা না, আমিত তোমায় বলেছি, মনের বেগে যে যাই করুক না কেন, সময়ে তাকে ঠিক যায়গায় এসে দাঁড়াতে হবে। স্রোতের বেগের মতই মনের এই দুর্দ্দমনীয় বাসনা যে, মানুষকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বিপরীত পথে টেনে নেয়, কিন্তু যতই শক্তি ওর হ'ক না, শেষটা সবাইকে গিয়ে একমাত্র গন্তব্য সাগরে গিয়ে পড়্‌তে হবে। ওতে সন্দেহ কর্‌বারও কিছু নেই, ভেবেও পারবাবার যো থাকে না। কর্ম্মের ফল-ভোগ শেষ না হলেত মানুষ আপন অধিকার ঠিক বুঝ্‌তে পারে না।"

বাহিরে প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়িতেছিল, ঝাপ্‌টা বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া দীপের শিখাটা বলির জন্য উপস্থিত ছাগপশুর হৃদয়ের মতই কাঁপিতেছে। দরজা জানালা বন্ধ, তবু বাতাসের এই উদ্দাম গতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও ছিল না। বিমলার মনের মধ্যেও ঠিক এই ভাবের একটা ঝড় তাহার মানসবৃত্তিনিচয়কে বাহিরের প্রকৃতির মত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। শত চেষ্টায় হৃদয়ের দ্বার নিরুদ্ধ করিয়াও সে যেন অন্তঃপ্রকৃতির তুমুল ঝড়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতেছিল না। বিমলার মুখ দিয়া কথা

সরিল না, শঙ্কিত দৃষ্টি নত করিয়া সে নিজের কাজই করিয়া যাইতেছিল, সদানন্দ আবার বলিলেন—"দুঃখ যখন ছাপিয়ে উঠে এই সুখের আশাকে ঢেকে দেবে, তখনই জানবে, যে কেঁদেও পার পাবে না, এখন ভুলেও যা মনে কর্চ্ছে না, এরি জন্য তাকে পাগল হয়ে ছুটতে হবে, আমার শুধু ভাবনা, তখন তাকে এই ছুটাছুটির হাত হতে রক্ষা করবে কে।" সদানন্দ দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিলেন, একমাত্র পুত্রের এই অধঃপতনে তাহার স্থির চিত্ত সময় সময় যেন কেমন বিকল হইয়া উঠিত, নিজের সুখঃদুখের চিন্তা তিনি করিতেন না, পুত্রের বর্ত্তমানের জন্যও তাঁহাকে কখনও কাতর হইতে দেখা যায় নাই, কিন্তু কারণে অকারণ এই বৃদ্ধ যেন নির্ম্মলের বিবেকহীন গতির ভবিষ্যৎ চিন্তাতেই ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন, তাই তিনি মুহূর্ত্ত থাকিয়া বলিলেন—"তুমিই মা আমার আশা ভরসা, ওকে এই পাপের হাত হতে মুক্ত কর্ত্তে আর ত কেউ পার্ব্বে না, যদি তুমি—"

"আমি।"

"হাঁ তুমি, এত বড় পাপ হতে রক্ষা কর্ত্তে পৃথিবীতে আর কেউ পারে না, তা ছাড়া তুমি কিছু যেসে নও, তোমার স্পর্শে যে রঙও সোণা হয়ে উঠবে।"

বিমলা জবাব করিতে পারিল না, তাহার মন যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুলিবিকুলি খাইয়া বলিতেছিল—"আমি, আমি তার কি করব, আমার জন্যেই যে সে সব ছেড়ে পালিয়েছে, আমি যে পাপ, পাপের জন্যেই সে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। আমি আবার যাব তার ভালমন্দর কারণ হতে।"

সদানন্দ বলিলেন—"সে যখন কেঁদে এসে পড়বে, তখন হয়ত আমিও থাকব না, তার মাও থাকবে না, যে তাকে আদর করে বুকে নেবে, এত শিগির কিছু তার ফেরবার সময় হবে না, সে জালা জুড়াতে হলে স্নেহ ছাড়া উপায়ও নেই, তাই মা, আমারও তোমার কাছে, এই একটি অনুরোধ, তুমি যেন মা ভুল কর না, অভিমান করে যেন তাকে পথে ছুড়ে ফেল না। ফিরে এসে আঘাত পেলে তার ভাঙ্গা বুক যে চৌচির হয়ে যাবে।"

বিমলা কাঁপিয়া উঠিল, ধারার বেগে অশ্রু ঝড়িয়া পড়িয়া বক্ষঃ আর্দ্র করিয়া তুলিতেছিল। অতিকষ্টে মনে মনে বলিল—"আমার আবার অভিমান, আমি নাকি পারি তাকে তাড়িয়ে দিতে ছিঃ, সে যে আমার দেবতা, দেবতার দোষগুণ বিচার না কি কেউ করে। ঐ এক আশাতেই যে আমি

বেচে আছি, ফিরে আস্‌তে ইচ্ছে যায় আস্‌বে, নয়ত তবু সে সুখে থাক, তার যেন কোন জ্বালাতেই জ্বল্‌তে না হয়।"

সহসা সদানন্দ উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিয়া পড়িয়া গেলেন। বিমলা দ্রুত-পদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাখা লইয়া মাথায় বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল—"খুব বেশী কষ্ট হচ্ছে কি বাবা।"

"মা" বলিয়া সদানন্দ চক্ষু মেলিলেন, ধীরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"কষ্ট আমার আর কিছুতে নেই, যা জীবনে ভাবি নাই, তাই যে আমার শেষকালে ভাব্‌তে হচ্ছে, তুমি যদি আশ্বাস দেও মা।"

"আমি আবার কি আশ্বাস দিব, মেয়ে কি বাপমার কথার অন্যথা করে, আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন পারি—"

উচ্ছ্বসিত আবেগ চাপিয়া রাখিয়া সদানন্দ বলিয়া উঠিলেন—"তুমি পার্ব্বে মা, আমার আশীর্ব্বাদে, তোমার কোন কাজে পিছুতে হবে না।" বলিয়া তিনি থামিলেন, শ্রান্ত দেহকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া বলিলেন—"আর আমার কোন খেদ নেই মা, তোমার কথাতেই প্রাণ শীতল হ'ল, যদিও সন্দেহ থাকৃত, তবু আজ আর আমি তা রাখ্‌ব না, এমন মা যার ঘরে রয়েছে, তার আবার ভাব্‌না। তোমাকেও মা কিছু ভাব্‌তে হবে না, যা রেখে গেলাম, দেখেশুনে খেতে পাল্লে এতেই জীবনে কোন অভাব বুঝ্‌তে পাবে না। আমিত চল্লাম, যাবার আগে আর একটা কথা মা, বাড়ীর চৌদ্দ পুরুষের ক্রিয়াকর্ম্মগুলি যেন বন্ধ কর না, ঠাকুর দেবতার উ'পর ভক্তি রেখ, আমি যা করে রেখে গেলাম, সবই মা দেবতার প্রসাদে, আমার একথাটা মনে রেখ।" বলিয়া তিনি নিমীলিতনেত্রে অসারের মত পড়িয়া রহিলেন।

(৩৭)

সন্ধ্যার স্তিমিতপ্রায় দিবালোকে রমার চিঠীখানা বুকে চাপিয়া ধরিয়া বিমলা ফুকারিয়া কাঁদিতেছিল, তাহায় নিরুপায় প্রাণ ভীষণ বিপদের বিভীষিকায় স্থানাস্থান কালাকাল ভুলিয়া কি করিয়া কি করিবে চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। আশে পাশে আশ্রয়ের মত কিছু খুজিয়া না পাইয়া সে রমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, কিন্তু রমাত আসিতে পারিল না, এমন বিপদ্‌-সময়ে রোগ যে চির শত্রুর মত তাহার শরীরকেও চাপিয়া ধরিয়াছে, বিমলার ভাবনার অন্ত ছিল না, বৃদ্ধ শ্বশুর মৃত্যুশয্যায় শায়িত, পুনঃ পুনঃ চিঠী লিখিয়াও স্বামীর কোন সংবাদ নাই, কৃপাময়ী পাগলের মত, তাহার দিকে একবার

দৃষ্টি করিবে এমন লোক নাই। বিমলা চিত্ত স্থির করিতে চেষ্টা করিয়া বলিয়া উঠিল—"হায় ভগবান্ এক কল্লে, শেষটা ধরেবেধে মেরে ফেল্‌বে।"

শান্তি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, বলিল—"বৌদি এ তোমার কেমন ধারা, সন্ধ্যে বেলা চোখের জল ফেল্‌ছ।"

আঘাত পাইয়া অশ্রু দ্বিগুণ বেগে বহিয়া চলিল, শান্তি হাত ধরিল, কাপরের আচলে চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল—"ছিঃ? তুমি কেন এত অস্থির হবে, আমরা সবাই যে তোমার মুখ চেয়ে আছি। তুমি ধৈর্য্য হারালে ত চল্‌বে না।"

গৃহিণী কৃপাময়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বিমলা ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল—একি, বাবাকে একলা ফেলে এলে?"

কৃপাময়ী সে কথার জবাব না করিয়া বলিলেন—"রাধানাথ না বৌমা, তা কেন আস্‌বে, সময়ে সবাইকে পাওয়া যায়, অসময়ে ত কাকেও কেউ নয়।"

"ঠাকুরঝীর যে অসুখ করেছে।"

"তা অমন করে" "বলিয়া তিনি নিজের মনেই বকিতে লাগিলেন—"গেল সব গেল, এত আশা ভরসা আমার একদিনে তলিয়ে গেল। কিন্তু সে কার দোষে।"

বিমলার অশ্রু রোধ করা কষ্টকর হইল, মনে মনে বলিল—"আমারই দোষে, আমাকে জায়গা দিয়েই যে ঘরের লক্ষ্মীকে তাড়িয়েছ মা।"

সদানন্দ ক্ষীণ স্বরে ডাকিলেন—"মা।"

বিমলা ত্বরিতপদে গৃহে ঢুকিয়া শ্বশুরের মাথার গোড়ায় দাঁড়াইল। সদানন্দ বলিলেন—"যে কটা দিন আছি, তুমি মা কাছটিতেই থেক, তোমায় দেখ্‌লেও যে আমার প্রাণ জুড়ায়।"

বিমলা মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"এখন সন্ধ্যে কর্‌বেন।"

সন্ধ্যার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এ অনুভূতিও এতক্ষণ সদানন্দের ছিল না, সহসা বিমলার কথায় অনেকটা প্রবুদ্ধের মত চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"তাইত সন্ধ্যের সময় যে বৈয়ে গেল।"

"আমিত অনেকক্ষণ যায়গা করে রেখে গেছি।"

"আজ হয়ত অতটাও পেরে উঠ্‌ব না, নাব্‌তে কি পারব মা, ধর দেখি চেষ্টা করে দেখি।"

"তা নয়ত শুয়েই করুন না।"

"না মা, দেখি আজকের দিনটাও যদি পারি, বামনের ছেলে বিছানায় পরে সন্ধ্যা আহ্নিক করব, কোন্ সাহসে।"

"রোগীর পক্ষেত বিধিনিষেধ কিছু নেই।"

সদানন্দ মৃদু হাসিলেন, বলিলেন—"রোগী বলে দোহাই দিয়ে পার পেতে ত পাড়া যাবে না, শক্তি থাকতে যদি—"বলিয়াই তিনি শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, বিমলা বলিল—"এই দেখুন, দুটো কথা কইতে আপনার কি কষ্ট হচ্ছে, এতে নাকি পারবেন উঠতে।"

সদানন্দ নিঝুম মারিয়া পড়িয়া রহিলেন, সেই সান্ধ্য বায়ুর শীতল স্পর্শেও তাঁহার কপালে গণ্ডে স্বেদকণা দেখা দিয়াছিল। দূরে, বৃক্ষের শাখায় একটা পাখী বিকট রবে চীৎকার করিয়া উঠিল, বিমলার প্রাণ কাঁপিতেছিল, বুকটা যেন ধসিয়া যাইতেছে। নাসারন্ধ্রের শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। সহসা সদানন্দ চোখ মেলিলেন, হাত বাড়াইয়া বলিলেন—"ধর মা দেখি যদি পারি।"

(৩৮)

নির্ম্মলের ক্ষুধিত মন সহসা একটা মহাআশ্রয় পাইল, শোভার অভাব তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতে না তুলিতে নীলিমার সঙ্গ লাভ করিয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল, কিসের জন্য সেও তাহা জানিত না, তথাপি এমনই একটা সঙ্গী যেন তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল, একটা কিছু লইয়া তাহাকে থাকিতে হইবে। জীবনকে একটা বিষয়ের মধ্যে মগ্ন রাখিয়া জগৎ ভুলিয়া তাহার মন যেন এমনই একটা খেয়ালকে বরণ করিয়া লইতে চাহে, সুখশান্তির কথা সে অনেক কাল ভুলিয়া গিয়াছিল, উচ্চ আশা বা সাধু আকাঙ্ক্ষা সে রাখিত না, একমাত্র সময় কাটান গোছের অবলম্বন সম্মুখে পাইলেই সে বাঁচিয়া যায়, ক্ষুধার জ্বালায় আত্মা চীৎকার করিতেছে, ভালমন্দ দোষগুণের বিচার সে করিতে পারে না, অভক্ষ্য কুভক্ষ্য কিছু পাইলেই জঠরজ্বালার নিবৃত্তি করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতে পারে। শোভাও তাহার কেহ ছিল না, নীলিমাও তাহার আপনার হইবে না, তবু একটা মাধুর্য্যময় আত্মপ্রসাদ যেন তাহার মনকে ঠিক ইহাদেরই জন্য ধাবিত করিয়া রাখিত। শোভার মধ্যে সে নিজের জন্য যে স্থানটুকু করিয়া লইয়াছিল, দস্যু যেন তাহা ছিনাইয়া লইল, নির্ম্মল সমস্ত সংসার বিষাদ কালিমাচ্ছন্ন দেখিতেছিল; শুক

মরুতে এক বিন্দু জল না দেখিয়া তাহার তৃষিত প্রাণের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল, সহসা রূপের সুবাসিত স্বচ্ছ জল লইয়া নীলিমা আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল, নির্ম্মল প্রাণ ভরিয়া তাহাই পান করিতে লাগিল, অবগাহনস্নানে শরীর শীতল করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিল না, এই রূপের স্বচ্ছ জলের মাদকতা আছে কি নাই, তাহা একবার ভাবিলও না, ভাবিবার শক্তিও যেন তাহার ছিল না, অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের দুর্গমতায় ব্যতিব্যস্ত পথিকের দৃষ্টিতে আলেয়ার আলোও যেমন আশ্বাসপ্রদ হয়, পথিক হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ভুলিয়া তাহারই দিকে ছুটিয়া চলে, নির্ম্মলও ঠিক সেই ভাবে ছুটিয়া চলিল, দুর্ব্বল মন চঞ্চল, হাতের গোড়ায় বাধা জন্মাইবার মত কিছু ছিল না। আশাও আকাঙ্ক্ষার সান্নিধ্য লইয়া এই বয়াঙ্গী যেন উচ্চ শিক্ষায় ও নিপুণ সৌন্দর্য্য মণ্ডিত হইয়া আলোক্য অঙ্কিত মানসপ্রতিমার মত ধীরে ধীরে তাহারই প্রকৃতির ছায়া লইয়া যুবক নির্ম্মলের তরুণ প্রাণে নূতন ভাবের লহর তুলিয়াছিল। দু'তিন দিনে তাস খেলিয়া পিয়ানো বাজাইয়া দেশ বিদেশের ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়া নীলিমাও নির্ম্মলের মন অধিকার করিবার চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল, নির্ম্মলও তাহার আশায় প্রাণের কোণে বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিবার জন্য অনন্য কার্য্য হইয়া সকালে সন্ধ্যায় রাত্রিতে সেখানেই পড়িয়া থাকিত, আহার নিদ্রা হাস্য পরিহাসে তাহার দিনগুলি বেশ এক রকম কাটিয়া যাইতেছিল, তথাপি যেন সে শোভার কথাটা একেবারে ভুলিতে পারে নাই, তাই সেদিন তাহারই স্মৃতি বুকে করিয়া সতীশের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উপস্থিত হইল, ঘরে ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, পাশের বৈঠকখানা ঘর খানা আজ যেন নীরবে শুষ্ক আমোদ হইতে আপনাকে কাড়িয়া লইয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সতীশ আয়োজনের ত্রুটি করে নাই। তথাপি সে বাটীতে পদার্পণ করিয়াই নির্ম্মলের যেন মনে হইল, শোভার বিবাহের পর সতীশ সর্ব্বতোভাবে একটা পরিবর্ত্তন টানিয়া আনিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। নির্ম্মল নীরবে ভাল ছেলেটির মত বসিয়াছিল, সতীশ খোঁচা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তা হলে আপনার রোগীর এখন কি অবস্থা।"

নির্ম্মল জানিত, সতীশের জানিতে কিছুই বাকী নাই, এরি মধ্যে সে কারণে অকারণে পাঁচ সাত বার নীলিমার বাড়ীতে গিয়াছে, আর প্রতিবারেই নির্ম্মলের সহিত তাহার দেখা হইয়াছে, মনে মনে চটিয়াও সে ধীর কণ্ঠেই উত্তর করিল—"আপনিত তার সবই জানেন সতীশবাবু।"

"আমি যা জানি, তাতে কিন্তু আপনার মত ডাক্তারের তাদের প্রয়োজন আছে বলে মনে কর্ত্তে পারি না। কিন্তু তারাত আপনাকে খোঁয়ে এসেছে, কাজেই কৌতূহল চেপে রাখা দায় হয়েছে।"

নির্ম্মল উত্তর করিল না, সতীশ বলিল "আপনার বন্ধু শশাঙ্ক বাবুর নিকটই শুনলাম, আপনার পিতা মুমূর্ষু, আর আপনি ওখানে দিন রাত পড়ে রয়েছেন।"

নির্ম্মল কাঁপিয়া উঠিল, কদিন আগে সে একবার বাসায় গিয়াছিল সেদিন ত সত্যিই ঠিক ঐ ভাবের একখানা চিঠী তাহার হাতে পড়িয়াছিল, কিন্তু তার পর সেও আর সে মুখো হয় নাই, পিতার সংবাদ ও জানিতে পারে নাই। সে বিমূঢ়ের মত জিজ্ঞাসা করিল—"শশাঙ্ক এখানে এসেছে না কি?"

"এও আপনি জানেন না, তাঁর সঙ্গে কি দেখাও হয় নি?

"দেখা না কল্লে কি করে দেখা হবে।" বলিয়া নির্ম্মল অন্যমনস্কের মত নীচের দিকে মুখ করিয়া যেন পায়ের আঙুল গণিতেছিল, সতীশও অল্পকথায় উত্তর করিল—"হয়ত আপনার বাসায় গিয়েও আপনাকে ধর্ত্তে পারেন নি।"

"সে কিছু অসম্ভব নয়।" মনে মনে বলিয়া নির্ম্মল চিন্তায় আত্মহারা হইয়া উঠিতেছিল। সতীশ বলিল—"তাঁকে কিছু দোষ দেওয়া চলে না নির্ম্মলবাবু, যখনই দেখা হয়, তিনি কিন্তু আপনার কথা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন।"

নির্ম্মল মাথা নীচু করিয়াই ছিল, অপরাধ যে তাহার কতখানি তাহা আর কেহ না জানিলেও তাহার ত জানিতে বাকি ছিল না, সতীশ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বেহারা আসিয়া দাঁড়াইল, আহারের স্থান হইয়াছে জানিয়া নির্ম্মলের হাত ধরিয়া সতীশ উঠিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

বিপ্লব।

[লেখক—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রামু জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ছোড় দি, সত্যি সত্যি পরেশের আবার বিয়ে দেবে?"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "সত্যি নয় তো কি মিথ্যে বিয়ে দেব? কেন বল্ দেখি?"

রামু বলিল, "না, তাই জিজ্ঞেস্ কচ্চি।"

একটু পরে বলিল, "আচ্ছা ছোড়দি, তা হ'লে বৌমার কি হবে?"

তারাসুন্দরী ঈষৎ রাগতভাবে বলিলেন, "হবে আবার কি, ঘুঁটে কুড়ুনীর মেয়ে ঘুঁটে কুড়িয়ে বেড়াবে।"

রামু একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমাদের ঘরে হ'লে ঘুঁটে কুড়িয়েই বেড়াত, কিন্তু তোমাদের ভদ্দর লোকের ঘরে—তাই বলচি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "ভদ্র ঘরের মেয়ে হ'লে ভদ্রের মত ব্যাভার হ'তো, সোয়ামী ছেড়ে, শ্বশুরের ঘর ছেড়ে বাড়ীতে নেচে বেড়াত না।"

রামু ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "অমন কথা ব'লো না ছোড়দি, বৌমার কোন দোষ নাই। যত পাজীর হাড় ঐ একচোখো বামুনটা। বলবে বামুনকে গাল দিলে, কিন্তু সাধে কি গাল দিই, তার আক্কেলকে গাল দিই। কি বলব বেটা বামুন, তা নইলে বুঝতে পাত্তো, সে কেমন বামুন আমি কেমন গয়লার ছেলে।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "ওরে রামু, তুই থাম্। ও সব সমান, যেমন খুড়ো, তেমনি ভাই-ঝি। মেয়েটাও বড় কম যায় না, আমি বেশ চিনে নিয়েছি। আচ্ছা, আগে বিয়েটা দিই, তারপর দেখাব মজা।"

রামু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "দেখ ছোড়দি, সেদিন শ্যামনগর থেকে আসবার সময় ওনাদের বাড়ী গিয়েছিলুম, বলি কে কি বলে শুনে যাই।"

একটু ব্যগ্রতার সহিত তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর ওরা কি বললে?"

"আর কে কি বলবে? বৌমা আমাকে আদর ক'রে বসালে। ঘরে সন্দেশ ছিল, তাই দিয়ে জল খেতে দিলেন।"

"তার পর?"

"তারপর জিজ্ঞাসা করলে, পিসীমা কেমন আছে, তোমরা সব কেমন আছ।"

"পরেশের কথা কিছু বললে না?"

তিরস্কারের স্বরে রামু বলিল, "তুমি যেন পাগল ছোড়দি, সে কথা আবার মুখ ফুটে জিজ্ঞেস কত্তে পারে? আমি মোদ্দা সুকাজকার কথা বললুম।"

মৃদু হাসিয়া তারাসুন্দরী বলিল, "ওঃ, তোকে সন্দেশ খাইয়েছিল, তাই তোর এত টেনে কথা?"

রামু রাগিয়া বলিল, "রেখে দাও তোমার সন্দেশ! রামু গয়লা কারো সন্দেশ মোণ্ডার তোয়াক্কা রাখে না। আমি উচিত কথা বলবো, তা সে বাবা কেনে হোক্ না।"

তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর আর কোন কথা হ'লো?"

রামু বলিল, "হ'লো বৈকি। আমি বল্লুম, তুমি আমাদের বাড়ী যাবে না বৌমা?" বৌমা বল্লে, "যাব না কেন, তোমরা কবে নিতে এসে ফিরে গিয়েছ?" আমি তো ছোড়দি, লজ্জায় অধোবদন।"

তারাসুন্দরী একটু চড়া গলায় বলিলেন, "বটে, এই তো দাদার কাজের সময় আনা হয়েছিল। তা রৈল কোথা?"

রামু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "হক্ কথা কও ছোড়দি, সে তো কদিনের কড়ারে আনা হ'য়েছিল। তার পর আর আনতে গিয়েছিলে?"

ঝঙ্কার দিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "ওঃ ভারী বড়মানুষের মেয়ে, রোজ রোজ তাঁর খোসামোদ ক'রে আনতে যেতে হবে।"

রামু একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া বলিল, "এটা তোমার নেহাৎ গরজ কথা ছোড়দি। বড় মানুষের মেয়েই হোক, আর গরীবের মেয়েই হোক, শ্বশুর-বাড়ী তো বটে, যেচে কি আসতে পারে? এই যে আমাদের কেশের মা চার ছেলের মা হ'য়েছিল, তবু বাপের বাড়ী গেলে আমাকে আনতে যেতে হ'তো। মেয়েরা বাপের বাড়ী সেধে যেতে পারে, কিন্তু শ্বশুর বাড়ীতে সেটী হয় না।"

শেষের কথাটাকে দৃঢ় করিবার জন্য রামু কথার সঙ্গে সঙ্গে বার দুই ঘাড়টা নাড়িল। তারাসুন্দরী মুখখানাকে খুব গম্ভীর করিয়া রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "হয় না তো আনতে যাও। আমি কি বারণ ক'রে রেখেছি?"

তাঁহার মুখের উপর সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রামু বলিল, "আজই যাব?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে, আজ দিন ভাল থাকে আজই নিয়ে আয়।"

রামু বসিয়াছিল, উঠিল। বলিল, "আচ্ছা টোলে গিয়ে দিনটা ঠিক ক'রে আসি।"

রামু প্রস্থানোদ্যত হইল। তারাসুন্দরী ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু আনা চাই, তা আমি বলে দিচ্ছি। তা নইলে তোরই একদিন কি আমারই এক দিন।"

"আচ্ছা আচ্ছা।" বলিয়া রামু হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

রামু টোলে গিয়া দিন দেখাইল। সেদিন রবিবার, পশ্চিমমুখে দিক্‌শূল। নক্ষত্রটাও ভাল ছিল না। পরদিন সোমবারেই দিন ঠিক হইল। রামু সেখান হইতে সোজা সেনপুরে গোবিন্দ আকুলীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

আকুলী মহাশয় তখন বামস্কন্ধে নামাবলী, দক্ষিণ স্কন্ধে গাত্রমার্জ্জনী, ডান হাতে লাঠি এবং বাঁ হাতে লণ্ঠন লইয়া বাহির হইতেছিলেন। রামুকে দেখিয়া একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে রামচরণ যে, ভাল তো?"

রামচরণ হাত দুইটা কপালে ছোঁয়াইয়া প্রণাম সারিয়া বলিল, "আজ্ঞে অমনি পরাণগতিক চলে যাচ্ছে।"

গম্ভীর ভাবে একবার গ্রীবা আন্দোলিত করিয়া আকুলী মহাশয় বলিলেন, "বটে! তারপর কি মনে ক'রে?"

রামু বলিল, "একবার বৌমাকে "দেখতে এলাম। আর ওনাকে নিয়ে যাবার কথাও বলতে এয়েচি। কাল দিন ভাল আছে।"

আকুলী মহাশয়ের মুখখানা একটু বিকৃত হইল। তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুটী ছিল না, বাম চক্ষুটীর তীব্র দৃষ্টি রামুর উপর নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের ডাক্তারবাবুর চলছে কেমন?"

রামু বলিল, "চলাচলি আর কি, পরেশ তো পয়সার পিত্যেশী নয়। তবু মাসে দু'এক শো হচ্চে বৈ কি।"

একটু কুটীল হাসি হাসিয়া আকুলী মহাশয় বলিলেন, "আট পয়সার পিত্তেশী হ'লে বুঝি এতদিনে একটা জমিদারী কিন্‌তো ?"

রামুও স্বরে বেশ একটু তীব্রতা আনিয়া উত্তর দিল, "জমিদারী কিনতেই বা হবে কেন ঠাকুর মশাই, বাপের যা বিষয় আছে সেই তো একটা জমিদারী। পাঁচ খান গাঁয়ের ভিতর এত জমি জায়গা বাগান বাগিচে আর কোন্ বেটার আছে ?"

আকুলী মহাশয় ভ্রূকুটী করিলেন। রামুর কথার উত্তরে বলিলেন, "বেশ ভাল হ'লেই ভাল, হাজার হোক আমার কুটুম্ব তো। সেদিন মেজো ছেলেটার বড্ড অসুখটাই হয়েছিল, ভাবলুম একবার ডাকাই। আবার মনে হলো কি জানি বাবু, বড় ডাক্তার, যদি আমাদের মত গরীবের ঘরে না আসেন।"

রামু সদম্ভে বলিল, "গরীবের ঘরে ? গরীবের ঘরেই না দিন রাত প'ড়ে আছে। বড় লোকের বাড়ীর ডাক ফেলে গরীবের ঘরে আগে যায়।"

মৃদু হাসিয়া আকুলী মহাশয় বলিলেন, "হাঁ হাঁ, পশার করবার সময় ও রকম কত্তে হয় বটে। ঐ রকম কত্তে কত্তে দু'দশ বছর পরে যদি পশার হয়। বেশ, ভাল হলেই ভাল।"

আকুলী মহাশয় প্রস্থান করিলেন, রামু বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিল, "বৌমা !"

অনুপমা আসিয়া রামুকে বসাইল, এবং বাড়ীর সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল। রামু তাহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিল, "কাল যে যেতে হচ্চে বৌমা।"

সহাস্যে অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বরণডালা সাজাবার লোকের অভাব হ'য়েছে নাকি ?"

রামু মুখটা নীচু করিয়া ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে বলিল, "তুমিও তা হ'লে শুনেছ ?"

অনুপমা বলিল, "কথা কি চাপা থাকে ?"

রামু বলিল, "কিন্তু ওটা বাজে কথা।"

অনুপমা বলিল, "আমি যেন শুনেছিলাম সত্যি।"

রামু জোর গলায় বলিল, "সত্যি হ'লে আমি তোমাকে নিতে আসতাম মা বৌমা। যদিও সত্যি হয়, তুমি একবার গিয়ে বসলেই দেখবে, সব সত্যি একেবারে মিথ্যে হ'য়ে গিয়েছে ?"

অনুপমা চুপ করিয়া রহিল। রামু জিজ্ঞাসা করিল, "যাবেনা বৌ মা?"

অনুপমা অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "যাব।"

রামু সহর্ষে বলিল "এই তো কথার মত কথা। আপনার ঘর আপনি নিয়ে একবার দখল করে বসো তো, তার পর দেখি, কোন্ বেটা বেটী কি বলে।"

অনুপমা ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রামু বলিল, "আর দেখ বৌমা, পরেশেরও কষ্টের সীমা নাই। সারা দিন এগাঁ সেগাঁ ঘুরে এসে না পায় সময়ে একটু জল, না পায় একটা কথা কইবার লোক।"

অনুপমার মুখখানা বেদনার চিহ্নে ভরিয়া উঠিল। রামু বলিল, "তা হলে কাল বিকেলে ৫টার পরে পাল্কী নিয়ে আসবো।"

অনুপমা বলিল, "আচ্ছা।"

রামু চলিয়া গেল। অনুপমা বাড়ীতে সব কথা বলিল, খুড়ী আবার খুড়াকে বলিলেন। খুড়া তখন পরেশের অনাচার অবিচার অসামাজিক ব্যবহার প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া অনেক কথাই কহিলেন, এবং সেখানে কিছুদিন বাস করিবার পর অনুপমা যদি এখানে আসে তাহা হইলে তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। খুড়ী মেয়েমানুষ; মেয়েমানুষে মেয়েমানুষের মনের কথা যেমন বুঝে এমন পুরুষে বুঝে না; সুতরাং তিনি উত্তর করিলেন, "তা হোক, ওর এখানেই আসবার দরকার কি, জন্ম জন্ম সেই ঘর করুক।"

একটু উপহাসের হাসি হাসিয়া আকুলী মহাশয় বলিলেন, "সেটা তোমারও প্রার্থনা, আমারও প্রার্থনা, কিন্তু ফলে তা ঘটে উঠে কৈ। আজকাল পরেশের আচার ব্যাভার তো জান না। রমা ভট্টাচার্জ্জির মেয়ে, যাকে তোমরা খিরিষ্টানী মেয়ে বল, তার সঙ্গে মিশে কি কাণ্ডটাই না কচ্ছে। সেও খিরিষ্টানী, ও নিজেও বিলেত ফেরৎ, মিলেছে ভাল কিনা। দেশ শুদ্ধ লোক তো ছি ছি কচ্চে। অথচ নেংটার নাই বাটপাড়ের ভয়। লোকে বলছে গর্জ্জে নিয়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করবে।"

অনুপমা ঘরের বাহিরে ছিল; কথাটা কানে যেতে তাহার চোখ মুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কিন্তু ক্ষণপরেই খুড়ার সত্যবাদিতা ও রামুর নির্ভয় উক্তি স্মরণ হওয়ায় সে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল।

গৃহিনীর সহিত অনেক বাদানুবাদের পর শেষে আকুলী মহাশয় মত

দিলেন। কিন্তু গৃহিনী এবং অনুপমা দুইজনকেই জানাইয়া দিলেন যে, অনুপমা শ্বশুরালয়ের অন্নজল গ্রহণ করিলে তিনি আর তাহাকে গৃহে স্থান দিতে পারিবেন না। ইহাঁতে সে রাগ করিয়া বাপের সাড়ে তিন বিঘা জমির ভাগ লইতে চায়, আকুলী মহাশয় তাহাও ছাড়িয়া দিবেন, তথাপি তিনি সমাজের কাছে মাথা হেঁট করিতে পারিবেন না।

অনুপমা সে দিন বিছানায় পড়িয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভাবিল। তাহার এক দিকে গুরুজনের অবমাননা, অন্যদিকে নারীহৃদয়ের সকল আশা, সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি। শুধু তাহাই নয়, স্বামীর কষ্টের কথাগুলাও মনে আসিল। তিনি তৃষ্ণার জল, ক্লান্তিতে বিরাম, কষ্টে সহানুভূতি পান না; অথচ তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ সামর্থ্য কোনটারই অভাব নাই। তাহাকে স্বামী গৃহে যাইতেই হইবে। নারী জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি সে স্বামী সেবাই করিতে না পাইল, তবে তাহার জন্মটাই যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল, জীবনটা একেবারে ব্যর্থ। অনাচার? সেবারে কয়দিন থাকিয়া অনুপমা তো কোন অনাচারই দেখিতে পায় নাই। তিনি সন্ধ্যা আহ্নিক করেন না, ফোঁটা কাটেন না, নামাবলী গায়ে দেন না বটে, কিন্তু কোন কুখাদ্যও তো খান না; মাছ ছাড়া অন্য কোন আমিষ একদিনও তো বাড়ীতে আসে নাই! আর কথায় বার্ত্তায় চালচলনেও তো কোন অহিন্দু ব্যবহার দেখা যায় না। অনুপমার দৃঢ় বিশ্বাস,—বিবাহের কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, তিনি যখন এতটা নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারেন না, যতটা নিষ্ঠুর ব্যবহার অনুপমা তাঁহার প্রতি করিয়াছে। নিজের নিষ্ঠুরতা স্মরণে অনুপমা আপনাকে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারিল না।

পরদিন রামু যথাসময়ে পাল্কী লইয়া উপস্থিত হইল। অনুপমা খুড়ীর পায়ের ধূলা লইয়া পাল্কীতে উঠিল।

পাল্কী যখন পরেশের বাড়ীর দরজায় আসিয়া থামিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। অন্ধকার হয় নাই, কিন্তু দিনের আলো নিবিয়া গিয়াছে, পৃথিবীর উপর ধূম্রবর্ণের একটা ছায়া পড়িয়াছে।

অনুপমা পাল্কী হইতে নামিলে রামু ট্রাঙ্কটা মাথায় লইয়া উপরের ঘরে চলিল; অনুপমা তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। উপরে পরেশের ঘরটা অনুপমা জানিত, সুতরাং সিঁড়ীতে উঠিবার সময় তাহার পা দুইটা যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু উপরে উঠিয়া ঘরের দরজার সম্মুখে গিয়া

রামু এমনই থতমত খাইয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল যে, তদ্দর্শনে অনুপমা বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। সে ব্যস্তভাবে আপনার কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি গৃহমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিল। কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার পা দুইটা যেন অচল হইয়া গেল। দেখিল, দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া পশ্চিমের জানালার সম্মুখে পরেশ ও শৈল পাশাপাশি দণ্ডায়মান।

অনুপমা শৈলের নাম শুনিয়াছিল, কিন্তু সে যে বড় মেয়ে, এমন সুন্দরী তাহা আজ প্রথম দেখিল। আবার সেই প্রথম দর্শন ঘটিল তাহারই স্বামীর পাশে। এত পাশে যে, পরস্পরের অঙ্গ প্রায় পরস্পরের আলিঙ্গপাশ। শৈলজার এলো চুলের একগোছা বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া পরেশের বাহুস্পর্শ করিতেছে; পরেশের উত্তপ্ত নিশ্বাস বায়ুতে শৈলজার অলকরাজি যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। পশ্চিম আকাশ হইতে লাল মেঘের ছটা আসিয়া উভয়ের মুখে হর্ষমিশ্রিত লজ্জার রক্তরাগ মাখাইয়া দিয়াছে।

অনুপমা তাহাদের দিকে চাহিয়া বিস্ময়বিমূঢ়ার স্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে যখন চৈতন্য হইল, তখন সে রামুর মুখের উপর একবার কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়াই নীচে নামিয়া চলিল। রামুও হতবুদ্ধির ন্যায় তাহার অনুবর্ত্তন করিল।

নীচে নামিয়া আসিয়া অনুপমা একবার দাঁড়াইল।

রামু ডাকিল, "বৌমা!"

অনুপমা উগ্র অথচ অনুচ্চস্বরে বলিল, "পাল্কী কোথায়?"

রামু বলিল, "বাহিরেই আছে।"

অনুপমা বলিল, "শীগ্‌গীর ডাক।"

রামু ট্রাঙ্কটা নামাইয়া একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "চলে যাবে বৌমা?"

কঠোর স্বরে অনুপমা আদেশ করিল, "পাল্কী ডাক।"

রামু আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, সে তাড়াতাড়ি পাল্কী ডাকিতে গেল। বেহারারা তখনও চলিয়া যায় নাই, বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছিল। রামু গিয়া তাহাদের ডাকিয়া আনিল। অনুপমা পাল্কীতে উঠিতে গেল। রামু ভীতভাবে বলিল, "আপনার রাজত্ব পরের হাতে তুলে দিয়ে চলে যা।"

অনুপমা তাহার মুখের উপর একটা কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া

পান্ধীতে উঠিল। রামু হতাশস্বরে বলিল, "একবার ছেড়ে দিয় সঙ্গে করে—"

মাথা দিয়া দৃঢ়স্বরে অনুপমা বলিল, "না।"

ভিতর হইতে তারাসুন্দরী ডাকিলেন, "রামু!"

রামু ধরাগলায় উত্তর দিল, "হঁ।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "বৌমা এসেছে কি?"

"না" বলিয়া রামু বেহারাদের পান্ধী তুলিতে ইঙ্গিত করিল বেহারারা পান্ধী তুলিল, রামু ট্রাঙ্ক মাথায় লইয়া পান্ধীর পশ্চাৎ ছুটিল।

(ক্রমশঃ)

গল্পলহরী

ষষ্ঠ বর্ষ, } কার্ত্তিক, ১৩২৫ { ৭ম সংখ্যা

পুনরাগমন

[লেখক—শ্রীসত্য চরণ চক্রবর্ত্তী]

১

মানুষের মন বাজীকরের ঝুলির মত এমনি দুজ্ঞেয় রহস্যে ভরা যে, তার ভিতর ঢুকিতে পারে, এমন শক্তি বোধ করি স্বয়ং বিধাতা পুরুষের বাপেরও নাই। লোকে যা মনে করে, অনেক সময়ে তা তো হয়ই না—অধিকন্তু যা ভাবেনা বরং করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে—সেইটেই যেন আগে থাকতে কোথা দিয়ে আপনা আপনি সম্পন্ন হয়ে গেছে—এমনি ভগবানের মার? এমনি করে অজ্ঞাতে সুষমারও জীবনের গতি ফিরে গিয়েছিল।

বাপের মরণ মনে পড়েনা. মা কলকাতার কিছু দূরে একটি ছোট সহরে এক ব্রাহ্ম বাড়ীর নীচেকার দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করতেন, সেখানে ধাত্রীর ব্যবসায় তাঁর পসারও মন্দ ছিল না, কিন্তু বাড়ীওয়ালার সঙ্গে সামান চালে চল্‌তে গিয়ে বাবুয়ানায়, আর মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে এক-পয়সাও সঞ্চয় রাখতে পারতেন না। তেমনি সময়ে হঠাৎ যখন একদিন তাঁর ডাক পড়লো, তখন অন্তিম শয্যায় মেয়েকে কাছে বসিয়ে অনুতপ্ত স্বরে বল্লেন—

“বোঝবার ভুলে সর্ব্বনাশ করেছি মা—তোকে পথে বসিয়ে চল্লুম। যে যেমন মানুষ, তার তেমনি ভাবেই চলা উচিৎ,—নইলে ভগবান সদয় হন্ না।”

বল্‌তে বলতে দু’চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো, স্বর বেধে গেল, করুণ নয়নে চেয়ে রইলেন দেখে মেয়ে তাড়াতাড়ি নিজের ব্যথা চেপে রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লে—

“আমার জন্যে কিছু ভেবোনা মা, এ সময়ে ভগবান তোমার মনে শান্তি

দিন। আমায় লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছ—নিজের পথ করে নিতে পারবো। প্রার্থনা করি—তুমি যে পুণ্যধামে চলেছ, এখানকার ভাবনা চিন্তা যেন সঙ্গে যেতে না পারে।"

"একটা কথা মা, এখন এঁরাই তোমার একমাত্র সহায়—অবলম্বন, আশ্রয়। আপনার অবস্থা বুঝে খুব সাবধানে চলো। যে আশাকে মনে বেঁধে আমি আর সব অগ্রাহ্য করে কেবল তোমাকে উচ্চশিক্ষিতা করে তুলছিলুম, বেঁচে থাকলে হয়তো তা সফল হত, কিন্তু এখন তা দুরাশা হয়ে দাঁড়ালো। বুদ্ধিমতী তুমি,—এর বেশী আর বলবার আবশ্যক নেই—সে দুরাশায় মজে নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে এনোনা।"

সেই দিন মায়ের সেই অন্তিম উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে সুষমা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে—

"আর যা হোক, জীবনে কখনো অনিলের ছায়াও মাড়াবে না।"

২

বছর দুই বেশ কেটে গেল। অনিলের মায় নিজের একটি মেয়ে-স্কুল ছিল, তার আয় থেকে এবং বাড়ীখানিতে নিজেরা বাস করেও যা ভাড়া উঠতো, তাতে সংসার এবং একমাত্র ছেলের পড়ার খরচ দুইই স্বচ্ছন্দে চলতো, আর যা কিছু স্বামীর পরিত্যক্ত টাকাকড়ি ছিল, তা খাটতো কলকাতায় এক বন্ধুর বিলডিং কন্ট্রাকটের কারবারে। তিনি বেঁচে থাকতে নিজের মূলধনে ওই ফেল করা ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুর সঙ্গে কারবারটি খুলেছিলেন,—মরে যাবার পর, বন্ধুটিই এখন তাঁর স্ত্রী-পুত্রের অভিভাবক হয়ে, অনিলকেও নিজের মত করে গড়ে তোলবার ইচ্ছায়, শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজে দিয়েছিলেন। এ কাজে তাঁর নিজেরও যে একটু স্বার্থের সম্বন্ধ না ছিল—এমন নয়। যাক সে কথা।

মা মরবার পরে অনাথা সুষমা এই পরিবারের একজন হয়ে গিয়ে, লেখাপড়া ছেড়ে বাড়ীউলীর ইস্কুলেই মাষ্টারী করে, মন জুগিয়ে চলতো। এই রকমে দু'বছরের ভিতরে সে তাহাদের বাড়ীর মেয়ের মতই হয়ে গিয়েছিল।

অনিল থাকতো শিবপুরের কলেজের বোর্ডিং এ। মাঝে মাঝে লম্বা ছুটিগুলো, বছরে দু'তিনবার করে, যখন বাড়ীতে এসে কাটিয়ে যেত—তখন তার সেবা-যত্ন, দেখা শুনো করবার সকল ভারই পড়তো গিয়ে সুষমার ঘাড়ে। কারণ গিন্নী থাকতেন তাঁর স্কুল নিয়েই ব্যস্ত—বাড়ীতেও অন্য মেয়েছেলে আর কেউ ছিল না।

এমনি করে, পিছল পথ ধরে সুষমাকে বড় সাবধানে পা টিপে টিপে চলতে হ'ত। যখনি পা টলমল করতো—তখনি মায়ের শেষ কথা গুলোকে বুকের ভিতর আঁকড়ে ধরে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে খাড়া করে রাখতো। কিন্তু বছর দুই বাদে—অনিলের শেষ পরীক্ষার বছরে—তার সাংঘাতিক ব্যামোর ভিতরে—কোথা দিয়ে, কেমন করে যে সেই অবলম্বনদণ্ডটির গোড়া ক্ষয় হয়ে ভেঙ্গে পড়লো, তা সুষমা জানতেই পারলে না।

বর্ষণ ক্লান্ত শ্রাবণের বিকেলবেলা পশ্চিম আকাশ থেকে ম্লান রৌদ্র, খোলা জানলায় ঘরের ভিতর এসে বিছানার কোণাকোণি পড়েছে। খাটের ওপর থেকে মাঠের ধারের বর্ষাজলে ধোওয়া শিরীষের পল্লবিত চাকচিক্য দেখা যাচ্ছে। ধব্‌ধবে বিছানা থেকে রোদের স্নিগ্ধ আভাটুকু সুষমার গালে চিক্ চিক্ করছে।

হঠাৎ অনিল সুষমার হাতখানি ধাঁ করে ধরে গভীর আবেগে মুখের পানে চেয়ে ক্ষীণ করুণ স্বরে ডাক্‌ল—"সুষু—"

সুষমা চম্‌কে উঠলো, বুকের ভিতর ধড়্‌ফড়্ করতে লাগলো, সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করে কেঁপে কর্ণমূল অবধি রাঙ্গা হয়ে গেল। বিদ্যুতের মত চকিতে একবার মুখ তুলে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিয়ে, হাত দু'খানি আস্তে আস্তে টেনে নেবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু অনিল আরো একটু জোর করে চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত আবেগের ভরে বলে উঠলো—

"সুষু, এ যাত্রা আমার প্রাণ দিলে তুমি। তোমার দেওয়া প্রাণ তোমার হাতেই ধরে দিলুম।"

সুষমার মাথা থেকে পা অবধি যেন একবার প্রলয়ের ভূমিকম্পে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল, দু'চোখে সাগর উথলে উঠলো—তাড়াতাড়ি হাত দুখানি টেনে নিয়ে চোখের পলকে ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

৩

কল-কব্জার মত, দেহ যতই যা করুক, একজন চালাবার লোক না থাকলে যেমন সেগুলো অকর্ম্মণ্য হয়ে থাকে, মন তেমনি দেহের ইঞ্জিনিয়ারী না করলে শরীরও টিকে না। সেই মনের ভার কেটে গিয়ে যখন প্রফুল্ল হয়ে উঠলো—তখন শরীরও ব্যাধিমুক্ত হয়ে অনিলের জীবনটা আবার খাড়া হয়ে গেল।

দু'মাস বাদে, পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী হয়ে এসেছে, রাত আটটার পরে

অনিল নির্জ্জন ঘরে টেবিলের উপর কেরোসিনের আলোয় নিবিষ্ট মনে বসে পড়্‌ছে। পিছন থেকে আস্তে আস্তে কপাট ঠেলে, চুপি সাড়ে সুষমা এসে খা। করে দু'চোখ টিপে ধরলে।

"ওরে রে চোর, রোস" বলেই অনিল চেয়ারের পিছন দিকে দুহাত উঁচু করে তুলে সুষমার গলা জড়িয়ে ধরে মুখখানা আস্তে আস্তে নিজের মুখের উপর টেনে নিলে। আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অনিলের মা দোরের সামনে এসে হঠাৎ চম্‌কে উঠেই নিঃশব্দে চোরের মত ধাঁ করে বারাণ্ডা থেকে সরে গেলেন।

সুষমা অনিলের হাত ছাড়িয়ে পাশে এসেই রাগ করে দুহাতে বইগুলো টেনে নিয়ে পাশে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বল্লে—"বলি, কি ঠাউরেছো বল দেখি, দুদিন অমন শক্ত ব্যামো থেকে সেরে উঠতে না উঠতে দিনরাত এমন হাড়ভাঙ্গা মেহনত করে কি আবার আমার মাথা খাবে ?"

অনিল হেসে জবাব কর্‌ল—"এমন মৃত-সঞ্জীবনী কবচ যার বুকে সে কি মরে, না—"

খপ্‌ করে গালে একটি আস্তে ঠোনা মেরে সুষমা চোখরাঙিয়ে বল্লে, বালাই, কথার ছিরি দেখ ? না—ওসব চলবেনা, এ বছর তোমার একজামিন দিতে হবে না। পাশ করে তোমার রোজগারে কাজ নেই, এমন করে আমার সর্ব্বনাশ করোনা বলছি ?"

অনিল মৃদু হেসে অসীম স্নেহে সুষমাকে বুকের উপরে টেনে নিলে।

ঠিক সেই সময়ে নীচে থেকে গিন্নীর বিরক্তি-ব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর এলো "ওরে ও সুষি, গেলি কোথায় ? আজ আর খেতে-দেতে হবে না বুঝি—নটা যে বেজে গেছে কোন্ কালে ?"

চকিতে আপনাকে মুক্ত করে ঝড়ের মত বাইরে এসে সুষমা বারাণ্ডা থেকে জবাব দিলে···

"এই যে যাই মাসি মা ?"

কিন্তু গলার কাঁপুনিটুকু পর্য্যন্ত মাসীমার কাণে পৌঁছুতে বাকী থাক্‌লো না। রাগে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল, ধাঁ করে কি একটা কটু জবাব করতে গিয়ে অত্যন্ত কষ্টে সাম্‌লে নিলেন। অনিলকে দেখিয়ে কণ্ঠস্বর সহজ করে বল্লেন—"তোকে আবার কে নেমে আস্‌তে বল্লে, ওপরেই খাবার দিয়ে আসতো ?"

"একশোবার ওপর নীচে করতে মানুষের কষ্ট হয় না কি ?"

বলে অনিল আসনের উপর গিয়ে বস্‌লো। গিন্নী একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের মুখের পানে চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

৪

কিন্তু সুষমার হাজার সাবধান—হাজার বারণ সত্ত্বে ও চেষ্টাতে, মায়ের ভয়ে অনিলের একজামিন দেওয়া বন্ধ রইলো না। দিন রাত খেটে খেটে পড়ে তাহার চোখ বসে গেল, মুখ শুকিয়ে গেল, শরীর রোগা হয়ে পড়্‌লো, সেই সময়ে ডাক্তার ডাকিয়ে মা ব্যবস্থা করিয়ে নিলেন যে, একজামিন দিয়েই—আর বাড়ীতে ফিরে না এসে—অনিলকে হাওয়া বদ্‌লাবার জন্য অমনি অমনি কিছু দিনের মত পুরীতে গিয়ে সমুদ্রের ধারে থাকতে হবে। সুতরাং একেবারে পুরী যাবার বন্দোবস্ত সঙ্গে নিয়ে অনিলকে একজামিন দেবার জন্য বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হল?

আর সেই দিন থেকে সুষমারও মুখ চোখ শুকিয়ে শরীর দিন দিন যেমন ভেঙ্গে পড়তে লাগলো—ততই অনিলের মার রুক্ষ ব্যবহার গুলোও দিন দিন ফুটে উঠতে লাগলো। ক্রমে এমন হ'ল যে উঠতে বস্‌তে অকারণে নিরবচ্ছিন্ন তিরস্কার না খেয়ে আর সুষমার একটা রাত্তিরও পোহায় না। তবু সে মুখটি বুজে চুপ করে সয়ে রইলো।

অনিলের খবর পাবার জন্য সুষমা যখন হাজার বকুনী খেয়েও যথা নিয়মে নির্দ্দিষ্ট সময়ে রোজ জানালার কাছে গিয়ে ডাকওয়ালার পথ চেয়ে দাঁড়াত, তখন অনিলের মা—তার জ্বলন্ত চোখ দুটোর উপরে আগে থাকতে হরকরার হাত থেকে সেই চিঠি নিয়ে খর খর করে চলে যেতেন, অথচ চিঠি দেখানো দূরের কথা—তার শরীরের সুস্থতার সম্বন্ধে একটা কথাও কখনো ভুলেও মুখ ফুটে জানাবার আবশ্যক বোধ করতেন না। সুষমা নীরবে একটা বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দুফোঁটা চোখের জল লুকিয়ে মুছতে মুছতে নিত্যকার গৃহ-কর্ম্মে নিযুক্ত হ'ত। এমনি করে অতিকষ্টে—মর্ম্মান্তিক দুঃখের বোঝা মাথায় বয়ে বেচারা কেবল ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছিল।

কিন্তু সেই দুঃখের বোঝায় মাথা ভেঙ্গে পড়লো তখন, যখন মাস দুই আড়াই পরে একদিন সেই ভবিষ্যৎ ক্রূর রাক্ষসের মূর্ত্তিতে গিলে ফেলবার জন্য একেবারে বিকট হাঁ মেলে সামনে এসে দাঁড়ালো।

বিকালবেলা সুষমা স্কুল থেকে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই গিন্নী ডেকে একেবারে সোজাসুজি বল্লেন—

"শোন বাছা, সে কথাটা এতদিন একজামিনের ফল বেরোবার অপেক্ষায়—বলি বলি করেও বলা হয়নি, আজ তা তোমাকে বলার আবশ্যক হয়েছে। অনিল পাশ হয়ে বেরিয়েছে, এই হপ্তার শেষ নাগাদ পুরী থেকে চলে আসছে। এখন আর তোমার এ বাড়ীতে থাকা চলবে না।"

সুষমার পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা যেন হঠাৎ সরে গেল, সে ধুপ করে পড়ে যেন সোঁ সোঁ করে নীচের দিকে নেমে চল্লো—আঁকড়ে ধরবার মত একগাছা কুটোও চোখে পড়লো না। গিন্নী আরো রূক্ষভাবে বল্লেন—

"অনাথা পথের কাঙাল দেখে দয়া করে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলুম, তা এমনি বেইমান তুমি যে, যে ডালে বসে সেই ডালই কাটতে চাও? আস্পর্দ্ধা তো কম নয়—ঘুটে কুড়ুনীর বেটীর রাজরাণীর হবার সখ? বাছাকে আমার যাদুকরে ভুলিয়ে নেবার চেষ্টা? না বাপু, তুমি পথ দেখ, কর্ত্তা মরবার আগেই ব্রহ্মবান্ধব বাবুর মেয়ের সঙ্গে ওর বের কথা ঠিক করে গেছেন—বিজলীলতাও বি, এ, পাশ করেছে এবার। তোমাকে ঘরে রেখে ওদের অমন দুর্ল্লভ মিলনের পথে পাঁচীল তুলে দেবার ইচ্ছা নেই। তুমি যেমন, তেমনি শাস্তি হওয়াই উচিত, তবু আমি তোমার ওপর যথেষ্ট দয়া করলুম।"

বলেই ঝন্ ঝন্ করে দশটা টাকা সামনে ফেলে দিয়েই অন্ধকার মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে থর্ থর্ করে চলে গেলেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে, টাকাগুলো তেমনি পড়ে রয়েছে দেখে ক্ষেপে উঠে চেঁচিয়ে বাড়ী ফাটিয়ে দিলেন।

"সুষি!—সুষি!"—

কিন্তু সুষমার আর কোথাও সাড়া পাওয়া গেল না। সেই রাত্তিরেই তিনি স্বামীর বন্ধু ব্রহ্মবান্ধব বাবুকে খুব বড় একখানা চিঠি লিখতে বসলেন।

পাঁচ দিন পরে অনিল ইন্‌জিনীয়ার হয়ে যখন পুরী বেড়িয়ে ঘরে ফিরে এলো, তখন যতই সুষমার অভ্যর্থনার জন্য ঘন ঘন দোরের দিকে চাইতে লাগলো, ততই যেন একটা অজ্ঞাত হতাশে বুকের ভিতরটা কেবলই হু-হু করে উঠতে লাগলো। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের ভিতরেও যখন তার সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না—তখন আর থাকতে না পেরে একটু ঢোক গিলে, বার কতক আমৃতা আমৃতা করে, খপ করে জিজ্ঞাসা করে ফেল্লে—

"হ্যাঁ মা, সুষি কি এখনো স্কুল থেকে ফেরে নি? এখনো করছে কি সেখানে?"

মা একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়ে, চোখ দুটো মস্ত মস্ত করে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে জবাব দিলেন—

"ওমা শুনিস্‌নি বুঝি তুই, সে কি আর এখানে আছে? আজ একমাসের ওপর হল—ভারি একটা কলঙ্ক নিয়ে টেক্‌নিকেল ইস্কুলের একটা বদমাইস ছোড়ার সঙ্গে রাতারাতি বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছে? ও সব ছোটলোকের মেয়ে—রীতি-চরিত্র মন্দ—ভদ্দর লোকের বাড়ীতে থাকিতে পারবে কেন? আমার বরাবরই ধরণ ধারণ দেখে সন্দেহ ছিল—কেবল দুঃখী অনাথ বলে আদর করে রেখেছিলুম বই তো নয়? পাড়াময় একেবারে ঢি ঢি—কাণ পাতা যায় না। শুন্‌ছিস্‌ কি—"

কিন্তু অনিল শুনতে পাচ্ছিলো কিনা বলা বড় শক্ত। তার ভাব দেখে মা অসম্পূর্ণ কথাটা আর শেষ না করে একবার মুখের পানে চেয়েই ঠোঁটের আড়ে একটু হেসে ঘর থকে বেরিয়ে গেলেন।

অনিল যেমন বসে ছিল—তেমনি রইলো। খোলা জানালায়—অনাহুত পথিকের মত—উদাস বাতাস এসে হু হু করে নিশ্বাস ফেলতে লাগলো। শরতের সান্ধ্য-আকাশে রঙিন্‌ মেঘগুলো মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে ভেসে যেতে লাগলো। মাঠের ধারের শিরীষ গাছের উপর থেকে একটা ঘুঘু করুণ স্বরে ডেকে হায়রাণ হয়ে পড়লো। কাণের কাছে ঘড়িটা ঠংঠং করে সাতটা বাজিয়ে দিলে; কিন্তু কিছুতেই তাকে চঞ্চল করতে পারলে না। মা একটা আলো জেলে নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন।

আলোটা চোখে পড়তেই অনিল চম্‌কে উঠলো, ব্যাকুল হয়ে তাড়াতাড়ি বল্লে—"নিয়ে যাও, নিয়ে যাও।"

"সে কিরে, অন্ধকারে থাক্‌বি নাকি?"

"হুঃ, আলো এনোনা—মাথা ধরেছে।"

বলেই ডান হাতের চেটোয় চোখ ঢেকে কপাল টিপে ধর্‌লে। দেখে মা মিষ্টস্বরে একটু অনুযোগ দিয়ে বল্লেন—"কলকাতার ব্রহ্মবান্ধববাবু তাঁর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কাল থেকে এসে রয়েছেন যে—জানিস নি? তুই ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিস্‌—আমাদের ফারমের ভার দেবেন যে তোর উপর, বলে

মুখ ফিরিয়ে একটু চেঁচিয়ে ডাকলেন—"ওমা বিজু, গোলাপজলের বোতলটা নিয়ে এস তো মা ?"

মায়ের কথা শেষ হতে না হতে যখন একটি খুব সাজা-গোজা ষোল বছরের যুবতী একটা ছোট কালো বোতল হাতে করে, হাসিতে বিদ্যুৎ খেলিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন অনিল একেবারে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে লাফিয়ে উঠেই থতমত খেয়ে বাধবাধ স্বরে বলে ফেল্লে—এ্যা—সুষি—সু—ষি—

মা একটু হেসে খপ্ করে বাধা দিয়ে বল্লেন—"হ্যাঁ, ঠিক সেই পোড়ার মুখীর মতই হুবহু চেহারা বটে! তা মা বিজু, তোমার বাবা এখনো বেড়িয়ে ফেরেন নি বুঝি? তা তোমরা বোস—আমি খাবার-দাবারের জোগাড় করিগে ততক্ষণ।"

বলেই আলোটা টেবিলের উপরে রেখে চোখের পলকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

"আপনাকে ছেলেবেলায় বার দুই দেখেছিলুম মনে হয়।"

বলেই বিজলীলতা আগেই হাত বাড়িয়ে অনিলের ডান হাতখানা ধরে সেক্‌হাণ্ড করে যেন কত কালের আলাপী বন্ধুর মত এমন হাসতে হাসতে পাশে বসে পড়লো যে অনিল একেবারে হতভম্বের মত হয়ে গিয়ে কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে মুখের পানে চেয়ে রইলো, মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুলো না।

৬

আট বছর পরের কথা।

অনিলের বিয়ের পর বছরেই যখন প্রথম সন্তান—'শোভা' জন্মালো, তার মাসখানেক পরেই অনিলের মা এ জীবনের বসতপাট তুলে চলে গেলেন—তখন বিজলীই হল গিন্নী। তারপর এই সাতবছর ধরে আরো পাঁচ ছটি সন্তান জন্মেও যখন প্রথমকারটি ছাড়া আর একটিও টিকলো না, তখন তারও শরীর ভেঙ্গে গেছে। এর অন্য কারণও যে একটু না ছিল—এমন বলা যায় না।

অনিলের মা এবং ব্রহ্মবান্ধব বাবু উপযুক্ত মুহূর্ত্তে খুব বুদ্ধি খাটিয়ে কৌশল করেই বিজলীর সঙ্গে তার বিয়ে ঘটিয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু অনিল দাম্পত্যজীবনে মোটেই সুখী হতে পারে নি। খুব ভারি শোক-দুখের আঘাত মদ খেয়ে ভুলতে গিয়ে লোকে যেমন জ্বালা আরো বাড়িয়ে তোলে, তেমন সুষমাকে ভোলবার জন্য বিজলীর পানে চেয়ে সে সব কথা আরো বেশী মনে পড়তো—

এমনি গুঞ্জনের সাদৃশ্য ? তখন অতীত স্মৃতির মত্ততায় ডুবে মাতালের মতই বিভোর হয়ে সে বিজলীর অনুগামী হত। বিজলীও যে না বুঝতো—তা নয়, তাতেই তার অসুখের সূত্রপাত। কেবলই মনে হত—এ যেন তার নিজের নয়, কোন ভাগ্যবতী পরের জিনিস চুপি চুপি চুরি করে দুদিনের জন্য লুকিয়ে ভোগ করছে—শেষে একদিন ধরা পড়ে শুধুই যে সুদে আসলে ফেরত দিতে হবে এমন নয়, অধিকন্তু শাস্তিও তাকে ভোগ করতে হবে।

ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে মিলে অনিলের বাপ কলকাতায় যে কারবার করে গিয়েছিলেন—তার প্রধান পরিচালক এখন অনিল, পয়সাকড়িও করেছে যথেষ্ট, কিন্তু সংসারে ঢোক্‌বার মুহূর্ত্তেই যে বিষের বীজটি তার হৃদয়ক্ষেত্রে পড়েছিলো—তা এখন ফলে ফুলে সেজে সে জায়গাটা একেবারে জুড়ে বসেছে। আজ পাঁচদিন ধরে আফিস কামাই করে সে ঘরে বসে আছে, তা স্ত্রীর ব্যায়রামের ভাবনায় আকুল হয়ে যত না হোক—লোক নিন্দার ভয়েই বেশী।

সন্ধ্যের সময় বেড়িয়ে এসে অনিল বৈঠকখানায় সবে চা টুকু নিয়ে বসেছে... অমনি সাতবছরের শোভা ছুটে এসে ডাক্‌ল

"শীগগির এস বাবা—মা কেমন কচ্ছে।"

অনিল এক নিশ্বাসে গরম চা টুকু গিলে ফেলেই মুখ মুছতে মুছতে ছুটে গিয়ে দেখলে যে বিজলীর অবস্থা সব দিনের চেয়ে খারাপ, মুখে একটা আশঙ্কা জনক পাণ্ডুর বর্ণ ছেয়ে গেছে। শিয়রে বসে আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অসীম স্নেহে জিজ্ঞাসা করলে—"এখন কি বড় কষ্ট হচ্ছে ?"

রোগী একটু চমকে উঠে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে ক্ষীণ হাস্যে জবাব দিল—এমন স্বর তোমার কখনো শুনিনি কেন ? তাহলে—"

বলেই হঠাৎ থেমে গিয়ে একটি ছোট নিশ্বাস ফেলে, ঢোক গিলে বল্লে—"আর মিছে চেষ্টা, ডাক পড়েছে—শোভাকে দেখো।"

অনিলের বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠলো, মনে হল তারই অবজ্ঞার ফলে বুঝি এই নারীহত্যা ঘট্‌লো। তাড়াতাড়ি চঞ্চল হয়ে বলে উঠলো—

"একটুতেই এমন ভয় পাচ্ছ কেন ? সেদিন ডাক্তার সাহেবও তো খুবই আশ্বাস দিয়ে গেছেন, আর সুরেনও তো তোমার সামনেই বলেছে শুনেছ ?"

আবার একটু ম্লান হাসি হেসে বিজলী আস্তে আস্তে বল্লে—"ডাক্তার রোগ সারাতে পারে, আয়ু দেবে কেমন করে ? তুমি ঈশ্বরের শপথ করে বল—শোভাকে অবহেলা করবে না ?"

বলতে বলতে হঠাৎ একটা বিষম যাতনায় মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠলো। দেখেই অনিল তাড়াতাড়ি পরিচারিকাকে ডেকে দিয়ে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

৭

এই পরিচারিকাটি বিজলীর আপনার লোক; সম্পর্কে বোন হয়। তিন কুলে কেউ ছিল না বলে শেষ দশায় এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। এর ওপর সংসার এবং মেয়ের সব ভার চাপিয়ে দিয়ে বিজলী যেমন নিশ্চিন্ত থাকতে পারতো এমন স্বামীর ওপর দিয়ে পারতো না। অনিলের ডাকে রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলে—

"কিরে বিজু, ফিটটা আবার হয়েছে নাকি ?"

"না দিদি, তুমি করছো কি ?"

"তোর জন্যে স্যুপ টুকু তৈরী করছিলুম।"

"আর স্যুপ !"

বলেই একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লে—"ইন্দুদিদি, যত শীগগির পার কাজ চুকিয়ে এসে একটু আমার কাছে বোস, আজ কেমন আমার ভয় ভয় কচ্ছে।"

"ভয় কি বোন, ভোরেই ডাক্তার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে আসবার জন্যে বাবু তোমাদের বন্ধু সুরেন ডাক্তারকে টেলিগ্রাফ করতে গেছেন।"

"তা হোক—যাও কাজ সেরে নেও গে।"

বলে বিজলী শোভাকে বুকের ভিতর টেনে নিলে।

"দেরী হবেনা—স্যুপটুকু নিয়েই আসছি—হয়ে এলো"

বলে ইন্দু বেরিয়ে গেল। বিজলী মেয়েকে বুকের ভিতর চেপে ধরে চুপ করে ছল ছল চোখে মুখের পানে চেয়ে রইলো। দেখে শোভা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে—"অমন করছো কেন মা ?"

আস্তে আস্তে মেয়ের মুখখানি মুখের কাছে টেনে নিয়ে চুমো খেয়ে বিজলী বল্লে—"আমি চল্লুম রে শোভা !"

"কোথায় মা ?"

"সে অনেক দূর রে—অনেক পথ—"

"কেন মা ?"

"সময় হয়েছে যে—আর কি না গেলে হয় ?"

"আবার কখন আস্‌বে !"

"আস্‌বো !"

বলেই একটু থেমে বিজলী হঠাৎ দৃঢ় ভাবে বল্লে।"

"হ্যাঁ মা, আসব বই কি, তোকে কি ফেলে গে চুপ করে থাকতে পারি ? আবার দেখতে আসবো।"

সেই সময় ইন্দু দোর ঠেলে ঘরে এসে বল্লে "নেও বোন, এই গরম সুপ টুকু খেয়ে ফেল—এক ড্রাম ব্রাণ্ডী মিশিয়ে দিছি।"

বলে, পাত্রটি যেমন হাতে দিলে, অমনি বিজলী সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে একটু হেসে বল্লে—"আর কেন জ্বালাও দিদি, হয়ে এলো যে। ইন্দু দিদি কাছে এস—ওকি, এ সময় চোখের জল ফেলোনা- মস্ত ভার তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে যাচ্ছি, নইলে আর যে আমার কেউ নেই--"

বিজলীর চোখ ছল ছল করে উঠ্‌লো দেখে ইন্দু তাড়াতাড়ি কাছে বসে মুছিয়ে দিতে দিতে বল্লে—

"ছিঃ বোন, হতাশ হও কেন, আবার সেরে উঠবে।"

"কি সুখে ?"

বলেই বিজলী একটি লম্বা নিশ্বাস ফেলে, দৃঢ় স্বরে বল্লে -"না দিদি বোঝনা আমার যাওয়াই মঙ্গল। শোভাকে তোমায় দিয়ে গেলুম, দেখো—"

কথা বেধে গেল, এবার হু হু করে চোখের জল উথ্‌লে উঠে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। দেখে শোভা আকুল হয়ে উঠ্‌লো।

"ওমা—না মা, যেও না—"

"আবার আসবো রে পাগল—কান্না কিসের—ছিঃ !"

বলে বিজলী আপনিই চোখ মুছে মেয়েকে চুমো খেয়ে ইন্দুর হাতে দিয়ে বল্লে—

"ধর দিদি, বল—এ ভার নিলে ?"

"নিলুম বোন,—"

বলেই ইন্দুর গলা বেধে গেল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছে শোভাকে বুকে নিয়ে চুমো খেলে। দেখে, বিজলী একটি ছোট আরামের নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"আজ নিশ্চিন্তি হলুম।"

৯

কিন্তু ইন্দু এই নার্স্‌টিকে দেখেই একেবারে নির্ব্বাক হয়ে এক দৃষ্টে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইলো—ঘুমিয়ে না জেগে, তাই ঠাওর করতে গোল বেধে গেল— দেখে নার্স্‌ একটু মধুর হেসে ততোধিক মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—

"আপনি ও রকম অবাক হয়ে এক দৃষ্টে আমার পানে চেয়ে দেখ্‌ছেন কি ?"

ইন্দু আরো দশগুণ বেশী আশ্চর্য্য হয়ে চম্‌কে উঠে থতমত খেয়ে আম্‌তা আম্‌তা করে জবাব দিলে।—

"আপ—না—র—না—ম ?"

"মিস্‌ মাধুরীময়ী মিত্তির, কেন বলুন দেখি ? আপনাকে দেখে বোধ হচ্ছে যেন একটা আশ্চর্য্য রহস্যে অভিভূত হয়ে পড়েছেন।"

"আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য—অসম্ভব রহস্য !"

উত্তেজিত ভাবে বলেই ইন্দু যেন আপনা আপনি বলে উঠ্‌লো—

"ঠিক সে—চেহারা, ধাঁজ, বয়েস, চাউনী রকম সকম, গলার স্বরটুকু অব্‌ধি—ঠিক—ঠিক্‌—হু বহু একেবারে—কি আশ্চর্য্য !"

"কার কথা বল্‌ছেন ?"

"গিন্নীর—এই বাড়ীর মৃত কর্ত্রীর। যার মেয়ের ভার নিতে আপনি এসেছেন—মাস্‌ দেড়েকের ওপর মারা গেছে, কিন্তু আপনাকে দেখলে কেউ তা বিশ্বাস করবে না।

"বলেন কি ?"

বলে, আমোদের হাসি হেসে মাধুরী মধুর স্বরে বল্লে—"ভগবানের রাজ্যে এ রকম সাদৃশ্য দু একটা বিরল নয় ?"

"না হতে পারে—কিন্তু একেবারে এমন হু-বহু—কেউ কখনো হঠাৎ বিশ্বাস করতে পারবে না।"

মাধুরী আবার হেসে জবাব করলে—"না করে, ক্ষতিবৃদ্ধি আমাদের কারুরই নেই। চলুন এখন মেয়েটিকে দেখি গে।"

কিন্তু তার আমোদের হাসি হঠাৎ ঠোঁটেই মিলিয়ে গেল, যখন দোতলায় উঠ্‌তে উঠ্‌তে সিঁড়ির পাশের পেণ্ট্‌ করা দে'য়ালে চওড়া দামী ফ্রেমে বাঁধা খান দুই বড় বড় অয়েল পেন্টিং এর ওপর নজর পড়লো, চম্‌কে উঠেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে ছবির দিকে চেয়ে রইলো।

"ওকি, থম্‌কে দাঁড়ালেন যে ?" বলে ইন্দু মুখের পানে চাইলে।

"ও ছবি দু'খানি কার ?"

এ বাড়ীর যিনি এখন মালিক—তাঁর মৃত পত্নীর এখানি—আর ওখানি তাঁর মৃত মায়ের।"

"ঠিক ওই রকম চেহারা আমি এ দেশে আর এক জনের দেখেছি।"

এবার ইন্দুর হাসবার পালা। মুচ্‌কে হেসে বল্লে—

"আমায় অবাক হতে দেখে হাস্‌ছিলেন, এখন দেখুন—সাদৃশ্য দেখে আপনিই অবাক হয়েছেন ?"

কিন্তু মাধুরী কিছুতেই আর হাসি টেনে আনতে পারলে না, কেমন সন্দেহের ভাবে প্রশ্ন করলে—

"এই প্রকাণ্ড বাড়ী কি এঁদের নিজের—এখানে বরাবরই আছেন ?"

"হাঁ। নিজেরই বাড়ী—বরাবরইতো দেখে আস্‌ছি।"

মাধুরী আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে ইন্দুর সঙ্গে উপরে উঠে গেল। বারাণ্ডা থেকে ঘরে ঢুকে উপর্য্যুপরি দুটি ঘরের ভিতর দিয়ে যখন রোগীর ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো—তখন তার নিজের চোখে যেন হঠাৎ ছানি পড়ে আস্‌ছে বোধ হল। ঘরের বদ্ধ জানালা দরজাগুলোর ওপরে এমন মোটা সবুজ কাপড়ের পরদা টানা যে গাঢ় সবুজ রং‌এর ফানুসে ঢাকা অত্যন্ত স্নিগ্ধ ছোট একটি মিট্‌মিটে সেজের আলোতে চোখে কেবল অন্ধকার বই আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

"কই, মেয়ে কোথায় ?"

"ওই যে ওখানে পালং‌এ শুয়ে।"

বলে ইন্দু কাছে যেতে না যেতে শোভা তাড়াতাড়ি একেবারে ধড়ফড় করে উঠে বসে ব্যগ্র হয়ে বল্লে—"এই যে আমি, এদ্দিন পরে বুঝি ফিরে এলে মা ?"

"এই যে মা আসছেন," বলে ইন্দু কোলে করে যেমন তুলে নিতে যাবে শোভা ঝাঁকা দিয়ে অস্থির হয়ে বল্লে—

"নানা, তুমি যাও মাসিমা, এই যে মার কথা শুনতে পেলুম—ওমা—মা—মাগো—

বলেই আকুল হয়ে হাত বাড়ালে। ইন্দু আর চোখের জল চেপে রাখতে পারলে না, মাধুরীর গা টিপে কাণে কাণে বল্লে—"ওই শোন বোন, গলা শুনে শুধুই আমিই না—"

"কই মা, এসোনা আবার পালিয়ে যাবে বুঝি ?"

মাধুরী আর থাক্‌তে পারলে না। ততক্ষণে চোখ দুটো অন্ধকারে অনেক দোরস্ত হয়ে এসেছিলো তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বল্লে—"এই যে মা আমি।"

"তবে নাকি তুমি আস্‌বে না মা?"

বলে, শোভা ছটফট্ করতে করতে তাড়াতাড়ি চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেল্‌তে গেল।

"খুল না—খুল না বল্‌তে বল্‌তে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বাধা দিয়ে মাধুরী তাড়াতাড়ি দুহাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেলে। শোভা একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে অভিমানের সুরে ফুলে ফুলে বল্লে—

"তোমায় কতদিন দেখিনি মা—আমি যে আর থাকতে পারছিনি, ও চুলোর ছাই খুলে দেওনা মা!"

"না মা, অত অস্থির হয় কি, ডাক্তার এলেই খুলে দিতে বলবো'খন।"

"হুঁঃ—তোমার মন কেমন করেনা কিনা, তাহলে এক্ষুনি খুলে দিতে?"

মাধুরী শোভাকে বুকে চেপে ধরে আবার চুমো খেয়ে বল্ল—"এই যে তুমি আমার বুকে রয়েছে—খুলে দেব'খন মা—আজ না—কাল।"

এমনি করে মুহূর্ত্তের ভিতরে এই একরত্তি বাচ্ছাটা যে কেমন করে তার বুকের মাঝখানে অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব মধুর মাতৃস্নেহের আস্বাদ জানিয়ে দিয়ে একেবারে বেঁধে ফেল্লে তা মাধুরী জানতেই পারলে না।

তারপরে শোভাকে ঘুম পাড়িয়ে অনেকক্ষণ পরে যখন সে খাওয়া দাওয়া সেরে নেবার জন্য আবার চুপি চুপি বেরিয়ে এলো, তখন সব শেষের ঘরের ভিতর এসে, উজ্জ্বল আলোর সামনের দেয়ালে আর একখানি বড় ছবির পানে চেয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলো।

ইন্দু দোরের সামনে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো, মাধুরীর ভাব দেখে আশ্চর্য্য হয়ে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে—"আবার কি?"

মাধুরী জবাব না দিয়ে নীরবে ছবিখানার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে। ইন্দু আবার হেসে বলে উঠলো—"আজ আমাদের বাড়ীতে কিসের হাওয়া বইছে! ও যে বাড়ীর কর্ত্তার ছবি, অনিলকুমার বোস—সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ওকি—ও—হোঁচট্ খেলে বুঝি? দেখি দেখি লাগলোনাতো?

বলেই তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে এসে সামনে দাঁড়ালো। তখন মাধুরী

টেবিলের ওপর ভর রেখে কাঁপছে—মুখখানায় একটা অস্বাভাবিক রকম উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠেছে।

"না—না—আঁ—আঁ—লাগে—নি ?

"তবে ?"

"না—না—ও—কিছু—কিছু না।"

"আস্তে আস্তে দেখে শুনে সাবধানে এস বোন, নতুন জায়গা—তায় রাত্তির কাল—অন্ধকার।"

"ওমা—মা—কোথায় গেলে মা—মাগো—"

বলে শোভা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো। মাধুরী তাড়াতাড়ি বল্লে—"না দিদি, মেয়ে উঠেছে, তোমরা খেয়ে দেয়ে নেওগে—আমি আজ আর খাবনা ক্ষিদেও নেই।"

"সে কি ?"

কিন্তু তখন ঝড়ের মত মাধুরী শোভার ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

(১১)

শোভাকে আর ভুলিয়ে রাখা যায় না—চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলে মাকে দেখবার জন্যে একেবারে অস্থির হয়ে উঠলো, তখন মাধুরীর অনুরোধে স্থরেন আবার একদিন কলকাতা থেকে যখন সাহেব ডাক্তার এনে দেখালে, তখন তিনি পরীক্ষা করে আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—

"আর কোন ভয় নেই—বেশ সেরে গেছে, এ দেখছি—মন অদ্ভুত কাষ করেছে, এখন ব্যাণ্ডেজ খুলে রাখা যেতে পারে। কিন্তু খালি চোখে একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে ক্রমে ঘর থেকে বার করতে হবে।"

বলে, ব্যাণ্ডেজ খুলে দে যেদিন চলে গেলেন সেদিন শোভার আমোদ দেখে কে ? মায়ের পানে একশোবার চেয়ে চেয়ে, গলা জড়িয়ে, চুমো খেয়ে পাগল করে তুল্লে। কিন্তু মাধুরীর মুখখানা হঠাৎ যেন সাদা হয়ে গেল। এক অবসরে নিরালায়, অনিলের ছবিখানার পানে চেয়ে চেয়ে, মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলো। মেয়ে সেরে গেছে, তারও কাজ ফুরিয়েছে, এখন বিদেয় হতে হবে ?

কিন্তু ইন্দুর কাছ থেকে সকল কথা শুনে স্থরেন বল্লে—"তুমি আর কিছুকাল থাকো মাধুরি, অন্ততঃ ওর বাপ ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর—নইলে মেয়ের চোখ আবার কেঁদে কেঁদে হয়তো রিল্যাপ্স করতে পারে। শুনেছ তো ডাক্তার সাহেবের মুখে—কেবল মনের আমোদে না ভেবে তোমায় দেখবার

প্রবল আকাঙ্ক্ষায় এ যাত্রা সেরে উঠেছে। এখন আর তোমার এমন কায না থাকলেও পূরো ফি পাবে—তাতে আর ক্ষতি কি ?"

শুনে মাধুরীর যেমন আনন্দ আর উৎসাহ ফিরে এলো, তেমনি তা আবার একশোগুণে নিবে গেল—মাসখানেক পরে সেদিন বিকেল বেলায় অনিলের গাড়ী এসে দোর গোড়ায় দাঁড়ালো।

"বাবা এয়েছে—বাবা এয়েছে," বলে শোভা ওপরের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে নেমে গেল। মাধুরীর বুকের ভেতর অত্যন্ত জোরে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগলো, মুখখানা একেবারে মড়ার মত হয়ে গেল—চোখের জ্যোতি ম্লান হয়ে এলো। অস্থির ভাবে নিজের জিনিষ পত্তর গুছিয়ে নিয়ে বিদেয় হবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো।

এদিকে মেয়ের মুখে ক্রমাগত "মা এয়েছে—মা এয়েছে" শুনে অনিল যত না আশ্চর্য্য হয়েছিলো—তার চেয়ে হাজার গুণে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ইন্দুর মুখে সব কথা আগাগোড়া শুনে বুকের ভেতর কেমন করতে লাগলো, মনে মনে ঝড়ের মত দেখবার আগ্রহ ছুটে চল্লেও, পা দুটো যেন হঠাৎ অত্যন্ত অসাড় হয়ে পড়লো, পুতুলের মত স্তব্ধ হয়ে ইন্দুর মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কিন্তু চুম্বুকে যেমন লোহা টানে, তেমনি শোভা যখন একশোবার "এসোনা বাবা দেখবে" বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে চল্লো—তখন সে লোহার মতই নিতান্ত জড় হয়ে কেবল মেয়ের ইচ্ছা-শক্তিতেই আকর্ষিত হয়ে চল্লো।

শেষে ওপরের ঘরের দোর গোড়ায় এসে "ওই দ্যাখনা—মা—মা—"

বল্‌তে বল্‌তে শোভা যখন বাপের হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে মাধুরীর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো—তখন ঘরে-বাইরে দু'জনেই পরস্পরের দিকে চেয়ে নির্নিমেষ চোখে একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে।

১২

শোভা মাঝে না থাক্‌লে কি হ'ত বলা যায় না। কিন্তু এই একটুখানি মেয়ে যে কি যাদুমন্ত্রের গুণে দু'জনকার সে চটকা ভাঙ্গিয়ে কথার অবসর জুগিয়ে দিলে—তা অদ্ভুত!

"এসনা বাবা—অমন করে বাইরে দাঁড়িয়ে ভূত দেখছো নাকি ?"

বলেই, চোখের পলকে ছুটে গিয়ে কলের মত বাবাকে টেনে মার সাম্‌নে এনেই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌লো!

"ওমা ওকি—সত্যি ভূত বুঝি ?—মা—মা—এই ছাখো।"

বলেই, বিদ্যুতের মত চকিতে ফিরেই মায়ের বুকের ওপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে—দুহাতে গলা জড়িয়ে অস্থির করে তুল্লে।

তখন—

"আমার জীবনের সব গর্ব্ব ভেঙ্গে দিলিরে দস্যি!"

বলেই, মাধুরী তাকে বুকে চেপে ধরে ছলছল চোখে মধুর হেসে মুখে চুমো খেলে।

কিন্তু শোভা তখনি ধড়ফড় করে নেমে পড়ে আবার বাপের বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তখন অনিলও একটু না হেসে থাকতে পারলে না, তারপর মেয়ের মুখে চুমো খেয়ে ছলছল চোখে মাধুরীর পানে ফিরে নিতান্ত অপরাধীর মত ভিক্ষুকের স্বরে বল্লে—

"চিনেছি—চিনেছি তোমায়, করুণাময়ী তুমি, যদি নিজের গৌরবে ফিরে এসে আমার গৌরব পদাহত করে ভেঙ্গে দিলে সুষি—তবে অপরাধও ভুলে যেতে ভুলনা। ওই ছাখো তোমাকেই অবিচ্ছিন্ন সাদৃশ্যের ভেতর দিয়ে এত-কাল তোমারই পূজো করে আসছি।

বলে দেয়ালে টাঙ্গানো বিজলীলতার ছবিখানা দেখিয়ে দিলে।

মাধুরীর সর্ব্বাঙ্গ একবার থরথর করে কেঁপে উঠলো, মুহূর্ত্তের ভিতর মুখে একশো রকমের ভাব—বায়স্কোপের ছবির মত—ওলট পালট হয়ে খেলে গেল। সংজ্ঞাহারার মত ধপ করে পাশের সোফাখানার ওপর বসে পড়লো।

অনিল চকিতে হাত ধরে তুলতে গিয়েই হঠাৎ মুখের পানে চেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে, আবেগভরে বলে উঠ্‌লো—

"যদি ফিরে এসেছ তবে আর ছেড়ে যেওনা—সকল ভুলে সব মার্জ্জনা করে—ঘরের লক্ষ্মী আমার—ঘর আলো করে থাকো। সুষি—সুষি"

"ওমা, সুষি কে গো—মা মা—না মা, বলনা ?"

বলেই শোভা আবার মায়ের বুকের ওপর গিয়ে পড়লো। তখন সুষমা উচ্ছ্বসিত আবেগে তাকে কোলে নিয়ে চুমো খেতে খেতে হেসে বল্লে—

"হ্যাঁমা, আমি মা! একরত্তি বুকের ভেতর নিখিলের শক্তি নিয়ে কে তুই মহাশক্তি আজ আমার জীবন-মরণের গ্রন্থি বেঁধে দিলি মা ?"

বলে আবার চুমো খেলে।

বিপ্লব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সেদিন কোথাও ডাক ছিল না; সুতরাং জ্যৈষ্ঠের দীর্ঘ অপরাহ্নটা পরেশের নিকট ক্রমেই বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। কাগজ পড়িয়া, বই ঘাঁটিয়া অপরাহ্নের দীর্ঘতাকে যতই সংক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ততই তাহা যেন অসহ্য দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছিল। ঘড়ির বড় কাঁটাটা যেন নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসন্নভাবে এমনই ধীরে ধীরে চলিতেছিল যে, তাহাতে পরেশ কাঁটাটার উপর না রাগিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, ঘড়ীটা বুঝি অচল হইয়া গিয়াছে; কিন্তু টিক্ টিক্ শব্দে আপনার সচলত্ব প্রমাণ করিয়াও ঘড়ীটা যে কেন এত আস্তে আস্তে চলিতেছিল, পরেশ তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না।

অস্থিবিদ্যা ভেষজতত্ত্ব তখন ঠিক অতি তিক্ত ভেষজের মতই বোধ হইতেছিল। অগত্যা পরেশ আলমারী খুলিয়া একখানা ইংরাজী উপন্যাস বাহির করিল। একে তো উপন্যাসে তাহার কোনদিনই রুচি ছিল না, তাহার উপর উপন্যাসখানার প্রথমেই যখন প্রণয়-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল, তখন সে পুস্তকখানিকে আলমারির যথাস্থানে স্থাপন করিয়া কোন্ বহিখানা প্রীতিকর হইতে পারে, আলমারীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাই অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

সহসা আলমারীর কাঁচের উপর কাহার ছায়া পড়িল। পরেশ চকিতভাবে ফিরিয়া চাহিল; দেখিল, দরজায় শৈলজা। নিদাঘের প্রচণ্ড মধ্যাহ্নে সহসা জলদোদর দর্শনে ক্ষুদ্র পক্ষী চাতকের মনে কতখানি আনন্দ হয় জানি না, কিন্তু শৈলকে দেখিয়া পরেশের মনে যে খুব বেশী পরিমাণেই আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা তাহার মুখের ভাবেই সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইল। তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া শৈল মৃদু হাসিয়া নমস্কার করিলে পরেশও সহাস্যে প্রতিনমস্কার করিল। তারপর আলমারী বন্ধ করিয়া সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা এসেছেন নাকি?"

শৈল বলিল, "হাঁ, তিনি এসেছিলেন, কিন্তু চলে গিয়েছেন।"

"কোথায় গেলেন ?"

"গোপীনাথের মন্দিরে। আজ একাদশী কিনা, সেখানে পুরাণ পাঠ হবে।"

"তা হ'লে তোমরা অনেকক্ষণ এসেছ ?"

"খুব বেশীক্ষণ নয়, তবে আধঘণ্টা হ'তে পারে।"

"তাই বা কম কি" বলিয়া পরেশ একটু হাসিয়া এবং সামনের চেয়ারখানা ঝাড়িয়া দিয়া নিজে আসন গ্রহণ করিল। শৈল ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল, "আমি মনে করেছিলাম আপনি ঘরে নাই। তার পর পিসীমার মুখে শুনিলাম যে, আজ কোথাও যান নি।"

শৈল বসিল না, সে ঘরের এদিকে সে দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং ঘরে যে সকল জিনিব বিশৃঙ্খলা হইয়াছিল, সেই জিনিষগুলিকে সুশৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া রাখিতে লাগিল। কাপড় জামা, তোয়ালে প্রভৃতি ভাঁজ করিয়া কাঠের আলনার উপর রাখিল; ট্রাঙ্কের উপর ধূলা পড়িয়াছিল, ঝাড়ন দিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া দিল; ছবিগুলার পাশে মাকড়সার জাল হইয়াছিল, একখানা চৌকীর উপর উঠিয়া সেগুলা ঝাড়িয়া দিল। গৃহসংস্কারে তাহার এই ব্যস্ততা দেখিয়া পরেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "ও সব কতক্ষণের জন্য ?"

শৈল মৃদু তিরস্কারের স্বরে উত্তর করিল, "যতক্ষণের জন্যই হোক, আপনি একজন বিলাতফেরত ডাক্তার, আপনাকে এ রকম নোংরা হ'য়ে থাকতে দেখলে লোকে বলবে কি ? দেখুন দেখি, কুঁজোটার পাশে কত জঞ্জাল ধূলো জমে আছে ?"

পরেশ বলিল, "ওদের স্বহস্তে স্থানচ্যুত করা আমি নিতান্ত নিষ্ঠুরতা মনে করি।"

শৈল হাসিয়া বলিল, "ডাক্তারদের একটা কোমলতা আশ্চর্য্য বটে। তবে আপনি স্বহস্তে না পারেন, চাকরকে বললে সে তো ওগুলা পরিষ্কার ক'রে দিতে পারে।"

পরেশ বলিল, "বললে তো ? আমার ওদিকে কোনদিন লক্ষ্যই হয় নি।"

শৈল বলিল, "লক্ষ্য যে হয় নি তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে, নইলে আপনি

যে ঘরের ভিতর কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের কল্পনা ক'রেছেন এটা আদৌ সম্ভব নয়!"

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি রকম?"

শৈল হাসিতে হাসিতে বলিল, "রকম বড় মন্দ নয়, এই দেখুন এখানে দু'তিনটে ছোলার গাছ হয়েছে।"

পরেশ কৌতূহলের সহিত গিয়া দেখিল, সত্যই কুজোর অনতিদূরে ভিজা ধূলার উপর কয়টা ছোলার গাছ জন্মিয়াছে। সকালে ভিজা ছোলা খাওয়া পরেশের অভ্যাস, এবং তাহারই দুই চারিটা কোনরূপে এই নির্জলা নরম স্থানে পড়িয়া যে আপনাদের বংশবিস্তারের চেষ্টা করিতেছে, পরেশ ইহা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া হাসিতে লাগিল। শৈল গাছগুলাকে তুলিয়া ফেলিতে গেল; পরেশ বাধা দিয়া বলিল, "আহা, থাক্ থাক্, বেশ নধর গাছগুলি।"

শৈল বলিল, "কিন্তু এই রকম নধর গাছের উপর দয়া প্রকাশ কত্তে কত্তে যদি আরও দু'দশটা গাছ এসে আপনাকে দয়া করে, তা হ'লে ক্রমে যে আপনাকে অরণ্যচারী হ'য়ে পড়তে হবে।"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "ক্ষতি কি, আমার যথারণ্যং তথা গৃহং।"

পরেশ হাসিলেও তাহার হাসির ভিতর দিয়া যে একটা নৈরাশ্যের ম্লান ছায়া ফুটিয়া উঠিল, তাহা শৈলজার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। সে নত-মুখে গাছগুলি তুলিয়া স্থানটা পরিষ্কার করিতে লাগিল। পরেশ ফিরিয়া স্বস্থানে আসিল।

শৈল গৃহের অন্যান্য স্থান পরিষ্কার করিয়া টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ছি ছি, টেবিলটা ধুলো কালিতে কি হ'য়ে আছে! উঠুন আপনি।"

পরেশ গম্ভীরভাবে বলিল, "না, দেখছি তুমি আমার ঘরের নিত্য সঙ্গী-গুলির উপর অত্যাচার ক'রেই ছাড়লে না, শেষে আমারও উপর অত্যা-চার আরম্ভ করলে।"

শৈল সহাস্যে বলিল, "অনাচারে থাকার চাইতে একটু অত্যাচার সহ্য করা ভাল নয় কি?"

পরেশ উঠিতে উঠিতে বলিল, "কাজেই, কারণ তুমি যখন অত্যাচার না ক'রেই ছাড়বে না।"

পরেশ গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। শৈল টেবিল ঝাড়িতে লাগিল।

সে প্রথমে বই কাগজ প্রভৃতি নামাইল; টেবিলের ধূলা ঝাড়িল, নেকড়া দিয়া মুছিল, তার পর এক একখানা বই ঝাড়িয়া সাজাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিল। একখানা বই ঝাড়িতে গেলে তাহার ভিতর হইতে একখানা ছোট ফটোগ্রাফ বাহির হইয়া পড়িল। শৈল বই ঝাড়িতে ঝাড়িতে বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিল, ইহা ডাক্তার বাবুরই ফটো। শৈল স্থির দৃষ্টিতে ফটোখানার দিকে চাহিয়া রহিল। পরেশ তখন বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল, সুতরাং ইহা দেখিতে পাইল না।

তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। দূর চক্রবালপ্রান্তে যেখানে নিবিড় কালরেখা দৃষ্টি সীমা রুদ্ধ করিয়া দিতেছিল, তথায় ঠিক গাছের মাথার পাশ দিয়া একটা বৃহৎ সুবর্ণগোলক যেন ধীরে ধীরে বনানী গর্ভে নামিয়া যাইতেছিল। উপরে একখানা মেঘ গায়ে সোণালি রং মাখিয়া পশ্চিম আকাশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। পরেশ স্থির মুগ্ধ দৃষ্টিতে পশ্চিমাকাশের সেই সান্ধ্যশোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল। শৈল যে কখন্ আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছিল সে জ্ঞান পর্য্যন্ত তাহার ছিল না। যখন জ্ঞান হইল, তখন চকিতভাবে ফিরিয়া দেখিল, পশ্চিমাকাশের সেই সুবর্ণচ্ছটা শৈলের ললাটে ওষ্ঠে গণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়া আর একটা নূতন সৌন্দর্য্য ঠিক পাশেই ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সেই অভিনব সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই পরেশ শিহরিয়া উঠিল।

ঠিক সেই সময়ে অনুপমা আসিয়া তার সম্মুখে দাঁড়াইল।

অনুপমা যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমন নিঃশব্দে কিন্তু ফিরিয়া যাইতে পারিল না। প্রত্যাগমন কালে পায়ের শব্দ বুঝি একটু বেশী হইল, চুড়ীর সঙ্গে বালার সঙ্ঘর্ষণে একটু ঠিন্ ঠিন্ শব্দ উঠিল। শৈল চমকিতভাবে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, "কে?"

পরেশও ফিরিয়া চাহিল; শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

সহাস্যে পরেশ বলিল, "মানুষ নিশ্চয়।"

শৈলও ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "এবং স্ত্রীলোক।"

"ঠিক।"

"কিন্তু পরিচয়?"

"জিজ্ঞাসা ক'রে আসতে পার।"

হঠাৎ শৈলর মুখ দিয়া বাহির হইল, "বৌদি?"

পরেশ নীরবে মৃদু হাসিল। শৈল বলিল, "কিন্তু চলে গেলেন যে?"

সত্যই তো, চলিয়া গেল কেন? পরেশের মুখে যেন একটু শঙ্কার ছায়া পড়িল। গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "কি জানি।"

তাহার মুখের ভাব দেখিয়া শৈলও যেন একটু শঙ্কিত হইল। সে হত-বুদ্ধির ন্যায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরেই সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "বৌদিকে দেখে আসি, নীচে যাই।"

শৈল দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেল। কিন্তু নীচে গিয়া যখন বৌদির কোন অনুসন্ধান পাইল না, এবং পিসীমাও কোন সন্ধান দিতে পারিলেন না। শৈল পুনরায় উপরে আসিয়া পরেশকে বলিল, "কৈ, বৌদি তো আসেন নি।"

পরেশ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "আসেন নি?"

শৈল বলিল, "না।"

পরেশ নিঃশব্দে জানালার দিকে মুখ ফিরাইল। শৈল ঈষৎ শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কে?"

পরেশ একটু হাসিয়া বলিল, "ভূত।"

শৈলর মুখখানা ম্লান হইয়া গেল; সে পরেশের দিকে আর একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

নীচ হইতে কাত্যায়নী ডাকিলেন, "শৈল।"

শৈল ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। পরেশ উদাস দৃষ্টিতে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন পশ্চিম আকাশের স্বুবর্ণদ্যুতি মিলাইয়া গিয়াছে; স্তূপে স্তূপে অন্ধকার আসিয়া দৃষ্টিপথের সম্মুখে কৃষ্ণ যবনিকা বিস্তৃত করিয়া দিতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রিতে পরেশ আসিয়া রামুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে এসেছিল?"

রামু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বৌ মা।"

"কেন এসেছিল?"

"আনতে গিয়েছিলাম।"

"তারপর?"

"তারপর চলে গেলেন।"

"কেন গেলেন?"

অনুপমা চলিয়া যাইবার কারণটা জানিলেও রামু সে কথাটা স্পষ্ট বলিতে পারিল না, সে শুধু নীরবে দাঁড়াইয়া ঘাড়ে হাত বুলাইতে লাগিল। পরেশ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রোষগম্ভীরস্বরে বলিল, "এর পর কিন্তু আমাকে না জানিয়ে যেন না আনা হয়।"

"আচ্ছা" বলিয়া রামু চলিয়া গেল। পরেশ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

কেন গেল? আসিয়াই হঠাৎ এরূপে চলিয়া যাইবার কারণ কি? একটা কথাও না বলিয়া চলিয়া যাইবার কোন কারণ না জানাইয়াই চলিয়া গেল। তবে কি শৈলর এ ঘরে উপস্থিতিই চলিয়া যাইবার কারণ? কিন্তু শৈল থাকায় এমন কি দোষ হইয়াছিল যাহাতে সে এমন ভাবে চলিয়া যাইতে পারে। আলাপ পরিচয় থাকিলে এমন কি কেহ কখন থাকে না? বিলাতে তো পরস্পর পরিচিত স্ত্রীপুরুষের বন্ধুভাবে এরূপ মিলন সর্ব্বদাই ঘটে। তাহাতে তাহাদের স্ত্রীর মনে তো কিছুমাত্র মালিন্য উপস্থিত হয় না? কিন্তু তাহারা শিক্ষিতা মহিলা, আর এটা অশিক্ষিতের দেশ।

পরেশের ধারণা ছিল, শিক্ষিতা মহিলাদের অপেক্ষা এদেশের অশিক্ষিতা মহিলাদের স্বভাবচরিত্র অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। কিন্তু আজিকার ঘটনায় তাহার সে ধারণা যেন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ছি ছি, এ দেশের মেয়েগুলো এমনই অপদার্থ যে, তাহারা এত সামান্য কারণে স্বামীর উপর কুৎসিত সন্দেহ করিতে পারে। একটুও বিবেচনা না করিয়া, কোন বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইয়া অপরাধীকে তাহার অপরাধের অলীকত্ব প্রমাণ করিবার অবসর না দিয়াই ভালবাসার উপর এরূপ অলীক সন্দেহ হৃদয়ে স্থান দেওয়া কি ঘোর অবিচার, নিষ্ঠুর অত্যাচার নহে। শৈল যদি কোনক্রমে এই সন্দেহের আভাষটুকুও জানিতে পারে? ছি ছি, এই স্ত্রীলোকগুলোর প্রবৃত্তি কি নীচ!

পরেশ শুধু রাগিল না, অনুপমার উপর ঘৃণা ও বিরক্তিতে তাহার মনটা যেন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, এবং এরূপ সন্দেহপ্রবণা স্ত্রীকে লইয়া যে তাহাকে সংসার করিতে হয় নাই ইহাই ভাবিয়া যেন একটু স্বস্তি বোধ করিল।

সকালে বাড়ীর বাহির হইতেই পরাণ মণ্ডল আসিয়া ছেলের কঠিন অসুখের কথা জানাইল, এবং ডাক্তার বাবুকে একবার দেখিতে যাইবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিল। পরেশ তাহাকে ধমক দিয়া তাড়াইয়া দিল তারপর ডাক্তারখানায় ঢুকিতেই উপস্থিত রোগীদের কলরব শুনিয়া বিরক্তির সহিত এমন তীব্র ধমক দিল যে, তাহাতে রোগীর দল ভয়ে যেন কাঠ হইয়া

গেল। তারপর রোগীদের দেখিবার সময় পরেশ এমনই ক্রোধ ও অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিল যে, হরিচরণ পর্য্যন্ত তাহাতে ভীত না হইয়া থাকিতে পারিল না। ডাক্তারবাবুর এই অস্বাভাবিক উত্তেজনা দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিল। কোনরূপে রোগীগুলাকে বিদায় দিয়া পরেশ ডাক্তারখানা হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না, তথাপি পরেশ কখন ধীর কখন বা অধীর পদক্ষেপে একটা পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। ডাক্তারবাবুকে পথে দেখিলেই তাহাকে হাত দেখাইতে আসিত। আজিও কেহ কেহ হাত দেখাইতে সম্মুখীন হইল, কিন্তু পরেশের দৃষ্টির তীব্রতা দেখিয়াই ভয়ে ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল। পরেশ খানিকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে শৈলদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

কাত্যায়নী তখন স্নান করিতে গিয়াছিলেন, শৈল স্নান সারিয়া ছোট পিতলের সাজিটী হাতে লইয়া ফুল তুলিতেছিল। বাড়ীর ভিতরেই কতকটা জায়গা ঘেরিয়া শৈল একখানি ছোট ফুলবাগান তৈরী করিয়াছিল। বাগানে গাছ খুব বেশী ছিল না। দুই তিন ঝাড় বেল, এক ঝাড় চন্দ্রমল্লিকা, দুইটা গোলাপ, এক ঝাড় যূঁই, একটা রক্তকরবী মাত্র ছিল। এক পাশে একটী তুলসী গাছও ছিল। শৈল নিজে পূজা আহ্নিক করিত না, মাব পূজার জন্যই ফুলগাছগুলি তৈরী করিয়াছিল, এবং তাঁহারই জন্য ফুল তুলিতেছিল। ফুল তোলবার সঙ্গে সঙ্গে গাছের পাকা পাতা, শুকনা ডাল ভাঙ্গিয়া দিতেছিল, গাছের গোড়ার ঘাস আগাছা তুলিয়া ফেলিতেছিল। ভিজা চুলগুলা পিঠের উপর ঝাঁপিয়া পড়িয়াছিল; কণ্ডা পেড়ে শাড়ীর লাল্ পাড়টা রোদে জল্ জল্ করিতেছিল; সেই চুলের পাশে, শাড়ীর মাঝে স্নানশুদ্ধ মুখখানি ঠিক প্রভাতের পদ্মের মত দেখাইতেছিল, পরেশ তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

আজ শৈল শুধু স্মিতহাস্যেই পরেশের অভ্যর্থনা করিল; পরেশ গিয়া বাগানের ভিতর দাঁড়াইল, এবং এদিকে সেদিকে ফিরিয়া কৃষিবিজ্ঞানের মতে কোন্ গাছটা কোন্ খানে কি ভাবে বসান উচিত, গোলাপগাছের পরিচর্য্যা কিরূপ, পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ বুদ্ধিকৌশলে পরাগ সম্মিলন দ্বারা কত জাতীয় গোলাপ ও অন্যান্য পুষ্পের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলিতে লাগিল। শৈল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সেই সকল চেষ্টা ও অনুসন্ধানের মহৎ ফল অবশ্য আমার এই ছোট বাগানটীতে ফলতে পারে না।"

পরেশ বলিল, "নিশ্চয়ই ফলতে পারে। কাজের ছোট বড় দুই সমান।

আমাদের একটা দোষ এই যে, আমরা মনে করি, ছোট আয়োজনের ভিতর দিয়ে বড় কাজকে ফুটিয়ে তোলা যায় না, সে জন্য খুব বড় রকমের আয়োজন দরকার। কিন্তু এটা বাস্তবিক ভুল। তাহাকে সময় খুব ছোট ছোট ব্যাপারের ভিতর দিয়েই বড় কাজটা ফুটিয়ে তোলবার খুব বেশী সুবিধা থাকে। মনে কর, তোমার এই এক ঝাড় সাদা চন্দ্রমল্লিকা আছে, আমি যদি এটাকে কেটে—"

ব্যস্তভাবে শৈল বলিয়া উঠিল, "রক্ষা করুণ ডাক্তারবাবু আমার ঐ একটী ঝাড় চন্দ্রমল্লিকার উপর দিয়ে আপনাকে ছোট বড় কোন কাজই ফুটিয়ে তুলতে হবে না।"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "ভয় নাই, আমি সত্যি সত্যি তোমার এই একটী ঝাড় কাটছি না।"

শৈলও হাসিয়া বলিল, "বিশ্বাস কি, কাটাকুটিতে আপনারা যে খুব মজবুত ছুরী চালালেই হ'লো, তা সে যেখানেই লাগুক।"

পরেশ বলিল, "আমাকে কি তেমনি হাতুড়ে ডাক্তার মনে কর ?"

শৈল উত্তর করিল, "না, এবং সেই জন্যই আপনাদের বেশী ভয় করি। হাতুড়েদের কাছে বরং রক্ষা আছে, কিন্তু আপনাদের ঐ যে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক শিরা উপশিরার সংস্থান দেখে ধীর ভাবে ছুরী চালান, ওটা বাস্তবিকই ভয়ানক। ও যেন ঠিক জবাই করা। নয় কি ?"

উত্তরের প্রত্যাশায় পরেশের দিকে ফিরিয়াই শৈল বলিয়া উঠিল, "ঐ যা ওকি করলেন ? গোলাপটা ছুঁয়ে ফেললেন ?"

পরেশ বলিল, "তাতে ওর যাত গেল নাকি ?"

শৈল বলিল, "জাত যাবে কেন, ওটা নষ্ট হ'য়ে গেল। আপনার পায়ে যে জুতো, আর আপনার তো হাত ধোয়া নয়।"

পরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "জুতোটা আছে বটে, কিন্তু হাত আমার রীতিমত সাবান দিয়ে ধোয়া।"

শৈল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ?

ফুল তোলা শেষ করিয়া শৈল বলিল, "ঘরে বসবেন আসুন।"

পরেশ বলিল, 'না যাই, বসলে তো পেট ভরবে না।"

"যদি ভরে ?"

"অবশ্য মা যদি চেষ্টা করেন।"

শৈল রাগতভাবে বলিল, "কেন, আমি এমন অক্ষম নাকি ?"

সহাস্যে পরেশ বলিল, "ততদিন লোক অক্ষমই থাকে, যতদিন সে তার ক্ষমতার প্রমাণ না দেখায়।"

শৈল ঘাড় ঘুরাইয়া বলিল, "তাহার প্রমাণ আমি আজই দেখাব।"

"ঠিক ?"

"ঠিক।"

"তা হ'লে আমি ঘুরে আসছি।"

"কত দেরী হবে ?"

"ঘণ্টাখানেক ?"

"বেশ, কিন্তু আসা চাই। আমারই—"

দিব্য দিতে গিয়া শৈল আপনাকে আপনি এমনই লজ্জিত হইয়া পড়িল যে, কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না। পরেশ বলিল, "নিশ্চয়ই আসবো। কিন্তু এটাও বলে যাচ্ছি, লুচী কচুরী খাব না।

পরেশ চলিয়া গেল। শৈল মায়ের পূজার জায়গায় থালি রাখিয়া উনান ধরাইতে চলিল।

কাত্যায়নী যখন স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, শৈল তখন উনান ধরাইয়া ডালের হাঁড়ী চাপাইয়া দিয়াছে। কাত্যায়নী দেখিয়া অবাক হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি।"

শৈল বলিল, "আজ আমি রাঁধব, ডাক্তারবাবুকে নিমন্ত্রণ করেছি "!

মৃদু হাসিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "খাবার নিমন্ত্রণ, না উপোষের নিমন্ত্রণ ?"

শৈল রাগে মুখ ভার করিয়া বলিল, "কেন, আমি রাঁধতে জানি না বুঝি ?"

কাত্যায়নী বলিলেন, "খুব জানিস্, চল্ দেখি।"

শৈল জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "খবরদার বলছি, তুমি হাঁড়ী ছুঁতে পাবে না। আমি যা জানি তাই রাঁধব।"

অগত্যা কাত্যায়নী আহ্নিক করিতে গেলেন।

এ দিকে পরেশ সোজা পরাণ মণ্ডলের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। পরেশের কাছে ধমক খাইয়া পরাণ অগত্যা এক টাকা ভিজিট দিয়া হীরু ডাক্তারকে আনিয়াছিল। পরেশ শুনিয়া কতকগুলা তিরস্কার করিল এবং এই সামান্য অসুখে এত তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিয়া পয়সার শ্রাদ্ধ করা সম্পূর্ণ অনুচিত

হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিল। তারপর সে রোগী দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিল, এবং পকেট হইতে একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া জানাইয়া গেল যে, অতঃপর এরূপ হইলে সে চারটাকা ভিজিটের কম বাড়ীতে পা দিবে না।

স্নানাদি শেষ করিয়া পরেশ যখন শৈলদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন শৈলর রান্না শেষ হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া দিল। পরেশ খাইতে বসিল। কাত্যায়নী একটু দূরে বসিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। পরেশ দুই চারি গ্রাস খাইয়া কাত্যায়নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য করে বলুন, রান্নাটা কার হাতের ?"

কাত্যায়নী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "খেতে বিশ্রী হয়েছে বুঝি ? এই জন্যেই বল্‌লাম, চল্ আমি দেখি, কিন্তু আমাকে হাঁড়ী ছুঁতেই দিলে না।"

মৃদু হাসিয়া পরেশ বলিল, "আপনাকে ছুঁতে দিলে এর চাইতে আর বেশী কি ভাল হতো তা তো বলতে পারি না।"

কাত্যায়নী বলিলেন, "সত্যি বাবা, খেতে কি হয়েছে ?"

পরেশ বলিল, "সেটা খাওয়া দেখেই অনুমান করুন। কিন্তু রাঁধুনী গেল কোথায় ?"

কাত্যায়নী ডাকিলেন, "শৈল, ও শৈল !"

শৈল আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। পরেশ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীর-ভাবে বলিল, "এই খেলাঘরের রান্নার মত একবিন্দু করে তরকারী সকলেই ভাল রাঁধতে পারে। বেশী বেশী জিনিষ ভাল রাঁধতে পারলেই তবে বাহাদুরী।"

শৈল মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল, এবং অবিলম্বে সকল তরকারী আরও খানিক খানিক আনিয়া পাতে ঢালিয়া দিল। পরেশ বলিল, উচিত কথাটা এমনি যে, মানুষ তাতে না রেগে থাকতে পারে না। ভাল, আমারও রাগ এবং ক্ষুধা দুইই আছে।"

কাত্যায়নী কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এমন বোকা মেয়েও দেখি নি ; শাকের ঘণ্টটা আবার দিলি নে কেন ? অম্বল কৈ ?"

"আনি" বলিয়া শৈল চলিয়া গেল। কাত্যায়নী বলিলেন, "মোচার ঘণ্টর রংটা হয়েছে দেখ না।"

পরেশ বলিল, "যারা রূপের চেয়ে গুণের পক্ষপাতী আমি তাদেরই একজন। সুতরাং রং দেখে ওটাকে আমি ফেলতে পারি না।"

শৈল অম্বল আনিয়া দিল। পরেশ একটু মুখে দিয়া বলিল, "এইবার খুব ঠকেছে। কেননা অম্বল আর চিনীর রসে যে একটু পার্থক্য আছে তা বুঝতে পারে না।"

কাত্যায়নী বলিলেন, "সব নিরামিষ্যি, মাছ নাই, তোমার খাবার কষ্ট হবে বাবা।"

পরেশ বলিল, "কষ্ট যে হবে, তা শৈল যখন নিমন্ত্রণ করেছিল এখনই বুঝে নিয়েছি। তবে কি জানেন, নিত্যি সুখের মাঝে এ দিনকার একটু কষ্ট চাটনীর মত খুব মন্দও লাগে না।"

পরেশ দরজার দিকে হাস্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। শৈল দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া তীব্র কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

আহারান্তে পরেশ শৈলকে জিজ্ঞাসা করিল, "সার্টিফিকেট চাই নাকি?"

শৈল বলিল, "আপনার মত পেটুক লোকের সার্টিফিকেটের কোনই মূল্য নাই।"

(ক্রমশঃ)

রামচরণ

[লেখক — শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্]

"নবপত্র" নামে এক নূতন মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া বিদেশে তাহার গ্রাহক সংগ্রহ করিবার জন্য সঙ্গে একটি চাকর ও কতকগুলি পত্রিকা লইয়া কলিকাতা হইতে ঢাকা সহরে গিয়া হাজির হই। সেখানে বাজারের নিকট একখানি ছোট ঘর ভাড়া লইয়া নিজের কাজ চালাইতে লাগিলাম। আমাদের ঘরের সম্মুখেই এক মুড়ি মুড়কির দোকান ছিল; সেই দোকানটি এক বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের। তাহার তরুণ বয়স্ক ভাইপো রামচরণই সেই দোকানের তত্ত্বাবধান করিত। মধ্যে মধ্যে দেখিতাম বৃদ্ধা সঙ্গে একটি দশ বার বছরের মেয়ে লইয়া বিক্রয়ের জন্য দোকানে জিনিষপত্র

দিয়া যাইত। রামচরণের হাতে যখন কোনও কাজ থাকিত না, তখন সে প্রায়ই আমার ঘরে আসিয়া মাসিক পত্রিকা ও অন্যান্য পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া একমনে ছবি দেখিত ও আমাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। রামচরণ নিম্নশ্রেণীর লোক হইলেও, তাহার কথাবার্ত্তায় ও আচার ব্যবহারে এমন একটা নম্রতা ও শিষ্টতা মিশ্রিত ছিল যে তাহার সঙ্গে দুদিন কথা কহিয়াই আমি তাহার গুণে বড়ই মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। রামচরণও, যতই দিন যায়, আমার প্রাণ ততই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। নিজে নিরক্ষর, আমি পুস্তক লিখি ও পুস্তকের ব্যবসা করি দেখিয়াই বোধ হয় আমার প্রতি তাহার ভক্তির মাত্রা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। আমাকে গুরুর আসনে বসাইয়া অন্ধ ভক্তের ন্যায় সে আমার পূজা করিতে লাগিল। আমার চাকর কার্য্যান্তরে গেলে, সে স্বেচ্ছায় আমার কাজ করিয়া দিত, এবং আমার কোন একটু কাজে লাগিতে পারিলেই নিজেকে যেন ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিত।

একদিন দুপুর বেলা আমার চাকরটাকে কোন জরুরি কাজে স্থানান্তরে যাইতে বলিলাম; সে হঠাৎ উত্তর করিল, "বাবু এখন যেতে পারবো না, বিকালে যাবো।" উত্তর শুনিয়াই রাগে আমার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। আমি সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রাপ্য মাহিনা চুকাইয়া দিয়া তাহাকে কাজে জবাব দিলাম। পরদিন দেখি রামচরণ সেই চাকরটাকে পুনর্ব্বার কাজে বহাল করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছে। আমি কিছুতেই তাহার কথায় সম্মত হইলাম না। পরন্তু তাহাকে বলিলাম,—"রামচরণ, তুই আমার কাছে থাকবি, ওকে আর আমি রাখবো না।"

আমার কথা শুনিয়া রামচরণ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। সে স্মিতবদনে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। আমি তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমি যখন যেখানে যাব, আমার সঙ্গে যেতে পারবি?" "আজ্ঞে হাঁ, খুব যাবো। দিল্লী যেতে বল্লেও আমি রাজি আছি।" ইহার দ্বারা রামচরণ যে দিল্লী অপেক্ষা বেশী দূর স্থানে যাইতে স্বীকৃত হইবে না, এরূপ জানাইল, তাহা নহে; তবে দিল্লী সহরটাই যে ভারতের সুদূর প্রান্তে অবস্থিত ইহাই নিরক্ষর লোকদের দৃঢ় ধারণা! আমি তখন তাহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, রামচরণ, তোর পিসী তোকে ছেড়ে দিতে রাজি হবে?"

"আজ্ঞে হাঁ, তার জন্যে আপনার কোনও ভাবনা নাই, সে বন্দোবস্ত আমি করে নেব।"

পরদিন হইতেই রামচরণ আমার নিকট কাজ করিতে আসিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, যতটা আশা ভরসা লইয়া ঢাকাতে গিয়াছিলাম, দিন দিন তাহা নির্ম্মূল হইয়া আসিতে লাগিল। বড় উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, দীনা বঙ্গভাষার শ্রীহীন অবস্থার উন্নতি সাধন কল্পে, রক্ষণশীল বঙ্গবাসীকে নববাণী শুনাইয়া তাহাদের চৈতন্য উদ্‌বুদ্ধ করিবার মানসে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া এই দুর্দ্দিনে কাগজের মহার্ঘ্যতা সত্বেও "নবপত্র" বাহির করিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ইহার দস্তুরমত বিজ্ঞাপন দিতে পারিলে, পত্রিকার বহুল প্রচারের' সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও কল্যাণ সাধিত হইবে. নিজেরও বেশ দু'পয়সা লাভ হইবে। পরের দাসত্ব করিয়া আর এই মহামূল্য জীবনটা নষ্ট করিতে হইবে না। কিন্তু হায়, অবোধ বাঙ্গালী তা বুঝিল না!

প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় খুব জোর করিয়া আমাদের ভাষার ও সমাজের পুরাতন কুরীতি ও কুসংস্কার গুলিকে প্রবলভাবে আঘাত করিয়া প্রবন্ধ বাহির করিলাম। 'পৌরাণিক চরিত্র' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বিশেষভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে ওসব চরিত্র সম্পূর্ণ মিথ্যা, কবি কল্পনা মাত্র, গাঁজাখোরের উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত। ইহা পড়িয়া আমাদেরই দলের একজন প্রধান পাণ্ডা আমাকে উৎসাহিত করিয়া এক লম্বা পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন ; বড় আশা ছিল তৃতীয় সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই সেই পত্রখানি ছাপাইয়া দিব, কিন্তু হায়, আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তৃতীয় সংখ্যা আর পৃথিবীর আলো দেখিতে পাইল না। কে তখন ভাবিয়াছিল এতকাল ধরিয়া মাথার ভিতর যে সব ভাবের বেগ বহুকষ্টে সংযত করিয়াছিলাম, আজ সম্মুখে প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইয়াও দুদিনেই তাহার প্রবাহ থামিয়া যাইবে?. এত শীঘ্র আশাকুসুম শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িবে ?

দু'চার জন বন্ধু-বান্ধব ছাড়া কলিকাতায় আর কাহাকেও গ্রাহক জুটাইতে পারিলাম না। অনেকেই মুখে আমার সাধু উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিল বটে, কিন্তু গ্রাহক হইবার জন্য অনুরোধ করিলেই তাহারা নানা ওজর আপত্তি করিতে লাগিল। কলিকাতায় সুবিধা না হওয়ায় ঢাকায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। এ দেশের লোক এখন নব ভাবে জাগ্রত, নববাণী শুনিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল; তাই ভাবিয়াছিলাম আমার এ বাঁশীর নূতন সুর তাহাদের কর্ণে মিঠা বাজিতে পারে! কিন্তু সেখানেও নিরাশ হইতে হইল। পরে পূর্ব্ববঙ্গের আরও নানা স্থানে ঘুরিলাম, লোককে নানা রকম করিয়া বলিয়া দিলাম, কিন্তু কোথায়ও গ্রাহক মিলিল না। শেষে হতাশ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম, রামচরণও

আমার সহিত আসিল। এতদিন ছায়ার ন্যায় সে আমার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে এবং বিশেষ দুঃখের সহিত প্রতি পদে আমার এই নিষ্ফলতা ও নৈরাশ্য লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে। আমার এক আত্মীয় কলিকাতায় বাসা ভাড়া লইয়াছিলেন; আমিও সেই বাড়ীতেই একখানি ঘরে থাকিতাম। আসিয়া দেখিলাম, তাঁহারা বাসা উঠাইয়া দিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন। কি করি, এক মেসে উঠিয়া একখানি ঘর ভাড়া লইলাম। পরদিন রামচরণকে ডাকিয়া বলিলাম,—"রামচরণ আমার ত এই অবস্থা দেখতে পাচ্ছিস। টাকাকড়ি হাতে যা কিছু ছিল, প্রায় সব খরচ হয়ে গেছে। কাগজও ত চলে না, উঠে যাবার জোগাড়। এখন যে আর আমি তোকে মাইনে দিয়ে রাখতে পারবো, বিশ্বাস হয় না। চল তোকে আমার এক বন্ধুর বাড়ী রেখে আসি।" সে কিছুতেই তাহাতে রাজি হইল না বলিল,—"বাবু, আমাকে এখান থেকে মাইনে আর দিতে হবে না। মাইনে যা পাওনা আছে, তা আপনার সুবিধা মত দিলেই হবে। আমাকে খালি দুটি খেতে দেবেন, আমি আর কোথাও যেতে পারব না।" এ লোককে কি প্রকারে বলি, তোমাকে ভাত দিবারও অবস্থা আমার নহে? কিন্তু ক্রমেই আমার অবস্থা যখন বড়ই মন্দ হইয়া উঠিতে লাগিল, রামচরণ নিজেই বুঝিল, বাবু আর মুখে কিছু না বলিতে পারিলেও, তাহাকে খাওয়াইতেও আমার কষ্ট হইতেছে, সে একদিন আমাকে বলিল,—"বাবু আমাকে একটা টাকা দেবেন?" ভাবিলাম হয়ত এবার দেশে যাইবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়াছে। আমি উত্তর করিলাম,—"তা দেব। তুই বাড়ী যাবি ত?"

"আজ্ঞে না, আমি বিড়ির দোকান খুলবো। আমি বেশ বিড়ি তৈরী করতে জানি, মসলা কিনে বিড়ি তৈরী করবো।"

আমি তাহাকে একটি টাকা দিলাম। সে পরদিন হইতেই বিড়ি তৈয়ারি করিয়া নিজের খাবার খরচের পয়সা রোজগার করিতে লাগিল এবং সেইদিন হইতে তাহার খরচ সে নিজেই মেসে দিতে লাগিল। সকাল বেলা আমার কাজকর্ম শেষ করিয়া সে নিজের কাজে যাইত; আবার সন্ধ্যাবেলা কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার কার্য্যে নিযুক্ত হইত। আমি তাহাকে অত পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিতাম, কিন্তু সে কিছুতেই আমার মানা শুনিত না। রাত্রে আহারাদি শেষ করিয়া সে আমারই ঘরের এক কোণে শুইত। যতক্ষণ না আমি ঘুমাইতাম, আমার সেবা করা, আমার সঙ্গে গল্পগুজব করা, আমার হতাশ

প্রাণে উৎসাহ প্রদান করা, ইহা তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে গণ্য ছিল। আমি কাগজের উন্নতির আশা-ভরসা ত্যাগ করিয়া চাকুরীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কিন্তু এ বাজারে যাহাদের চাকুরি ছিল, তাহাদেরই যাইতেছে, নূতন চাকুরী কোথায় মিলিবে? তখন যথার্থই নিজের উপর ধিকার জন্মিল। আপনার লোকদের, মনের ঘোর বিরুদ্ধে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া; বহুকষ্টে সঞ্চিত অর্থ ভাঙ্গিয়া এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ভূত কেন আমার ঘাড়ে চাপিয়াছিল? আমি কি এতই নির্ব্বোধ বনিয়া গিয়াছিলাম? তখন যথার্থই বুঝিতে পারিলাম, এ সব খেয়াল চরিতার্থ করা ধনী লোকেরই শোভা পায়!

অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও মানসিক দুশ্চিন্তায় হঠাৎ রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলাম। দিনরাত পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিছানায় শুইয়া ছটফট্ করিতে লাগিলাম। এমন কোনও আত্মীয় বন্ধু নিকটে নাই যে, এক মিনিটও পাশে বসিয়া যন্ত্রণায় একটু উপশম করিয়া দেয়। বাড়ীর সকলেই আমার ব্যবহারে, আমার উপর একেবারে হাড়ে চটিয়া গিয়াছে। তাহাদের আর এ সময় খবর দিয়া বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করিলাম না। ভাবিলাম অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে। কিন্তু রামচরণ আত্মীয়ের অভাব আমাকে কিছুই বুঝিতে দিল না! সেই আমার অভিভাবক সাজিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিতেছে, ডাক্তারকে নিয়ম মত রোগীর সংবাদ দিয়া আসিতেছে, নিজের দোকান পাট বন্ধ করিয়া পরমাত্মীয়ের ন্যায় আমার সেবা করিতেছে, আবার কখনও বন্ধু বান্ধবের ন্যায় আমাকে কত উৎসাহ দিয়া যন্ত্রণার লাঘব করিতে চেষ্টা করিতেছে। রামচরণ যে পূর্ব্বজন্মে আমার কে ছিল বুঝিতে পারিলাম না। একি, এ যেন শীতলামূর্ত্তিতে আমার এই অসহ্য যন্ত্রণায় শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া যন্ত্রণার উপশম করিতেছে, অভয়দায়িনী মূর্ত্তিতে আমার দুর্ব্বল অন্তঃকরণে সাহস দিতেছে—ভয় নাই, আবার দুর্গতিনাশিনী মূর্ত্তিতে দুর্গমে আমাকে রক্ষা করিতেছে। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই আমি একটু সুস্থ হইয়া উঠিলাম। তখন রামচরণের স্ফুর্ত্তি আর ধরে না! দু'একদিন পরে দেশ হইতে তাহার এক পত্র আসিল, "পিসীমার বড় অসুখ, তাহাকে বাড়ী যাইতে লিখিয়াছে। পূর্ব্বেও দু'এক খানা পত্রে তাহার পিসীমা তাহাকে বাড়ী যাইতে লিখিয়াছিল কিন্তু সে যাইতে স্বীকৃত হয় নাই। আমিও এবিষয়ে দু'একবার তাহাকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার ইচ্ছার

বিরুদ্ধে বেশী পীড়াপীড়ি করিতে পারি নাই, পাছে সে মনে করে বাবু আমাকে জোর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে। এবার আমি তাহাকে ধরিয়া বলিলাম,—"রামচরণ, এখন আমি বেশ ভাল আছি, তুমি এবার দিন কতকের জন্যে বাড়ী যাও, পীসিমার অসুখ না গেলে দোষ হবে। আচ্ছা, বাড়ী যেতে চাওনা কেন, পিসীমার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছ নাকি?"

সে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে আমার দিকে মুখ তুলিয়া বলিল,—"বাবু, সে অনেক কথা!"

আমি সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে তাহাকে বলিলাম,—"থাক্, যদি কষ্ট হয় ত বলে কাজ নেই।"

"না, বাবু, আপনাকে সব খুলে বলছি শুনুন; শুনে বিচার করবেন দোষ কার—আমার না পিসীমার? বাবু, আমি বড়ই হতভাগা, আমার বয়স যখন সাত বছর, তখন আমি পিতৃমাতৃহীন হই। সেই থেকেই আমার বিধবা পিসী আমাকে তাঁর বাড়ীতে এনে মানুষ করে আসছে। বাপ-মার অভাব পিসীমা আমাকে কিছুই জানতে দেয় নি। পিসীমার ছেলে পিলে কিছুই ছিল না। তিনি আমাকে নিজের ছেলের মতনই মানুষ করতে লাগলেন; আমি যখন যা আবদার ধরেছি, পিসীমা তাই পূরণ করেছেন। তাঁর ঐ মুড়ি মুড়কির দোকানে আমি বসে থাকতাম ও জিনিষপত্র বেচতাম। বছর খানেক পরে পিসীমা আমাকে নিয়ে আমাদেরই স্বজাতি স্ত্রীলোকদের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতে যান। সেখানে সেই স্ত্রীলোকটি হঠাৎ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়ে। তার একটি মাত্র চার বছরের ছোট মেয়ে ছিল। মারা যাবার আগে সে পিসীমার হাতেই তার ছোট মেয়েকে সঁপে দিয়ে যায়। পিসীমা যথারীতি সৎকারাদি করিয়ে আমাদের নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। মেয়েটির নাম হচ্ছে জগা। পুরোনাম জগদম্বা। জগা সেই থেকেই আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে ও আমাকে দাদা বলে ডাকে। তার বাপ মা নেই বলে আমি তাকে বড় ভালবাসতাম ও আদর যত্ন করতাম। পিসীমাও আমাদের দুজনকেই সমান স্নেহ করতেন ও মাঝে মাঝে বলতেন,—'বড় হলে তোদের দুজনের বিয়ে দিয়ে দেব।' তখন ছেলেমানুষ কিছু বুঝতে পারতাম না, হেসে উড়িয়ে দিতুম। ক্রমেই যত বয়স বাড়তে লাগলো, জগার উপর আমার ভালবাসা দিন দিন বাড়তে লাগলো। কোনও ভাই বোধ হয় নিজের বোনকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাসতে পারে না। জগা কিসে সুখী হবে, সে দিকে আমার সর্ব্বদাই নজর ছিল। তার জন্য হাট

থেকে পুতুল খেলনা কিনে আনতাম ; সেও ছোট বোনের মতন আমার প্রতি রত ছিল। আমার সুখ স্বচ্ছন্দ বিধানের জন্য সে প্রাণপণ যত্ন করতো। আমাদের এ মিল দেখে পিসীমা বড়ই আনন্দিত হতেন।

"পমে বাবু দেখতে দেখতে আট বছর কেটে গেল। আমার বয়স তখন ষোল বছর, জগা বার বছরে পড়েছে। আপনি আমাদের দেশে যাবার কিছুদিন আগে, পিসীমা একদিন রাত্রে আমাকে ধরে বসলেন এই মাসের মধ্যেই ভাল দিন দেখে তোর সঙ্গে জগার বিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হবো। আমি ত শুনেই বেঁকে বসলাম, না ওকে আমি কিছুতেই বে করতে পারবো না। পিসীমা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। এই আট বছর ধরে যে আশা তিনি মনে মনে করে এসেছেন, আমাদের দুজনের মধ্যে এত মনের মিল ও ভাব দেখে তিনি একদিনও স্বপ্নেও ভাবেন নি, আমি তাঁর সে আশা এক কথায় নির্ম্মূল করে দেব। তাঁর বড় রাগ হলো, এত রাগ হবার কথাই। তিনি বল্লেন,- 'অমন সুন্দর মেয়ে, কত গতর, তোকে কত ভালবাসে, তুইও এত ভালবাসিস, কেন বে করবি না বল।' আমি কি উত্তর দেব ঠিক করতে পারলাম না, মনের মধ্যে অনেক কথাই উঠতে লাগলো, কিন্তু মুখ দিয়ে তা প্রকাশ করতে পারলাম না। আমি কেবল বল্লুম,—'বোনকে কেউ আবার বে করে ?' পিসীমা উত্তর শুনেই হেসে উঠলো,—'বোন আবার কিরে ? দুজনে একসঙ্গে থাকলেই কি ভাই বোন হয়ে যায়। ছেলেমানুষি কথা ! ওসব পাগলামি ছেড়ে দে, যা বলি, তা শোন।' আমি কিন্তু কিছুতেই রাজি হলাম না। জগাও আমার পাশে বসে ছিল। সে হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"যেদিন আপনার সঙ্গে কাজের ঠিক করি, সেদিন সকালে ঐ নিয়ে পিসীমার সঙ্গে খুব তর্কাতর্কি হয়। পিসীমা রেগে বলে উঠলেন, 'আমার এখানে থাকতে গেলে অবাধ্য হলে চলবে না।' তিনি ভেবেছিলেন ভাল কথায় হলো না, বোধ হয় ভয় দেখালে আমি রাজি হবো। কিন্তু কাজে তা হলো না, আমি আপনার কাছে কাজে লেগে গেলাম। পিসীমা আমার উপর খুব রেগে ছিলেন, কথা পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। আপনি তখন ঢাকা ছেড়ে অন্য যায়গায় গেলেন। আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম যতদিন না জগার অন্য কারও সঙ্গে বে হয়, আমি বাড়ী ফিরবো না। আপনার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগলাম। প্রথম কলকাতায় এসে পিসীমার জন্যে প্রাণটা বড় কাতর হয়। যে মার মতন

আদর যত্ন করে আমাকে লালন পালন করেছে, তার কথার অবাধ্য হয়ে তার মনে কষ্ট দেওয়া আমার সাধ না ইচ্ছা? কিন্তু কি করি, আপনিই বলুন না, যাকে আট বছর ধরে নিজের ছোট বনের মত দেখে এসেছি, ভালবেসে এসেছি, তাকে কি করে বে করি? হাঁ, কলকাতায় এসে পিসীমার মনও নিশ্চয়ই আমার জন্য কাঁদছে। তিনি বাড়ী ফিরবার জন্য দুতিন খান পত্র দেন; আপনি ত তারপর সবই জানেন। আমার বাড়ী না যাবার এই একমাত্র কারণ। আপনি ত সব শুনলেন, এখন আপনিই বিচার করুন, দোষ কার?"

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাহার কথা শুনিতেছিলাম। আমারি আপদে বিপদে সে যেরূপ ছায়ার ন্যায় নিঃস্বার্থ ভাবে আমার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, কঠিন রোগে সে যে উপায়ে আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে, অবশ্য তজ্জন্য পূর্ব্বেই আমার মনে তাহার প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। বৃথা এত অর্থ নষ্ট করিয়া মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলাম বলিয়া পূর্ব্বে যে মনে সর্ব্বদাই একটা আত্মগ্লানি উপস্থিত হইত, অনুতাপানলে অন্তঃকরণ দগ্ধ হইত, এখন রামচরণের নিষ্কাম সেবা ও পরোপকার দেখিয়া সে ভাব আমার মন হইতে একেবারে দূর হইয়া গিয়াছিল। হায়! লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেও রামচরণের ন্যায় লোকের মন জয় করিতে পারা যায় না, আমি যে সামান্য টাকা খরচের বিনিময়েই তাহাকে পাইয়াছি! কি শুভক্ষণেই মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার সঙ্কল্প আমার মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু একি, আজ আবার এ কি শুনিলাম, নিম্নশ্রেণার ষোল সতর বৎসরের যুবক, এ জ্ঞান তাহার কোথা হইতে আসিল? এ কি পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার? আমি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম,—"ভাই, দোষ তোমার পিসীমারই!" বেশী কথা আর বলিতে পারিলাম না, তাহার মহান হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া আমার মুগ্ধ প্রাণ তাহার নিকট সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিয়া বসিল। আমি যে শিক্ষিত, বিদ্বান বলিয়া মনে মনে এতকাল একটা গর্ব্ব ছিল, তাহা এক মুহূর্ত্তেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

পরদিন রামচরণ বাড়ী গেল, বলিয়া গেল শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। দিন চার পাঁচ পরে কত দুঃখ জানাইয়া সে আমাকে এক পত্র লিখিল, তাহার পিসীমার গঙ্গালাভ হইয়াছে, কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া শীঘ্রই কলিকাতা চলিয়া আসিবে।

প্রায় মাস দেড়েক পরে একদিন দেখি রামচরণ হঠাৎ আসিয়া হাজির। আমি সানন্দে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। বিশ্রামের পর তাহাকে বাড়ীর কথা সব জিজ্ঞাসা করিলাম, জগদম্বাকে কাহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসিল সন্ধান লইলাম। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"বাবু, ভাগ্যে আপনার কথা শুনে গেছলাম, তাই পিসীর সঙ্গে দেখা হলো, নইলে আর হতো না। মরবার আগে বের কথা পিসীমা আর ভুলেন নি। আমি তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাই, তিনি আমাকে ক্ষমা করে গেছেন। কিন্তু এ দুঃখ আমার যাবে না যে, আমি এত হতভাগ্য যে তাঁকে সুখী করতে পারলাম না। তিনি বৃথাই আমাকে এত কষ্ট করে মানুষ করেছিলেন। পিসীমার মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধাদি শেষ করে জগার বের সম্বন্ধ স্থির করলাম। পিসীমার হাতে নগদ টাকা কিছু ছিল। শ্রাদ্ধের খরচ করেও কিছু বেচে ছিল। তাতেই জগার বের সমস্ত খরচ পত্র চালালাম। বের পরদিন শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লে,—'দাদা, আমাকে ভুলো না, আমার যে আর কেউ নেই।' তাকে আশীর্ব্বাদ করে বল্লাম,—'আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুই সুখী হবি। তোর এ দাদা বেঁচে থাকতে তোর কোন কষ্টই হবে না। পিসীমার ধানজমি ও ঘরদোর সামান্য যা ছিল, সব তার নামে লেখা পড়া করে দিয়ে আমি আপনার কাছে চলে এলাম।"

রামচরণের কথা শুনিয়া আমি তাহাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিলাম। সেই দিন হইতে রামচরণকে সকলের নিকট ছোট ভাই বলিয়া পরিচয় দিতে আমি গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। এখন আমার নিজের কাজেরও সুবিধা হইয়াছে। আমি এক সওদাগরি আফিসের বড় বাবুর পদ পাইয়াছি। মাসিক বেতন ষাট টাকা। স্ত্রী পুত্রকে বাড়ী হইতে আনাইয়া কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া করিয়া আছি। দুদিনেই রামচরণ নিজের গুণে তাদের বড় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। আমার ছেলেত তাহাকে 'কাকা' বলিতে অজ্ঞান। স্থির করিয়াছি, রামচরণকে কোনও ব্যবসায় লাগাইয়া দিব। আর তাহার বিবাহের জন্য স্বজাতীয় একটি পাত্রীরও অনুসন্ধান করিতেছি, তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারী করিব। তবে সে এখন হইতেই বলিয়া রাখিয়াছে যে, তাহার বিবাহের সময় জগাকে আনাইতেই হইবে। *

---

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

স্নেহের দান

(লেখিকা—শ্রীমতী শরদিন্দু সরকার।)

(১)

তখনও প্রভাত সূর্য্য-কিরণ প্রখর হইয়া উঠে নাই। পাখিগুলি নিজ নিজ আহার অন্বেষণে ব্যস্ত। একটি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা উদ্যান মধ্যে ফুল সংগ্রহ করিয়া সাজিতে ভরিতে ছিল। করবী বৃক্ষের উচ্চ শাখায়-কতক গুলি ফুলের গুচ্ছ পাড়িয়া লইবার জন্য বালিকা বৃক্ষের ডাল ধরিয়া বারংবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছিল। একটু দূরে একটি দ্বাদশ বর্ষীয় বালক তাহার পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল। বালিকার সে দিকে লক্ষ্য ছিল না, বৃক্ষোপরি ফুলের উপরে সে ঝুকিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কোন প্রকারে ফুল গুলি তুলিয়া লইতে পারিতেছে না। দেখিয়া বালক একটু অগ্রসর হইয়া কহিল—"তুমি সরে যাও মণি আমি ফুল পাড়ছি।" বালিকা সসব্যস্তে কহিল "না, না তুমি ছুয়ো না, এ যে ঠাকুরমার পূজোর ফুল।" বালক ঈষৎ হাসিয়া কহিল "কিন্তু তুমিত ও ফুলগুলো পাড়তে পারবে না মণি, ফুলে বুঝি দোষ আছে? সর আমি পেড়ে দিচ্ছি।" মণি বিস্মিত হইয়া কহিল "ওমা, দোষ নেই? তোমার যে বাসি কাপড়, ঠাকুরমা বক্‌বে যে।" বালক একটু ক্ষুন্ন হইয়া কহিল—"আচ্ছা, তবে ও ফুলগুলোর আশা ছেড়ে দিয়ে অন্য ফুল নিয়ে বাড়ী যাও, আমি ততক্ষণ বিপিনকে ডেকে নিয়ে আসি, বেশী দেরী করোনা কিন্তু।" বালক অন্য পথে চলিয়া গেল। মণিও অগত্যা সে ফুলগুলির আশা ত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্নমনে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

বালিকা মণিমালাকে পঞ্চম বৎসর বয়সেই তাহাকে ছাড়িয়া তাহার মাতা-পিতা ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সংসারে ঠাকুমাই তাহার একমাত্র অবলম্বন, এবং বৃদ্ধা ঠাকুরমারও মণি ছাড়া আর কেহ ছিল না। অল্প বয়সে মাতৃ-পিতৃ হীনা মণিকে ঠাকুমা আপনার বুকে তুলিয়া লইয়া বহু কষ্টে তাহাকে লালন পালন করিয়া ছিলেন। ঠাকুরমার অত্যধিক আদর পাইয়া মণি লজ্জা-ভয় কাহাকে বলে, তাহা প্রায় জানিত না। অবাধে পল্লী বালক-বালিকাদের দলে মিশিয়া সারাদিন বৃক্ষে বৃক্ষে পাখির ছানা—পেয়ারা, আম, পাড়িয়া বেড়াইত। এ সম্বন্ধে পল্লীস্থ প্রবীণা গৃহিণীর দল-ঠাকুরমার নিকট অভিযোগ

জানিলে, তিনি মৃদু হাসিয়া বলিতেন "মণির বয়স কি বোন্? এখন খেলা করবে না ত আবার করবে কখন।" ঠাকুমার উত্তরে গৃহিণীরা মনে মনে বিরক্ত হইলেও মুখে কিছু বলিতে পারিতেন না।

কালীদাস ঘোষের পুত্র নরেন্দ্রের সহিত মণির বড় ভাব! তুচ্ছ কথায় মান, অভিমান, সাধ্য সাধনা, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে দুজনের হৃদয় এক হইয়া যাইত। ইহাতে অন্য অন্য বালক বালিকা, প্রায়ই তাহাদের উপর চটিয়া উঠিত। কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। কারণ দলের মধ্যে নরেন্দ্রই সর্ব্বপ্রধান, এবং তাঁহার দলের মধ্যে প্রভুত্বও অত্যন্ত প্রবল ছিল, তা ছাড়া সে মণিকে বড় ভালবাসিত। "আহা, তার মা বাপ নাই।" কাজেই মণির শত অন্যায় দলস্থ বালক বালিকাদিগকে সহ্য করিতে হইত। এবং সময়ে সময়ে কিলটা চাপড়টাও তাহারা সহিয়া লইত। কাজেই মণির প্রতাপ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। কালীদাস বাবু পুত্রের লেখা পড়ায় অমনোযোগ লক্ষ্য করিয়া, তাহাকে পাঠশালা হইতে স্কুলের শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। নরেন ঠিক সময়ে বই ইত্যাদি লইয়া স্কুল যাইবার জন্য বাহির হইত বটে, কিন্তু সে একস্থানে বই গুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া, পিতার চক্ষে ধূলি দিয়া সারাদিন মণির সঙ্গে বাগানে বাগানে ঘুরিয়া অপরাহ্ন বেলায় সুবোধ বালকটির মত বাড়ী ফিরিত। মাতা ভাবিতেন—ছেলে স্কুলে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া আসিল। অল্পদিন মধ্যেই কালীদাস বাবু পুত্রের কীর্ত্তি জানিতে পারিয়া, তাহাকে ডাকিয়া অনেক তিরস্কার করিলেন, এবং তাহাকে গ্রাম্য স্কুল ছাড়াইয়া সহরের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। সে কোন প্রতিবাদ করিতেও পারিল না, এবং কোনরূপ আগ্রহও জানাইল না, নীরবে গৃহের বাহির হইয়া গেল।

যদিও নূতন স্থানে যাইবার, এবং নূতন স্থান দেখিবার ইচ্ছাটা অত্যন্ত প্রবল হইতেছিল, তথাপি মণিকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া তাহার দুইটি চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে যে মণিকে এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে তাহা সে এতদিন মোটেই বুঝিতে পারে নাই। আপনার অজ্ঞাতে তাহাদের দুইটি হৃদয় যে এরূপ ভাবে পরস্পর আকর্ষণ করিয়া লইতেছে তাহা ত সে একদিনও ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই! সে পিতাকে লুকাইয়া ধীরে ধীরে খিড়কির দ্বার দিয়া মণিকে এই দুঃসংবাদটা দিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

মণি রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল! নরেনকে

আসিতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল "আজ তোমার মুখখানা এত শুকিয়ে কেন নরুদা ?"

নরেন মুখটি চুন করিয়া, অকস্মাৎ সেই দুঃসংবাদটা তাহাকে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল। মণি সজলনেত্রে বলিল "তুমি ত নূতন জায়গাতে গিয়ে বেশ থাকবে নরুদা, কিন্তু আমার দশা কি হবে ভাই ?" কথাটি বলিয়াই আজ কে জানে কেন তাহার কেমন লজ্জা করিতেছিল, হঠাৎ মস্তকটা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নরেন সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া আগত দুঃখের দিনগুলা সে কিরূপে কাটাইবে, তাহারই পরামর্শ করিতে করিতে তাহারা খানিকদূরে আসিয়া পড়িল।

মণি আগ্রহ দৃষ্টিতে কেবল তাহারই মুখের পানে চাহিয়া তাহার পাশে পাশে যাইতে ছিল, কোন কথা বলিল না। শেষ এই সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের দিনগুলা কাটিয়া আবার যখন তাহাদের দুজনে মিলন হইবে—সেই দিনটা কত সুখের হইবে মনে মনে কল্পনা করিয়া আগত বিচ্ছেদের দিন গুলা বিস্মৃত সাগরের তলদেশে কোথায় মিশিয়া গেল—তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না।

ক্রমে বিদায়ের দিন আসিল। একমাত্র সন্তানকে বিদায় দিতে স্নেহময়ী মাতার অন্তরাত্মা কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। তবুও পুত্রের মঙ্গল কামনায় নিঃশব্দে চোখের জল মুছিয়া সমস্ত গুছাইয়া দিতেছিলেন। এই সুযোগে নরেন মণির নিকট বিদায় লইবার জন্য ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মণি উদ্যান মধ্যে একটি কবরী বৃক্ষের তলে বসিয়া মালা গাঁথিতে ছিল। এলায়িত কেশগুচ্ছ তাহার পৃষ্ঠে বাহুযুগলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং চূর্ণ কুন্তল গুলি মৃদু বাতাসে উড়িয়া তাহার সুন্দর ললাটে খেলা করিতেছে। নরেন কিছুক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া সেই শোভা দেখিতেছিল, মনে মনে ভাবিল মণিকে কি সুন্দর দেখাইতেছে।" কিন্তু অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিবার সময় ছিল না। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকটস্থ হইয়া কহিল— "মণি, আমি এখুনি যাবো, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, আমায় যেন ভুলে যেও না মণি।" মণি মুহূর্ত্তে যেন জগৎ অন্ধকার দেখিল, সলজ্জ-দৃষ্টিতে একবার তার মুখের পানে চাহিয়া আবার চক্ষু নত করিয়া লইল। মনে অনেক কথা জাগিতেছে, কিন্তু কেন যে আজ হঠাৎ একটা লজ্জায় বাধ আসিয়া সমস্ত যেন ওলট পালট হইয়া গেল। কম্পিত কণ্ঠে কহিল "আবার কখন আসবে বলে যাও নরুদা।" একটু খানি থামিয়া আবার কহিল—"আমি

কিন্তু তোমারি আশায় থাকব।" তাহার দুইটি চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। নরেন আপনার কোঁচার' খুঁটে, তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া কহিল "আমি শীগ্‌গীর ফিরতে চেষ্টা করব মণি, কিন্তু যদিই দেরী হয়ে যায় আমি না আসা পর্য্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো, কেমন পারবে তো? এ মালা কার জন্যে মণি?" মনি সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িল, কোন কথা বলিল না। সেই সম্পূর্ণ মালা ছড়াটি তাহার পায়ের উপরে রাখিয়া ধীরে ধীরে প্রণাম করিল। নরেন তাহা উঠাইয়া লইয়া আনন্দ চিত্তে আপনার গলায় পরিল, এবং সস্নেহে মণির হাত-খানি ধরিয়া তবে আমি যাই মণি, মনে রেখ।" বলিতে বলিতে তাহারও চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। মনি কোন কথা বলিতে পারিল না, তাহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু রাশি গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। "ছিঃ কেঁদনা মণি, আবার আমি শীগ্‌গীর ফিরে আসব।" বলিয়া নরেন তাহার ললাটে সস্নেহে চুম্বন করিল। মণির লজ্জায় মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। নরেন দ্রুতপদে চলিয়া গেল। মণি অনেকক্ষণ তথায় বসিয়া কাঁদিল। শেষে চোখের জল মুছিয়া গৃহে ফিরিল।

ইহার পর তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কালীদাস বাবু পুত্রের চরিত্র সংশোধন হইবার জন্য এই সুদীর্ঘ কাল তাহাকে প্রবাসেই রাখিয়াছেন। সহরে আসিয়া নানাপ্রকার দেখিয়া শুনিয়া নরেনের মনের ক্লেশ অনেকটা দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু মণির সেই বিদায়কালীন সজল নেত্র দুটি সে কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই। সে এখন আর বালক নহে—সবই বুঝিতেছে, আবার ফিরিয়া যাইয়া মণির সহিত কি তেমনি ভাবে মিশিতে পারিবে? তবুও কে জানে কেন সে আশা টুকুকে সে অন্তর হইতে দূর করিতে পারিতেছেনা। যে আশাকে সে আজও আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, পিতা কি তাহাকে সম্মতি দান করিবেন? ভাবিয়া একটা নিরাশার ঘোর অন্ধকার তাহার সমস্ত বুকটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। কিন্তু পিতার সম্মতি না দিবার কারণ ত কিছুই নাই! তবে কেন অসম্মত হইবেন? সে মণিকে ছাড়িয়া অন্যকে বিবাহ করিবে না, করিতে পারেও না, তাহাদের একরকম বিবাহ হইয়া গিয়াছে, লোকে তাহা না জানিলেও তাহার অন্তর্য্যামী ত জানিতেছেন। কত বিনিদ্র-রজনী সেই সুখময় মধুর কল্পনা করিয়া সে কাটাইয়া দেয়।

কালীদাসবাবুর অর্থ সচ্ছলতা থাকায়, অর্থের অভাব তাহার ছিল না। অনেক গরীব সহপাঠি ছাত্রকে সে অর্থ সাহায্য করিত, এই সূত্রে অনেক

ছেলের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, এবং তাহার স্বভাবের গুণে দেশের সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। লেখা পড়ায় কৃতবিদ্য হইলে হয় ত পিতা সন্তুষ্ট হইয়া তাহার আশানুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন, ভাবিয়া সে পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। সে প্রশংসার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আই, এ পড়িতেছিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। এই সময় একদিন জানিতে পারা গেল যে, সে আই, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে আহ্লাদের সহিত পিতাকে সংবাদ দিয়া আশান্বিত হৃদয়ে দিন কাটিতেছিল।

আজ কত দিন সে মণিকে দেখে নাই, তাহার নিকট সে যেন একটা যুগ বলিয়াই মনে হইতেছিল। আসিবার সময় সে তাহাকে আশা দিয়াছিল যে, সে শীঘ্রই ফিরিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা ত হইল না। কে জানে মণি এখনও অবিবাহিত কি না? তাহার ভাবিতেও লজ্জা করে—সে বাল্যচপলতা বশতঃ কি গর্হিত কার্য্যই করিয়াছে, হয় ত তাহাতে নিজের এবং মণির জীবন কি ঘোর বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তাহাতে ত তাহার কোনই হাত ছিল না। কি একটা মোহের আকর্ষণে মণির দিকে তাহার হৃদয়টা টানিয়া লইয়াছিল, তখন সেও বালক মাত্র। হিতাহিত জ্ঞান ত তাহার ছিলই না, তা ছাড়া সে যে পিতার একান্ত বাধ্য, এ কথাটা ভাবিয়া দেখিবার মত অবসরও সে পায় নাই।

মণি এখন আর বালিকা নহে, সে ত্রয়োদশ বৎসরের কিশোরী! নরেনের বিদেশে গমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও খেলা ধূলা সবই ফুরাইয়া গিয়াছে। সে এখন সকালে ঠাকুমার পূজার ফুল তুলিয়া দেয়, এবং যথা সাধ্য ঠাকুমার কার্য্যের সাহায্য করে, বাকী সময়টুকু সে আপনার নির্জ্জন কক্ষে কাটাইয়া দেয়। বাড়ীর বাহিরে আসিতে এখন আর তাহাকে প্রায় দেখা যায় না। তাহার এই পরিবর্ত্তনে লোকে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। যে মণিকে প্রায় বাড়ীতে দেখা যাইত না, সে এখন কাহারও সহিত মিশিতে চায় না কেন? তাহাদের খেলার সাথীগুলিও যূথভ্রষ্ট হরিণের ন্যায় কে কোন্‌দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

লোকে বলে তাহার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মণির সে বিষয়ে কোন চিন্তা না থাকিলেও বৃদ্ধা ঠাকুমার কিন্তু আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে, কিরূপে এই কন্যাদায় হইতে তিনি উদ্ধার হইবেন। সেই প্রিয়

দর্শন বালক নরেনকে তিনিও অত্যন্ত স্নেহ করেন, একটা আশা যে তাঁহার অন্তরেও সময়ে সময়ে জাগিয়া উঠিত না—তাহা নহে, কিন্তু নরেন ধনীর সন্তান, অর্থপিপাসু কালীবাবু এই একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়া, আরও একটা নূতন জমিদারী ক্রয় করিবার সংকল্প করিয়া রাখিয়াছেন। এ স্থলে মাতৃ-পিতৃহীনা দরিদ্র বালিকা মণির সহিত বিবাহের উল্লেখ তাঁহার নিকট উত্থাপন করাই যে ধৃষ্টতা। কাজেই তাঁহার অন্তরের আশাটুকু অন্তরেই চাপা দিয়া, নানাস্থানে পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন।

যতই নরেনের আসিতে বিলম্ব হইতেছিল ততই মণি ভগ্ন হৃদয় হইয়া পড়িতেছিল। সে বলিয়া গিয়াছিল যে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে, আরও বলিয়াছিল যে তাহারই আশার অপেক্ষা করিতে। মণি ত সেই আশায় আজও দিন গণিতেছে, তাহারই অপেক্ষায় সে ত আজিও জীবন রাখিয়াছে। কিন্তু কই, সে ত আসিল না? সে কি তবে তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে? না তাহা অসম্ভব! সে আসিবে, নিশ্চয়ই আসিবে, সে তাহারই হৃদয়ের একমাত্র দেবতা। সে শুনিয়াছে নরেনের পিতার এ সম্বন্ধে মত নাই। তবে কি সে অন্যের নিকট হৃদয় বলি দিবে? সে যে তাহারই চরণে আপনার মন প্রাণ যাহা কিছু সবই নিবেদন করিয়া দিয়াছে, সেই নিবেদিত হৃদয় অন্যের করে আবার নূতন করিয়া কিরূপে নিবেদন করিবে? সে যতদিন পরেই ফিরিয়া আসুক—সেই আশাপথ চাহিয়া সে বসিয়া থাকিবে, অন্যের হইতে পারিবে না। কিন্তু নরেনের মাতার,—তাহাকে পুত্রবধূ রূপে পাইবার একান্ত ইচ্ছা। স্বামীর ভয়ে তিনি ত এ কথা ওষ্ঠাগ্রেও আনিতে পারিবেন না। তবে কি হইবে? ভাবিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল।

(৩)

পুত্রের উন্নতির সংবাদ পাইয়া সত্যই একদিন কালীবাবু তাহার মেসে আসিয়া দেখা দিলেন। এবং পুত্রের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতে দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। নরেন পিতার সহিত আবার বহুদিন পরে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। মাতা পুত্রের মলিন মুখ দেখিয়া ভাবিলেন "বিদেশের ক্লেশে ছেলের শরীর শুকিয়ে গেছে, দুদিন বাড়ী থাকিলেই সব সেরে যাবে এখন।"

নরেনের প্রশংসা দেশের সর্ব্বত্রে ছড়াইয়া পড়িল। যত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা তাহার প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া যেন চিলের মতই ছোঁ দিয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টায় ফিরিতেছিল। কিন্তু কালীবাবুর সেই একই ডাক শুনিয়া অনেকেই

পিছাইয়া পড়িল। পিতার মনোগত ভাব বুঝিয়া নরেন চিন্তিত হইয়া পড়িল "কি করা যায়।" কিরূপে সে মণি-রত্ন লাভ করিবে। সে প্রায় মাসাধিক হইল বাড়ী আসিয়াছে. কিন্তু মণির সহিত তাহার একদিনও দেখা হয় নাই। সে আরও শুনিল—মণির বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে তাহা কি সত্য? কই মণি ত তাহাকে কিছুই জানাইল না। এখন মণির সহিত দেখা করা তাহার নিতান্তই প্রয়োজন। ভাবিয়া সে একদিন বৈকালে তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া ডাকিল "কই গ ঠাকুমা?" "কে নরু, আয় ভাই বোস্। মণি, মাদুরখানা পেতে দেত দিদি।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধা নরেনের নিকটস্থ হইয়া বিস্ময়াপন্ন ভাবে আবার কহিলেন "ওমা, নরু এর মধ্যে কত বড় হয়ে পড়েছিস্ রে? তা আজ তিন চার বছর দেখিনি যে, বেশ ভাই বোস্।" মণি লজ্জাবনত মস্তকে ধীরে ধীরে আসিয়া মাদুর খানা পাতিয়া দিল, এবং কোন মতে আপনার দেহটাকে টানিয়া আনিয়া নরেনের পায়ের কাছে মাথাটা নোয়াইয়া মাটিতে ঠেকাইল। নরেন মুহূর্ত্তের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ দেখিয়া লইল। মণি ত আর বালিকা নাই? তাহার প্রতি অঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া সে কি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে। মণি দ্রুতপদে সরিয়া গেল। ঈষৎ হাসিয়া নরেন কহিল "আমাকে দেখে বুঝি মণির লজ্জা হচ্ছে? এখন বড় হয়েছে কিনা।" ঠাকুমা মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"হাঁ, মণি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কম্পিত স্বরে—জিজ্ঞাসা করিল "কোথা বিয়ের কথা বার্ত্তা হচ্চে ঠাকুমা?" ঠাকুমা ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিলেন "আর ভাই, পাত্র ত একটি পাওয়া গেছে, কিন্তু মেয়ে যে একেবারে বেঁকে বসেছে, কি করি বল।" নরেন সমস্তই বুঝিল, তাহারও মুখখানা সহসা মলিন হইয়া গেল। তাহা ঠাকুমার চক্ষু এড়াইল না, একটুখানি হাসিয়া ঠাকুমা কহিলেন "তুই যদি আমার এই স্নেহের দান গ্রহণ করতে পারতিস্ ভাই, তাহলে ত কথাই ছিল না, কিন্তু তা ত হবার নয়।" নরেন ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, একটু অতঃপর [illegible] য় উঠিয়া গেল।

দ্বারের পাশে মণি দাঁড়াইয়াছিল। নরেনের মুখের পানে চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নত করিয়া লইল। কতদিন পরে দেখা, কিন্তু কেহ কোন কথাই বলিতে পারিল না। অনেকক্ষণ নস্তব্ধতার পরে মণি আপনা হইতে জিজ্ঞাসা করিল "তাহলে আমি কি করব বলে যাও, সম্ভব আর তোমার সঙ্গে দেখা হইবে না। একটুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া নরেন কহিল "আমি এখনও কিছু ঠিক

করতে পারিনি মণি, আজ মাকে সব কথা বলে দেখি, পরে তোমাকে জানাব, মণির চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সস্নেহ কণ্ঠে নরেন—বলিল "কেঁদনা মণি, আমি যদি তোমাকে পাই—তবেই বিয়ে করব—নইলে এ জীবনে নয়, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" বলিয়া নরেন দ্রুতপদে চলিয়া গেল। সে ত একটু চিন্তিতা নহে, কিন্তু লোকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় কই?

সেই দিন রাত্রে আহারের পর নরেন মাতাকে সব কথা খুলিয়া বলিল। গৃহিণী বুঝিলেন নরেন মণিকে ছাড়া অন্যকে বিবাহ করিবে না। কাজে কাজেই কর্ত্তাকে না বলিলে চলিল না। কর্ত্তা সব শুনিয়া বলিলেন "ওসব ছেলেমানুষী আমি শুনতে চাই না, মণির বিয়ে দিয়ে দিচ্ছ, তা হলে ত হবে?" গৃহিণী ক্ষুন্ন হইয়া কহিলেন "না গো, না তুমি নরুকে জান ত? তা হলে সে আর বিয়েই করবে না, টাকা নিয়ে কি হবে বল ত? যদি ছেলেই না সুখী হল।" কর্ত্তা মৃদু হাসিয়া বিরক্তির স্বরে কহিলেন "কেন, মণি নইলে বুঝি ছেলে সুখী হবে না? ওসব নভেলিআনা রেখে দাও, আমি সব ঠিক করে দেব।" গৃহিণী আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

ইহার পরে কালীবাবু মণির বিবাহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। নানাস্থানে সন্ধানের পর একস্থানে সব ঠিক হইয়া গেল। কিন্তু তাহাদের একটু টাকার খাঁক্ বেশী, কালীদাসবাবু মনে মনে একটা যুক্তি আঁটিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন। নরেন ভাবিয়া কূল পাইতেছিল না।

মণি ঠাকুমার নিকট আবদার ধরিল—সে বিবাহ করিবে না। ঠাকুমা বিরক্ত হইয়া সস্নেহে অনুযোগের স্বরে কহিলেই—"পাঁচ জনের কাছে আমার মাথা হেঁট না করে কি তুই ছাড়বি নে মণি? তোর জ্বালায় আমি গলায় দড়ি দে মরব কি?" তিনি মুখে এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাহারও অন্তরটা যেন কি একটা বেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সত্বরে তথা হইতে উঠিয়া গিয়া অঞ্চলে চোখের জল মুছিলেন। আজ যদি শরৎ জীবিত থাকত, তা হলে কালীদাসের পুত্রকে পাওয়া এখন দুঃসাধ্য হইত না। তাঁহার আদরের মাণিককে নরেনের হস্তে সস্নেহে দান করিয়া তিনি কত যে সুখী হইতেন, তাহা কেবল তাঁহার অন্তর্যামীই জানিতেছেন। মণির এক বিন্দু চোখের জল যে তাঁহার বুকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতই বিঁধিতেছে তাহা অন্যে কি বুঝিবে!

(৪)

যথাসময়ে পাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। গোলমালের মধ্যে মণি যেন চৈতন্যহীণার মত শয্যায় ঢলিয়া পড়িল। ঠাকুমার শত চীৎকারে সহস্র অনুরোধেও সে উঠিতে পারিল না। বাল্যস্মৃতি তাহার অন্তরে লইয়া তাহার হৃদয়টা যেন জ্বলিয়া যাইতেছিল। তাহার সে সুখ স্বপ্ন যদি এ জন্মের মত ফুরাইয়া গেল, তবে তাহার স্মৃতিটুকু কেন রহিয়া গেল? সে ত প্রতারণা শিক্ষা করে নাই! যে হৃদয়ের বিনিময় একবার এ জীবনের মত হইয়া গিয়াছে—তাহা আবার অপরের হস্তে কিরূপে দান করিবে? সেই দেবতার আসনে, অন্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, হৃদয়ের আগুন চাপা দিয়া কি প্রকারে অশেষ সন্তোষ সাধন করিতে হয় তাহা ত সে জানে না, তাহার সবই যদি শেষ হইয়া গেল—তবে জীবন রহিল কেন? ঠাকুমা কত বুঝাইলেন, কিন্তু তাহার মন বুঝিল না, সে স্পন্দহীন অসাড়ের মত পড়িয়া রহিল। ঠাকুমারও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল, কিন্তু মণির অকল্যান আশঙ্কায় তিনি তাহা সজোরে চক্ষের মধ্যেই রোধ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

নরেন যাইয়া একটা নির্জ্জন কক্ষে আশ্রয় লইল। বাদ্যের শব্দ যেন তাহারই পক্ষে সশব্দে আঘাত করিতেছিল, আহত বক্ষ দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া সে শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। সে দিনও যে সে মণিকে সম্পূর্ণ আশা দিয়া আসিয়াছে, সে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোন দিনই করিবে না। কিন্তু মণির জীবনের সুখ সেই ত নষ্ট করিল? অনুতাপের আগুনে যেন তাহার অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছিল, তাহার দুই চক্ষু হইতে বিন্দুর পর বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িয়া বালিসটাকে সিক্ত করিয়া দিতেছিল। পিতার প্রতি একটু অভিমান আসিয়া তাহার হৃদয়টাকে অধিকার করিয়া বসিল। অর্থ কি মানুষের এতই প্রার্থনীয়? যাক্ সে বিচার করিবার সে কে? তিনি তাহার পিতা—পূজনীয়, তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তাহার তাহাই করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সে মনকে কতকটা শান্ত করিল।

কালীবাবু ডাকিয়া বলিলেন, "কন্যা সম্প্রদান হয়ে যাক্, পরে দেনা পাওনা সব মিটাইয়া দিবেন। কারণ লগ্ন বহিয়া যাইতেছে।" কিন্তু বর কর্ত্তার লক্ষ্য শুধু ঐ দেনা পাওনার উপরে, লগ্ন বহিয়া যাউক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, তিনি অগ্রেই সেটা চুকাইয়া লইতে চাহেন। ক্রমে উভয়ে এই বিষয় লইয়া বেশ একটু তর্ক হইয়া গেল। বরকর্ত্তা চটিয়া আগুন হইলেন,

"বর উঠাও, আমি বিয়ে দেব না, এমন ছোট লোক জানলে কে বিয়ে দিতে আসতো।" বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। দেখিয়া বরযাত্রি সব উঠিয়া গেল। কালীবাবুও তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিলেন, তাঁহাকে ছোট-লোক বলে এমন লোক এদেশের মধ্যে নাই। "যাক্ বেটারা, অন্য পাত্র এনে এই লগ্নেই বিয়ে দেব, বেটা ভেবেচে—ছেলের বিয়ে দিয়ে, কি একটা তালুক মুলুক কিনবে।" সৌভাগ্য বশতঃ তাঁহার কন্যা ছিল না, এরূপ অপমান নত-মস্তকে সহ্য করিতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না, কাজেই ক্রোধটা তাঁহারও অতি-রিক্ত হইয়া পড়িল। সেই ভিড়ের মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিল "তবে আপনার ছেলের সঙ্গেই বিয়েটা দিন্‌না মশাই।" কথাটা তাঁহার অন্তরে আঘাত করিল, জেদের বশে কহিলেন "তা পারিনা নাকি, কে কথা কয় রে?" আর কোন উত্তর পাওয়া গেল না। যে বলিয়াছিল—সে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। প্রতিবেশী রামহরি বাবু বলিলেন "কাজটা ভাল হলো না কালী বাবু, এখন উপায়?" "ভাবনা কি? এখুনি—এই লগ্নেই বিয়ে দেব।" বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

মুহূর্ত্তের মধ্যে কালীবাবু নূতন পাত্রকে আনিয়া ছাঁদনা তলায় বসাইয়া দিলেন। চৈতন্যশূন্য মণিকে ধরিয়া আনিয়া কোনরূপে কন্যা সম্প্রদান হইয়া গেল। আবার ধরাধরি করিয়া লইয়া গিয়া বরকনেকে বাসর গৃহে রাখিয়া আসিল। ঠাকুমা আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া, পাত্রের প্রতি চাহিয়াই আহ্লাদে তাঁহার চোখে জল আসিল। মণির হাতখানি ধরিয়া বরের হস্তের মধ্যে স্থাপিত করিয়া কহিলেন "আমার স্নেহের দান গ্রহণ কর ভাই, দেখিস্ ভাই যেন মণি আমার কখন অন্তরে ব্যথা না পায়।" ঠাকুমার মুখের প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিতে চাহিয়া বর ঈষৎ হাসিল, কোন উত্তর দিল না। ঠাকুমার বাক্যগুলা যেন স্বপ্নের মতই মণির কর্ণে প্রবেশ করিল। সে ভয়ে ভয়ে অর্দ্ধদৃষ্টিতে বরের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। একি? এ যে তাহারই চিরবাঞ্ছিত—বড় ভালবাসার পাত্র নরেন! সেকি স্বপ্ন দেখিতেছে? সে দুই হস্তে চক্ষু রগড়াইয়া আবারও চাহিয়া দেখিল, না, এত স্বপ্ন নহে! এ মুখ যে তাহার হৃদয়ের প্রতি অস্থিতে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা কি ভুল হইতে পারে? তাহার দুটি চক্ষুতে আনন্দের অশ্রু ছাপাইয়া উঠিল।

নিস্তব্ধ রাত্রি, দিবসের কোলাহল তখন একবারে থামিয়া গিয়াছে। নির্ম্মল গগণে চাঁদ আপনার কিরণরাশি বিকীরণ করিয়া জগতের বক্ষে পোড়োবাড়ী ভাঙ্গা বেড়া পর্য্যন্ত আপনার আলোকরাশি ঢালিয়া দিয়া যেন স্বর্গরূপে প্রতিভাত করিয়া তুলিয়াছেন। গবাক্ষ পথে জোৎস্না আসিয়া মণির মুখে চোখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নরেন সেই বহু [illegible] বকুল পুষ্পের শুষ্ক মালা ছড়াটি বাহির করিয়া ধীরে ধীরে মণির গলায় [illegible] দিয়া সস্নেহে তাহার ললাটে চুম্বন করিল।

শ্রীবিনোদ [illegible]
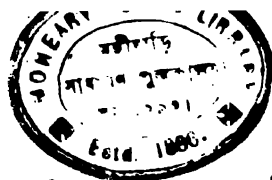
গল্পলহরী

ষষ্ঠ বর্ষ, } অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ { ৮ম সংখ্যা

মুস্কিল-আসান

[লেখক—শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী]

জীবনে মনোভঙ্গের কষ্ট মানুষকে অনেক সহিতে হয়। কিন্তু সব চেয়ে বড় দুঃখের কারণ ঘটে তখন—যখন আজীবনের সঞ্চিত ক্ষুদ্র আশাটুকুও চিরকালের মত ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়, তখন নিতান্ত ভাল ছেলেও দুষ্টের চূড়ান্ত হইয়া উঠে। তেমনি নরেশকে মুখের উপর এই প্রথম জবাব করিতে শুনিয়া হরিগোপাল বাবু খানিকক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। শেষে একটুখানি আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন—

"তা হলে আমি আর তাদের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না বাপু, তুমি নিজে গিয়ে জ্ঞানবাবুর কাছে টাকাগুলো ফেরৎ দিয়ে বলে এস যে—আমার উপর বাপ-মা-জ্যাঠা-খুড়োর কোন অধিকার নেই; তারা সব মিথ্যেবাদী, জন্তু জানোয়ার, তাই আমার মত দিগ্‌গজ লোকের অভিভাবকত্ব দাবি করে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও জেনে রাখ যে—অমন মহাপুরুষের আর আমাদের মত অধমদের ঘরে স্থান নেই।"

বলিয়া চোখ মুখ লাল করিয়া পিতা যখন মাটীর দিকে চাহিয়া নীরবে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন, অথচ টাকাগুলো আনিয়া ফেরৎ দিবার কোনও লক্ষণই প্রকাশ করিলেন না—পুত্র তখন নীরবে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে একটুখানি নত মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

তিরিশ টাকা মাহিনার ইস্কুলমাষ্টারী সম্বল লইয়া হরিগোপাল যখন নরেশকে পড়াইবার জন্ত কলিকাতার একটা দরিদ্র বস্তির ভিতরে একখানা খোলার ঘরে

বাসা লইয়া পুত্রকে কাছে আনিয়া রাখিলেন, তখন সে ইংরাজী ইস্কুলের থার্ডক্লাশে পড়িত, আর তার ছোট ভাই জীবেশ পড়িত—ষষ্ঠ শ্রেণীতে। বাপ-ভাইয়ের কাছ ছাড়া হইয়া দেশে একলা থাকিয়া ক্রমে ক্রমে সে লেখাপড়ার চেয়ে অন্য বিষয়ে বেশী মন দিয়া মাটী হইয়া যাইতেছে দেখিয়া মাস ছয়েক পরে যখন তাহাকেও কলিকাতার বাসায় আনিয়া রাখিতে হইল, তখন কিন্তু আর খরচে কুলাইল না। কাজেই হরিগোপালকে তো সকাল-বিকাল ছেলে পড়ানো জোগাড় করিয়া লইতেই হইল—অধিকন্তু একটা বেলায়, পাঁচটা টাকার লোভে নরেশকেও একটি ছোট ছেলের টিউশনী জুটাইয়া না দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ভাই দুটী মিলিয়া অধিকাংশ দিনই তিনজনার ভাতে-ভাত রাঁধিয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিল।

এই রকম করিয়া বছর দুই কাটাইয়া নরেশ যখন প্রথম শ্রেণীতে উঠিল—তখন মেয়ের বিবাহ দিতে হরিগোপাল একেবারে হদ্দমুদ্দ নাকাল হইয়া যা কিছু ছিল সব খরচ করিয়া, নরেশের পাশের আশায় মনে মনে মনে দাঁও কষিতে লাগিলেন।

পাশও করিল সে ফাষ্ট ডিভিসানেই বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বাপের অত-বড় দাঁওয়ের আশাটাও মাটী করিয়া দিতে ছাড়িল না।

২

যে বাড়ীতে নীচের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া নরেশ রোজ সন্ধ্যা বেলায় ছেলে পড়াইত, সেই ঘরের পাশেই একখানা ছোট অন্ধকার ঘর ভাড়া লইয়া এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ঘরের দরিদ্র বিধবা তাঁহার দশ বছর বয়সের অনূঢ়া কন্যা লইয়া বাস করিতেন। কাছাকাছি আর একখানা ছোট বাড়ীতে তাঁহার সামান্য চাকুরে ভাই পরিবার লইয়া থাকিতেন—তিনিই ছিলেন অভিভাবক। বিধবার পুঁজিপাটা যা যৎসামান্য ছিল তাহাতে কোন রকমে মা-মেয়ের সংসার চলিয়া যাইত বটে, কিন্তু লক্ষ্মীর বিবাহের উপায় ছিল না।

তা মেয়েটি নামে এবং স্বভাবে যাই হউক, চেহারায় তার ধার দিয়াও যাইতে পারে নাই—সুতরাং মায়েরও ভাবনার অন্ত ছিল না, কিন্তু কেমন করিয়া যে এই কালো মেয়েটি সারা বিশ্বের অনন্ত-সৌন্দর্য্য হইয়া নরেশের চখের উপরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা যিনি নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ঘটকালী জুটাইয়া দিয়া থাকেন—তিনি ছাড়া আর কেউ বলিতে পারে না।

সন্তান যেমনই হউক বাপমার চোখে পরের ছেলের চেয়ে সুন্দর বলিয়াই বোধ

হয়। কিন্তু লক্ষ্মীর মায়ের ততটা না হইলেও—যখন কেহ তাহাকে ভাল বলিয়া সুখ্যাতি করিতেন—তখন আহ্লাদে তাহাকে আপনার ভাবিয়া অমনি পোড়া অদৃষ্টের দুঃখ কাহিনী গাহিতে সুরু করিয়া দিতেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর বিবাহের কথাটাও আপনিই উঠিয়া পড়িত। তখন মেয়েকে টানিয়া আনিয়া, দেখাইয়া, একটি ছেলের সন্ধান করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ না করিয়া ছাড়িতেন না। তেমনি এক সময়ে নরেশের কথায় তাঁহার মনে মনে ভারি একটা আশা জাগিয়া ছিল।

নরেশ রোজ পড়াইতে আসিয়া, 'মাসীমা বলিয়া তাঁহার ঘরে দুদণ্ড না বসিয়া; লজ্জায় জড়সড় লক্ষ্মীকে বারম্বার মায়ের ধমক খাওয়াইয়া, দুটো পান না সাজাইয়া লইয়া ছাড়িত না।

একজামিন দিয়া একদিন সন্ধ্যায় আসিয়া নরেশ কহিল—"শুনেছ মাসী-মা বাবা বলছেন পাশ হলে, পড়া ছাড়িয়ে পুলিশের চাকরীতে ভর্ত্তি করে দেবেন।"

বলিয়া উদাসভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিল। লক্ষ্মীর মা একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন—

"তা মন্দ কি বাবা, দারোগা হয়ে বসতে পারলে যে—"

"হ্যাঁ ছাই!" বলিয়া নরেশ তাড়াতাড়ি দৃঢ়স্বরে কহিল—"দারোগাই বল, আর যাই বল, পুলিশে যেতে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই। পড়বো আমি, আর একটা পাশ করে মেডিক্যাল কলেজে পড়ে ডাক্তার হব।"

"তা বাবা, পারলে তার চাইতে কি আছে? গৌরব বল, মান বল, পয়সা বল—ডাক্তারির মত এমন আর কিছুতে নেই।"

ঠিক এই কথাটাই মায়ের কাছে লক্ষ্মীকে একদিন বলিতে শুনিয়া নরেশ ডাক্তার হইবে বলিয়া মনে মনে ঠিক করিয়া বসিয়াছিল। উৎসাহে বলিয়া উঠিল—"তা না তো কি?"

"কিন্তু বাবা, তাতে যে শুনতে পাই খরচ ঢের—সব্বাই কি পারে! অবস্থা বুঝে তো কাজ করতে হয়। তোমার বাবা—"

বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি উত্তেজিত ভাবে নরেশ কহিল—"বাবার কি? গোড়ায় একটু কষ্ট সয়ে শেষে যদি বড় হওয়া যায়, তা না চায় কে? কিন্তু তাঁর সবই উল্‌টো—ভবিষ্যতের জন্যে তাঁর আর তর্ সয়না! তবু যদি আমার জন্য খরচ করতে হত?"

"পাগল ছেলে!" বলিয়া একটু হাসিয়া লক্ষ্মীর মা বলিলেন—

"তিনি না করলে আর এত বড়টা হলে কি করে ?"

"সে অমন সবাই করে থাকে—তা বলে ছেলের মাথা খেতে কেউ চায় না। আমার লেখা পড়ায় তাঁর এক পয়সা লাগে নাকি ? ইস্কুলে তো ফ্রি,—বই টই সব চেয়ে চিন্তে আনা। আমার টিউশানী থেকে কাপড়-জামা-জুতো হয়ে বরং আরো কিছু বাঁচে। তার ওপর দুবেলা হাঁড়ী ঠেলে বাসার খরচ অর্দ্ধেক সাশ্রয় করে দিই আমরা দু'ভাই। তবু আমার পড়াশুনা—যেন তাঁর চক্ষু শূল।"

"কেন, কেন হয়েছে কি ? অমন করে কি গুরুজনকে বলতে আছে !"

"যতদিন যে রকম চলেন ততদিন পায়ের ধুলো চাটি, নইলে অন্যায় অবিচার হলে ভগবানকে শুদ্ধ বাদ দিই না—তা গুরুজন ! মেয়ের বিয়ে দে ফতুর হয়েছেন বলে সে আমার গলায় কোপ ঝেড়ে উশুল করে নেবেন—তা সইবো কেন ?"

"তা আজ হয়েছে কি—অমন গরম হয়ে রয়েছ কেন ?"

"গরম হবার কথা নয় মাসীমা,বলদেখি—এখন জ্ঞান দারোগার মেয়ের সঙ্গে আমার বে দিয়ে লেখাপড়া ছাড়িয়ে পুলিশে ঢোকাবে বলে পাঁচশো টাকা আগাম দাদন খেয়ে বসেছেন শুনছি।"

লক্ষ্মীর মা হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেলেন। একটুখানি পরে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—

"না বাবা, বাপ-মার কথার অবাধ্য হয়ে তাঁদের অপমান করবার দরকার নেই। আমাদের বরাতে যা আছে তাই হবে।"

বলিয়া আর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু নরেশ উত্তেজিত হইয়া তাড়াতাড়ি কহিল—

"না মাসীমা—তুমি কিছু মনে করোনা, আমি সে কিছুতেই পারবো না। পাকা কথা তোমাকে দিইছি—তুমি নিশ্চিন্তি হয়ে থাক, দিন কতক আমার মুখ চেয়ে সবুর কর—নইলে আমি পাগল হয়ে যাব।"

বলিয়াই ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

৩

জ্ঞানবাবু নোটের তাড়াটা জোর করিয়া হরিগোপালের হাতে ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন—

অমন উতলা হয়ে হাল ছেড়ে দিলে সব মাটী হবে এখন। আজ-

কালকার ছেলেদের রকমই ওই, আমি খুব জানি। ক্লাশ-ফ্রেণ্ড তুমি—একন্যে আমার কাছে এত কিন্তু হচ্ছ কেন? আগে তো তাকে নিজে এসে একবার মেয়ে দেখে যেতে বল। সে নিজের চক্ষে আগে একবার দেখুক এসে. তার পর বোঝা পড়া যাবে?"

"কাকে বলবো—কোথায় সে?"

"কেন?" বলিয়া জ্ঞানবাবু আশ্চর্য্য হইয়া চাহিলেন।

"তবে আর বলছি কি?"

বলিয়া হরিগোপালবাবু হতাশভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—

"সে দিন রেগে বলেছিলুম যে আমরা পাকাপাকি কথা করে ফেলেছি, এখন যদি বে না কর, এতই স্বাধীন হয়ে থাক তো—নিজের হিল্লে নিজে দেখে নাও, এ বাড়ীতে তোমার জায়গা নেই। তা সে দিন থেকে সেই যে কোথায় সরেছে আর সংবাদটি পর্য্যন্ত নেই।"

বলিতে বলিতে হরিগোপালের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল, চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। জ্ঞানবাবু একটুখানি নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কোথায় না টিউশনী করতো—সেখানে খবর নিয়েছ?"

"সেই তো গোল। এখন শুনতে পাচ্ছি যে, তাদের বাড়ীর কে এক ভাড়াটে বিধবা মাগীর একটা কদাকার মেয়ে আছে, তাকে দেখে ক্ষেপে উঠেছেন, এ্যাদ্দিন ধরে তলে তলে না কি কোর্টসিপ চলে এসেছে এখন বে করবে বলে পাকাপাকি করে ফেলেছে?"

"সে কি?" বলিয়াই জ্ঞানবাবু একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন!

"কাউকে না জানিয়ে—জাতকুলের খবর না নিয়ে—নিজেই একেবারে—

"তবে আর বলছি কি?"

বলিয়া উত্তেজিত ভাবে বাধা দিয়া হরিগোপাল সুরু করিলেন,—"এসব আমাদের বরাতের দোষ, আর আজকাল-কার শিক্ষার দোষ। দেশে এখন উচ্চশিক্ষার স্রোত চলেছে, কিন্তু তাতে ফল হচ্ছে কি? না—ছেলেপুলেরা সর্ব্বরকমে কেবল উচ্ছৃঙ্খল হয়েই উঠছে, তাকি কর্ত্তারা কেউ একবার ভেবে দেখছেন, প্রত্যেক ইস্কুল কালেজে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে দস্তর মত নীতি-শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা না করলে আর উপায় নেই। এই রকম যে কত শত কুলাঙ্গার কত রকমে মা বাপের মুখ উজ্জ্বল করছে, কে জানে!"

বলিতে বলিতে হঠাৎ যেন নিস্তেজ হইয়া নীরব হইলেন। জ্ঞানবাবু আশ্বাস দিয়া কহিলেন—

"যাবে কোথায়, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, ফিরে আসতেই হবে বাছাধনকে। আর যদি সত্যিই পড়বার ইচ্ছা থাকে তো—সব কালেজ খুলে গেল, আর তো চুপ করে বসে থাকতে পারবে না ?"

"তুমিও, ক্ষেপেছ ? যথার্থই যার পড়বার ইচ্ছা থাকে সে কি আর বাপ-মার সঙ্গে এমন ধারা করতে পারে ? আমার তো মনে হয় ওসব কেবল আমাদের দেখাবার জন্যে ?"

"তাও কি হয় ? ও তাহলে করবে কি,—একটা কিছুতো ভেবেছে ?"

"এই দশটা টাকা স্কলারশিপ পাবে—তার উপর আর গোটা পনেরো টাকার টিউশানী জোগাড় করে নে হয়তো—"

জ্ঞানবাবু বাধা দিয়া দুঃখের সহিত বলিলেন—

"এমন ভাল ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাবে হে ?"

হরিগোপাল উত্তেজিত ভাবে জবাব করিলেন—

"ভালছেলে বল কাকে ? পড়াশুনায় অমন প্রথম প্রথম অনেকেই ভাল ফল দেখায়, কিন্তু শেষে বকার চূড়ান্ত হয়ে এমন হয়ে যায় যে—মা-বাপের আর মুখ দেখাবার জো থাকেনা। এও—তাই। স্বভাব ভাল না হলে—লেখা-পড়ায় যতই দিগ্‌গজ হোক না—তাকে ভগবানের অভিশাপ বলে মনে করি।"

"আচ্ছা রোস" বলিয়া কি ভাবিয়া জ্ঞানবাবু পকেট হইতে একখানা হ্যাণ্ডবিল বাহির করিয়া চোখ বুলাইয়া কহিলেন—

"আচ্ছা আমি একবার খোঁজ করে, বেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি—মোদ্দাৎ তুমি এখন ও রকম নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিও না।" ঘরে এলে বকাবকি না করে বুঝিয়ে সুজিয়ে একবার এখানে পাঠিয়ে দিও।"

"ঘরে এলে তো ?" বলিয়া আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হরিগোপাল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—ওখানা কি ?"

"পড়ে দেখ" বলিয়া কাগজখানা হাতে দিয়া জ্ঞানবাবু হাসিয়া উঠিলেন।

হরিগোপাল বাবু পড়িতে লাগিলেন।

আর ভয় নাই ! আর ভয় নাই ! !

কন্যাদায়গ্রস্ত নিরুপায় মা বাপের পরিত্রাণকারী

মুস্কিল আসান-সমবায়।

কতিপয় কৃতবিদ্য বঙ্গীয় যুবকগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সমিতিতে

সকল জাতীয় স্বাধীনচেতা, দেশহিতৈষী, উদার প্রকৃতি সম্পন্ন কৃতবিদ্য যুবক আছেন। বিনা পয়সায় এমন কি নিজের ব্যয়ে দরিদ্র অনাথ নিরুপায় পিতা-মাতার অরক্ষণীয়া কন্যা বিবাহ করিতে প্রস্তুত। ছেলের কসাই বাপের হাত হইতে দরিদ্র গৃহস্থকে রক্ষা করিবার জন্য—পতিত বঙ্গ-সমাজকে উদ্ধার করিবার জন্য—দেশের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য এই সমিতির সৃষ্টি! কন্যাদায় গ্রস্ত দরিদ্র বঙ্গবাসী সত্বর হউন—অগ্রিম কেবলমাত্র দশ টাকা জমা দিয়া আবেদন করুন। আর কোন খরচ লাগিবেনা, ইহাই প্রথম ও শেষ। এক সপ্তাহের মধ্যেই বিবাহ চুকিয়া যাইবে।

—নং—ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৪

এক সপ্তাহ পরে লক্ষ্মীর মামা মতিবোস্ আসিয়া ভগ্নির কাছে চোট্‌পাট্ করিয়া বলিল—

"এ কি সর্ব্বনাশ করে বসেছ দিদি? তোমাদের জন্যে কি শেষটা জাতকুল সব খুইয়ে চাকরিটুকু পর্য্যন্ত খোয়াতে হয়?"

লক্ষ্মীর মা একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেন কেন—কি হয়েছে ভাই?"

"হয়েছে আমার গুষ্টির পিণ্ডি—সর্ব্বনাশের চূড়ান্ত? বাড়ীর পাশেই রয়েছি আমি—একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত না করে, কোন্ লক্ষ্মীছাড়া বকা বদমাইস্ ইতরের সঙ্গে মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলেছ?"

লক্ষ্মীর মাতার বুকের ভিতরটা অকস্মাৎ দুরু দুরু করিয়া উঠিল; নিরতিশয় আতঙ্কে মুখ শুকাইল, কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেন, কার সঙ্গে ঠিক হয়েছে?"

"তা তোমরাই জান।" বলিয়া মতি রুক্ষস্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

"বাইরে ঢিঢি—সমাজে মুখ দেখানো ভার! কে মাষ্টার আস্‌তো এ বাড়ীতে ছেলে পড়াতে, তার কাছে নাকি মেয়েকে দিবা রাত্তির পাঠিয়ে পাঠিয়ে মন ভুলিয়ে বশ করে নেছ? এ যে বেশ্যা মাগীদেরও বেহদ্দ হল?"—

"ওমা, ছিঃ ছিঃ—কি ঘেন্নার কথা?" বলিয়া লক্ষ্মীর মাতা বিরস মুখে আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন—বাধা দিয়া তেমনি উত্তেজিত ভাবে ভ্রাতা কহিল—

"গলায় দড়ি দে মরা উচিত। পুলিশের ইনেস্‌পেক্টার জ্ঞানবাবুর মেয়ের

সঙ্গে তার সব পাকাপাকি—টাকাকড়ি পর্য্যন্ত লেন-দেন চুকে গেছে। তোমরা এখন তাকে লুকিয়ে বশ করে ভুলিয়ে নে যে কাজটি করতে বসেছ—তাতে যে সবাইকার হাতে দড়ি পড়বার যোগাড়। জ্ঞানবাবু আমায় ডাকিয়ে নে সব বল্লেন—তিনি অল্পে ছাড়বেন না—ছোঁড়া নাকি এর মধ্যে কবে দেশে গিয়ে তার বোনের একখানা গয়না ভুলিয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছে ?"

"ওমা, কি সর্ব্বনাশ ?"

"এখুনি সর্ব্বনাশের হয়েছে কি ? কোন দিন পুলিশ এসে সব্বায়ের হাতে দড়ি দে টেনে না নিয়ে গেলে বাপের ভাগ্যি বলে মেনো। জ্ঞানবাবু তো এক রকম স্পষ্টই বলে গেলেন—যে তোমাদের মায়ে ঝিয়ের মতলবেই নাকি এ কাণ্ড হয়েছে !"

"ওমা যাব কোথায় ?" বলিয়া লক্ষ্মীর মাতা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ইচ্ছা হইতে লাগিল যে মেয়েটার গলা টিপিয়া মরিয়া নিজে আত্ম-হত্যা করেন। ভয়ে, লজ্জায়, ঘৃণায় মুখখানা মড়ার মত শাদা হইয়া গেল। দেখিয়া একটু নরম হইয়া মতি কহিল—

"শোন, যদি বাঁচতে চাও এক কাজ কর। তিনি এক পরামর্শ বলে গেছেন, যথাসাধ্য করবেন—আমি সে সব ঠিক করে এসে তোমায় বলবো। সে ছোঁড়া এখানে পড়াতে এলে চুপি চুপি আমায় গে খবর দিও। লক্ষ্মীকে এখন দু'পাঁচ দিনের জন্যে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে চল্লুম।"

বলিয়া ভাগ্নীকে লইয়া মাতুল চলিয়া গেল।

৫

পরদিন বিকালবেলা মুস্কিল আসান সমবায়ের ঘরে সভ্যগণের কাছে দশটাকা জমা দিয়া দরিদ্র মতি বোস একেবারে কাঁদিয়া পড়িল—

"দোহাই বাবুরা—বাপ-খেকো মেয়ে, আপনারা না দয়া করলে কায়স্থের জাত যায় ?"

সহকারী-সম্পাদক নরেশ তাড়াতাড়ি কহিল—"দয়া কি মশাই—এই আমাদের কর্ত্তব্য, এই জন্যেই আমরা এই পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেছি। তবে কিনা—বুঝতেই তো পারছেন সে বুড়োর দল সবাই আমাদের শত্রু—স্বার্থে ঘা লেগেছে কিনা ? কাজেই আমাদের কষ্ট বড় অল্প—তাই এখনো খরচ পত্তর করে কাজে তেমন ফল দেখাতে পারছিনে।"

মতি বোস তাড়াতাড়ি কহিল—"সে কি মশাই, এই যা করেছেন তাই

আশার অতিরিক্ত; এর উপর আবার নিজেরা খরচ পত্তর করবেন কি? সে সব আমাদের ভার; বঞ্চিতও একেবারে হবেন না—যথাসাধ্য দেব। তবে কিনা নেহাৎ গরীব, দিন চলা ভার—এটা ওটা কোট্ ধরে বস্‌লে পারি কেমন করে? তাই মশাই—এ পর্য্যন্ত দোর দোর ঘুরেও একটা হিল্লে লাগাতে পারলুম না—বাড়ন্ত মেয়ে, এখন জাত যাবার দাখিল।"

"বুঝুন তাহলে সমাজের অবস্থা। লেখাপড়া শিখে ছেলেরা যদি এ বিষয়ে বাপের মতে না চল্লো তো তাঁরা অমনি ক্ষেপে উঠলেন, ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন, এতে আর দেশ রসাতলে যাবেনা? সেই জন্যেই তো আমরা থাকতে না পেরে কেবল দেশের উন্নতির জন্য গরীবের মুখ চেয়ে এই সমিতি খুলেছি। তা আমার সঙ্গে আর হবেনা, একজনের সঙ্গে আমার ঠিকঠাক হয়েহ রয়েছে। আমাদের সম্পাদক বিপিন মিত্তির—এবার ইণ্টার মিডিয়েট পাশ করেছেন, তিনিই বে করবেন, আর এইটেই হবে সমিতির প্রথম কার্য্য—দ্বিতীয় আমার।"

বলিয়া নরেশ গর্ব্বভাবে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। মনে মনে ঈষৎ হাসিয়া মতি বোস কহিলেন—"তাহলে আজই মেয়ে দেখে একটা পাকা পাক করে ফেল্লে গরীব কাঙ্গাল আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ধীরেসুস্থে জোগাড় করতে পারি।"

"মেয়ে আর দেখবে কি, নেহাৎ কানা খোঁড়া না হলেই হল। যখন সমাজের উপকারের জন্যে—"

বাধা দিয়া মতিবোস তাড়াতাড়ি কহিল—"ধন্য আপনারা, মশাই লোক! তা সত্যি বলতে কি, মেয়ে আমাদের পটের ছবি নয়; তবে মুখশ্রী ভাল, আর গেরস্থালি—কাজ কর্ম্মে—"

"ব্যস—ব্যস—যথেষ্ট" বলিয়া নরেশ উৎসাহ দিয়া কহিল—"তা, যখন নেহাৎ বলছেন একটু বসুন, বিপিন এলেই গিয়ে মেয়ে দেখে আসা যাবে।"

সেই রাত্রেই মেয়ে দেখিয়া আসিয়া সমিতি গৃহে সভ্যগণ জড় হইলে নরেশ বিপিনকে কহিল "ভগবানের বিধান দেখ, আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য; আমার শ্বশুরের নাম যা, তোর শ্বশুরেরও তাই, তিনিও মৃত, ইনিও মৃত, স্ত্রীর নামও দুজনকারই লক্ষ্মী; খালি যা চেহারার আকাশ পাতাল তফাৎ।"

বলিয়া বিপিন হাসিল। নরেশও হাসিয়া জবাব করিল, "গরীবের রাংই সোনা।"

"কিন্তু ভাই, ওরকম এগ্রিমেণ্ট লিখে দেওয়া কি ভাল হল?"

"কেন দোষ কি?" বলিয়া নরেশ মাতব্বরের মত কহিল, "প্রথম প্রথম

এখন দু চারটে না করলে লোকের আমাদের উপর বিশ্বাস হবে কেন? আর তোর লক্ষ্মী যখন অমন সুন্দরী, তখন তুই আর মুখ নাড়িস্ নি।"

পাঁচদিন পরে মতিবোসের বাড়ী 'মুস্কিল-আসানের' সভ্যগণ মিলিয়া, বিপিনের বিবাহ দিতে গিয়া—কেহ কিছু সন্দেহ না করিলেও—দেখিয়া শুনিয়া নরেশের মনটা কেমন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ কন্যা দান করিতে বসিয়াছিলেন যিনি—লম্বা ঘোমটায় তাঁহার মুখখানা ঢাকা থাকিলেও এবং অতি নিম্নস্বরে মন্ত্রপাঠ করিলেও—তাঁহাকে দেখিয়া নরেশের মনে ঘোরতর সন্দেহ হইল। তখন কন্যার প্রতি যতই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল—ততই সে সন্দেহ আরো প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু অনেকগুলি সমবেত বয়স্থ ভদ্রলোকের সাক্ষাতে হঠাৎ কিছু বলিতে পারিল না।

শুভদৃষ্টির সময়ে বিপিনের মনেও হঠাৎ কেমন একটু খট্‌কা লাগিল। কিন্তু তখনি মেয়ের মাসী বলিয়া উঠিল—

"আহা উপোসে উৎকণ্ঠায় বাছা একদিনেই যেন কালীমাড়া হয়ে গেছে—নে বাপু শীগ্‌গির করে তোরা স্ত্রী-আচার সেরে নে।"

এতক্ষণ বরযাত্রগণ বিপুল চেষ্টা করিয়াও মতিবোসের বিশেষ বন্দোবস্তে—স্ত্রী-আচারের সময়ে—মেয়ে মহলে ঢুকিতে পারে নাই।

নরেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল—"এইবারে তো ঢুকে গেল, এখন সকলের সামনে একবার ভাল করে কনে দেখিয়ে নে যান।"

"হ্যাঁ দিদি, আর কি—এখন তো নিশ্চিন্তি, এইবারে লক্ষ্মীকে একবার সকলের সামনে ভাল করে দেখিয়ে বর কনে বাসরে নে যাও।"

বলিয়াই হাসিমুখে বিদ্যুদ্বেগে বাটীর বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পর মুহূর্তেই সেখানে একেবারে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়া উঠিল। কনের মুখ খুলিবা মাত্রেই নরেশ একেবারে ক্ষেপিয়া আস্তিন গুটাইয়া উঠিল। "তবেরে শালা বিপনে তোর এই কাজ?"—বলিয়া বরের উপর যেমন গিয়া পড়িবে—অমনি উদ্যত ঘুষোটা মাঝখান হইতে একজন কন্যাযাত্র ধরিয়া নিরস্ত করিল।

কিন্তু বিপিন সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একবারে স্তব্ধ হইয়া কনের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

নরেশ উন্মত্তের মত চেঁচাইয়া উঠিল—

"এতবড় জুচ্চুরি—দাগাবাজী? এক মেয়ে দেখিয়ে শেষে আমার মাথায় কাঁঠাল-ভাঙ্গা? এ বে—না মঞ্জুর"

"বকে কে? এই দেখুন সবাই—আগে থাকৃতে ওঁরা সবাই মিলে মেয়ে দেখে শুনে, কুল-শীল, জাত-গোত্র, নাম-ধামের পরিচয় জেনে নিজের ইচ্ছায় এগ্রিমেণ্ট লিখে দেছেন।"

বলিয়া মতিবোস সকলের সাম্‌নে কাগজখানা খুলিয়া ধরিল।

"ডাকাতি, ডাকাতি, দিনে ডাকাতি ভয়ানক জুচ্চুরি—ও এগ্রিমেণ্ট বাতিল, আমরা দেখে নিচ্ছি—চলে আয় বিপনে, দেখি কোন শালা আটকায়?"

বলিয়া নরেশ বিপিনের হাত ধরিয়া টানিতে গেল। কিন্তু বিপিন তো নড়িলই না—অধিকন্তু মতিবোস এবার অত্যন্ত ক্রোধে ধমকাইয়া উঠিল—

"খবরদার, ভদ্দরলোকের বাড়ীতে মুখ খারাপ করো না, বল্‌ছি—পারো, বর নিয়ে চলে যাও দেখি?"

নরেশ একেবারে বোমার মত ফাটিয়া কি একটা তুমুল কাণ্ড করিতে যাইতেছিল—সহসা বিপিন গম্ভীর ভাবে বলিল—

"থাম নরা, মিছে ছোটলোকমি করে আর বীরত্ব ফলাসনি। হিঁদুর বে—স্বয়ং বিশ্বপতি নারায়ণের সামনে—সর্ব্বশুচি যজ্ঞানলের সাম্‌নে—তেত্রিশকোটী দেবতার প্রত্যক্ষে; আর ফেরবার নয়। যার কপালে ভগবান যাকে দিয়েছেন সেই তার ভাল। আমার কোন আপশোষ নেই।"

বলিয়া মুগ্ধনেত্রে আবার একবার অবগুণ্ঠিতা কনের পানে চাহিল।

নরেশ মুহূর্ত্তমাত্র স্তব্ধ হইয়াই কি বলিতে যাইতেছিল, অকস্মাৎ জ্ঞানবাবু এবং হরিগোপাল বাবু ভিড় ঠেলিয়া সাম্‌নে আসিয়া কহিলেন—

"ঠিক বলেছ বাবা—আশীর্ব্বাদ করি পত্নী সহবাসে চিরসুখী হও।"

বলিয়াই নরেশের পানে ফিরিয়া চাহিলেন। কিন্তু সে তখন ভোজবাজীর মত কোথায় একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেছে!

ন'এর আত্মকথা

(লেখক—শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ ভাদুড়ী বি. এল)

অর্দ্ধ সুপ্তি-অর্দ্ধ জাগরণে এইরূপ ভাবে পড়িয়া আছি, এমন সময় কে যেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া স্নিগ্ধ মধুর হাসি হাসিয়া বলিল—যেন কত দিনের পরিচিত—"কি গো, বসিয়া বসিয়া ত আমারই উপাসনা করছ, বলি একটা কাজ করনা ?"

বিস্মিত নয়নে চাহিয়া বলিলাম "তোমার উপাসনা করছি কি রকম !"

"কেন করছ না ? এই ভাবনা চিন্তা, দোহাই ধর্ম্মের, হেঁয়ালী ছাড়—সাদা কথায় বল !"

তবে শোন, আমি অনুনাসিক বর্ণ ; কিন্তু অনুধাবন করিলে আমি দন্ত্য'ন' আমার চর্ব্বনে বিনিয়োগ। অনন্ত নীলগগনে শ্যামায়মান ; জনহীন কানন-প্রান্তরে চঞ্চলগামিনী কলনাদিনী তটিনী, আমি নিসর্গ সুন্দরীর লীলা-নিকেতন আমি স্বর্গের নন্দন-কানন। প্রভাতের নবীন তপন, মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণ, অপরাহ্নে শ্রান্ত ক্লান্ত ভানুর ম্লান কান্তি, সায়াহ্নে অন্ধকার যবনিকা, আবার সান্ধ্য গগনের নক্ষত্র, গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ও নীরবতা, নিশাবসানে নীহার বিন্দু, নিশানাথ প্রেয়সী কুমুদিনীর নলক।

আমি নদী-কলতান-বিহগ কূজন ভ্রমর গুঞ্জন নূপুর-নিক্কন জন্তু গর্জ্জন অশনি-নির্ঘোষ কামান-নিনাদ মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। আমি প্রসূন গন্ধ চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ফাল্গুনের যৌবন হিন্দু ললনার ভ্রূযুগ অন্তরালে সিন্দূর বিন্দু, প্রাবৃটান্ত গগনের নির্ম্মল নীলিমা, অরণ্যানীর নিশাচর-নিশাচরী। আমি উদ্বাহ অনুষ্ঠানে আদান প্রদান। গৌরবচনে নরসুন্দর অর্থাৎ নাপিত, নাসিকার নলক ও নাকছাবি, কণ্ঠের নেকলেস্, নিতম্বের চন্দ্রহার, বাহুর অনন্ত—মস্তকের অবগুণ্ঠন। আমি জনক-ভবন-বাসিনী নববধূ-যন্ত্রণাদায়িনী তেজস্বিনী ননদিনী 'রায়বাঘিনী'। আমি সন্তান-সন্ততি-কালে জনক জননী। আমি প্রথমে কন্যা পরে ভগিনী, যৌবনে পত্নীনারী—বিনোদ বেশে বিনোদিনী, শেষে তনয় তনয়ার জননী, অবশেষে নাতি নাতনির সুতরাং নথনাড়া সম্পূর্ণ গিন্নী বা গৃহিণী। আমি স্নেহ প্রেমের নিদর্শন চুম্বন, নায়ক-নায়িকার নয়নবাণ ; শয়নে স্বপনে যখন তখন অনন্ত-মনা প্রণয়ী প্রণয়িনীর রূপ চিন্তা, মীনকেতন পুষ্পধন্বা নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ বাণ সন্ধান ;

নিরাশ প্রণয়ের বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা। চাঁদনী-যামিনীর সাহানা রাগিনী, আমি নব নটবর নবীন নাগর, কখন নিশুম্ভ নাশিনী শিবানী কখন শ্মশানে-মশানে ডাকিনী যোগিনী প্রেতিনীর তাণ্ডব নর্ত্তন, কখন পতিতপাবনী শান্তি-দায়িনী জহ্নু তনয়া সুরধনী, কখন বারানসীতে অন্নদা, অন্নপূর্ণা। আমি নির্ম্মাণে চতুরানন—পালনে নারায়ণ জগন্নাথ, বিনাশে পঞ্চানন এবং ত্রিলোচন। আমি কখনও উদাসীন সন্ন্যাসী কখন আপনাতে আপনি বিলীন। আমি বৃন্দাবনের নন্দ-নন্দন কানাই, ছানা ননী মাখন বসন চুরিতে সুনিপুণ; আমারই বংশী-ধ্বনিতে যমুনা যেত উজান কিন্তু এখন "নন্দ-কুল-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।" আমি আবার নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য ডাকনাম নিমাই। আমি যত দিন 'নাবালক' ততদিন জননীর স্নেহ-নাড়ে নিরাপদে নিশ্চিন্ত মনে জীবন যাপন করি, কখনও নিদ্র-নিমীলিত নয়ন কখনও স্তন্যপান নিয়ে নির্নিমেষ নেত্র কখনও ক্রন্দনে ম্লানানন। আমি ধনি নন্দন ননীমাখন-ছানা-সন্দেশ নধর কান্তি-নাদুশ-নুদুশ; এসেন্স সাবানে, অশন-বসন-সেবনে, কেশ-বিন্যাসে, 'চাহনি-চলনে' নিত্য নূতন আয়নার সামনে দণ্ডায়মান হইয়া অনুপম আনন-সৌন্দর্য্য অবলোকনে নিমগ্ন। আমি কখনও স্বাধীন কখনও পরাধীন। যখন স্বাধীন তখন নাকি অত্যন্ত নীতিজ্ঞান; তাই ন্যায়ের আসনে সমাসীন হইয়া অনুনয় বিনয়ের আর্ত্তনাদ অনর্থক মনে করিয়া উদাসীন। তবে পতি পরায়ণা পত্নীর প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিয়া আপনার অনিষ্ট সাধন করি। বিষপান, উদ্বন্ধন, অহিফেন সেবন এসব আমারই কাণ্ড-কারখানা। কুলীন ব্রাহ্মণ সুতরাং কৌলীন্য অভিমানে উদ্বাহ-অনুষ্ঠানে নায়কত্ব ফলাই। বর্ত্তমানে নূতন তন্ত্রের মানুষ কাজেই নিজের অনভিমতে সামান্য কোন কিছু নিষ্পন্ন হইলে স্বাতন্ত্র্যনাশ সম্ভাবনায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও আগ্নশর্ম্মা। স্বাধীনতার চুড়ান্ত আর কি? কোন্দল-পরায়ণা কামিনীর বড় স্নেহের জিনিষ—সম্মার্জ্জনী। আমি ন্যায়বান তাই দুর্জ্জন দমনে নির্ম্মম সজ্জন-পালনে মহানুভব যতনে-রতনে অমলে-পবনে শয়নে-স্বপনে লালনে পালনে দহনে দাহনে নাটকে নভেলে আখ্যানে উপাখ্যানে আবেদনে নিবেদনে নিমেষে উৎসবে গান বাজনায় অভ্যর্থনা সম্বর্দ্ধনায়—অভিনন্দনে—অনুসন্ধানে অন্বেষণে—যান-বাহনে—মান্দ্রী—সন্তাপে—ন্যায় অন্যায়ে রচনা সন্দর্ভে—নিকেতনে ভবনে—অনুজ্ঞা-অনুকম্পায়—দেনা পাওনায়—নূতনে পুরাতনে—আলোচনা সমালোচনায়—ধন ধান্যে—বিজনবনে—গহনকাননে আমারই প্রাধান্য বৈজয়ন্তী উড্ডীন।

আমি নির্ম্মল—কল্লোজলা ভুবন মনোমোহিনী জনক জননী জন্মভূমি—ধন

ধান্য দায়িনী বসুন্ধরা। আমি 'জ্ঞান-নয়ন—অঞ্জন'—ভকতজন-রঞ্জন', শান্ত তপোবনে ধ্যানমগ্ন মৌন মুনির নীরব উপাসনা—নিভৃত চিন্তা। আমি আছি 'অনল-অনিলে চির নভোনীলে' অন্তরে বনে, অরণ্যে কান্তারে সিন্ধুনীরে। আবার নগরপ্রান্তে পান্থ নিবাসেও অবস্থান করি। আমাঁর বিনাশে গমন মৃত্যু, সৃজনে আগমন-জীবন। আমি নিরাকার নির্ব্বিকার সুতরাং মান অপমান আমার নিকট সমান। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব আমারই অনুগ্রহে কেননা আমিই তাঁর দান-ধ্যান যজন-যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন; সন্ন্যাসীর নির্ব্বেদ-নিবৃত্তিতে আমার নিবাস। অনন্তের মধ্যে সান্তের স্থান নির্দ্দেশার্থ দৈনন্দিন জীবনকে অনন্ত-জীবনকেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত করি। নিরন্তর পাপানৃত অনুষ্ঠানের অন্তিম অনুতাপ, জীবন নাশান্তে অনন্ত নরক বা নিরয়ও আমি। আমি উত্থান-পতন প্রাক্তন এজন্য অবনীর নরনারী আমারই ক্রীড়নক। যখন আমি নির্ব্বাণ তখন জন্ম-জন্মান্তরের নৈকট্য নাশ। আমি ভগবান উদ্দেশ্যে নিবেদিত নৈবেদ্য ও প্রসূন নির্ম্মাল্য। শুনি নাকি খোদার 'নূর'ও আমি। সন্ধ্যা আহ্নিক আরাধনা উপসনাবন্দনাদি নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে আমি হিন্দুর সনাতন বা চিরন্তন নিয়ম। ভজনপূজনে প্রাচীন প্রাচীনার নামাবলী। নীতিজ্ঞান শূন্য মনুষ্যকে আমি জঘন্য ও নিকৃষ্ট জন্তু মনে করি। মহানুভবের নিকট আমি বিনয়াবনত জানু; আমি মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন, ধন্যবাদ আমারই প্রতিদান। আমি বন্ধুবান্ধব স্বজন পরিজনের স্নেহ বিনয় সৌজন্য বন্ধনে চির বন্দী; প্রিয়জনের বেদনা দৈন্যে উদ্বিগ্ন ও উদ্ভ্রান্ত। মানুষ যখন রুগ্ন, অবসন্ন, দুশ্চিন্তাপীড়নে নিষ্পিষ্ট তখন আমার অনুগ্রহপ্রার্থী কে না? কেননা আমি শান্তি স্বান্তনা! উন্নতি অবনতির সোপানে আমি দণ্ডায়মান। পান ভোজনাদি নিয়ম লঙ্ঘনে নিন্দার ভাগী আমি; নকলে আমি নাকাল কাজেই উপপত্নীর প্রেমালিঙ্গনে চিরদিন বিপন্ন। বন্ধ্যা নারী বলিয়া পতিভবনে নিন্দা-ভাগিনী ও অনাদৃতা! আমি তন্ত্র মন্ত্রে তান্ত্রিক। আমি বিদ্বানের সম্মাননা অভ্যর্থনা। আমি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক কিন্তু যখন সৈয়ায়িক তখন নানাদিকে নানারূপে নানাভাবে বচন বিন্যাসে ও অনবরত নস্য প্রদানে সুনিপুণ।

আমি উপন্যাসের আখ্যাত কল্পনা; নাটকের প্রস্তাবনা; প্রবন্ধের মুখবন্ধ বিজ্ঞাপন; গ্রন্থকারের গ্রন্থ ও তত্ত্ব নির্ঘণ্ট। আমি পত্রের প্রথমে "সবিনয় নমস্কার বা নিবেদন"—অন্তে "নিবেদক বা বিনীত"—বিশেষ প্রয়োজনে "পুনশ্চ" আমি যখন ভাষান্তর তখন আমি অনুবাদ। বনবাস নির্ব্বাসন—জনবাদ কিম্ব-

দন্তী প্রভৃতি আমার বিভিন্ন নাম। বনানীতে ও জানিতে অজানিতে আমার বদনাম। আমি "মতান্তর" কে "মনান্তর" জানিনা তবে এজন্য মনোমালিন্য আছে। "বস্তুপ", "মস্তুপ", "বিন্" "হ'ন্" রূপে অনেক অনেক বচনের জন্মদান করি, দৃষ্টান্তের নিষ্প্রয়োজন। আমি যখন ষ্টুডেণ্ট তখন "একজামিনের" জন্য অনন্যমনা অধ্যয়নে নিবিষ্ট ও নিমগ্ন। আমি সন্ন্যাসী নরোত্তমের জীবন বৃত্তান্ত ও তদানীন্তন আনুসঙ্গিক কাহিনী। অধুনা স্বনাম ধন্য মনীষিগণের জন্মস্থান নির্ণয়ে অনাবশ্যক অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতত্ত্ববিৎ নামে অবনীতে বিদ্যমান। গান বাজনায় আমার অত্যন্ত নেশা; কাজেই গানের ছন্দে ছন্দে মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় নাচিয়া নাচিয়া উঠি; আমি সানাইয়ের রসনচৌকী বা নহবৎ; সাহানা, কানেড়া ছায়ানট ইমন কল্যাণ প্রভৃতি রাগরাগিণীর তানে নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ-নির্ঝর বর্জ্জন করি।

আমি মনু-তনয় মানব এবং নরনারী রূপে মিথুন যেমন নল-দময়ন্তী। আমি কখনও বন্দরের বাণিজ্য-নৌকা—কখনও নদীর "কিনারা" পাটনীর অনাদৃত "জালহীন" ক্ষেয়া নৌকার ক্ষেপণী! আমি মদনের অনুচর বসন্ত—শচীনাথ শচীন্দ্র তস্য তনয় জয়ন্ত—গান্ধারীর দুর্য্যোধন—কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন—লহনা খুল্লনার শ্রীমন্ত—সনকার লখীন্দর। আমি বামন রূপে ভগবান; কৃতান্ত-ভগ্নী যমুনা; শমন দমন শচ্চীদানন্দ—"মুড়া"-রূপে নারায়ণ! নারায়ণ-চরণ-নিঃসৃতা মন্দাকিনী আমি; উপরন্তু অঞ্জনা নন্দন হনুমানও আমি।

আমি বসুন্ধরালিঙ্গন মলিনতনা উন্মুক্তকুন্তলা অনন্ত যৌবনা রোরুদ্যমানা ত্রিলোচন-নেত্র-বহ্নি-ইন্ধিত—কন্দর্প-মনোমোহিণীর অরুন্তুদ অন্তর বেদনা; অশোক বিপিনে জনক নন্দিনী জানকী; নিদাঘে নবীন-নীরদাবলোকনোন্মত্ত-নর্ত্তনা শিখিনী, প্রাবৃটান্ত-গগনের নির্ম্মল নীলিমা।

আমি প্রতিমা নিমজ্জনে বিসর্জ্জনবাজনা; অনুনয়-বিনয়-প্রার্থনা বিজ্ঞাপন-আবেদন-নিবেদন প্রভৃতি আমার অনাটনের বিনীত ক্রন্দন! ঘ্যান ঘ্যানানি—প্যান প্যানানিতে অত্যন্ত জ্বালাতন। আনাড়ি বামুনের রান্না বান্না ভোজনে আমার আসে কান্না ও ভাবনা কিন্তু কি করি গিন্নীর নথ নাড়া তার চেয়েও ভয়ানক ও অনিবার্য্য।

আমি ধনীর ধন ও দারবান—নগরের নাগরিক—মানীর মান—জ্ঞানীর জ্ঞান—অন্ধের "নড়ি";—নাকের নথ—নাসিকার নস্ত—মনের ভ্রান্তি—

অন্তরের অনুরাগ—গ্রন্থকারের লেখনী—সেনাপতির সেনানি—অন্তেবাসীর অনধ্যায়—নদ নদীর বন্যা ও প্লাবন—অন্তঃপুরের অঙ্গনা—ভগ্ন-মন্দিরের আঙ্গিনা—অরবিন্দ মকরন্দ নারীর বন্ধ্যাত্ব কাঙ্গালিনীর ছিন্নবসন—সপত্নীর গঞ্জনা—নাগ নাশী নকুল—মহামারীতে নগর সঙ্কীর্ত্তন। আমি ভোজনে জনার্দ্দন—শয়নে পদ্মনাভ নিদ্রায় নাসিকা গর্জ্জন। পানের চূনও আমি, কিন্তু পান থেকে চূন নড়িলেই নাসারন্ধ্রের স্পন্দন বা স্ফুরন। "নুন" খেয়ে নিমক হারামীও নাকি করি।

আমি মুসলমানের 'নামাজ ও খানা পিনা' খৃষ্টানের উপাসনা ও ডিনার—হিন্দুর সন্ধ্যা বন্দনা ও নিমন্ত্রন-ভোজন। 'খানা' যখন বচনান্তে নিযুক্ত হয় তখন 'যবনত্ব' বিসর্জ্জন করিয়া 'হিন্দুত্বের' আসনে সমাসীন হই (শ্রীমান দয়ানন্দের অনুকম্পায় কিনা জানিনা)—যেমন 'তোষাখানা', 'বালাখানা', 'বৈঠক্‌খানা', 'চিড়িয়াখানা', কিন্তু 'পায়খানা'তে গা ন্যাকার ন্যাকার করে আর নিষ্ঠীবন নিঃসরণ হয়।

আমি বড়দিনের মূল্যবান উপঢৌকন; ঘর কন্নায় নানারকম 'বাম্নন-কুম্নন'। আমি নাকি 'ফুটন্ত' নলিনী—'জীবন্ত' দৃষ্টান্ত—উনেনের 'জলন্ত' আগুন; তবে হসন্ত ন্ বটে! যখন বড় অনটন তখন পনর দিন অন্তে মাহিনার' জন্য সতৃষ্ণ নয়নে—উদ্বিগ্ন মনে সংক্রান্তির আগমন প্রার্থনা করি। আমি 'কন্‌কনে' ঠাণ্ডা—'খ্যান্‌খেনে শিশু সন্তান—'খুন্‌খুনে' বুড়োমানুষ—'গন্‌গনে' আগুন—'গুন্‌গুন্' তা না না না ধ্বনি—'ঘন বন' আনাগোনা—'চন্‌চনে' নাড়ী—'চিন্‌চিনে' বেদনা—'ছন্‌ফনে' ঘুড়ী—'ঝন্‌ঝনে' ঝিনুক—'ঝন্‌ঝিন্'—'টন্‌টনে' স্নায়ু বা নাড়ীজ্ঞান—'ঝুন্‌ঝনো', ঝুনা নারিকেল—'টুন্‌টুনী' পাখী—'টিন্‌টিনে'—'ঠন্‌ঠনে' শুক্‌না—ঠুন্‌ঠুনে ধ্বনি—'ধিন্ ধিন' নাচনী—'প্যান্‌পেনে' নাকিসুর—'ফিন্‌ফিনে' বসন—'বন্‌বন্' ঘূর্ণন—'ভন্‌ভন্' গুঞ্জন—'মিন্‌মিনে'—'ম্যান্‌মেনে' প্রবন্ধ—'সন্‌সন্' পবন—'হন্‌হনে' গমন—

—যখন আমি নারী, তখন আমার কত নাম—যেমন জ্ঞানদা, মানদা, অন্নদা; নলিনী, কামিনী, মোহিনী, শান্তি, সান্ত্বনা, কল্যাণী, নিভাননী, নির্ম্মলা, কুমুদিনী, সুনিতি, কমলমনি, শৈবলিনী, তরঙ্গিনী, তটিনী, ইত্যাদি পুনশ্চ হাল আইনে যতীন্দ্রবালা, সুরেন্দ্রবালা, শচীন্দ্রবালা, প্রভৃতিও আমার নামের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এখন দেখলেত সাহিত্য-উদ্যানে আমার কতখানি স্থান। তোমরা চিনলে না কিন্তু গন্ধর্ব্ব দানব কিন্নর এমন কি চীন জাপান প্রভৃতিও আমাকে কেমন সম্মান করে!

বিপ্লব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

"মা কোথায় গো!"

শৈল দাবায় বসিয়া মোজার উপর উলের ফুল তুলিতেছিল। মুখ তুলিয়া দেখিল, এক বর্ষীয়সী বিধবা উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে একটু বিস্ময়ের সহিত আগন্তুকার দিকে চাহিল। আগন্তুকা কান্ত ঠাকরুণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায়?"

"গা ধুতে গিয়েছেন।"

"কোথায়? ফিরতে কি বেশী দেরী হবে?"

শৈল উত্তর করিল, "না।"

কান্ত ঠাকরুণ দাবার উপর বসিবার উপক্রম করিলে শৈল তাড়াতাড়ি একখানা আসন পাতিয়া দিল। কান্ত ঠাকরুণ তাহাতে বসিয়া শৈলর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মোজা বুনছো?"

মৃদু হাসিয়া শৈল উত্তর দিল, "না, ফুল তুলচি।"

কান্তঠাকরুণ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তা মন্দ কি। আমারও এক বোনঝি সেও অমনি কেমন মোজা, কম্পোটার, রুমাল সব বুনতে পারে। এমনি জুতো তৈরী করে যে, এক এক জোড়া জুতো বিশ পঁচিশ টাকায় বিকোয়।"

শৈল নীরবে মৃদু হাসিল। কান্তঠাকরুণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, এর যে মেয়েটীর বিয়ের কথা হচ্ছে সেটী কোথায়?"

হাসি চাপিয়া শৈল বলিল, "কোথায় বেড়াতে গিয়েছে।"

"সেটী দেখতে কেমন?"

"আমারই মত।"

গম্ভীর মুখে কান্তঠাকরুণ বলিলেন, "তা হ'লে মন্দ কি, তোমার গায়ের রং তো মোহাৎ ময়লা নয়।"

শৈল একটু চাপা হাসি হাসিল। কান্তঠাকরুণ বলিলেন, "কি জান মা, আজকালকার ছেলেরা আগে রূপটাই দেখে। আমার হাতে দু' তিনটী ছেলে আছে কি না?"

শৈল সহাস্যে বলিল, "তাই না কি?"

কান্তঠাকরুণ গর্ব্বসহকারে একবার মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "ছেলের অভাব কি! তবে আসল কথা কি জান, মেয়ের একটু রূপ আর কিছু পয়সা থাকা চাই। যেমন পয়সা চালাবে তেমনি ছেলে পাবে। বলে গুড় দিলেই মিষ্টি হয়।"

শৈল নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। কান্তঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এর বড় মেয়ে।"

শৈল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। কান্তঠাকরুণ বলিলেন, "তোমার বিয়ে হয়েছে কোথায়?"

সহাস্যে নতমুখে শৈল বলিল, "নিশ্চিন্ত পুরে।"

একটু ভাবিয়া কান্তঠাকরুণ বলিলেন, "সে বর্দ্ধমান জেলায় বুঝি?"

শৈল ঘাড় নাড়িল, কান্তঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সোয়ামী কি করে?"

"ডাক্তার।"

"বেশ বেশ, অমন পয়সা আর কোন চাকরিতে নাই মা। যে ছেলেটীর কথা বলচি, সেটীও ঐ, তা মিলবে ভাল।"

বলিয়া কান্তঠাকরুণ দন্তহীন মুখে একটু হাসির লহর তুলিলেন। শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটী ডাক্তারি করে?"

কান্তঠাকরুণ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "এখনও করে নি, এখন কম্পাউণ্ডারি করছে, বছর খানেক পরেই একজন বড় ডাক্তার হয়ে বসবে।"

ইনি যে ঘটক ঠাকরুণ তাহা বুঝিতে শৈলর বিলম্ব হইল না; কিন্তু ঘটক ঠাকরুণ সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিতে লাগিলেন, "যেমন ঘর তেমনি বর। বাপ নাই, কিন্তু, মা, ভাই, বোন, বিষয়, আশয়, জমি জায়গা সব জাজ্বল্যমান। ছেলে দেখতেও মন্দ নয়, পয়সারও খাকতি নাই।"

"ছেলে কোথায় কম্পাউণ্ডারী করে?"

"এই—এইখানেই কোথায় মা, অত নাম কি আমার মনে থাকে? বিলেত ফেরৎ খুব বড় ডাক্তারের কাছেই কাজ করে, মোটা মাইনে পায়।"

শৈল আর কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু মাতাকে বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া থামিয়া গেল। সে সূতা কাঁটা উল প্রভৃতি লইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল।

অতঃপর কাত্যায়নীর সহিত কথায় বার্ত্তায় ক্ষান্তঠাকরুণ যখন শুনিলেন, এতক্ষণ তিনি যাহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন "সেইটাই পাত্রী," তখন তিনি আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এত বড় মেয়ে, ছেলের মা বলিলেই হয়, ইহার এখনো বিবাহ হয় নাই, ইহাও কি সম্ভব!" সুতরাং মেয়ে বা মেয়ের মা কে, যে তাঁহার সহিত রহস্য করিতেছে তাহা স্থির করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। শেষে কাত্যায়নীর কথায় যখন শৈলকেই পাত্রী বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন, তখন তিনি হরিচরণের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিলেন না।"

যাহা হউক, ক্ষান্তঠাকরুণ পুনরায় কাত্যায়নীর নিকট ছেলের রূপ গুণ ঐশ্বর্য্যাদির বিবরণ বেশ গর্ব্ব সহকারেই বিবৃত করিলেন, এবং উপযুক্ত বিদায় পাইলে খুব কম পয়সায় এক মাসের মধ্যেই যে এরূপ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পাত্রটীকে তাঁহার জামাতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে পারেন এরূপ আশ্বাসও দিলেন। শেষে পাত্র পক্ষ কোন তারিখে মেয়ে দেখিতে আসিবেন স্থির করিয়া জানাইবেন আশা দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঘটকীর সহিত রহস্য করার জন্য কাত্যায়নী মেয়েকে একটু তিরস্কার করিতে ছাড়িলেন না।

এদিকে হরিচরণ রাত্রিতে পিসীমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে পিসীমা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "হাঁরে হরি, তুই ঐ ধেড়ে মাগীকে বিয়ে করবার জন্য খেপেছিস্? ও মেয়ে, না মেয়ের মা।"

হরিচরণ বলিল, "আমিই বা কোন্ কচি খোকাটী। তুমি নিজে গিছিলে নাকি পিসীমা?"

"না গেলে দেখলাম কি ক'রে?"

ব্যস্তভাবে হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর? তার পর?"

পিসীমা বলিলেন, "তারপর আর কি, কথাবার্ত্তা ক'রে এলাম।"

"ওদের মত আছে?"

"মত আবার নাই? বলে—হাবা ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথায়?"

হরিচরণ আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "জীতা রও পিসীমা, একটু পায়ের ধূলো দাও।"

পিসীমা নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তা যেন দিচ্চি, কিন্তু—"

বাধা দিয়া হরিচরণ বলিল, "এর আর একটুও কিন্তু নাই পিসীমা, কিন্তু সব ছেড়ে আগে চার হাত এক হাত করে দাও।"

পিসীমা বলিলেন, "সে তো হবেই, তবে আমি ভাবচি, ঐ খেড়ে মেয়ে—"

রাগে হাতে হাত চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া হরিচরণ বলিল, "আমার খেড়ে মেয়ে আছে, আমারই আছে, তাতে তোমার বাবার কি। তুমি এখন বিয়ে দেবে কি না বল ?"

কান্তঠাকরুণ বিরক্তির সহিত বলিলেন, "এই মরে চেঁচিয়ে। যদি বিয়েই দেব না, তবে কথাবার্ত্তা ক'য়ে এলাম কেন ?"

"তাই বল" বলিয়া হরিচরণ আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তখন পিসী ভাইপো মিলিয়া, কিরূপ সাবধানে কাজ করিতে হইবে তাহারই পরামর্শে প্রবৃত্ত হইল। শেষে হরিচরণ বলিল, "একটা কাজ কত্তে হবে পিসীমা, আমাদের ডাক্তার বাবুকে আগে ওখান হতে সরাতে হবে। তাঁর যে রকম আনাগোনা চলেছে, তাতে গতিক বড় ভাল বোধ হয় না।"

পিসীমা বলিলেন, "তাকে কেমন ক'রে সরাব রে ?"

হরিচরণ বলিল, "তার খুব সহজ উপায় আছে। তোমাদের গাঁয়েরই গোবিন্দ আকুলীর ভাইঝির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ'য়েছে জান তো ?"

সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, "তা আর জানি না। সে বিয়ের রেতে কি কাণ্ড। মারামারি, গালাগালি, ছাওলা তলা থেকে বর চলে গেল। তারপর তো ওর সঙ্গে অনির বিয়ে হয়।"

হরিচরণ বলিল, "কিন্তু বিলেত ফেরৎ বলে বৌটা ঘর কর্ত্তে যায় না। এখন যাতে সে গিয়ে ঘর করে সেইটা কত্তে হবে।

চিন্তিত ভাবে পিসীমা বলিলেন, "বিলেত ফেরৎ ব'লে যখন সোয়ামীর ঘর কত্তে চায় না, তখন আমার কথাতেই কি যাবে ?"

হরিচরণ ঘাড় নাড়িয়া চড়া গলায় বলিল, "আলবাৎ যাবে। তোমার কথায় যদি আমার মত লক্ষ্মীছাড়ার হাতে কেউ মেয়ে দেয়, তবে ও মেয়েটাও তোমার কথায় সোয়ামীর ঘর করবে। এ যদি না পার তা হ'লে আমি দিব্যি ক'রে বলতে পারি, বিয়েও দিতে পারবে না।"

সগর্ব্বহাস্যে পিসীমা বলিলেন, "আচ্ছা, পারি কি না দেখ।"

পরদিন কান্তঠাকরুণ গোঁসাই পুকুরে স্নান করিতে গিয়া নিবিষ্টচিত্তে শিব পূজা করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন, পূর্ব্ব দিবসে গোবিন্দ ঠাকুরের ভাইঝি অনি শ্বশুর বাড়ী গিয়াছিল; কিন্তু তাহাকে বাড়ী ঢুকিতে দেওয়া হয় নাই। বাড়ীর বাহির হইতে ধুলো পায়েই তাড়াইয়া দিয়াছে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক ভাবিয়া কান্তঠাকরুণ পরদিন গোবিন্দ আকুলীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। গৃহিণী তাঁহাকে আদর করিয়া বসাইলেন, এবং ইদানীং তিনি আর এদিকে আসেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কান্তঠাকরুণ জানাইলেন, যে, তিনি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় কোথাও যাইতে পারেন না, নতুবা তিনি সর্ব্বদাই তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া থাকেন। গৃহিণী তখন গুরুতর ব্যস্ততাপূর্ণ কার্য্যটা কি তাহা জানিতে চাহিলেন। উত্তরে কান্তঠাকরুণ বলিলেন, "কাজটা অপর কিছু নয় মা, একটা বিয়ে। ঐ যে নেউকী পাড়ার রমা ভটচাজের একটী বছর পনের ষোলর মেয়ে আছে, সেটীর তো বিয়ে কিছুতেই হয় না। তার মা এসে কেঁদে পড়েছে, কাজেই চেষ্টা দেখতে হচ্ছে।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাও ঠিক হ'লো?"

কান্তঠাকরুণ বলিলেন, "হাঁ, ঠিক সবই হ'য়ে গিয়েছে, শুধু চার হাত এক হওয়া বাকী।" কিন্তু বলতে কি মা, তোমরা আপনা আপনি—সেই জন্যেই ছুটে এলাম। বলি, দোষটা এড়িয়ে রাখি।"

শঙ্কিতভাবে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোষটা কি?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কান্তঠাকরুণ বলিলেন, "দোষ কি জান মা, বিয়েটা হচ্ছে, তোমাদের জামাই পরেশ ডাক্তারের সঙ্গে।"

গৃহিণী স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কান্তঠাকরুণ অপরাধীর ন্যায় মুখখানাকে একটু সঙ্কুচিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তা আগে মা, আমি কিছুতেই হাত দিই নাই; কিন্তু পরেশের পিসী ছাড়লে না। বলে, সে বৌকে তো ঘরে নেব না। আর সে আসবেও না। কাজেই পরেশের বিয়ে দিতে হবে। তা আমি মাঝে না থাকলেও যে বিয়ে আটকাবে এমন বোধ হয় না। কাজেই বুঝলে তো মা।"

রুদ্ধ কণ্ঠে গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "সত্যি পরেশ আবার বিয়ে করবে?"

অনুপমা পুকুর ঘাট হইতে বাসন ধুইয়া আনিতেছিল। কথাটা শুনিয়াই সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, পরক্ষণেই দ্রুতপদে স্বকার্য্যে চলিয়া গেল। কান্তঠাকরুণ তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আহা, মেয়ে তো নয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুণ। এমন মেয়ের উপর সতীন।"

গৃহিণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কপাল!"

তারপর অনুপমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শুনলি অনু?"

অনুপমা রন্ধনশালা হইতেই উত্তর করিল, "শুনেছি খুড়ীমা, বেশ সমানে সমানে মিলেছে, একজন বিলেত ফেরৎ, আর একজন খিরিষ্টানী।"

শ্লেষের স্বরে বলিলেও তাহার গলাটা যে ভারী ইহা বুঝিতে খুড়ীমার বিলম্ব হইল না। কান্তঠাকরুণ কিন্তু ততটা লক্ষ্য করিলেন না; তিনি অনুপমার কথাতেই সায় দিয়া বলিলেন, "সত্যি বাছা, মেয়েটার যেন খিরিষ্টানী খিরিষ্টানী ঢঙ্। আমার তো মোটেই ভাল লাগে না। যেমন কাপড় পরার ধরণ, তেমনি কথার ধরণ, তার উপর রূপেরও তো ধুচুনী। তোমার ভাসুর-ঝির পায়ের কাছেও দাঁড়াতে পারবে না।"

গৃহিণী নিরুত্তরে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। কান্তঠাকরুণ বলিতে লাগিলেন, "দেখ বাছা, আমার কথা যদি শোন, তা হ'লে বলি, মেয়েটাকে পাঠিয়ে দাও। হ'লেই বা বিলেত ফেরৎ গা, আজকাল বলে কত কি চলে যাচ্চে। ও গিয়ে আপনার ঘরে চেপে বসুক, আমিও ওদিকে আলগা দিই। দেখি বিয়েটা কি ক'রে হয়।"

অনুপমা রন্ধনশালার বাহিরে আসিয়া বলিল, "তা হ'লে তোমার ঘটক বিদায়টা যে মারা যাবে?"

কান্তঠাকরুণ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মারা যায় তোর কাছ থেকে আদায় ক'রে নেব। ওলো ছুঁড়ি, তুই কি জানবি, তোর খুড়ীমা জানে। এঁর শাশুড়ী, তোর ঠাকুর মা, তার সঙ্গে আমার কি ভালবাসা ছিল। এক জীব এক প্রাণ; মাগী কান্ত দিদি বলতে অজ্ঞান হ'তো। তোদের যাতে মন্দ হয় আমি তা কি কত্তে পারি!"

তিনি মন্দ করিতে পারুন বা না পারুন, তিনি যে কিরূপে ঠাকুরমার কান্ত দিদি হইতে পারিয়াছিলেন, অনুপমা তাহাই ভাবিতে লাগিল। কেন না কান্ত-ঠাকরুণের বয়স চল্লিশের কিছু উপর, অথচ ঠাকুর মা দশ বার বৎসর পূর্ব্বে ষাট বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। সেই ত্রিশবর্ষাধিক বয়স্কা ঠাকুরমা কোন

হিসাবে যে কাস্তঠাকরুণকে দিদি সম্বোধনে সম্মানিত করিতেন অনুপমা তাহা বুঝিতে পারিল না। তবে কাস্তঠাকরুণের হঠাৎ আজ ঠাকুরমার কাস্তদিদি হইতে আসিবার যে বিশেষ কোন একটা কারণ আছে, সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইল।

অতঃপর কাস্তঠাকরুণ খানিক বসিয়া নানারূপে গৃহিণীকে বুঝাইয়া দিলেন, অনুপমাকে সেখানে পাঠাইয়া দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত, নতুবা বিবাহ কিছুতেই রোধ হইবে না। এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি সে দিনের মত বিদায় লইলেন, এবং পরদিন আসিয়া এসম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জানিয়া যাইবেন এরূপ আশ্বাস ও দিয়া গেলেন। গৃহিণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

অনুপমা ব্যস্তহস্তে কাজ সারিতে লাগিল। কাজও তখন বেশী ছিল না, আহারাদি হইয়া গিয়াছিল। কাজের মধ্যে উচ্ছিষ্ট পরিস্কার এবং রোদে শুকান কাপড় গুলোকে ঘরে তোলা। অনুপমা সেই সামান্য কাজ গুলাকেই যেন খুব বড় করিয়া অতিমাত্র ব্যস্ততার সহিত সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সেই ব্যস্ততার মধ্যেও একটা কথা শুধুই তাহার মনের ভিতর জাগিয়া উঠিতে লাগিল, আবার স্বামী বিবাহ করিতেছেন। অনুপমা কাজের কোন ব্যস্ততা দিয়াই মনের এই স্বাভাবিক গতিটাকে প্রতিহত করিতে পারিল না। অবশেষে হাতের কাজগুলাও যখন রোধ হইয়া আসিল; তখন সে হতাশ চিত্তে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

বিছানার একপাশে খুড়ীমার তিন বছরের ছেলেটী শুইয়া ঘুমাইতেছিল। অনুপমার ইচ্ছা হইল, তাহাকে জাগাইয়া খুব একটা গোলমালের সৃষ্টি করে। কিন্তু জাগাইতে গিয়াও জাগাইতে পারিল না; বরং তাহার গায়ে যে মাছিগুলা বসিয়া ঘুমের ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল, পাখার বাতাস দিয়া সে গুলাকে তাড়াইয়া দিল। তারপর তাকের উপর হইতে রামায়ণ খানা পাড়িয়া লইয়া মাথার দিকের জানালায় ফেলিয়া গুনগুন্ স্বরে পড়িতে আরম্ভ করিল।

"শ্রীরাম বলেন শুন জনক দুহিতে,
বিষম দণ্ডক বন না যাইও সীতে।
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস।
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস?

অন্তঃপুরে নানাভোগে থাক মন সুখে।
ফল মূল খেয়ে কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে ?
তোমার সুসজ্জা শয্যা পালঙ্ক কোমল।
কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে চরণ কমল ॥
চিন্তা পরিহর প্রিয়ে ক্ষান্ত হও মনে।
বিষম রাক্ষসগুলা আছে সেই বনে ॥"

অনুপমা ভ্রূকুটী করিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। একটা রৌদ্রপীড়িত কাক চালের উপর বসিয়া হাঁ করিয়া হাঁপাইতেছিল, নির্মেঘ আকাশটা যেন ভীষণ দাবদাহে পুড়িয়া যাইতেছিল, দুইটা ঘুঘু সামনের আমগাছের পাতার ভিতর নিঃশব্দে পাশাপাশি বসিয়া ছিল। অনুপমা দৃষ্টি ফিরাইয়া পুনরায় পড়িতে লাগিল—

"শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে।
কহেন রামের প্রতি কুপিত সন্তাপে ॥
নিজ নারী রাখিতে যে ভয় করে মনে।
তারে বীর বলে নাকো কোন ধীর জনে ॥
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে ॥
তব সঙ্গে থাকি যদি ধূলি লাগে গায়।
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায় ॥
তব সহ থাকি যদি পাই তরুমূল।
স্বর্গ কিম্বা গৃহ নহে তার সমতুল ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগে যদি ভ্রমিয়া কানন।
শ্যামরূপ নিরখিয়া করিব বারণ ॥"

অনুপমা বই খানা মুড়িয়া ফেলিল, এবং উভয় করতলের মধ্যে চিবুক রাখিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। একটা তপ্ত দমকা বাতাস তাহার মুখের উপর দিয়া বহিয়া গেল।

সহসা ডাক আসিল, "বৌমা!"

অনুপমা ত্রস্তে ফিরিয়া দেখিল, রামচরণ রৌদ্রতপ্ত উঠানে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। অনুপমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

রামচরণ যে অনুপমার উপর বেশ প্রসন্ন ছিল তা নয়, বরং পরেশকে উপেক্ষা করায় তাহার উপর একটু বিতৃষ্ণাই জন্মিয়াছিল। স্ত্রী যে কোন কারণেই স্বামীকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না, এ ধারণাটা রামচরণের মনে বদ্ধমূল ছিল। সুতরাং স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া অনুপমার পিত্রালয়ে থাকা তাহার চক্ষে নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইত, এবং এই জন্য সে তাহাকে বিরক্তির দৃষ্টিতেই দেখিত। ইহার উপর এক চোখো আকুলী ঠাকুরের উপর তাহার কেমন একটা বিদ্বেষ ভাব ছিল। সেটাও অনুপমার উপর বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ঘটনা স্রোত এমনই বিভিন্নমুখী হইয়া পড়িল যে, তাহাকে বাধ্য হইয়া অনুপমার পক্ষপাতী হইতে হইল।

অনুপমার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেও পরেশ যে শৈলকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনে; এটা রামচরণের নিকট বড়ই বিসদৃশ বোধ হইল। একেতো এত বড় আইবুড় মেয়ে কোন ভদ্র ঘরের কুলবধু হইতে পারে বলিয়া রামচরণের বিশ্বাস ছিল না, তাহার উপর সেই নির্লজ্জা ধেড়ে মেয়েটা যখন হাসিয়া হাসিয়া পরেশের সহিত কথা বার্ত্তা কহিত, তখন রোষে রামচরণের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে থাকিত। পরেশ যতই এই মেয়েটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করিত, রামচরণের চিত্তটা ততই তাহার সম্বন্ধে ঘোর বিদ্রোহী হইয়া উঠিত।

তারপর যখন শৈলজার সহিত পরেশের বিবাহের কথা চলিল, তখন সেটা রামচরণের আদৌ ভাল লাগিল না। একে তো এই মেয়ে, তাহার উপর গ্রামে তাহারা দোষী বলিয়া পরিচিত। বিবাহের কথায় সেই দোষের কথাটা তুলিয়া অনেকেই 'যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে' বলিয়া রামচরণকে উপহাস করিতে লাগিল। রামচরণের সেটা অসহ্য হইল। ছি, ছি, করালী চাটুজ্যে—যাহার প্রতাপে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খাইত, তাহার ছেলে এমন ঘরে বিবাহ করিবে? আজ কর্ত্তা বাঁচিয়া থাকিলে কি এতটা হইতে পারিত! রামচরণ তারাসুন্দরীর কাছে আপনার মনোবেদনা জানাইল। কিন্তু তারাসুন্দরী তখন অনুপমার উপর স্বীয় ক্রোধের প্রতিশোধ লইতে ব্যস্ত। তিনি রামচরণের কথায় ততটা কাণ দিলেন না। রামচরণ ইহাতেও নিরস্ত হইল না। কিরূপে বিবাহ বন্ধ করিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

অবশেষে রামচরণ দেখিল, এ ক্ষেত্রে অনুপমার সহায়তা না লইলে কার্য্যোদ্ধার

সহজ হইবে না। অগত্যা তাহাকে তাহাই করিতে হইল। সে মধ্যে মধ্যে গোবিন্দ আকুলির বাড়ীতে যাতায়াত করিয়া অনুপমার মনের গতি জানিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কয়েকবার যাতায়াতে সে বুঝিল, নদী উভয় কুল প্লাবিত করিয়া আপনার প্রবাহকে যতই অন্য পথে প্রেরণ করুক, তাহার মূল প্রবাহ ঠিক সাগরের দিকেই ছুটিয়া যায়। তা ছাড়া অনুপমার স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে তাহার মনটাও অনুপমার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। এবং সে এই প্রতিমাটি লইয়া গিয়া পরেশের শূন্য মন্দিরে স্থাপন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তারপর তারাসুন্দরীর অনুমতি ক্রমে একদিন সে এই প্রতিমাকে মস্তকে লইয়া পরেশের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রতিমার স্থাপন হইল না; সে গৃহ তখন রামচরণের দৃষ্টিতে কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সে প্রতিমাকে মাথায় লইয়া পুনরায় যথাস্থানে রখিয়া গেল।

তার পর রামচরণ প্রায় পনর দিন আর অনুপমার সহিত সাক্ষাৎ করিলনা। লজ্জায় সে এ দিকে আসিতে পারিল না।

এদিকে সে লক্ষ্য করিল, এই পনর দিনের মধ্যে পরেশ তিন চারি দিন শৈলদের ঘরে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিল। শৈলও কারণে অকারণে প্রায়ই আসিয়া পরেশের কাছে সারা বেলা কাটাইয়া যাইতে লাগিল। সে আসিলে পরেশ আর বড়ীর বাহির হইত না। রোগীদের ডাক আসিয়া ফিরিয়া যাইত; কত গরীব লোক ডাক্তার বাবুর প্রত্যাশায় দ্বারে হত্যা দিয়া বসিয়া থাকিত। রামচরণের ইহা অসহ্য হইল। কিন্তু উপায় নাই। তারাসুন্দরীও শৈলর পক্ষে। রামচরণের এক একবার ইচ্ছা হইল, সে চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিন্তু এতকালের চাকরী ছাড়িয়া যাওয়া, বিশেষ পরেশকে ত্যাগ করা তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। রামচরণ ক্ষোভে আপনার হাত আপনি কামড়াইতে লাগিল।

অনুপমা মেয়েটাই বা কি রকম! সে আসিয়া কি এই অলক্ষ্মীটাকে কুলার বাতাস দিয়া দূর করিতে পারে না? কুলার বাতাসও দিতে হইবে না; যেমন ঈশার মূলের গন্ধে সাপ পলায় তেমই তাহার গায়ের বাতাসেই এই অলক্ষ্মীটা বাড়ী ছাড়িয়া পলাইবে। কিন্তু সে আসিবে কি? এই অলক্ষ্মীস্পর্শে অপবিত্র গৃহে লক্ষ্মী আসিয়া কি অধিষ্ঠিত হইবেন?

কিন্তু তাহাকে আনিবার কথা তারাসুন্দরীকে আর বলা যায় না। একবার বলিয়া সে ঠকিয়াছে, আবার কোন মুখে সে কথা তুলিবে? তবু কোন প্রকারে এক দিন সে কথা তুলিল। শুনিয়া তারাসুন্দরী ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিলেন,"

তোর যখন নেহাৎ ঝোঁক, তখন চল্, একদিন আমি ফুলচন্দন নিয়ে গোবিন্দ আকুলীর বাড়ী যাই। পাল্কী ডাকাব, না হেঁটেই যাব?"

রামচরণ এ কথার উত্তর না দিয়া পলাইয়া গিয়াছিল।

তারপর রামচরণ অনেক ভাবিয়া ঠিক করিল। তাকে আনিতে হইবে, নয় তো এ বাড়ীর মঙ্গল নাই। ঐ খিরিষ্টানী যে দিন বৌ হইয়া ঘরে ঢুকবে সেই দিনই বাস্তুদেবতা বাস্তু ছেড়ে ছুটে পালাবেন। কিন্তু 'রামচরণ থাকতে সেটী হবে না। আগে সেখানে গিয়ে তার মনটা বেশ করে জেনে আসি। তার পর ছোড়দিকে এমন চেপে ধরবো যে না বলতে পারবে না।

এইরূপ স্থির করিয়া রামচরণ হঠাৎ একদিন অনুপমার নিকট উপস্থিত হইল। অনুপমা আসিয়া তাহাকে বসাইল, এবং ব্যস্তভাবে বাড়ীর সকলের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল, উত্তরে রামচরণ সকলের কুশল জ্ঞাপন করিয়া ধীরে ধীরে বলিল," তুমি যাবে না বৌমা?"

মৃদু হাসিয়া অনুপমা উত্তর দিল, "কোথায় যাব?"

রামচরণের ইচ্ছা হইল, সে উত্তর দেয় "চুলোয়।" কিন্তু সে উত্তরটা চাপিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিল, "নিজের ঘরে যাবে।"

উত্তরে অনুপমা একটু হাসিয়া মাত্র। রামচরণ মাথা নাড়িয়া বলিল, "দেখ বৌমা, পর ভাবলে খুব আপনার লোকেও পর হইয়া যায়। নয় তো পরও আবার আপন হয়।"

অনুপমারও মুখখানা গম্ভীর হইয়া আসিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "বিয়ের ঠিক হ'য়ে গিয়েছে?"

মাথা নীচু করিয়া মাটীতে আঙ্গুল ঘষিতে ঘষিতে রামচরণ বলিল, ঠিক আর কি!' তুমি না গেলেই ঠিক, গিয়ে পড়লেই সব বেঠিক। তুমি যদি নিজের ঘরে গিয়ে চেপে ব'সো —"

মৃদু হাসিয়া অনুপমা বলিল, "জোর ক'রে নাকি?"

রামচরণ বলিল, "হাঁ, জোর ক'রে। সোয়ামীর ঘর তো বটে।"

অনুপমা বলিল, "কারো উপর জোর জুলুম করা কি ভাল?"

ঈষৎ ক্রুদ্ধ স্বরে রামচরণ বলিল, "আর আপনার অধিকারটা পরের হাতে ছেড়ে দেওয়াই খুব ভাল বুঝি?"

অনুপমা নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। রামচরণ আশান্বিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল বৌমা, যাবে?"

অনুপমা উত্তর করিল, "না।"

রামচরণের আশাপ্রদীপ্ত মুখখানা অন্ধকার হইয়া আসিল। সে ঘাড় নীচু করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর সহসা মুখ তুলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ঢের ঢের ঘোর মানুষ দেখেছি বৌমা, কিন্তু তুমি এক সৃষ্টিছাড়া মেয়ে।"

রামচরণ উঠিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। অনুপমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন বেলাটাও পড়িয়া আসিয়াছিল। সে ঘরে ঢুকিয়া কলসীটা লইয়া গা ধুইতে চলিল।

গা ধুইয়া অনুপমা যখন কলসী কক্ষে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন সহসা অশ্ব-পদশব্দে চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। চাহিতেই দেখিল, একটা ঘোড়া আরোহী সমেত কার্ম্মুক নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় উল্কাবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। অনুপমা ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে সে দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

চক্ষের পলক না ফেলিতেই ঘোড়াটা সম্মুখে আসিয়া পড়িল। আরোহী চীৎকার করিয়া সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু অনুপমা তখন ভয়ে এতটা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার পা তুলিবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না। সে শুধু স্তব্ধদৃষ্টিতে অশ্ব ও তাহার আরোহীর দিকে চাহিয়া রহিল।

আর এক মুহূর্ত্ত পরেই সে ক্ষিপ্ত প্রায় অশ্বের পদতলে বিমর্দ্দিত হইবে। আরোহী প্রাণপণ শক্তিতে রশ্মি টানিয়া ধরিল। উন্মত্ত অশ্ব আর দ্রুত ধাবনে বাধা পাইয়া পশ্চাতের পদদ্বয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং পরক্ষণেই ভীম বিক্রমে লম্ফপ্রদান করিল। সঙ্গে সঙ্গে আরোহী সমেত অশ্ব পথপার্শ্বেস্থ খাদে সশব্দে নিপতিত হইল।

অনুপমা চীৎকার করিয়া উঠিল। অনেক লোক ছুটিয়া আসিল; তাহারা ঘোড়ার নীচে হইতে সংজ্ঞাশূন্য আরোহীকে টানিয়া তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "একি, ডাক্তার বাবু যে!"

অনুপমার কক্ষ হইতে জলপূর্ণ কলসটা সশব্দে মাটীতে পড়িয়া গেল।

বখ্‌সিস

[লেখক—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

১

আজ ১লা!

কেরাণীর অলস-একঘেয়ে জীবনের ঐ তারিখটা কি মধুময়! মাসে একবার না হইয়া এই মধুময় সংযোগটি যদি আরো ঘন ঘন হইত, তবে কি হইত বলা যায় না। পয়লা কেরাণী বাবুদিগের যেমন আনন্দের দিন, মুদী, গোয়ালা কয়লা-ওয়ালা, ধোপারও তদ্রূপ। বাসা বা বাটীর সম্মুখে খাতা হস্তে মুদীর লোক দাঁড়াইয়া আছে, গোয়ালা বালতিটি নামাইয়া বিশ্রাম করিতেছে, কয়লা-ওয়ালার মুটে থলেখানির উপর বসিয়া বাবুর অগমন প্রতীক্ষা করিতেছে ইত্যাদি। প্রথম দর্শনেই এই বহুবজ্র সম্মিলন দর্শন করিয়া বাবু যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, খ্যাঁদা—কই বাবা, আমার লাঠিম এনেছ? পাঁচু—আমাকে লেবেঞ্চুস-স—এবং কন্যাটি আমার রবারের পুতুল কই বাবা?—এবং কন্যা ও পুত্রের গর্ভধারিণী—হ্যাঁ গা, কই তেলটা এবারেও আন্‌লে না! চুল ক'গাছা গেল—সপ্ত বা ততোধিক রথী-রক্ষিত ব্যূহ ভেদ করিয়া নিষ্ক্রমণের কোন উপায়ই নাই, তখন বাবু হতাশ ভাবে ১লা-কে ধিক্কার না দিয়া পারেন না।

এমনি একটি পয়লায় দশটার সময় ডালহৌসী স্কয়ারের সম্মুখে হপার কোম্পানীর আফিসে একটি যুবক প্রবেশ করিয়া, গলির মধ্যে ছাতাটি মুড়িয়া, পকেট হইতে ঝাড়নখানি বাহির করিয়া জুতার ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিলেন। দিব্য সুপুরুষ, কিন্তু চেহারায় আর সে সৌন্দর্য্য নাই। একদিন নাকি ইহার সৌকুমার্য্যে মুগ্ধ হইয়া অনেক কন্যার জনক-জননী ইহাদের গৃহের পথ খুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। হায় রে সেদিন!

টেবিলের পার্শ্বে ছাতাটি দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া রাখিয়া, গলা হইতে চাদর খানি তুলিয়া সযত্নে চেয়ারের পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া তিনি দেরাজ খুলিয়া একটি গেলাস বাহির করিলেন। সেই সময়ে রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে গদাধর বাবু কহিলেন—এই যে সরোজ, আজ পয়লা। খাইয়ে দিচ্ছ ত!

ইত্যবসরে অন্য একটি যুবক আসিয়া দেরাজ খুলিতেছিল, সে বলিল কি

বলেন গদাধর বাবু, তার ঠিকানা নেই। এই দু'টা মাস ধরে বেচারার যে কি বিপদ যাচ্ছে।—

গদাধর বাবু কটাক্ষ করিয়া কহিলেন—আহা, আমি রহস্য করলুম, সেটা আর বুঝতে পারলে না। যাই বল, তোমরা বড় রস-চটা লোক।

সিঁড়িতে মস্ মস্ শব্দ শ্রুত হইল—বাবুরা নিজ নিজ আসনে বসিয়া পড়িলেন। হঠাৎ দেখিলে বাল্যকালের কথা মনে পড়িয়া যায়। শব্দ ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া গেল।

সরোজকান্তি পকেট হইতে 'বেঙ্গলীর' টুকরায় মোড়া একটি পান ও চাটি গুপারী বাহির করিয়া গালে ফেলিয়া দিল। হায় রে সেদিন! তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন সে এ আফিসে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়াছিল, একটী সুন্দরীর চিত্র সম্বলিত সুদৃশ্য কৌটায় ভরিয়া পান আনিত এবং আফিসের অনেকেই সেই ছোট্ট ছোট্ট খিলিগুলির রচয়িত্রীর নৈপুণ্যে শতমুখ হইত। আজ নিজের হাতে দুইটি পান সাজিয়া একটি বাহির হইবার পূর্ব্বে, একটি আফিসে আসিয়া খাইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইল।

আফিসের বড় বাবু এগারোটার সময় আসিলেন। প্রত্যেক কর্ম্মচারীর সম্মুখীন হইয়া একবার কাজ-কর্ম্মের তদারক করাটি তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্মের মধ্যে। সরোজকান্তির সন্নিকটে আসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—কি হে, কাল তোমার হয়েছিল কি?

সরোজকান্তি আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু বলিবার কোন অবসর পাইল না।

এত কামাই চলবে না বলছি—বলিয়া তিনি গদাধর বাবুর দিকে অগ্রসর হইলেন। সরোজের কণ্ঠে অশ্রু যেন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, সে মাথা নীচু করিয়া কাগজ দেখিতে লাগিল।

শনিবার দেড়টায় ছুটি। একটার সময় টিং টিং টিং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গেই বড় বাবু উঠিলেন। বাহির হইতে হইতে বলিলেন—সব একে একে যেও হে!

বড় সাহেবের সম্মুখে বেতন বণ্টন হয়। শ্রেষ্ঠ হিসাবে বাবুরা পর পর যাইয়া বড় সাহেবকে সেলাম করিয়া থাকেন। বড় সাহেব তাঁহার নামের খামটি দেখাইয়া দেন, খাজাঞ্চী সহি নিয়া হর্ষোৎফুল্ল অন্তঃকরণে পুনরায় সেলাম করিয়া বাহিরে আসেন। ইহাই এখানকার পদ্ধতি।

গদাধর বাবু উঠিলেন। গমনকালে সরোজের প্রতি, একটি বঙ্কিম কটাক্ষ করিয়া কহিলেন—এইবার তুমি হে!

তাহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই রামহরক আসিয়া হাস্যমুখে সরোজকান্তিকে এক দীর্ঘ সেলাম করিল। চেষ্টাকৃত একটুখানি হাসি সরোজের ওষ্ঠে দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। রামহরক বড় সাহেবের খাস্ চাপরাসী, আদব কায়দা-দুরস্ত। পুনরায় এক দীর্ঘ সেলাম!

২

এই সেলামের এবং তাহার দৈর্ঘ্যের একটি ইতিহাস আছে। তাহা বলিতে গেলে, একটুখানি পূর্ব্ব কথা বিবৃত করিতে হয়। তিন বৎসর পূর্ব্বে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া সরোজকান্তি হুপার কোংতে ২০৲ টাকা মাহিনায় কেরাণী গিরিতে ভর্ত্তি হন; তখন পিতা জীবিত. তিনি ৬০৲ টাকা বেতনে কোন্ একটা সওদাগরী আফিসে কর্ম্ম করিতেন। সে সময় সরোজ পান খাইত, চুরুট খাইত, পান বিলাইত, চুরুটও দাতব্য করিত। পিতার মৃত্যু হইল, বেচারা নবপরিণীতা বধুকে লইয়া সংসারে একা। আফিসে একটা সাধারণ ইনক্রিমেণ্ট হয়, পাঁচ টাকা মাহিনা তাহারও বাড়িয়াছিল। সংসার বড় নয়, দুইজনের একরকম কষ্টে সৃষ্টে চলিয়া যাইত। সেবার কুমুদিনী বাপের বাড়ী বর্দ্ধমানে গিয়া দুইমাস ছিল। ইহার মধ্যে কমারশ্যাল ইকনমির কোন কথা ছিল কি-না আমরা জানি না, তবে সত্য কথা এই যে, দুই মাসের শেষে সরোজের ব্যাঙ্কে প্রায় কুড়ীটা টাকা জমিয়া গিয়াছিল। বর্দ্ধমান হইতে সীতাভোগ মিহিদানা এবং তৎসঙ্গে ম্যালেরিয়া লইয়া কুমুদ যেদিন কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল, তাহাকে দেখিয়া সরোজের চক্ষুঃস্থির হইয়া গেল। একি মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছে।

কুমুদ বলিল পাড়াগাঁয়ে থাকলেই লোকে ময়লা হয়ে যায়, এ কথাটা আর জান না?

অপরাহ্নে একটু একটু জ্বর হইত,কুমুদ সে-কথা প্রকাশ করিত না; আগেত সন্ধ্যার পর ছাড়িয়া যাইত, ক্রমে অনেক রাত্রিতে ছাড়িতে লাগিল। একদিন সরোজ গায়ে হাত দিয়া চমকিয়া উঠিল—এযে জ্বর!

কুমুদ তাহার হাতটা হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ও একটুখানি হয়েছে। এখনি ছেড়ে যাবে।

সরোজ বিষণ্ণ হইয়া বলিল—ম্যালেরিয়া নিয়ে এলে কুমো!

সরোজ আদর করিয়া কুমো বলিয়া ডাকিত।

কুমুদিনী একটু রাগতঃভাবে কহিল—আমি কি আর ইচ্ছে করে' এনেছি?

ক্রমশঃ জ্বর আর বিরাম হয় না। এতদিন কুমুদিনী অসুখের ভিতরে উঠিয়াই সরোজের ভাত জল যথাসময়েই দিয়া আসিতেছিল, এখন আর পারিল না; চোখের জলে বক্ষ ভিজিয়া গেল, মরণের ইচ্ছা হইতে লাগিল, কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল না।

সরোজ সান্ত্বনা দিয়া বলিল—কেঁদ না কুমো, তুমি সেরে ওঠ। আমার সব দুঃখ দূর হবে;

সারা দূরে থাক, ক্রমশঃই সে নির্জীব হইয়া পড়িতেছিল। পঁচিশ টাকার মধ্যে বাসাভাড়া, আহার, প্রভৃতি খরচ করিয়া রোগের সেবার জন্য খুব অল্পই অবশিষ্ট থাকিত। দেখিয়া সরোজ সকালে একবার করিয়া সে ট্রামে যাইত, তাহা ছাড়িয়া দিল; আফিসে দুই তিন পয়সার খাবার খাইত, তাহাও ত্যাগ করিল। একজন রোগে পড়িয়া শীর্ণ জীর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, আর একজন সঙ্গে সঙ্গেই রোগে না পড়িয়াও তদ্রূপ হইতেছিল।

সেই সময় সমস্ত দুঃখ নিবেদন করিয়া সে একখানি দরখাস্তে বড় সাহেবকে সকল কথা জ্ঞাপন করিয়া বড়বাবুর নিকটে হাজির হইল। বড়বাবু ত অবাক্, ছোকরা সেদিন ৫৲টাকা ইন্‌ক্রিমেণ্ট পাইয়াছে! বলিলেন,—ভারী ব্ল্যাক সিজন, এসব তিনি সাহেবকে দিতে অক্ষম।

নিজের আসনে ফিরিয়া আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সে-যে বড় আশা করিয়াই আবেদন পত্রটি রচনা করিয়া আনিয়াছিল। গভীর রাত্রে নিদ্রাতুরা রুগ্না স্ত্রীর শিয়রে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে-যে ইহা লিখিয়াছিল। হায় হায়! সব বিফল হইল। কুমোকে চিকিৎসা করাইয়া বাঁচাইয়া তুলিবার কোন উপায়ই যে সে দেখিতে পাইতেছে না। তবে কি বিনা চিকিৎসায়, বিনা যত্নে তাহার গৃহ চিরতরে শূন্য হইয়া যাইবে! কল্পিত বিচ্ছেদের আতঙ্কে সরোজের মুখখানা মৃতের মত পাংশু হইয়া গেল। ক্ষণিক চিন্তার পর সে স্থির করিল, একবার নিজেই চেষ্টা করিবে। সাহেব না মঞ্জুর করেন, নিরুপায়! বড়বাবু চটিবেন, চটুন, তাহার কুমোর একটা উপায় হইতে পারিবে ত!

টিফিনের সময় বাহিরে আসিয়া বড় সাহেবের চাপরাসী রামহরককে ডাকিয়া বলিল—রামহরক, একটা কাজ করবে?

বৃদ্ধ চাপরাসী কেমন করিয়া লোককে বশ করিতে হয় জানিত, বলিল—কাহে না করব বাবু!

সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া রামহরকের হাতে দরখাস্তটি দিয়া সরোজ বলিল—সাহেবকে এটি দেবে?

আলবৎ দেব— বলিয়া রামহরক পত্রটি লইয়া খুলিল এবং কহিল—তলব বাড়াইবার চিঠি!

ঘণ্টা খানেক পরে সরোজের কাছে আসিয়া রামহরক ম্লানমুখে কহিল—হইল না বাবু!

ও কি সরোজ! তুমি পড়িয়া যাইবে নাকি? না না চেয়ারটা নড়িয়া গিয়াছিল, বুঝি?

একটু পরে হাসিয়া পুনরায় বলিল—যদি আপনার দশ টাকা মাহিনা বাড়ে, আমাকে কি বখশিশ করবেন, কহিয়ে দিন্‌ ত!

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া সরোজ বলিল, পাঁচ টাকা।

রামহরক কাগজখানি তাহার হাতে দিল। লাল কালীতে লেখা রহিয়াছে—as a Special case, I recomend increament of Rs. 10 from next month. (বিশেষ কারণে আমি দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিলাম) বড় সাহেবের সহি।

সরোজ চক্ষু বুজিয়া ভাবিল, ভগবান, তবে আমার কুমাকে বাঁচান অসম্ভব হইবে না।

রামহরক চলিয়া গেল। আফিসের মধ্যে সেদিন যে একটা বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া গিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝা গিয়াছিল। দুই চারিদিন ধরিয়া কাজেরও বিষম ত্রুটী লক্ষিত হইতে লাগিল, সাহেব নোটিশ দিলেন—এইরূপ হইলে সকলের মাহিনা কমিয়া যাইবে।

রাত্রে কুমোর জরোষ্ণ কপোলে চুম্বন করিয়া সরোজ এই শুভ সংবাদ দান করিয়া বলিল—কুমো, ভগবান যখন এত দয়া করছেন, তখন তোমাকেও এবার তিনি সুস্থ করবেন। সরোজ স্থির করিল—দশ পনেরো টাকা ডাক্তারের জন্য আলাদা করিয়া তুলিয়া রাখিবে, কুমো আপত্য করিল, বলিল—একটা ঠিকে বামুন চাই-ই। আমি শুয়ে শুয়ে সে কষ্ট কিছুতেই দেখতে পারব না। তা হলে আমি কখনই আরাম হইব না।

কি করিবে, তিনটাকা মাহিনায় একটি উড়িয়া বালক নিযুক্ত করিতে হইল।

কুমোকেও মদন ডাক্তার দুই তিনটা ইঞ্জেকসন দিয়াছেন। তিনি বলিতেছিলেন, জ্বরটা বন্ধ আমি করিয়ে দিচ্ছি। তার পর কিছুদিন একটা ভাল যায়গায় ঘুরিয়ে নিয়ে আসুন, চমৎকার উপকার হবে।

দশ টাকা বেতন বৃদ্ধিতে যে পরিমাণ আনন্দ হইয়াছিল, আজ তাহার শত-গুণ নিরানন্দ সরোজকে ঘিরিয়া ফেলিল। হায়! তাহার সম্বল যে পাঁচটি টাকাও নাই। মাসের শেষ, বাজারেও কিছু দেনা হইয়াছে, পয়লা তারিখে মাহিনা পাইলেই শোধ করিবে, এবং আগামী মাসের শেষেও তাহাই হইবে। তবে উপায়!

আজ রামহরক আসিয়া সেলাম করিতেই সরোজের বুকটা ছলাৎ করিয়া উঠিল, পাঁচটি টাকা তাকে দিতেই হইবে। পাঁচ মাসে দিলেও সে গ্রহণ করিবে, না কাজ নাই, উপকৃতের নিকট কোন ক্ষুদ্র কারণেও অকৃতজ্ঞ হইতে তাহার ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল।

৩

গদাধর বাবু ফিরিয়া আসিতেই সরোজ বড় সাহেবের কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইল। সাহেব অল্প হাসিয়া পে সিট্‌টা তাহার সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন— আপনি কাল আইসেন না কেন বাবু?

সাহেব বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গালাতেই কথা কহিতেন এবং তাহাতে একটু আনন্দ বোধ করিতেন।

সরোজ অতি কষ্টে কহিল—আমার পীড়িতা পত্নীকে লইয়া আমি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি।......

সাহেব বলিলেন—হাঁ, হাঁ, আপনার দরখাস্তখানায় দেখিয়াছি, মনে হয়। আপনার স্ত্রীর কি বড়ই অসুখ?

বিদেশী মনিবের এই সদয় কণ্ঠে সরোজ অশ্রুরোধ করিতে পারিল না, সজলকণ্ঠে কহিল—ভগবান কেবল জানেন, এই কয়মাস আমি কি দুঃখই না পাইতেছি। নহিলে, আফিসের সকলের রাগের কারণ হইয়া আপনার কাছে নাচ্‌এল করিতাম না।

সাহেব বলিলেন—সকলেই কি আপনার প্রতি রাগ করিয়াছেন?

সরোজ কোন কথা কহিল না। সাহেব বলিলেন—বাঙ্গালী বাবুদের উচিত এই দশ পাঁচ দিন ছুটি পেলেই সস্ত্রীক হাওয়া বদলে আসা।

সরোজ কি বলিতে যাইতেছিল, সাহেব বলিলেন—সেই করুণ। আপনার

উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, কাজকর্ম্মে আপনার কোন দোষ দেখি না।

সরোজ বাহির হইয়া গেল। রামহরকের হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া তিনখানি নোট পকেটে করিয়া কাজে মন দিল, কিন্তু মন স্থির করিতে পারিল না। তাহার দোকান দেনা ডাক্তারের ফি ও ঔষধের দাম, পাচকের বেতন সব দিতে হইবে। কুমোর জন্য কিছু আঙ্গুর, ডালিম, নেবুও কিনিতে হইবে।

আজ সকালে সে সাগু খাওয়াইয়া আসিয়াছে, ফল টল কিছুই ছিল না— সারাদিন রোগী সেই সাগু খাইয়া আছে৭ গিয়া হয়ত কি রকম দেখিবে, কে জানে!

পাঁচটার অল্প পূর্ব্বে রামহরক পুনরায় সেলাম করিল। এই সেলামের অর্থ বুঝিতে কোন কেরাণীর বিলম্ব হয় না। বড় সাহেব বা ছোট সাহেব ডাকিলেও চক্ষুর ইঙ্গিত সহ সে সেলাম করে। একদিন এই রকম সময়েই ছোট সাহেব ডাকিয়া একটা এষ্টিমেট করিতে দিয়াছিলেন, কাজটি যখন শেষ হইল, রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছিল। আজ তাহার বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল, কেমন করিয়া আজ সে বিলম্ব করিবে! আজ যে তাহার যথাসর্ব্বস্ব পথের পানে চাহিয়া শয্যায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছে!

কাঁপিতে কাঁপিতে বড় সাহেবের কামরায় ঢুকিয়াই দেখিল—বড় এবং ছোট উভয়েই বিরাজ করিতেছিল।

বড় সাহেব কহিলেন আমরা দু'জনে অত্যন্তরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম গুড্ সার্ভিস বোনাস আপনাকে আমরা দিতে পারি।

সরোজের মনে হইল, স্ত্রীর রোগ কাতর মুখের পানে চাহিয়া সে-ও আকাশে হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহার কাণ মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

আপনার চাকরী কত দিন হইল?

সরোজ একটু ভাবিয়া বলিল—আড়াই বছর হয়ে গেছে।

ছোট সাহেবের প্রতি চাহিয়া, বড় সাহেব এক মিনিট কি ভাবিয়া লইলেন, তাহার পর বলিলেন—আড়াই শ' টাকা আমরা আপনাকে দিতে পারি। এবং আশা করিতে পারি যে আপনি পীড়িতা স্ত্রীকে লইয়া কোনও একটা উত্তম স্থানে লইয়া যাইবেন। আপনি কাল দশটার সময় চেক পাইবেন।

সরোজের বক্ষ দুলিয়া দুলিয়া উঠিল।

বড় সাহেব কহিলেন—আমি মিঃ উইলিয়মসন্‌কে বলিয়া দিতেছি, তিনি আপনকে এক মাসের ছুটি পুরা বেতনই দিবেন।

শশাঙ্ক বলিল—"না সতীশবাবু, এ কিছু দৈবদুর্দ্দশা ভিন্ন হতে পারে না, দৈবই ওকে, সুখ যে কিসে কতখানি হতে পারে, তা জানতে দেয়নি, নৈলে আজ ওর মত সুখীই কজন?"

"ও আপনি হয়ত বুঝবেন, আমার কিন্তু জানতে বাকি নেই, এসব লোককেই ভবঘুরে বল্‌তে হয়, এদের ত কোনটায় পিপাসার শান্তি নেই, যতই দেওনা কেন, আরও চাই, এই হচ্ছে ওদের শিক্ষার নিয়ম।"

শশাঙ্ক পুনর্ব্বার নির্ম্মলের হাত ধরিল, জিজ্ঞাসা করিল—"তা হলে এখন কি কর্ব্বি, বাড়ী যাওয়া যে তোর' খুবই' দরকার, সে কথাটা মনে করে দিতে গিয়া আমি আর দুঃখ সইতে পারি না, ওতে যে আমার প্রাণে বড্ড লাগে, তুইত আমাদের বড় আপনার, তোর এমন মতিভ্রম, ভাবতেও যে লজ্জা হয়।"

নির্ম্মলের মুখ লাল হইয়া উঠিল, হাতে হাত রাখিয়া সে অবসন্নের মত বসিয়াছিল, চোখের দুই কোণ ভিজিয়া আসিতে সে দাঁড়াইল, হাত ছাড়াইয়া লইয়া মুখ ঘুরাইয়া জানালাপথে দৃষ্টি করিয়া সে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশের হাত হইতে রক্ষা পাইল বটে, তাহার মন কিন্তু কিছুতেই বশ মানিতে চাহিল না। একটা উপহাস যেন কেবলই তাহার কাণের গোড়ায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—"কিসের জন্য কোন্ আশায় তুমি এই মায়ামরীচিকায় মজে আছ, শোভাই বা কে' নীলিমাই বা কি করিবে, এইত শোভা তোমার মুখে লাথী মেরে চলে গেছে, এম্‌নি নীলিমাও একদিন—"

নির্ম্মল আর ভাবিতে পারিল না, তীব্র বিছার কামড়ে মানুষের সমস্ত গা যেমন জ্বালা করে, তেমনই জ্বালায় সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, শোভাকে ঢাকিয়া নীলিমাকে ঢাকা দিয়া তাহার মনের উপর সেই পল্লীগৃহে বিপন্ন পিতা-মাতার ছবি ভাসিয়া উঠিল। পিতা অসুস্থ, মাতা পাগলের মত হইয়া পড়িয়াছেন, বিমলা একা, নির্ম্মল যেন একটা চাবুকের আঘাতে লাফাইয়া উঠিয়া তখনই বসিয়া পড়িল, পাশে যে শশাঙ্ক ও সতীশ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার মনেও পড়িল না, বিমলার নিরুপায়কাতর সুন্দর মুখখানা মনে করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল, কে যেন তাহার কাণে কাণে বলিল—"সে নাই পারুক, তুমিত তাকে শাস্ত্রমত বে করেছ, তোমার কার্য্য দায়িত্বশূন্য হলে পাপের সীমা থাক্‌বে না।"

পাপপুণ্যের বিচার নির্ম্মল করিত না, তাহার জন্য সে কুণ্ঠিত বা বিচলিত নহে, কিন্তু এই কথাটাই এভাবে সেভাবে মনের একোণে সে কোণে উঁকি

দিতেছিল, "যে তোমারই মুখ চেয়ে আছে, এমন সময়ে সেই বিপন্না অনাথার সাহায্য করাও তোমার উচিত ছিল না কি?"

গৃহখানা নিস্তব্ধ, শশাঙ্ক ও সতীশ যেন পরামর্শ করিয়া তাহার এই অবস্থা-টির জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। সহসা সতীশের পিসীমা আসিয়া দুঃখ করিয়া বলিলেন—"আজ যদি শোভা আমার এখানে থাকত।"

নির্ম্মল তড়িদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, শোভা এখানে নাই, সে একটা মুক্তির শ্বাস ত্যাগ করিতে গিয়া যেন বাধা পাইল, অভাব যেন তাহাকে কেমন একটু পীড়া দিতে লাগিল। পিসী আবার বলিলেন—"সতীশকে এত করে বল্‌ছি, তবু দিদিকে আন্‌বার নামটি করে না, মেয়ে আমার পাগল, হয়ত কত কষ্ট হচ্ছে।"

নির্ম্মল শোভার প্রতি সতীশের এই অবিচারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, সতীশ মৃদুকণ্ঠে বলিল—"পিসীমা, তুমি কিছু এত বুঝ্‌বে না, স্নেহে যে তোমার হৃদয় অন্ধ হয়ে আছে। শোভার এখন ঐ দরকার, আগুনে পোড়া না হলে সোণার রঙ ঠিক হবে না, ওযে ধূলাকাঁদায় জড়িয়ে রয়েছে, তাকেত ঠিক তার স্থানে এনে দেখ্‌তে হবে। আস্কারা দিতে কিছু কম করিনি, আর তার জন্যে ফল ভোগ যতটা কর্ত্তে হয়, তাও করেছি, তবু ত শোভার ভবিষ্যতের দিকে আমাদের চাইতেই হয়।"

"আগে একথা ভাব্‌লেত দোষ ছিল না" বলিয়া নির্ম্মল বিদ্রূপপূর্ণ দৃষ্টিতে সতীশের মুখের দিকে চাহিল। সতীশ বলিল—"ও অনুযোগ আমায় জীবন ভোর সইতে হবে, আর তার জন্যে আমি প্রস্তুতও রয়েছি, পাপ কল্লে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তেই হবে, আর সেই প্রায়শ্চিত্তই যে পাপীর মনের গুরুভার লাঘব করে দেয়।"

ইহার মধ্যে পাপই কোথায়, প্রায়শ্চিত্তই কিসের নির্ম্মল তাহা বুঝিতে পারিল না, মনকে সে এ প্রসঙ্গ হইতে উঠাইয়া লইয়া বাড়ীর দিকে চালিত করিবার চেষ্টায়ই প্রাণপণে করিতেছিল। তাই সে অস্ফুটকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল—"বেশ ভালই হয়েছে, আপদ চুকে গেছে, নৈলে হয়ত এমন সময়েও আমায় আবার জড়িয়ে ধরত।"

ঠিক এই সময়ে বাহিরে শব্দ শোনা গেল, "দাদাবাবু" বলিয়া শোভা ত্বরিতপদে গৃহে প্রবেশ করিয়া সম্মুখের সোফার উপর আসন্নের মত বসিয়া পড়িল।

একটা দমকা বাতাস যেন গৃহের শোভা সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ঝাড় লণ্ঠন শুদ্ধ আলোগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল, আর অজ্ঞাত আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া এই মানুষগুলি একেবারে বজ্রাহতের মত হইয়া পড়িল। কেবলমাত্র সতীশের মুখে কঠোর স্বর শোনা গেল, সে তিরস্কারের স্বরে ডাকিল—"শোভা!"

(৪০)

শোভার গৃহপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই শশাঙ্ক নির্ম্মলের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িল। নির্ম্মল যেন এতক্ষণ এই মর জগতেই ছিল না, ঠেলাগাড়ী যেন তাহার অজ্ঞাতে অনিচ্ছায় লইয়া চলিয়াছে, সহসা বাহিরের কোলাহলে মুখ তুলিয়া চাহিতেই শশাঙ্ক বলিল—"চল এবার বাসায় যাই।"

নির্ম্মল উত্তর করিল না, পথের জনপ্রাবাহের প্রতিই চাহিয়া রহিল, এদিকে ওদিকে কত লোকই যাইতেছে, নির্ম্মল মনে মনে বলিল—"এই যে এত লোক যাচ্ছে, এদের সবারই একটা গন্তব্য স্থান আছে, কেউ দুমিনিটে কেউবা দশ মিনিটে ঠিক স্থানে গিয়ে পৌঁছবে, আর আমি।"

কেহ হাসিতেছে, কেহবা উৎসাহে দীর্ঘ পদক্ষেপ করিয়া তীরের মত ছুটিয়াছে, কাহারও মন চিন্তায় আচ্ছন্ন, মুখ মলিন, দেখিতে দেখিতে নির্ম্মল তন্ময় হইয়া ইহাদের অবস্থার আলোচনাই করিতে ছিল, তাহার গতি মন্থর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া শশাঙ্ক হাত ধরিল বলিল—"হাঁ করে কি দেখ্‌ছিস্।"

নির্ম্মল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"কি দেখ্‌ছি, দেখ্‌বার যে আমার অনেক আছে। দেখ্‌ছি কি জানিস্ শশাঙ্ক, এইত এত লোক যাচ্ছে, এদের মধ্যে সবাই কিছু সুখী নয়, কেউ আনন্দে যাচ্ছে, কেউবা দুঃখে যাচ্ছে, কেউ সুখের আশায় যাচ্ছে, কেউবা দুঃখের পসরা ঘাড় পেতে নিতে প্রস্তুত হয়েই চলেছে, তবু এরা সবাই সুখী, কারণ সবারই একটা নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে, নির্দ্দিষ্ট চিন্তা আছে।

"তা হয়ত আছে।"

"কিন্তু আমার ত ওটি নেই, অনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে, অনির্দ্দেশ্য সুখের আশায়, কার অঙ্গুলীসঙ্কেতে যে কোন্ দিকে ধেয়ে চল্‌ছি, সে কথা যে আমায় কেউ বলে দিতে পারে না।"

কথায় কথায় দুই জন আসিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল, নির্ম্মলকে কদিন পরে দেখিয়া বেয়ারা প্রভৃতি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, সেলাম করিয়া পথ ছাড়িয়া

দাঁড়াইয়া একজন বলিল—"মেম সাহেবের বাড়ী থেকে দুতিনবার লোক এসে ফিরে গেছে।"

শশাঙ্ক ইঙ্গিতে বেয়ারাকে ধমক দিয়া নির্ম্মলের হাত ধরিয়া সটান উপরে চলিয়া গেল। একটা চেয়ার টানিয়া দিয়া বলিল—"বস এখানে, আমি একবার বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে হয়ত দুতিন ঘণ্টা দেরি হবে, এর মধ্যে সব গুছিয়ে নিবি।"

শশাঙ্ক চলিয়া গেল, নির্ম্মল অনন্ত ভাবনারাশি বুকে লইয়া মৃতের মত বসিয়া রহিল। শোভা এভাবে ফিরিয়া আসিল কেন? আসিল ত তাহাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করা হইল না। আর কিছু সেখানে যাওয়া যায় না, সতীশ কি মনে করিবে, না না এতবড় লজ্জার হাতে সে আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। কিন্তু শোভা কি মনে করিবে, এতদিন পরে আসিল, নির্ম্মল কিনা একটা কথাও বলিল না, শোভা কেন এমন কথা মনে করিতে যাইবে। সে এখন অন্যের বিবাহিতা, তাহার সহিত কথা বলিতে যাওয়াই হয়ত অসঙ্গত মনে হইবে। বুক ফাটাইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস নির্ম্মলের নাক দিয়া বাহির হইয়া গেল। পায়ের নখ হইতে চুলের গোড়া পর্য্যন্ত যেন ঝাকানি দিয়া কাঁপিয়া উঠিল।" "শোভা অন্যের স্ত্রী" অস্ফুটস্বরে এই কথা বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বেয়ারা আসিয়া বলিল—"মেম সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন, লোক দাঁড়িয়ে আছে।"

"যা তাকে ভাগিয়ে দে।" বলিয়া নির্ম্মল আবার বসিয়া পড়িল। মনে মনে বলিল—"কিন্তু নীলিমার কি অপরাধ পুনঃ পুনঃ ডেকে পাঠাচ্ছে, কেন তাকে এমন করে প্রত্যাখ্যান কচ্ছি।" চাহিয়া শ্বাস ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল আবার সহচর চিন্তাকেই ডাকিয়া আনিল।

নীলিমার সহিত একবার দেখা করিয়া গেলে দোষ কি। না না সে আর হইতে পারে না, এবার ঠিক বন্ধন কাটাইতে হইবে। কে কার। নীলিমা ব্রাহ্মকন্যা, তাহার বাড়ীতে এত আনাগোনার দরকার। মন বলিল—"হউক না ব্রাহ্মকন্যা, তার কি প্রাণ থাকতে নেই, সে যদি তোমায় ভাল বাসে, যত্ন করে, তবে তুমি কেন তাকে এমন করে অগ্রাহ্য কর্ত্তে যাবে।"

ভাবিতে ভাবিতে ঘণ্টা তিনেক কাটিয়া গেল। শশাঙ্ক ঠিক আসিয়া হাজির হইয়াছে। নির্ম্মলের ত কোন কাজই হয় নাই। শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিল—"নিয়েছিস্ সব গুছিয়ে।"

বিরক্তির স্বরে নির্ম্মল উত্তর করিল—"গোছাতে আবার কি হবে, যা যেমন আছে, থাক্ না।"

"তবে তাই থাক!" বলিয়া শশাঙ্ক ঘরের মধ্যে পাইচারী করিতেছিল। ঠাকুর আসিয়া বলিল—"আহার প্রস্তুত।"

শশাঙ্ক নির্ম্মলের হাত ধরিল, আহার সারিয়া দুইজন যখন গাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে গাউন পরা শোভা ডাকিল—"নির্ম্মলবাবু।"

নির্ম্মলের পিপাসাক্লিষ্ট বুকে যেন এক ফোটা জল পতিত হইল, সে গাড়ীর ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইতেই শোভা জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা যাচ্ছেন।"

শশাঙ্ক হাসিয়া বলিল—"হাকাও।"

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল, নির্ম্মল উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—"দেশে যাচ্ছি, বাবার বড্ড অসুখ!"

(৪১)

"এ কি আবার একটা ব্যবস্থা হ'ল দাদাবাবু!"

শোভার আচরণ ও কথাবার্ত্তায় সতীশ বিষম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, অনিষ্টাশঙ্কায় বুক বার বার কাঁপিয়া উঠিতেছে। উপস্থিত মত আত্মসংযম করিয়া কহিল—"দেখ শোভা, কি যে ব্যবস্থা, কি যে অব্যবস্থা সে কিছু আমি তোর অপেক্ষা কম জানি না, কারণ আর কিছু না হ'ক বয়সে ত বড়, অনেক আগেই আমি পৃথিবীতে পা দিয়েছি, দেখেছিও তোর থেকে বেশী, ভাল মন্দ জ্ঞানও কম হবার কোন কথা নেই।"

সতীশ থামিল, শোভা ঠিক এই যুক্তির উপর নির্ভর করিতে পারিল না, দু'বৎসর দশবৎসর অগ্রপশ্চাৎ জন্মান কিছু জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না, তবু সতীশের কথার প্রতিবাদ করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না, সতীশের আকৃতি ও প্রকৃতি অসিয়া অবধিই তাহার কেমন ভাল ঠেকিতেছিল না। সতীশ আবার বলিল—"না বুঝে মায়ায় ভুলে যে ভুল করেছি, আমি জানি তার প্রতিকার যদি কর্ত্তে হয়, ঠিক এরই দরকার, তাই অনেক খুজে তবেই আমি ওদের পেয়েছি। ছেলেবেলা মা বাপ হারিয়ে যে অন্ধ ভালবাসা আমায় তোর দিক্ দিয়া মুহূর্ত্তে চিন্তা কর্ত্তে দেয় নি, সেই ভালবাসাই আজ উন্মুখ হয়ে আমায় জোর করে বল্ছে, শোভার মঙ্গলামঙ্গল ভালমন্দ তোমার হাতে, তুমি আস্কারা দিয়ে ওকে যে পথে নিয়েছ, ওপথ ওর পক্ষে প্রশস্ত নয়, হিন্দুর মেয়ে আচারভ্রষ্ট

হ'লে ত তার আর কিছু থাকবে না, যেমন ক'রে হ'ক, ওকে তোমায় ফিরিয়ে আনতে হবে।"

সতীশ আবার থামিল, শোভা ক্ষীণশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদু কণ্ঠেই উত্তর করিল—"কি জানি, তোমার এ সব ভালমন্দ কিছু আমি বুঝতেই পারি না। মানুষের চামড়া নিয়ে যতখানি বরদাস্ত কর্ত্তে পারা সে আমি ক'রেছি, যখন পারিনি, তখনই পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছে।"

সতীশ বিস্ময়ে চাহিয়াছিল, শোভা যে কি করিতে কতখানি করিয়া বসিয়াছে, তাহাই ভাবিয়া সে যেন কূল কিনারা দেখিতে পাইতেছিল না। শোভা একাকিনী গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, এত বড় অপরাধ কি তাহারা মার্জ্জনা করিতে পারিবেন। শোভা আবার বলিল "বস্বার একটা জায়গা নেই, একখানা পাখা পর্য্যন্ত জোটে না, চা না খেয়ে ত আমার বুক শুদ্ধ শুকিয়ে গিয়েছে।"

সতীশ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"এই পাখা, চা প্রভৃতি কদ্দিন এদেশে এসেছে তা জানিস্ শোভা ?"

"হয় ত খুব কম দিনই হয়েছে, তবু যার যেমন অভ্যাস।"

সতীশ গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, শোভার কথাটা সমাপ্ত করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল—"তবেই দেখ বোন, যত দোষ তোর এই ভাইটির. এই অভ্যেসটা আমি ক'রিয়েছি, এঁর জন্য কি আর কাউকেও অনুযোগ কর্ত্তে পারি।"

শোভা ভ্রাতার কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না, কি যে তাহার দোষ, কেন যে এতকথা ইহার কিছুই ধারণায় আনিতে পারিল না, জীবনে আজই সে কেমন একটা বাধ বাধ অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। তবু সে জোর দিয়াই বলিল—"যার আছে, সে কিছু ভোগ না করে ভবিষ্যৎ ভাবনায় ছুড়ে ফেলে দিতে পারে না।"

সতীশ ছোট্ট শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"ভবিষ্যৎ ভাবনা কেন বোন, বর্ত্তমানকেই যদি বুঝে চল্‌তে পারতাম, তবে ভবিষ্যৎই আমার কেন অন্ধকার হবে। ভোগেরও একটা মাত্রা আছে, আছে বলে যে তাকে অপব্যয় কর্ত্তে হবে, এমনত কথা নেই, যা রয় সয় সবাইকে যে তাই কর্ত্তে হয়, আর ওর কিছু সীমা নেই, যতই ভোগ কর্ব্বে, ততই তার আশা বেড়ে চল্‌বে, তাতেই যারা মানুষ, তারা এমনই করে ভোগ কর্ত্তে শিখে, অভাবে পড়েও আত্মহারা হয় না,

এক মিনিটের অভাবে অন্ধকার দেখ্‌তে না হয়, যখন যা জোটে তাতেই সন্তুষ্ট হয়।”

শোভার মুখের কথা মুখেই রহিল। ধীরে ধীরে নন্দকিশোর প্রবেশ করিয়া বলিল—“এই যে সতীশবাবু।”

সতীশ যেন আকাশ হইতে পড়িল, লাফাইয়া উঠিয়া অপ্রকৃতিস্থের মত নন্দকিশোরের হাত ধরিয়া বাষ্প গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—“এ যে আমার হাতে আকাশের চাঁদ, এত বড় অপরাধ এমন করে ক্ষমা কর্ত্তে পারা, সেত সহজ নয়! ডেকে আন্‌তে পার্ব্ব, এমন ভরসাও ত হয় নি।”

ধীরে ধীরে নন্দকিশোর উত্তর করিল—“অপরাধী’ বলে তাকে যদি বাদ দিয়ে বসতে চেষ্টা করা যায়, তবে যে তার অস্তিত্বই লোপ পাবে, অপরাধ বেড়েই চল্‌বে। বাবা বলেন যেখানেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, সেখানে অপরাধেরও ক্ষমা আছে, অপরাধীকে টেনে নিয়ে শেষ রক্ষার চেষ্টা করা যায়।” বলিয়া নন্দকিশোর থামিতেই সতীশ যেন তন্ময় হইয়া দুই বাহুতে তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিল, শোভা চক্ষের সম্মুখে একটা ছায়া বাজীর দৃশ্য দেখিয়া না বলিতে পারিল একটি কথা, না পারিল এক পা নড়িতে। বোকার মত চাহিয়া, চাহিয়া সে এই দুইটি আলিঙ্গনবদ্ধ যুবককে দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া লইল।

ক্রমশঃ

পরপারে।

সমুদ্রের ধারে ছিল তার ছোট্ট কুটীরখানি। বনলতার রঙ্গিন তুলিকায় বিশ্বকর্ম্মার নিপুণ ও শ্যামল রেখা পাতে কুটীর খানির বাহিরের সৌন্দর্য্য মহিমময় গরিমায় আপনি ফুটিয়াছিল।

কুটীরখানির ভিতরের সৌন্দর্য্যও কম গরীয়ান ছিল না। বাহিরের তাজা সবুজ লতায় কারুকার্য্যের মতো ভিতরে ছিল একখানা তরুণ কিশোরী হৃদয়; কিশলয়ের মতোই তাহা স্নিগ্ধ তাজা, ঝরণার স্ফটিক জলের মতোই স্বচ্ছ ও চঞ্চল।

দিকে দিকে তা'র সৌন্দর্য্যের ঢেউ প্রভাতের তরুণ অরুণ মদিরার মতো ছড়াইয়া পড়িতেছিল। স্পর্শমণির পরশ যেমন করিয়া রাংতাকে সোণা করিয়া দেয়, তেমনি করিয়া তার সৌন্দর্য্য-রশ্মির রঙিন আলো দিগ্বিদিকের তরুণ হৃদয়-মন্দির সিক্ত করিয়া তুলিতেছিল।

কত দেশ হইতে কত যুবক তাহার পাণি প্রার্থী হইয়া আসিল, কিন্তু সিন্ধুতটে ব্যাকুল-উর্ম্মিরাশি আসিয়া যেমন করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া ফিরিয়া যায়—তেমনি করিয়া প্রাণভরা নিরাশার যাতনা লইয়া তাহারা সকলেই ফিরিয়া গেল।

চাঁদিনীরাতে সিন্ধু-সৈকতে বসিয়া আনমনে কিশোরী কোন অনুদ্দিষ্টের উদ্দেশে মন-মাতানো প্রাণ-কাঁদানো সঙ্গীতে বিভোরা ছিল। সে গান দিগন্তের সুপ্ত প্রকৃতিকে বিরাট করুণ বেদনায় ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল। সঙ্গীতের তালে তালে ফুটিয়া উঠিতেছিল সেই তরুণ হৃদয়ের করুণ আবেগ।

মখমল মোড়া জরীর কাজ করা খামের ভিতরে সুদূর প্রবাসী প্রণয়ীর আবেগপূর্ণ চিঠির মতই তাহার অন্তরে ভরা ছিল একখানা প্রণয়-পাগল স্বচ্ছ প্রাণ!

সেই হৃদয়খানিকেই উপহার দিবার জন্য উহা বড় আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কই আজিও তো সে চির-বাঞ্ছিত চির ঈপ্সিত প্রাণের দেবতা এখনো সে যত্নে রচা অর্ঘ্য গ্রহণ করিল না;

যে অর্ঘ্য একবার দেবতার চরণে সে নিবেদন করিয়াছে তার পরে তার আর কোনো অধিকার নেই, সে শুধু এখন আমরণ সেই অর্ঘ্যথালা আগুলিয়া বসিয়া থাকিবে—তার দেবতার প্রতীক্ষায় ?

ওকে ! কেগো !—ওই দূরে কাহার অস্পষ্ট অথচ স্নিগ্ধ মূর্ত্তি তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। চরণের তালে তালে বাজিতেছে যে মধুর রাগিনী—সে তো শুধু তার প্রাণের রুদ্ধ গুঞ্জনকেই অভিব্যক্তি দিতেছে ! ওকে !—এমন করিয়া প্রাণের গুপ্ত বেদনা যার চরণের তালে তালে ঝঙ্কারিয়া উঠিতেছে। নিশুতি রাতের অন্ধকারময় স্তব্ধ আবরণের গোপন কাহিনীটুকু ব্যক্ত করিয়া দিল—কে সে—সে কেগো !

একি ! তার হৃদয় মন্দিরে এতকাল ধরিয়া যাহার মূর্ত্তি প্রণয়ে অর্ঘ্য-চন্দনে অভিষিক্ত ছিল, এযে সেগো—সেই ! মানস পটে ধেয়ানের রংএ যাহার মূর্ত্তি আঁকা, কিশোরী হৃদয়ের নীরব সাধনা যাহার অর্চনা করিতেছিল আজ সে ধরা দিয়াছে।

নিবিড় আবেগে তরুণী তাহার চির-কাম্য দেবতাকে বক্ষের মাঝে জড়াইয়া ধরিল।

যুবকও আযৌবন এই কিশোরীকেই খুঁজিয়াছে। প্রাণের সমস্ত ব্যাকুল ভালবাসা অন্তরে স্তুপীকৃত ছিল—এই কিশোরীকেই উপহার দিবার জন্য !

দুইটী অজানা হৃদয়ের মাঝে যে একটী ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম সূত্র এতকাল ধরিয়া গোপন ছিল, আজ তাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

চাঁদিনী রাতের ভরা চাঁদ তখন আশীষ ভরা সকৌতুক কিরণ রশ্মিতে তাহাদের মিলন-ব্যাকুল হৃদয় দুইখানি প্লাবিত করিয়া দিতেছিল, পূর্ণিমার চাঁদের মতোই আজ তাহা কূলে কূলে উদ্বেলিত।

দুইটী মুগ্ধ হিয়া যখন এমনি করিয়া কল্পলোকের স্বপ্ন-ঘোরের মদিরায় বিভোর ছিল তখন অদৃশ্যে বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস তাহাদিগকে উপহাস করিতেছিল।

যুবকের প্রেম-বিহ্বল নির্ব্বাক নিমেষহারা আঁখি, দুটী কিশোরীর হৃদয়

অমরার সুধাধারা সঞ্চিত করিতেছিল, এমন সময়ে কাহার তীব্র দংশনে তরুণী চমকিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল এক বিষধর ফণী তীব্র গরল ঢালিয়া পলাইতেছে।

বজ্রাহত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে সে যেমন করিয়া নিস্পন্দের মত ঢলিয়া পড়ে—তেমনি ভাবে যুবক সিন্ধু-সৈকতে নিশ্চল ভাবে বসিয়া পড়িল।

জ্ঞান হইলে যুবক চাহিয়া দেখিল তাহার কোলে মাথা রাখিয়া প্রস্তর মূর্ত্তির মত কিশোরী ঘুমাইতেছে। মৃত্যুর পাণ্ডু ছায়া তাহার সমস্ত দেহে ঘনীভূত, শুধু ওষ্ঠপুটে বিদায়ের করুণ হাসিটুকু অম্লান ভাবে মুক্তার মতো লাগিয়া রহিয়াছে।

পাগলের মতো সে উঠিয়া দাঁড়াইল—তার প্রিয়তমার মৃত্যু হয় নাই, হইতে পারে না। অন্তরে বাহিরে সমস্ত বিশ্বজগতে আজ সেই কিশোরীর মূর্ত্তিই সজাগ হইয়া রহিয়াছে।

দূরে ফুলের বনে দক্ষিণ হাওয়া উষার রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া কেতকী ফুলগুলিকে যখন নাড়া দিতেছিল, তাহার প্রিয়ার স্নিগ্ধ হাসিটীই বুঝি ওর মাঝে লুকাইয়া তাহার সঙ্গে লুকোচুরী খেলিতেছে! বৃক্ষে পাতা নড়িতেছিল, যুবক ভাবিল প্রিয়ার আহ্বান তাকে ইঙ্গিত করিতেছে; গগনে পবনে অনিলে সলিলে আজ তাহার প্রিয়ার সেই মধুর হাসিটী লুকাইয়া রহিয়াছে, বাহু প্রসারিয়া ব্যাকুল বেগে সে বলিতেছে, ওগো এসো প্রিয়তম আমার বক্ষে, ধরণীতে সুখ নাই, এসো বন্ধু এই চির নবীনতার শ্যামল স্নিগ্ধ ক্রোড়ে, এখানে বিরহ বিহীন মিলন, অমলিন শান্তি, অফুরন্ত সুখ! এসো দয়িত চিরাকাঙ্ক্ষিত বন্ধু মোর! এসো, এসো গো!"

পাগলের মতো সে আজ ছুটিয়াছে; কত নদী নির্ঝর মরু প্রান্তর, গিরিকন্দর পিছনে রাখিয়া সে আজ উন্মত্তের মতো প্রিয়ার সন্ধানে ছুটিয়াছে; কোনো দিকে দৃষ্টি নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই, আছে শুধু সারা অন্তর ব্যাপি এক করুণ ব্যাকুল উন্মাদনার বিরাট ক্রন্দন।

পাহাড়ের উপর দিয়া সে ছুটিয়াছে—ওই যে তাহার প্রিয়তমা তাহার

সম্মুখে পরপারের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছে। ওখানে পৌছিলেই তার চির বিরহের অনন্ত সমাধি। উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে ছুটিতে লাগিল।

পরদিন পর্ব্বতের সানুদেশের অধিবাসিগণ দেখিতে পাইল কে একজন পাহাড়ের তলে মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

ষষ্ঠ বর্ষ } পৌষ, ১৩২৫ { ৯ম সংখ্যা

ননদ-ভাজ

[শ্রীমতী সুমতি বালা বসু]

বোসপাড়ার অগ্নিকাণ্ডটা খুব ভারীরকম না হইলেও তাহাতে যে তিনচারি ঘর গরীবের সর্ব্বনাশ করিয়া দিয়াছিল, তাহাদেরই মধ্যে এক বৃদ্ধা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বছর বারো বয়সের একমাত্র নাতনীর হাত ধরিয়া যখন মিত্তিরদের বাড়ী আসিয়া ঢুকিল তখন পরিমল খাওয়া দাওয়ার পর দুপুর বেলা সদোরের বারাণ্ডায় খেলাঘর পাতিয়া গুছাইতে ছিল। তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল "গিন্নী কোথায় মা ?"

"কে, মার কথা জিজ্ঞাসা করছো ? বলিয়াই পরিমল মুখ তুলিয়া চাহিতেই বালিকার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। আর খেলায় মন বসিল না, একটুখানি চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়াই বলিল—"চল তাঁর কাছে নে যাচ্ছি।"

বলিয়াই তাড়াতাড়ি ভিতরে ছুটিয়া গিয়া বলিল "মা মা দেখ কারা এসেছে।"

কমলা ঘরের বাহির হইয়া বৃদ্ধাকে দেখিয়াই আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি, দিদি তুমি ? অনেক দিন এস নি—সব ভালতো ?"

বৃদ্ধা ছল ছল চোখে বাধ বাধ স্বরে বলিল—আর বোন পরশুকার আগুণে সর্ব্বনাশ করে, আমায় পথে দাঁড় করিয়ে দে গেছে।"

বলিতে বলিতে তাহার স্বর বাধিয়া গেল. চোখের জল গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। কমলার মনে বড় কষ্ট হইল, সহানুভূতির স্বরে বলিলেন—"আচ্ছা

তা এস দিদি, বোস বোস, কি করবে বল, সব বরাত—মানুষের তো হাত নেই। ওটি কে ?"

"ওটি আমার নাতনী, বংশের একমাত্র চিহ্ন, আর সবাইকে যমে নেছে। সেই পাঁচ বছরেরটি দেখেছিলে, তারপর বাবা মার সঙ্গে বিদেশেই থাকতো। বছর দুই হল সবাইকে হারিয়ে এসে আমার বাঁধন বাড়িয়েছে।

বৃদ্ধার চোখ দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল। কমলা মিষ্টস্বরে কহিলেন—"আহা দিব্যি মেয়ে, বেঁচে থাক, তা তোমাদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো ?"

"আমার তো আজ একাদশী, পারুলকে পাড়ার এক বামুন বাড়ী থেকে একমুঠো খাইয়ে এনেছি।"

"তা এখানে আর দাঁড়িয়ে কেন, ঘরের ভিতর বসবে চল ; সেইখানে বসে কথাবার্ত্তা কইব।"

পরিমল এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। হঠাৎ পারুলের হাত ধরিয়া যেন কতকালের পরিচিতার মত বলিল—"তা ওঁরা ভিতরে বসে কথা কোন্‌গে, তুমি এস ভাই আমার খেলাঘরে যাই।"

বলিয়া আর জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই পারুলকে টানিয়া লইয়া তাহার খেলাঘরে চলিয়া গেল।

কমলার স্বামী অনিলকুমার স্ত্রীর ঘাড়ে দুইটি ছেলে এবং চার বছরের মেয়ে পরিমলের ভার চাপাইয়া দিয়া যখন ইহলোক ছাড়িয়া যান, তখন সেই মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে পত্নীকে বলিয়া গিয়া ছিলেন—"দেখ, গেরস্ত ঘরে মেয়ের বিয়ের চেয়ে বেশী বিপদ আর কিছুই নেই। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে তোমার দু'দুটি ছেলে—অরুণকে আমি একরকম দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলুম। কিন্তু বরুণের ভার তোমার। সে সবে এ বছর আই, এ দেবে, এরই মধ্যে লোকে বাড়ীর মাটী রাখছে না। এরপর কন্যাদায়গ্রস্ত লোকের আনাগোনায় অস্থির হয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু দেখো, ছেলে ভাল বলে সেই গুমোরে তোমার মাথা গরম না হয়। প্রাণের দায়ে যাঁরা তোমার দ্বারস্থ হবেন, তাঁদের ওপর যেন খাঁড়া শানিয়ে ধরোনা। বরং ঘরের পয়সা খরচ করে ভিখিরী কাঙালের ঘরের একটি শান্ত শিষ্ট লক্ষ্মী মেয়ে বৌ করো, তবু টাকার লোভে

ছেলে বেচোনা। তাহলে ভগবান মুখ তুলে চাইবেন। তোমার পরিকে তিনি রাজার ঘরে রাজরাণী করে দেবেন।"

কমলা এই ছ' বছর ধরিয়া স্বামীর সেই শেষ কথা গুলি মনে মনে জপমালা করিয়া রাখিয়াছিলেন! সুতরাং বরুণ কুমার বি, এ, পাশ করার পর মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত অন্ততঃ একশো জন বড় লোক, নগদ পাঁচ ছয় হাজার পর্য্যন্ত কবলাইয়াও তাঁহাকে জামাই করিতে পারেন নাই। তাঁহার বড় ভাই অরুণেরও বছর দুই হইল স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে এবং তিনিও আর বিবাহ করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং বাড়ীতে এক কমলা ভিন্ন আর অন্য কেহ গৃহিনী নাই।

কথাবার্ত্তায় বেলা পড়িয়া গেলে কমলা বৃদ্ধাকে বলিলেন—"তা দিদি তুমি আর সে পোড়া বাড়ীতে পারুলকে নিয়ে রাত্তিরে কোথায় গে থাকবে, এই খানেই থাক না কেন?"

বৃদ্ধা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"গরীব দুঃখীদের ওপর তোমাদের দয়ার কথা বোন পাড়ার শতমুখে গায়, তোমার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হোন্। কিন্তু বোন্, শুধু দুটো একটা দিনের আশ্রয় চাইতে আমি আসিনি, যদি দয়া করলে তবে আমার পারুলকে চিরকালের মত দাসী করে রেখে একটু আশ্রয় দেও—আমি নিশ্চিন্তি হয়ে ভিক্ষে শিক্ষে করেও শেষ কটা দিন কোন রকমে কাটিয়ে দেব। ওগো আমরা বড় গরীব গো—পথের কাঙ্গাল, কড়ার সম্বল নেই—মুখ তুলে চাইবার যে কেউ নেই।

বলিতে বলিতে বৃদ্ধা এমন ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন যে তাঁহার দুঃখে কমলার চোখেও শতধারা বহিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল প্রাণ দিয়াও তাঁহার দুঃখ দূর করেন। প্রাণের আবেগে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"তুমি নিশ্চিন্তি হও দিদি, পারুল আজ থেকে আমার মেয়ে হল, ওকে আমার ঘরের লক্ষ্মী করে বরণ করে নেব।"

পরের দিন বরুণ কুমার মায়ের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বলিলেন—"মায়ের সাধ পূর্ণ করবোনা তো ছেলে হয়েছি কেন? তিনি যে আমার সাক্ষাৎ জগদম্বা, তাঁর আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে নিলুম।

পারুলের সঙ্গে বরুণের বিবাহ। পাড়াময় ভারি একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। দলে দলে ধনকুবেরগণ আসিয়া রাশি রাশি টাকা কবলাইয়াও যে ছেলের সঙ্গে

মেয়ের বিবাহ দিতে পারেন নাই, আজ ঘরবাড়ী শূন্য পথের কাঙাল বোস্ বুড়ী তাহাকে কোন কুহক বলে ভুলাইয়া নাত্ জামাই করিতেছে—এই কথাটা শতমুখে একশোবার একশো রকমে কেবলই তোলাপাড়া হইতেছে। কমলার কাণেও যে সে সব কথা পৌঁছায় নাই এমন নহে, কিন্তু তিনি সে সব কথায় কাণ না দিয়া স্বামীর শেষ আদেশ পালন করিতে প্রাণপণ করিতেছেন।

আর যতই তাঁহার গৃহে বিবাহের উৎসব আয়োজন চলিতেছে ততই মৃত-স্বামীকে স্মরণ করিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে. কেবল শুভদিনে চখের জল ফেলিলে পাছে পুত্রের অকল্যাণ হয় সেই ভয়ে অতিকষ্টে কোনমতে সামলাইয়া লইতেছেন। তবুও পোড়া মন বাধা মানিতেছে না, থাকিয়া থাকিয়া জলধারা ফোয়ারার মত বুক ঠেলিয়া চোখের কোণে উপ্চাইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু তবুও কমলা কর্ত্তব্য ও অনুষ্ঠানের ত্রুটি করেন নাই। নিজের অর্থে বোসপাড়ার ভিতরে বৃদ্ধা ও পারুলের জন্য দিনকয়েকের মত একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া দিয়া সকল খরচ জোগাইতেছেন, সেইটিই হইয়াছে কনের বাড়ী।

বিবাহের দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বর খুব ঘটা করিয়া বাহির হইতে যাইবে। এমন সময় এক নিদারুণ সংবাদ আসিল। কনের ঠাকুরমা হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর দ্বারস্থ হইয়াছেন। এই সংবাদে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল।

বরপক্ষীয় সকলেই পারুলকে অলক্ষুণা বলিয়া বিবাহ বন্ধ করিয়া দিতে চাহিলেন। কমলার ভ্রাতা লালমোহন জোর করিয়া বলিলেন—"এমন হাভাতে ঘরের অলক্ষুণে মেয়ের সঙ্গে কখনই আমি ভাগ্নের বে হতে দেবনা। তোমরা এখন বর নিয়ে যাওয়া বন্ধ কর, এক ঘণ্টার ভেতর আমি ফিরে আস্‌ছি, আমাদের গাঁয়ের জমীদার চৌধুরী বাবুর মেয়ের সঙ্গে এই লগ্নেই বরুণের বে দেব। মরুক বোস্ বুড়ী—ও মেয়ের যা হয় হোক্। বোন্ আমার যেমন বে আক্কেলে, কোথাকার একটা লক্ষ্মী ছাড়া ভিখিরির মেয়ের সঙ্গে ছেলের বে দিতে যাচ্ছে, ভগবান তা সইবে কেন—যে যেমন, তার তো তেমন ঘর হওয়া চাই। আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি, খবরদার কেউ বর বার করো না।"

বলিয়া লালমোহন সেইদণ্ডেই চৌধুরীবাবুর মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তখন বাড়ীতে একটা ভয়ানক হৈ হৈ কাণ্ড আরম্ভ হইল। সেই

গোলমালের ভিতরে পারুলের এক জ্ঞাতি মামা নিঃশব্দে আসিয়া একেবারে অন্তঃপুরে ঢুকিয়া কমলার কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল—

"রক্ষে কর মা দয়াময়ি! হতভাগী পারুলের এ দুনিয়ায় আপনার বলতে ওই ঠাকুরমা ছাড়া আর কেউ নেই—ভগবান তাকে কেড়ে নিতে এসেছেন, সে বালিকার তাতে কি অপরাধ? এখন যদি এ বিয়ে না দেও—তাহলে ও হতভাগী রাত পোহালে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে মা? আর কে দয়া করে ওকে বে করবে? কায়েতের মেয়ের যে সর্ব্বনাশ হয় মা?"

পরুলের ঠাকুরমার হঠাৎ কলেরার কথা শুনিয়া কমলা একেবারে পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে বাহিরে বাহিরে তাঁহার দাদা লালমোহন যে এমন কাণ্ড বাধাইয়া অন্য মেয়ে ঠিক করিতে গিয়াছেন—সে সংবাদ শুনেন নাই। এক্ষণে পারুলের মামার মুখে সকল শুনিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন—"কার সাধ্য এ বিয়ে ভাঙ্গে—আমার ছেলে বরুণ। এখুনি বর নে' যাও, রাত আটটায় যে লগ্ন আছে—সেই লগ্নেই বে দিয়ে দেও। কি জানি খারাপ ব্যামো—যদি মন্দ ঘটে, তবে এক বছর পারুলের কাল অশৌচ হবে। শীগ্‌গির নিয়ে গে দু হাত এক করে দেও। আমি নিজে ডাক্তারের ব্যবস্থা করে নিয়ে যাচ্ছি রোগী দেখিগে—তোমরা এদিক ঠিক কর—লগ্ন ভ্রষ্ট না হয়।"

"মা তুমি দেবী" বলিয়া পারুলের মামা বর লইয়া প্রস্থান করিল।

৪

সতীবাক্য ব্যর্থ হইবার নয়। দুই বৎসর হইল বরুণের বিবাহ হইয়াছে। কমলা সেই যে "আমার ঘরের লক্ষ্মী" বলিয়া গরীবের মেয়ে পারুলকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়া ছিলেন, সেই হইতে পারুল প্রকৃতই লক্ষ্মীরূপিণী হইয়া কমলার সংসার যেন সহস্রগুণে উজ্জ্বল—শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। বৌয়ের গুণে শাশুড়ী ননদ এবং ভাসুর যেমন মুগ্ধ, বাড়ীর ঝি চাকর গুলো—এমন কি পাড়া প্রতিবাসীগণ পর্য্যন্ত তেমনি মুগ্ধ। চারিদিকে পারুলের সুখ্যাতি শতমুখে।

আর বরুণের বোন—পরিমলের তো কথাই নাই। পারুল ও পরিমল যেন দুই দেহে এক প্রাণ, এমনি দুজনের স্নেহ ভালবাসা। এই বৌ লইয়া বড় সুখেই কমলার দিন যাইতেছে।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখ কাহারই অদৃষ্টে ঘটে না। পারুলের

বিবাহের বছর দুই আড়াই পরে কমলার সুখের সংসারাকাশে দুঃখের মেঘ ঘনাইয়া আসিল।

সে বছর কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ বড় বাড়াবাড়ি। বরুণের বড়দাদা অরুণ রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সভ্য ছিলেন। সেই মহামারীর দিনে মিশনের সকলেই প্রাণপণ করিয়া প্লেগগ্রস্ত দরিদ্রের সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং দেখিতে দেখিতে কয়েক দিনের ভিতরে অরুণও প্লেগাক্রান্ত হইয়া মারা গেলেন।

কমলা এই নিদারুণ পুত্রশোক বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। দিবারাত্রি পুত্রের শয্যা পার্শ্বে থাকিয়া থাকিয়া তিনিও সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। বরুণ কুমারের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—দশদিক অন্ধকার দেখিলেন। শাশুড়ীকে হারাইয়া পারুলেরও মাতৃশোক যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল। আর পরিমল?—সে কেবল দিন রাত ধরিয়া ভূমে লুটাইয়া মা মা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুখের সংসারে দুঃখের তুফান ছুটিল।

কিন্তু সময় বড় চমৎকার ঔষধ, সময়ে অতি বড় শোকও আপনিই জুড়াইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে বছর খানেকের ভিতরে বরুণের সংসারেও শোকভার লাঘব হইয়া আবার হাসি খুসি আমোদ আহ্লাদের দিন আসিল।

দিন আসিল বটে, কিন্তু একটা বিষয়ের ভাবনা বরুণ ও পারুলের বুকে পাষাণের মত চাপিয়া বসিল। পরিমল বারো ছাড়াইয়া তেরোয় পা দিয়াছে, তার উপর বাড়ন্ত গড়ন—আর বিবাহ না দিলে চলে না।

পারুল পরিমলকে একদণ্ড চোখের আড় করিয়া থাকিতে পারে না, বিবাহ হইলে পরের বাড়ী যাইবে তখন কেমন করিয়া থাকিবে, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তবু সুপাত্র সন্ধান করিবার জন্য স্বামীকে দিনরাত খোঁচাইতে ছাড়িতেছে না। রাত্রে বরুণ কুমার শয়ন করিতে আসিলে পারুল একটু দংশন করিবার অভিপ্রায়ে বলিল—

"তা হলে এইবারে তুমি শোও, আমি গিয়ে ঠাকুর ঝিকে পাঠিয়ে দিই?"

বরুণ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

"বোনটিকে তো প্রাণ ধরে পরের ঘরে পাঠাতে পারবে না, কি আর করবো—আমিই সতীন করে নিই?"

বলিয়া পারুল ঠোঁট চাপিয়া একটু হাসিল, কিন্তু বরুণ কুমার একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

"তুমি কি ভাবছো পারুল, যে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি? কিন্তু কি যে গ্রহের ফের, কিছুতেই সুপাত্র জোগাড় করতে পারছি না। একটু চলনসই যে পাত্র তারই দাম নগদ পাঁচ হাজার?

"তা আর কি করবে বল, আমার যা কিছু গয়না গাঁটি আছে, সে সমস্তই আমি ঠাকুরঝিকে দেব—তবু ভাল ঘর বরে দেওয়া চাই। কিন্তু আর দেরী করলে চলবে না—ভয়ানক বেড়ে উঠেছে, দেখলে ছেলের মা মনে হয়, সেটা নজর রাখ কি! আর এদিকে পাড়ার লোকেও কত বলছে।"

গয়না দেবার হাত তোমার, কিন্তু বর জোটাবার হাত তো কারুর নেই; যিনি জোটাবার কর্ত্তা তিনি যেদিন জোটাবেন সেই দিন হবে।"

"বারে, দৈবের মুখ চেয়ে যারা এমন চুপ করে বসে থাকে, তারা তো কাপুরুষ—দৈব তাদের ওপর সদয় হন না, কিন্তু যারা পুরুষকারের বলে চেষ্টা করে, ভগবান তাদের সহায় হন।"

"এই যে টোলের ভটচায্যি হয়ে উঠেছ, বাঃ বাঃ তবে আর ভাবনা কি?"

বলিয়া বরুণ মুচকিয়া হাসিল, পারুল কৃত্রিম কোপে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিল—

"যে আজ্ঞে, এখন থেকে তবে বিধেন নিয়ে চলো। আমি হুকুম করছি, আসছে মাসেই ঠাকুরঝির বে দেওয়া চাই, তা যেমন করে হোক, নাহলে আমি আর মুখ দেখাতে পারিনি।"

তাকে পরের ঘরে পাঠিয়ে থাকতে পারবে তো—না তখন পা ছড়িয়া কাঁদতে বসবে, এক দণ্ড তো চোখের আড় হলে বাঁচনা।"

"তা বলে কি নিজের সুখের জন্য তার আখের নষ্ট করবো! স্বামীই যে মেয়েমানুষের ইহকাল পরকাল—জীবনের শ্রেষ্ঠ দেবতা। সে দেবতার হাতে না দিয়ে আমার ধরে রাখবার অধিকার কি?

"তবে শোন—বোধহয় একটা সম্বন্ধ লাগলো, কাল তারা পরিকে দেখতে আসবে, যদি মেয়ে দেখে পছন্দ হয় তো, খাঁই মোটেই করবে না। পাত্রটিও ভাল, ওই এক ছেলে, পয়সা কড়িও মন্দ নেই, একটি বোন আছে তার বিয়ে হয়ে গেছে। যদি বরাত ভাল হয় তো পরি সত্যিই সুখে থাকবে।"

"বটে, তবে এইখানেই যাতে হয় তার চেষ্টা কর।"

"মেয়ে দেখে পছন্দ হলে তো ?"

"ইঃ, আমার ঠাকুরঝিকে দেখে যে পছন্দ না করবে সে তো কানা! তার ওপর যা করে সাজিয়ে দেবো—মুনির মন টলে যাবে, দেখে নিও তখন। নিজে একটু সামলে থেকো দেখে, যেন হোঁচট্ খেওনা।"

বলিয়া হাসিতে হাসিতে ঝড়ের মত বাহির হইয়া একেবারে পরিমলের ঘরে গিয়া তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া তুলিল। বলিল—

"ওঠ্ ছুঁড়ী তোর বিয়ে!"

৫

পারুল সত্যই বলিয়াছিল যে পরিমলকে সাজাইয়া মুনির মন টলাইবে। হইলও তাহাই, যাঁহারা দেখিতে আসিয়া ছিলেন, তাঁহারা এমন মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে একেবারে পাকা দেখিয়া দিন স্থির করিয়া গেলেন। তারপর ধুমধামের সহিত পরিমলের বিবাহও সুসম্পন্ন হইয়া গেল।"

বর-কণে বিদায়ের সময়ে পারুল দুটি চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে হরিচরণের হাতে পরিমলের হাত দুখানি স্থাপন করিয়া গদ গদ স্বরে কহিল—

"ঠাকুর জামাই, এ সোনার পুতুল, এতদিন আমার ছিল, আজ তোমায় দিলুম. এর একমাত্র দেবতা তুমি, ইহকাল পরকালের বিধাতা। ঠাকুরঝি ছেলেমানুষ, এতদিন কেবল আদরে আদরেই বেড়েছে, সংসারের কিছুই জানেনা দোষ ঘাট যা করে—অন্যে না ক্ষমা করুক, তুমি ক্ষমা করে নিও। বড় ঠাণ্ডা, আবার বড় অভিমানী, মুখ ফুটে বেশী কথা বলতে পারে না, মনে মনে গুমরে থাকে, তুমি ভাই ওর মন বুঝে সুখী করো—তোমার সংসারে লক্ষী অচলা হবেন।"

পরিমলও কাঁদিয়া হাত ভাসাইতেছিল, তাহার দিকে ফিরিয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিল—"ঠাকুরঝি আর কেঁদনা, ভাই তোমার বিশ্বেশ্বরের হাতে যখন সঁপে দিলুম ওই চরণে স্থান পেলে—তখন উনিই ধর্ম্ম মোক্ষ—এ জীবনের এ জগতের সার সর্ব্বস্ব, ওই ধর জন্ম জন্ম কর। পতিই সতীর সর্ব্বস্ব এই কথাই জপমালা করে রেখো।"

উভয়ে পক্ষেরই অবিশ্রান্ত রোদন রোলের ভিতরে বরকণে বিদায় হইয়া গেল। এখন সমস্ত সংসারটা পারুলের এমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিল যে সে আর কিছুতেই মন বাঁধিতে পারিলনা—কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ঢুকিয়া বিছানা লইল।

সে কান্না থামিল আবার কখন—যখন শ্বশুর বাড়ী হইতে বিয়ের কণে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু মাস দুই যাইতে না যাইতে পারুল বুঝিল যে তাহারা যেমন বড় সাধ করিয়া পরির বিবাহ দিয়াছে সে শ্বশুরবাড়ী তেমন সুখের হইবে না। দুমাস পরেই পরির শাশুড়ী একটা কাজের ছুতা করিয়া সেই যে বিয়ের ক'নে লইয়া গিয়া বাড়ীতে আটক করিল, কিছুতেই আর বাপের বাড়ী মুখো হইতে দিলনা। বরুণ কুমার প্রাণপণে সর্ব্বপ্রকারে কুটুম্বদের মন জোগাইয়া এবং বারম্বার অশেষ প্রকার চেষ্টা করিয়াও বোনটিকে আর একবেলার জন্যও বাড়ী আনিতে পারিল না। পারুলের চোখের জলও আর শুকাইল না: এমনি করিয়া এক বৎসর কাটিয়া গেল!

একদিন রাত্রে ঘরে আসিয়া বরুণকুমার দেখিল যে পারুল কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ মুখ ফুলাইয়াছে; তবুও কান্নার বিরাম নাই। স্বামীকে দেখিয়া সে আরও ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিল না—কেবলই কাঁদিতে লাগিল। বরুণকুমার নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া একটু শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আজ হয়েছে কি, অমন কেঁদে লুটোপুটি খাচ্ছ কেন?"

"ওগো ঠাকুরঝি বুঝি ফাঁকি দিয়ে যায়!"

"সে কি—কি হল তার?" বলিয়া বরুণকুমার একেবারে লাফাইয়া উঠিল। পারুল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ওগো সে আমার বড় অভিমানিনী, কারুর একরত্তি কথা সইতে পারেনা যে—"

"কেন, কেন, শাশুড়ী শ্বশুর তো তাকে খুব ভালবাসে, আদর যত্ন করে শুনেছি।"

"তা করলে কি হয়, মাগী-মিন্সের ও ডাইনের ভালবাসা। সেই যে দুমাস না কাটতে বের ক'নে নিয়ে ঘরে পুরেছে, আর কিছুতে একটি দিনের জন্যে পাঠালে না।" "তা কি করবে বল বরাত আমাদের! তবু সে সেখানে শ্বশুর শাশুড়ীর আদরে আছে, সেই আমাদের সুখ"। "ওগো সে আদরে কি মেয়ে মানুষের মন ওঠে? একদিন তাকে একলা হতে দিলেনা, তার ওপর সম্পর্ক যাকে নিয়ে, তাঁর সঙ্গে তো ভাসুর ভাদর বৌ—এই বছর ফিরলো, কদিন ঠাকুর জামাই রেতে ঘরে থাকে, সে খবর জান কি?"

"সে কি কথা, তাতো শুনিনি, হরিচরণ তো খুব ভাল ছেলে বলেই আমি জানতুম।"

"ওগো আমাদের কপালগুণে চন্দনও বিষবৃক্ষ হয়েছে, তুমি কষ্টের ওপর

আরো মনোকষ্ট পাবে বলে এতদিন বলিনি। ঠাকুরঝির এক একখানা চিঠি পড়ি, আর বুকের এক একখানা পাঁজর যেন খসে যায়। রাত্রে তো ঠাকুর-জামাই ঘরে থাকেই না, যদি বা দৈবি সৈবি এক আধ দিন দুপুর রাত্রে আসে, সে অজ্ঞান হয়ে, মদ্‌খেয়ে টর্‌। গাল মন্দ তো পরির অঙ্গের ভূষণ হয়েছে—তার ওপর এদানী মার ধোর সুরু করেছে।"

"এ্যাঁ বল কি?" বলিয়া বরুণ কুমার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। পারুল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আর বলবো কি, সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমরা না বুঝে শুঝে রাক্ষসের হাতে ঠাকুরঝিকে সঁপে দিইছি।"

বরুণকুমার একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"সব কথা খুলে বল আমাকে।"

"ঠাকুর জামাইয়ের স্বভাব চরিত্র একেবারে বিগড়ে গেছে, একদিনও ঘরে থাকে না। কেবল টাকার দরকার হলে মাঝে মাঝে বেশী রাত্রে টর্‌ মাতাল হয়ে এসে গালমন্দ ক'রে টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি নিয়ে যায়। এমনি করে ঠাকুরঝি সব খুইয়েছে—বাকী কেবল ব্রেস্‌লেট্‌ আর নেক্‌লেশ্‌ ছড়া। সেদিন তাও নিতে এসেছিল। কিন্তু ঠাকুরঝি দিতে চায়নি বলে, লাথি মেরে ফেলে দিয়ে, তার ওপর বাপন্ত পিতোন্ত করে নেক্‌লেশ ছড়া জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে। শ্বশুর কোন কথাতেই নেই—শাশুড়ি তাঁর আদরের ছেলের দোষ দেখতে পান্‌না, বলতে গেলে উল্‌টে ঠাকুরঝিকে নানারকম করে মুখ ঝাম্‌টা দেয়। এবারে যেমন করে হোক, তাকে যদি না আন্‌তে পারতো সে আত্মহত্যা করে মরবে বলে দিব্যি করেছে।' এই দেখ তার চিঠি পড়ে—পাষাণও ফেটে যায়।"

বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পারুল পরিমলের চিঠিখানা স্বামীর হাতে দিল।

এক সপ্তাহ পরে বরুণ কুমারের গৃহ আবার যেন নবজীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে—পারুলের আর আমোদ ধরেনা। বরুণকুমার এবার একেবারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া অনেক কষ্টে তিনদিনের কড়ারে পরিমলকে গৃহে আনিয়াছে।

বিকাল বেলা চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে পারুল বলিল "আজ আমাদের সপ্তমী পূজো—"বৎসরান্তে শিবানী হিমালয়ে এলেন।' কিন্তু বোন, কাল পরশু

বাদেই যে, আবার বিজয়ার দিন আসবে, তা মনে করতেই মনটা আমার যেন ফাঁকা হয়ে যায় ?”

“ইঃ ! তা বইকি ? আমি গেলেতো ? বলিয়া পরিমল মুখ ঘুরাইল। পারুল মুহূর্ত্ত মাত্র একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—“সে কি ভাই, কত করে তবে তিনদিনের কড়ারে পাঠিয়েছে, না গেলে শাশুড়ী রাগ করবেন।”

বাধা দিয়া পরিমল দৃঢ়কণ্ঠে জবাব করিল—

“রাগ করেন ক’রবেন, তিনি তো আর ইচ্ছে করে পাঠাননি। দু’দিন না খেয়ে উপোস থেকে আমি একরকম জোর করে তাঁর অনিচ্ছাতেও মত করিয়ে চলে এসেছি। তিন দিনতো দূরের কথা—যতদিন তোমার ঠাকুর জামাই নিজে এসে সেধে না নিয়ে যাবে, ততদিন যাব না—এই আমারও প্রতিজ্ঞা। তিন বছর হলেও নয়। তবে তোমরা যদি দূর করে দেও তা—

পারুল তাড়াতাড়ি পরিমলের গাল টিপিয়া বাধা দিয়া এমন করিয়া চাহিল যে, তাহাতেই পরিমল বুঝিল—মাতৃহারা হইয়াও সে তেমনি স্নেহময়ী আর একটী আত্মীয়ের ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়াছে। সুতরাং তিনদিন পরে যখন তাহার শাশুড়ী লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়া তাহার মারফতে বলিয়া পাঠাইলেন যে “এই লোকের সঙ্গে বৌমা না আসিলে তাঁহাকে আর এ বাড়ীতে আসিতে হইবেনা, আমরা ছেলের আবার বে দেব,” তখন সে একেবারে রাগে আগুন হইয়া বৌ-দিদিকে গিয়া বলিল—

“ছেলের বে দেবে, দিক্‌না ; কেউতো মানা করেনি, তা সে কথা এখানে বলে পাঠাবার দরকার কি ?”

পারুলও তদনুসারে চাকরকে সেই কথা বলিয়া দিয়া কহিল—“ঠাকুরঝি মা-বাপ নেই বটে, কিন্তু দাদা আছেন; তিনি ওর বৌদিকে বিদেয় করে দিতে পারেন, কিন্তু ও তাঁর বুকের পাঁজরা। ঠাকুরজামাই যতদিন নিজে এসে না নিয়ে যাবেন, ততদিন আমরা পাঠাবোনা। এতে একটা কেন তিনি ছেলের দশটা বে দিন্‌ গে।

চাকরের মুখে খবর শুনিয়া পরির শাশুড়ী সেই মাসেই ছেলের আবার বিবাহ দিবার জন্য একেবারে ধনুক ভাঙ্গা পণ করিয়া বসিলেন। কর্ত্তা অনেক রকম বুঝাইয়া মানা করিলেন, তিনি কর্ণপাত করিলেন না। তাহার ফলে

হরিচরণ নিজে দেখিয়া শুনিয়া আবার একটি বিবাহ করিয়া বৌ ঘরে আনিল। কিন্তু শ্বশুর সে বৌয়ের মুখ পর্য্যন্ত দেখিলেন না, অধিকন্তু বলিলেন --

"ঘরের লক্ষ্মীকে চিন্‌তে না পেরে, হেনস্থা করে যেমন বিদেয় করেছ, তেমনি দেখো--এ বৌ নিয়ে তোমার কি দুর্গতি হয় ?"

গিন্নী মুখ ঝামটা দিয়া জবাব করিলেন—"দুর্গতি হয় আমার হবে, তোমায় তো ডাকতে যাবনা ?"

কর্ত্তা নীরবে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বছর খানেক কাটিতে না কাটিতে কর্ত্তার বাক্য বেদবাক্যের মত ফলিয়া গেল। তখন গিন্নী মনে মনে বুঝিলেন যে নিজের বুদ্ধির দোষে কি সর্ব্বনাশই করিয়া বসিয়াছেন। এখন এ কালসাপের ছোবল হইতে তাঁহার হাড় ক'খানা রক্ষা পাইলে হয় ?

পরিমল থাকিতে গিন্নীকে নড়িয়া বসিতে হইত না, কিন্তু এখন আদরের বৌয়ের করণা করিতে করিতেই তাঁহার দিন যায়। তার উপর মুখটি বুজিয়া থাকিতে হয়, একটা কথা বলিলেই সর্ব্বনাশ! হরিচরণ অমনি বৌকে লইয়া পৃথক হইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে চাহে!

একদিন অমনি কি একটা কথার পর বৌ যে মুখখানা ভারি করিয়া শয্যা লইল, আর উঠিল না, বলিল আমার জ্বর হয়েছে, কেউ যেন না বিরক্ত করে ?"

এতদিন বৌ যদিও বা শাশুড়ীর হাতের কাছে এটা ওটা আগাইয়া দিত— এখন হইতে তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। বুড়ো বয়সে অহোরাত্রি হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া গিন্নীরও শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। বৌ বেটী ফিরিয়াও চাহিল না—তিনিও অভিমানে তাহাকেও কিছু বলিলেন না।

দুপুর বেলা প্রতিভা মাগুর মাছের স্থপ্ খাইয়া ঘরে শুইয়া নভেল পড়িতেছিল, হরিচরণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এখন আছ কেমন ?"

"ছাই আছি—মরণটা হলেই বাঁচি ; কি যে কাল জ্বরে ধরেছে—"

"কেন, ডাক্তার তো আজ তিন দিন থেকে দুবেলা করে দেখে, জোর করে বলেছেন জ্বর মোটেই নেই—"

"হ্যাঁগো হ্যাঁ—আমার শরীর আমি বুঝিনি, যেমন তোমাদের হাতুড়ে গো-বদ্দি ডাক্তার—তেমনি তোমরা! আমার মরণ হলেই তোমরা বাঁচ।"

বলিতে বলিতে মুখে আঁচলের খুঁট চাপিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"ওগো মাগো, এমন ঘরে আমায় দেছ যে বিনা চিকিচ্ছেতে মরতে হল গো—"

হরিচরণ কিছুক্ষণ নীরবে গোঁ হইয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল।

দিন তিন চার পরে একদিন দুপুর বেলা হরিচরণের মা বউয়ের মাগুর মাছের ঝোল ভাত লইয়া উপরে দিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। থালা-বাসনগুলো পড়িয়া গিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। অমনি প্রতিভা ঘরের ভিতর হইতে ঝড়ের মত বাহিরে আসিয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—

"অমন অশ্রদ্ধা করে ভাত আনা কেন? যদি আমি কুকুর বেরালেরও অধম হয়ে থাকি তো উঠোনে ছড়িয়ে দিলেই তো পার! আমার অতি বড় দিব্যি—যদি এ বাড়ীতে আর মুখে জল দিই? ওরে বাপ রে সবাই খুনে—সবাই একজোট হয়ে পরামোর্শ করে ভাতে বিষ দিয়ে মেরে আমায় ফেলতে চায়। আমি আজই বাপের বাড়ী চলে যাব—দেখি কি ক'রে আটকাতে পার তোমরা? ওগো মাগো তোমাদের আদরের প্রতিভাকে খুন করলে গো—"

বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরের ভিতরে গিয়া খিল আঁটিয়া দিল।

সন্ধ্যার পর হরিচরণ মদ খাইয়া টর হইয়া টলিতে টলিতে ভিতরে আসিতেই ঝি গিয়া কাঁদিয়া বলিল—

"ওগো দাদাবাবু, মাঠাকরুণ বুঝি আর এ যাত্রা রক্ষে পেলে না গো—"

হরিচরণের নেশা মুহূর্ত্তেই জল হইয়া গেল, চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কেন কি হয়েছে?"

তখন ঝি তাঁহার সিঁড়ির উপর পড়িয়া যাওয়ার কথা এবং বৌয়ের ব্যবহার সবিস্তারে কহিয়া বলিল—

শীগ্‌গির একবার দেখবে চল, কর্ত্তা বিছানার ধারে বসে চোখের জলে ভাস্‌ছেন।"

হরিচরণ ঝড়ের মত মায়ের ঘরে গিয়া ঢুকিতেই কর্ত্তা চোখের জল মুছিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন। হরিচরণ পাশে বসিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কেমন আছ মা?"

গিন্নীর চোখের জলে বিছানা ভিজিতে লাগিল, অতি কষ্টে বলিলেন—"আর বাবা—বুড়োকে দেখিস্, আমার সে মা লক্ষ্মী থাকলে আজ আর কর্ত্তার চিন্তা করতে হত না, নিশ্চিন্তি হয়ে যেতে পারতাম। মহাপাতকী আমি—তাই এ ভগবানের সাজা।"

বলিতে বলিতে কাশিতে কাশিতে এক ঝলক রক্ত উঠিল, গিন্নি অত্যন্ত যাতনায় মুখ বিকৃত করিয়া অতি কষ্টে পাশ ফিরিলেন। হরিচরণ খনিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া মাতার শীর্ণ মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল, তারপর ভাঙ্গা গলায় কহিল—

"তা হবে না মা, তোমায় পালাতে দেব না, সব বুঝেছি আমি। জীবনে এবারটা আমার সমস্ত অপরাধ মাপ কর, দেখি তোমার সেবার দাসীকে আবার ঘরে এনে প্রতিষ্ঠা করিতে পারি কি না?"

বলিয়াই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। নিজের শয়ন ঘরে ঢুকিতে গিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ দেখিয়া সজোরে ধাক্কা দিয়া কহিল—"দোর খোল।"

মিনিট পাঁচেক চেঁচামেচি ধাক্কা ধাক্কির পর প্রতিভা ঝনাৎ করিয়া দোর খুলিয়া দিয়াই মেজেতে গিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। হরিচরণ একটু নীরব থাকিয়া কহিল।

"বলি অমনি করে পড়ে থাকবে—না উঠবে?"

স্বামীর এ রকম কঠোর স্বর প্রতিভা আর কখনো শুনে নাই, চমকিয়া উঠিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দারুণ অভিমানে আগুনের মত হইয়া কহিল—"কি মারবে নাকি, মাতাল হয়ে তেজ ফলাবার আর জায়গা পাওনি?"

হরিচরণও আগুন হইয়া জবাব দিল—মেরে হাড় গুড়িয়ে দেওয়াই উচিত, কিন্তু সে পাপ আর কত্তে চাইনি—"

"বটে, যত বড় মুখ না তত বড় কথা, পাজি মাতাল—"

"খবরদার মুখ সম্লে কথা কও। এখুনি—"

"দেও, এই রাত্তিরেই আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে। তোমার সঙ্গে জন্মের শোধ—"

"তাই চাই আমিও—সোজা রাস্তা পড়ে আছে, ইচ্ছে হয় রেমোকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাও।"

"তাই যাবো, আর যদি কখনো এ মুখো হইতো—"

"তোমার অতি বড় দিব্যি, আমারও দিব্যি, পায়ে ধরে কেঁদে না আসতে চাইলে যদি নাম করি কখনো? আর আজ থেকে দিব্যি করে এই মদ ছাড়লুম দেখি ঘরের লক্ষ্মীকে আবার ফিরিয়ে এনে ঘরে প্রতিষ্ঠা করতে পারি কিনা?

বলিয়া হরিচরণ বিদ্যুতের মত বহির হইয়া গেল। সেই রাত্রি ভোর হইলে প্রতিভাও চাকরকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী ডাকাইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

"ঠাকুর জামাই, সতীর পুণ্যে যখন মতি গতি ফিরেছে, তখন আর কখনো ঠাকুরঝিকে আমার অযত্ন করোনা। বলিতে বলিতে পারুল কাঁদিয়া ফেলিল।

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া পরিমল বলিল, "কেঁদনা বৌদি, মায়ের অমন অসুখ আর কি আমি এখানে এক দণ্ড দেরী করতে পারি? তিনি সেরে উঠলেই আবার আমি আস্‌ব।

বলিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল—হ্যাগা তিনটের আগে আর গাড়ী কি মোটেই নেই?"

হরিচরণ ও পারুল দুইজনই ছল ছল চক্ষে পরিমলের পানে চাহিল। এই পরিমলই বছরখানেক আগে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—আর শশুর বাড়ী যাইবে না।"

হরিচরণ ধীরে ধীরে কহিল—"গাড়ী আছে বারটায়, কিন্তু এত শীগ্‌গির যেতে গেলে তোমার খাওয়া দাওয়া—"

বাধা দিয়া পরিমল বলিল—এঁ্যা—বল কি? তুমি আমার দেবতা, তোমার যিনি দেবতা তিনি ব্যারামে পড়ে আতারি কাতারি খাচ্ছেন, আর আমি এখানে পেটভরে খাব? তোমার পায়ে পড়ি, বারোটার গাড়ীতেই চল্‌—এখানে আর আমি এক দণ্ডও থাকতে পারছি নি।"

হরিচরণের দু'চোখ বাহিয়া জল উছলিয়া উঠিল, পারুল তাড়াতাড়ি পরিমলকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মুখ চুম্বন করিয়া কহিল—"সার্থক হিন্দুর ঘরের সতী লক্ষী তুমি, হ্যঁা বোন্‌, আজ না হয় নাই খেলে, শাশুড়ী অমন ব্যায়রামে পড়ে, তোমরা বারটার গাড়ীতেই যাও।"

হরিচরণ পারুলের পদধূলি লইয়া কহিল—"ধন্য তুমি বৌদি—ধন্য তোমরা ননদ-ভাজ বটে! ঘরে ঘরে এমন 'ননদ-ভাজ' হলে এ সংসার স্বর্গ হবে।"

স্বপত্নী।

লেখক—শ্রীদেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১)

'লিখে লিখে শরীর মাটি করচে দোষ না।'

শরৎ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চেয়ারটা টানিয়া লইয়া বসিতেই তাহার চোখে পড়িয়া গেল, টেবিলের উপর যে বহি খানা রহিয়াছে সে-টা এই মাসের "কনক-রেখা" ভিন্ন আর কিছুই নয়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকের নাম করিতে হইলে লোকে "কনক-রেখারই" নাম করিত। শরৎ আগ্রহের সহিত টেবিলের উপর হইতে "কনক-রেখা" খানি তুলিয়া লইয়া পাতা উণ্টাইতে উণ্টাইতে "সখের গোয়েন্দা" গল্পটী বাহির করিল।

কলেজের 'পড়া শুনা' করিয়াও শরৎ মাঝে মাঝে "কনক-রেখাতে গল্প লিখিত। এ বৎসর সে এম এ আর 'ল' পড়িতেছিল। বয়স তাহার এই সবে তেইশ। শ্বশুর একজন ডেপুটি—টাকা কড়িও বেশ আছে সুতরাং এম-এ বি এল হইতে পারিলে সে-ও যে ভবিষ্যতে ঐ রকম একটা কেষ্ট-বেষ্ট হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। আর এখন হইতেই যখন সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছে তখন পরে সে যে ডি এল রায় কি নবীন সেনের মতই খ্যাতি লাভ করিতে পারিবে এ আশাটা অন্যের মনে না থাক্, তাহার নিজের মনে বিলক্ষণই ছিল।

এই সংখ্যার "কনক-রেখা"র "সখের গোয়েন্দা" গল্পটী তাহারই লেখা। গল্পের শেষ পাতাটী উল্‌টাইয়া সে সতৃষ্ণ নয়নে ছাপার অক্ষরে নিজের নামটী দেখিতে লাগিল। 'অসার সংসারের সার শ্বশুর মন্দিরে' এই সে দ্বিতীয়বার আসিয়াছে, দরজার দিকেও চোখ দুটো মাঝে মাঝে ছুটিয়া যাইতেছিল—ভাবটা যেন, এখনও 'সুকু' আসিতেছে না কেন?

কিছুক্ষণ পরে সুকুমারী সলজ্জভাবে গৃহে প্রবেশ করিল। ধীরে ধীরে কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে নতজানু হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিল। শরৎ দেখিল পূর্ব্ববারে সে সুকুকে যেমন দেখিয়াছিল, তার চেয়ে এবারে সে আর একটু লম্বা হইয়াছে—আর দেহের লাবণ্য যেন আর একটু বাড়িয়াছে। সাদরে সে তাহার ষোড়শী পত্নীকে বুকের উপর টানিয়া লইল।

সুকুমারী এতদিন স্বামীর পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। সাদর বাহুবেষ্টনের মধ্যে সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া দিল।

পত্নীর লাবণ্য-মাখা মুখখানি দুইহাতে তুলিয়া ধরিয়া শরৎ তাহা চুম্বনে চুম্বনে প্লাবিত করিয়া দিল।

হৃদয়ের আবেগ কতকটা প্রশমিত হইলে শরৎ স্ত্রীর চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিল—"এত দিন কেমন ছিলে সুকু?"

প্রত্যুত্তরে সুকুমারী স্বামীর একখানি হাত নিজের, দুই হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—"তুমি ভারী রোগা হ'য়ে গেছ" "ও কিছু না—তোমাকে কাছে পেলে দু'দিনেই মোটা হ'য়ে যাব" "যাও, তা-ও বুঝি আবার হয়?"

"হয় বৈ কি—তুমি কাছে থাক্‌লে একটা বেশী খাবার জিনিষ পাওয়া যায় কি-না! আর তুমি কাছে না থাক্‌লে সে জিনিষটা কম পড়ে যায়—কাজে কাজেই রোগা হ'য়ে যেতে হয়!"

কথাটা বুঝিতে না পারিয়া সুকুমারী জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি কাছে থাক্‌লে একটা বেশী খাবার জিনিষ পাওয়া যায়, কি রকম?" "বুঝ্‌তে পাচ্চ না?"—বলিয়া শরৎ পত্নীর দুই চক্ষুর উপর দুইটী চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল। বলিল—"এই—এবার বুঝ্‌লে?"

সুকুমারী কথাটা এবার বুঝিল কি-না, তাহার কোনো উত্তর না দিয়া সাম্‌নে খোলা "সখের-গোয়েন্দা"র দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া বলিল—"একে কলেজের কঠিন পড়া—তারপর আবার ভেবে ভেবে এই সব লেখা হয়—তাইতেই এত রোগা হ'য়ে যাচ্চ—আমি কাছে থাক্‌লে, এ-সব লিখে লিখে শরীর মাটী কর্ত্তে দেব না—বুঝ্‌লে?"

শরৎ বলিল—"যো হুকুম"

দেওয়ালের গায়ের ক্লক-ঘড়ীটা ঢং-ঢং করিয়া বারোটা বাজিয়া ঘরের লোকদিগকে বোধ হয় এই কথাটাই জানাইয়া দিল যে, রাত্‌টা আরো একটু বড় হইলে তোমাদের ভাল হইত বটে, কিন্তু কি আর করি বল, আমার তো কোনো হাত নাই—কাজে কাজেই আমাকে রাত্রি যত হইয়াছে ঠিক্ তাহারই পরিমাণ করিতে হইতেছে!

সুকুমারী বলিল—"কাল সারা রাত্তির তুমি তো ট্রেনে ভাল ক'রে ঘুমুতে পাও নি?—ঘুমুবে চল"

এ কথারও প্রত্যুত্তরে শরৎ বলিল—"যো হুকুম"

মাইনর-স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র এ-বাড়ীর দশ বৎসর বয়স্ক শ্রীমান্ অমিয়কুমার—ওরফে খোকা—সকাল বেলাতেই নীচের তলায় একটী ছোট ঘরের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক খুলিয়া গৃহবাসীকে জোর-গলায় এই কথাটাই বার-বার করিয়া জানাইয়া দিতেছিল যে "বিড়ালের একটী লেজ আছে—দুইটী নাই! পার্শ্বোপবিষ্ট 'মাষ্টার মশাই' আর ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া শ্রীমানের মস্তকে একটা 'টোকা' দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"একটা কথাই কতবার বল্‌বি?—তারপর পড়ে যা!" ঠিক্ সেই সময়েতেই ডাক্-পিয়ন আসিয়া "বাবু, চিঠ্‌টি হ্যায়" বলিয়া একখানা নীলরংয়ের খাম ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। খামখানা কুড়াইয়া লইয়া চোখের কাছে ধরিয়া 'মাষ্টার-মশাই' বলিলেন—"শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়" নামটা শুনিয়া খোকা লাফাইয়া উঠিল—"মুখুয্যে মশাইয়ের চিঠি—তিনি ওপরে আছেন, দিন 'স্যার' চিঠিখানা তাঁকে দিয়ে আসি" মাষ্টার জলদমন্দ্র স্বরে বলিলেন—"যা, কিন্তু দিয়েই চলে আস্‌বি—তুই যেন ফাঁকি দিয়ে বসে থাকিস্ নি" "না 'স্যর', এখনি আস্‌ছি"—বলিয়া খোকা চিঠিখানা লইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছেই যাইতেছিল কিন্তু পথের মাঝে দিদির দেখা পাইয়া খামখানা তাঁহার হাতে দিয়া চিঁচিঁ করিয়া বলিল—"দিদি, মুখুয্যে মশাইয়ের চিঠি—আমার পড়া কামাই হচ্চে, তুমিই তাঁকে দিয়ে এসো, আমি আর যেতে পার্ব্বো না—দেখো কিন্তু তুমি নিজে যেন পোড় না, আমার বইয়ে লেখা আছে যে পরের চিঠি পড়্‌তে নেই—বুঝ্‌লে?"

সুকুমারী বলিল—"খুব বুঝেচি, তুই পড়্‌গে যা" "যাচ্চি"—বলিয়া খোকা চলিয়া গেল।

খামখানা হাতে লইয়া সুকুমারী দেখিল যে লেখক প্রথমে চিঠিখানা তাহার স্বামীর কলিকাতার "মেসে"র ঠিকানায় পাঠাইয়াছিল—সেই 'মেস' হইতে 'রিডাইরেক্ট' হইয়া উহা এখানে আসিয়াছে। উপরে মেয়েলি-হাতের বাঁকা-বাঁকা বড়-বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে…"শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইত্যাদি।"

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সুকুমারী ভাবিয়া দেখিল, স্বামীকে তাহার চিঠি লিখিবার উপযুক্ত মেয়ে মানুষের মধ্যে বাড়ীতে এক মা ভিন্ন আর তো কেহই নাই। আর ছেলে যে তাঁহার এখানে আছে এ-কথাটা তিনি ভাল করিয়াই

জানেন। তিনি চিঠি লিখিলে তো এইখানের ঠিকানাতেই লিখিতেন। তবে চিঠি লিখিল কে ?

চিঠিখানা দেখিবার জন্য সুকুমারীর মনের মধ্যে একটা অদম্য লোভ ও কৌতূহল জন্মিল। কাপড়ের মধ্যে খামখানা লুকাইয়া লইয়া সে তাহার ঘরে যাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর কম্পিতবক্ষে উপরের আবরণ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। চিঠিখানা বাহির করিবামাত্র একটা সুগন্ধ আসিয়া নাকের মধ্যে প্রবেশ করিল। সুকুমারী দেখিল তাহাতে লেখা রহিয়াছে :—

৩রা ভাদ্র, ১৩২৫

শ্রীচরণেষু,

কাল রাত্রের গাড়িতেই তো তোমার আস্‌বার কথা ছিল ? কিন্তু কৈ, তুমি তো এলে না !

আমি কাল সারা রাত তোমার জন্যে জেগে বসেছিলুম কিন্তু তুমি তো এলে না ! আস্‌বার সময় পেরিয়ে গেল, তবুও তুমি যখন এলে না দেখ্‌লুম, তখন আমার মনে যে কি কষ্ট হয়েছিল, তা আর কি বল্‌ব।

কতদিন আমাকে এমন করে লুকিয়ে থাক্‌তে হবে ? মাকে একবার দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে কচ্ছে। তুমি শীগ্‌গীর আস্‌বে—বুঝ্‌লে ?

তোমাকে ছেড়ে আমি আর একদণ্ডও থাক্‌তে পার্ব্বো না—তুমি না এলে মরে যাব।

তোমারই আদরের

'সুশী'—।"

চিঠিখানা পড়িয়া সুকুমারী কিছু বুঝিতে তো পারিলইনা, তা'ছাড়া তাহার চোখগুলো ঠিক্ আছে কি-না সে বিষয়েও বিষম সন্দেহ জন্মিল। চিঠিখানা আর একবার সে আগাগোড়া ভাল করিয়া পড়িল। এ কি স্বপ্ন, না সত্য ? তাহার মন বলিতে চাহিল, 'হে ভগবান্, যেন স্বপ্নই হয়।'

কিন্তু হাতের গোড়ায় কাগজটা যখন সত্য সত্যই রহিয়াছে আর চোখ-দুটোও বারবার চেষ্টা করিয়াও চিঠিটার দ্বিতীয় কোনো অর্থ বাহির করিতে পারিতেছে না, তখন স্বপ্ন হয় কি করিয়া !

'অকস্মাৎ এ-কি বজ্রাঘাৎ—বিমামেঘে হঠাৎ কোথা হইতে এ-কি ভীষণ ঝড় উঠিয়া সমস্ত ওলট্ পালট্ করিয়া দিল !'—

অনেকবার সুকুমারী চেষ্টা করিয়া দেখিল চিঠিটার আর কোনো অর্থ সে বাহির করিতে পারে কি না, কিন্তু বৃথা চেষ্টা!

উদাস দৃষ্টিতে সে নিঃস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। দরজায় ধাক্কা পড়িল—"ঠাকুরঝি",

সুকুমারী চমকিয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি সে চিঠিখানা তাহার বাক্সের মধ্যে লুকাইয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিল। ভাবিল, 'এই চিঠি যদি আর কারো হাতে পড়িত!' বাহির হইতে আবার ডাক্ পড়িল।

সুকুমারী দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল—"কে, বৌদি?—ঘুমিয়ে পড়েছিলুম" ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই 'বৌদি' বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এ কি!" "কি?" "মুখ চোখ যে সব একবারে বসে গেছে!" সুকুমারী শুক্‌নো হাসি হাসিয়া বলিল—"কে বল্লে?" কিন্তু 'বৌদি' কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে মনে ইহার কারণ স্থির করিয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন:—"বল্‌বে আবার কে—কালরাত্রে ঘুম হয়নি বুঝি—নয়!—বলিয়া হাসিয়া আবার বাহির হইয়া গেলেন।

সুকুমারী তেমনি স্তব্ধ হইয়া মেজের উপর বসিয়া রহিল।

"তোমাকে ছেড়ে আমি আর একদণ্ডও থাক্‌তে পার্ব্বো না—তুমি না এলে মরে যাব। তোমার আদরের 'সুশী'—" শেষের এই কথাগুলো তাহার চোখের সাম্‌নে জ্বলন্ত আগুনের মত হইয়া যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল!

'স্বামীর এত আদর—এত ভালবাসা—সবই কপটতায় পূর্ণ?" হায় ভগবান্! বাহিরে যে এত সুন্দর, ভিতরে তাহাকে এতই কুৎসিৎ করিতে হয়?"

সুকুমারীর চোখ হইতে জল ধারা একটীর পর একটী করিয়া গণ্ড বহিয়া ক্রমাগতই নামিয়া আসিতে লাগিল। রুদ্ধ আবেগ আর বাধা মানিল না—ঘরের মধ্যে সে লুটাইয়া পড়িল।

৩

শরৎ বেচারী তো হঠাৎ স্ত্রীর এমন অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কোনো সুসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিল যে সে কোন 'অপরাধ' করিয়া ফেলিয়াছে কি না, কিন্তু কৈ তেমন কোন 'অপরাধ'ই তাহার মনে আসিল না। মুখখানা যেন শুক্‌নো, মনটা যেন ভার ভার—এ সবের কিছুই তো কারণ নাই!

পার্শ্বে 'জড়সড়' হইয়া শয়ানা স্ত্রীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া

শরৎ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

অর্দ্ধেক রাত্রে একবার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় শরৎ দেখিল, পার্শ্বে সুকু নাই।

কিছু বিস্মিত হইয়া 'বোতাম' টিপিয়া আলো জ্বালিতেই সে দেখিতে পাইল, সুকুমারী আস্তে আস্তে কখন উঠিয়া গিয়া জানালা খুলিয়া জানালার পার্শে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছে—আর তাহার চোখ হইতে জল পড়িতেছে। বড় উদ্বিগ্ন হইয়া শরৎ তাড়াতাড়ি স্ত্রীর কাছে উঠিয়া আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি, সুক, এখানে বসে কাঁদচ কেন?

স্বামী যে এমন হঠাৎ জাগ্রত হইয়া পড়িবেন তাহা সুকুমারী আশা করে নাই। সে বলিল—"বড় মাথার যন্ত্রণা হচ্চে!"

শরৎ সুকুমারীর কপালে হাত দিয়া তাহার দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু কৈ দেহ ত গরম বোধ হইল না। বলিল—"এখানে এমন করে বসে কাঁদলে যন্ত্রণা বাড়বে বৈ তো কমবে না, তার চেয়ে বরং শোবে চল, আমি মাথাটা একটু টিপে দিইগে।"

কথাগুলো সুকুমারীর হৃদয়ে যেন বিষ ঢালিয়া দিল। 'এত তোমার স্নেহ—এত তোমার ভালবাসা—এত তোমার আদর—কপট নিষ্ঠুর!"

উঠিয়া যাইয়া সে নির্জীবের মত শুইয়া পড়িল। শরৎ তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। স্বামীর এই স্পর্শ আজ তাহার আগুনের মত বোধ হইতে লাগিল। ঘুমাইতে সে অনেক চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু ঘুম না আসায় এবং হাতের কাছে আর কিছু না থাকায় আঁচলের চাবির রিংটা ক্রমাগতই খুলিতে আর বাঁধিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, যদি কাল সকালে আবার ঐ "আদরের সুধীর" চিঠি আসে এবং সে চিঠি যদি আর কারো হাতে পড়িয়া যায়!

এই কথাটা মনের মাঝে আলোচনা করিয়া সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, আর তাই প্রভাতের প্রথম আলোক দেখা দিবা মাত্র বিছানা হইতে উঠিয়া খোকাকে এই কথাটা বলিতে গেল যে আজও যদি 'ওঁর' নামে চিঠি আসে তবে সে চিঠি যেন তাহাকেই দেওয়া হয়।

স্ত্রীর উঠিয়া যাওয়ার শব্দে শরতেরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চোখ

মেলিয়া দেখিল যে তাহার স্ত্রী উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু চাবির রীংটা ভুলিয়া গিয়াছে।

স্ত্রী-পরিত্যক্ত এই জিনিষটী কুড়াইয়া লইয়া শরৎ আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল।

৪

অনেকক্ষণ গত হইয়া গেল, কিন্তু তবু কেহ যখন চাবির খোঁজ করিতে আসিল না, আর শরতের হাতেও কোনো কাজ ছিল না; তখন বাক্স-খোলার খেয়ালটা যে আপনা হইতেই আসিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

বাক্সটাও সামনেই ছিল আস্তে আস্তে উঠিয়া যাইয়া শরৎ স্ত্রীর বাক্সটী খুলিয়া ফেলিল।

তাড়াতাড়িতে সুকুমারী পত্রখানা উপরেই রাখিয়াছিল।

বাক্স খুলিয়াই পত্র দেখিতে পাইয়া শরৎ সে খানা বাহির করিয়া লইয়া আবার চাবি বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর চাবির রীং যেমন ভাবে ছিল তেমনি ভাবে খাটের উপর ফেলিয়া রাখিয়া দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিয়া চিঠি খানার দিকে মনোযোগ দিল। প্রথম বার পড়িয়া সে নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল—কিছুই বুঝিতে পারিল না। ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে তাহার চোখে পড়িল, কে যেন ইচ্ছা করিয়া অক্ষরগুলো বাঁকাইয়াছে! হঠাৎ তাহার কি একটা কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় সে নিজে নিজেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আর কেহ তখন সেখানে ছিল না, তাই—তা না হইলে এই হাসি শুনিয়া সে তাহাকে পাগল সাব্যস্তই করিত।

এখানে আসিবার দিন 'মেসের' বন্ধুগণ তাহাকে তাহার বৌয়ের চিঠি দেখাইবার জন্য কেমন ভাবে ধরিয়া বসিয়াছিল ও অনেক বলা-কহাতেও সে যখন বন্ধুদের ইচ্ছা পূর্ণ করে নাই, তখন তাহার 'গুণধর' "সুশীল" বন্ধুটী "ইহার প্রতিশোধ লইব" বলিয়া কেমন ভাবে 'তিন-সত্য' করিয়াছিল—এই সমস্ত কথাগুলো একে একে শরতের মনে পড়িতে লাগিল। ঐ গুণধর সুশীলই যে 'ল' লোপ করিয়া "আদরের সুশী" হইয়াছেন এ কথাটা আর শরতের বুঝিতে বাকী রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে সুকুর এমন হঠাৎ পরিবর্ত্তনের অর্থটাও তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়া গেল।

কিন্তু ঐ "রিডাইরেক্টের" ব্যাপারটুকু ?—ও টুকুও ঐ পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদের একটু 'কারসাজি' ভিন্ন আর কিছুই নয়।

শরৎ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সে কি জানি কেন কতকটা কাগজ লইয়া কাহাকে কি লিখিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে আঁচলের দিকে চোখ পড়িবামাত্র সুকুমারী সেই দিকেই ছুটিয়া আসিতেছিল। আসিয়া দেখিল, চাবির রীংটা বিছানার উপরেই সে ফেলিয়া গিয়াছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া রীংটা কুড়াইয়া লইয়া সে আবার চলিয়া যাইতেছিল। শরৎ ডাকিল—"সুকু" সুকুমারী থমকিয়া দাঁড়াইল। শরৎ লেখা বন্ধ করিয়া বলিল—"এদিকে এস" সুকুমারী সাম্‌নে সরিয়া আসিল। শরৎ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল,—"আমি তোমার কি করেছি যে তুমি এমন করে আমাকে অপমান কচ্চ ?" আমাকে দেখ্‌তে না পার—বল্লেই তো আমি চলে যেতুম। আমি চলে গেলেই তো তুমি সুখী হও ?"

সুকুমারীর দুই চোখ ছাপাইয়া অশ্রু উছলিয়া উঠিল। শরৎ আবার বলিতে লাগিল—"এই বারোটায় ট্রেণ আছে, আমি এখনি চল্লুম, মাকে বলে দিও, বিশেষ একটা দরকার আছে বলেই আমি এখ্‌ন হঠাৎ চলে যাচ্চি—"এই বলিয়া শরৎ তাহার 'কোট'টা লইয়া গায়ে দিতে দিতে আবার বলিল—"কিন্তু যাবার আগে একটা কথা আমি তোমাকে বলে যেতে চাই। কিছুদিন আগে একজন কুলীনের ছেলে পঞ্চাশ ষাট্‌টে ক'রে বিয়ে কর্ত্ত তা' জান ?" স্বামীর কথা বলিবার ভঙ্গিটা এতক্ষণে সুকুমারীর হৃদয়ে যাইয়া আঘাত করিল। স্বামীর মুখের দিকে অশ্রুপূর্ণ চোখদুটী তুলিয়া চাহিতেই সে দেখিতে পাইল, সেখানে একটা চাপা হাসির ফোয়ারা ছুটিয়া চলিয়াছে।

'হে ভগবান্! তবে কি সমস্তই মিথ্যা—যেন তাই হয়।'

শরৎ বলিয়া চলিল—"আমিও কুলীনের ছেলে, না হয় দুটো বিয়েই করেছি—কিন্তু তা' ব'লে এত অপমান ?—"

'আর কোনো আশা এখনো আছে কি ? স্বামী তো নিজমুখেই স্বীকার করিলেন! সত্যই তবে ?—হায় ভগবান্!'

সুকুমারী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

স্ত্রীকে এমন ভাবে শুধু শুধু কাঁদাইতে শরতেরও বুক যে ফাটিয়া

যাইতেছিল না তাহা নহে। সে বলিল—"না, আর তো থাকা যায় না, তুমি এম্‌নি কাঁদতেই থাক্‌বে সুকু—তবে এই দেখ তোমার সতীনকে তার পত্রের কি উত্তর দিয়েছি দেখ—" এই বলিয়া শরৎ এইমাত্র যে কাগজখানা লিখিয়াছিল সেইখানা সুকুমারীর দিকে আগাইয়া দিল।

সুকুমারী অদম্য কৌতুহলের সহিত কাগজখানা কুড়াইয়া লইয়া এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল। শরৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুতো পরিতে পরিতে বলিল—"আমি তো চল্লুম কিন্তু আমার দোষটা কি তা'তো তুমি বুঝতে পাল্লে ? কি দোষে আমাকে এত কষ্ট দিলে সুকু !"

একদিকে মেঘ কাটিয়া গেল বটে কিন্তু আর এক দিকে ঝড় যে তুমুল হইয়া উঠিল! অশ্রু চাপিয়া সুকুমারী স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া পা জড়াইয়া ধরিল। 'চলে যেওনা গো—দোষ করেছি, এবারের মত ক্ষমা কর।, শরতের হৃদয় ভিতরে ভিতরে ভাঙ্গিয়া টুক্‌রো টুক্‌রো হইয়া যাইতেছিল কিন্তু তবু সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া জুতো গুলো খুলিয়া ফেলিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল—"আঃ আমাকে যেতেও দেবে না ?"

সুকু তাহার অশ্রুসিক্ত লাল চোখ দুটী স্বামীর দিকে ফিরাইল। কি করুণ সে দৃষ্টি !

'ওগো নির্দ্দয় ! ওগো পাষাণ ! তুমি কি এমনি করিয়া আমার হৃদয় মথিত করিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে।

শরৎ আর থাকিতে পারিল না। দুই হাতে ধরিয়া রোরুদ্যমানা ভূলুণ্ঠিতা পত্নীকে বুকের উপর তুলিয়া লইল। বলিল—"ছিঃ সুকু ! এম্‌নি অপদার্থ তোম্‌রা ! তোমরাই না বঙ্গের বধূ—কবি না তোমাদিগেই, তোমাদের বুক্‌টাকে শিলের মত শক্ত কর্ত্তে বলেছেন ? দুটো বিয়ে তো আমি করেইছি কিন্তু এটুকু আর তুমি সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বে না ?"

আবার সেই কথা ! একি নির্ম্মম পরিহাস ! 'ওগো এমন করিয়া তুমি আর আমায় দগ্ধাইয়া মারিও না।" সুকুমারী চোখের জলে স্বামীর বক্ষস্থল সিক্ত করিতে লাগিল।

শরৎ বলিল, "আবার কাঁদে !"

সুকু তাহার রাঙা চোখ তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিমানের সুরে বলিল, "তুমি আবার বলচ কেন ?" "কি বলচি ?" "দুটো বিয়ে করেচি',

বললেই কি হয়ে গেল না কি! কিছুদিন আগে লোকে কাজে কর্ত্ত, আর এখন মুখে বলবারও যো নেই? সুকুমারী তেমনিভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "না।" "না তো না, আর না হয় বলবো না, কিন্তু কি দোষে তুমি আমাকে এত কষ্ট দিলে বল দেখি? কাল সারারাত্রি আমি ঘুমুই নি তা' জানো?"

কাল রাত্রির কথা মনে হওয়ায় সুকু লজ্জায় মরিয়া গেল। সেই ত মিথ্যা কথা বলিয়া কাল সারারাত্রি স্বামীকে দিয়া মাথা টিপাইয়া লইয়াছে! স্বামীর বক্ষের মধ্যে মুখ রাখিয়া সুকু খুব আস্তে আস্তে বলিল, "দোষ করেচি ক্ষমা কর" "ক্ষমা টমা আমার দ্বারা হবে না। তুমি শাস্তি পেয়েচ নিজের দোষে। আমাকে না বলে আমার চিঠি পড়েছিলে, তেমনি শাস্তি পেয়েচ—ঠিকই হয়েচে। কিন্তু আমি শাস্তি পেলুম কি দোষে? এর আমি প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়চি না!" সুকু কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তুমি আমাকে না জানিয়ে আমার বাক্স খুলেচ কেন?" "তারই বুঝি শাস্তি?" "হ্যাঁ!" "বাঃ বিচার তো! দোষ করবার আগেই শাস্তি! বাক্স খুলেচি তো আজ, আর শাস্তিটা হয়ে গেছে কাল!"

সুকু হাসিতে কাঁদিতে বলিল, "যাঃ—ও।"

শরৎ পত্নীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "এ কি রোদ বৃষ্টি দুইই যে! কাঁদবে আবার হাসবেও? নাঃ, তা হচ্ছে না, কাঁদবে তো তাই কাঁদ. আর না হয় হাস—একবারে দুটো কাজ কর্ত্তে পাবে না।"

সুকু হাসিয়া বলিল, "তুমি এই বারোটার ট্রেনে এখনি চলে যাবে বলছিলে জুতো জামা সব পরলে, কই গেলে না।"

শরৎ মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, "হ্যাঁ সত্যিই যেতে হবে বটে! একটা বিশেষ দরকার আছে। সময়ও হয়ে এল দেখচি—এবার বেরুতে হচ্ছে।"

সুকুর চোখ আবার ছলছল করিয়া আসিতেছে দেখিয়া শরৎ বলিল "না গো না, তোমাকে ছেড়ে আমি এখনি চলে যাচ্ছি আর কি! দুটো কথা বলবারও যো নেই। প্রত্যেক কথাতেই অমনি কান্না" এই বলিয়া শরৎ পত্নীর ছলছলায়মান নেত্রদ্বয়ের উপর চুম্বনের পর চুম্বন করিতে লাগিল।

সুকু তাহার সুগোল হস্তদ্বারা স্বামীর গলা জড়াইয়া বলিল, "তা হলে তুমি চলে যাবে না তো?"

শরৎ বলিল—"না, তা আর যাচ্চি না বটে কিন্তু কালরাত্রে যে ঘুমুতে পা- নি তার ক্ষতি সুদ শুদ্ধ পূরণ করে দিতে হবে।"

স্বকু হাসিয়া বলিল—"সে আমি কি জানি। ক্ষতিপূরণ নাওগে তোমার বন্ধুদের কাছে।"

"বন্ধু টন্ধু আমি এত জানি না—হাতের কাছে যাকে পেয়েছি তার কাছ থেকেই ক্ষতিপূরণ করে নেব।"

কয়েদী।

[লেখক শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

গত রাত্রে একজন কয়েদী পলায়ন করিয়াছে।

আষাঢ়ের মেঘভরা অন্ধকার রাত্রে, প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় লোকটা কেমন করিয়া জেলের লোহার গরাদে ভাঙ্গিয়া পলায়ন করে। পরদিন সকালেই কথাটা আমার কাণে পৌছিল। তৎক্ষণাৎ মটর গাড়ীতে আসামীর সন্ধানে ছুটিলাম।

লোকটার বাসস্থান আমার জানা ছিল। প্রথমে সেই গ্রামের দিকেই ছুটিলাম।

পথে একটি লোক যাইতেছিল।

আমি গাড়ী থামাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—"কোন নতুন লোককে এ অঞ্চলে দেখেছ?"

"আজ্ঞে অনেক। আপনি কে?"

"আমি——জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ৯৩ নম্বরের আসামীকে দেখেছ বলতে পার?"

"কি করে জানব বলুন, আমি ত আর তাকে চিনি না।"

"এই গ্রামেই তার বাড়ী; আজ সকালে কি ভোরের দিকে কোন নতুন লোক দেখনি?"

লোকটা আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল, তাহার পর বলিল,—"ধরে দিতে পারলে বখ্‌সিস আছে ত?"

"আছে বই কি?"

"কত ?"

"৫০৲ টাকা !"

"ওঃ ! যদি জানতুম—"

অনর্থক সময় নষ্ট হইতেছে দেখিয়া আমি গাড়ী চালাইতে উদ্যত হইলাম। লোকটা একটু কাসিয়া বলিল,—"তা হ্যাঁ, দেখুন, ধরে দিতে পারলে টাকাগুলো পাওয়া যাবে ত ?"

"যাবে বই কি।"

"তবে এক কাজ করুন, ঐ ডাক্তার বাবু আস্‌ছেন, ওঁকে গিয়ে জিগেস করুন নিশ্চয় সন্ধান পাবেন,।" লোকটা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ডাক্তারকে দেখাইয়া দিল।

আমি "আচ্ছা" বলিয়া গাড়ী চালাইয়া দিলাম।

ডাক্তারের সমীপবর্ত্তী হইয়া গাড়ী থামাইলাম।

"নমস্কার মশায়, আপনিই বোধ হয় ডাক্তার ভবতোষ বাবু ?"

লোকটী সহাস্যে সবিনয়ে প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কি চান ?"

"আমি——জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আপনি গ্রামের ভেতরই যাচ্ছেন বোধ হয় ? আসুন না আমার গাড়ীতে। পথে যেতে যেতে আমার ব্যক্তব্যটাও সেরে নেব।"

"বেশ ; তা চলুন।" ডাক্তার আমার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। মোটর আবার চলিতে লাগিল।

"তা আমার কাছে মশায়ের কি দরকার ?"

"গত রাত্রের দুর্যোগে—জেল থেকে ৯৩ নম্বরের আসামী পালিয়েছে—"

"তা আমি কি করবো ?"

"লোকটার বাড়ী এই গাঁয়েই—"

"বেশ।"

"আপনার পাঁচ জায়গায় যাওয়া আসা আছে—"

"তাতে কি ?"

"যদি কোন নতুন লোক আজ দেখে থাকেন ?"

"আজ্ঞে না, কই কাউকে দেখেছি বলে ত মনে হচ্ছে না।"

আমরা থানায় থানায় টেলিগ্রাম করে দিয়েছি, ধরে দিতে পারলে ৫০১ টাকা পুরস্কারও আছে।"

ডাক্তার আমার কথার উত্তর না দিয়া বলিল—"গাড়ীটা থামান, আমায় ঐ কুঁড়ে ঘরে যেতে হবে। এক জন স্ত্রীলোক ওখানে মরণাপন্ন হয়ে পড়ে আছে।"

গাড়ী থামাইলাম। ডাক্তার নামিয়া বলিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয় যে আপনার কোন উপকার করতে পারলাম না। বিদায় নমস্কার করিয়া তিনি একটা পতনোন্মুখ কুটিরের দিকে চলিয়া গেলেন।

বিরক্ত প্রসন্ন হইয়া আমি থানায় গেলাম। দারোগাকে পূর্ব্বেই টেলিফোনে আমার আসিবার কথা জানাইয়াছিলাম। তাহার বাসাতেই আহারাদি করিয়া দ্বিপ্রহরটা বিশ্রাম করিবার কথা ছিল।

গাড়ী থামিতেই হেড্ কনেষ্টবল ও দারোগা বাহির হইয়া আমায় অভ্যর্থনা করিল। দারোগা রহিম আলিকে আসামীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বিশেষ কিছুই বলিতে পারিল না। কয়েনজন কনেষ্টবল ইতিপূর্ব্বেই আসামীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে শুনিলাম, কিন্তু তখনও তাহারা ফিরে নাই।

বেলা প্রায় এগারটার সময় কয়েকজন কনেষ্টবল ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু কাজের কাজ তাহারা কিছুই করিয়া আসিতে পারে নাই। কেবল বাজে সময়টা নষ্ট করিয়া আসিয়াছে।

বিরক্ত চিত্তে আমি স্নান আহারে মন দিলাম। যত সব বোকা লইয়া আমাদের পুলিশের কাজ—কাজের কাজ হইবে কি করিয়া? এমন কত কথা আমার মনে আসিতেছিল।

আহারাদির পরে রহিম স্বয়ংই একবার পলাতক আসামীর অনুসন্ধানে বাহির হইল।

আমি জানালার ধারে দাঁড়াইয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ দেখিলাম সকালের সেই ডাক্তার থানার পথে আসিতেছেন। আমায় দেখিয়া তিনি সস্মিত হাস্যে অভিবাদন করিলেন।

লোকটা বরাবর ঘরের মধ্যে আসিল।

তাঁহাকে দেখিয়া আমার বিস্ময় ও আনন্দের অবধি ছিল না। কেন বলিতে পারি না, আমার মনে হইতেছিল আসামীর সন্ধান একা তিনিই বলিতে পারেন,

আর সেই কথা বলিবার জন্যই এ সময়ে এ স্থানে তাঁহার আগমন। পঞ্চাশটা টাকাও ত বড় অল্প নহে।

"আসুন ডাক্তার বাবু, এমন সময় যে? খবর কি?"

"খবর ভাল।"

"কয়েদীর সঙ্গে দেখা হয়েছে তা হ'লে?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে?"

"সন্ধান পেয়েছি।"

"কি রকম? বলুন বলুন, শীগ্‌গীর বলুন।"

"বেলা দুটোর সময় আমার ডিস্‌পেনসারিতে যাবেন।"

"তার মানে?"

"মানে আবার কি?"

"আঃ! কথাটা ভেঙ্গেই বলুন না ছাই।"

"মাপ ক'রবেন, ওর বেশী এখন আর কিছু বলতে পারছি না।"

আমি লোকটার রকম দেখিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম।

"বুঝেছেন, আসামীকে ফিরে পেতে চান ত ঠিক দুটোর সময় আমার ডিস্‌পেন্‌সারিতে যাবেন।"

"আমি কথা দিচ্ছি, একা আপনাকে ফিরতে হবে না, কয়েদীকে নিশ্চয় পাবেন।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

এবার তাঁহাতে একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল! চোখ দুইটা তাঁহার জলিয়া উঠিয়াছিল ও লাল হইয়াছিল—যেন এই মাত্র কাঁদিতেছিলেন। আমি কিন্তু সেদিকে মন দিবার অবসর পাই নাই। আপনার চিন্তাতেই ব্যস্ত ছিলাম।

প্রায় পৌনে দুইটা।

আমি হেড কনেষ্টবল মোবারক আলীকে ডাকিলাম,—"ওহে, একবার ভবতোষ ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারিতে যেতে হবে।"

"আজ্ঞে, কেন শুন্‌তে পাই কি?"

"লোকটা কয়েদীর সন্ধান করে দেবে বলে গেছে!"

মোবারক হতাশভাবে মাথা নাড়িল।

"কি মোবারক, তুমি অমন ক'রছ যে ?"

"কি করি হুজুর ? আপনার যেমন। ঐ পাগলের কথায় বিশ্বাস ক'রলেন —ও আবার আসামীর খোঁজ ক'রে দেবে ?"

"কি রকম ?"

"দেখবেন, হয় আমাকে না হয় আপনাকেই আসামী বলে বসে থাকবে।"

আমি একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া মোটরে উঠিলাম। মোবারক আমার পিছনে বসিল।

দ্রুত মোটর চালাইয়া আমি ডিস্পেন্সারির দিকে অগ্রসর হইলাম।

মোবারক পথে একবার মাত্র বলিয়াছিল,—"আমার কিন্তু হুজুর ডাক্তারের কথাটা কেমন বিশ্বাস হচ্চে না—হয়ত এ আমাদের পণ্ডশ্রম হবে।"

ডিস্পেনসারীর সম্মুখে গাড়ী থামিতই একজন কয়েদীর পরিচ্ছদ পরা রোগা লোক বাহির হইয়া আসিল।

মোবারককে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—এ আবার কে ?"

"ঐ ত ভবতোষ ডাক্তার।"

"তবে আমার সঙ্গে সকালে—

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই লোকটা মোবারককে বলিল,—"আরে আমি যে তোমাকেই খবর দিতে যাচ্ছিলুম।"

"কেন ডাক্তার বাবু ?"

"—জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কে ?"......

বাধা দিয়া আমি বলিলাম—"আজ্ঞে আমিই সুপারিণ্টেণ্ডেট।"

মুখ বিকৃত করিয়া ডাক্তার বলিল,—"কৃতার্থ ক'রলেন আর কি ? আপনি গাড়ী চড়ে মজা মেরে বেড়াচ্ছেন আর আপনার কয়েদী আমার সর্ব্বস্ব ডাকাতি ক'রে নিচ্ছে।"

"৯৩ নম্বর আসামী ?"

"তা নয় ত আবার কে ?"

সহসা পার্শ্বের ঘরের একটা জানালা খুলিয়া গেল এবং তাহার মধ্য হইতে ৯৩ নম্বর কয়েদীর মুখ বাহির হইল। কয়েদী বলিল—"ডাক্তার বাবু সত্যি কথা বলুন।"

মুখ বিকৃত করিয়া ডাক্তার বলিল,—"হ্যাঁ, সত্যি কথা।" তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল,—"ঐ নিন মশায় আপনার কয়েদী।"

মোবারক ৯৩ নং আসামীর হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া বাহির করিয়া আনিল

আসামী বলিল, "জেল পালান আমার কোন দরকার ছিল না, শুধু মা আমার মরবার সময় একবার দেখতে চেয়েছিলেন বলেই আসা। এমন কুচরিত্র ছেলেকেও মা ভালবাসে। হায়রে মা।" কয়েদী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল,—"জেল পালিয়ে মা'র সঙ্গেই আমি শেষ দেখা ক'রতে এসে-ছিলাম, কিন্তু কয়েদীর পোষাকে গেলে গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে তাই একটা ছদ্মবেশের সন্ধান কচ্ছিলুম, এমন সময় ডাক্তার বাবু ডিস্পেনসারিতে এলেন। আমি অতর্কিতে ওঁকে আক্রমণ করে ওঁর হাত পা বেঁধে পোষাক খুলে নি, সেই পোষাকেই মা'র সঙ্গে দেখা করতে যাই। সে কাজ আমার শেষ হয়েছে। এক ঘণ্টা আগে মা আমার কোলে মাথা রেখে সুখে মরেছেন। তার পর ডাক্তার বাবুর কথা মনে পড়ল। ভদ্রলোকের ওপর বড় অত্যাচার করা হয়েছে ভেবে মনে কষ্ট হল। এমন সময় পুলিশ ষ্টেশনের বিজ্ঞাপনে দেখলাম আমায় যে ধরে দিতে পারবে—সে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাবে। তখনই আমি আপনাকে খবর দিয়ে এলাম। তার পর এসে স্বেচ্ছায় ডাক্তার বাবুর কাছে ধরা দিলুম। এখন পুরস্কারের টাকাটা ডাক্তার বাবুরই পাওনা।"

টাকার কথা শুনিয়া ডাক্তারের উগ্র ক্রোধ কতকটা শান্ত হইল। তিনি আমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"হ্যাঁ, মশায় টাকাটা পাওয়া যাবে ত?"

আমি বলিলাম,—"আজ্ঞে হাঁ।"

কয়েদী ডাক্তারের দিকে চাহিয়া বলিল,—ডাক্তার বাবু রাগ করেন নি ত?"

"না তোমার ব্যবহারটা প্রথমে খারাপ হলেও তুমি বড় ভদ্র।"

আমি কয়েদীকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

ডাক্তার গাড়ীর নিকট আসিয়া কয়েদীকে প্রশ্ন করিল,—"আমার দ্বারা তোমার কোন উপকার হয়ত বল।"

কয়েদী হাসিয়া বলিল,—"আর কি উপার করবেন? মার সঙ্গে দেখা ক'রব বলেই এতটা কষ্ট স্বীকার করেছিলুম, তা আমার সফল হয়েছে। এখন কয়েদে ফিরে যেতে আমার একটুও অনিচ্ছা নেই। তবে হাঁ, একটা কাজ করতে পারেন।"

"কি, বল।"

"আপনি পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাবেন, তা থেকে কিছু খরচ করে মা'র আমার সৎকারটা করিয়ে দেবেন। পরলোকে তাহলে তিনি সুখী হবেন।

"বেশ, আমি নিজে দাঁড়িয়ে এ কাজ করিয়ে দেব।"

কয়েদীকে লইয়া আমি জেলের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

একাল সেকাল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৪২)

নন্দকিশোর হাত পা ধুইয়া সতীশকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাড়ীতে ঠাকুর নেই না কি? সন্ধ্যের জল?"

লজ্জায় অনুতাপে সতীশ যেন মরিয়া গেল। ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া সন্ধ্যা কেমন তাহা সে জানিত না, পিসীর তাড়নায় বার বৎসর বয়সে তাহার গলায় একটা সূতা গাঁথিয়া দিয়াছিল, আর সেই সময়ে একবার যে এ বাড়ীতে গঙ্গাজল প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার পর দ্বিতীয়বার আর করে নাই। এবারেও পিসী আসিয়া অবধি গঙ্গাজল আনাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শোভার অত্যন্ত অমত, বিশেষ গঙ্গা অনেক দূরে বলিয়া আজ কাল করিয়া সতীশ সে চেষ্টাকে চাপা রাখিয়াছিল। নতমুখে উত্তর করিল—"পিসীমাও পূজ করেন, কিন্তু সে কলের জলে, তাতেই সেরে নিতে পার্ব্বেন কি?"

নন্দকিশোর অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। সতীশ বলিল,—"রাগ করুন আর যাই বলুন, আমায় সবই সহ্য করে নিতে হবে, কারণ ওদিকে এদ্দিন আমার খেয়ালই যায় নি।

নন্দকিশোর বিস্মিতের স্বরে বলিল,—"দেখুন হয়ত আছে, বের সময় ত এনেছিলেন।"

সতীশ বিকৃতকণ্ঠে উত্তর করিল,—"না ঠিকই জানি নাই, কলের জলেই সব কাজ হয়েছিল।

নন্দকিশোর বিরক্তির সহিত কথাটা চাপা দিতে গিয়া বলিল,—"তা হ'লে আপনি বসুন, আমি একবার গঙ্গা থেকে ঘুরে আসছি।"

"বলেন, কি ?" বলিয়া সতীশ বিস্মিতমুখ তুলিতেই নন্দকিশোর হাসিয়া ফেলিল, চলিতে চলিতে বলিল—"আপনি হয়ত মনে কচ্ছেন, এটা আমার বাড়াবাড়ি, কিন্তু কি কর্ব্ব, এর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আপনার মন রাখ্‌ব, সে শক্তি আমার নেই, কলের চলে চল্‌তে পারে, এমন শিক্ষা ও কোন দিন পাইনি, তা ছাড়া অমন কথাও শুনিনি ?" বলিয়া সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

সতীশ তীব্র আত্মগ্লানির আঘাতে মুহূর্ত্ত যেন হতচেতনের মত দাঁড়াইয়াছিল, লুপ্তজ্ঞান ফিরাইয়া দিল শোভার শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠস্বর। শোভা আড় চোখে পথের দিকে চাহিয়া সতীশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"দেখ্‌ছ দাদাবাবু, কত বড় অসভ্য এই লোকগুলি—"বলিতে বলিতে শোভার কথা আটকাইয়া গেল, ক্রুদ্ধ স্বরে তিরস্কার করিয়া মধ্যস্থানেই সতীশ বলিল—"থাম শোভা, এতখানি হয়ে গেল, তবু একটু আক্কেল হল না ?" বলিয়া শোভার ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি স্নেহের বোনটির হাত ধরিয়া আবার বলিল—"ছিঃ অমন কথা নাকি বল্‌তে আছে। ওতে ত তোর পাপ হবে, তা ছাড়া যে দেবতার কাজ কচ্ছে, তাকে কুকুর বলে গালিগালাজ কর্ত্তে আছে রে ?"

শোভা উত্তর না করিয়া সতীশের অরুণিত দৃষ্টির দিকে তাকাইয়াছিল। সতীশ স্বর নামাইয়া শান্তকণ্ঠে বলিল—"মানুষ যারা, তারা আগে কর্ত্তব্য কাজের কথাই ভাবে, বর্ণবিশেষের প্রতি আবার বিশেষ প্রতিপাদনের যে ভাব আছে, একটা কোন গণ্ডীর মধ্যে থাক্‌তে হলেই যে তাকে মাথা পেতে নিতে হবে, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান সবারি এক একটা সম্প্রদায় আছে, ধর্ম্ম ও তদনুগত যতটুকু হ'ক আচারণীয় কাজ রয়েছে, কিন্তু আমাদের ত কিছুই নেই, আমরা না মানি রাম না মানি রহিম, শোভা ভেবে দেখ, তখন বুঝবি. সত্যি আমাদের মত উচ্ছৃঙ্খল লোকগুলিই দিন দিন এই পুণ্য ভূমিকে পাপের আধার করে তুলছে।"

এ সকল বিষয়ে ভাবিবার ইচ্ছা শোভার কোন কালেই ছিল না, তবু কিছু দিনের ঘটনাপরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার মন কেমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, কোন দিকেই আত্মার গতির স্থিরতা না দেখিয়া সে এবার খানিক-ক্ষণ ভাবিয়া জবাব করিল—"ধর্ম্ম ত এদের সংস্কারমাত্র, আর তাকে এমন ভাবে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে যে কুসংস্কারের মধ্যে গিয়া পড়েছে। নৈলে মুখে

বল্‌বে জল নারায়ণ, আবার সন্ধ্যে কর্‌বার সময় কলের জল ফেলে দৌড়িবে গঙ্গার দিকে ?"

সতীশ হাস্যমুখেই জবাব করিল—"এর মধ্যে কুসংস্কার কোথায় রে বোকা ? একটু তলিয়ে দেখ, জল নয়ত নারায়ণই হ'ল, কিন্তু প্রাকৃতিক সত্ত্বা নিয়ে অবশ্যই বিচার কর্ত্তে হবে। কলের জলের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত কতটুকু জিনিষ আছে। পাথরই শালগ্রাম, তা বলে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে পাথরের কুচর পূজ করা ত চলে না।"

(৪৩)

সন্ধ্যার পরে উপরের হলঘরে বসিয়া সতীশ ও নন্দকিশোরে কথা হইতেছিল। নন্দকিশোর বলিল—"আমাদের ত কৈ কোন কথা বল্‌তে হয়নি, রাত্তির বেলা চলে এল, সকালে সবাইকে ডেকে বাবাই বয়ল দিলেন, "সতীশ এসে কাল বৌমাকে নিয়ে গেল, কি কর্ব্ব, না কর্ত্তে পাল্লাম না, কিন্তু আমি কিছু তাকে সেখানে ফেলে রাখতে পার্ব্ব না, তা বলে দিয়েছি, আমার একটি ছেলে একটি বৌ, তাদের ফেলে কেন থাক্‌তে পার্ব্ব ?"

সতীশ অবাক হইয়া শুনিতেছিল, পুলিনবিহারী কি দেবতা, এত বড় অপরাধ এমন করিয়া মুখেও না আনা ইহাতে কলিকালে অসম্ভব। নন্দকিশোর আবার বলিল—"ভোরে এসে আমায় ডেকে বল্লেন, দেখ নন্দ, কালই তোমায় যেতে হচ্ছে, বুঝেই করে থাকি, আর না বুঝেই করে থাকি, আমি তোমার বাপ, আমার আদেশ বলে মনে করেই তুমি ওকে সুধ্‌রিয়ে নিতে চেষ্টা কর্ব্বে, অপরাধ করেছে বলে তাকে ঠেলে ফেল্‌লেত হবে না, অপরাধীকে মাথায় করে নিয়ে তার পাপতাপ ধুইয়ে পুছিয়ে ফেলাই যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব। তা ছাড়া দেখে শুনে বিয়ে করিয়ে এনে বৌকে ঘরে রাখতে পাল্লাম না, এমন কলঙ্কও আমি মাথা পেতে নিতে পার্ব্ব না। লোকের কাছে মাথা হেট করে চল্‌তে হবে, এমন কাজত এ বাড়ীর কোন পুরুষে কেউ করে নি ?"

এতক্ষণ পরে সতীশ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বৃদ্ধা পিসী আসিয়া বলিলেন—"চল বাবা, পাত হয়েছে ?"

আহারের পর শুইতে গিয়া নন্দকিশোর দেখিল, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বালিশের উপর পা রাখিয়া সৌন্দর্য্যের রাণী শোভা একখানা ইংরাজি পুস্তকের উপর বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। পরিধানে সাদা ধপ্‌ধপে সেমিজের উপর মিহি কাপড়, বিদ্যুত আলোর প্রখর কিরণছটায় ঘর যেন ভাসিয়া গিয়াছে।

বাহিরের বাগান হইতে ফুলের গন্ধ লইয়া শন্ শন্ করিয়া বাতাস প্রবেশ করিতেছিল। নন্দকিশোর মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া এই নীরব সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিল, ফুলের গায়ে যেন ফুল ঝড়িয়া পড়িয়াছে, সুবাসিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশগন্ধে ঘরখানা ভরপূর হইয়াছে, নন্দকিশোর যেন মুহূর্ত্তে সমস্ত কথা ভুলিয়া গেল, প্রথম বিবাহিত যুবকের প্রাণ যেন শোভার গর্ব্বের কথা অপমানের কথা বিস্মৃত করিয়া দিল, ধীরে মাথার গোড়ায় গিয়া বলিল সে শোভার হাত ধরিতে শোভা যেন সর্পস্পর্শে ভীত হইয়া আদ্র হাত সরিয়া গেল। নির্ম্মলের প্রদত্ত পুস্তকখানা তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল, নন্দকিশোর গাঢ় স্বরে ডাকিল—"শোভা ?"

শোভা যেমন শুইয়া ছিল, তেমনই রহিল, কিন্তু অন্য দিন হইলে হয়ত নন্দকিশোর হাতটা দূরে ছুড়িয়া ফেলিত, আজ যেন সে সাহস হইল না, এ গৃহে আসিবার পূর্ব্বে সতীশের পুনঃ পুনঃ অনুরোধের কথাই তাহাকে বাধা দিল, শোভা ক্ষুণ্নস্বরেই জিজ্ঞাসা করিল—"কি ?"

স্বরটা নন্দকিশোরকে আঘাত করিল, শ্রান্ত বিদেশাগত অপমানপীড়িত হৃদয়ের জন্য পরিণীতা পত্নীর নিকট কি একটু কোমলতার আশাও করা যায় না। নন্দকিশোর হাত ছাড়িয়া মাথা টানিয়া ক্রোড়ে আনিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা শোভা, তোমায় কি কেউ স্বামীর সঙ্গে কি ব্যবহার কর্ত্তে হয়, তাও শিখিয়ে দেয় নি.?"

নির্ম্মলের প্রতিকৃতি শোভার বুকের মধ্যে ছায়ার মত ক্রীড়া করিতেছিল, তটে তটে পূর্ণ স্রোতস্বতীর মত যৌবনপূর্ণাঙ্গী শোভার কামনাবাসনগুলি যেন সেই বিদেশস্থ যুবককে লক্ষ্য করিয়া তীব্র বেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল। তবু সতীশের কথা মনে করিয়া সে অনেকটা সংযত ভাবেই মাথা টানিয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"না ?"

নন্দকিশোর মন্ত্রমুগ্ধ আহত সর্পের মত, খানিকটা সরিয়া বসিল, ধীরে ধীরে একটি চাপা শ্বাস ত্যাগ করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিল—"তা হলে হয়ত তোমার বে না হওয়াই ছিল ভাল ?"

কথাটা শোভার কাণ এড়াইল না, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া উত্তর করিল—"অপরাধ ত বিয়ের নয়, অপরাধ বিবেচনার, জগতে অযোগ্যসমাবেশে সুখ নেই, হতেও পারে না ?"

নন্দকিশোর আর শুনিতে পারিতেছিল না, তাহার প্রেমপ্রার্থনার গোড়ায়

কে যেন বিষধর সর্প আনিয়া দাঁড়করাইয়া দিল, স্বচ্ছ জলে বিষ মিশাইয়া তাহাকে অপেয় অগ্রাহ্য করিয়া তুলিল। তবু সে পিতার আদেশ মনে করিয়া বলিল—"এরি জন্য যোথাযোগ্য বিচারের ভার আগের কালে অভিভাবকের হাতে থাকত। সে কথা যাক, বাবা তোমায় নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন, যাবে ?"

ধীরে ধীরে বৃদ্ধ পুলিনবিহারীর মধুর প্রকৃতির কথা শোভার মনে পড়িল, একটা আকর্ষণের টানে যেন সে অনেকটা মনমড়া হইয়া পড়িল, মৃদু কণ্ঠেই উত্তর করিল—"আচ্ছা, তোমরা সবাই কেন তাঁর মত হতে পারো না ?"

নন্দকিশোর হাতে আকাশ পাইল, বলিল—"একটুখানি চিন্তা করে দেখলে, দেখবে, আমরা তাঁরি মত, তাঁর হাতের গড়া পুতুল আবার অন্যের মত কি করে হবে শোভা ? চল তোমায় নিয়ে যাই, তুমি যদি অবাধ্য না হও, দেখবে দুদিনে সমস্ত সংসারটা তোমার বাধ্য হয়ে পড়েছে ?"

শোভার কেমন বিসদৃশ ঠেকিতেছিল, বাধ্যবাধকতার ধার সে ধারিত না, তাহা ছাড়া তাহার মনে পড়িল, কথায় কথায় নির্ম্মল একদিন বলিয়াছিল, —"মানুষ কেন অন্যের বাধ্য হতে যাবে, তা হলে যে তার মনুষ্যত্বই থাকবে না। যে যার স্বাধীন ভাবে কাজ কর্ত্তে পাবে বলেই প্রকৃতি সবাইকে চোখ কাণ হাত পা দিয়ে পৃথিবীতে এনেছেন ?"

শোভার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে ধীর স্বরেই বলিল—"না না, আমিই কেন বাধ্য হতে যাব, তা ছাড়া আমার বাধ্য হয়ে কেউ মনুষত্ব বিসর্জ্জন দেয়, তেমন ইচ্ছাও আমি করি না ?"

"মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন এ বাধ্যবাধকতার মধ্যে নেই শোভা, জানত লোকে বলে—"অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" তোমাদেরও হয়েছে তাই, দুপাতা ইংরেজি পড়ে মনে করছ, আমাদের মত বুদ্ধিমান্ মীমাংসক এ পৃথিবীতে আর নেই, বাস্তবিক জ্ঞান যদি পাকাই হত, তবে বুঝতে, স্বাধীনতা বলে কাকে ? মানুষের অবাধ্য হলেই স্বাধীন হ'লাম, আর কারুর কথামত কাজ করলেই অধীনতার অপমানে আত্মার অধোগতি হবে, এমন কথা হয়ত কোন কেতাবেই লেখেনি। বাধ্য-বাধকতা পৃথিবীর নিয়ম, ও না থাকলে হয়ত সংসারের কাজ বন্ধ হয়ে যেত, তা ছাড়া আমি যে বাধ্য হবার কথা বলেছিলাম, তার মত উপাদেয় জিনিষ বোধ হয় দুটি নেই, যে প্রাণ স্নেহের হাতে আটক না হয়েছে, তার বুঝি কোমলতাও নেই, সুখ শান্তি কিছুই নেই।"

এতগুলি কথার উত্তরে শোভা একটি কথাও বলিল না, উপরে উজ্জ্বল আলো ও বৈদ্যুতিক পাখার শব্দ, নীচে পুষ্পবৎ শয্যা, পূর্ণাঙ্গী সুন্দরী পত্নী, কথায় কথায় নন্দকিশোরের মন বিচলিত হইয়া উঠিল, সহসা হাত বাড়াইয়া সে শোভার কবরী খুলিয়া দিল। আলোক সমুজ্জল মুখখানা ধরিয়া গাঢ় স্বরে বলিল—"জীবনেত বাধ্য হয়ে দেখনি, তাতে কত সুখ, একবার নয় পরীক্ষা করে দেখ, যা করে এতকাল আনন্দ ভোগ করেছে, এই স্নেহের বন্ধন তা থেকে শান্তি দিতে পারে কিনা" বলিতে বলিতে নন্দকিশোর শোভার গা ঘেষিয়া শুইয়া পড়িল। স্পর্শে তাহার সমস্ত শরীর যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল, না পারিল সে এক আঙ্গুল সরিয়া যাইতে, না পারিল উঠিয়া বসিতে নূতন একটা অনুভূতি তাহাকে আক্রমণ করিতে করিতে যেন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, শোভা নির্ম্মলের মূর্ত্তি মনে করিয়া বুক কাঁপাইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল, মূঢ় নন্দকিশোর অত বুঝিল না, সে নবোঢ়া পত্নীর প্রণয় আশায় কাটার ভয়রহিত লুব্ধ ভ্রমরের মত দুই হাতে শোভার শোভিতাঙ্গ জড়াইয়া ধরিয়া শিহরিয়া উঠিয়া স্পন্দিত স্বরে বলিল—"এস, একবার আমার অনুরোধেও নয় পরখ করে কিসে তোমার কত সুখ।"

(৪৪)

নিবির অন্ধকারের কোলে উঠিয়া অমাবস্যার রাত্রি ভীতি-উদ্গীরণ করিতে করিতে অট্টহাসি হাসিতেছিল, আকাশ ঘন মেঘসমাচ্ছন্ন, গাছে গাছে ডালে ডালে পাতায় পাতায়, পথে ঘাটে গৃহে অঙ্গণে জমাটপাকান অন্ধকার, কখনও লঘু কখনও দ্রুত,কখনও ছোট কখনও বড় এমনই ভাবে সন্ধ্যা হইতে বৃষ্টি পরিতে-ছিল, দমকাবাতাস ঘরদোর শাখাপাতা ছিনাইয়া টানাটানি করিয়া পাড়াগায়ের গৃহস্থগণের মনের উপর একটা বিরাট বিভীষিকার রাজ্য স্থাপন করিয়া বসিয়াছে। মুমূর্ষ শ্বশুরের পায়ের গোড়ায় বসিয়া বিমলা অশ্রু ত্যাগ করিতেছে। বাহিরের ঝড়বৃষ্টি যেন তাহার অন্তরের উপদ্রবে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃতি অপেক্ষা তাহার পেলব অন্তঃকরণ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। করুণাময়ী একপাশে মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—"বৌমা এখন কেমন ?"

শ্বশ্রূর কথার উত্তরে বিমলার কথা যোগাইতেছিল না, প্রতিমুহূর্ত্তে রোগীর আসন্ন কাল উপস্থিত দেখিয়া সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিতেছিল। যদিও করুণাময়ীর সাক্ষাতেই সন্ধ্যা বেলা চিকিৎসক পরিষ্কার বলিয়াছিল 'আজ

রাত্রিতে আর রক্ষা নেই?' তথাপি মাতৃহৃদয়ের মত স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে শেলাঘাত করিতে বিমলার সাহসে কুলাইতেছিল না, সূচিপাতশব্দবিরহিত রজনীর নয় ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধতা যেন গাঢ় হইতেছিল, সদানন্দ অনেকক্ষণ নিঝুম মারিয়া পড়িয়াছিলেন, সহসা তাহার ঠোঁট নড়িল, বাহিরে এই ভীষণ প্রকৃতির কথা তিনি জানিতেও পারেন নাই, ধীরে ধীরে স্খলিত কণ্ঠে বলিলেন—"মা, সময় ত হয়ে এল, একবার তুলসী তলায় নেবে না?"

বিমলাও ঠিক এই কথাই ভাবিতেছিল, শ্বশুরকে যে এখন আর ঘরে রাখা উচিত নহে, একথাটাই এভাবে সেভাবে তাহার মনের মধ্যে সোরগোল তুলিয়াছিল, কি করিয়া বিমলা শ্বশুরের সৎগতির বিধান করিবে। এত তপস্যা করিয়া দেবপূজা করিয়া শেষটা কি তিনি গৃহে মরিবেন, স্থিরবুদ্ধি বিমলা এই বিষম চিন্তায় ছটফট করিতেছিল, অথচ নিরুপায়, একা কি করিয়া বাহিরে নিবে। সদানন্দ খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার বলিলেন—"মা যেমন করে পার আমার সদগতি কর, গ্রামের কেউ আসেনি না, তা আস্‌বে না মা?" আবার বিশ্রাম করিলেন, বিমলা গঙ্গাজল মুখে দিতে ধীরে ধীরেই বলিলেন— "এই এখন দেশের অবস্থা হয়েছে, কিন্তু এমনও একসময় ছিল, যখন কারুর বিপদ হলে তার বাড়ীতে লোক ধর্ত্ত না।"

সদানন্দ আবার নীরব হইলেন, দেখিতে দেখিতে তাহার নাভিশ্বাস দেখা দিল, আর বিলম্ব করা চলে না, বাহিরে মেঘ কড় কড় করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, বিমলার হাত পা কাঁপিতে লাগিল, বাষ্পরুদ্ধ স্বরে ডাকিল—"মা মা!"

করুণাময়ী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "কি মা সময় হয়েছে বুঝি?" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সদানন্দের অস্ফুট কণ্ঠ হইতে শব্দ হইল,— "এমন সময় কেউ কেঁদ না, আমার আত্মার সদগতি যাতে হয়—তাই কর, না-রা-য়-ণ!"

কথাটা করুণাময়ীর কাণে পৌঁছিল, তিনি যেন কোন্ দৈহবলে সহসা প্রকৃতিস্থ হইয়া জোর করিয়া স্বামীর পায়ের দিক ধরিয়া উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"ওঃ বৌমা, শিগ্‌গির শিগ্‌গির শেষটা ঘরে মরবে?"

বিমলা মাথার দিক্ ধরিল, অতিকষ্টে দুই রমণী মিলিয়া সদানন্দের মৃতপ্রায় দেহ বাহিরে লইয়া চলিল, দৌড়িয়া শান্তি পাড়ার মাধব চাটুয্যাকে লইয়া ফিরিয়া অবস্থা বুঝিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইল, মাধব তাড়াতাড়ি সাহায্য করিতে

গিয়া বিমলার গায়ের উপর পড়িয়া বলিল—"আহা তুমি কেন, অমন শরীর না কি পারে, এ কাজ কর্ত্তে ?"

সদানন্দকে তুলসী তলায় আনা হইল, বিমলার পরামর্শে শান্তি সেই স্থানটিকে পূর্ব্ব হইতেই জলবৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইবার মত করিয়া রাখিয়াছিল, বাহিরে আসিয়া নামাইতে করুণাময়ী উচ্চকণ্ঠে হরি নাম শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, আর পিপাসু শিষ্যের মত সদানন্দের শ্রবণেন্দ্রিয় যেন গুরু মুখের ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া স্ত্রীর মুখনির্গত সেই মধুময় নাম শ্রবণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। করুণাময়ীর স্বর ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল; হরিধ্বনিতে সেই নৈশনিস্তব্ধ গগণ মথিত করিয়া পুণ্য তীর্থের মন্দিরের মত সেই স্থানটিকে পবিত্র করিয়া তুলিল। সদানন্দ শেষবার হা করিলেন, বিমলা গঙ্গাজল মুখে দিল, মাধব অগ্রসর হইয়া বলিল —"তুমি সরে এস না, যা কর্‌বার আমি কচ্ছি, জলে বৃষ্টিতে ভিজে যে অসুখ কর্ব্বে।"

বিমলা শান্তির দিকে দৃষ্টি করিতেই সে মনে মনে কাতর হইয়া বলিল—"তাই ত, এমন সময়ে একি আপদ ডেকে আন্‌লাম।" প্রকাশ্যে বলিল—"আর ত কেউ এল না বৌদি ?"

সদানন্দ চক্ষু সারা করিলেন তাহার পুণ্য জীবনবায়ু ধীরে ধীরে বাহিরের বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া গেল। বিমলা শ্বশুরের পা ধরিয়া ছিল, তেমনই রহিল, একবিন্দু নড়িল না, এক ফোটা চোখের জল ফেলিল না, কিন্তু তাহার শরীর ভঙ্গপ্রবণ নদীকূলের বেতসলতার মত ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল, জলে বৃষ্টিতে শরীর যেন বরফ হইয়া আসিতেছে, পৃথিবীটা শূন্য একেবারেই অবলম্বন ছিল না, এমনই অবস্থায় তাহার মাথা ঘুরিয়া পড়িতেছিল, সহসা করুণাময়ী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, মাধব বিমলার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইতেছিল, বিমলা তাহাকে ধাক্কা দিতে গিয়া নিথর হইয়া গেল, দূরে আলোর ছায়া পড়িল, দুই ব্যক্তি আসিয়া সেই তুলসীমঞ্চের সম্মুখ দাঁড়াইল, বিমলার চাহিয়া দেখিতে ভয় করিতেছিল, সহসা শব্দ কানে আসিল, বাষ্পাকুলিতকণ্ঠের ভীষণ স্বর —"মা মা চেয়ে দেখ, তোমার হতভাগ্য নির্ম্মল এয়েছে।"

বিমলা লুটিয়া পড়িল, শান্তি চীৎকার করিয়া উঠিল, মাধব তাহাকে ধরিতে গিয়া "আহা এত না কি এ শরীরে সয়" বলিয়া মাথা

প্রকাশ করিতে না করিতেই শশাঙ্ক আসিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া নির্ম্মলকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"নির্ম্মল, দেখ, কি অবস্থা ঘটেছে, এক বন্ধুর অভাবে বৃন্দাবনের অবস্থার কথা তোর মনে পরে না। আয় এখন, আর দাড়িয়ে থাকিস না, বিমলাকে ত তুই ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পার্ব্বে না।"

(৪৫)

শ্মশানের কর্ত্তব্য সারিয়া নির্ম্মল যখন গৃহে ফিরিল, তখন পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে, সারারাত্রি বর্ষণের পর মেঘের হাত হইতে মুক্ত হইয়া একটা নীল শোভায় প্রকৃতি যেন হাসিতেছিল, পাখীর ঝিলিত কণ্ঠস্বরে নির্ম্মল একবার চমকিয়া উঠিল, চাহিয়া দেখিল, বিমলা দোরের গোড়ায় বসিয়া করুণাময়ীকে কোন প্রকারে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছে! আজ সত্যই নির্ম্মলের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল, একটা মড়া কান্না যেন তাহাকে পুনঃপুনঃই আঘাত করিয়া অস্থির করিয়া তুলিতেছিল, শশাঙ্ক সঙ্গে ছিল, হাত ধরিয়া অন্য দিকে লইয়া গিয়া বলিল—"এখন আর অমন অস্থির হলে চল্‌বে না রে, এত দিন ত গাছের তলায় ছিলি, সে গাছ সরে পড়েছে, যত ঝড়ঝাপটা তোকে চেপে ধর্‌তে চাইবে, বুকে জোর না কল্লে কিছু এর হাত থেকে রক্ষা পেতে পার্ব্বি না।"

সংসারানভিজ্ঞ নির্ম্মলের ঠোট কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু কথা বলিতে পারিল না, এ যেন তাহার নিকট নূতন পৃথিবী, নবীনত্বের এতবড় দাবীতে সে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আত্মহারা হইয়া পড়িতেছিল, শশাঙ্ক তাহাকে ঘরে প্রবেশ করাইয়া বলিল,—"বোস এখানে, আমি ততক্ষণ ওদের চানের বন্দোবস্ত করিগে" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে দুই দিন কাটিয়া গেল, করুণাময়ীর অবস্থা দেখিয়া নির্ম্মল ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হইতেছিল, করুণাময়ীর মাথার যেন মোটেই স্থির ছিল না, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সাধ্বী যেন স্বামীর অনুগমনে কৃতসংকল্প হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিছু বলিল, তিনি অর্থহীন দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, কখনও বা অতিরিক্ত আদরে পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন, নির্ম্মলের জীবনে এমন শঙ্কট এই প্রথম; ভরসা একমাত্র শশাঙ্ক, কিন্তু সেদিন যখন সে আসিয়া বলিল,—"নির্ম্মল, একবার ত বাড়ী না গিয়ে পারছিনা, দেখ রমা, কি লিখেছে?" বলিয়া চিঠীখানা হাতে দিতে

যাইতেই নির্ম্মল হাত ঠেলিয়া দিয়া বলিল—"বৌদির অসুখ বেড়েছেত, তা তুমি যাও, কিন্তু ফিরে না আসতে কিছু হবে না, এটা মনে রেখে কাজ কর ?"

শশাঙ্ক চলিয়া গেল, মস্ত একটা সমস্যা এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সংসারের ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। এ দুদিনের মধ্যে বিমলা বা নির্ম্মলে দেখাসাক্ষাৎ ছিল না, বিমলা মনমরা মানুষ, প্রতিপদক্ষেপে ভয় করিয়া চলিত, যত অপরাধও তাহার, কি জানি আবার কি করিতে কি করিয়া বসিবে। ভাবিয়া দূরে দূরে থাকিয়া মনে করিত, ঝী চাকরের মত আমার জীবনের দিনকটা কেটে গেলেও যার বাড়ীঘর সে যদি তাই নিয়ে সুখে থাকিতে পারেত, আমি কেন উপদ্রব হইতে যাইব, ধীরে ধীরে তাহার বুক কাঁপিত, একটা নীরব বেদনা নিবিড় পীড়নে তাহাকে কাতর করিতে চাহিলেই সে অন্য কার্য্যে মন দিতে চেষ্টা করিত, শ্বশ্রুকে স্নান করাইত, আহার করাইত; সেবা করিত, সান্ত্বনা প্রদানের চেষ্টা করিয়া নিজের হাতে চোখের জল মুছিয়া দিত, কিন্তু আজত আর শশাঙ্ক নাই, উদাসীন থাকিলেত হইবে না, সংসারের সবই যে তাহার হাতে, নির্ম্মলকে খাইতে দিলে সে খাইবে, না দিলে উপাস করিয়া থাকিতে হইবে। পরিশ্রমে উপাসে নির্ম্মলের চোখ বসিয়া গিয়াছিল, দুদিনেই বুকের হাড় উঠিয়া পড়িয়াছে, বিমলার প্রাণ দূর হইতে এ দৃশ্য দেখিয়া হাহাকার করিতেছিল, হায় এমন সময়ই না স্বামীর মনের কালি ধুইয়া দিয়া স্ত্রী তাহার কর্ত্তব্য পালন করে, বিপদেই বন্ধুর প্রয়োজন, স্ত্রীর মত বন্ধু এ পৃথিবীতে কে আছে। কিন্তু কোথায় তাহাদের বন্ধুত্ব, কোথায় বা সুখসুবিধার উপায়। শাশুড়ীর অজ্ঞাতে স্বামীর অজ্ঞাতে বিমলা বুক চাপিয়া ধরিয়া জোড় করিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া অন্তঃস্থিত জ্বালায় দগ্ধ হইত, কিন্তু আজত আর তাহা করিলে চলিবে না।

সকাল হইতে গ্রামের লোকসমাগমে বেলা এগারটা বাজিয়া গেল, নির্ম্মল অল্প কথায় সকলকেই তুষ্ট করিয়া বসিয়া আছে, কি করিতে হইবে, তাহা যেন সে জানিত না, শান্তি গিয়া বলিল,—বাবু বেলাত অনেক হয়ে গেল, চান্ করে আসুন ?"

নির্ম্মল শুষ্ক মুখে বসিয়াছিল, কিন্তু এবার আর পারিল না, বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—"পান্তি মা কৈরে, তাঁকে একবার পাঠিয়ে দিতে পারিল না ?"

করুণাময়ী ওঘর হইতে পুত্রের কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। নির্ম্মল অন্ধকার দেখিতে লাগিল, আজ যেন পৃথিবীতে আপনার

বলিতে তাহার কেহই ছিল না। মাতৃহৃদয় আজ শ্মশানের মত, এক বিমলা, কৈ এত কষ্টের এত দুঃখের মধ্যেও ত সে মুহূর্ত্তের জন্য নির্ম্মলের কাছটিতে আসে নাই। নির্ম্মল মনে মনে বলিল—"কেন আস্‌বে, আমি ত তাকে শাস্তি দিতে কসুর করিনি, সেওত মানুষ, এমন পাপিষ্ঠের জন্য না কি আবার সে কাতর হতে পারে।"

একটা "নাই নাই" শব্দে নির্ম্মলের চারিদিক চাপিয়া ধরিল, পিতা নাই, ভ্রাতা নাই, মাতা আছেন কিন্তু তাহারও হৃদয় নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, পত্নী আছে, কিন্তু তাহার কোমলতা মায়া দয়া অনুরাগ সব যে নিজেই শুষিয়া দেখিয়াছে, এখন সুধু ভিক্ষা, অনুগ্রহ নির্ম্মলের জীবনের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন। শান্তি আবার বলিল—"চান করে আসুন।"

নির্ম্মল নড়িল না, দেখিতে দেখিতে বেলা বারটা বাজিয়া গেল, বাহিরে নিমগাছের শাখায় বসিয়া আতপতপ্ত গোটা দুই পাখী যেন জলের জন্য চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিল।

মেঘমুক্ত আকাশ খাঁ খাঁ করিতেছে, বাহিরের তপ্ত ধুলিকণা বহন করিয়া দমকা বাতাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মলের তপ্ত প্রাণ যেন দাবদাহে পোড়াইয়া দিতেছিল। ঘুমটায় মুখ ঢাকিয়া ধীরে ধীরে বিমলা গৃহে প্রবেশ করিল, তাহার পা কাঁপিতেছিল, মুক শুকাইয়া আসিতেছে, অতি কষ্টে সে দরজার একটা কপাট হেলান দিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও কথা বলিতে পারিল না। নির্ম্মলের প্রাণটা যেন ছিটকাইয়া গিয়া বিমলার পায়ের উপর পড়িতে চাহিতেছিল, এতবর নিরাশ্রয় সে যে, যে কোন প্রকারের একটু মাথা গুজিবার স্থান পাইলেই আপাতত আত্মরক্ষার উপায় হইতে পারে। কিন্তু সে যে অপরাধী, লম্পটের মত যে হৃদয় লইয়া এর ওর ওর ঘরে বিনিময়ের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, সে হৃদয় আবার এই বিমলার নিকট কি করিয়া আনিয়া উপস্থিত করিবে, পবিত্র জিনিষকে অপবিত্র কলুষিত করিতে গিয়া সে যে পাপ করিয়াছে, ইচ্ছা করিলে বিমলা তাহার ক্ষমা করিতে পারে, কিন্তু না করিলে জোর করিবার কোন অধিকারও তাহার নাই। দশ মিনিট কাটিয়া গেল, গাছের পাখী দুইটী গাছ ছাড়িয়া উঠানের উপর গিয়া ডাকিয়া চলিয়া গেল, রৌদ্রটা যেন কেমন ম্লান হইয়া উঠিল, নির্ম্মল চাহিয়া দেখিল, বিমলার পায়ের তলার মাটীতে অশ্রু পড়িয়া তাহা ভিজাইয়া তুলিয়াছে, নির্ম্মল আর পারিল না, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিমলার হাত ধরিতে গেলে বিমলা সরিয়া দাঁড়াই-

তেই অনেকটা পিছাইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—"দাঁড়িয়ে কেন কাঁদছ বিমল, জানত আমি পাপী, যদিও ভোগ করা আমার ভাগ্যে ঘটেনি তবু কিছু তার পেছন ছুটতে আমার ক্রটী ছিল না। চুরি কর্ত্তে পারিনি বটে, কিন্তু চোরের বৃত্তি অবলম্বন করেত পাপ করেছি।"

"উঃ" শব্দে নির্ম্মলের মুখের কথা মুখেই আটকিয়া গেল, বিমলা ধপাস করিয়া পড়িয়া গেল। নির্ম্মল ব্যস্ত হইল না, এত দুঃখের মধ্যেও যেন এই আকস্মিক ঘটনাটা তাহাকে অনেকটা আশা ও আনন্দ প্রদান করিল, সে বিমলার মাথা হাটুতে তুলিয়া লইয়া কাপড়ের আচলে বাতাস করিতে লাগিল।

খানিক পরে বিমলার চেতনা ফিরিয়া আসিল, সে চোখ মেলিয়া আবার তখনই চোখ বুজিয়া লইল, অস্ফুটকণ্ঠের স্বর বাহির হইল—"আমি কোথায় ?"

"কেন বিমল" বলিতে বলিতে নির্ম্মলও থামিয়া গেল, তাহার আরষ্ট মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না, বিমলা যেন একটা কর্ত্তব্যের অভিব্যক্তিতে তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না, স্ত্রীলোকের নিজস্ব এই সুখ টুকু তাহাকে আজ লুব্ধ করিয়া কর্ত্তব্যচ্যুত করিল, মুখে বলিল মাত্র—"আঃ ছুয়ে ফেলেছ, এর মধ্যে ত ছুতে নেই।"

"নেই না কি ?" বলিয়া নির্ম্মল তাড়াতাড়ি হাটু হইতে মাথা নামাইয়া রাখিয়া বলিল,—"তোমাকে ছোবার অধিকার হয়ত আমার আর কোন সময়েই হবে না, এশরীরের সংস্পর্শে যে তোমার পাপ হবে।'

বিমলা অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল, কষ্টের শ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে অস্ফুট কণ্ঠে বলিল,—"আর যাই কর, অমন কথা গুলো বলে আমার পাপের ভার আর বাড়ীয়ে তুলনা, এ জন্মেত তোমায় সুখী কর্ত্তে পাল্লাম না, পর জন্মের আশার পথও কেন রুদ্ধকচ্ছ ?"

(ক্রমশঃ)

বিপ্লব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অবশ পা দুইটাকে কোনরূপে টানিয়া লইয়া অনুপমা যখন ঘরে ফিরিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। খুড়ী মা তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া সচকিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছে অনু, এত দেরী হ'লো যে ?"

অনুপমা সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। ক্ষণকাল পূর্ব্বে তাহার সম্মুখে যে ভয়ানক কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল, তাহাকে সে একটা প্রলয় কাণ্ড অপেক্ষা একটু কম মনে করিতে পারিল না, এবং সেই আকস্মিক প্রলয় ঘটনায় চিত্তটা ক্রমশই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার মনের কাছে সকলই যেন সন্ধ্যার অস্পষ্ট দৃশ্যের মত ঝাপসা বোধ হইতেছিল। সে কলসীটা নামাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িতে ঘরে ঢুকিল।

সত্যই কি ভয়ানক ব্যাপার! আর একটু হইলেই দ্রুতগামী ঘোড়াটা পায়ের চাপে তাহাকে দলিয়া পিষিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু তাহা হইল না, তাহাকে বাঁচাইবার জন্য পরেশ জোরে ঘোড়ার রাশ টানিয়া ঘোড়াসমেত নিজেই পড়িল। উঃ, সে পতন ব্যাপারে কি সাংঘাতিক! সে ব্যাপারটা মনে করিতে অনুপমা তখনও শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। যেন একটা প্রকাণ্ড মন্দিরের মাথা ভূকম্পে একবার কাঁপিয়া উঠিয়াই তাহার চোখে ঝাপসা লাগাইয়া হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। উঃ, কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! এ দৃশ্য অপেক্ষা তাহার দেহের উপর দিয়া ঘোড়াটা ছুটীয়া গেলে কি ভাল হইত না? তাহার দেহে না হয় আঘাত লাগিত, না হয় সে মরিয়া যাইত, কিন্তু চোখের উপর এই দৃশ্যটা—তাহাকে বাচাইতে গিয়া স্বামী নিজে ঘোড়া চাপা পড়িল এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা তো দেখিতে হইত না! সে যে স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, সেই স্বামী তাহাকে বাচাইবার জন্য প্রাণ দিতে গেল, এ যন্ত্রণাটা যে সব চেয়ে অসহ্য!

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে না হইয়া যদি আর কোন একটা মেয়ে ঘোড়ার সামনে পড়িত, তাহা হইলে কি হইত? পরেশ কি তাহার উপর দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিত' না তাহাকেও ঠিক এই রূপেই রক্ষা করিবার চেষ্টা করিত! যদি মানুষ হয়, তাহা হইলে সে অনুপমাকে বাচাইয়া এমন কোন একটা কাজ করে নাই যাহাতে স্ত্রীর উপরি তাহার ভালবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর সকলের জন্ত যাহা করিত, অনুপমার জন্তও তাহাই করিয়াছে, সুতরাং তাহাতে কষ্ট বোধ করিবার কিছু থাকিলেও গর্ব্ব অনুভব করিবার মত কিছুই নাই; সে পরেশের নিকট কৃতজ্ঞ হইতে পারে, কিন্তু তাহার ভালবাসার কাছে মাথা নীচু করিতে পারে না।

অনুপমা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বুকের ভারী বোঝাটাকে হালকা করিয়া গৃহকার্য্যে মন দিল. কিন্তু সকল কার্য্যের মধ্যেই যাহার বোঝাটা ক্রমেই মনে বেশী ভারি হইয়া আসিতে লাগিল।

রাত্রির রান্না শেষ করিয়া অনুপমা আঁচল পাতিয়া দাবার উপর শুইয়াছিল, একটু তন্দ্রাও যেন আসিতেছিল, সেটা কিন্তু গাঢ় হইতে পারিতেছিল না। থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছিল, তাঁর আঘাতটা যে গুরুতর হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; বাড়ী সেবা শুশ্রূষার লোকও তেমন নাই।. হয় তো সেবার জন্য তাহার ডাক আসিবে। সে ডাকে তাহাকে যাইতেই হইবে, না গিয়া থাকিতে পারিবে না। কিন্তু এতখানি রাত্রি হইল, কেহই তো ডাকিতে আসিল না। বাহিরে কুকুরটা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, অনুপমা ভাবিল, রামচরণ আসিয়াছে; সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। কিন্তু রামচরণ আসিল না, কুকুরটারও আর কোন শব্দ শুনা গেল না। অনুপমা আবার শুইয়া পড়িল।

আঘাতটা খুব গুরুতর হইয়াছে! লোকেরা যখন ঘোড়ার নীচে হইতে টানিয়া বাহির করিল, তখন অজ্ঞান। কে জানে কোথায় আঘাত লাগিয়াছে। কতকটা রক্তও যেন দেখা গিয়াছিল; মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া যায় নাই তো? শুনা যায় মাথার খুলি ভাঙ্গিলে মানুষ আর বাঁচে না। না না, খুলি ভাঙ্গিবে কেন, মাটী তো তেমন শক্ত নয়; জল শুকাইয়া গেলেও মাটী এখনও বোধ হয় নরম আছে। তাই আছে কি? আঃ, সে যে নিত্যই এই জায়গাটার পাশ দিয়া জল আনিতে যায়; অথচ সেখানকার মাটী নরম কি শক্ত, এক দিনও যদি লক্ষ্য করিয়া দেখিত, তাহা হইলে আজ এত ভাবিতে হইত না।

রাত্রি না হইলে এখনই সে জল আনিবার অছিলায় দেখিয়া আসিতে পারিত। না না, এই তো সেদিন একটু বৃষ্টি হইয়া গেল, মাটী নিশ্চয়ই নরম, মাথায় চোট লাগে নাই, শুধু ঘোড়ার চাপেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, একটু ওষুধ পত্র খেলেই সেরে যাবে। কিন্তু সেই রক্তটা? সেটা বোধ হয় হাতে পায়ে কিছু লাগায়—পাশের বাড়ীর দরজায় কে ডাকিল,—"বাবা!" অনুপমা শুনিল— বৌমা!

সে ধড়ফড় করিয়া উঠিতে উঠিতে উঠিতে বলিল, "কে—"

আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাহার কাণে আসিল, "ও বামী, ও পোড়ার মুখী।"

অনুপমা বুঝিতে পারিল, ইহা কেদার জেঠার কণ্ঠস্বর, দরজা খুলিয়া দিবার জন্য তিনি আপনার ভগ্নীকে ডাকিতেছেন। অনুপমা অবসন্ন ভাবে পুনরায় শুইয়া পড়িল।

ইহার একটু পরেই আকুলী মহাশয় বাড়ীতে আসিলেন। গৃহিণী উঠিয়া তাঁহাকে ভাত বাড়িয়া দিলেন। আকুলী মহাশয় আহারে বসিয়া গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শুনেছ, পরেশ ঘোড়া হইতে পড়ে গিয়েছে।"

গৃহিণী ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল কি? কোথায় পড়লো?"

আকুলী মহাশয় গৃহিণীর জিজ্ঞাসার উত্তরে জানাইলেন, "এই মেলপুরেই ঘোড়া ছুটাইয়া যাইতে যাইতে রাস্তার নীচে খালে ঘোড়া সমেত পড়িয়া গিয়াছে, পড়িয়া অজ্ঞান হইয়াছে। কেন পড়িয়াছে তাহা তিনি জানেন না, খুব সম্ভব ঘোড়াটা ক্ষেপিয়া উঠিয়া সওয়ার শুদ্ধ খালে পড়িয়াছে। সংবাদ পাইয়া তিনি দেখিতে যাইতেছিলেন, পথে চৈতন কামারের মুখে শুনিলেন, এখনো জ্ঞান হয় নি, রহিপুরের অতুল ডাক্তার আসিয়াছে, বর্দ্ধমানের সিবিল সার্জ্জনকে আনিতে লোক গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া তিনি রাত্রিতে যাওয়া নিষ্ফল জ্ঞানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অনুপমা মাথাটা উচু করিয়া রান্নাঘরের দিকে কান পাতিয়াছিল, সে উঠিয়া বসিল। গৃহিণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ গা, কি হবে তা হলে? বাঁচবে তো?"

আকুলী মহাশয় বলিলেন, "যে রকম লক্ষণ শুনলাম, তাতে বাঁচবার লক্ষণ তো কিছুই দেখছি না। তবে কি জান, বাঁচা মরা ঈশ্বরের হাত, মানুষের তো তাতে কোন জোর নাই। নেহাৎ পরমায়ুর জোর থাকে তবেই এ যাত্রা

রক্ষা, নইলে—কি জান, অতি দর্পটা কিছুই নয়। একটু লেখাপড়া শিখলে ই যে ব্রাহ্মণ সজ্জন বা গুরুতর লোকের অপমান কত্তে হবে এমন কোন কথা নাই। বাপের শ্রাদ্ধের সময় দেখলে তো, একশো খানি টাকা দিলেই মিটে যায়, সকলে হাসিমুখে লুচী খেয়ে চলে আসে, তা হ'ল না, ব্রাহ্মণদের অপমান করে এক রকম তাড়িয়েই দিলে। সে সব ব্রহ্মনিশ্বাস যাবে কোথায় ?"

গৃহিণী তাড়াতাড়ি নিতান্ত মিনতি স্বরে বলিলেন, "সে যা হয়েছে হোক, তাই ব'লে তুমি আর অভিশাপ দিও না। হাজার হোক আমাদের জামাই।"

আকুলী মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন, হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ মধ্যস্থ ভাত কয়টা পাতের চারিপাশে ছড়াইয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "অভিশাপ আমি দিই না, তবে কি জান, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। পাপ কল্লে তার ফলভোগ কর্ত্তেই হবে। এই সে দিন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কি অপমান করেছে জান ? তাঁর নাতি তিনটী শিশি নিয়ে ওষুধ আনতে গিয়েছিল, তা ঐ রেমো বেটা, যে বেটা মাঝে মাঝে আসে, ঐ বেটা গয়লার ছেলে ওষুধ নাই বলে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এ সব কি সয় ? কলি হলেও এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠছে, দিন রাত হচ্চে, এখনো ব্রাহ্মণের গলায় যজ্ঞোবীত রয়েছে। যাক্, সকলই জগদম্বার ইচ্ছা।

গম্ভীরভাবে কথাগুলি বলিয়া আকুলী মহাশয় অতঃপর নিঃশব্দে আহার শেষ করিয়া উঠিলেন। অতঃপর গৃহিণী মনোর মাকে খাইবার জন্য ডাকিতে আসিলেন, কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া ডাকিতে পারিলেন না। ভাত তরকারীতে চাপা দিয়া রান্নাঘর বন্ধ করিয়া আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন, স্নেহকোমল কণ্ঠে ডাকিলেন, "অনু !"

অনু একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল !

সারারাত্রির মধ্যে অনুপমা একবারও ঘুমাইতে পারিল না, একটু তন্দ্রা আসিলেই সেই সঙ্গে সেবাবঞ্চিত আহতের আর্ত্তনাদ আসিয়া তাহার চিত্তকে জাগাইয়া দিতে লাগিল। অনুপমা সমস্ত রাত্রি জাগাইয়া কাটাইল। ইহার মধ্যে সে নিজের যাইবার কথা একবারও ভাবিল, শুধু সেবা করিবার জন্য তাহাকে কেহ লইতে আসিল না কেন ইহাই চিন্তার বিষয় হইল, এবং সেই চিন্তার পরিণামে এমন একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কা মনের ভিতর জাগিয়া উঠিতে লাগিল, যাহাকে তাড়াইবার জন্য অনুপমা ছটফট করিতে লাগিল। না না,

সামান্য মাত্র আঘাত, হয়তো সারিয়া গিয়াছে, তেমন সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজন হয় নাই। নতুবা রামচরণ কোন্ কালে তাহাকে লইতে আসিত। কোন আশঙ্কা নাই বলিয়াই সে আসে নাই। আশঙ্কা কি? অমন জোয়ান লোকটা ঘোড়ার একটু চাপে তাহার কি হইবে?

মন অমঙ্গলাশঙ্কী। সঙ্গে সঙ্গে মনে আসিল, কিন্তু পরাণ বাগ অসুরের মত চেহারা, সেদিন হুঁচোট খাইয়া পড়িল, ডাক্তার ডাকিতেও বিলম্ব সহিল না। না না, সে তাহার নিয়তি, নিয়তি! অনুপমা বালিশটাকে দুইহাতে জড়াইয়া তাহার মধ্যে মুখটা এমন জোরে গুঁজিয়া রাখিল যে, তাহার মনে হইল, এই মুখের ভিতর দিয়াই যেন বাহিরের অমঙ্গল চিন্তাগুলা মনের কাছে গিয়া হাজির হইতেছে।

সকালে তাহার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া খুড়ী মা ভীত হইলেন; আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি মা, এমন কত লোক ঘোড়া হতে পড়ে যায়।"

অনুপমা কোন উত্তর করিল না। খুড়ী মা তাহার আশঙ্কার গুরুত্ব অনুভব করিয়া একটু মিথ্যার আশ্রয় লইয়া বলিলেন, "তোর কিছু ভয় নাই, গুদীর মা চোখে দেখে এসেছে, তেমন কিছু চোট লাগে নি, শুধু পায়ে।"

বাধা দিয়া অনুপমা করুণ গম্ভীর স্বরে বলিল, "না খুড়ী মা, খুব বেশী লেগেছে।"

তাহার ধারণাটা উড়াইয়া দিবার জন্য খুড়ী মা যেন একটু রাগের ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "হাঁ, লেগেছে, কে তোকে বললে বল্‌তো?"

অনুপমা বলিল, "আমি চোখে দেখেছি।"

"চোখে দেখেছিস্?"

"হাঁ আমিই ঘোড়া চাপা পড়তাম, কিন্তু আমাকে বাঁচাতে গিয়েই—"

অনুপমা কথাটা শেষ করিতে পারিল না। খুড়ীমাও তাহার কথায় বিস্ময় ও স্তব্ধভাবে খানিকটা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তার পর ধীর কোমলস্বরে বলিলেন; "তুই যাবি অনু?"

অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?"

খুড়ীমা তাহার মাথায় একটা হাত রাখিয়া, স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ছি মা এই কি রাগ অভিমানের সময়? আমি পাল্কী আনিয়ে দিচ্চি, সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে আয়।"

অনুপমা কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

মধ্যাহ্নকালে পরেশের বাড়ীর দরজায় পাল্কী হইতে নামিয়া অনুপমা দেখিল, অদূরে রামচরণ বসিয়া রহিয়াছে। কিন্তু অনুপমাকে দেখিয়াও সে কোন কথা বলিল না, মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল। অনুপমা শঙ্কা জড়িত পদে বাড়ী ঢুকিল।

বাড়ীখানা নিস্তব্ধ, যেন সেখানে একটী প্রাণীও বাস করে না। অনুপমার বুক দুর দুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে আস্তে আস্তে সিঁড়ী দিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সেই ধীর পদক্ষেপের মৃদু শব্দ টুকুতেই স্তব্ধ বাড়ীখানা যেন শব্দিত হইয়া উঠিল। অনুপমা কম্পিত চরণে উপরে উঠিয়া পরেশের ঘরের সম্মুখীন হইল। কিন্তু ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বেই এককিশোরী বিদ্যুতের মত আসিয়া দরজার উপরে দাঁড়াইল, এবং দুই হাতে দরজা আগলাইয়া মৃদু অথচ কঠোর স্বরে বলিল· "আমি এখন তোমাকে এ ঘরে ঢুকতে দিতে পারি না।"

অনুপমা তাহার মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?"

কিশোরী স্থির স্বরে উত্তর করিল, "আমি শৈল।"

অনুপমা বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"শৈল !"

টেবিলের উপর চিমনীটা মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহারই মৃদু আলোক রেখা আসিয়া পরেশের পাণ্ডুর মুখখানার উপর পড়িয়াছিল। মাথার কাছে বসিয়া অনুপমা নির্নিমেষ নেত্রে সেই মুখখানির দিকে চাহিয়াছিল।

মধ্যাহ্নের পর পরেশের চৈতন্য হইয়াছে। ডাক্তার আশ্বাস দিয়াছেন, আর কোন ভয় নাই। শৈল অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া অপরাহ্নে অনুপমাকে পরেশের কাছে রাখিয়া এবং সমস্ত কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়া এক রাত্রি এক দিনের পর স্নানাহার করিতে গিয়াছে। তদবধি অনুপমা স্বামীর মাথার শিয়রে বসিয়া রহিয়াছে। বসিয়া থাকিতে থাকিতে যখনই শৈলর কথা মনে আসিতেছে, তখনই ঈর্ষায় তাহার প্রাণটা যেন জ্বলিয়া উঠিতেছে; কিন্তু সেই সঙ্গে রোগীর সেবা কার্য্যে যখনই আপনার অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় পাইতেছে, তখনই আবার লজ্জায় আপনাকে আপনি ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারিতেছে না।

ঔষধের তিন চারিটা শিশি ছিল; কোন্ সময়ে কোন্টা খাওয়াইতে হইবে,

শৈল তাহা উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঔষধ খাওয়াইবার সময় উপস্থিত হইলে সে যেন সব গোলমাল করিয়া ফেলিল। তাহার যেন মনে হইত লাগিল, এ শিশিটা নয় ঐ শিশিটা। শিশির গায়ে ক্রমিক নম্বর লেখা ছিল, কিন্তু তাহা ইংরাজীতে লেখা, অনুপমা তাহা বুঝিতে পারিল না। অনেক কষ্টে সে ঔষধ ঠিক করিয়া খাওয়াইতে গেল। পরেশের সংজ্ঞা নাই, অনুপমা এক হাতে তাহার মাথাটা ধরিয়া অপর হাতে ঔষধের পাত্র লইয়া মুখে ঢালিয়া দিতে গেল, কিন্তু তাহার হাতটা এত জোরে কাঁপিয়া উঠিল যে, সামান্য মাত্র ঔষধ মুখে গেল, বাঁকী সব বিছানায় পড়িয়া গেল। পরেশ মুখ বিকৃত করিয়া হাতখানা ছুড়িতেই অনুপমার হাতের গ্লাসটা মেঝের উপর পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। অনুপমা ভয়ে লজ্জায় যেন জড়-সড় হইয়া পড়িল।

খানিক পরে পরেশ চোখ মেলিয়া ইঙ্গিতে জল চাহিল। গ্লাসটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, অনুপমা তাড়াতাড়ি একটা বাটীতে সোডার জল ঢালিয়া দিতে গেল। পরেশ কিন্তু জল খাইল না, তীব্র ভ্রূভঙ্গি করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। অনুপমা চুপ করিয়া মাথার কাছে বসিয়া রহিল। দ্বিতীয় ঔষধটা খাওয়াইবার সময় প্রায় হইয়াছে ; কিন্তু অনুপমা সাহস করিয়া উঠিতে পারিল না, শৈলের আগমন প্রত্যাশা করিতে লাগিল।

আপনার এই অক্ষমতায় অনুপমা শুধু যে নিজে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে শৈলর উপর যেন একটু শ্রদ্ধার উদয় হইতে লাগিল। শৈল যদি না থাকিত তাহা হইলে কে ইহাকে বাঁচাইত? অনুপমা প্রথম আসিয়া দরজার উপর শৈলকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল, এখন যেন সে দৃষ্টটা ক্রমেই কোমল হইয়া আসিতে লাগিল।

পরেশ চক্ষু উন্মিলন করিয়া ডাকিল, "শৈল!"

অনুপমা একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া উত্তর দিল, "কেন?"

পরেশ বলিল, "শৈল কোথায়?"

"ঘরে গিয়েছে।"

"তুমি কে?"

অনুপমা কি উত্তর করিবে সহসা ভাবিয়া পাইল না ; উত্তর দিতে যেন কষ্ট বোধ হইল ; মৃদুস্বরে বলিল, "আমি—আমি অনুপমা।"

সচকিতে মুখ ফিরাইয়া পরেশ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "তুমি তা হ'লে ঘোড়া চাপা পড়নি?"

অনুপমা উত্তর করিল, "না।"

পরেশ যেন একটা আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করিল। অনুপমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি চাপা পড়লেই বোধ হয় ভাল হ'তো।

ছাদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পরেশ বলিল, "না।"

"কেন নয়?"

"তাতে আমার দুর্নাম, পাপ দুইই হ'তো।"

"কিন্তু তুমি উপযুক্ত স্ত্রী পেতে পাত্তে।"

চকিতে দৃষ্টি ফিরাইয়া পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কে আমার উপযুক্ত স্ত্রী?"

ঈষৎ তীব্রকণ্ঠে অনুপমা বলিল, "শৈল।

ভ্রূকুটীতে গভীর বিরক্তি প্রকাশ করিয়া পরেশ চক্ষু মুদ্রিত করিল।

অনুপমা একটু চুপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছ?"

পরেশ উত্তর দিল না। অনুপমা পুনরায় ডাকিল, কিন্তু সাড়া নাই। তখন সে মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আরও তিন চারিবার জোরে জোরে ডাকিল, মাথা ধরিয়া নাড়া দিল, কিন্তু কোন সাড়া পাইল না। অনুপমা যে কি করিবে না করিবে ভাবিয়া পাইল না; সে যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, তাহার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো পিসীমা গো!"

পিসীমা বাহিরে মালা জপিতেছিলেন। অনুপমার চীৎকারটা তাঁহার কাণে বজ্রধ্বনির ন্যায় আসিয়া ঠেকিতেই তিনি মালা হাতে "ওরে কি হ'লো রে" বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু দরজার চৌকাট বাধিয়া পড়িয়া গেলেন। অনুপমা খাট হইতে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সে চীৎকারধ্বনি কক্ষ মধ্যে বিলীন না হইতেই শৈল হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিল; এবং সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?"

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই সে ছুটিয়া খাটে উঠিল, এবং পরেশের কপালে নাকে মুখে হাত দিয়া খুব জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিল। তারপর একটা ঔষধ খাওয়াইয়া দিয়া পাখা লইয়া পরেশের মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। অনুপমা আড়ষ্ট ভাবে মেঝের উপর পড়িয়া তাহার কার্য্য কলাপ দেখিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে তাহার যেন এই মেঝেটার সঙ্গে মিলিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল।

[ক্রমশঃ]

চাটনি

(১)

স্ত্রী। আমি তোমাকে পাঁচখানা পত্র দিলেম, তা তুমি একখানারও উত্তর দিলে না। আক্কেল বলে একটা জিনিষ, তা তো তোমার নেই।

সম্পাদক। আমি নিয়ম ব্যতিক্রম করতে পারি না; সম্পাদকের স্ত্রীর অন্ততঃ জানা উচিত যে, "উত্তরের প্রয়োজন হইলে টিকিট পাঠাইতে হয়।"

(২)

লেখক। আমার প্রবন্ধ তো আপনার কাগজে একটাও প্রকাশ করলেন না, ফেরত চেয়ে পাঠালেম, তাও ফেরত দিলেন না। আমার "জ্বলন্ত অনল" নামে যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ গুলো পাঠিয়েছি সে গুলো গেল কোথায়?

সম্পাদক। (গম্ভীরভাবে) জ্বলন্ত অনলে!

(৩)

বাবু। তুমি তো আচ্ছা লোক হে? তাগাদা করবার কি আর সময় পেলে না। দেখছ আমার স্ত্রীর প্রসব বেদনা উপস্থিত!

পাওনাদার। আজ্ঞে সে অপরাধটাও কি আমার?

(৪)

উমাকান্ত বাবুতে ও রামরতন বাবুতে মহা-তর্ক চলিতেছিল, উমাকান্ত বাবু শেষ চটিয়া বলিলেন, "তুমি না বুঝলে উপায় নেই, কিন্তু গাধায়ও এ বুঝতে পারে।" রামরতত বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ওই টুকুই তোমার সুবিধা।"

(৫)

১ম বন্ধু। বলতে পারো বন্দুক ছোড়বার সময় লোকে এক চোক বোজে কেন?

২য় বন্ধু। এ আর বুঝতে পারো না, কারণ দুই চোক বুজলে আর কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না।

(৬)

নবীন। শুনেছ আমাদের সেই [illegible] বুড়ী মারা গেছে।

বিপিন। সত্যি না কি? আমি পূর্ব্বেই ভেবেছিলাম শেষে ওর ভাগ্যে ওই ঘটবে!
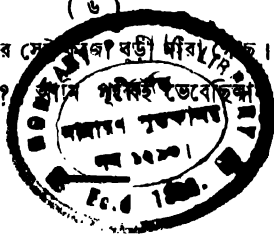
ষষ্ঠ বর্ষ } মাঘ, ১৩২৫ { ১০ম সংখ্যা

জায়ে জায়ে।

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

দোষ যে কাহার বলা দায়!

সর্ব্বশরণ ও রামশরণ দুই ভাই; তাহাদের স্ত্রী গিরিবালা ও হরিপ্রিয়া— ছয় বৎসর এক সংসারে বনিবনাও করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আজকাল প্রায়ই কেমন একটা বেখাপ্পা রকমের গরমিল হইতে দেখা যাইতেছিল।

পাড়ার রমণীরা ছেলেদের কলহে বাধা দিয়া বলিত—চৌধুরিদের দু'টি ভাইকে দেখলে চক্ষু জুড়ায়! দু'টি ভাই—এক আত্মা।

যেদিন ছোট বৌ হরিপ্রিয়া বড় জা গিরিবালাকে তাহার ছেলে নীরেনের দুধ ফেলিয়া দেওয়ার অপরাধে দশ কথা শুনাইয়া দিল, বড় জা গিরিবালা ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার কন্যা পুঁটিকে বুকের ভিতর পুরিয়া সারা দিন কাঁদিয়া কাটাইয়া দিল। জমিদার বাড়ীতে কাজ শেষ করিয়া আসিয়া, সর্ব্বশরণ বড় বৌ এর মান ভাঙ্গাইল; বলিল—ছোট বোন্, দু'টা কথা যদি বলেই থাকে, যে বড়, তার কি তা ধরে থাকৃতে আছে? পাগলী, যখন বড় হ'য়েছ, তখন একটু সইতেই হবে।

রামশরণ হরিপ্রিয়াকে বলিয়াছিল—ফের যদি অমন কাজ করবি, দেব তোকে দূর করে।

হরিপ্রিয়া 'বাবা গো' বলিয়া কাঁদিবার চেষ্টা পাইবামাত্র রামশরণ তাহার হাত ধরিয়া, আদর করিয়া বলিল—একটা কথা বললুম, অমনি রাগ হল! দেখ দেখি, তোর আর খোকার জন্যে কি এনেছি। এই দেখ, বলিয়া সে সোণার টুকটুকে দু'গাছা বালা ও একছড়া সোণার কণ্ঠহার চাদরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া হরিপ্রিয়ার হাতে দিল। বালাজোড়া বিছানায় রাখিয়া হরিপ্রিয়া

নীরেনের গলায় কণ্ঠহার পরাইয়া দিয়া বলিল—বাবাকে নম করত, বাবা আমার !

রামশরণ যখন দেখিল, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, তখন আস্তে আস্তে বলিল— আজ কান্নাটা হ'ল না তা হ'লে !

(২)

চৌধুরীদের সংসার পরিচয় এইরূপ।

রামশরণ সর্ব্বশরণের খুল্লতাত পুত্র। উভয়েই বলাগড় গ্রামের ইংরাজী স্কুলে অতি সামান্য লেখা পড়া শিখিয়াছিল। আর্থিক অবস্থা উন্নত না থাকায় অল্প বয়সেই দুজনে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সর্ব্বশরণ গ্রামের জমিদার বাড়ী মুহুরীগিরি করিত, রামশরণ বেণের দোকানে মুহুরিগিরিতে ভর্ত্তি হইয়া পড়িল।

দু'জনের বিবাহের পর হইতে অল্প অল্প খুঁটিনাটি হইত, রামশরণ সর্ব্বশরণকে মান্য করিত বলিয়াই সে সকল কথায় কর্ণপাত করিত না। সংসার পৃথক হয় নাই, আহার এক হাঁড়ীতেই চলিত, অন্যান্য যা কিছু স্বতন্ত্র ; যেমন কাপড় চোপড় ইত্যাদি।

রামশরণ সম্প্রতি মহাজনের কাজে কলিকাতায় গিয়াছিল। সেখানে গ্রামের জমিদার বাবুদের স্বর্ণকারের দ্বারা দুইখানি অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া আনিয়া হরিপ্রিয়ার হাতে দিল। বড় জা গিরিবালা সর্ব্বশরণকে কহিল— ছোট বৌ-এর নূতন বালা দেখেছ ?

সর্ব্বশরণ বলিল—ভাদ্দর বৌ-এর হাতের গয়না কেমন করে দেখ্‌ব, বল ? নূতন হয়েছে নাকি ?

হ্যাঁ গো, টক্‌টকে গিনি সোণা—এই এতখানি।

বেশ ত !

শুধুই 'বেশ ত !'

নহিলে আর কি বলব, বল ? তোমার কি দুঃখ হচ্ছে ? কি করব বল ! আমার অবস্থা তোমার ত অজানিত নেই।

আমার জন্যে দুঃখ হ'চ্ছে না। আমি বুড়ো মাগী, গয়নার আর দরকার নেই। নীরেনের যেমন হার হয়েছে, পুঁটির জন্যে সেই রকমের হার গড়িয়ে দাও। ক'দিন ধরে খ্যান্ খ্যান্ করছে।

এই সময়ে অসংলগ্ন চরণক্ষেপে নীরেন উঠান দিয়া চলিতেছিল, সর্ব্বশরণ স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকিল—নীরু—

কি, জেঠামতায় ?

এদিকে এস ত বাবা !

নীরেন জ্যেষ্ঠতাতের ক্রোড়ে উঠিল। সর্ব্বশরণ হার দেখিয়া বলিল—কি সুন্দর হারটি! দেখি, বাবু বলেছেন ত এবার কিছু দেবেন। একগাছা মিনির জন্যে না হয় গড়িয়ে দেব। এগুলোকে কি হার বলে ?

হরিপ্রিয়া জানিত না, সর্ব্বশরণ সেখানে আছেন, সে বড় জা-এর সন্ধানে আসিয়াছিল, ভাসুরকে দেখিয়া, জড়সড় হইয়া চলিয়া গেল।

(৩)

অগ্রহায়ণ মাসের ১৪ই। বাবুদের বাড়ীতে বিবাহ। সমস্ত গ্রামের লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। চৌধুরীদেরও হইয়াছে। সর্ব্বশরণ, স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া যাত্রা করিল, নীরেন বলিল—জ্যেঠামতায়, মা বললে মা যাবে না, অসুক করেছে, আমি তোমার সঙ্গে যাব। বাবা দোকান থেকে যাবে।

সর্ব্বশরণ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল—চল, বাবা-আমার !

নীরেনের গলায় সেই কণ্ঠহার দুলিতেছিল, দেখিয়া গিরিবালা বলিল—এমন বরাত করে এসেছিলুম ভারতে, মেয়ের গলায় যে একটা গয়না দেব, পোড়া অদৃষ্টে তারও যো নাই।

সর্ব্বশরণ বলিল বোসপাড়ার মধু শেকরাকে গড়তে বলেছি, শীঘ্রই দেবে।

বিবাহ বাড়ীতে পৌঁছিয়া ছেলেদের আমোদ দেখে কে ? মিনি একদল মেয়েদের সঙ্গে ছুটাছুটি ও বর দেখিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল; নীরেন কতকগুলি বালকের সহিত মিশিয়া মহোৎসাহে লাল-নীল দেয়াশালাই পোড়া-ইতে, কখন বা লুকোচুরি খেলিতে প্রবৃত্ত হইল।

যখন ব্যাণ্ড বাজাইয়া চতুর্দ্দোলে চড়িয়া, যাত্রার দলের রাজার মত বর আসিল, ছেলেরা সব ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, ও ভাই বর, কি করতে এসেছ, বল না ভাই ?—বর অবশ্যই সে সকল কথায় কর্ণপাত করিতেছে না; এবং তাহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া আছে, ছেলের দল তাহা দেখিয়া ভাবিতেছে, উঃ কি কথাই বলিয়াছি। ও ভাই, বর কখনই উত্তর দিতে পারিবে না।

নীরেন সকল বালকের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া—ও ভাই বর ইত্যাদি বলিয়া আপনার মনে অযথা আনন্দ অনুভব করিতেছিল। সকলের চেয়ে ছোট, সকলের চেয়ে ক্ষীণ এই পাঁচ বৎসরের শিশুটি বর দেখিতে না পাইলেও আহ্লাদ যে

অন্য সকলের চেয়ে কম হইতেছিল, তাহা বলা চলে না! সে হাততালি দিয়া, হাসিয়া, লাফাইয়া হর্ষ প্রকাশ করিতেছিল। তাহাতে তাহার কি যে আনন্দ, সেই জানে!

বর আসরে গিয়া বসিল, ছেলের দলও সেইদিকে ছুটিল। সকলের শেষে নীরেন চলিয়াছে।

তাহার বাপ রামশরণ বসিয়াছিল, সে ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইল। নূতন পোষাক তাহার গায়ে চক্‌মক্ করিতেছে, কিন্তু প্রথমেই রামশরণের দৃষ্টি পড়িল, গলার দিকে! গলায় ত হার নাই! ছোট বৌ-এর উপর তাহার ভয়ানক রাগ হইল। এমন দিনে যদি কেহ হার না পরিল, কবে আর পরিবে? রামশরণ জিজ্ঞাসিল—নীরু, হার কোথায় বাবা?

জানিনা। ঐ বর বসেছে, ঐখানে চল না বাবা।

জানিনা! কি বলে ছেলেটা?—রামশরণের মনের ভিতর খট্ করিয়া উঠিল। তবে কি সে হার হারাইয়া ফেলিয়াছে?

ছেলে বলিল—চল-না বাবা, বর—

রামশরণ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—বর এখন মাথায় থাক্—হার কোথায় গেল? সে ছেলেকে কোলে করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে ছুটিল।

সর্ব্বশরণ বিবাহ-বাটীতে নীরেনকে খুঁজিয়া না পাইয়া আলু-থালু হইয়া বাড়ী ফিরিল।

(৪)

সর্ব্বশরণ বাড়ীর নিকটেই পৌঁছিয়াই শুনিল—হরিপ্রিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে—বড় মায়া! তোমার যে বড় মায়া! দাদা! দাদা! কি আমার দাদা গো! আমি চিরকালই জানি—

জান ত আজ আবার ওদের সঙ্গে পাঠালে কেন?—এই কথা কয়টি রামশরণ কহিল।

সর্ব্বশরণের শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল।

হরিপ্রিয়া বলিতেছিল—সেদিন যখন নীরুকে কোলে নিয়ে তোমার দাদার সোহাগ করা হ'চ্ছিল, আমার মন ঠিক বুঝেছিল যে ঐ হার ছড়াটার উপরই লোভ পড়েছে। অমন সর্ব্বনেশে লোক—

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই সর্ব্বশরণ সেই অন্ধকারে, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

শুনিল,—রামশরণ বলিতেছে—আমি মুখ ফুটে বল্‌তে পারব না।

হরিপ্রিয়া বলিল—সে তোমায় ভাবতে হবে না। সে ভার আমার। যা'তে ওদের ছায়া আর না মাড়াতে হয় আমি তা করছি। হরিপ্রিয়া ক্রন্দনের সুরে বলিতে লাগিল—আহা, বাছা আমার দশদিনও পরলে না-গা! এমন করে নিলে! যে হার নিয়েছে, ভগবান করুন—

রামশরণ বলিল—চুপ কর, গোল করিস নে। জিনিষ ধরতে হবে।

আর শুনিতে ইচ্ছা হইল না। সর্ব্বশরণ নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। তাহার গায়ে লেপ টানিয়া দিতে দিতে গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিল—শরীরটা কি ভাল নেই?

নাঃ—বলিয়া সর্ব্বশরণ মুখ ফিরাইল।

পরদিন সর্ব্বশরণ জমিদার-বাড়ীতে চলিয়া যাইবার পর মধু স্বর্ণকার আসিয়া পুঁটির হার গিরিবালার হাতে দিয়া গেল। গিরিবালা পুঁটির গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল, যা কাকীমাকে প্রণাম করে আয়।

পুঁটির গলায় হার দেখিয়া হরিপ্রিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল. দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সে সজোরে হার খুলিয়া লইয়া বলিল—যা বলগে যা, যার হার সে নিয়েছে।

গিরিবালা ঘরের বাহির হইয়া আসিল। তখন সেই গৃহমধ্যে একটা ছোটখাট বাক্যযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

পাড়ার লোক বলিল—"মড়ারা ঝগড়া করেই চিরটাকাল ম'ল!"

(৫)

সেইদিনই মহাজনের মাল সংগ্রহ করিতে রামশরণকে কলিকাতায় যাইতে হইল। হুগলী হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত নূতন রেল খুলিয়াছে, সেই লাইনের গাড়ীতেই সে আসিয়াছে। কাজেই হরিপ্রিয়াকে কিছুই বলিয়া আসিতে পারে নাই, আর সন্ধ্যার পরেই ত ফিরিবে।

হন্ হন্ করিয়া সে চলিয়াছে। দু'বার দু'টা আলোক-স্তম্ভে ধাক্কা লাগিয়া গিয়াছে; মনের অবস্থাও ভাল ছিল না।

পিছন হইতে কে ডাকিল—রামশরণ বাবু! ও মশায়, ও চৌধুরী মশায়!

রামশরণ ফিরিয়া বলিল—আঃ, কে আবার চেঁচামেচি করে!

শুনুন, শুনুন।

ও—তুমি! ভালো ত! বড় তাড়া।

দোকানে আসবেন না একবার ?

এই ব্যক্তিই জমিদার বাবুদের স্বর্ণকার, এবং সেই নীরেনের হার প্রস্তুত করিয়াছিল।

রামশরণ দোকানে ঢুকিয়া বসিয়াই বলিল—তোমার দোকান থেকে একটি গাদা টাকা খরচ করে ছেলেটার জন্তে কণ্ঠহার ছড়াটা গড়িয়ে নিয়ে গেলুম, অদৃষ্ট এমনি, ছেলেটা দশদিন সেটা গলায় দিতে পেলে না হে! চোরে চুরি করলে! শুধু তাই কি! ঘরের চোর, নিজের ভাই। চুরি করে সেই হার নিজের মেয়ের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে। আমি খুব ভাল তাই কিছু বলি নি; অন্য কেউ হ'লে দাদা-ফাদা মানতো না। একটা কাণ্ড করে বস্‌তু। হ্যাঁ, তামাক আছে হে ?

আপনি বলছেন কি, "চুরি গেছে—"

"বলছেন কি—দেখে এলুম, এই চোখ দিয়ে।"

"আপনার ছেলের হার ?"

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সেই হার, সেই হার! তার গলায় ছিল, ছোট বৌ রাগের মাথায় কেড়ে নিয়েছিল, তা আমি আবার ফেরত দিলুম। উপরে ভগবান আছেন, তিনিই বিচার করবেন। কৈ-হে, তামাকটা—

এই যে আসছে—বলিয়া স্বর্ণকার একগাছি হার বাহির করিয়া বলিল পরশু একটি ছেলে বাবুদের বাড়ীতে বর দেখছিল, তার গলা থেকে এটি খুলে পড়ে যায় আমি কাছেই ছিলুম, তুলে নিয়ে দেখলুম, আমারই তৈরী; ভিতরে নামও আছে, আর নতুন দেখে মনে হল যে এ'টি আপনাকেই গড়ে দিয়েছি। একটু পরে ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেটিকে দেখতে পেলুম না, সন্ধান করেও আপনাকে পেলুম না। কাজেই সঙ্গে রাখ্‌তে হ'ল। ভাবলুম পরে যখন বলাগড় যাব—দিয়ে আসব! আজিই একটা চিঠি আপনাকে দিচ্ছিলুম।

অল্প অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া রামশরণ বলিল কি বলছ তুমি! আর সে হার আমি দেখে এলুম। আচ্ছা, বল দেখি সে ছেলেটি কত বড় ?

দাঁড়ান মশায়। হারের নম্বর আছে—চশমা পরিয়া স্বর্ণকার দেখিল, ৩২০ নং, খাতা খুলিয়া রামশরণকে দেখাইল, বলিল—এই দেখুন তবে ৩২০ নং বাবু রামশরণ চৌধুরী সাং বলাগড়, চৌধুরীপাড়া। 'ছ' ভরি, দেখলেন ত!

তাইত, রামশরণের তামাক খাওয়া হইল না। সে আড়াইটার ট্রেণে বাড়ী ফিরিয়া হরিপ্রিয়ার কাছে বলিতে গেল। ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল,

ক্রোধে রুদ্রমূর্ত্তি হইয়া হরিপ্রিয়া অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়া আছে! বলিল—হয়েছে কি? শুয়ে যে!

হরিপ্রিয়া বলিল—অদৃষ্টে আরো কি আছে কে জানে? গেছিলে কোথায়?

"হ'য়েছে কি? ধমক দিয়া রামশরণ বলিল, হয়েছে কি?"

হরিপ্রিয়া বলিল—তুমি খবর না দিয়ে কোথায় গেছ, আমি কেঁদেকেটে সারা—রান্না বান্না চড়াই নি। বড় গিন্নি, ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে ভাত খাইয়ে দিয়েছেন। বিষ, বিষ খাইয়ে দিয়েছেন! শীঘ্র ডাক্তার বদ্যি ডাক। বিষ—বিষ—

রামশরণ বলিল—বিষ, বল কি? তাহ'লে আমিও যাই, একটু খেয়ে আসি।

গিরিবালাকে ডাকিয়া বলিল—বড় বৌ, এদিকে ত হাঁড়ী চড়েনি, যদি কিছু থাকে, চারটি দাও, আমি ত আর পারছি না।

গিরিবালা সস্নেহে বলিল, সত্যি?

সত্যি কি মিথ্যে দেখ—বলিয়া একখানি আসন স্বহস্তে পাতিয়া লইয়া রামশরণ বসিয়া পড়িল।

সেই সময় কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া হরিপ্রিয়া রামশরণের সদ্য পরিত্যক্ত জামায় হাত দিয়া দেখিল—তন্মধ্যে নীরেনের অপহৃত হারটি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

ঘোম্‌টা আটা

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল]

প্রথম পরিচ্ছেদ

পিতার সহিত গোকুলের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না,—সে আবাল্য তাহার দাদা মহাশয়ের নিকটই মানুষ হইয়াছে। গোকুলের দাদামহাশয় নীলরতন বাবুর সন্তান সন্ততির মধ্যে ছিল ওই একমাত্র কন্যা। গোকুলের অতি শৈশবেই মাতৃবিয়োগ হয়। তাহার মাতার মৃত্যুর পর নীলরতন বাবু তাঁহার ক্ষুদ্র দৌহিত্রটিকে

নিজের নিকটে আনিয়া রাখেন। সেই হইতে গোকুল, গোকুলে কৃষ্ণের মত এত বড়টা হইয়া উঠিয়াছে। গোকুলের পিতা রামসদয় লোকটা ছিল কৃপণ, শুধু কৃপণ কেন, অতি কৃপণ বলিলে তবে তাহার চরিত্রের কতকটা বিশেষণ প্রদান করা হয়। গোকুলের মাতার মৃত্যুর পর তাহার দাদামহাশয় যখন গোকুলকে তাঁহার বাটীতে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন,—তখন পুত্রের খাইখরচ ও লেখাপড়া হিসাবে কতকটা খরচ লাঘব হইবে দেখিয়া রামসদয় আর তাহাতে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। রামসদয় লোকটা বুঝিত কেবল অর্থ,—না খরচ করিয়া কেমন করিয়া অর্থ সঞ্চিত করিতে হয়,—কেমন করিয়া সেই অর্থ নাড়িয়া চাড়িয়া কেবলই বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, তাহা তিনি যতটা বুঝিতেন,—ততটা বোধ হয় পৃথিবীর খুব কম মানুষই বুঝিত। অর্থব্যয়ের ভয়ে তিনি কোন একটা ভাল জিনিষ কোনদিন মুখে তুলিয়া দেন নাই। তাঁহার বাটীতে কাজ করিলে না খাইয়া থাকিতে হয় এই কথাটা বাজারে রাষ্ট হইয়া পড়ায়,—তাঁহার বাটীতে দাসী চাকরও থাকিতে চাহিত না। তাহাতে রামসদয়ের সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা হয় নাই। তিনি ভাবিতেন,—ভালই হইয়াছে,—লোকজন যত না থাকিতে চায় ততই মঙ্গল। অনেকটা ব্যয় লাঘব হইবে। যতদিন গোকুলের মাতা জীবিত ছিলেন,—ততদিন বাটীতে দাসী চাকরের সম্পর্কই ছিল না; তাঁহার মৃত্যুর পর নিতান্ত আহার বন্ধ হয় দেখিয়া,—বাধ্য হইয়া রামসদয় একটী পরিচারিকা রাখিয়া ছিলেন। এই পরিচারিকাটিও তিনি স্ব ইচ্ছায় রাখেন নাই,—বাধ্য হইয়াই রাখিয়া ছিলেন। তিনি প্রথম ভাবিয়া ছিলেন নিজেই রন্ধন করিয়া যাহ'ক্ করিয়া চালাইয়া লইবেন,—কিন্তু দুইদিন চেষ্টা করিয়া, কাজটা যত সোজা ভাবিয়াছিলেন ততটা সোজা নয় দেখিয়া, বাধ্য হইয়া এই ঝিটীকে রাখিয়া ছিলেন। এই ঝিটীই তাঁহার বাটীর রন্ধন হইতে সকল কাজ একাই করিত; কিন্তু তথাপি রামসদয় তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু পাছে সে চলিয়া যায়, সেই আশঙ্কায় তাহাকে কোন কথা বলিতেও সাহস করিতেন না। দুইবেলা দুইমুটা ভাত খাইয়া একা সংসারের সমস্ত কাজ করিত, কাজেই ঝিটী ভাত কিছু অধিক পরিমাণে খাইত। দৈবক্রমে যদি কোনদিন ঝির একরাশ বাড়াভাতের থালাটা রামসদয়ের চক্ষে পড়িত, সেদিন আর তাঁহার প্রাণে মোটেই শান্তি থাকিত না,—তাঁহার মনে হইত, বুকটা যেন ফাটিয়া গেল। বুক ফাটিলেও রামসদয় মুখে কোন কথা বলিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু মনে মনে বলিতেন "হে ভগবান,—এ বেটীর খাওয়াটা কিছু কমিয়ে দাও।"

এই ভাবে অর্থের ভিতর বসিয়া,—টাকার গন্ধে, টাকা নাড়াচাড়া করিয়া বেশ সুস্থ সহজভাবেই রামসদয়ের দিনগুলি কাটিয়া আসিতেছিল। আজ কমপক্ষে প্রায় পনের বৎসর গোকুল,—তাঁহার একমাত্র পুত্র,তাহার দাদামহাশয়ের নিকট বাস করিতেছে,—কিছু ব্যয় হইবার ভয়ে রামসদয় এযাবৎ তাহার খোজটুকুও লন নাই। পৃথিবীতে, অর্থই ছিল তাঁহার পিতা, মাতা,ভগ্নি, পুত্র কন্যা,—তিনি তাহারই সেবায়, তাহারই যত্নে,—তাহারই লালন-পালনে দিনরাত নিযুক্ত ছিলেন।

দাদামহাশয়ের আদরে,—দিদিমার স্নেহের মাখনতোষ দিয়া এক অদ্ভুত খেয়াল লইয়া গোকুল পৃথিবীর বুকের উপর জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহার বহুপূর্ব্বেই গোকুল লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া বাটীতে বসিয়া কেবলই ইংরাজি ও বাঙ্গালা নবেল নাটক ইতিহাস পাঠ করিতেছিল,—আজ দুই বৎসরের ভিতর সে বোধ হয় তিন চারি হাজার পুস্তক পাঠ করিয়া শেষ করিয়াছে। তাহার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কেমন মনে মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল,—যে আমাদের দেশের নারী বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। এ বিষয় সে যখন তখন যাহার তাহার নিকট বলিতেও ছাড়িত না। সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই সে এ বিষয়ে রীতিমত তর্ক জুড়িয়া দিত। এমন কি সে তাহার অদ্ভুত যুক্তি দিয়া এক অদ্ভুত পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিল,—তাহার নাম দিয়াছিল,—"বিলাতী শিক্ষায় দেশীয় নারী।" এই পুস্তক কতদিনে শেষ হইবে ও কত বড় হইবে তাহার কোন স্থিরতা ছিল না,—কেবলই লেখা চলিতেছিল।

সন্ধ্যার সময় গোকুল সান্ধ্য-ভ্রমণের জন্য বাহির হইতেছিল,—দাদামহাশয়ের মৃদু স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। দৌহিত্রকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া বৃদ্ধ নীলরতন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভায়া, বেড়াতে বেরুচ্চ নাকি ? কোন দিকে যাবে ?"

বৃদ্ধের কথার উত্তরে গোকুল উত্তর দিল, "কোন্ দিকে যে যাব দাদামশাই, তার কোন স্থিরতা নেই। সমস্ত দিন বাড়ী বসে আছি,—একটু বেরুনো দরকার তাই বেরুচ্ছি,—কোথায় যাব, কোন দিকে যাব তার কোন ঠিক নেই। দাদামশাই! জীবনটা বড় একঘেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে, এতে যেন আর কোন বৈচিত্র্য পাইনি। সেই দিন, সেই রাত, সেই খাওয়া, সেই নাওয়া, সেই শোওয়া, সবই যেন সেই এক ;—কোনই বিশেষত্ব নেই।"

বৃদ্ধ নীলরতন দৌহিত্রের মুখেরদিকে চাহিয়া ছিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "জীবনে বৈচিত্র্য পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিবাহ, তোমার জীবনে যাতে শিগ্‌গিরই বৈচিত্র্য আসে আমি তারই চেষ্টায় আছি। শিগ্‌গিরই ভায়া আমি তোমার একটী বিবাহ দিয়ে দিচ্ছি। বিবাহ কল্লে তখন বুঝবে এই পৃথিবী বিশেষত্বে গড়া। যে দিকে চাইবে, তখন দেখবে শুধু বিশেষত্ব। জীবনটা আর কোনদিন এক ঘেয়ে হবে না। রোজই একটা একটা নতুন জিনিস দেখ্‌তে পাবে।"

গোকুল দাঁড়াইয়াছিল, সে ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার দাদামহাশয়ের সম্মুখে বসিল। নাতিকে বসিতে দেখিয়া বৃদ্ধ আবার প্রশ্ন করিলেন, "ভায়া যে বসছ? এই তো বল্লে বেরুবে?"

গোকুল সম্মুখে গবাক্ষের দিকে একবার চাহিল। বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার রাজপথে গ্যাসালোকের নীচে দিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল, সে তাহার দাদা মহাশয়ের দিকে না চাহিয়াই উত্তর দিল, "আপনি বসালেন কাজেই বস্‌তে হ'লো!"

নাতির কথায় বৃদ্ধ নীলরতনের মুখের উপর বেশ একটা বিস্মৃতির ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি অবাকভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সে কি হে? আমি আবার তোমায় কখন বস্‌তে বল্লুম। গতিক বড় ভালো বলে বোধ হচ্ছে না ভায়া। এখন অতি শিগ্‌গিরই তোমার একটী জোড়া গাঁথা দরকার হয়ে পড়েছে। সবারই কথা—যে বয়সের যা। ভগবানের এমনি নিয়ম, যখনকার যেটা তখনকার সেটা না হ'লেই মানুষের এমনি সমস্ত কল কব্জা উল্‌টে যায়। এতদিন তোমার বিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল। তবে কি জান ভায়া, তোমার মা নেই,—বাপও তো কোন খবরই নেয় না। তাই ভেবে ছিলুম তাড়াহুড়ো করে তোমার বিয়েটা আর দেব না। একটু বয়স হ'লে যখন তুমি কার্য্যক্ষম হবে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পার্ব্বে, তখনই তোমার বিয়ে দেব। কাজেই এতদিন চুপ করে ছিলুম। এখন তুমি যা লেখা পড়া শিখেছ তাতে অনায়াসেই তোমার স্ত্রীকে প্রতিপালন কর্ত্তে পার্ব্বে। এখন তোমার বিয়ে হওয়া অতি শিগ্‌গিরই প্রয়োজন, আমিও তার বিশেষ চেষ্টায় আছি।'

বৃদ্ধ অতি ধীরে ধীরে একটীর পর একটী করিয়া একরাশ কথা বলিয়া ফেলিলেন। গোকুল নীরবে তাহার দাদা মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া অবাক-ভাবে বৃদ্ধের কথাগুলা শুনিতেছিল। বৃদ্ধ নীরব হইবামাত্র সে বলিল, "দাদা

মশাই, তুমিতো বেশ গুছিয়ে গুছিয়ে এক রাশ কথা এক নিশ্বাসে বলে ফেল্‌লে, কিন্তু কি যে বল্‌লে, তার ত আমি এক বর্ণও বুঝতে পারলুম না। বিয়ে কর্ব্বেই বা কে, আর তুমি বিয়ে দেবেই বা কার? দাদামশাই আমাকে মাপ কর্ত্তে হবে। আমি কার্ত্তিকের মত চিরকাল আইবুড়ো থাকবো; বিয়ে কর্ত্তে আমি একেবারে নারাজ।"

বৃদ্ধের চোখের তারা দুইটী বাহির হইবার মত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার নাতির মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাকভাবে চাহিয়া বলিলেন, "সে কি হে? বিয়ে কর্ব্বে না কিহে। বিয়ে না কল্লে কি মানুষের হাতের জল শুদ্ধ হয়! বাঙ্গালীর ছেলে, বিয়ে কর্ব্বে না কি হে? এখন তোমাদের রক্তের তেজ আছে, তোমরা অনেক কথাই বলতে পারো। বিয়ে না করলে কি মানুষ এক মিনিট তিষ্ঠুতে পারে? রেঁধে বেড়ে দেওয়াই বল, ঘর সংসারের কাজই বল, আর সেবা-শুশ্রূষাই বল, মেয়ে মানুষের হাত না পড়লে তা কিছুতেই সুসম্পন্ন হতে পারে না। তোমার দিদিমা আছেন বলেই আমি আছি, নইলে কি আমি এতদিন তিষ্ঠুতে পারতুম; এই বুড়ো বয়সে আপনার মতো করে কে দেখবে বল? বিয়ে না কল্লে কি চলে,—বাঙ্গালীর ছেলের বিয়ে কর্ব্বো না এ কথা বলা একেবারেই সাজে না।"

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "খুব বলা চলে দাদামশাই, এখন প্রত্যেক বাঙ্গালীর ছেলের বলা উচিত—বিয়ে কর্ব্বো না। দাদামশাই, সেদিন চলে গেছে,—দিদিমার মত মেয়ে আজকালকার দিনে আর পাওয়া যায় না। ঘরকন্না রান্নাবান্নার কাজ আজকালকার মেয়েদের দ্বারা একেবারেই চল্‌তে পারে না! আধুনিক শিক্ষিত হয়ে তারা আর মোটে ঘরে থাক্‌তেই চায় না, তা আবার ঘর-কন্নার কাজ! তারা বিলাতি শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়ে এখন পুরুষের সঙ্গে সমান চালে চল্‌তে চায়। তাদের বিয়ে করে ঘরে আনলে কি আর রক্ষে আছে! আরাম পাবার তো কোন আশাই নেই, বরং উঠতে বস্‌তে কাণ-মলা খাবারই বেশী সম্ভাবনা।"

নাতির কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বৃদ্ধ নীলরতন বলিলেন; "আরে ছ্যা ভায়া, তাও কি কখন হয়! শিক্ষা জিনিষটা চিরকালই—শিক্ষা। তার কি আর আধুনিক পৌরাণিক আছে। শিক্ষা মানেই জ্ঞানের বিকাশ,—যার জ্ঞানের বিকাশ হয়, সে কি কখন এমন হতে পারে। বরং আজকালকার মেয়ে বিয়ে করে বেশী আরাম পাওয়া যায়। কারণ সে স্বামী

কি বোঝে, স্বামীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি জানে, কাজেই তার দায়িত্ব জ্ঞান ও আগেকার মেয়ের চেয়ে ঢের বেশী বোধ হয়। ভায়া, বিয়ে না কল্লে কি বাঙ্গালীর চলে।”

গোকুল তাহার দাদামহাশয়ের কথায় হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, দাদামশাই এ বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করা চলে না। কিন্তু যখন তুমি কথাই তুল্লে তখন কাজেই আমার বল্‌তে হলো, তুমি যা বলছ, তা আগাগোড়াই ভুল। বাঙ্গালীর ছেলে বিয়ে না কল্লে চলে না, এ কথা তুমি একেবারেই বলো না; বিয়ে না কল্লে চলে না এও কি একটা কথা! বাঙ্গালীর ছেলে বলে সে তো আর জড় পদার্থ নয়, যে যাকে সে বিয়ে করে আনবে তাকে একটা কথাও বল্‌তে পারবে না। বাঙ্গালীর মেয়ে আবার যখন বাঙ্গালির মেয়ে হবে, যখন এই বিলাতি ভাব যেয়ে পূর্ব্বের মত সংসারের কাজে সন্তুষ্ট হবে, তখনই আবার তাদের বাঙ্গালীর ছেলের বিয়ে করা উচিত। আর তা যতদিন না হবে, ততদিন প্রত্যেক বাঙ্গালীর ছেলের প্রতিজ্ঞা করা উচিত, আমরা বিয়ে করবো না। ভিতরের জিনিষ যদি বাহিরে আস্‌তে চায়,—তাহলে কি আর রক্ষে থাকে। আমাদের মেয়েদের অধঃপতনের জন্যই আমাদের এই দুর্দ্দশা। দশমাসেই পেটের নাড়িভুঁড়ি-গুলো যদি জোরে বাহির হইয়া আসে —তা হ'লে সেটা দেহের পক্ষে দেখ্‌তেও যেমন কুৎসিত হয়, তেমনি মারাত্মকও বটে। আজকালকার মেয়েকে বিয়ে করাও যা, আর ফাঁসীকাটে ঝোলাও তাই। তাদের উপরের বাহার আছে ষোল আনা, কিন্তু ভেতরে সে রকম ক্ষমতা নেই। যাকে বিয়ে করে নৌকার হাল ধর্ত্তে হবে, সে যদি গাড়ী হাকানো শেখে তাহ'লে তার ফল হয় কি জান দাদামশাই! সে যে নৌকায় ওঠে, সেখানেও তার ঘোড়া হাকাবার কয়েদা কারণ গুলো দেখাতে চায়। কাজেই তার দ্বারা হাল ধরা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়. মাঝখান থেকে নৌকাখানি টুপ করে ডুবে যায়।”

নীলরতন ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন, “তা হবে ভাই,—তোমরা আজকালকার ছেলে অনেক লেখাপড়া শিখেছ,—অনেক বই টই পড়েছ, আমাদের চেয়ে তোমরা ঢের বেশী জান। তোমাদের সঙ্গে তর্কে এটে ওঠা আমাদের সাধ্য নয়। আমরা শুধু এইটুকু বুঝি যে, বাঙ্গালীর ছেলের বিয়ে করাই উচিত। তবে এই যে সুদর্শনবাবু,—একটা মস্ত জ্ঞানি পুরুষ,—সাক্ষাৎ দেবতার মত লোক। তিনি যে অত ব্যয় করে তার মেয়েকে লেখাপড়া

শেখাচ্ছেন কেন? নিশ্চয়ই কিছু ভালো বুঝেছেন—তবেই না। লেখাপড়া আমার মতে সকলেরই শেখা উচিত,—ওতে মেয়ে পুরুষ নেই।"

গোকুল বেশ একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল,—"নিশ্চয়ই আছে,—যার যা কাজ, তার তাই শেখা উচিত। মেয়েদের রান্নাবান্না শেখা উচিত, তারা তাই শিখবে। মেয়ে মানুষ লেখাপড়া শিখলেই তার কোমলত্ব চলে যায়।"

বৃদ্ধ নীলরতন বলিলেন, "হবে। কিন্তু ভাই সুদর্শনবাবুর মেয়ের সুখ্যাতি তো সকলের মুখে শুনতে পাই। সুদর্শনবাবু মেয়েকে উপযুক্ত শিক্ষিতা করবার জন্যে বালিগঞ্জে এক বাগানবাড়ী কিনে সেইখানে তাঁর মেয়েকে রেখেছেন। সেখানে সে রীতিমত লেখা পড়া শিখছে।"

গোকুল গম্ভীর স্বরে বলিল, আমি তোমায় জোর করে বলতে পারি "এর জন্যে সুদর্শনবাবুকে একদিন অনুতাপ কত্তে হবে।"

নীলরতন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা হ'তে পারে,—কিন্তু এখন তো তার মেয়ের খুবই সুখ্যাতি। দেখ ভায়া, কথায় কথায় ত আমার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দাও। যাও দেখি একদিন সেই মেয়েটার কাছে, দেখি তাকে কেমন হারিয়ে দিয়ে আসতে পারো। সে তো একটা বাচ্ছা ছুড়ি, তাকে যদি তর্কে হারিয়ে লেখা পড়া বন্ধ করিয়ে দিতে পারো, তবেই বুঝবো তোমার মুরোদ আছে।"

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "নিশ্চয়ই,—আমি কালই তার সঙ্গে দেখা কর্ব্বো। লেখা পড়া শিখে সে যে দেশের মেয়েদের সর্ব্বনাশ করছে তা আমি স্পষ্টই বলে আসবো।"

গোকুল আর দাঁড়াইল না, সে ধীরে ধীরে বৈঠকখানা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালীর মেয়ে লেখা পড়া শিখিয়া বিদুষী হইতেছে, এ জিনিষটা গোকুলের চক্ষে কেমন বিষদৃশ ঠেকিত। সে এ জিনিষটা কিছুতেই পছন্দ করিতে পারিত না। তাহার মনে হইত, এটা একেবারেই অস্বাভাবিক। যাহাদের কার্য্য ভিতরে, তাহারা ভিতরের জিনিষ না শিখিয়া বাহিরের জিনিষ শিখিতে যায় কেন? সংসারে সহস্র কাজ পড়িয়া আছে, তাহাই এক জীবনে শিক্ষা করা সম্ভব নয়! তাহার বিন্দু বিসর্গ না শিখিয়া তাহারা লেখা পড়া শিখিতে যায় কেন? যাহাকে সংসার লইয়া থাকিতে হইবে, সে যদি সংসারের কাজ

বিন্দুমাত্র না শিখিয়া কেবল এক রাশ পুস্তক পাঠ করিয়া বিদুষী হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে কি কোন দিন সুফল ফলিতে পারে—না ফলা সম্ভব! গোকুল দাদা মহাশয়ের মুখে সুদর্শন বাবুর কন্যার কথা শুনিয়া পর্য্যন্ত তাহার মনটা যেন কেমন বেয়াড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হিন্দুর মেয়ে বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেছে এ সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। হিন্দুর কন্যা সে শুধু হিন্দুর কন্যাই থাকিবে, সে শুধু তাহাই দেখিতে চায়, তাহার একটু উনিশ বিশ দেখিলেই তাহার সমস্ত প্রাণটা ঘৃণায় ভরিয়া উঠে। দাদা মহাশয়ের মুখ হইতে সুদর্শন বাবুর কন্যার কথা শুনিবার পর হইতেই তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য তাহার সমস্ত প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিতেছিল। কেমন করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে, তাহারই সুযোগ খুঁজিতেছিল,—ভগবান সে সুযোগ তাহার মিলাইয়া দিলেন।

মধ্যাহ্নের রৌদ্র যখন কলিকাতা সহরের উপর বেশ জমাট হইয়া উঠিয়াছিল,—অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ সমস্ত দিন পাকশালায় হাড়ি ঠেলিয়া যখন একটু আলস্য ভাঙ্গিবার জন্য শয়নগৃহের মেঝের উপর একটু গড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, গোকুল তখন তাহার দাদামহাশয়ের প্রদত্ত ঘরটির ভিতর টেবিলের সম্মুখে একখানি চেয়ারে বসিয়া তাহার সেই "বিলাতী শিক্ষায় নারী জাতি" পুস্তকখানা একমনে লিখিতেছিল,—সেই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "কর্ত্তাবাবু বাহিরে একবার ডাকৃছেন।"

গোকুল একমনে কেতাব লিখিতেছিল,—ভৃত্যের স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় সে মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল, ভৃত্য পুনরায় বলিল,—"কর্ত্তাবাবু আপনাকে একবার বাহিরে ডাকৃছেন।"

গোকুল ঘাড়টা বার দুই দুলাইয়া বলিল, "হুঁ, আচ্ছা যা বলগে, আমি যাচ্ছি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল,—গোকুল টেবিলের দেরাজটা টানিয়া কাগজপত্রগুলো তাহার ভিতর তুলিয়া রাখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। লেখার অর্দ্ধ পথে বিঘ্ন হওয়ায় সে দাদামহাশয়ের এই অসময় ডাকে একেবারেই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। সে যেন একটু বিরক্তভাবেই বাহিরে বৈঠকখানা গৃহে যাইয়া প্রবেশ করিল। বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিয়াই সে দেখিল,—বাহিরে বৈঠকখানা গৃহে তাহার দাদা মহাশয়ের সম্মুখে অপর একজন তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক বসিয়া আছেন। গোকুলকে গৃহের ভিতর প্রবেশ

করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ নীলরতন মৃদু হাসির সহিত বলিলেন, "এস ভায়া, এস বস। এই বাবুটীর সঙ্গে তোমার আলাপ নেই. ইনি অতি সদাশয় লোক। এর কাঠের ব্যবসা আছে ; তুমি এত দিন যা খুঁজছিলে তাব বার আনা সুযোগ মিলেছে

গোকুল দাদামহাশয়ের এই কথার অর্থ বিশেষ ভাল বুঝিতে পারিল না। ধীরে ধীরে যাইয়া দাদা মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া সেই ভদ্র লোকটীর দিকে চাহিল। লোকটী শ্যামবর্ণ, বেটে সেটে ঝাঝারি ধরণের চেহারা। গোঁপ দাড়ী কামান। বয়স তেমন অধিক নয়, আন্দাজ তিরিশ পঁইতিরিশের ভিতর। বেশ ভূষারও তেমন বিশেষ পারিপাট্য নাই। সচারাচার বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিকের আফিসের পোষাক যেরূপ হয়, কতকটা সেইরূপ; বোতাম আটা সাদা জিনের কোট, চলনসই কাপড়, ফিতে বাঁধা বার্ণিস জুতা। নাতিকে সেই ভদ্র লোকটির দিকে চাহিতে দেখিয়া নীলরতন বাবু ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিলেন, "ভায়া, ওর মুখের দিকে চাহিয়া আছ কি, ওর সঙ্গে আলাপ কর,—কথা কয়ে সুখ পাবে। ওর নাম গৌরচরণ বাবু, উনি মস্ত বংশের ছেলে। ওর মামা সুদর্শন বাবুর মেয়েকে হাতের লেখা শেখাতেন। গৌরচরণ বাবু ওর মামার সঙ্গে অনেক দিন সেখানে গেছেন। উনি ইচ্ছা কল্লে অক্লেশেই তোমাকে সেখানে একদিন নিয়ে যেতে পারেন। তোমার যখন তার সঙ্গে দেখা করবার এত ইচ্ছে, তখন একদিন অনায়াসেই ওর সঙ্গে সেখানে যেতে পারো।"

দাদা মহাশয় নীরব হইবা মাত্র, গোকুল সেই ভদ্র লোকটীর দিকে ফিরিয়া একটী ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া বলিল, "আমার সত্যিই আজ সৌভাগ্য যে আপনার সঙ্গে দেখা হ'লো। দাদামশাই যা বল্লেন—সত্যিই আমার সেই মেয়েটীকে দেখবার ভারি ইচ্ছে হয়। আমাদের দেশের মেয়েরা আজ কাল আর ঘর-কন্নার কিছুই শিখ্‌তে চায় না। তারা ভাবে লেখা পড়া শিখ্‌লেই বুঝি তাদের চার হাত পা বেরুবে। কিন্তু সেটা যে একেবারে সম্পূর্ণ ভুল তা তারা একবারও বোঝে না। আমি জোর করে বলতে পারি, এই লেখা পড়া শিখেই আমাদের দেশের মেয়েদের আজ এত অধঃপতন। বলতে লজ্জা করে,—মাথা কটা যায় যে কোন শিক্ষিত যুবকই, পাছে এই রকম একটা মেয়ে ঘাড়ে এসে পড়ে এই ভয়ে বিয়ে পর্য্যন্ত কর্ত্তে সম্মত হয় না। এর চেয়ে আর আমাদের দেশের মেয়েদের অধঃপতন কি বেশী হতে পারে ? যার যা কাজ সে

যদি তা না করে অন্য কাজ কত্তে চায়, তা'হ'লে কি কখন কোন দিন মঙ্গল হতে পারে? কোনও দিন না,—কোনও ইতিহাস তা সাক্ষ্য দেয় না। আমি চাই আমার দেশের মেয়ে, আমার দেশের মেয়ের মতনই হয়। স্বাভাবিক নিয়মে বেড়ে উঠুক, স্বভাবের সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে পড়ুক।" নারীর কোমলতা যদি পুরুষের কঠোরতায় আবৃত হয় তা'হ'লে সে এমন বিকট হয়ে দাঁড়ায় যে তা মানুষ যে সে কিছুতেই চোখ চেয়ে দেখতে পারে না। আপনা হ'তেই একটা বিশ্রী ঘৃণায় তার চোখের পাতা দুটো বুজে আসে।"

স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখিতেছে, এ কথা গোকুল কোন দিনই সহ্য করিতে পারিত না। এ কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিলেই তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন একটা বৈদ্যুতিক তেজে ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিত। সে একেবারে এক নিশ্বাসে এই এক রাশ কথা বলিয়া যেন একটু দম লইবার জন্য থামিল। গৌরচরণ গোকুলের মুখের দিকে চাহিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহার কথাগুলা শুনিতেছিলেন। গোকুল নীরব হইবা মাত্র তিনি যেন বিদ্রূপ মাখান একটু মৃদু হাসিলেন; বিশেষ কোন কথা কহিলেন না। নীলরতন বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "গৌরচরণ বাবু আমার নাতিটীর কথা বার্ত্তা সব শুনলেন তো? বললে যা, তা নেহাত মন্দ নয়, শুনতে বেশ লাগে। আমাদের দেশের মেয়েদের যে একটু অধঃপতন হয়েছে তাতে কার কোন সন্দেহ নেই। আগেকার মতন আজ-কালকার মেয়েরা তেমন আর খাটতে খুটতে পারে না। যেন কেমন বাবু বাবু হয়ে পড়েছে। আমার যেন মনে হয়, উপরের বেশ ভূষার বহরটাই তাদের বেশী বেড়ে উঠেছে। তবে এটা লেখা পড়া শেখার দরুণ হয়েছে কি না সেটা ঠিক বলতে পারিনি। আর কেমন করেই বা বলি বলুন, লেখা পড়া শিখলে তো জানি মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। জ্ঞান বৃদ্ধি হ'লে কি মানুষের কখনও অধঃপতন হয়। তা কখনও হ'তেই পারে না। আমার মনে হয় এটা আজকালকার হাওয়ার দোষ! এটা ঠিক মানুষের দোষ বলে আমার মনে হয় না। আপনি কি বলেন গৌর বাবু?

গৌরচরণকে উত্তর দিতে হইল না, তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গোকুল সতেজে বলিয়া উঠিল, "হাওয়ার যে দোষ তাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ করবার কিছু নেই দাদামশাই। কিন্তু এ হাওয়া এলো কোথা থেকে? এ হাওয়া যে আমাদের আমদানী করা হাওয়া। এ হাওয়া জাহাজে চড়ে সমুদ্র পার হয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছে। আমরা সকলে মিলে

চাঁদা করে মাস্থল দিয়ে সে হাওয়া খালাস করেছি। এখন হাওয়ার দোষ দিলে চলবে কেন? আগেকার মেয়েরা ভোরে উঠে সাজি হাতে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ফুল তুলে, অতি শৈশবকাল থেকেই কত ব্রত কর্ত্তো, সমস্ত দিন মায়ের পাশে পাশে থেকে সংসারের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম শিখ্‌তো,—মায়ের দেখে তাদেরও প্রাণে সেই রকম স্নেহ মমতার প্রস্রবণ ছুটতো। কিন্তু আজ কাল-কার মেয়েদের সে সব শেখ্‌বার ফুরশুধ নাই। তাদের সকালে উঠেই স্কুলের পড়া মুখস্ত কর্ত্তে হবে। দশটা বাজতে না বাজতে নেয়ে খেয়ে স্কুলে ছুট্‌তে হবে। কাজেই আগেকার মেয়েদের সঙ্গে এখনকার মেয়েদের আকাশ পাতাল প্রভেদ। এখনকার মেয়েরা যেন রেলের গাড়ী, আগেকার মেয়েরা যেন গরুর গাড়ী। দেখ্‌তে কুৎসিত বটে, গতিও মন্দ বটে, কিন্তু সব জায়গা দিয়েই যেতে পারে! আর রেলের গাড়ী দেখ্‌তে খুবই চটকদার বটে, গতিও খুব দ্রুত, কিন্তু তা হ'লে কি হবে, বাঁধা পথ না হ'লে চল্‌তে পারে না।

গৌরচরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বেশ—খাসা—বলে যান!"

গৌরচরণের এই উত্তরে বেশ যে একটু বিদ্রুপ মিশ্রিত ছিল, গোকুলের তাহা মর্ম্মে শেল বিদ্ধ করিল। সে একবার গৌরচরণের মুখের দিকে একটা তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া,—একটু উচ্চ গলায় বলিয়া উঠিল,—"বেশ খাসা" নয়। যার প্রাণ এক মুহূর্ত্তের জন্যও সমাজের জন্য কাঁদে, তার মুখ দিয়ে আর অমন মোটা ভাবে "বেশ খাসা" বেরোয় না! ওই দুটো কথা বেরুতেই তার গলার স্বর আপনাহতে বন্ধ হয়ে আসে! আপনি কাঠের ব্যবসা করেন,—তাতে কিসে লাভ লোকসান হয় আপনি সেইটুকুই ভালো বোঝেন, সমাজের কিসে ক্ষতি বৃদ্ধি হয়, সেটুকু বোঝবার আপনার অবসরও নেই, বোঝবার চেষ্টাও কোন দিন করেন না।"

গৌরচরণ গম্ভীরস্বরে বলিল, "কাজেই! কিন্তু আপনি যা বললেন সেটা শুনতে বড়ই ভালো লাগল, কিন্তু সেটা আগা গোড়াই ভুল; ইহা আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, তাই হচ্ছে সব চেয়ে আশ্চর্য্য। লেখাপড়া শেখা মেয়েদের পক্ষে অন্যায়. এটা বলতে আপনার মুখে বাধিবে না; কারণ আপনারা চান মেয়েরা মুখ্যু হয়ে থাক, চিরকাল আপনাদের বাড়ী দাসী চাকরাণীর মত খাটুক! ভালমন্দ বিচার করবার জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত না হ'ক; তারা কেবল বিনা দ্বিধায় আপনাদের হুকুম শুধু তামিল কর্ত্তে থাকুক। মেয়েরা লেখা পড়া শিখ্‌লে পাছে সেটা না হয়,—পাছে আপনাদের আরামের বিঘ্ন হয়, এই জন্যই তো

মেয়েদের লেখা পড়া শেখার বিরুদ্ধে আপনারা। মানুষকে মানুষ কতদিন চেপে রাখ্‌তে পারে? এক দিন না এক দিন তাদের চোখ খুলবেই। মেয়েদের ঘরের কোণে ঘোমটা এঁটে মুখ্যু করে রেখে আপনারা যে প্রাচীন ঋষিদের দোহাই দেবেন তা কি আর এখন চলে! দেশের সে দিন গেছে, —দেশের উপর দিয়ে এখন অন্য হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে, এখন আর মেয়েদের ঘোমটা এঁটে রাখা চলবে না। তা আপনারা হাজারই চেষ্টা করুন। এতে কি প্রমাণ হয় জানেন,—আপনারা নিজেরা মুখ্যু, পাছে মেয়েরা লেখা পড়া শিখে আপনাদিগকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে, আপনাদের শুধু সেই আশঙ্কা। প্রতিযোগিতা না হ'লে কি কোনও জিনিষের উন্নতি হতে পারে? ইউরোপে মেয়ে পুরুষ সমান লেখা পড়া শেখে বলেই আজ ইউরোপ এত উন্নত। আমরা ব্যবসা করে খাই, কাজেই এটা আমরা খুব ভাল বুঝি! আমাদের দোকানের পাশে যদি আর একখানা কাঠের দোকান হয়, তবেই দেখবেন আমাদের দোকানের উন্নতি হবে। তবেই আমাদের চেষ্টা হবে, কি করে ওর চেয়ে সস্তায় আমরা বিক্রি কর্ত্তে পারি, —কি করে ওর চেয়ে ভাল জিনিষ আমদানী কর্ত্তে পারি! যখন আমরা দেখ্‌বো যে আমাদের দেশের মেয়েরা লেখা পড়া শিখতে আরম্ভ করেছে, তখন আমাদের বাধ্য হয়েই লেখা পড়া শিখতে হবে— উন্নতি কর্ত্তে হবে। সার কথা হচ্ছে কি জানেন, আমাদের দেশের লোক অধিকাংশই মুখ্যু, এ অবস্থায় কোন ভরসায় মেয়েদের লেখা পড়া শেখাই! মেয়েরা লেখা পড়া শিখ্‌ছে বলেই যে তাদের অধঃপতন হচ্ছে, এ কথাটা আপনার একেবারে সম্পূর্ণ ভুল। আপনি লেখা পড়া জানেন,—বই লিখ্‌ছেন, তাই আপনাকে এত কথা বললুম—মাপ কর্ব্বেন।"

গৌরচরণের এই উক্তির প্রতিবাদ করিবার জন্য গোকুল একেবারে গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। সে একটু ফাঁক পাইবামাত্র একবার ঘাড়টা মৃদু নাড়িয়া বলিয়া উঠিল,—আমার কথাগুলি ভুল কি সত্যি তা আমি এখনি যুক্তি দিয়ে আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। বক্তৃতা যত রকমই করুন না কেন, মানুষ কানা না হ'লে তা দেখবেই। এই আধুনিক শিক্ষিত মেয়েদের দ্বারা সমাজের বা সংসারের কোন্ কাজটা হয়—বলুন তো! আমি জোর করে বলতে পারি, তাদের দ্বারা কোনও কাজই হতে পারে না। তাদের বিয়ে করে তাদের স্বামী সুখী হতে পারে না। তাদের বাচলতা দেখে তাদের আত্মীয় স্বজন সকলই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে। আগেকার সেই ঝাঁকি পরা মুখ্যু স্ত্রীলোক-

দের দিকে চেয়ে দেখুন, আর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আজ কালকার মেয়ে-দের দিকে চেয়ে দেখুন। দেখবেন একজনকার ভিতর থেকে স্বর্গের সুষমা ঝরে পড়ছে, আর একজনের ভেতরে অহঙ্কার তেজঃ নরকাগ্নি জ্বলছে। আপনি যদি একজনও এমন স্ত্রীলোক দেখাতে পারেন, যার লেখা পড়া শিখেও প্রাণে কোমলতা আছে,—তবে আপনাকে বলি,—হঁ্যা আপনার কথা যথার্থ।"

বৃদ্ধ নীলরতন ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, গৌরচরণ বাবু; আমার না টীকে আপনি একবার সুদর্শন বাবুর মেয়েটীকে দেখিয়ে আনুন। আমি সকলের মুখেই তার সুখ্যাতি শুনেছি। সে মেয়েটী নিশ্চই খুব ভাল বলেই আমার মনে হয়।"

তর্কের মুখে পড়িয়া গৌরচরণ বাবুও বেশ একটু উত্তেজিত হইয়াছিল,—সে তখনি উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই! সে রকম মেয়ে, আমি খুব জোর করে বলতে পারি, খুব অল্পই হয়। চলুন গোকুল বাবু, আমি এখনি তাকে আপনাকে দেখিয়ে আনছি। তাকে দেখলে, আপনাকে নিশ্চয়ই স্বীকার কর্ত্তে হবে, যে মেয়ে মানুষের লেখা পড়া শেখা উচিত।"

"স্বীকার কর্ত্তে হয়, নিশ্চয়ই স্বীকার কর্ব্বো। বসুন, আমি এখনি জামাটা গায়ে দিয়ে আসছি;" গোকুল উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাহারও দিকে না চাহিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল।

[ক্রমশঃ]

উদারতা।

লেখক—শ্রীমন্মথকুমার রায়।

(১)

"ধুনার গন্ধে মনসা লাফায়" কথাটার সার্থকতা প্রমাণিত হইত অক্ষয় চন্দ্রের চরিত্রে! সে বড় লোকের নামে একবারে "তেলে বেগুনে" জ্বলিয়া উঠিত! বড়লোক কথাটার উপরেই তাহার নিদারুণ ঘৃণা ছিল! যতগুলি কুৎসিৎ বিশেষণ সে জানিত, ভাষার ভাণ্ডার আলোড়ন করিয়া তাহাদের নামের পূর্ব্বে সে তাহা সংযোগ করিয়া দিত! বিশেষতঃ তাহার রাগটা ছিল তাহার বাটীর সম্মুখস্থ প্রতিবেশী চারু মিত্রের উপর! কোন কারণে তাহাকে ধনী চারু

মিত্রের নাম করিতে হইলে সে অতি মহাপাতক মনে করিত! সে দিনটা কুক্ষণে প্রভাত হইয়াছে বলিয়া ঠিক করিত। কাহার মুখ দেখিয়া শয্যাত্যাগ করিয়াছে তাহারই চিন্তায় সে বহুক্ষণ কাটাইয়া দিত। সংসারী অক্ষয় চন্দ্র আফিসে বাহির হইবার সময় হঠাৎ কোনদিন তাহার মুখ দেখিলে 'মহা-তাড়া' থাকিলেও বাটীতে পুনঃ প্রবেশ করিত। শৈল মেয়েটাকে কোলে লইত, আবার দুটো পান চিবাইত, সদ্যঃ পরিত্যক্ত হুঁকায় পুনরায় গোটাকয়েক টান দিয়া দুর্গা-নাম কীর্ত্তন করিতে তবে বাহির হইত। কোথাও কোন প্রসঙ্গে—চারু মিত্রের সুখ্যাতি শুনিলে উতপ্ত তৈলে জীবিত কই মৎস্যের মত 'চিটির পিটির' করিয়া উঠিত। যদি কোথাও তাহার নিন্দার ক্ষীণ সূত্র উঠিত, অক্ষয়চন্দ্র সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেও কল্পনা বিস্তারে আরব্য উপন্যাসের মত তাহার ফেংড়ী জুড়িয়া শেষ করিতে দিত না। সময়ে 'রং চড়িয়া' যাইলেও আলাদিনের প্রদীপের মত ঘটনা সমাবেশে রত্ন ভাণ্ডারের সত্যতা সপ্রমাণ করিয়া দিত! জ্যামিতির স্বতসিদ্ধ প্রমাণের মত সে সকলকে স্বীকার করাইয়া তবে ক্ষান্ত হইত!

সে দিন আফিসের তাড়ায় অক্ষয়চন্দ্র বেলা সাড়ে আটটা না বাজিতেই তৈল মাখিতে বসিয়াছে, এমন সময় কে সদর দরজায় কড়া নাড়িল। অক্ষয়চন্দ্র বলিল "কে কড়া নাড়ে?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল "একবার দয়া করে বাহিরে আসুন!"

"যাই" বলিয়া উত্তর দিয়া অক্ষয়চন্দ্র থেলো হুঁকাটা টানিতে টানিতে নামিয়া আসিল। দরজার অর্গলমুক্ত করিয়া দেখিল সম্মুখে চারুমিত্র!

চারুমিত্র সস্মিত মুখে নমস্কার করিল, অক্ষয়চন্দ্র নেহাৎ না করিলে নয় এইভাবে তাহার প্রতি-নমস্কার করিল! এতদ্ভিন্ন একবার বসিতে পর্য্যন্ত বলিল না। অতি বড় শত্রুকেও, বাড়ীতে আসিলে, লোকে বসিতে বলে; অক্ষয় চন্দ্র তাহা মুখাগ্রেও আনিল না!

চারুচন্দ্র করজোড়ে বলিল "আগামী কল্য আমার বড় খুকীর বিয়ে. তাই বলতে এসেছি, দয়া করে আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবেন; দাঁড়িয়ে থেকে যাতে সুশৃঙ্খলায় কাজটা সম্পন্ন হয় সে সম্বন্ধে দেখবেন, শুনবেন। আপনি আমার সহপাঠী, বাল্যবন্ধু, প্রতিবেশী, আপনাকে আর বেশী কি বলব। আপনারাই ত আমার ভরসা! বলতে গেলে কাজত আপনাদেরই!"

অক্ষয়চন্দ্র নিরস কঠোরভাবে বলিল, কি জানেন চারুবাবু, আমরা গরিব

মানুষ ; বড়লোকের বাড়ী খেতে আমাদের সাহস হয় না ! দরওয়ানের ধাক্কা সহ্য করা বড়লোকে পারে ; তারা ক্ষীর মাখন ছানা খায়, তাদের সহ্য হয়। গরিবে খেতে পায়না, দেহে অত বল নেই, কাজেই দরওয়ানের ধাক্কাও সহ্য করতে পারেনা। আপনাদের আবার লোকের অভাব ! আপনারা "ভু" করে ডাক্‌লে কত বেটা ছুটবে ! আমি গরিব লোক, বড়লোকের 'হাল্‌চাল্‌' ও জানিনে, বড়লোকের খাদ্যও আমার সহ্য হবেনা ; তা মাপ্‌ করবেন, নেমতন্নটা আমি খেতে পরিলাম না !"

লোকের একটা 'চোখের পরদা' থাকে, অক্ষয় চন্দ্রের কথার ভিতর তাহার একটু নমুনাও পাওয়া গেলনা। সে চিরাভ্যস্ত ভাবে, একনিশ্বাসে কথাগুলা প্রলের মত বলিয়া গেল !

চারুচন্দ্র অবনত মস্তকে অক্ষয় চন্দ্রের কথাগুলো শুনিতে ছিল ! আর ক্ষোভ-লজ্জা জড়িত হৃদয়ে গলদ-ঘর্ম্ম হইতেছিল ! তাহার মুখে উত্তর যোগাইতে ছিলনা ! শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অক্ষয় চন্দ্রের দশম বর্ষীয়া কন্যা শৈলজার প্রতি চাহিয়া বলিল "মা লক্ষ্মীও আমার যাবেনা !"

শৈলজা তখন অক্ষয় চন্দ্রের অনুমতিক্রমে তেলের বাটী ও গামছা লইয়া পিতার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল !

অক্ষয়চন্দ্র তিক্ত গম্ভীর স্বরে বলিল "না" !

চারুচন্দ্র নিলর্জ্জের মত বলিল "ছেলের দোষ কি ?"

অক্ষয়চন্দ্র পূর্ব্ববৎ ভাবে উচ্চৈস্বরে বলিল "না !"

চারুচন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল ! অক্ষয়চন্দ্র দ্বার রুদ্ধ করিল !

বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই অক্ষয়চন্দ্রকে তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল "কে এসে ছিল গা ?"

অক্ষয়চন্দ্র বলিল "ওই চারু মিত্তির বেটা, বেটা অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি ! জাঁক করে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, তাই নেমতন্ন করতে এসেছিলেন। আমরা যেন খেতে পাইনে, তাই ওঁর বাড়ীতে পাত পাড়তে যাব ! বেটার কি আস্পর্দ্ধা ! বলে কি, আমি না খাই শৈলকে নিয়ে যাবে ? কি বলব বাড়ীতে এসেছিল, নইলে—"

অক্ষয় চন্দ্রের পত্নী বাধা দিয়া বলিলেন "অনেক বেলা হল ! খেয়ে নাও। ভাত তৈরী !"

পত্নীর কথায় অক্ষয় চন্দ্রের আফিসের তাড়ার কথা স্মরণ হইল। মনের

আগুনটা চৌবাচ্চার জলে কতকটা নিভাইয়া উত্তপ্ত অন্ন ব্যঞ্জনে "বিষে বিষক্ষয়" করিতে বসিয়া পড়িল।

যথা সময়ে যথা নিয়মে সুচারু রূপে চারুচন্দ্রের কন্যার বিবাহ হইয়া গেল, দেখিয়া অক্ষয়চন্দ্র মোটেই শান্তি পাইল না! চারুচন্দ্রের নূতন কুটুম্বের সদ্ব্যবহারের কথায় যেন অক্ষয় চন্দ্রের সারা গাত্রে জ্বালা দিয়া বেড়াইতে লাগিল! সে মনে মনে এই উপলক্ষে অনেক গাত্র দাহের শোধ তুলিবে বলিয়া স্থির করিয়া ছিল; তাহা হইল না, কাজেই তাঁহার মর্ম্ম স্থলে রক্তপাত হইতে লাগিল। বিবাহের পরদিন নন্দু ঠাকুর যখন হরিচাটুর্য্যের বৈঠকখানায় গুরু ভোজনে উদর আধ্মানের কথা তুলিল, তখন অক্ষয়চন্দ্রের হাতের পাশাটা দশছয় ষোলর স্থলে পঞ্জুড়ী ফেলিল। আর আঘাতটা হইল ঠিক বিরাট গৃহে যুধিষ্ঠিরের কপাল কাটার মত! নিধু গয়লানী যখন বাসি লুচী-মিষ্টি বাঁধা ভারি আঁচলটা কষ্টে নামাইয়া রোজের দুধ দিতে বসিল তখন অক্ষয়চন্দ্রের পিপাসার জলটা একবারে উচ্ছে পাতার রসের মত বোধ হইল। কাজেই চারুমিত্রের সুখ সম্পদের মূলে অক্ষয়চন্দ্রের নিজের হৃদপিণ্ডটাকে ছিঁড়িয়া দধিচির অস্থি করিয়া বজ্ররূপে ফেলিতে হইল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চারুচন্দ্রের সুখ সম্পদের গাত্রে একটা দাগও বসিল না; কেবল অক্ষয়চন্দ্রের মনের ভিতর ক্ষতের আকার দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

(২)

সেদিন সন্ধ্যার দিকে ঝড়টা ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে ছিল! বৃষ্টির ঝাপট, বজ্রের নির্ঘোষ, বিদ্যুতের চমকানি যেন দেবাসুরের যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়াছিল! নিবিড় কৃষ্ণ কালো মেঘ গুলো যুদ্ধ পতাকার মত চার দিকে দৌড়াইয়া বেড়াইতেছিল! রাস্তার ধারের বড় বড় গাছগুলো মত্ত দানবের মত তাণ্ডব নৃত্যে দক্ষিণে বামে লুটোপুটি করিতেছিল! আর সহরের অট্টালিকাশ্রেণী নিজ নিজ দরজা জানালাগুলি সাবধানে বন্ধ করিয়া "যদি ঘাড়ে পড়ে তখন দেখিব" এইরূপ ভাবে অপেক্ষা করিতেছিল!

তখন কলিকাতার সিমলা নিবাসী অক্ষয়চন্দ্র বসুর বাটীর একটী দীপালোকিত কক্ষে খাটের সম্মুখস্থ নীচের বিছানায় বসিয়া স্বামী স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। আর খাটের উপর ঘুমাইতেছিল কন্যা শৈলজা! কথা তাহাকে লইয়া! সে কৈশর ছাড়াইয়াছে। তাহার বিবাহ বয়স প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। আর কোন ক্রমে রাখা চলে না। যতশীঘ্র হয় বিবাহ দিতেই হইবে

স্বামী স্ত্রীতে তাহারই কথাবার্ত্তা হইতেছিল! কিন্তু কি বিষম সমস্যা! কি দারুণ চিন্তা! এরূপ রূপলাবণ্য সম্পন্ন সর্ব্বগুণময়ী কন্যাকে অর্থাভাবে যাকে তাকে ধরিয়া দিতে হইবে! কি পরিতাপ! কিন্তু উপায় কি? বাস্তুভিটাটী পর্য্যন্ত নাই বলিলেই হয়। "আর দুই দিন দেখি, আর দুই দিন দেখি" করিয়া প্রায় তিন বৎসর কাটিয়াছে। কিন্তু হিংস্র নীচ সমাজ, আর ত শুনিবে না। কাজেই একটা পাত্র স্থির করিয়া অক্ষয় সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাটী ফিরিয়াছে। তাহারই তালিকা গৃহিনীকে দিতেছিল।

ছেলেটী 'পাঁচ পাঁচী'—মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে সদাগরী আফিসে চাকুরী করে! বাড়ীঘর নাই! দেশ বলে একটা 'চুলোও' নাই। বাপ আছে, তিন ভাই—এটী মধ্যম! ছেলের বাপ টাকা পঞ্চাশেক উপায় করে। তবে দিতে হবে দুই হাজার টাকা আন্দাজ! হাজার টাকার গহনা, পাঁচশ টাকা নগদ! আর ছেলেকে ঘড়ি চেন আংটি জোড় ইত্যাদি! কিন্তু জুটিবে কোথা হইতে, অক্ষয়চন্দ্র তাহাই ভাবিতেছিল। তাহার স্ত্রী 'যা করেন মধুসূদন' বলিয়া উঠিয়া পড়িল। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের হাত পা উঠিতে ছিল না। তাহার স্ত্রী তাহাকে হাতে মুখে জল দিয়া ঠাণ্ডা হইতে বলিতে ছিল! তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে বাড়বাগ্নি জ্বলিতেছিল তাহা আর সামান্য জলে কি নির্ব্বাণে! যতবার বজ্র নির্ঘোষ হইতেছিল অক্ষয়চন্দ্র ভাবিতেছিল, যদি ভগবান দয়া করিয়া একটা তাহার ছাদের উপর ফেলিয়া দেন; তবে সব জ্বালা জুড়ায়! কিন্তু কি নিষ্ঠুর ভগবান; সব ফাঁকা আওয়াজ! একটাও যে তার জন্য সৃষ্টি করেন নাই! তার ইচ্ছা হইতেছিল, পত্নী ও কন্যার হাত ধরিয়া উন্মুক্ত ছাদের উপর যাইয়া দাঁড়ায়; তাতে যদি একটা ছুটিয়া আসিয়া তাদের একসঙ্গে জগত হইতে সরাইয়া লইয়া যায়।

চিন্তার ক্ষণেক অবসাদে দীপালোকে সেই সুপ্তা বালিকাকে দেখিয়া অক্ষয় চন্দ্রের হৃদপিণ্ডটা যেন ফাটিয়া চৌচির হইয়া ছুটিয়া যাইতে চাহিল। এ যে চির নয়নানন্দময়ী পুত্তলী! যাহাকে সে পলকের জন্য চক্ষের আড় করিতে পারে না। তাহাকে সে কেমন করিয়া একটা জঘন্য কাফ্রীর হাতে তুলিয়া দিবে! দেবতার অর্ঘ কোন প্রাণে চণ্ডালের পদে স্থাপন করিবে! কেন? সমাজের ভয়ে? ওঃ! অশরীরী পদার্থের এত ক্ষমতায় সে যেন আরও উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল!

সে উন্মাদের মত গৃহ মধ্যে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তায় অক্ষয়চন্দ্র কন্যার দিকে চাহিল। ভাবিল এ যে রাজার ঘরের ধন; কি করিয়া এ পর্ণকুটীরে আসিল। এখানে জন্মান যে তার ভুল হইয়াছে! বিধাতা কেন এ ভুল করিলেন! সে স্থির সিদ্ধান্ত করিল, ধর্ম্মত্যাগে, সমাজ ত্যাগে যদি পাপ হয়—হোক যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য নরকে থাকিতে হয়;—হউক; তথাপি প্রাণ ধরিয়া সে দেবতার নৈবেদ্য, দানবকে উৎসর্গ করিতে পারিবে না! শত্রুর দল হাসিবে—হাসুক!

চিন্তায় বিভ্রান্ত চিত্তে স্নেহ বৎসল পিতৃ-হৃদয় কন্যার মস্তকে হস্ত দিল! বলিকা নিদ্রার ঘোরে কি স্বপ্ন দেখিতেছিল; স্পর্শমাত্রে উঠিয়া বসিল। দেখিল, পিতা তাহার মস্তকে হস্ত দিয়াছেন, এবং তাঁহার নয়ন দিয়া দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে! সে বিহ্বলা হইয়া গেল!

সেই সময় অপর গৃহ হইতে অক্ষয়চন্দ্রের স্ত্রী ডাকিল, "কি গো, উঠে এস, হাতে মুখে জল দাও; আমি যে খাবার বেড়েছি! আসিবার সময় শৈলকে তুলে আন!"

শৈলজা মাতার স্বরে সাহস পাইয়া বিছানা হইতে নামিল। সস্নেহে বলিল "চলনা বাবা—খাবে!"

অক্ষয়চন্দ্র মাতৃ অদিষ্ট বালকের মত "চল মা" বলিয়া কন্যার অনুবর্ত্তী হইল।

(৩)

সংসারের সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝা অক্ষয়চন্দ্রকে এখন ভবিতব্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। যৌবনের সেই চঞ্চল উদ্দাম বাসনা, কুহকিনী দুরাশার অতীত কল্পনা আজ বাস্তব রাজ্য হইতে দূরে টানিয়া আনিয়া এখন যেন নিজ ক্ষুদ্র ক্ষমতার গৃহ প্রাচীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। তাহার চেষ্টার অবসান হইয়াছে! তাহার লাবণ্য বিশীর্ণ হইয়াছে। তাহার অন্তর প্রকৃতির ভিতরের মুর্ত্তির দ্বারা চির আকাঙ্ক্ষিত আশাকে তৃপ্তিতে ডুবাইয়া দিয়া শুদ্ধ মাত্র কন্যাটীকে সুখী দেখিয়া সায়াহ্নে জীবনের শান্তিপর্ব্বে উপনীত হইতে চায়। কিন্তু তাও বুঝি হয় না!

কন্যার বিবাহের আর একটী দিন মাত্র বাকী; বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে, আত্মীয়ের উপদেশে সে সমাজ ছাড়িতে পারিল না। তাহাকে পূর্ব্বোক্ত বিবাহের সম্বন্ধে মত দিতে হইয়াছে! নিজস্ব বা স্ত্রীধন বলিতে যাহা কিছু ছিল, সকল ঘুচাইয়া উদ্যোগ আয়োজন সব শেষ হইয়াছে। কেবল বাকী

নগদ টাকাটা! সে আর কি করিবে? যাহার কখনও ছায়া স্পর্শ করিত না, তাহাকেও অক্ষয় 'মহাশয়' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে! করজোড়ে বিনীত প্রার্থনায় এই কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবার জন্য সানুনয় অনুরোধ করিয়াছে। তাহাতেও কুলায় নাই। পরিচিত অপরিচিত কাহারো নিকট যাইতে সে কুণ্ঠা বোধ করে নাই; অকপটে মুক্তকণ্ঠে নিজ নিবেদন জানাইয়া আসিয়াছে। কেবল পারে নাই যাইতে চারু মিত্রের নিকট! পারিবেও না! সেটা যেন উপলব্ধ অথচ অস্পর্শীয়, কল্পনায় আছে, বাস্তবে নাই, এই ভাবে তাহার বিষয় অক্ষয়চন্দ্র ঠিক করিয়া লইয়াছে। যেন কাহিনীর মত, স্বপনের মত, প্রত্যক্ষ বিস্ময়ের মত, ঔষধের মত, উৎক্ষিপ্ত, রাগিনীর মত! দেবতার ধ্যানের মত!

যখন তাহার মাসতুতো ভ্রাতা নরহরি আসিয়া বলিল "না দাদা, কোন মতেই পারলুম না," তখন মুহূর্তের জন্য অক্ষয়চন্দ্রের হৃদপিণ্ডের স্পন্দনটা থামিয়া গেল। হাতের ডাবাটা খসিয়া পড়িবার মত হইল, মাথাটা যেন একবার টাল খাইল। শেষে সান্ধ্য বাতাসের মত জোরে একটা নিশ্বাস পড়িয়া চটকাটা ভাঙ্গিয়া গেল! ধীরে অক্ষয় বলিল "যাক্, আর কি হবে ভাই, তুমি ব'সো।"

অক্ষয়চন্দ্রের এই দুর্দ্দিনে সাহায্য করিতেছিল তার মাসতুতো ভ্রাতা নরহরি! সে নিজে গরীব গৃহস্থ; তাহার স্ত্রীর যে ২।১ খানা গহনা ছিল, সেগুলিও সে বন্ধক দিয়া বা বিক্রয় করিয়া ভ্রাতাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত ছিল না। কিন্তু তাহার স্ত্রী, ভগ্নীর বিবাহে পিত্রালয়ে গিয়াছে। কাজেই বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলিল "দাদা কোন মতেই পারিলাম না!" সে কয়দিন আহার নিদ্রা বর্জ্জিত হইয়া ঘুরিয়াও কিছু করিতে পারিল না!

কন্যার বা নিজ অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক, ভাবিয়া অক্ষয়চন্দ্র জড়ের মত বসিয়া রহিল। তার কল্পনা-চক্ষের সম্মুখে কন্যার লাঞ্ছনার জলন্ত মূর্ত্তিগুলো সুস্পষ্ট হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তথাপি সে উপায় হীন বুঝিয়া নীরব রহিল!

অক্ষয়চন্দ্রের পত্নী, নরহরি ফিরিতেই ব্যাপারটা বুঝিল, কিন্তু তথাপি শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কি হবে ঠাকুরপো?"

নরহরি আশ্বাস দিয়া বলিল, ভয় কি—বউদি! বিয়েটাত হয়ে যাক, তারপর টাকার কথা! তখন দু'ভাইএ হ্যাণ্ডনোট লিখে দিব, তারপর মাসে মাসে শোধ করা যাবে!

বলা বাহুল্য শেষের এই কথাটুকু তাঁর ভবিষ্যৎ বৈবাহিক হাসিমুখে শুনি-

বার জন্য অক্ষয়চন্দ্রের পত্নী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোন দেবতাকে মানত করিতে বাকী রাখিলেন না। একটা দিন কতক্ষণ সময়, দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল! ইতিমধ্যে কোন সুযোগই হইল না; নগদ টাকাটার অভাব সমান ভাবেই রহিয়া গেল!

মানুষ যতই ভাবিব না বলিয়া সিদ্ধান্ত করুক, যদি চিন্তার মূলে কোন সত্য কারণ থাকে, সে শত অন্য মনস্কের চেষ্টাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সে অজ্ঞাতে চোরের ন্যায় কোন ক্ষুদ্রতম ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া সদর্পে নিজ সাম্রাজ্য বিস্তার করিবেই করিবে। বালির বাঁধের মত তাহা একটা তরঙ্গের আঘাতেই খরস্রোতের মুখে ধুইয়া চলিয়া যাইবে। অক্ষয়চন্দ্রের "ভাবিব না" দুর্গদ্বারকে বজায় রাখিয়া, কোন গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ দিয়া চিন্তা রাক্ষসী তাহার উষ্ণ রক্ত ঘন নিশ্বাসে পলকে পলকে শোষণ করিতেছিল তাহা সে অনুভবই করিয়া উঠিতে পারিল না। সে শবের মত নির্জীব হইয়া পড়িল।

আজ বিবাহের দিন। অন্য দিনের মত সূর্য্য উঠিল, আবার অস্ত গেল; উদয়টা যেন বড় তীব্র, যেন বড় পাংশুবর্ণ। প্রাবৃটের চন্দ্র যেন ঢাকা ঢাকা মুখে উদয় হইল। তারাগুলো আর লজ্জায় মুখ দেখাইতে চাহিতেছিল না। যেন নবোঢ়া কুলবধুর মত ঘোমটা টানিয়া গৃহ-কোণে নীরবে বসিয়া থাকিতে চায়! বাতাসের নিশ্বাসটা বড় তীব্র; যেন কি একটা কুৎসিৎ কথা রচনা করিয়া বেড়াইতেছে। গাছগুলাও তাহাতে মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইতেছে। পাখীর দল ছি ছি করিতেছে। অক্ষয়চন্দ্র ছোট একটা কোণের ঘরে নিঝুমভাবে ডাবা টানিতেছিল। বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিল নরহরি!

লগ্নের কিছু পূর্ব্বে জুড়ি চড়িয়া বর আসিল। শঙ্খধ্বনি হইল; হুলুধ্বনি পড়িল, মেয়ে ছেলের দল বর দেখিতে ছুটিল। নরহরি বর নামাইয়া আনিল! আত্মীয়দের দল চারিদিকে হৈ রৈ রব তুলিয়া আদর সম্ভাষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কেবল দেখা পাওয়া গেল না অক্ষয়চন্দ্রের। বর, বর-যাত্রীরা যথা স্থানে বসিলে পাত্রের পিতা বিবাহস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "বেয়াই মশায় কোথায়?" নরহরি বলিল "ঘরেই আছেন ডেকে আনি।" পাত্রের পিতা বলিল "এই যে সব ঠিকঠাক্, তবে আর অনর্থক দেরি করে লাভ? লগ্ন ত হ'য়েছে; পুরুত ডেকে বর এনে বসিয়ে দিন না।"

নরহরি সস্মিত মুখে বলিল "সেটা আপনার অনুমতি হলেই হয়।"

পাত্রের পিতা বলিলেন "এর আর অনুমতি কি? এদিকে বর পুরুত বসিয়ে দিন, আর অন্যদিকে বরযাত্রী বসিয়ে দিন। কাজটা যত সকাল সকাল চুকে যায় ততই মঙ্গল। যাক আপনি একবার বেয়াই মশায়কে ডেকে দিন! ভয় নেই, বেয়ান ঠাকরুণের আঁচল ছেড়ে একবার আসতে বলুন!

হবু বেয়াইএর কথায় নরহরি একটু যেন সাহস পাইল। সে তাড়াতাড়ি বর, পুরোহিত এবং অক্ষয়চন্দ্রকে ডাকিতে ছুটিতেছিল! এমন সময় পাত্রের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—" সব যোগাড় হয়েছে?"

নরহরি কি একটা কথা বলিতে যাইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। আওয়াজটা যেন কণ্ঠনালীতে আটকাইয়া গেল! পাত্রের পিতা দান সামগ্রীর প্রতি চাহিতে চাহিতে বলিলেন, সবত সাজান দেখছি; কিন্তু টাকাটা কই? পাঁচজনে দেখবে! আপনারাও মেয়ে জামাইকে দেবেন! আপনাদেরও সার্থক! সেটা বার করুন!

নরহরি শুষ্ক কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "সেটা এখনও যোগাড় হয় নি!"

পাত্রের পিতা চক্ষের চসমা খানা বাম হস্তের দ্বারা খুলিয়া চোখ দু'টো কপালের দিকে তুলিয়া বলিলেন "এঁ্যা! সেকি? "ওহে হরেন।"

হরেন পাত্রের জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা। সে একটু দূরে দাঁড়াইয়া অপর ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছিল। পিতৃ আহ্বানে নিকটে আসিল!

পাত্রের পিতা বলিলেন, একি শুনছি হরেন, নগদ টাকা এখনও পর্য্যন্ত যোগাড় হয়নি বলছেন! ব্যাপার কিহে?" বলা বাহুল্য হরেনের চীৎকারে অক্ষয়চন্দ্রের বাটী মুহূর্ত্ত মধ্যে মুখরিত হইয়া উঠিল। অকথ্য অশ্রাব্য ভাষার প্রবাহে বাড়ীটা এবং আগন্তুক সব ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তখন নরহরি পিতাপুত্র উভয়ের পদদ্বয় জাপটাইয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে। কাতর অনুনয় বিনয়, হ্যাণ্ডনোটের প্রস্তাব কিছুতেই কিছু হইল না! উভয় পক্ষের মধ্যেই যেন একটা ছোটখাট রকম হাঙ্গামা চলিয়াছে।

অনুনয় বিনয়, অনুরোধ উপরোধ, আবেদন নিবেদনেও বর কর্ত্তাটির মত নড়িল না। 'চাওয়া' জুড়ি বাটীর সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিল, বর লইয়া বর যাত্রীর দল চলিয়া গেল। পাড়ার ছেলের দল তাহাদের পশ্চাতে ঢিল ছুড়িল। কিন্তু কোনরূপেই বাধা দেওয়া গেল না! অক্ষয়চন্দ্রের আত্মীয় স্বজন মুহ্যমান হইল, বাটীর স্ত্রীলোকের দল চক্ষের জল ফেলিল, ছেলেদের খেলা, হৈ-চৈ থামিয়া গেল। নরহরি, শ্যাম যদু প্রভৃতি ছেলে খুঁজিতে বাহির হইল। নতুবা যে মেয়ে 'দো'পোড়া' হইবে!

হিন্দুসমাজ অতি কঠোর, অতি নির্দ্দয় ; বড়ই নীচ স্বার্থপর ; কিন্তু যখন একটা কিছু নেহাইত গায়ে আসিয়া পড়ে, তখন তাহার মূর্ত্তি অন্যরূপ। বর যখন চলিয়া গেল, তখন তাহাদের চোখ ফুটিল, আবাল বৃদ্ধ বনিতা একটা বরের জন্য পাগলা কুকুরের মত চতুর্দ্দিকে ছুটিল। হাওয়ার মত সুস্থান কুস্থান মনে না রাখিয়া, মান অপমান ত্যাগ করিয়া প্রতি গৃহস্থের গৃহ কোণ অবধি আঁতি পাতি করিয়া খুঁজিতে লাগিল। বেত্রাঘাতে ঘুমের চটকা ভাঙ্গিয়াছে ; চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াছে এতক্ষণে, বুঝিয়াছে কাজটা তাহাদের। যেখান হইতে হউক, যেমন করে হউক এখনই একটি পাত্র চাই।

পাড়ার নন্দু ঠাকুর অনেকক্ষণ দম খাইয়া ভনিতা করিয়া নরহরিকে বলিল "দেখ, এক কাজ কর, এত রাত্রে বর আর কোথা পাবে, তা বরং এক কাজ কর, উপস্থিত যা আছে তাতেই হবে। পাত্র এমন মন্দ নয়! তবে কি জান বয়েসটা—তা এমনই কি বেশী। এই আমাদের লালু বাবুকেই দাও না।"

নন্দু ঠাকুর কথাটা বহুকষ্টে শেষ করিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

আজ বড় দুর্দ্দিনে পড়িয়া নরহরি এত বড় গালাগালিটাকে জীর্ণ করিল। নতুবা আজ সে কি করিত বলা যায় না! তার ঘাড়টা বাঁকিয়া উপরে দিকে উঠিয়াছিল, চক্ষের তারা দুইটাও ঘুরিতে ঘুরিতে এ কোণ হইতে ও কোণে ঠেলিয়া উঠিয়া বক্রভাবে নন্দু ঠাকুরের মুখের দিকে ফিরিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সব শ্লথ হইয়া পড়িল।

যখন যদু শ্যাম যতীন নিরু, নন্তী হতাশভাবে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, যে হঠাৎ কোন পাত্রই মিলিল না, তখন নরহরি একবারে বসিয়া পড়িল। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে পৃথিবীটা একবারে ঘোলা হইয়া গেল। পায়ের তলার মাটীটা যেন সরিয়া গেল! কিন্তু উপায় কি? নরহরি ভাবিল দাদার ভারটী যখন স্বেচ্ছায় লইয়াছি পাপটিও গ্রহণ করি। এ বিবাহ-বলিদানে আমি যুপকাষ্ঠ। ঘাতক শ্রীলাল মোহন ঘোষ, পঞ্চাশৎ বর্ষীয় স্থবির ঘাতক, চারুমিত্রের মোসাহেবিতে হাত অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়েছে! তা হোক, শৈলজা মায়ের কুসুম-পেলব কোমল গ্রীবা কাটিবে না! নিশ্চয় দ্বিখণ্ড হইবে! খড়্গা পড়িতে যে বিলম্ব! নর হরির চক্ষু ছাপাইয়া জল ঝরিল।

ক্রমে বিলম্ব হইতেছে ভাবিয়া নরহরি নন্দু ঠাকুরকে পাত্র আনিতে পাঠাইল। আবার মনে মনে আঘাতের তীক্ষ্ণতার পরিমাপ করিতে লাগিল। যখন বৃদ্ধ লালমোহন পাত্রস্থ হইবে ভাবিয়া আসনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল,

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অনিমন্ত্রিত চারুমিত্র নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া হঠাৎ তথায় প্রবেশ করিলেন। ডাকিলেন "অক্ষয় বাবু।" নরহরি ডাকিল "দাদা।"

অক্ষয়চন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বাহির হইয়া আসিল। চারুচন্দ্র নিজ পুত্রের হস্ত অক্ষয়চন্দ্রের হস্তে দিয়া বলিলেন "এই যে পাত্র! এত নিকটে থাকতে কেন দূরে খুঁজছিলে ভাই!"

সকলে চারু মিত্রের মুখের দিকে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল।

বাহিরে তখন রাত্রীর গভীরতা ভেদ করিয়া সানাইএ মালকোষের তান উঠিল।

একাল সেকাল

(লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪৬)

ঠিক পরের বাড়ীর মানুষটির মত নির্ম্মল পিতৃশ্রাদ্ধ কোন রকমে সম্পাদন করিয়া লইল। আহারে শয়নে যখন যে ব্যবস্থা তাহার জন্য হইত, সে তাহাই শিষ্ট বালকটির মত সন্তুষ্টির সহিত গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে রমা ও শশাঙ্ক আসিয়া যাহা যাহা করিতে হইবে, সমস্তই করিয়াছে, কচিৎ কখনও তাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেও সে তাহাদের উপর ভার চাপাইয়া আপনাকে হাল্কা রাখিয়াছে, কখনও বা জিজ্ঞাসার অবকাশ না দিয়া সরিয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, প্রবৃত্তিতে হউক অপ্রবৃত্তিতে হউক, শ্রাদ্ধের মন্ত্রগুলি তাহাকে আওড়াইতে হইয়াছিল, তাহা ছাড়া তাহার কোন কাজ ছিল, তাহা সেও যেমন জানিতে পারে নাই, শশাঙ্ক বা রমাও প্রাণপণে করিয়াও তাহাকে তেমনই জানিতে না দিবার চেষ্টাই করিয়াছে।

কিন্তু শ্রাদ্ধের দিন তিনেক পরে সে কিছুমাত্র সুস্থ না হইতে হইতেই রমা আসিয়া ধরিয়া বসিল, বলিল "এখন আরত পাখীর মত ঘুরে বেড়ালে চলবে না, এখন থেকে যা আছে না আছে, বুঝে শুঝে নিয়ে, করে-কর্ম্মে খেতে হবে ত।"

নির্ম্মল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"কদিন থেকে আমিও তাই ভাবছি, আমি এতখানি কি পার্ব্ব বৌদি?"

"যে কাজ কর্ত্তেই হবে, তার জন্যে চিন্তা করা বৃথা নির্ম্মল বাবু, না খেলে যখন প্রাণ যায়, তখন ইচ্ছেই হউক আর অনিচ্ছায় হউক, বিচার না করে অরুচির মুখে ভাতের গ্রাসের মত পুরে দিতেই হবে।

নির্ম্মল জবাব করিল না, রমা আবার বলিল "এবার পোষ মানতে হবে, চিরদিন বাইরে বাইরে বেড়িয়ে এবার এমন স্থানে এসে পৌঁছাতে হয়েছে যে, পা নাড়িবারই যো নেই, ঘর ছেড়ে বেরুতে গেলে ভাবতে হবে, এদের কে দেখবে!"

কদিনের পর রমার কথাতেই নির্ম্মলের ভাবনা বাড়িয়া চলিল, একদিন সে নানা কার্য্যের মধ্যে, সোর গোলের মধ্যে ভবিষ্যৎ ভাবনার দিক্ দিয়াও যায় নাই; আর সেটা তাহার অভ্যাসও নহে। কিন্তু সত্যই কি তাহার পায়ে দৃঢ়পাশ আবদ্ধ হইল, এ পাশে সুখের আশা যে নাই, তাহা পূর্ব্বে সে যেমন জানিত, এবারও কিন্তু তাহার কোন অন্যথা দেখিতে পায় নাই। সেই একদিন বিমলার সঙ্গে তাহার দুটা কথা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর এখানে সেখানে এভাবে সেভাবে বহুবার দেখা হইলেও কোন কথাই হয় নাই, বিমলাও পাঁচ জনের মধ্যে ঠিক পরের বাড়ীর বৌটীর মতই পাশ কাটাইয়া গিয়াছে। নির্ম্মলও কথার অভাবেই হউক বা লজ্জায়ই হউক তাহাকে কোন কথা বলে নাই। তখন আর এখানে কোন বৈপরীত্যের আশাই সে করিবে কি করিয়া! নির্ম্মলকে নীরব দেখিয়া রমার মন চিন্তিত হইয়া উঠিল। সে এবার একটু দৃঢ়স্বরে বলিল, "ছেলেমি যতদূর করবার তাতে কিছুমাত্র ত্রুটি হয়নি, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে নির্ম্মল বাবু, বুঝে দেখুন, এখন এ সংসারের জাতি-মান আপনার উপর নির্ভর করে রয়েছে। আপনি যদি—"

"যদি কেন বল্‌ছ বৌদি।" বলিয়া নির্ম্মল বাধা দিয়া আবার বলিল, "এ সব আমাকে বলে তোমাদের কি লাভ হচ্ছে, যখন আমার কোন মনুষ্যত্বই নেই।"

গৃহে প্রবেশ করিয়া শশাঙ্ক মৃদু হাসিয়া বলিল, "শিষ্টাচার চলছে না কি রে নির্ম্মল, তা মন্দ নয়, কিন্তু এত শিগগীর কেন, আমরা কিছু আজই যাচ্ছি না।"

নির্ম্মল হাসিল না, বাড়ী আসিয়া অবধি হাসি তাহার মুখে ছিলই না। গাঢ় স্বরে বলিল,—আমার কেন শিষ্টাচার হতে যাবে? বরং বলতে তুমিই

মুখে শিষ্টাচার দেখাচ্ছ, নৈলে মনুষত্ব যে আমাতে নেই তাহা মুখে না হউক মনে মনে বলতে তোমরা কোনই ত্রুটি কর না।"

"হবে হয়ত, কিন্তু আমরা পথের মানুষ, আমাদের ভাবা-ভাবিতে কিছু এসে যায় না রে ?"

"পথের বা ঘরের কারু নাম করে কিছু আমি কোন কথা বলিনি।" বলিয়া নির্ম্মল ঢোক গিলিল।

শশাঙ্ক মনে মনে কাতর হইয়াও বাহিরে বিন্দুমাত্র প্রকাশ না করিয়া বলিল, "সে কথা আমি জানিও নি, জান্তেও চাইনি; কারণ ও নিয়ে মাথা ঘামাতে এত সময় আমার নেই। আমি জানি দু'দিনে হউক, দশ দিনে হউক, তোমায় হাতে ধরে সব শিখিয়ে বুঝিয়ে—তবে আমার রেহাই। এবং সেই কথা বলতেই এসেছি যে, আজ থেকেই তোমার এদিকে মন দিতে হচ্ছে।"

নির্ম্মল একটা ছোট নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আমি যখন ওর কিছুই জানি না, তখন আমায় বোঝাতে হলেও ঢের সময় লাগবে! তার চেয়ে, বাবা বেঁচে থাকৃতেই যারা দেখে শুনে এসেছে, তাদের নিয়ে চেষ্টা কল্লে, একটু শীগ্‌গির হবার আশা আছে!"

কথাটা যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া হইল, তাহা বুঝিতে শশাঙ্কের বা রমার মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না, তাহারা উভয়ে উভয়ের প্রতি বিস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতেছিল। কি অপরাধে নির্য্যাতিতা নিপীড়িতা অবলার প্রতি এই অকারণ বিতৃষ্ণা প্রকাশ হইতেছে। নির্ম্মল যেন প্রস্তুতই ছিল, এই এত বড় বিস্ময়টাকে যে হজম করিতে ইচ্ছুক না হইয়া আবার বলিল "এতে ত বিস্মিত হবার কিছুই নেই। কারণ মাছ যত সত্বর জল চিনে নিতে পারে, এমন আর কেউ পারে না, তাহা ছাড়া যেটায় যার ন্যায্য অধিকার, তা থেকে আমি বঞ্চিত কর্ত্তে চাইনা। পুত্র পিতার বিত্তের অধিকারী হয়, একথা সেখানেই খাটে, যেখানে সত্যি সে পুত্রের মত কাজ করে। নইলে যে পুত্রের কাজ করেছে, তাকেই যে সে দাবী ছেড়ে দেওয়া উচিত। "

"অধিকারে ত পেট ভরবেনা' আর দখল করার যদি জোর না থাকে ত, তাকে ছাড়িয়া দিতেই বা কতক্ষণ। এ কিছু মেয়েমানুষের কাজ নয়! আপনি এ সব কি বলছেন নির্ম্মল বাবু। এদ্দিনেও কি আপনার ঘটে বুদ্ধি এল না।" বলিয়া রমা থামিতেই শশাঙ্ক নির্ম্মলের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিল "নে, রাখ তোর লেক্‌চার। এখুনি পূবপাড়ার মাঠ দেখ্‌তে যেতে হবে, তাই চল, বলিয়া হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

(৪৭)

দিন কাটিল, মাস কাটিল, কিন্তু এক সংসারের এই তিন তিনটি প্রাণীর মধ্যে মনের খেদ কাহারও কমিল না একটা নীরব দুঃখাভিনয়ে যেন ক্ষুদ্র সংসারটি হাবুডুবু খাইতেছিল। করুণাময়ী কাঁদিয়া কাটিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন, বিমলা অন্তর্বেদনা চাপিয়া রাখিয়া শ্বশ্রূর সেবা ও স্বামীর দুঃখ মোচনের জন্য আত্মত্যাগ করিয়াও পদে পদে বিফল কাম হইয়া আঘাতে আঘাতে দূরেই গিয়া পড়িতেছিল। এত ক্লেশ যেন সেও আর সহ্য করিতে পারে না, কাজেই ফুলের পোকার মত তাহার অন্তরের মধ্যেও যেন দুষ্ট পোকার ঝঙ্কার হইয়া তাহার অন্তর্ব্যাধি সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। নির্ম্মল এত সংবাদও রাখিত না, সেদিকে তাহার লক্ষ্যও ছিল না। বিমলার অকর্ম্মণ্যতায় দিন দিন সে যেমন বিরক্ত হইতেছিল। তেমনই আবার নীলিমার পুনঃ পুনঃ সাদর আহ্বানে তাহার অন্তরাত্মা কলিকাতার দিকে ধাবিত হইয়া পড়িয়াছিল। পিঞ্জরবদ্ধ বন-বিহঙ্গের মত সে যেন হাত পায়ের দৃঢ়বন্ধনের জন্যই ঘর ছাড়িতে পারিতেছিল না।

রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, দীপের আলো উজ্জ্বল করিয়া দিয়া আহারের পর নির্ম্মল নীলিমার সদ্য আগত চিঠিখানা পুনঃ পুনঃ পড়িতেছিল। আজ আর তাহার পান খাইবার কথাও মনে ছিল না, নীলিমা লিখিয়াছিল, তাহার মাথার বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, এমন সময়ে নির্ম্মল বাবুকে না পাইয়া সে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ তাহার বৃদ্ধ পিতার ঐকান্তিক কাতরতা তাহাকে রোগের অধিক মন্ত্রণা দিতেছে। নির্ম্মলবাবু ভিন্ন তাঁহাকে সান্ত্বনা করে এমনও কেহ নাই। নির্ম্মল আর থাকিতে পারে না, যেমন করিয়া হউক, এস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে যাইতেই হইবে। সে কেন এমন আবদ্ধ হইয়া থাকিবে, কাহার জন্য এত আগ্রহপূর্ণ আহ্বান উপেক্ষা করিবে। কিন্তু একটা লোক না পাইলেত হইবে না। একজন কাহারও উপর ইহাদের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিতে পারিলেই যেন সে চলিয়া যায়। সেই সময় ধীরে ধীরে বিমলা পানের কৌটা হাতে গৃহে প্রবেশ করিয়া মৃদু স্বরে বলিল—"পান।"

নির্ম্মলের কাণে যেন একটা অব্যক্ত শব্দ প্রবেশ করিল, ফিরিয়া দেখিল, বিমলা, সে মৃদুস্বরে বলিল, "বিমলা, আমায় কিন্তু আর ছেড়ে না দিলে চল্‌ছে না তোমাদের কি বন্দোবস্ত করি বল ত?"

কাহারও স্কন্ধের ভার হওয়াটা বিমলা চিরকালেই ঘৃণা করিত। কিন্তু এ যে নিরুপায়, ত্যাগই করুন আর পায়েই রাখুন এত ত্যাগের বস্তু নহে!

সে ধীরে ধীরে বলিল,—"মার অসুখ যে বেড়েই চলেছে। "তার আমি থেকেই কি কর্ব্ব, ডাক্তার কব্‌রেজ রয়েছে, টাকা পয়সায়ও তোমাদের অভাব হবে না, নিজেরাই দেখে শুনে পার্ব্বে।"

বিমলার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল, জোড় করিয়া সে তাহা রোধ করিল, বলিল—"মেয়ে মানুষ আমরা, পুরুষের সাহায্য না পেলেত কোন কাজ কর্ত্তে পারি না।"

"একটা চাকর রেখে নিলেও চল্‌তে পারে।"

বিমলারও সেদিন জ্বর হইয়াছিল, এ আঘাতে তাঁহার দুর্ব্বল শরীর কাঁপিয়া উঠিল, সে একটু অগ্রসর হইয়া একহাতে চেয়ারের হাতাটা জোড় করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া যেন শরীরের সমস্ত শক্তি এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন তুমিই বা যাবে কেন, হাতে ও কার চিঠী।"

নির্ম্মল সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল, বিমলার কথাটা সন্দেহমূলক মনে করিয়া সে মনে মনে আগুন হইয়া বলিল—"তুমি না বড় ভাল মানুষ বিমলা, ?"

মন্দ যে সে কতখানি, তাহা কিছু তাহার অবিদিত ছিলনা, তবু ইহার মধ্যে কি আবার একটা অপরাধ হইয়া গেল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না, বরং বিপরীত ভাবে এ কথাটাই ভাবিতেছিল যে. এতখানি সাহস করিয়া এত সরল ভাবে সে হয়ত জীবনেও স্বামীর সহিত কথা বলে নাই। আজ এতবড় একটা কথা পরিষ্কার কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতে পারিয়া সত্যই যেন স্বামীর উপর পূর্ণ আধিপত্যের সংবাদটা সে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল। এযে হিতে বিপরীত হইল, নির্ম্মল রুষ্টস্বরে বলিল—"সন্দেহ কর্চ্ছ, তা কর, কিন্তু সন্দেহ কেন, আমিত চিরদিন পরিষ্কারই বলে আসছি, স্বভাব আমার ভাল নয়, এ চিঠী নীলিমার, সেই আমায় বার বার করে যেতে লিখেছে, তাতেই ত বল্‌ছি থাক্‌বার যো নেই।"

ঝনাৎ করিয়া বিমলার হাতের খোলা পানের ডিবাটা নির্ম্মলের গায়ের উপর পড়িয়া গেল। পানগুলি ছড়াইয়া কতক নীচে কতক কাপড়ে দেবপূজার জন্য আনীত হস্তভ্রষ্ট ফুলের মত লোটাইতে লাগিল। বিমলা কোন প্রকারে চেয়ারের হাতা ধরিয়াই দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। নির্ম্মল উচ্চঃ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল—"তার ব্যামো, আমি নাগেলে তাকে দেখে এমন আর কেউ নেই।"

বিমলার কাণের গোড়ায় একটা দুষ্ট শব্দ যেন শোঁ শোঁ করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, মাতার রোগ, তাহার জন্য পুত্রে অপেক্ষা করিবার সময় নাই, কে নীলমা, তাহার জন্য ছুটিয়া যাইতে হইবে। অস্ফুট-শব্দ হইল—"হা ভগবান্, একথা শুন্‌বার আগে বজ্র কেন আমার মাথায় ভেঙ্গে পড়্‌ল না।"

(৪৮)

অনেক দিন পরে নির্ম্মলকে চায়ের টেবিলে পাইয়া নীলিমার আনন্দের সীমা ছিল না, নির্ম্মলের পিতার মৃত্যুসংবাদজ্ঞাপক কামান মাথার চুল এখনও সমান হইয়া আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। পারা গায়ে থাকিয়া শরীরও যেন কেমন আভাহীন হইয়া পড়িয়াছিল। চাপানের সঙ্গে সঙ্গে এসকল কথারই আলোচনা হইতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে হিঁদুদের বাড়াবাড়ির নাম করিয়া নীলিমা নির্ম্মলের বিষাদমলিন মনের উপর আপনার অধিকার স্থাপন করিতেছিল। চাপান শেষ হইলে সকলে মিলিয়া তাসের আড্ডায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেই নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল—"এসে কিছু আপনি সতীশবাবুর সহিত দেখা কর্ত্তে সময় পান নি।"

এই অপ্রাসঙ্গিক কথাটা উঠিয়া পড়ায় নির্ম্মল কিছু বিস্মিত হইল, সে দিক্ আর সে মাড়াইবে না, এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, প্রলোভন যত বড়ই হউক, নীলিমা তাহা পূরণ করিতে না পারিবে, এমন আশাও সে করিত না, বিশেষবিবাহিতা শোভার সংসর্গ যে সর্ব্বতো ভাবেই ত্যাজ্য তাহাও তাহার অবিদিত ছিলনা। এসকল নানা চিন্তা করিয়াই নির্ম্মল এই দুইদিনের মধ্যে সতীশদের বাড়ীতে যায় নাই। যদিও ইহাও তাহার জানা উচিত ছিল যে, ব্রাহ্মকন্যা নীলিমাও দুদিন পরে ঠিক শোভার মতই ফাকি দিয়া পলাইবে, তথাপি সে দিকের ভাবনা যেন কে জোর করিয়া চাপা দিয়া রাখিয়া ছিল বলিয়া সে একথা মনেও তোলে নাই। বরং সকল প্রকারে তাহারই হাতে প্রাণ তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিয়া আনাগোণা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। এ অপ্রিয় আলাচনার এই খানেই শেষ করিতে ইচ্ছা করিয়া সে অল্প কথায় উত্তর করিল—"না।"

নীলিমা বলিল"—কিন্তু সতীশ বাবুত এসেছিলেন, তিনি আর আপনাকে মস্ত অনুযোগ করে গেলেন। আপনার বাবা মারা গেলেন, এত বড় বিপদের পরে এখানে এলে তাদের সঙ্গে একবার দেখাও কল্লেন না।"

নির্ম্মলের বিস্ময় বাড়িয়া চলিল, সতীশ কি যাদু জানে,—নহিলে তাহার উপস্থিতির বিষয় জানিবারওত কোন কারণ নাই। নীলিমা আবার বলিল— "সেদিন তার ভগিনীপতি নন্দবাবুও সঙ্গে এসেছিলেন, তিনিও অনেক করে আপনাকে দেখা কর্ত্তে বলে গেলেন। কিন্তু আমার যে সেকথা মনেই ছিলনা।

"নন্দবাবুও এখানে রয়েছেন না কি!"

"সেত অনেক দিনের কথা, জানেন নির্ম্মলবাবু, ওদের ভেতরে ভেতরে যেন কি একটা ঘটেছে, শোভাই বা অমন করে চলে এল কেন, আর দুদিন পরেই নন্দবাবু এসে একেবারে শালিয়ানা হয়ে বসলেন।"

তাসের আসর হা করিয়া ইহাদের মুখাপেক্ষা করিতেছিল, নির্ম্মলও অন্য বিষয়ে মন দিতে পারিলেই যেন বাচে। সহসা ঘড়ীতে আটটা বাজিয়া গেল, শব্দ শুনিয়া নীলিমার যেন চমক ভাঙ্গিল, সেও ব্যস্ত ভাবেই বলিল—"তাইত, কথায় কথায় আটটা যে বেজে গেল, ওরাত আমাদের জন্য বসে রয়েছে, চলুন শিগ্‌গির করে, দুহাত চেলে নেওয়া যাক।"

নির্ম্মল সহসা অন্যমনস্ক হইয়া গগনের গায়ে নব রবিকরের দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছিল। নূতন ধনীর মত গ্রীষ্মের রৌদ্র প্রচণ্ড উত্তাপে ধরাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়া উদ্দাম গতিতে নামিয়া আসিতেছে। নীলিমার কথায় অন্যমনস্ক ভাবেই "তাই চলুন" বলিয়া দৃষ্টি ফিরাইতে দেখিল সম্মুখে শোভা দাঁড়াইয়া আছে। সহসা নির্ম্মলের মস্তক নত হইয়া আসিল, শোভার পরিপূর্ণাঙ্গ যেন যৌবনের খরস্রোতে পৃথিবীকে তৃণজ্ঞান করিতেছিল। জোয়ারের জল খালবিল নালা ডুবাইয়া আপনার গর্ব্বে আপনার সৌন্দর্য্যে যেন বিধাতার অনন্যসুলভ সৃষ্টির মত হাসিতে প্রগল্‌ভতায় মানব মনের উপরে একটা তীক্ষ্ণ আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু এতখানি কমনীয়তার মধ্যেও শোভার মুখে চোখে যেন তীব্র অভিমান ও অবজ্ঞার কালিমা কেমন মৃদুভাবে বিচরণ করিতেছে। মুহূর্ত্ত কাহারও মুখে কথা ছিল না, নীলিমা এই নীরবতার কারণ অবগত ছিল না, তাই সে হাসিয়া শোভার হাত ধরিল, বলিল—"তোমার কিন্তু অনেক দিন আয়ু দিদি, এই মাত্রতোমার কথাই হচ্ছিল।"

শোভা যেন একটা বেদনাকে অতিকষ্টে গোপন করিয়া লইয়া অন্ধকার রাত্রিতে মৃদু দীপশিখার মত একটু হাসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"আমার এত ভাগ্যি, তোমারা কারা?"

"এই আমি আর নির্ম্মলবাবু ?"

শোভা কুঞ্চিতকটাক্ষে নির্ম্মলের দিকে দৃষ্টি করিয়া শ্লেষের সহিতই বলিল—"নির্ম্মলবাবুর মুখে আমাদের কথা ?"

কথা শেষ হইতে না হইতে তিনজন গিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, কাহারও ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বোঝা গেল না, তিন জনেই তিনখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিলে, শোভাই আবার বলিল—"এ সময়ে এসে হয়ত বড্ড অন্যায় করেছি, দুগ্রহের মত নির্ম্মলবাবু যখন আমাদের ছায়া মাড়াতেও ভয় করেন, তখন ঘাড়ে পড়ে জ্বালাতন করা কিছু আমাদেরও উচিত নয়, আর তিনিও বরদাস্ত কর্ত্তে পার্ব্বেন না।"

নির্ম্মল নীরবে সমস্ত অভিযোগগুলিই শুনিয়া যাইতেছিল। নীলিমা তাহার পক্ষ হইয়া উত্তর করিল—"কিন্তু দুদিন যেতে পারেন নেই বলে, একেবারে ক্ষেপে দাঁড়ানও কিছু তোমার উচিত হয় নি ?"

"না তা কেন ?" বলিয়াই শোভা থামিয়া গেল, নীলিমার কথাটা যেন তাহার বেদনাটা তীব্র করিয়া দিল। খানিকক্ষণ থামিয়া আবার বলিল— "আস্‌ছে রববারে আমার একটা বাগানপাটি দিতে হবে, তাতে তোমার যেতে হবে, এ কথাটা বল্‌তেই আমাকে এমন অসময়েও তোমাদের উপদ্রব কর্ত্তে আস্‌তে হয়েছে। ওকে অনুরোধ করে কিছু ব্যতিব্যস্ত কর্ত্তে পারি না, তুমি যদি দয়া করে যাও।"

"ছিঃ দয়া কেন বল্‌ছ, আমার ত যেতেই হবে, আর নির্ম্মলবাবুও কিছু এমন সুযোগ ছাড়্‌বেন না, ছাড়্‌তে গেলেও আমাদের পক্ষে সেটা যখন ভাল মনে হচ্ছে না, তখন ওকেও ধরে নিয়ে যাব।"

এই ধরাধরির কথায় শোভার বুকের মধ্যে যে গোলগোল জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সে খানিকক্ষণের জন্য এতই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল যে, নির্ম্মল কখন উঠিয়া গিয়াছে, তাহাও জানিতে পারে নাই। সহসা শূন্য চেয়ারের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তাহার চোখ মুখ যেন ছুটিয়া পড়িতেছিল। সে তাড়াতাড়ি হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া অতিসংক্ষেপে "তবে এখন আসি" এই কয়টি মাত্র কথা বলিয়া দ্রুতপদে শিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল। নীলিমা ইহার গুরুত্ব কিছুই জানিত না বলিয়া শোভার এই অকারণ অভিমানের জন্য মনে মনে তাহাকে উপহাসই করিতে লাগিল। সে তখন এমন কথা ভাবিতেও পারিল না যে, দুদিনের পরিচিত এই বন্ধুটি যদি শোভার মতই

তাহার সংশ্রবও ত্যাগ করে, তবে অনুযোগ করিবার অধিকার আছে না আছে, এ বিবেচনা না করিয়া বেদনা তাহাকেও ইহা অপেক্ষা বেশী করিয়া বিদ্ধ করিবে কিনা।

বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়া পড়িল, নির্ম্মলকে মটরে উপবিষ্ট দেখিয়া। শোভা মুহূর্ত্তমাত্র ভাবিবার অবকাশ না লইয়া নির্ম্মলের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—"যাও বারাকপুর।"

স্পর্শে নির্ম্মল রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মটর দ্রুতবেগে চলিতে-ছিল, বাতাসের উপদ্রবে শোভার গায়ের সুবাসিত বস্ত্রাংশ পুনঃ পুনঃই তাহার মুখে চোখে আসিয়া যেন আদরের সহিত আব্দার জানাইতেছিল। নির্ম্মলও কি করিতে গিয়া কি করিয়া বসিল, ভাবিবার অবকাশ পাইল না। এই বারাকপুর গমনের আদেশটাই তাহার মনের উপর জোর করিয়া বিভিন্ন চিন্তার সৃষ্টি করিয়া তুলিল। কোন কথা বলে সে শক্তিও তাহার ছিল না, কি বলিতে কি বলিয়া অপরাধের মাত্রাই বাড়াইয়া তুলিবে। শোভা ও কয়েক মিনিট নীরবে থাকিয়া স্বর হাল্কা করিয়া লইয়া বলিল—"তারপর নির্ম্মলবাবু।"

কিসের পর, তাহা নির্ম্মল বুঝিল না, কিন্তু উত্তর করিল—"অন্যায় অবশ্যি আমি ইচ্ছা করে করিনি, আপনি এখন পরস্ত্রী?"

শোভা বাধা দিল, আর একটু ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল—"তোমাদের কিন্তু এটা একটা প্রকাণ্ড ভুল ধারণা, স্ত্রী আবার আমি কার হতে গেলাম। কেন তোমাদের শাস্ত্রই না বলে, প্রাণের বিনিময়েই বিবাহ, আমার ত তা মোটেও হয়নি।"

নির্ম্মল ইহার মীমাংসা জানিত না, বিশেষ তোমার কথাটা তাহাকে দারুণ আক্রমণে আক্রান্ত করিয়া লইয়াছিল। সে কম্পিতকণ্ঠেই বলিল—"বিনিময় হক না হক, যার হাতে আপনাকে সমর্পণ করেছেন, আর্য্যধর্ম্ম হয়ত জোর করেও তারেই আপনার করে দিতে চেষ্টা কর্ব্বে?"

শোভা হাসিল, উপহাসের স্বরে বলিল—"ও আমি কোন দিন মানিনি, এখনও মানুতে পার্ব্ব না, আমার ঐ এক কথা, যেখানে মনের মিল হবে না, সেখানে জোর জুলুম মেনে চলাও আমাদ্বারা হবে না।"

"হবেই না কেন, চেষ্টায় সব হতে পারে।"

"থাক চেষ্টা, জানোয়ার নিয়ে না কি জীবন কাটান যায়। এইত এদ্দিন

এসে পড়ে আছে, কৈ এক দিনের জন্যও ত আপনার বলে ভাব্‌তে পারিনি। সত্য কথা বল্‌তে কি, ও এলেই আমায় আর জ্বালাতন করে তুলেছে, এবার আমি ঠিক করেই নিয়েছি, ওরা আমায় আর জ্বালাতন কর্ত্তে না পারে, এমনই একটা কিছু আমার কর্ত্তে হবে।"

নির্ম্মল কথাটা না বুঝিয়া যেন একটু বিমনা হইয়া পড়িল। শোভা আবার বলিল—"আমি আজ এটাই জান্তে চাই, কি এমন অপরাধ করেছি যে।"

"কার কাছে ?"

শোভা জবাব করিল না, খপ করিয়া নির্ম্মলের হাত ধরিতে যাইতেই নির্ম্মল হাতখানা সরাইয়া লইয়া বলিল—"এখন ফিরে গেলে হয় না।"

শোভার অভিমান হইতেছিল, সে তাহা গোপন করিয়া ম্লান হাসি হাসিয়াই বলিল—"এম্‌নি যদি ফিরেই যেতে হবেত, গাড়ীতে এসে কেন বসেছিলে।"

নির্ম্মল আবার কাঁপিয়া উঠিল, এই শোভাকে পাইলে সে হয়ত কমাস পূর্ব্বেও বুকে করিয়া লইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিত না। কিন্তু সে এখন পরস্ত্রী, এই ভাবে তাহার গাড়ীতে চড়িয়া বসা যে কত বড় মূঢ়ের কার্য্য হইয়াছে, তাহা ভাবিয়াই সে আকুল হইয়া উঠিল। শোভা তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া আছে, ইহাও যেন কেমন বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। তাই কম্পিত-কণ্ঠে বলিল—"নানা, এবার ওকে বলুন, বাড়ী ফিরে যায় ?" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ড্রাইভারের আসনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেই শোভা জোর করিয়া তাহার হাত ধরিয়াই ছাড়িয়াছিল। পরক্ষণেই ড্রাইভারকে ডাকিয়া বলিল—"আচ্ছা ফের, বাসায় যাও।" বলিয়া নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া বলিল—"কিন্তু একটা অনুরোধ, কাল বাগানপার্টিতে যোগ দেবেন।"

নির্ম্মলের এ সংস্রবে থাকিবারই আর ইচ্ছা ছিল না। তাহার দুর্ব্বল মন এতখানি লোভ সাম্‌লাইতে পারিবে, এতটা জোর তাহার মনে কখনও দেখা দেয় নাই। আজ যে বলে সে আত্মরক্ষা করিতেছে, কাল যদি ইহাই তাহার না থাকে ত, নিজের জন্য সে ভাবে না। কিন্তু হিঁদুস্ত্রীর এমন অধোগতির জন্য কি তাহাকে দায়ী হইতে হইবে না। মুহূর্ত্তে তাহার বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হইল। তাহাদের ইংরাজি কেতাবে

কৈ এমন কথাত কখনও সে পরে নাই। যাহাতে সুখ, যাহাতে শান্তি, তাহাই করিতে হইবে, ইহাই যে, তাহাদের কণ্ঠস্থ বিদ্যা প্রকাশ করিতেছে। তবে সে এমন সুযোগ ত্যাগ করিবে কেন। বিশেষ করিয়া তাহার পুনঃ পুনঃই মনে হইতেছিল, এতটুকু পাপ করিয়া যদি সে শোভার মত একটা মহৎ জীবনের উদ্ধার সাধন করিতে পারেত, তাহাতেও তাহার কিছু পুণ্য সঞ্চয় হইবে। শোভা নির্ম্মলকে নিরুত্তর দেখিয়া ক্ষুণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি যাবে না, এতটুকু দয়াও যদি তোমার হৃদয়ে নেইত, আমাদের কেন এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করালে।"

সত্যই কি এজন্য নির্ম্মল দায়ী? সত্যই কি তাহারই দোষে শোভা তাহার জন্য এত লালায়িতা হইয়া পড়িয়াছে। যাহাই হউক, কোন পথ শ্রেয়, তাহা যখন সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, তখন বাধ্য হইয়াই যেন বলিল—"তাই যাব।"

শোভা আর দ্বিরুক্তি করিল না। গাড়ীর বেগ কমিয়া কমিয়া নির্ম্মলের দ্বারে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইতেই সে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া ভিতরে গিয়া শয্যার উপর কাত হইয়া পড়িল।

[ক্রমশঃ]

বিপ্লব

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সকালে অনুপমা ষ্টোভ জ্বালাইয়া চায়ের জল গরম করিতেছিল; এ কাজটা তাহার আদৌ অভ্যাসের মধ্যে নহে, সুতরাং কাজটা যেন তাহার একটু বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। পরেশ গায়ে একটা গরম কাপড় জড়াইয়া বিছানার উপর বসিয়া প্রতিপদে তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেছিল, যেন ষ্টোভটা বেশী জ্বলিয়া না উঠে, কেটলিটা না পড়িয়া যায়, গরম জল গায়ে ছিটকাইয়া না পড়ে। কিন্তু তাহার এই সাবধানতায় অনুপমার বাধ বাধ ভাবটা যেন একটু বেশী হইয়া উঠিতেছিল। বাহিরে থম-থমে মেঘে সমগ্র

আকাশটা ভরিয়া ছিল, বাদলের ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করিয়া বহিয়া যাইতে-ছিল ; একটা স্তব্ধ বিপদে সারা পৃথিবীটা যেন ভরিয়া উঠিয়াছিল।

পরেশ ব্যস্তভাবে বলিল, "জলটা নামাও, নামাও, সব যে পড়ে গেল।"

অনুপমা অতিমাত্র ব্যস্ততার সহিত কেটলিটা নামাইয়া লইল, কিন্তু তাড়া তাড়িতে একটু জল ছিটকাইয়া পায়ে পড়িয়া গেল। অনুপমা মুখটা একটু বিকৃত করিল। পরেশ বলিল, "এই দেখ, যা ভেবেছি, পায়ে গরম জল পড়লো! অনুপমা বিরক্তির সহিত কেটলিটা খপ্ করিয়া মেঝের উপর রাখিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। পরেশ বলিল, "দাড়িয়ে রইলে যে, চা ফেলে দাও না।"

অনুপমা এক মুঠা চা ফেলিয়া দিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল। পরেশ মুখখানাকে একটু বিকৃত করিয়া বলিল, "আহা, অতগুলা চা দিলে ?"

অনুপমা নিরুত্তরে চায়ের কাপে দুধ চিনী ঢালিল। তারপর তাহাতে চায়ের জল ঢালিয়া পরেশের হাতে দিল। পরেশ এক চুমুক খাইয়া বিকৃত মুখে বলিল, "এ্যা, বড্ড কড়া হ'য়ে গিয়েছে।"

অনুপমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ বলিল, "শৈল কিন্তু বেশ চা তৈরী করে।"

অনুপমা স্বামীর মুখের উপর একটা তীব্র ভ্রূকুটী নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। পরেশ কিন্তু সে ভ্রূকুটী লক্ষ্য না করিয়াই বলিল, "এই জন্যই বলেছিলাম, থাক, থাক, তুমি পারবে না।"

অর্দ্ধেকটা চা খাইয়া পরেশ বাটীটা নামাইয়া রাখিল। অনুপমা নিঃশব্দে খুব ক্ষিপ্রহস্তে চায়ের বাটী, কেটলী, ষ্টোভ প্রভৃতি লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। পরেশ গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া জড়াইয়া বালিশে হেলান দিয়া বসিল।"

খানিক পরে অনুপমা হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের মত ঘরে ঢুকিল তীব্রস্বরে বলিল, "শৈলকে আনতে পাঠাও।"

পরেশ বিস্ময়ের সহিত মাথাটা একটু তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বল দেখি ?"

অনুপমা পূর্ব্ববৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "নৈলে তোমার ঠিক মত সেবা হবে না।"

পরেশ মৃদু হাসিল ; বলিল, "না হয় নাই হ'লো।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া অনুপমা বলিল, "না হ'লে চলবে কেন ?" তুমি সেরে উঠবে কিসে ?"

পরেশ বলিল, "সেরে উঠবার আর বাকী নাই। আর যদিই বাকী থাকে, সে জন্য তাকে এনে আটকে রাখবার অধিকার আমার নাই।"

অনুপমা বলিল, "অধিকার নাই তো এতদিন এসে ছিল কেন ?"

পরেশ এবার একটু রাগতভাবে বলিল, "তোমার বিচারে সেটা তার একটা মস্ত অপরাধ ব'লে গণ্য হ'তে পারে, কিন্তু আত্মীয়তা বা ভালবাসা থাকলে সকলেই এই রকম ক'রে থাকে।"

অনুপমা গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ তাহার দিকে একটা ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রামচরণকে ডাকিল, এবং সে আসিলে শৈলকে আনিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিল। রামচরণ চলিয়া গেলে পরেশ বালিশটাকে সোজা করিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। অনুপমা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গেল।

খানিক পরে রামচরণ আসিয়া জানাইল যে, শৈল এক্ষণে আসিতে পারিবে না, তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে। পরেশ উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কে দেখতে এসেছে ? কেন দেখতে এসেছে ?"

রামচরণ জানাইল যে, তাহার বিবাহ, এই জন্যই বরের লোকেরা মেয়ে দেখিতে আসিয়াছে ; কে আসিয়াছে, সে পরিচয় রামচরণ অবগত নহে। পরেশ খানিকটা গুম হইয়া রহিল। তারপর পাশের জানালা হইতে কাগজ পেন্‌সিল লইয়া তাহাতে একটা ঔষধ লিখিল, এবং সেটা রামচরণের হাতে দিয়া বলিল, "হরিচরণের কাছ হ'তে এই মলমটা চেয়ে নিয়ে এস।"

রামচরণ কাগজখানা হাতে লইয়া বলিল, "তিনি তো আজ আসেন নি ?"

ক্রুদ্ধস্বরে পরেশ বলিল, "আসেন নি তো কোন্ চুলোয় গেল ?"

রামচরণ বলিল, "তেনাকে ওনাদের বাড়ীতে দেখে এলাম।"

ক্রুদ্ধভাবে বিছানার উপর একটা চাপড় মারিয়া পরেশ চীৎকার করিয়া বলিল, "ওনাদের বাড়ীতে—কাদের বাড়ীতে।"

রামচরণ বলিল, 'ঐ শৈল ঠাকরুণদের বাড়ীতে।"

ক্রোধ গম্ভীর স্বরে পরেশ বলিল, "ফুল্ ! সে হতভাগা ওখানে কেন ?"

এ কথার উত্তর রামচরণ দিতে পারিল না। সে নীরবে দাঁড়াইয়া হাতের কাগজখানা নাড়িতে লাগিল। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তারখানায় রোগী কেউ এলেছে ?"

রামচরণ বলিল, "চার পাঁচ জন শিশি হাতে ব'সে আছে।"

পরেশ গম্ভীরভাবে বলিল, 'ডাক্তারখানা খুলে দাও গে, আমি যাচ্ছি।"

রামচরণ কিন্তু গেল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ বলিল, "শীগ্‌গীর যাও।"

রামচরণ বলিল, "তুমি—কিন্তু তুমি যেতে পারবে ?"

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে পরেশ বলিল, "না পারলেও যেতে হবে। নয় তো রোগীরা ওষুধ পাবে না।"

রাম। কিন্তু তোমার উঠতে হাঁটতে বারণ। তোমার অসুখ বাড়তে পারে।

পরে। আর ওষুধ না পেলে রোগীগুলা মারা যেতে পারে।

কঠোর স্বরে রামচরণ বলিল, "মরে মরুক, তাদের মরা বাঁচার সঙ্গে তোমার তুলনা হ'তে পারে না।

শ্লেষগম্ভীর স্বরে পরেশ বলিল, "কেন আমি বড়লোক ব'লে ?"

রামচরণ কোন উত্তর দিতে পারিল না। পরেশ বলিল, "দেখ, তুমি আমার উপর স্নেহের অত্যাচার যতটা ইচ্ছা কত্তে পার, কিন্তু আমার কর্ত্তব্যের উপর হাত দিও না।"

রামচরণ আর কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গেল। পরেশ গায়ের কাপড়টা উত্তমরূপে গায়ে জড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় অনুপমা বাঁ হাতের তেলোর উপর কাপড় রাখিয়া তাহাতে গরম দুধের বাটী বসাইয়া ঘরে ঢুকিল, এবং পরেশকে বাহির হইতে উদ্যত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে দরজার উপর দাঁড়াইয়া পড়িল। পরেশ কিন্তু তাহাকে যেন দেখিতে পায় নাই এমনই ভাবে পাশ কাটাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। অনুপমা ধীরে ধীরে বলিল, "দুধ এনেছি।"

"রেখে দাও" বলিয়া পরেশ অতিরিক্ত ক্ষিপ্রপদে পাশ কাটাইয়া যেমন ঘরের বাহির হইতে গেল, অমনই তাহার গায়ের কাপড়টা লাগিয়া অনুপমার হাতের দুধের বাটীটা দুধ সমেত অনুপমার পায়ের উপর পড়িয়া গেল। অনুপমা একটু অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিবা মাত্র পরেশ চমকিতভাবে

ফিরিয়া চাহিল, এবং আপনার এই অস্বাভাবিক রূঢ় ব্যবহারে এমন লজ্জিত হইয়া পড়িল যে, প্রথমটা সে কোন কথাই বলিতে পারিল না। তারপর আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "দুধটা কি খুব গরম ছিল।"

দুধটা খুবই গরম ছিল, এবং তাহার স্পর্শে পায়ের দাহ যন্ত্রণাও যথেষ্ট হইতেছিল; অনুপমা কিন্তু সে যাতনাটা গোপন করিয়া নত মুখে গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "না।"

মেঝেয় যে দুধটা পড়িয়াছিল, তাহা হইতে তখনও ধোঁয়া উঠিতেছিল। পরেশ সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল, "না কেন, খুবই গরম ছিল। ঐ যে পায়ের চামড়াটা লাল হ'য়ে উঠেছে।

অনুপমা কোন উত্তর করিল না; সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ বলিল, "আমি এখনি রামু কাকার হাত দিয়া একটা মলম পাঠিয়ে দিচ্চি, সেটা লাগিয়ে দিও।"

বলিয়াই পরেশ দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। অনুপমা কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর মেঝের দুধটাকে হাত দিয়া বাটীতে তুলিয়া লইল, এবং কাপড় দিয়া ঘরটা মুছিয়া লইয়া নীচে গেল।

নীচে যাইতেই তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরেশ না বাইরে গেল বৌমা?"

অনুপমা ঘাড় নাড়িয়া তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তর দিল। তারাসুন্দরী বলিলেন, "কোথায় গেল আবার?"

অনুপমা যেন খুব অবজ্ঞার সহিত উত্তর করিল, "জানি না।"

সে পরেশকে দুধ খাওয়াইয়া আসিল, এতক্ষণ উপরে ছিল, তাহার সম্মুখ দিয়াই পরেশ বাহির হইয়া গেল; অথচ কোথায় গেল তাহা জানে না এ উত্তরটা তারাসুন্দরীর মনোনীত হইল না। অসুস্থ লোকটা বাহির হইয়া গেল, কিন্তু সে কোথায় যাইতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিল না।

স্বামী স্ত্রীর কোন ব্যবহারটাই ইদানীং তারাসুন্দরীর পছন্দ হইতেছিল না। উভয়ের মধ্যে এই ছাড়াছাড়া ভাব, পরস্পরের কার্য্য সম্বন্ধে পরস্পরের এই অগ্রহশূন্যতা, এ সকল কোনও গৃহিণীর চক্ষেই শুভচিহ্ন বলিয়া লক্ষিত হয় না। তারাসুন্দরীরও হইতেছিল না। তবে এজন্য তিনি অনুপমাকে যতটা দোষী বিবেচনা করিয়াছিলেন, পরেশের দোষ ততটা দেখিতে পান

নাই। কেননা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া তিনি পরেশের উপর অনুপমার উপেক্ষার ভাবটাই বেশী দেখিতে পাইতেছিলেন, এবং ইহাতে অনুপমার উপর মনে মনে খুব বিরক্তও হইয়া উঠিতেছিলেন। সুতরাং অনুপমার এই 'জানি না' উত্তরটা তাঁহার সেই বিরক্তিটাকে একটু প্রবল করিয়া দিল। কিন্তু তিনি মুখে কিছুই বলিলেন না।

একটু পরে রামচরণ একটা শিশিতে কতকটা মলম আনিয়া অনুপমার কাছে দিল। তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কার ওষুদ ?"

রামচরণ বলিল, "বৌমার পায়ে গরম দুধ পড়ে গিয়েছে, তার মলম ?"

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে তারাসুন্দরী বলিলেন, "ওমা, কখন্ আবার পায়ে দুধ পড়লো ? কৈ আমাকে তো কিছু বল নি বৌমা ?

অনুপমা বাটনা বাটিতেছিল, সে কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "কখন্, দুধ পড়লো ? আমার সামনেই তো দুধের কড়া নামালে।"

মৃদুস্বরে অনুপমা বলিল, "এখানে পড়ে নি।"

"তবে কোন্‌খানে ? পরেশকে দিতে গিয়ে ? কতটা পড়েছে ?"

"সব।"

"সব ? তা হ'লে পরেশের খাওয়া হয় নি বল।"

"হুঁ।"

গালের উপর হাত রাখিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, 'অবাক কল্লে বৌমা, একটু দুধ দিতে গিয়ে বাটীশুদ্ধ দুধটা ফেলে দিলে ? ছেলেটার খাওয়াও হ'লো না ? না বাছা, তোমাদের দিয়ে যদি একটিও কাজ হবে। কৈ দেখি, ওমা, এ যে, ফোস্কা উঠেছে। কি মেয়ে তুমি বাপু, দুধটা গেল, ছেলের খাওয়া হ'লো না, তার ওপর পায়ে ঘা ক'রে বসলে। এখন উঠে ওষুদ লাগাও।"

অনুপমা মলমের শিশিটা তুলিয়া লইল, এবং সেটাকে ছুঁড়িয়া নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিল। তারাসুন্দরী খানিকটা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর বিস্ময়স্তব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ওষুদটা ফেলে দিলে বৌমা ?"

অনুপমা চুপ করিয়া রহিল। তাহার এই নীরবতায় তারাসুন্দরী যেন একটু বেশী রাগিয়া উঠিলেন; মুখ ভার করিয়া তারাসুন্দরী ক্রোধগম্ভীর

কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি রাগ করবে বৌমা, কিন্তু উচিত কথা, এই জন্যেই ছেলের সঙ্গে তোমার বনিবনাও হয় না।"

বলিয়াই তিনি সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেন। অনুপমা আস্তে আস্তে উঠিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মেয়ে বড় হইলে, মেয়ের বিবাহের জন্য শুধু মা বাপেরই যে বেশী ভাবনা হয় তাহা নহে, মা বাপের চেয়ে বেশী ভাবনা হয় পাড়া প্রতিবেশীদের। এমন কি এই ভাবনায় স্থল বিশেষে তাঁহাদের অজীর্ণ রোগেরও সম্ভাবনা দেখা যায়; এবং ইহার প্রতিকারের জন্য তাঁহারা আসিয়া অযাচিতভাবে অনেক উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু সকল স্থলেই মাতাপিতা তাঁহাদের এই অমূল্য উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হন না। সেই সাহসে এই সকল পরম হিতৈষী প্রতিবেশিগণ নিরুপায় হইয়া অবাধ্য পিতামাতাকে শাসন করিবার জন্য এমন সকল কথার জল্পনা করেন এবং আপনাদের প্রখর কল্পনা শক্তির প্রভাবে এমন সকল দোষের আবিষ্কার করিতে থাকেন, যাহাতে তাঁহাদের হিতৈষণার ফলে মেয়েটীর চিরকুমারী হইয়া থাকা ছাড়া উপায়ন্তর দেখা যায় না।

কাত্যায়নীর পক্ষেও প্রতিবেশিদের এই হিতৈষণা প্রবৃত্তি নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকে নাই। যদিও তিনি সমাজচ্যুতা, তাঁহার সহিত সমাজের লোকদের কোন সংশ্রব ছিল না, তথাপি এত বড় একটা ধেড়ে মেয়ে যে তাঁহাদের চোখের সামনে ঘুরিয়া বেড়াইবে, সমাজের কেহই তাহাকে গ্রহণ না করিলেও মা যে তাহাকে পাত্রস্থ না করিয়া পেটে ভাত চাপা দিবে, এটা নিতান্তই অসহ্য। তাহার উপর এই মেয়েটা পরেশ ডাক্তারের বাড়ী যাতায়াত করাতেও তাহাদের সহ্য-শক্তিটা একেবারেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিল।

তারপর পরেশের সঙ্গে শৈলর বিবাহের কথাটা যখন কাণাঘুষায় প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন সকলেই নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিতে লাগিল, "ছি ছি, বিলেত ফেতরের সঙ্গে বিয়ে! গলায় দড়ি।" প্রবীণারা উদ্দেশে কাত্যায়নীকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন; "মাগী কি আর দেশে বর খুঁজে পেলে না।"

যুবতীরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "আহা সতিনের উপর!"

কথাটা সব চেয়ে বেশী লাগিল সার্ব্বভৌমের বুকে। তিনি কাত্যায়নীর

নিকট উপস্থিত হইয়া সক্ষোভে বলিলেন, "হ্যাঁ বৌ মা, শেষে ভটচায্যি কুলে কালী দিলে ?"

কাত্যায়নী কিছু বুঝিতে পারিলেন না, শুধু মাথার কাপড়টা গলার কাছ পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "কেন, দেশে কি আর পাত্র পেলে না ; শেষে বিলেত ফেরতকে মেয়ে দেবে ?"

কাত্যায়নী ভাবিয়াছিলেন, তিনি না জানি কি একটা ভয়ানক অপরাধ করিয়াছেন। ভাবিয়া তিনি খুব শঙ্কিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সার্ব্বভৌমের কথায় তিনি যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। সার্ব্বভৌম উত্তরের জন্য কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথাবার্ত্তা সব ঠিক হ'য়ে গিয়েছে "

কাত্যায়নী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ঠিক হয় নাই ! সার্ব্বভৌম মস্তক আন্দোলন করিয়া বলিলেন, "কিন্তু ঠিক না হওয়াও তো আর ভাল দেখায় না বৌমা। ধর, বয়সও তো পনর ষোল হ'য়েছে। শাস্ত্রে লিখেছে—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত উর্দ্ধং রজস্বলা॥"

এ বড় সহজ কথা নয় বৌমা, চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হয় ; শুধু নরকস্থ হয় না, অভিশাপ করে !"

কত্যায়নী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, আজকাল লোকে আর এ সব মানে না, কিন্তু যে না মানুক, আমাদের বংশে তো এসব না মানলে চলবে না। কাশী দাদা কি সহজ পণ্ডিত ছিলেন ? তাঁর পৌত্রী দ্বারা যদি কুল কুলঙ্কিত হয়, তবে সেটা কম আপশোষের কথা নয় তো বৌমা।"

মৃদুস্বরে কাত্যায়নী বলিলেন, "চেষ্টা তো দেখছি।"

সহাস্যমুখে সার্ব্বভৌম বলিলেন, "চেষ্টা দেখবার কি সময় আর আছে বৌমা, এখন কোন রকমে দায় হ'তে উদ্ধার পাওয়া দরকার। রাগ ক'রো না বৌমা. আত্মীয় বলেই এত কথা বলছি। ধর না, ভাল ছেলেই বা তুমি পাবে কোথায় ? সত্য হোক, মিথ্যা হোক, সমাজে একটা দুর্ণাম আছে তো ?"

কাত্যায়নী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সার্ব্বভৌম

বলিলেন, "এই জন্য আমি তখনই রমানাথকে বলেছিলাম, কিছু দিয়ে সমাজের এই গোলযোগটা মিটিয়ে দাও। কিন্তু সে কথা তখন কাণে নিলে না, দেশছেড়ে কলকাতাবাসী হ'ল। আরে যেখানেই যাও, দেশ বা সমাজ ছেড়ে যাবে কোথায়? যাক্, সকলই তারার ইচ্ছা। এখনকার কথা এই য, উচু আশা ছেড়ে দাও, কোনরকমে মেয়েটীকে পাত্রস্থ করে মান সম্মান বজায় রাখ।"

মৃদুস্বরে কাত্যায়নী উত্তর করিলেন, "আচ্ছা।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আর একটা কথা তোমাকে বলে যাই বৌমা, মেয়েটী তোমার নেহাত ছোট নয়; এত বড় মেয়ে যে দিন রাত কারো বাড়ীতে আনাগোনা করবে, সেটাও ভাল দেখায় না। এতে পাঁচজনে পাঁচ রকম কথা বলতে পারে। বলতে পারে কেন, এখনই তার সুর তুলেছে। তবে এই বুড়োর ভয়ে, বুঝলে কিনা, এখনো কেউ তেমন স্পষ্ট কিছু বলতে সাহস করেনি। কিন্তু পাঁচজনের মুখে সরা চাপা দেওয়া—বুঝলে কিনা।"

কাত্যায়নী বুঝিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া নখ খুঁটিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম অতঃপর কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষরূপে অবহিত হইতে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

শৈল সে দিন পরেশের বাটী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কাত্যায়নী তাহাকে এরূপে পরেশের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে নিষেধ করিলেন। শৈল হাসিয়া উত্তর করিল, "এতদিন যে গিয়েছি, তার জন্য কিছু প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হবে কি মা?

কাত্যায়নী রাগিয়া মেয়েকে কতকগুলা তিরস্কার করিলেন, আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন, শেষে খানিকটা কাঁদিয়া গাত্রদাহ নিবৃত্তি করিলেন।

সেইদিন অপরাহ্নে ক্ষান্ত ঠাকুরাণী আসিয়া সংবাদ দিয়া গেলেন যে, কল্য প্রভাতে বরপক্ষ মেয়ে দেখিতে আসিবে। সেদিন মাতা কন্যার সমক্ষেই প্রতিজ্ঞা করিলেন, বরপক্ষের মেয়ে দেখিয়া পছন্দ হইলে, বর যেমনই হউক, তাহার হস্তেই তিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন। ঈষৎ হাসিয়া শৈল বলিল, "যদি তাদের পছন্দ না হয়?"

ক্রোধকণ্ঠে কাত্যায়নী বলিলেন, "ত. হ'লে আমাকে গলায় দড়ী দিতে হবে।"

এ কথার উত্তরে শৈল আর হাসিতে বা কিছু বলিতে পারিল না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

"সুসংবাদ ডাক্তার বাবু!"

"সুসংবাদ না দুঃসংবাদ!"

"বিয়ের সংবাদ কি দুঃসংবাদ?"

"কারো কারো পক্ষে।"

"তাঁদের অবশ্য হিতৈষী বলা যায় না।"

"শত্রুও বলা চলে না।"

"ষোল' বছরের 'অরক্ষণীয়া' মেয়েকে কোন রকমে বিবাহ সমুদ্রটা পার হ'তে দেখলে "যারা কষ্টবোধ করেন. তাঁদের শত্রু ছাড়া হিতৈষী বলা সাজেনা।"

"আমি কিন্তু তেমন হিতৈষী সাজতে চাহিনা।"

ঈষৎ হাসিয়া শৈল বলিল, "তা হ'লে স্বীকার ক'রে নিলেন, আপনি আমার শত্রু?"

পরেশও হাসিয়া উত্তর করিল, "কাজেই।"

শৈল নিঃশব্দে একখানা কাগজ দিয়া টেবিলের ধুলা ঝাড়িতে লাগিল। পরেশ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিল। তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সারাদিনের মেঘলার পর শেষ বেলার রোদটুকু বেশ উজ্জ্বল ভাবেই গাছ-পালার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে; পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া একটু একটু রোদ আসিয়া মেঝের উপর পড়িয়াছে; রৌদ্রোজ্জ্বল মেঘের খণ্ডগুলা তুলার বস্তার মত পশ্চিম আকাশের প্রান্ত দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে।

সহসা শৈল ফিরিয়া ডাকিল, "ডাক্তার বাবু!"

পরেশ একটু চমকিত ভাবেই উত্তর দিল, "কি?"

"আপনি আর কিছু জিজ্ঞাসা কল্লেন না?"

"প্রয়োজন নাই।"

"পাত্রটী কে জানেন?"

"জানি।"

"কে বলুন দেখি?"

"কে একটা রাম, শ্যামা, মধ্যে হবে আর কি!"

শৈল এবার হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "বলতে পাল্লেন না।"

পরেশ গম্ভীরভাবে বলিল, "না পারলেও ক্ষতি নাই।"

শৈল বলিল, "ক্ষতি একটু আছে বই কি? আমার ভাবী স্বামীর সম্বন্ধে আপনার ওরূপ ভুল ধারণাটা ঠিক নয়!"

পরেশ একটু ভ্রূকুটি করিল। শৈল বলিল, "পাত্রটী কে জানেন? আপনার কম্পাউণ্ডার হরিচরণ বাবু।"

পরেশ এক প্রকার লাফাইয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, এবং সজোরে বিছানায় একটা চাপড় মারিয়া বলিয়া উঠিল, "হরিচরণ! ননসেন্স!"

শৈল হাসি চাপিয়া, মুখে খানিকটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য, আনিয়া বলিল, সাবধান ডাক্তার বাবু, আমার যিনি ভাবী স্বামী, তাঁকে এরূপ অসংযত ভাষায় গালাগালি করবেন না।"

উত্তেজিত কণ্ঠে পরেশ বলিল, "কে তোমার স্বামী? হরিচরণ? সেই হতভাগা তোমার স্বামী হ'বার উপযুক্ত?"

মৃদু হাসিয়া শৈল বলিল, "এটা কি বিলাত পেলেন ডাক্তার বাবু, যে মেয়ে মানুষে উপযুক্ত অনুপযুক্ত স্বামী নির্ব্বাচন করবে?"

শৈলর এই হাসিতে, এই কথায় যে একটা তীব্র শ্লেষ ছিল, তাহা পরেশের মর্ম্মে গিয়া বিদ্ধ হইল; সে মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শৈল আস্তে আস্তে গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল, এবং পশ্চিম আকাশে মেঘের গায়ে গায়ে যে একটা সোণালী রং ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

পরেশ খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "সকালে তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম।"

মুখ না ফিরাইয়াই শৈল বলিল, "জানি, কিন্তু কেন তা জানিনা।"

পরেশ বলিল, "এ দেশের লোকে বিয়েটাকে যে ঠিক ছেলে খেলা মনে করে, তাই শোনাবার জন্য তোমাকে ডেকেছিলাম।"

সহাস্য কণ্ঠে শৈল বলিল, "বিয়েকে ছেলে খেলা মনে করে? বলেন কি? কথাটা আমাকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে দেন তো।"

বলিয়া সে জানালা ছাড়িয়া বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেখেলাটা কি রকম ডাক্তার বাবু!"

পরেশ এবার একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "সেটা এখন আর তোমাকে

শোনাবার দরকার দেখি না। কেন না, আমার চেয়ে তুমি খুবই বেশী বুঝতে পেরেছ।"

"তা হ'লে আপনার মতে এদেশের বিবাহ প্রথাটা দূষণীয় ?"

"এ দেশের বিবাহ প্রথা যেমন, এমন আর কোন সভ্য দেশেই নাই। কিন্তু লোকে এই পবিত্র প্রথাটাকে একেবারে জঘন্য ক'রে তুলেছে। এমন জঘন্য ক'রে তুলেছে যে, তাতে গার্হস্থ্য সুখটা আমাদের কাছে ঠিক একটা স্বপ্নের মতই হয়ে গিয়েছে।"

পরেশের সমগ্র মুখখানার উপরে যেন একটা ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিল। শৈল সেদিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিলাতের প্রথা কি এর চেয়ে ভাল ?"

জোর গলায় পরেশ বলিল "শতগুণে ভাল। তুলনায় তাদের গার্হস্থ্য জীবন আর আমাদের গার্হস্থ্য জীবন ঠিক স্বর্গ আর নরক !"

শ্লেষের মৃদু হাসি হাসিয়া শৈল বলিল, "এই জন্যই বুঝি তাদের স্বামী ত্যাগের মামলা আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়।"

মৃদু হাস্যের সহিত পরেশ বলিল, "সে কয়টা শৈল ? আমাদের দেশের মেয়েরাও কি স্বামীকে ত্যাগ করে না ? ব্যভিচারিণী হয় না ? কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনে—"গৃহিণী সাধবঃ সখঃ মিথঃ, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ" এটা ইংরাজ সমাজে যা দেখে এসেছি শৈল, এদেশে তার বিন্দুমাত্র দেখতে পাই না।"

শৈল এবার গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমি আপনার এ ধারণার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করি। ভক্তিতে, পাতিব্রত্যে এদেশের রমণী অতুলনীয়া।"

"পরেশ হাসিয়া উত্তর করিল, "স্বামীর পায়ের ধুলা খাওয়া, আর শাঁখা শাড়ী সিঁদুর প'রে মরবার প্রবৃত্তিই যদি ভক্তি ও পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা হয়, তবে এবিষয়ে তাঁরা অতুলনীয়া সন্দেহ নাই ; কিন্তু স্বামীর গার্হস্থ্য জীবনকে সুখময় কত্তে বা গৃহস্থালীর অভাব মোচনে স্বামীর বিন্দুমাত্র সহায়তা কত্তে তারা গৃহপালিত যে কোন জীব অপেক্ষা অধিক উন্নত, একথা আমি কিছুতেই স্বীকার ক'রে নিতে পারিনা। বরং অনেকস্থলে তারা ঠিক এর বিপরীত আচরণই ক'রে থাকে।"

মৃদু হাসিয়া শৈল বলিল, "আপনি বোধ হয় গৃহিণীর কাছে আজ এই রকম ব্যবহারই পেয়েছেন ?"

মৃদু গম্ভীর হাস্যের সহিত পরেশ বলিল, "ঠিক এই রকম ব্যবহার না হলেও, বেশ ভাল ব্যবহারও বলা যায় না।"

শৈলের ইচ্ছা হইল, সে ব্যবহারটা কিরূপ জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর ব্যবহার লইয়া এতটা স্বাধীনভাবে আলোচনা সে সঙ্গত মনে করিল না। সুতরাং প্রশ্নটা ফিরাইবার উদ্দেশ্যে সে পরিহাসচ্ছলে বলিল, "আপনি এক কাজ করুন না, আর একটা পছন্দমত বিয়ে করুন।"

পরেশ নিরুত্তরে গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল। শৈল যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "রাগ কল্লেন ডাক্তার বাবু?"

পরেশ উত্তর করিল, "না।"

শৈল চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে পরেশ বলিল, "একটু চা তৈরী ক'রে দিতে পার? ও বেলা হ'তে চা খাওয়া হয় নি?"

শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বৌদি কি চা তৈরী ক'রে দেন নি?"

পরেশ বলিল, "দিয়েছিলেন, কিন্তু তেমন চা জীবনে এই প্রথম বোধ হয় খেয়েছি।"

শৈল উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিল। বলিল, "ওঃ, এতক্ষণে এ দেশের মেয়েদের উপর আপনার রাগের কারণ বুঝেছি। আফিমখোরদের যেমন আফিম, চা-খোরদের তেমনই চা। আচ্ছা, আজ আমি বৌদিকে চা তৈরী শিখিয়ে দিয়ে যাব।"

বলিয়াই শৈল ব্যস্তভাবে ঘরের বাহির হইয়া গেল। কিন্তু বাহির হইয়াই সিঁড়ীর কাছে অনুপমাকে দেখিয়া মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল; তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিয়া সহাস্যে বলিল, "এস তো বৌদি, তোমাকে চা তৈরী করা শিখিয়ে দিয়ে যাই।"

বলিয়া সে অনুপমাকে টানিতে টানিতে নীচে নামিয়া গেল।

খানিক পরে শৈল চা তৈরী করিয়া উপরে আসিল, এবং পরেশের হাতে চায়ের বাটী তুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখুন দেখি, এ বেলার চা ভাল না মন্দ?"

ঈষৎ হাসিয়া পরেশ বলিল, "ভয়ানক মন্দ। এত মন্দ যে, রোজ দু'বেলা এই রকম মন্দ জিনিষ খাওয়াকে সৌভাগ্য বলে মনে করি।"

শৈল বলিল, "এ সৌভাগ্য কিন্তু স্থায়ী হ'বার সম্ভাবনা নাই।"

পরেশ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না। রামু দরজার কাছে আসিয়া বলিল, "কম্পাউণ্ডার বাবু এসেচেন।"

মুখের কাছ হইতে চায়ের বাটীটা সরাইয়া পরেশ চীৎকার করিয়া বলিল, "দূর ক'রে দাও, কাণে ধ'রে তাড়িয়ে দাও।"

রামু আস্তে আস্তে নীচে চলিয়া গেল। শৈল সহাস্যে বলিল, "বিয়ে না হ'তেই বেচারার অন্ন মারবেন? ও বেচারীর উপর আপনার এত রাগ কেন ডাক্তারবাবু?"

উত্তেজিত কণ্ঠে পরেশ বলিল, "কেন রাগ? ও হতভাগার এত বড় স্পর্দ্ধা, তোমাকে বিয়ে কত্তে চায়?"

পরেশ এক নিশ্বাসে গরম চা টুকু গলায় ঢালিয়া দিল। শৈল বলিল, "বিয়ে কত্তে চাওয়াটা কি এত অপরাধ?"

পরেশ বালিশের উপর চাপড় মারিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দু'শো বার অপরাধ? ও রাস্কেল তোমাকে বিয়ে করবে? কক্ষণো না, এই আমি জোর গলায় বলছি, কক্ষণো না।"

শৈল আর আর কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু দরজার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। পরেশের চীৎকার শুনিয়া অনুপমা দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে চাহিতেই শৈলর মুখখানা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া পালাইবে, কি দাঁড়াইয়া থাকিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

(ক্রমশঃ)

গল্পলহরী

ষষ্ঠ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩২৫ { ১১শ সংখ্যা

দুঃস্বপ্ন

লেখিকা শ্রীমতী শরদিন্দু সরকার।

কুলিনের ঘরের মেয়ে, নিতান্তই বিধাতার অভিসম্পাতের মত হইলেও নিলিমা আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন—সবে ধন নীলমণি। মেয়ের বয়স যখন মাত্র দুই বৎসর, তখন আমাকে বিধবা হইয়া জীবনের সকল রকম সুখ-সাধ বিসর্জ্জন দিতে হইলেও তাহাকে পাইয়া আমি যেন কি এক অমূল্য রত্ন পাইয়াছি বলিয়াই বোধ হইত।

অকালে স্বামীকে হারাইয়া ছিলাম বটে, কিন্তু তিনি আমাকে অন্য কোনও রূপ অভাবে ফেলিয়া যান নাই। তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের মাতা-পুত্রীর কোনও রূপে দিন চলিয়া যাইত। তাহার জন্য আমাকে কোনদিন কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় নাই। বিধাতার করুণা পূর্ণ আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য টুকুর মতই আমি তাহাকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছি।

সেও আজ দশ বৎসরের কথা। ভাগ্য যাহার মন্দ হয়, তার কোনও দিকেই সুখ থাকেনা। আমারও এ সুখ বেশীদিন থাকিল না। এতদিন বেশ স্বচ্ছন্দোই কাটিয়াছিল। কিন্তু আর ত চলেনা। নিলিমা যেটের কোলে এই দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া একাদশ বৎসরে পড়িয়াছে। এখন ত তাহার বিবাহ দিতে হইবে? কিন্তু আজ কাল বিবাহ একটা বিষম ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে সে আবার কুলিনের মেয়ে! আমি গরীব বলিয়া ত আর কেহ বিনাপণে বিবাহ করিবে না? দিবা রাত্রি এই ভাবনায় আমি যেন কিছুতেই আর স্বস্তি পাই না। দেশে আমার এমন কেহ আত্মীয়

ছিলেন না যে, এতটুকুও সাহায্য কাহারও নিকট পাইতে পারি। একলা মেয়ে মানুষ, আমার দ্বারা কিরূপে এ কার্য্য হইতে পারে? আমাকে অহরহ এই চিন্তায় দগ্ধ করিতেছিল।

প্রতিবেশিনী মুখুজ্যেদের বড়গিন্নি আমাকে কন্যা তুল্য স্নেহ যত্ন করিতেন। তিনি বলিতেন "সুখদা, তুই এত ভাবিস কেন বল্‌ত? তোর মেয়ে যেরূপ সুন্দরী, বিনা টাকায় কত লোক লুফে নিয়ে যাবে।" আমি শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতাম। কোন কথা বলিতাম না। সত্যইত আর তাই হবেনা! আর সেই আশায় কিছু নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। আমি হরিশ বাগ্দীর মাকে দিয়ে গোপনে নানা স্থানে সন্ধান লইতে লাগিলাম। সে এই গ্রামের যত লোকের কুটুম্ববাড়ী তত্ত্ব করিতে যায়, এবং ফিরিয়া আসিয়া আমাকে সব বলে।

দেখিতে দেখিতে সে বৎসরটিও অতীত হইয়া গেল। দুঃশ্চিন্তার ভারে আমি যেন দিন দিন বলহারা হইয়া পড়িতে লাগিলাম। এই সময় মুখুজ্যে গৃহিণী একদিন আমাকে বলিলেন "মেয়ে, বারুণী নাইতে যাবি?" ভাবিয়া ভাবিয়া মেয়ের বিবাহের ত কোনও উপায়ই করিতে পারিলাম না। ঘরে বসিয়া দিবা রাত্রি ভেবেই বা কি হইবে; তবে আমিও দিন কতক ঘুরে আসি, এমন সঙ্গ আর পাব না ভাবিয়া সমস্ত ঠিক্ করিয়া ফেলিলাম। এখানেও ঐ মেয়ের ভাবনা! ওকে কারকাছে রাখিয়া যাই। মুখুজ্যে গৃহিণী বলিলেন "ওমা, ওকে কোথা রেখে যাবি, সঙ্গে নিয়ে চল্।" আমি বলিলাম "অগত্যা তাই।" তার পর একদিন আমরা বারুণী স্নানের উদ্দেশে কাটোয়ায় যাত্রা করিলাম।

ষ্টেসনে আসিয়া ট্রেনে উঠিলাম। আমাদের সহিত গ্রামের এবং ভিন্ন গ্রামের আরও অনেক গুলি যাত্রি ছিল। নির্ব্বিঘ্নে যখন সকলেই ট্রেনে উঠিয়া বসিল, তখন একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যেন আরাম বোধ করিলাম। ট্রেন হুস্ হুস্ শব্দে ছুটিয়া চলিল। আমাদের কামরাতে ভিড়ও যথেষ্ট ছিল। ট্রেন বর্দ্ধমান ছাড়াইয়া যখন ষ্টেসনে আসিয়া থামিল, তখন যাত্রির কণ্ঠ নিস্থৃত গোণ্ডগোল অনেক পরিমাণে থামিয়া গিয়াছে।

(২)

স্নানান্তে আবার সকলে বাড়ী ফিরিতেছি, ট্রেনে উঠিয়া দেখিলাম কামরার একপাশে একটি যুবতী বসিয়া নির্নিমেষ নেত্রে আমার পার্শ্বস্থিতা

নিলীমার মুখের পানে চাহিয়া দেখিতে ছিল। মেয়েটি প্রায় আমাদেরই সম বয়সী। ভদ্র মহিলা বলিয়াই বোধ হইল। চিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে বাকী রহিল না যে, স্ত্রীলোকটি সধবা। কি অনিন্দ্য সুন্দর মুখ! আমি বিস্মিতের মত তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। একটুখানি পরে স্ত্রীলোকটী আমার একটু কাছে ঘেঁসিয়া বসিল, এবং একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনারা কোথা হতে আসছেন?" এমন স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠ ত কোথাও শুনি নাই। বলিলাম "আমরা ভাই বারুণী নাইতে কাটোয়ায় গিয়াছিলাম। তুমি কোথা হতে আস্‌ছ ভাই?" মৃদু হাসিয়া সে কহিল "আমি আস্‌ছি সিউড়ি থেকে—আপনাদের বাড়ী।" আমি বলিলাম "আমাদের বাড়ী বৰ্দ্ধমানের কাছে কুসুমপুরে! তুমি যাবে কোথা ভাই?" সে উৎসাহ ভরে বলিল "ওঃ তাহলে ত এক সঙ্গেই, আমিও বৰ্দ্ধমানে নামবো—পাশের ও মেয়েটি—।" আমি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলাম "ওটি আমারি" আমার স্বরটা যেন আপনা হইতেই একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। এবং সতর্কতা সত্বেও একটা চাপা নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়া আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "বিয়ে—" আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম "এখনও বিয়ে হয়নি বোন্! তোমার নামটি কি ভাই! জান্‌তে বড় ইচ্ছে হচ্ছে, বল্‌তে কোন বাধা আছে কি?" সলজ্জ কণ্ঠে ঈষৎ হাসিয়া তিনি কহিলেন "না, বাধা কি! আমার নাম সরলা" আপনারা—" "আমরা ব্রাহ্মণ, তোমরাও বোধ হয় তাই,—না?" "হ্যাঁ, আমিও এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করবো মনে কয়ছিলুম, কিন্তু পারনি, আপনার—" আমি একটুখানি হাসিয়া কহিলাম এই পোড়া কপালির নাম শুনে আর কি হবে ভাই! আমার নাম "সুখদা।" কথায় কথায় এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা দুজনেই পরস্পরের নিকট বেশ পরিচিত হইয়া উঠিলাম।

তাহার পরিচয়ে জানা গেল—তাহার স্বামী সিউড়ির একজন খ্যাতনামা উকিল। তাঁহার দুইটি কন্যা এবং একমাত্র পুত্র, কন্যা দুইটিই বিবাহিতা, পুত্রটি এখনও অবিবাহিত। ছেলেটি সবে বি-এ, এগজামিন্ দিয়া বাড়ী আসিয়াছে। তাই তিনিও সিউড়ি হইতে বাড়ী যাইতেছেন। নিতান্ত অসম্ভব হইলেও, কেন বলিতে পারিনা, একটা ক্ষীণ আশা ধীরে ধীরে যেন আমার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। একটু ঘনিষ্ঠতা করিবার অভিলাষে, আমার দুঃখময় জীবনের কাহিনী সব একে একে খুলিয়া বলিলাম। শুনিয়া

সরলা একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সজল নেত্রে কহিল "আহা, কিন্তু এমন সুন্দরী মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা কি ভাই। আমার ম্লানমুখখানা যেন আরও মলিন হইয়া গেল,। কহিলাম "আজ কাল কে আর শুধু রূপ দেখে বিয়ে দেয় বোন্।" হঠাৎ কি মনে করিয়া সরলা কহিল "যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা বল্‌তে সাহস করি।" আমি খপ করে তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলাম "আমি অতি ক্ষুদ্র মানুষ ভাই, আমাকে ওরকম করে কথা কেন বলচ ভাই, তাতে আমি যে লজ্জায় মরে যাচ্চি বোন্। তোমার কথা তুমি স্বচ্ছন্দ্যে বলতে পার।" সরলা লজ্জায় যেন জড় সড় হইয়া পড়িল; এবং সঙ্কুচিত ভাবে কহিল "ছি ছি, ওকি কথা ভাই, আমি তোমার চেয়ে কিসে এত শ্রেষ্ঠ দিদি! আমার কথাটা যদি নিতান্তই অসঙ্গত হয়, তাহলে তুমি ক্ষুণ্ণ হবে না ত ভাই।" আমি এতক্ষণ আপনার বাক্যের মধ্যেই যেন ডুবে গিয়েছিলুম, সরলার কথায় লজ্জিত হইয়া কহিলাম "সে কি কথা ভাই, তুমি একটা কথা বললে আমি ক্ষুণ্ণ হব কেন, ছিঃ সরলা তুমি একথা মনেও করোনা।" সরলা পূর্ব্ববৎ সঙ্কোচের সহিত কহিল "তোমার যদি বাধা না থাকে, তবে তোমার স্নেহের নিলীমাকে, আমায় ভিক্ষা স্বরূপ দিতে পারবে কি ভাই?" একটা অব্যক্ত আনন্দে আমার দুইটি চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, হাসিয়া কহিলাম "এত দয়া—তোমার ভাই।" এমন সময়ে ট্রেন বর্দ্ধমানে আসিয়া থামিল। আমরা তখন আপনার আনন্দে এতই বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, সে বার্ত্তাটা আমাদের একবারেই অজ্ঞাত রহিয়া গেল। হঠাৎ মুখুজ্জে গৃহিণী ডাকিয়া বলিলেন "ও সুখদা, এইবার নাম্‌তে হবে যে মা।" আমি যেন সচকিত হইয়া কহিলাম "এই যে মা, ইনিও এইখানেই নামবেন যে।" প্লাটফরমের বাহিরে বড় বড় দুইটা অশ্ব[illegible]যাতা একখানা ঘরের গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। আমার হাত ধরিয়া সরলা একবারে সেইখানে যাইয়া দাঁড়াইল। একটি চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের ছেলে আসিয়া সহাস্ত মুখে সরলার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইয়া কহিল "আজ ট্রেনটা একটু দেরী হয়েছে, আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছি, ভাবছিলুম তুমি আজ আস্‌তে পারবেনা হয় ত! বাবা ত ঠিক্ সংবাদ কিছু লেখেন নি, রামসিং কই মা?" সরলা পুত্রের মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। আহ্লাদে একমুখ হাসি লইয়া কহিল "না, আস্‌বার জন্যে আমার প্রাণ ছট্‌ফট্ করছিল, তুই এখানে একলা—আমি কি স্থির থাক্‌তে পারি!

শৈল—সরোজ কবে আসবে বল্লে ?" "সব বলছি, এখন এস গাড়ীতে ওঠ।" বলিয়া সে একটু অগ্রসর হইতেছিল, সরলা তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল। এবং একটুখানি হাসিয়া কহিল "তোর শাশুড়ীকে প্রণাম কর ক্ষিতিশ।" আমার দিকে ফিরিয়া কহিল "এইটি আমার ছেলে, দিদি—আশীর্ব্বাদ কর।" ক্ষিতিশ বিস্মিত নেত্রে মাতার মুখের পানে একবার চাহিল। পরে লজ্জায় জড় সড় হইয়া আমার পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়াই দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবার অবসর টুকুও দিলনা।

(৩)

সরলার দয়া এবং মহত্বের কথা আর কি বলিব—আমাকে মেয়ের বিবাহের জন্য এতটুকুও বেগ পাইতে হইল না। সে নিজেই সমস্ত উদ্যোগ করিয়া, দুই তরফা ব্যয় ভার বহন করিল! এবং আমাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া যেন চির-কৃতজ্ঞ-পাশে বাঁধিয়া রাখিল। এত শীঘ্র নিলীমার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আমার অন্তরের দুঃশ্চিন্তার বোঝাটা নামিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাকে শ্বশুর বাড়ী বিদায় করিয়া আমার যেন বাড়ীতে তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠিল।

আজ একমাস হইল তাহাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়াছি। সরলা তাহাকে লইয়া বন্ধু বান্ধবগণকে দেখাইবার জন্য সিউড়ি লইয়া গিয়াছে। আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছে যে, বেয়ানকে ভাবতে নিষেধ করে দিও, আমি ক্ষিতিশকে সঙ্গে দিয়া আপনা হইতেই আবার বৌমাকে পাঠাইয়া দিব। একমাত্র মেয়ে হইলেও তাহাকেও শ্বশুরের ঘর করিতে হইবে ? কাজেই মনকে প্রবোধ দিয়া কোনরূপে দিন কাটাইতে ছিলাম। তবু কিন্তু মন কিছুতেই সুস্থির হইতে চাহে না। সর্ব্বদাই তাহার মুখখানি মনে পড়িয়া মন যেন হু হু করিতে থাকে। রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় না, মাঝে মাঝে ধড় ফড়িয়া বিছানায় উঠিয়া বসি। মনে কি যেন আশঙ্কা জাগিয়া উঠে, গরীবের ঘরে হয়ত তাহারা তাহাদের পুত্রবধূকে পাঠাইতে নারাজ। কোনও সময়ে যদি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ি, অমনি কত কি যে স্বপ্ন দেখিয়া প্রাণটা অস্থির হইয়া পড়ে, ঘুমের ঘোরে বিছানাটা হাতড়াইয়া দেখি, আর—অমনি যেন সে নিদ্রার ঘোর টুকু কাটিয়া যায়। বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠে।

নানা লোক নানা প্রকার কথা রটাইতে সুরু করিয়া দিল। আমি ভাবি

—তা কখনই হতে পারে না, সেই তো তাকে যেচে নিয়েছে। কিন্তু তবু ও মন বোঝে না, গরীবের মেয়ে বলে হয়ত তাকে সকলে হেনস্তা করিবে। সে কি তাহা সহ্য করিতে পারিবে! সে যে আমার বড় অভিমানিনী! তার ভালো করিতে গিয়া হয়ত আমি মন্দই করিয়া বসিলাম কিনা কে জানে! আমার চক্ষু ফাটিয়া যেন জল বাহির হইয়া আসে। প্রাণপণ বলে তাহা রোধ করিতে চেষ্টা করি, পাছে আমার অন্তরের বেদনা লোকে টের পায়। হাসিয়া বলি "তিনি সে রকম লোক নন, আমার নিলু বেশ সুখেই আছে।"

(৪)

তখন ভোরের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রভাতের পাখি-গুলা জাগিয়া উঠিয়া সাড়া দিতে ছিল। স্নিগ্ধ বায়ু ঝির ঝির করিয়া বহিয়া আমার সারা রাত্রির অনিদ্রা জনিত ক্লান্ত দেহটাকে যেন স্নিগ্ধ করিয়া দিতে ছিল। উঠি উঠি করিয়া তখনও উঠিতে পারি নাই। শরীর যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। পাশ ফিরিয়া শয়ন করিবা মাত্র, চক্ষু দুইটাকে যেন টানিয়া আবার জড়াইয়া ধরিতেছিল। আবার কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি মনে নাই। নিদ্রার ঘোর তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই। বাহিরে কাহার বাক্যে যেন আমি চমকিয়া উঠিলাম কে যেন বলিতেছিল— গরীবের মেয়ে, যৌতুক ত কিছু দিতেই পারে নাই, তা ছাড়া যৎসামান্য দান-সামগ্রী দেখিয়া সেখানকার লোক সব ছি ছি করিতেছে। বেয়ানের তেমন যে সরল প্রকৃতি, সেও একবারে তেলে বেগুনে জলিয়া যেন আগুণ হইয়া গিয়াছেন।

অশেষ বাক্য-যন্ত্রণায় দগ্ধ করিয়া নিলীমাকে আবার আমার গৃহে বিদায় করিয়া দিয়াছে। মেয়ের মুখের পানে আমি আর যেন চাহিতে পারিলাম না। দোষত আমারই, যত বড় বিছানা নয় ততটা পদ বিস্তার করিতে যাওয়া যে কত অন্যায় হইয়াছে তাহা মনে মনে বুঝিতে পারিয়া মরমে যেন মরিয়া যাইতে ছিলাম। তবুও মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়া ভাবিলাম—"তা হউক জামাইত ভাল হইয়াছে" মুখুজ্জে গৃহিণী আমার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন—"শাশুড়ী আর কদিন বাছা, তার পরে তোর মেয়েরই ত সব।" আমিও এই সান্ত্বনা বাক্যে সন্তুষ্ট হইতে চেষ্টা করিতে ছিলাম।

কিছুদিন অতীত হইতে না হইতে যেন একটা অকস্মাৎ বজ্রপাতের মতই সংবাদ আসিল, জামাই পীড়িত। শাশুড়ী বধূকে লইয়া যাইবার জন্য লোক

পাঠাইলেন। আমি আশীর্ব্বাদ করিয়া মেয়েকে বিদায় দিয়া চোখের জল মুছিয়া গৃহে ফিরিলাম।

সিউড়িতে আমার এক দূর সম্পর্কের ভগিনীর বাড়ী। নিলীমাকে বিদায় দিয়া কোনওরূপে দিন কাটাইতে ছিলাম। হঠাৎ আমার ভগিনী একটা স্ত্রীলোক পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন—যদি মেয়েকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে ত শীঘ্র এস। শুনিবা মাত্র আমি যেন জীবন-মৃত প্রায় হইয়া তাহার সহিত যাত্রা করিলাম। এই দুঃসংবাদটা মুখজ্জে গৃহিণীকে পর্য্যন্ত দিবার অবসর পাইলাম না।

দিগ্‌বিদিগ জ্ঞান শূন্য হইয়া যখন আমি সিউড়িতে প্রবেশ করিলাম—তখন প্রায় সব শেষ হইয়া গিয়াছে। মেয়েকে একটা ভগ্নপ্রায় মন্দিরের ভিতর পড়িয়া অর্দ্ধদগ্ধ মৃতপ্রায় দেখিয়া আমি আর চোখের জল রাখিতে পারিলাম না। দুই চক্ষু হইতে যেন প্রস্রবণের ন্যায় জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কি করুণ দৃশ্য! কি ভীতিকর ঘটনা। দুই বাহুর স্নেহ নিবিড় বেষ্টনে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে বাহ্যজ্ঞান শূন্যার ন্যায় ডাকিলাম "নিলু, ও নিলু, মা আমার।" এমন সময়ে কে যেন পশ্চাতে ডাকিল—"মা, ওমা, ওঠ গো, আমি এসেছি।" ধড় মড়িয়া উঠিয়া ভীত-চকিত নেত্রে তাহার মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। মনে মনে দশবার মধুসূদন নাম জপ করিয়া আবার তাহার মুখের পানে ভালো করিয়া চাহিলাম। আমার নিলীমার মুখখানিতে শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ মধুর হাসি দেখিয়া প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল, বলিলাম দুর্গা দুর্গা, এমন স্বপ্নও মানুষে দেখে।" ব্যাগ্রতার কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম" নিলু, ক্ষিতিশ এসেছেরে?" নিলিমা সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িল। সসব্যস্তে উঠিয়া মেয়ে জামাইয়ের অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিয়া গেলাম। আনন্দে আমার সমস্ত প্রাণটা যেন পূর্ণ হইয়া গেল। সরলাব এই অযাচিত দয়ার জন্য তাহাকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম।

ঘোমটা আঁটা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(লেখক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাস্তায় আসিতে আসিতে গোকুল গৌরচরণকে জিজ্ঞাসা করিল, "মশাই এই মেয়েটীর বয়স কত ?"

গৌরচরণ আপন মনে রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, সহসা গোকুলের এই প্রশ্নে ঈষৎ ফিরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিল. "বয়স ঠিক যে কত তা কেমন করে বলবো বলুন, তবে বয়স নিতান্ত অল্প নয় সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। নিতান্ত বালিকা না হ'লেও বালিকা বটে।"

গোকুল একটা বিস্মিতির দৃষ্টি লইয়া গৌরচরণের মুখের দিকে চাহিল, মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি রকম ? নিতান্ত বালিকা না হ'লেও বালিকা বটে, এর অর্থ কি ?"

গৌরচরণ উত্তর দিল, "এর অর্থ যে মেয়েটী নিতান্ত শিশু নয়, বালিকা বটে। আমাদের দেশে যখন মেদের বিয়ে হয়, তখন তাদের তো বালিকা বলা চলে না, শিশু বলাই উচিত। দশ বৎসর বয়সের মেয়েকে বালিকা বলা যাবে কোন হিসাবে বলুন। তারা তখন জানেই বা কি, বোঝেই বা কতটুকু।"

গৌরচরণের কথায় গোকুল একটু মৃদু বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া বলিল, "ও ! তাহ'লে দেখছি আপনি হিন্দু বিবাহেরও পক্ষপাতী নন।"

গৌরচরণ একেবারে স্পষ্ট উত্তর দিল, "আজ্ঞে হাঁ, কতকটা সেই রকমের বটে।"

গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "কারণ ?"

গৌরচরণ বেশ পরিষ্কারভাবে জবাব দিলেন, "কারণ হচ্ছে কি জানেন ? গাছ একটু বড় না হ'লে তা থেকে যদি কলম নেওয়া যায়, তাহ'লে তাতে কি হয় জানেন, তাতে গাছটাও বাঁচে না—কলমও জন্মায় না। নিজে দাঁড়াতে না পারলে আর এক জনকে কি দাঁড় করান সম্ভব ? সেই রকম, যে মেয়ে

বিয়ে কি জানে না—বোঝে না, সে কি কোন দিন বিয়ের ক'রে অন্ত জনকে সন্তুষ্ট কত্তে পারে? এর উত্তর স্পষ্টই পড়ে আছে না?"

শারীরিক মানসিক ও সামাজিক হিসাবে বাল্য বিবাহ যে কত মঙ্গলজনক তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য গোকুল রুখিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার মুখের কথা ঠোঁটেই রহিয়া গেল, রাস্তার ধারেই একটা বাটীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গৌরচরণ বলিল, "এই বাড়ীখানায় সুদর্শন বাবুর কন্যা বাস করেন।"

গৌরচরণের কথা কয়টা কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র গোকুলের দৃষ্টি সেই বাড়ীখানার উপর পতিত হইল। সে আর কোন কথা কহিল না, গৌরচরণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। বাটীতে প্রবেশ করিয়া গোকুল দেখিল বাড়ীখানি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ সুসজ্জিত। সম্মুখে একটু ক্ষুদ্র ফুলের বাগান। তাহাতে নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের গাছ। সেই বাগানের সম্মুখেই লাল গরনেটিং-করা উচ্চ ফ্লোরের উপর সারি সারি কয়েকখানি ঘর। সেই ক্ষুদ্র বাগান পার হইয়া গোকুল গৌরচরণ বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। তাহারা বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় একজন উড়ে বেহারা কি কাজে বাটীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল, বেহারাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া গৌরচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কান্ত বাবু কি চলে গেছেন?"

বেহারা মাথা নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে না, তিনি দিদি বাবুকে পাঠ দিচ্ছেন।"

গৌরচরণ বলিল, "তাঁকে গিয়ে খবর দাও, গৌরচরণ এসেছে।"

বেহারা ভিতরে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল। গৌরচরণ গোকুলের দিকে ফিরিয়া বলিল, "গোকুল বাবু আমার কথাটা যথার্থ কি না, এখনি তার স্বরূপ প্রমাণ পাবেন। আমাদের এখন সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হয়েছে, যার যতটুকু ক্ষমতা মেয়েদের লেখা পড়া শেখান। আমাদের দেশের মেয়েরা যেদিন লেখাপড়া শিখে শিক্ষিতা হবে, সেদিন দেখবেন আমাদের অনেক অভাব ঘুচে যাবে।"

গোকুল এতক্ষণ বাড়ীটার বিলাতী সাজসজ্জা, বেহারাটার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া ঘৃণায় ভিতরে ভিতরে সংকুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে গৌরচরণ বাবুর কথার উত্তরে অতি মৃদু স্বরে বলিল, "ও বিষয়ে যখন আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, তখন ও বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার আলোচনা

না হওয়াই ভাল। আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষিতা হ'লে এটা নিশ্চয় জানবেন আমাদের কোন অভাব, কোন অশান্তি কমবে না ; বরং অভাব ও অশান্তি বেড়েই যাবে। আমাদের দেশের মেয়েরা আবার যদি কোন দিন আমাদের দেশের মেয়ের মতন হ'তে পারে তবেই আমাদের আবার শান্তি, আবার সুখ ফিরে আসবে—নচেৎ নহে। বিলাতী হাওয়া এক্ষণে আমাদের দেশের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, মেয়ে পুরুষ সকলাই এখন সেই হাওয়ার তালে তালে সংঙের মত নাচতে আরম্ভ করেছে। সকলই সং সেজেছে,কাজেই কেউ কারুর দিকে চেয়ে দেখে না, নইলে দেখতে পেত এই বিলাতী শিক্ষায় আমরা মানুষ হচ্ছি না, এক একটী বাঁদর হচ্ছি। সে উদারতা, সে মহাপ্রাণতা আর আমাদের নেই। যাক্ এ আলোচনা আমি আপনার সঙ্গে কত্তে একেবারেই নারাজ। আপনি যা বুঝেছেন সেটা যে সম্পূর্ণ ভুল, এক দিন না এক দিন সেটা আপনাকে স্বীকার কত্তেই হবে।"

গৌরচরণ বাবু গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, "গোকুল বাবু আপনার কথার কোন যুক্তি নেই। একজন মাতালকে যদি বলা যায়, তুমি মদ খেও না, মদ খাওয়া শুধু পাপ নয়, শরীরেব পক্ষেও বিশেষ হানিকর, তার উত্তরে সে যদি উত্তর দেয় "তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাইনি, তুমি জারি জান, যখন আমার বাবা খেয়েছে, যখন আমার ঠাকুর দাদা খেয়েছে তখন আমিও নিশ্চয়ই খাব। তখন সে কথার আর কোন উত্তর নেই। আমাদের দেশের মেয়েরা এখন আর সাবেক কালের মেয়েদের মত আর কিছুতেই হতে পারে না। দেশের উপর দিয়ে এখন নানা রকম হাওয়া বইছে। আপনি তাতে বাধা দিলে সে বাধা টিকবে কেন ? সে বাধার তো কোন মূল্য হবে না।"

গোকুল বজ্র-গম্ভীর স্বরে প্রতিবাদ করিল, ঝড় উঠেছে, নৌকা ডুববেই ; কাজেই আর হাল চেপে ধরবার প্রয়োজন নেই। এই উপায় কি একটা যুক্তি, না এটা একটা কথা ! ঝড় উঠেছে বলেই হাল চেপে ধরতে হবে ; নৌকা যাতে না ডোবে প্রাণপণ শক্তিতে তার চেষ্টা কত্তে হবে। সেইটাই হ'ল মনুষ্যত্ব। আমি তো পূর্ব্বেই বলেছি, এ কথার আলোচনা কর্ত্তে আমি আপনার সঙ্গে একেবারেই নারাজ।"

গৌরচরণ বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সে স্বতন্ত্র কথা, তবে—"

গৌরচরণ বাবু কথা আর শেষ করিতে পারিল না। বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল, "আসুন বাবু, আপনাদের ভেতরে ডাকছেন।"

বেহারা অগ্রে অগ্রে চলিল, গৌরচরণ ও গোকুল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইল। কয়েকটা গেট পার হইয়া তাহারা একটা বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই বারান্দার উপর দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই বেহারা একটা গৃহের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আসুন, বাবু এই ঘরের ভিতর আছেন।

গৌরচরণ বিনা দ্বিধায় সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল, গোকুলের সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে কেমন যেন একটু দ্বিধা বোধ হইল, কিন্তু সে অতি ক্ষণিকের জন্য, সে ভাবটা প্রাণের ভিতর দমন করিয়া নিজেকে বেশ একটু গম্ভীর করিয়া লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।

গৃহখানি অতি পরিপাটীভাবে সজ্জিত, তবে বাঙ্গালী বড়লোকদিগের গৃহের মতন জাবড়জঙ্গ নহে। যেখানে যেখানে ছবির দোকানের মত দেওয়ালের চারিদিকে রাশিকৃত ছবি আঁটা নহে। প্রাচীর গাত্রে ছবি আছে বটে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য কয়েক খানি মাত্র। গৃহের মধ্যস্থলে একখানি টেবিল, টেবিলের চারি পার্শ্বে কয়েকখানি চেয়ার, গৃহের প্রাচীরের ধারে ধারে কয়েকখানি গদি আঁটা সোফা। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্রই একটা জিনিষের উপর সর্ব্বাগ্রেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ খানি একখানি অয়েল পেণ্টিং। গৃহের দরজার ঠিক সম্মুখেই প্রাচীরের উপর টাঙ্গান রহিয়াছে। অয়েল পেণ্টিংটীর উপর একজন তেজবান পুরুষের মূর্ত্তি অঙ্কিত। মূর্ত্তিটী দেখিবামাই মনে হয়, ইহা কোন সাধু পুরুষের মূর্ত্তি। পরিধান গৈরিক আলখাল্লা। গোকুল গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্রই তাহার দৃষ্টি সেই অয়েল পেণ্টিংটীর উপর পতিত হইয়াছিল; সে এক দৃষ্টে সেই অয়েল পেণ্টিং-টীর দিকে চাহিয়া ছিল। সহসা গৌরচরণের স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় তাহার দৃষ্টি গৃহের ভিতর ছড়াইয়া পড়িল। গৌরচরণ একখানা চেয়ার গোকুলের দিকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "বসুন গোকুল বাবু—ইনিই হ'লেন আমার মামা বাবু।"

গোকুলের দৃষ্টি গৃহের ভিতর ছড়াইয়া পড়িবা মাত্রই টেবিলের সম্মুখস্থ চেয়ারে উপবিষ্ট একটী বৃদ্ধকে দেখিয়াছিল,—গৌরচরণের কথায় সে তাড়াতাড়ি তাঁহার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে একটী নমস্কার করিয়া চেয়ারখানা নিজের দিকে একটু টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহাতে উপবেশন করিল। গৌরচরণ তাঁহার মামার দিকে ফিরিয়া বলিল, "মামাবাবু,—এই ভদ্রলোকটী সুদর্শন বাবুর মেয়ের সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে এসেছেন। এর বিশ্বাস

যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখ্‌লেই অধঃপাতে যায়। মেয়েরা লেখাপড়া শিখ্‌ছে বলেই নাকি আজ আমাদের দেশের এত অধঃপতন,—এত অশান্তি।"

গৌরচরণের কথায় বৃদ্ধ একটু মৃদু হাসিয়া গোকুলের দিকে চাহিলেন,—গোকুল এতক্ষণ যেন একটু তীব্র দৃষ্টিতেই বৃদ্ধকে লক্ষ্য করিতে ছিল, বৃদ্ধের বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে,—মাথার সমস্ত চুলগুলিই সাদা। দাড়ী গোঁপ কামান, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। মুখের উপর যেন একটু গাম্ভীর্য্য মাখান। শ্রীকান্তবাবু মৃদু হাসিয়া গোকুলকে কি একটা বলিতে যাইতে ছিলেন কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই,—গৌরচরণ আবার বলিল, "মামাবাবু আমি গোকুলবাবুর সেই বিশ্বাসটা ভাঙাবার জন্যেই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। অমিয়াকে দেখ্‌লেই ইনি বুঝতে পারবেন,—লেখাপড়া না শিখ্‌লে কোন স্ত্রীলোক যথার্থ নারী নামের যোগ্য হয় না। যে মেয়েই হক্‌,—যেই পুরুষই হক্‌, লেখাপড়া শিখে যদি তার একজনের না বিবাহ হয়—তাহ'লে সে কোন দিনই মানুষ হ'তে পারে না।"

"শুধু লেখাপড়া শিখলেই জ্ঞানের বিকাশ হয় না" আর একটু হইলেই অতি তীব্রস্বরে গোকুলের কণ্ঠ হইতে এই কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল আর কি,—কিন্তু গোকুল ঢোক গিলিল। এই বৃদ্ধের সম্মুখে উগ্রভাবে কথা কওয়া কিংবা তর্ক করা নিতান্তই অশিষ্টাচার ভাবিয়া গোকুল নিজেকে সংযত করিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ শ্রীকান্তবাবু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "উনি যা ধারণা করেছেন সেটা যে একেবারে ভিত্তিহীন, একথা বলা যায় না। শিক্ষার জন্যেই যে এরূপ হয়েছে এমন নয়, আমদের স্ত্রী শিক্ষার অনেক দোষ আছে,—সেই দোষ গুলোর সংশোধন হওয়া প্রয়োজন,—একেবারে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, এটা কোন যুক্তিরই কথা নয়। আমাদের দেশের মেয়েরা একেবারেই গেরস্থ, শিক্ষা কিছুই পায় না,—কাজেই সংসারের কাজে তারা যশঃ পায় না,—তা না পাবার কারণই হচ্ছে শিক্ষার অভাব। আমার মনে হয়, আমাদের এমন কোন বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন, যেখানে মেয়েরা রীতিমত গৃহস্থালী শিক্ষা কর্ত্তে পারে। যতদিন না তা হচ্ছে, ততদিন একটু গোলযোগ হইবেই। কিন্তু প্রকৃতির এমনি নিয়ম, যখনই যে জিনিষটার অভাব হয় তখনই সে জিনিষটা আপনা হতেই গড়ে ওঠে। কারুর তা কর্ত্তে হয় না।"

গোকুল, বৃদ্ধ নীরব হইবার অপেক্ষা করিতেছিল। শ্রীকান্তবাবু নীরব হইবা মাত্র,—সে স্বরটাকে যতদূর সম্ভব কোমল করিয়া বলিল, "আপনি যা

বল্লেন যে কথাটা যদি মেনে নিতে হয়, তবে আমার জিজ্ঞাস্য এই, পূর্ব্বে তো এই গেরস্থালী শেখাবার জন্য কোন স্কুল বা ইনিস্‌টিটুউসন ছিল না। তখনকার মেয়েরা সে সব শিখতো কোথা থেকে। আজকাল হয়েছে কি জানেন,—কিছু হক্ আর নাই হক্, বাইরে খুব একটা হৈ চৈ করা চাই। মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে, তা আর ঘরে চলে না—একটা স্কুল কর,—একটা ইনিস্‌-টিউসন কর—হৈ চৈ ব্যাপার। আজকাল সব বিষয়েই বাহিরের চটকটাই বেশী। একটু বিশেষ ভাবে দেখ্‌লেই বুঝতে পার্ব্বেন,—আমাদের দেশের মেয়েদেরও তাই হয়েছে,—ভেতরে কিছু থাক্ আর নাই থাক্, বাহিরের চটকটা খুবই বেড়েছে।"

শ্রীকান্তবাবু বিশেষ মনোযোগের সহিত গোকুলের কথা গুলা শুনিতেছিলেন, গোকুল নীরব হইলে, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়াটা যে বিশেষ দোষের তা আমি মনে করি না। আপনি যেটাকে চটক বলছেন সেটা ঠিক চটক নয়, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। আজ কালকার মেয়েরা আগেকার মেয়েদের চেয়ে একটু লেখাপড়া শিখছে, কাজেই তারা নিজেকে একটু ভাল ভাবেই আচ্ছাদিত করে রাখতে চায়। আমাদের দেশে বেশের অভাব। কাজেই সেমিজ টেমিজ এটে না থাক্‌লে সভ্যতা বজায় থাকে না, এটা যে ঠিক দোষের, তা আমি বলতে পারিনি। আর গেরস্থালী শেখবার জন্য স্কুলের কথা যা বল্লুম, তার কারণ কি হচ্ছে জানেন, আগেকার মেয়েরা তার মার নিকট দেখে সব শিখতো, কিন্তু এখনকার মায়রাই অশিক্ষিত, তাদেরই শেখা দরকার, কাজেই তাদের মেয়েরা শিখবে কোথা থেকে।"

গৌরবরণ তাহার মামার কথাটায় জোর দিবার জন্য কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল ঠিক সেই সময়েই অমিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখের দিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া শ্রীকান্তবাবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা-বাবু আজ দু'দিন বাবার কোন চিঠি পাইনি,—আপনি কি তাঁর কোন চিঠি পেয়েছেন?"

সে স্বর গোকুলের কর্ণে যেন কেমন একটু নূতন ঠেকিল,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃষ্টি অমিয়ার উপর পতিত হইল। অমিয়ার দেহটা বেষ্টন করিয়া সৌন্দর্য্যের যত সুষমা ঝরিয়া পড়িতেছিল। বিধিদত্ত পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে তাহার মুখখানি ঝক্‌মক্ করিতেছে। তাহার বেশভূষা সকলই গোকুলের চক্ষে নূতন

ঠেকিল। বাঙ্গালী গৃহের এরূপ বয়স্থা কন্যা, এরূপ বিনা দ্বিধায় অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ানটা গোকুল একেবারেই পছন্দ করিতে পারিল না; সে যেন একটু আগ্রহ ভরে এই কিশোরীর আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোকুল এক দৃষ্টে সেই কিশোরীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল,—এটা যে ভদ্রতা বিরুদ্ধ সেটুকু সে বিস্মৃত হইয়াছিল। এই বালিকার বয়স কত,—ইহার বিবাহ হইয়াছে কিনা, এই সকল বিষয় জানিবার জন্য এমন একটা কৌতুহল সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল, যে সে কিছুতেই সেই কিশোরীর দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল এই বালিকাকে তো বিবাহিতা বলিয়া বোধ হয় না। তবে কি বালিকা অবিবাহিতা,—হিন্দু কন্যা এত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রহিয়াছে,—এটা যেন গোকুলের চক্ষে কেমন বিসদৃশ ঠেকিতে লাগিল। সমাজে থাকিব অথচ সমাজের আচার ব্যবহার মানিব না,—একি মহাত্মার কথা। সুদর্শনবাবু হিন্দু, অথচ তিনি হিন্দুর কোনই আচার মানেন না,—কন্যাকে বিলাতী প্রথায় শিক্ষিত করিতেছেন,—কন্যার বিবাহ বয়স পার হইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার বিবাহ দিবার কোন চেষ্টাই নাই! একি অনাচার,—এ অনাচার কোনও হিন্দুরই সহ্য করা উচিত নয়। যিনি সমাজে থাকিয়া সমাজের শৃঙ্খলতা নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন তাহাকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত। সে সমাজের যত সুখগুলি ভোগ করিবে, অথচ অসুবিধার একটা আঁচড়ও সহ্য করিবে না, ইহা হইতেই পারে না। এই সকল যত দিন সমাজে থাকিয়া সমাজের উপর এই সকল অনাচার করিবে, ততদিন হিন্দু সমাজের মঙ্গল নাই,—উন্নতি নাই,—আশা নাই। অমিয়ার সর্ব্বাঙ্গে নিখুঁত রূপের অভাব ছিল না,—কিন্তু গোকুলের চক্ষে তাহা একেবারেই সুন্দর ঠেকিল না। তাহার মনে হইল অমিয়ার সমস্ত রূপ যেন একটা বিলাতী কালিতে ঢাকিয়া দিয়াছে। তাহাতে আছে সব সুধু নাই সেইটুকু, যেটুকু হিন্দুর গৌরব—আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী। সরলতা—কোমলতা—পবিত্রতা। সে আর নীরবে মুখ বুজিয়া শত সহস্র যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সংসারের পথে অগ্রসর হইবে না। প্রশ্ন করিবে, সহ্য করিবে না। বিধাতা পৃথিবীতে রমণী ও পুরুষকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। একজনের প্রতিভা বহির্ম্মুখ অপরের প্রতিভা ভিতরমুখ। কাজেই

একজনের কাজ ভিতরে, অপরের কাজ বাহিরে। একজন ফুলের মত ফুটিয়া নীরব গন্ধে চারিদিক মাতাইয়া নীরবে আপন কার্য্য সারিয়া যাইবে; অপরে ঝঞ্ঝার তম ফুল ফল ছিড়িবে,—মাটীতে দলিবে সন্‌সন্‌ শব্দে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন জিনিষ সৃষ্টি করিয়া ওলট পালট করিয়া দিবে। তবেই না পৃথিবীতে সামঞ্জস্য থাকিবে,—তবেই না সংসারে শান্তি থাকিবে। দুইটী বিভিন্ন জিনিসের গতি ও কার্য্য যদি এক হয়, তবে সংসারে শান্তি থাকিবে না—পৃথিবী এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইতে পারে না। রমণীর—রমণী হওয়াই প্রয়োজন, পুরুষের—পুরুষই হওয়া উচিত। পুরুষ যদি রমণী হয়, তাহা হইলে যেমন তাহার ছায়াতেও পৃথিবীর অনিষ্ট ছাড়া ইষ্ট হয় না; সেইরূপ রমণী যদি পুরুষ হয়, তাহা হইলেও তাহার দ্বারা আমাদের সংসারের অনিষ্ট ছাড়া ইষ্ট হইতে পারে না। গোকুল এক দৃষ্টে অমিয়ার দিকে চাহিয়া এই সকল কথাই আলোচনা করিতেছিল,—সহসা অমিয়ার মধুর স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় তাহার চমক ভাঙ্গিল। অপরিচিতা রমণীর দিকে এরূপভাবে চাহিয়া থাকা অনুচিত ভাবিয়া সে দৃষ্টি নত করিল। অমিয়া তখন শ্রীকান্তবাবুর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মধুর স্বরে পুনরায় বলিল। "কাকাবাবু আজ ক'দিন থেকে বাবার কোন খবর পাচ্ছিনি কেন? তাঁর শেষ পত্রে তিনি লিখেছিলেন, তাঁর শরীর নিতান্তই অসুস্থ, কই তারপর তো কোন খবর এলো না। তাঁর অসুখ বাড়ে নিতো?"

অমিয়ার কথায় সুদর্শন বাবুর ভাবটা একটু গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি মৃদুস্বরে তাহার কথার উত্তর দিলেন, "সুদর্শনের চিঠি পত্র আমিও আজ ক'দিন পাইনি। তার জন্যে আমারও মনটা বড় অস্থির হয়েছে আজকে একখানা টেলিগ্রাফ কর্ব্বো? সুদর্শনের ওই কেমন স্বভাব অসুখ বিসুখ হ'লে আর বড় একটা কাউকে খবর দিতে চায় না। সে মনে করে, খবর দিয়ে মিছে লোককে ভাবাই কেন, কিন্তু তাহাকে এত দিনেও এটা কিছুতেই বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারি নি যে খবর না দিলেও ভাবনা বড় কম হয় না।"

অমিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ কাকা বাবু, আপনি আজই একখানা টেলিগ্রাফ করে দিন। আমার মন যেন বল্‌ছে বাবা অসুস্থ।"

শ্রীকান্ত বাবু বলিলেন, "মা সে জন্যে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি আজই তোমার বাবাকে টেলিগ্রাফ কর্ব্বো। আমি এখনি একটু কাজে বেরুচ্ছি,—অমনি টেলিগ্রাফ করে দেব'খন।"

তাহার পর শ্রীকান্ত বাবু গোকুলকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি তোমার সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে এসেছেন, ইনি—রামরতন বসুর দৌহিত্র, এর পিতা নীলরতন মিত্র। নীলরতনের সঙ্গে আমরা এক কলেজে পড়েছিলুম, তোমার বাবার সঙ্গে নীলরতনের খুব ঘনিষ্ঠতা আছে।"

শ্রীকান্ত বাবুর কথায় অমিয়ার দৃষ্টি গোকুলের উপর পতিত হইল। গৃহে প্রবেশ করিয়াই সে একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে যে দেখে নাই—তাহা নহে। শ্রীকান্ত বাবুর কথায় তাহার দৃষ্টিটা একটু বেশী করিয়া গোকুলের প্রতি আকৃষ্ট হইল। সে গোকুলের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিয়া তাহার ঘাড়টা একটু নত করিয়া তাহাকে একটা ছোট নমস্কার করিল। শ্রীকান্ত বাবুর কথায় গোকুলের দৃষ্টিও অমিয়ার উপর পড়িয়াছিল, অমিয়াকে নমস্কার করিতে দেখিয়া বাধ্য হইয়া তাহাকেও প্রতি নমস্কার করিতে হইল, কিন্তু কিশোরীর নমস্কারটা কেমন যেন তাহার স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল না। অমিয়ার হাসিটুকু হইতে নমস্কারের ভঙ্গিমা পর্য্যন্ত যেন কেমন শেখা শেখা জিনিষ বলিয়া তাহার মনে হইল। ইহার ভিতরেও যেন কেমন একটা বিদেশীয় গন্ধ অনুভব করিল। অমিয়া গোকুলকে সম্মানিত করিয়া বলিল, "আপনি যে আমার সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে এসেছেন, এই আমার কম সৌভাগ্য নয়। মানুষ মানুষের বাড়ী আসার চেয়ে মানুষের আর বেশী কিছু সৌভাগ্য হতে পারে না।"

গোকুলও মহা বিনয় সহকারে উত্তর দিতে যাইতেছিল কিন্তু গৌরচরণ তাড়াতাড়ি বলিল, "অমিয়া, গোকুল বাবুকে আমিই তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। গোকুল বাবুর বিশ্বাস, বাঙ্গালীর মেয়ে লেখা পড়া শিখেই অধঃপাতেই গিয়েছে। আজকাল যে, গৃহে গৃহে এত অশান্তি, এত হাহাকার তার কারণ হচ্ছে মেয়েদের লেখাপড়া শেখান। এর বিশ্বাস আগেকার মত বাঙ্গালীর মেয়েরা যদি মুখ্যু হয়ে থাকতো, তাহ'লে এত বিশৃঙ্খলতা আসতো না। এত বড় একটা ভুল ধারণা মনে পোষণ করা কিছুতেই উচিত নয়, সেই ভুলটুকু ভাঙ্গিয়ে দেবার জন্যই আমি ওকে তোমার সঙ্গে আলাপ করে দিতে এসেছি। আমার বিশ্বাস তোমার সঙ্গে গোকুলবাবু দু'চারটে কথা কইলেই ওর ওই ভুল ধারণাটা ঘুচে যাবে।"

গৌরচরণের কথায় অমিয়া একটু মৃদু হাসিল, গোকুলের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিল, "আপনার কি সত্যই এই ধারণা যে মেয়ে মানুষ

লেখাপড়া শিখ্‌লেই অধঃপাতে যায়! সত্যিই যদি আপনার এ ধারণা থাকে তাহ'লে সে ধারণা আপনার একেবারেই ভুল। লেখাপড়া শিখলে জড়ও মানুষ হ'তে পারে যখন, তখন মানুষের কখনও কি অধঃপতন হতে পারে? না—না তা কখন হতে পারে না। আপনার যদি সত্যিই সেই ধারণা হয় তবে আপনার সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।"

গোকুল আনত মস্তকে বসিয়া অমিয়ার কথাগুলা শুনিতেছিল। সে একবার অমিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া অতি বিস্ময় সহকারে উত্তর দিল, "আমার ধারণা ঠিকই ধারণা। এ আমার মস্তিষ্কের কল্পনা কিম্বা আজগুবি গল্প নয়, এ বিষয়টা একেবারে খাঁটী বাস্তব জিনিষ। ভুরি ভুরি তার প্রমাণ দেওয়া যায়। আমার ঠাকুরমা ঘোর মুখ্যু ছিলেন, অক্ষর চিন্‌তেন না, তাঁর ভেতর আমরা যে জিনিষ দেখেছি, আমার মা একটু আধটু লিখতে পড়তে জান্‌তেন, তাঁর ভেতর সে জিনিষটি পাইনি। যেদিন হইতে আমাদের দেশের মেয়েরা লেখাপড়া শিখ্‌তে আরম্ভ করছে—সেইদিন থেকেই তারা সংসারের কাজে অপটু হয়ে পড়ছে, বিলাসিতা বাড়ছে; আজকাল বাড়ীর রাঁধুনীর যদি একদিন অসুখ হয়, অমনি সবার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সংসারে হয়তো অনেকগুলি স্ত্রীলোক বিরাজ কচ্ছেন, তথাপি হাড়ী চড়ে না। এর চেয়ে আর লজ্জার দুঃখের কথা কি হতে পারে?"

অমিয়া গোকুলকে কথাটা শেষ করিতে দিল না, বাধা দিয়া বলিল, "সত্যিই তার চেয়ে লজ্জার দুঃখের কথা কিছু হ'তে পারে না, কিন্তু তার সঙ্গে লেখাপড়ার শেখার কোন সম্পর্ক নেই। দেশের মেয়েদের বিলাসিতা বেড়েছে, তারা সংসারের কাজে একেবারেই অপটু হয়ে পড়েছে। আপনার কথা যথার্থ স্বীকার ক'রে নিলুম, কিন্তু সে অপরাধ মেয়েদের নয়, সে অপরাধ লেখা পড়া শেখার নয়, সে অপরাধ আপনাদের। দেশের পুরুষদের অধঃপতন হয়েছে বলেই দেশের মেয়েদের এত অধঃপতন। আপনার কথা মত জিজ্ঞাসা করি, আপনার ঠাকুরদাদার ভিতরে যে সমস্ত গুণ ছিল, আপনার ভেতরে সে সব গুণ যে আছে,—আমার বিশ্বাস হয় না। ঝড়ে যখন গাছ পড়ে, তখন তার ডাল পালা সবশুদ্ধ নিয়েই পড়ে। জাতির অবনতি হয়েছে, কাজেই মেয়ে পুরুষ আমাদের সকলেরই অধঃপতন হচ্ছে। যদি এ জাতিকে আবার তুলতে হয়, তবে শিক্ষাই হ'ল এর একমাত্র উপায়। শিক্ষা ব্যতীত কোনও জাতি, কোন দিন উঠ্‌তে পারে নি। এ অবস্থায় এখন যদি মেয়েদের মুখ্যু করে রাখা

হয়, মাটীর পুতুলের মত যদি তাদের উঠাতে হয়, বসাতে হয়, তাহ'লে আর কোন আশা নেই। আমাদের মেয়েরা যদি লেখাপড়া শিখে, সকলেই শিক্ষিতা হ'তে পারে, তাহ'লে দেখবেন আমাদের দেশের পুরুষরা আর এ পুরুষ থাক্‌বে না। তাহারা প্রত্যেকেই তখন প্রাণপণ ক'রে উন্নতি করবার চেষ্টা করবে। দেশের উপর দিয়ে একটা নতুন আলো বয়ে যাবে।"

গোকুল এক দৃষ্টে অমিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথাগুলা শুনিতেছিল। বালিকার মুখে এই লম্বা বক্তৃতা তাহার কেমন যেন একটা জ্যাঠামী বলিয়া বোধ হইল। সে বেশ একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "দেখুন, আমি চাই দেশের মেয়ে ঠিক আমাদের দেশের মেয়েদের মতনই হউক। পৃথিবীর অন্ত আর কোন জাতির কোন স্ত্রীলোকই আমাদের বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের মত নয়। হ'তে পারে—তাদের শত সহস্র গুণ থাকতে পারে; কিন্তু বাঙ্গালী রমণীর ভিতর যে একটা কোমলতা আছে, সে কোমলতা জগতের আর কোন জাতির রমণীর ভিতরে নাই। আমি চাই আমাদের মেয়েরা সেই কোমলতায় মণ্ডিত হ'য়ে লজ্জিত-শঙ্কিত চিত্তে পৃথিবীর বুকের উপর দাঁড়াক্। তাদের মুখে স্বর্গের হাসি ভাসুক,—নয়নে লজ্জা লুকোচুরি খেলুক,—ধৈর্য্যে পৃথিবীকেও লজ্জা দিক,—প্রতি ভঙ্গিমায় শত মাধুরী গড়িয়ে পড়ুক। আমি চাই, রমণী রমণী হউক, সে যেন না পুরুষ হয়। কিছু মনে করবেন না, সত্যি কথা শুনুন; লেখাপড়া শিখ্‌লে মেয়েরা ঠিক আপনার মতনই হবে। সব আছে, অথচ কিছুই নেই, সব যেন একটা বিলিতী ধোঁয়ায় ঢেকে রেখেছে। আমি মেয়েদের ঘোমটা আঁটা হয়ে থাকতে বলছিনি, কিন্তু তারা সদরে বক্তৃতা দিক, এ কথাও বল্‌তে পারিনি। লেখাপড়া শেখাটা যখন মেয়েদের কোন প্রয়োজনে আসবে না, আমার মতে তখন সেটা তাদের না শেখাই ভাল। তার চেয়ে সংসারে কিসে শান্তি আসে, কেমন ক'রে শৃঙ্খলায় চলে; সেইগুলোই তাদের শিক্ষা করা দরকার, মেয়েদের যেটা শেখা উচিত, মেয়েরা তাই শিখুক, পুরুষদের যেটা শেখা উচিত, পুরুষরা তাই শিখুক। মেয়েরা যদি পুরুষদের জিনিষ শেখে, আর পুরুষরা যদি মেয়েদের জিনিষ শেখে, তাতে কারুরই উন্নতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই।"

গোকুলের কথার উত্তর দিবার জন্য গৌরচরণ প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, "কিন্তু—"

গৌরচরণের মুখের কথা কেবলমাত্র ঠোঁট হইতে বাহির হইয়াই

থামিয়া গেল। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল বেহারা, তাহার হাতে একটা টেলিগ্রামের খাম। টেলিগ্রাম দেখিলেই বাঙ্গালীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, সকলেরই দৃষ্টি বেহারার হাতের দিকে পতিত হইল। বেহারা ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া টেলিগ্রামখানি শ্রীকান্ত বাবুর হস্তে প্রদান করিল। শ্রীকান্ত বাবু মহা ব্যস্তভাবে টেলিগ্রামটী তাড়াতাড়ি করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। টেলিগ্রাম পড়িতে পড়িতে তাঁহার সমস্ত মুখখানার উপর যেন একটা চিন্তার কালিমা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। অমিয়া বিশুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকাবাবু, কার টেলিগ্রাম?"

শ্রীকান্ত বাবু মহা চিন্তিত স্বরে উত্তর দিলেন, "তোমার বাবার টেলিগ্রাম, তিনি লিখছেন, তাঁর শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। তোমাকে আজই রাত্রের গাড়ীতে আমাকে কাশী নিয়ে যেতে লিখ্ছেন। সুদর্শনের শরীর নিতান্ত খারাপ না হ'লে আর সে এমন টেলিগ্রাম করেনি। আমার বড় ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। আজই রাত্রের গাড়ীতে আমাদের রওনা হ'তে হবে।"

শ্রীকান্ত বাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি গৌরচরণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "গৌর, তোমরা ততক্ষণ গল্প গুজব কর, আমি আমার কাজগুলো সেরে আসি। রাত্রের গাড়ীতেই যখন যেতে হবে, তখন আর দেরী করা উচিত নয়।"

পিতার ব্যাধির কথা শুনিয়া অমিয়ার মুখখানি এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, সে কোন কথা কহিল না। একটা ম্লান দৃষ্টি লইয়া শ্রীকান্ত বাবুর মুখের দিকে চাহিল। শ্রীকান্ত বাবু বলিলেন, "অমিয়া তুমি তাহ'লে যাবার জন্য প্রস্তুত হও, আমি এখনি আসব।"

অমিয়া কোন কথা কহিল না, উত্তর দিল গৌরচরণ, সে তাহার মামার দিকে ফিরিয়া বলিল, "মামা আমরাও তাহ'লে এখন উঠি। অমিয়ার মুখ চোখ দেখিলেই বেশ বুঝতে পারা যায়, এই দুঃসংবাদে তার মনটা নিতান্ত খারাপ হয়ে পড়েছে। এখন তাকে একলা থাকতে দেওয়াই উচিত।"

গোকুল এই মেয়েটার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিবার জন্য তর্কের ঝুলিতে নানাবিধ যুক্তি বোঝাই করিতেছিল, সহসা ব্যাধির সংবাদ আসায় সেও যেন কেমন একটু দমিয়া গিয়াছিল। গৌরচরণের কথাটা শেষ হইবামাত্র সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া

অমিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আপনি যে একেবারে উঠে দাঁড়ালেন ?"

গোকুল যেন গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, "আজ্ঞে এ সময় আপনাকে আর আমি বিরক্ত কত্তে ইচ্ছা করিনে। আপনার পিতা আরোগ্য হ'ন, আপনি ফিরে আসুন, তার পর একদিন এ বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব।"

শ্রীকান্ত বাবু ঘাড়টা নাড়িয়া বলিলেন, "বেশ—ভাল কথা। আজি অমিয়ার মনটা খারাপ, আজ আর কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা না হওয়াই ভাল। কিন্তু আমি কাশী থেকে ফিরে এসে, মাঝে মাঝে এখানে আসতে ভুলবেন না। পরস্পর যে কোনও বিষয়েরই আলোচনা হ'লে অনেক নতুন বিষয় শিক্ষা করা যায়।"

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আসব বই কি, যখন আলাপ হ'ল তখন নিশ্চয়ই আসব।"

অমিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "তাহ'লে নিশ্চয়ই আসবেন, আজ এ বিষয় বিশেষ কোনও কথাই হ'ল না। এর পর একদিন এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।"

গোকুল আর কোন কথা বলিল না, শুধু একটা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া, শ্রীকান্ত বাবু ও অমিয়াকে নমস্কার করিয়া গৌরচরণের সহিত সে বাড়ী পরিত্যাগ করিল। বাটী হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে গোকুলের মনের ভিতর কেমন যেন একটা তাচ্ছল্যভাব আসিতে লাগিল। সে প্রাণপণ শক্তিতে সেটাকে মন হইতে দূর করিবার জন্য ভিতরে ভিতরে রীতিমত লড়াই বাধাইয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

রাজপুত

[শ্রীফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, এল, এল, বি।]

"গুরুজী, আজ আমার জন্মদিন, আজ আমি ষোড়শ বৎসরে পদার্পণ করিলাম, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।"

এক গৌরকান্তি সুন্দর যুবক এক কষায় বস্ত্রধারী, শুভ্রকেশ, প্রসন্ন বদন সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিল, "গুরুদেব, আমায় অশীর্ব্বাদ করুন।"

সন্ন্যাসী সস্নেহে উভয় হস্ত দিয়া যুবকের মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "বৎস, দেবদেব মহাদেব তোমার মঙ্গল করুন।"

যুবক উঠিয়া বসিলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস, যুক্তকর হইয়া বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা কর—'হে শূলপাণি, হে বীরেশ, হে শক্তিনাথ, আমায় ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিবার বল প্রদান কর।"

যুবক বলিল, "হে শূলপাণি, হে বীরেশ, হে শক্তিনাথ, আমায় ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিবার বল প্রদান কর।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "এইবার সদাশিবের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম কর।"

যুবক প্রণাম করিলে, সন্ন্যাসী বলিলেন, "অধর্ম্ম নাশিতে পিনাকপাণি তোমার তরবারি তীক্ষ্ণতর করুন, স্বধর্ম্ম পালন করিতে ভূতনাথ তোমার বাহুবলবত্তর করুন; পার্ব্বতী হৃদয়-বল্লভ তোমার মতি সদা ভগবানে প্রেরণ করুন।"

"বৎস, তুমি ক্ষত্রিয়, রাজপুত। জনকাদি তোমার আদর্শ। এই সংসারের সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয়-পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া, সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া, কামনাশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে। পরাক্রমে ভীমের ন্যায় হইবে, ধর্ম্মে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায়, সত্যপালনে ভীষ্ম পিতামহের ন্যায়, প্রজাপালনে রামচন্দ্রের ন্যায় হইবে। বহু পুণ্যবলে মানব-জন্ম হয়, এবং বহু পুণ্যফলে দুর্ল্লভ রাজপুত জন্ম হয়। প্রভুভক্তিতে, শৌর্য্যে, প্রতিজ্ঞাপালনে, দেশ ভক্তিতে রাজপুত জগতে অতুল। তাহার প্রমাণ—পৃথ্বীরাজ, সংগ্রামসিংহ, সমরসিংহ, প্রতাপসিংহ, জয়মল্ল, পত্তমান্না। তুমি সেই রাজপুত, ইহা সতত স্মরণ রাখিবে।"

"বৎস, তোমায় আমি অনেক পৌরাণিক কথা বলিয়াছি, প্রতাপসিংহ

প্রভৃতি দেবতুল্য রাজপুতদিগের ইতিহাস তুমি আমার নিকট শু
আজ তোমায় আর একটি কাহিনী বলিতেছি, মন দিয়া শুন।

"মোগল বাদশাহ, রাজধানী দিল্লীনগরীতে শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত দরবার গৃহে নানা মণি-মাণিক্য-খচিত স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার চারিদিকে বিবিধ বহুমূল্য বস্ত্র মণ্ডিত অমাত্যবর্গ, সেনাপতি, সৈনিক, অনুচর,—রাজপুত, হিন্দু, মুসলমান।

"সভায় রাজপুতের বীরত্বের কথা উঠিল। বাদশাহ বলিলেন, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে রাজপুত প্রকৃত বীর। আমি অনেকবার শুনিয়াছি যে যুদ্ধকালে কোনও কোনও রাজপুত-বীর স্কন্ধচ্যুত শির হইয়াও তরবারি লইয়া শত্রুবিনাশ করিয়াছে। ইহা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমার এই সভায় এমন কোন রাজপুত কি নাই যে আমার এই জনরবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারে?"

"বাদশাহের এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া রহিল। এক গদাধারী সৈনিক একটি তাম্বুল হস্তে লইয়া সকল সভাসদের নিকট গেল। কে ঐ তাম্বুল লইয়া রাজপুত বীরত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে স্বীকার করিবে, যাহার নিশ্চিত পরিণাম মৃত্যু?

কেহ অগ্রসর হইল না, কেহ দণ্ডায়মান হইল না।

গদাধারী সৈনিক তাম্বুল লইয়া দুইবার সভাসদ শ্রেণীর সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কিন্তু কেহ তাহার তাম্বুল লইতে সাহস করিল না। তবে কি আজ রাজপুত নামে কলঙ্ক পড়িবে?

তৃতীয় বারে পলিতকেশ এক রাজপুত সৈনিক তাম্বুল গ্রহণ করিল।

বাদশাহ বলিলেন, "হে স্বামী। রাজপুত বীর, আজ নহে, একমাস পরে আমার দরবার হইবে, সেইদিন তোমার বীরত্বের পরিচয় লইব।'

একমাস অতিবাহিত হইল। ওমরাও প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া বাদশাহ সভাগৃহে বসিয়াছেন। সেই বৃদ্ধ রাজপুত সৈনিকও আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে তাহার পৌত্র,—তোমার মত ষোড়শ বৎসর বয়স্ক এক যুবক।

বাদশাহ বলিলেন, "কোন্ সাহসী সৈনিক আমায় রাজপুত বীরত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল?"

"বৃদ্ধ রাজপুত সৈনিকের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তাহার পৌত্র ঝটিতি দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "হুজুর, আমি রাজপুত বীরত্বের পরিচয় দিব।"

"এই বলিয়া যুবক বিস্মিত অমাত্য শ্রেণী পার হইয়া, দ্রুত পাদবিক্ষেপে সভাগৃহের মধ্যস্থলে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল।

বাদশাহ বৃদ্ধ রাজপুতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই বালক কি রাজপুত বীরত্বের পরিচয় দিতে পারিবে?"

"বৃদ্ধ রাজপুত উত্তর করিল, 'মহারাজ, আমি রাজপুত, আমার পৌত্রও রাজপুত। রাজপুত যাহা পারে, আমার বালক পৌত্রও তাহা পারিবে। রাজপুত বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, রাজপুত তাহা পালন করিবে। আমি "না" বলিয়া বাধা দিয়া আমার পৌত্রের এবং রাজপুতের বীরত্বে সন্দেহ উৎপাদন করিতে দিতে পারিব না।'

"তখন বাদশাহ এক ভীষণ-দর্শন পাঠানকে যুবকের শিরশ্ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। পাঠানের খড়্গ ঊর্দ্ধে উঠিল—নামিল—এবং যুবকের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হইয়া শ্বেতমর্ম্মরের উপর গড়াইয়া পড়িল।

"অতঃপর এক আশ্চর্য্য ও ভয়াবহ দৃশ্য দেখা গেল। মস্তক শূন্য, রক্তাপ্লুত যুবকের দেহ কাঁপিতে কাঁপিতে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কোষ হইতে অসি নিষ্কাষিত করিয়া এক আঘাতে পাঠানকে দ্বিখণ্ডিত করিল! তৎপরে সেই কবন্ধ অসি চালনা করিতে করিতে আমার শ্রেণীর মধ্য দিয়া টলিতে টলিতে, বাদসাহের সিংহাসনের নিকট যাইয়া, বাদসাহকে বধ করিবার নিমিত্ত তরবারি উত্তোলন করিল!

"সকলে ভয়ে, বিস্ময়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া রহিল। কাহারও যেন নড়িবার শক্তি নাই! কেহই বাদসাহকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া গেল না। বাদসাহ স্বয়ং চলচ্ছক্তিহীন হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাষ্ঠবৎ সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন! সর্ব্বনাশ! বুঝি রাজপুত কবন্ধের হস্তে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য!

"সহসা সেই বৃদ্ধ রাজপুত সৈনিক দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "বৎস, বীর পৌত্র আমার! ক্ষান্ত হও। রাজপুত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছ, নিজ বাক্য পালন করিয়াছ। আর কেন? আমরা বাদসাহের নিমক খাইয়াছি, বাদসাহকে বধ করিও না।"

"ঝণাৎ করিয়া রাজপুত কবন্ধের রক্তলিপ্ত অসি শ্বেতমর্ম্মরের উপর পড়িল, কাঁপিতে কাঁপিতে রাজপুত সিংহাসন তলে লুটাইয়া পড়িল।"

পিতৃঋণ

[শ্রীমতী প্রমীলাবালা মিত্র।]

(১)

আষাঢ়ের অপরাহ্ন। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার করিয়া কৃষ্ণমেঘ আকাশের গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রবল ঝড়ে বৃক্ষকাণ্ড সকল একে একে সশব্দে ভূতলশায়ী হইতেছে। মেঘরাশি ক্রমশঃ ঘনাকার ধারণ করিয়া বর্ষণ আরম্ভ করিল। ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রের একত্র সম্মিলনে প্রকৃতি প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করিল। মাঝে মাঝে চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়া আকাশের এক প্রান্ত হইতে বিদ্যুদ্বিকাশ অপর প্রান্তে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রকৃতির এই প্রলয়কালে বিন্ধ্যপর্ব্বতের তলদেশে একটি যুবতী আসিয়া দাঁড়াইল। যেন একখণ্ড বিজলী স্বর্গচ্যুত হইয়া মর্ত্তধামে পতিত হইয়াছে। যুবতীর সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে সিক্ত হইয়া গিয়াছে। গাত্রের বসন ও পৃষ্ঠের চরণ-চুম্বিত কৃষ্ণ কেশরাশির প্রান্তদেশ হইতে বারিবিন্দুগুলি ঝরিয়া ঝরিয়া মাটিতে পড়িতেছে। যুবতীর হস্তদ্বয় বক্ষঃসংলগ্ন, দৃষ্টি আনত। কিছুক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালনে যুবতী পর্ব্বতের অপর প্রান্তে গিয়া পতিত বৃক্ষকাণ্ড সরাইয়া সরাইয়া যেন কিসের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

এইরূপে রমণী মাথার উপরের উন্মাদিনী প্রকৃতির প্রলয় উপেক্ষা করিয়া পর্ব্বতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ব্যস্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে প্রকৃতি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। সাহস পাইয়া আলোক হস্তে এক পার্ব্বত্য বালা ও তৎপশ্চাতে এক বৃদ্ধ কথোপকথন করিতে করিতে পর্ব্বত সন্নিকটে উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল "কিরে বেটী, বহিনের সন্ধান পেলি?"

কন্যা উদ্বেগ পূর্ণ স্বরে উত্তর করিল "না বাবুজি! বহিন্ আমার আজ বুঝি মরেছে! এত জোর বাতাস, এত বর্ষা, এত বজ্রপাত, সে কি আর বেঁচে আছে? আমি নিশ্চয় জানি, সে মরেছে; তবুও তার দেহটা নিয়ে গিয়ে নদীতে দেব বলেই এত সন্ধান কর্‌ছি।" বলিয়া যুবতী চলিল। বৃদ্ধও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

সহসা দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ বলিল,—"শ্যামলী, বহিনের নাম ধরে একটা ডাক দে দেখি।"

শ্যামলী ডাকিল, "প্রীতি! ও বহিন্" চরণ দলিত সিক্ত পত্রের শব্দ হইল। রূপে পৃথিবী ঝলসাইয়া যুবতী হাস্যমুখে আসিয়া শ্যামলী ও বৃদ্ধের সম্মুখে দাঁড়াইল! শ্যামলী দুই পদ পিছাইয়া গিয়া বলিল, "ও বাবা! ওটা কি গো! পেত্নি না আমার বহিন্?"

আলোক তুলিয়া ভাল করিয়া দেখিল, সে তুষার সিক্ত প্রভাত কমলের মত মুখখানি তাহার বহিনেরই বটে। বহিনের দর্শন জনিত আনন্দরাশি বুকে চাপিয়া শ্যামলী বলিল, "মরিতে এ দুর্য্যোগে কোথায় গিয়েছিলি? আর গেলি ত ফিরে এলি কেন? কতদিন আর এমন করে জ্বালাতন কর্‌বি? দেখ দেখি বুড়া বাবুজির কষ্ট! এই রাত্তিরে তোর সন্ধানে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে!"

যুবতী স্মিত মুখে বৃদ্ধের নিকট সরিয়া গিয়া বলিল, "দেখ বাবুজি, কি পেয়েছি!" বৃদ্ধ বলিল "ওটা কি মা?" যুবতী বলিল, "এতেই বাবার ঋণ পরিশোধ হবে। এই পাথর খানি হীরকগর্ভ; বিজলীর আলোতে চমকে উঠেছিল; আমি দেখেছি।" শ্যামলী বলিল, "তোর মাথা হবে; চল্, বাড়ী চল্! পারিস্ ত আবার অর্দ্ধেক রাতে উঠে হীরকগর্ভ পাথর খুঁড়্‌তে যাস্।"

মাথার উপরে বর্ষাধৌত নির্ম্মলাকাশে সপ্তমীর চাঁদ তখন ম্লানোজ্জ্বল হাসি হাসিয়া একখণ্ড নীল মেঘের সহিত লুকোচুরি খেলিতেছিল।

(২)

মাতৃহারা প্রীতির সংসারে পিতা ভিন্ন আপনার বলিবার আর কেহই ছিলনা। পত্নী-বিয়োগ-কাতর প্রীতির পিতা হরনাথ বাবু সওদাগরী আফিসে ৫০৲টি টাকা বেতনের চাকুরী করিতেন। অপত্যস্নেহের আধিক্য হেতুই তিনি আর দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। চারি বৎসরের প্রীতিকে রাখিয়া প্রীতির জননী লোকান্তরে গমন করিয়াছিলেন। সেই অবধি প্রীতি পিতার নিকটেই পিতৃমাতৃ উভয় স্নেহ পাইয়া আসিতেছে। চারি বৎসর হইতে প্রীতিকে তাহার পিতা যাহা বলিতেন প্রাণদিয়া সে তাহা পূরণ করিত। সেও পিতার বিন্দুমাত্র ত্রুটি না হয় এজন্য প্রাণপণ যত্ন করিত, নিজ হাতে সে শয্যা রচনা করিত, পায়ের গোড়ায় বসিয়া সুপ্ত পিতার পদসেবা করিত।

হরনাথ বাবু আফিস হইতে ফিরিয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া প্রথম

প্রথম যখন প্রীতির স্বহস্ত সজ্জিত আহার্য্য পরিপূর্ণ রেকাবী ও তাহার হাস্য-ভরা মুখ সম্মুখে দেখিতেন, তখন আনন্দে তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িত। বালিকা প্রীতি এইরূপে প্রতিবাসিগণের মধ্যে পিতৃভক্তিমতী "প্রীতি" নাম পাইয়াছিল। সকলে নিজ নিজ পুত্র কন্যাগণকে প্রীতির মত হইতে শিখাইত।

হরনাথ বাবু জীবনের আনন্দদায়িনী কন্যা প্রীতিকে দশম বৎসরে পাত্রস্থা করেন। তাহাতে তাঁহার যাহা কিছু সম্পত্তি ও সঞ্চিত অর্থ ছিল, সব সমেত ২০০০৲ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়া যায়। কিন্তু ইহাতেও বৈবাহিকের নিকট অঙ্গীকৃত ৫০০৲ শত টাকা বাকী থাকে, সেই টাকা লইয়া উভয়ের মধ্যে একটু মনোমালিন্য হয়।

প্রীতি, ধনবান, গুণবান, রূপবান স্বামীর পত্নি হইয়াছিল। তাহার শ্বশুর বিমলচন্দ্র ঘোষ রায় বাহাদুর মহাশয় কিছু এক রোকা গোছের লোক ছিলেন। যাহা ধরিতেন না করিয়া ছাড়িতেন না।

প্রীতি বিবাহের পর দুই বৎসর একাদিক্রমে শ্বশুরবাড়ী রহিল। তাহার পিতাকে দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইলে, সে যদি কাহাকেও বলিত, তাহার পরিবর্ত্তে তীব্র তিরস্কার বই আর কিছুই পাইত না। "গরীবের মেয়ে, বাপের বাড়ী ত সুখের সীমা নাই, সেখানে গিয়ে কি হবে! তত্ত্ব যা করেন দেখে গা জলে যায়! আমাদের খোকার ঝিও মেয়ের বাড়ী অমন তত্ত্ব করতে লজ্জা পায়।" ইত্যাদি কথায় তাহার হৃদয় বিদ্ধ হইত, একবার হরনাথবাবু কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া পাঁচ মিনিটের জন্য সাক্ষাৎ পাইলেন। দেখিলেন অনাদরে অযতনে প্রীতিকুসুম শুখাইবার উপক্রম করিতেছে।

কন্যাবৎসল পিতা বৈবাহিকের নিকট দুই দিনের জন্য কন্যাকে বাটী লইয়া যাইবার প্রার্থনা করিলেন। রায় বাহাদুর মহাশয় উত্তরে শ্লেষ করিয়া বলিলেন—"অত টানই থাকে ত আমার টাকাগুলো পাঠিয়ে দেবেন, মেয়ে নেবার ইচ্ছা ত খুব, অথচ চুক্তির টাকা দিতে পারেন না!"

হরনাথবাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি ত দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই, এই কন্যার বিবাহের জন্য তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। হায় ভগবান্!

হরনাথবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বৈবাহিকের কথার উত্তরে তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নীরবে নত মস্তকে বাটী ফিরিলেন।

কিন্তু পিতার মন, কিছু দিন পরে যখন সংবাদ আসিল তাঁহার আদরিণী কন্যা শয্যাশায়িনী, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আবার রায় বাহাদুরের বাটী ছুটিলেন। রায় বাহাদুরের সেই এক কথা,—চুক্তির টাকা ব্যতীত কন্যাকে লইয়া যাওয়া অসম্ভব।

বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া হরনাথবাবু মাসের মধ্যে টাকা দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক কষ্টে প্রীতিকে লইয়া বাটী ফিরিলেন।

প্রীতির জ্বর কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। রুগ্না কন্যাকে একা বাড়ী রাখিয়া, হরনাথবাবু অফিস যাইতেও পারেন না। অবশেষে কিছুদিনের ছুটী লইয়া তিনি ডাক্তারের মতে কন্যা সহ বিন্ধ্যাচলে যাইবার জন্য মনস্থ করিলেন। ঋণ পরিশোধের জন্য দুই মাসের মাহিনা ১০০৲ শত টাকা অতি কষ্টে সঞ্চিত করিয়াছিলেন। তাহাই ইহাদের পথের সম্বল হইল। কিন্তু বৈবাহিকের টাকার কোনই উপায় হইল না।

কন্যাসহ প্রস্থানকালে তিনি বৈবাহিককে মিনতিপূর্ণ পত্র লিখিয়া জানাইলেন, ফিরিয়া আসিয়া টাকার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু বিন্ধ্যাচলে পৌছিয়া দিন পনর পরে তিনি তাহার বন্ধুর এক পত্র পাইয়া পাগল হইয়া উঠিলেন।

পত্রে লেখা ছিল, ভাই, একটা কথা জানাইতে প্রাণ বড় ব্যথিত হইতেছে। হাত কাঁপিতেছে; কারণ চাকুরীজীবি বাঙ্গালীর ইহার বাড়া আর অমঙ্গল কিছুই নাই। তোমার বৈবাহিক মহাশয় প্রায়ই আমাদের অফিসরে সাহেবের নিকট আসা যাওয়া করিতেছেন। আমি একদিন স্বকর্ণে শুনিয়াছি তোমার বৈবাহিকের সঙ্গে সাহেবের নিম্ন লিখিত রূপ কথা বার্ত্তা হয়,—

সা—"হরনাথবাবু না আপনার বৈবাহিক ?"

বৈ—"সে ছেড়ে দিন! ও রকম মিথ্যাবাদী জুয়াচোরকে আমি বৈবাহিক বলিতে লজ্জা বোধ করি! আমি পুত্রের স্বতন্ত্র বিবাহ দিব।"

"আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দরিদ্র রমেশের একটা উপায় করুন। হরনাথবাবু আপনাদের অফিসের ক্ষতি বই উপকার কি করিতেছে ? এতদিন কাজ বন্ধ করিয়া কতদুর ক্ষতি হইল বলুন দেখি ?"

সা—"আচ্ছা বাবু, আমি ভাবিয়া দেখিব। হরনাথবাবু অনেক দিনের পুরাণ লোক।"

সুতরাং বুঝিতেছ বোধ হয় তোমার কি বিপদ সম্মুখে ?· পার ত ইতিমধ্যে অনুনয় করিয়া ' সাহেবকে একখানা পত্র দিও। এ বিষয় অধিক আর কি বলিব। ঈশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবে। আমাদের সব এক প্রকার জানিবে। মা প্রীতিকে আমার স্নেহাশীষ জানাইও। ইতি—

তোমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু—
শ্রীকালীচরণ বিশ্বাস।"

হরনাথবাবু হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। রমেশ রায় বাহাদুর মহাশয়ের শ্যালক, তাহার জন্যই এ অনর্থ।

তাহার পর দুই দিন পরে অফিসের পত্র পাইলেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, কাজকর্ম্ম তত করিতে পারেন না; এবং মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ছুটি লইতে সুরু করিয়াছেন, ইহাতে অফিসের অনেক ক্ষতি হইতেছে। শীঘ্রই এক মাসের মাহিনা তাঁহার হস্তগত হইবে। ইতিমধ্যে হরনাথবাবু স্থির করিতে পারেন নাই যে কি লিখিবেন। শেষে আর লিখিবার আবশ্যকও রহিল না।

এদিকে প্রীতি একটু সুস্থ হইয়া উঠিল। হরনাথবাবু বৈবাহিককে প্রীতিকে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দিলেন। তিনি আর কোন্ লজ্জায় বৈবাহিককে মুখ দেখাইবেন ? তাই তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া কাতর আবেদন জানাইলেন।

বৈবাহিক পত্রের উত্তরে জানাইলেন, মিথ্যাবাদী জুয়াচোরের কন্যাকে আর তিনি বধূরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি পুত্রের আবার বিবাহ দিবেন।

হরনাথবাবু প্রীতির নিকট এ সকল কথা কিছুই বলিলেন না।

ষোড়শী প্রীতি যখন বলিত—"বাবা, বাড়ী যাবে না ?"

হরনাথবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলেন, "যাব বই কি মা, তুমি আর একটু সেরে উঠ।"

এমনি করিয়া দুই মাসের স্থানে এক বৎসর হইয়া গেল, তথাপি হরনাথ বাবু বাটী ফিরিবার চেষ্টা করিলেন না।

এখানে এক পর্ব্বতবাসীর সঙ্গে ইহাঁরা প্রীতি সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। নিজ ১০০৲ শত টাকা, এবং পরিশেষে চাকুরী ত্যাগের পত্র সমেত যে ৫০৲ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা দ্বারা ছয়মাস পর্য্যন্ত পিতাপুত্রীর গ্রাসাচ্ছাদন বেশ চলিল। শেষে এই পর্ব্বতবাসী মহাবীর লালের পরপোকারাকাঙ্ক্ষিশয্যে

কায়ক্লেশে একরকম করিয়া দিন পাত হইতে লাগিল। মহাবীর লালের তিনখানি পাতার ঘরের একখানিতে প্রীতি ও হরনাথবাবু থাকিতেন।

প্রীতি, মহাবীর লালের কন্যা শ্যামলীর সহিত বেড়ায়, তাহার রন্ধনে সাহায্য করে, তাহার ছোট ভাইটীকে কোলে লইয়া পর্ব্বতে ছুটিয়া বেড়ায়, তাহাকে দিদি, ও তাহার জননীকে মা বলিয়া ডাকে।

শ্যামলী বাল বিধবা। সে পিতৃগৃহেই অবস্থান করে।

নানারূপ মানসিক চিন্তায় রোগগ্রস্ত হইয়া হরনাথবাবু, মহাবীর লালের হাতে কন্যা সমর্পণ করিয়া যন্ত্রণাময় সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রীতির কুসুম-পেলব কচি হাত দুইখানি ধরিয়া বলিয়া গেলেন, "মা, পারিস্ ত সৎপথে থাকিয়া পিতৃঋণ শোধ করিয়া স্বামীর ঘরে যাস্। স্বামীই নারী জীবনের একমাত্র অবলম্বন। আর মহাবীর লালকে আমার মতন মনে করিস্।"

মুমূর্ষু পিতার পানে চাহিয়া ষোড়শী প্রীতি বলিল,—"যদি ঈশ্বর থাকেন, অবশ্য পিতৃঋণ পরিশোধ হইবে।"

(৩)

তাহার পর তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রীতিময়ী এক্ষণে উনিশ বৎসরের যুবতী।

পিতৃহীনা স্বামীবিচ্ছেদ কাতরা বনবাসিনী প্রীতির চিত্ত স্থির ছিল না। সরলা পর্ব্বতবাসিনী শ্যামলীর সঙ্গে কখনও তেমনি করিয়া তাহার কার্য্যে সাহায্য করে; আবার কখনও পিতৃঋণ শোধের আশায় পর্ব্বত কন্দরে, বৃক্ষমূলোৎপাটন করিয়া, প্রস্তরসরাইয়া অর্থ অথবা বহুমূল্য হীরকাদির সন্ধান করিয়া বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

প্রীতি সেদিনঅপরাহ্নে চিন্তাবনতবদনে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সহসা তাহার ম্লান দৃষ্টি একটা জলপূর্ণ গর্ত্তের মধ্যে পতিত হইল, প্রীতি চমকিয়া উঠিল, একি—এ যে বাইসিকেল সমেত একটা লোক গর্ত্তের জলে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে. প্রীতি আর দাঁড়াইল না, জোর করিয়া মাজায় কাপড় বাঁধিয়া গর্ত্তের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া জীবন্ত একটী রমণীমূর্ত্তি ধরিয়া তুলিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কন্যা হেলেনা তাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া খাটি বাঙ্গালায় বলিল—"আপনি আমার জীবন দান করিলেন, আমার এ কথা স্মরণ থাকিবে; পর্ব্বতে বেড়ান আমার একটা বদ অভ্যাস,

একটু অপেক্ষা কর, আমি পাথর নিয়ে যাচ্ছি। পাথরের হীরাতে তোর ঋণ পরিশোধের চেষ্টা পাইব।"

একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তরঙ্গ উঠিয়া প্রীতিকে আলিঙ্গন করিল। তাহার পর আর তাহাকে দেখা গেল না।

শ্যামলী ডাকিল "ওরে বহিন ফিরে আয়! তোর ও পাথরে কাজ নেই, ঋণ শোধ হয়েছে, ফিরে আয়!"

প্রীতির স্বামী, সেই সুন্দর যুবক ডাকিল, "ফিরে এস প্রীতি, তোমার ঋণ আমি শোধ করিব। ফিরে এস, তোমাকে বক্ষে নিয়ে আমি ভিক্ষায়েও সুখী হইব। ফিরে এস প্রীতি, আর জলখেলায় কাজ নেই।"

প্রীতির বকুল বৃক্ষ মর্ম্মর শব্দে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল "ফিরে আয় প্রীতি, ফিরে আয়, আমার বুকের অগাধ মধু দিয়া আমি তোর পিতৃঋণ শোধ করিব, ফিরে আয়!" সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি বকুল ফুল টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া ঝরিয়া নদী জলে বুঝি প্রীতির অনুসন্ধানে চলিল।

প্রীতির হরিণ মনিয়া ছুটিয়া আসিয়া সজল নয়নে নদীর পানে চাহিয়া রহিল। তাহার ভাষাপূর্ণ অশ্রু-কাতর নয়ন যুগল যেন বলিতে লাগিল "ফিরে আয় প্রীতি, ফিরে আয়, হেলেনা বিবি পুরস্কার স্বরূপ পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। আমায় নিয়ে তোর শ্বশুরবাড়ী চল।"

মাথার উপরে বিহগ ডাকিয়া বলিল, "ফিরে আয় প্রীতি, ফিরে আয়! নীল আকাশের গায়ে যে হীরার ফুল ফুটে আমি তাহারই কয়েকটি তোকে আনিয়া দিব, পিতৃঋণ শোধ করিস্, ফিরে আয়!"

ঘরঘরা কাঁদিয়া বলিল, "নেই নেই গো, সে নেই! আমার ক্রীড়ারতা বালা উর্ম্মি খেলার ছলে তাহাকে উদরসাৎ করিয়াছে।"

তখন আকাশমার্গে, বিহগ কণ্ঠে, নদী সৈকতে শ্যামলী, মনিয়ার স্বরে, বকুল বৃক্ষের মর্ম্মরছন্দে কেবলই ধ্বনিত হইতে লাগিল "ফিরিয়ে দাও গো, আমাদের প্রীতিকে; জগতের প্রীতিকে তোমরা ফিরিয়ে দাও।"

একাল সেকাল.

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(৪৯)

মস্ত একটা রাত্রি ও মস্ত একটা দিন হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া নির্ম্মল একবার এক পা অগ্রসর হইতেছিল ত, আবার পাঁচ পা পিছনে গিয়া পড়িতেছিল, আবার যেন সম্মুখের বাতাস জোরে টানিয়া আনিয়া ঠিক অভীষ্ট বস্তুটির গোড়ায় দাঁড়করাইয়া দিতেছিল, শোভাকে তাঁহার সর্ব্বপ্রকারেই ত্যাগ করা উচিত, এ কথাটা পুনঃ পুনঃই কষাঘাতের মত তাহার হৃদয়ে আঘাত করিতেছিল, আবার একটা প্রীতিপ্রদ মোহ যেন অতি নিপুণতার সহিত ত্যাজ্য বস্তুটিকে হৃদয়ের দেবী করিয়া দিয়া ক্ষত স্থানে প্রলেপের মত আরাম প্রদান করিতেছিল। কাল মটর হইতে নামিয়া রাত্রির মধ্যে সে এক মুহূর্ত্ত চোক বুজিতে পারে নাই, বিছানায় পা লাগাইতেও যেন দারুণ কষ্ট বোধ হইতেছিল, শয্যাকণ্টক তাহাকে না দিতেছিল, এপাশ ওপাশ হইতে, না দিতেছিল মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া থাকিতে! এই সকাতর প্রেম-প্রার্থনাটা অবজ্ঞা করিয়া সে যে শোভাকে কষ্ট দিয়াছে, সে কষ্টটাই তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল। সমস্ত রাত্রির অনিদ্রায় তাহার চোখ জ্বালা করিতেছিল, ক্ষুধায় পেট পুড়িয়া যাইতেছে, তবু কেমন আহারে প্রতি একটা প্রবল বিতৃষ্ণা, পাকের ঘরের দিকে ঘেঁষিতেও দিতে ছিল না, সারা দিন শরীরও কেমন অবসন্ন বোধ হইতেছিল; এতটা সময় ধরিয়া একঘেয়ে বাড়ীতে বসিয়া থাকাও কেমন বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না, অথচ এক পা বাহির হইবার প্রবৃত্তিও নাই, নীলিমার বাড়ীর পথের প্রতি এক একবার দৃষ্টি পড়িলেও জোর করিয়া আজ সে আত্মসংযম করিয়াছে, কি জানি, আজ যেমন শোভার জন্য তাহাকে দুরন্ত তাপ ভোগ করিতে হইতেছে, দুদিন পরে নীলিমার জন্যও ঠিক এমনটিই হইবে কি না? দেখিতে দেখিতে বেলা পড়িয়া আসিল, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িতেছিল, উদ্দাম বায়ুর গতি মন্দ হইয়া আসিয়াছে, রৌদ্রের প্রখর কণাও আর নাই, নির্ম্মল একবার বহিঃপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি করিয়া শিহরিয়া উঠিল, ঘড়ীর দিকে দৃষ্টি করিয়া মনে

মনেই বলিল—"আর একঘণ্টা পরে সবাই গিয়ে জুটবে, কিন্তু আমায় না দেখে সে কি মনে করবে।"

মুহূর্ত্ত নির্ম্মল আকাশের দিকেই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া "দূর ছাই" বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া একটা বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—"না না, এতে আমার যাওয়া হতেই পারে না, যেমন করে হক মনকে আমার বাঁধতে হচ্ছে. একটা ভদ্র পরিবার, এর জন্য এমন করে বিপন্ন হবে, সে কিছুতেই হতে পারে না।"

শয্যার আশে পাশে একরাশ বই এমন বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া ছিল যে, দেখিয়া নির্ম্মল গত কল্যকার রাত্রির কথা মনে না করিয়া পারিল না। একটা অদ্ভুত ভয়ে তাহার সমস্ত শরীর যেন কাঁপিয়া উঠিল, কি ভাবে যে রাত্রি ও দিন অতিবাহিত হইয়াছে, এই মাত্র যেন সে তাহা অনুভব করিল। স্থান করিবার সুযোগ না পাইয়া তাহার মন যেন নূতন সুর গাহিল। জীবন ভরিয়া এই যে এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিল, ইহার পুরস্কার ত এই, আবার অন্যের পেছন সে লইবে কি প্রকারে! যুদ্ধ যত বড়ই হউক, জয় লাভ করিতেই হইবে. তাহা সে এতক্ষণের চিন্তায় নিশ্চিত করিয়া লইয়াছিল, বাকি নীলিমা, তাহার আশা ত্যাগ করিতে পারিলে ঘরে মন বসে, ভালই, নতুবা যে তাহাকে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। এমনই একটা বিবেকের আদেশও যেন তাহার মনে উঠিতেছিল, কিন্তু অসংযত অশ্বের দ্রুতগতি যেমন প্রোথিত খুটির আকর্ষণে আবদ্ধ হইয়া যায়, তেমনই তাহার মনের গতিও কোথাকার একটা বাঁধনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বলিয়াই যে সে এতক্ষণ এত ভাবিয়াও অগ্রসর হইতে গিয়া বাধা পাইয়াই ফিরিয়া আসিতেছিল। এবার জোর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"যাই তার সঙ্গেও শেষ দেখাটা করে আসি, আর কেন।" বলিয়া জামা কাপড় পরিয়া বাহির হইতে যাইবে, অমনি সম্মুখে ভূত দেখিলে মানুষ যেমন দশহাত পিছাইয়া যায়, তেমনই দ্রুত গতিতে পিছাইতে গিয়া হোচট খাইয়া পড়িয়া গিয়া অচেতন হইয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে চেতনা ফিরিয়া আসিলে একটা কোমল স্পর্শে নির্ম্মলের সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়া উঠিল। কিন্তু ভয়ে সে চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল না, ধীরে ধীরে বলিল—"তুমি আবার এখানে কেন, আমি ত তোমার আশা ত্যাগ করেছি।"

কোন উত্তর না পাইয়া কি করিবে তাহাই ভাবিয়া নির্ম্মল স্থাণুর মত

পড়িয়াই ছিল, সহসা একবিন্দু তপ্ত অশ্রুর আঘাতে সে ক্ষিপ্তের মত উঠিয়া বসিয়া হাত দিয়া শোভার হাত ধরিয়া পরক্ষণেই তাহা ছাড়িয়া দিয়া গাঢ় কণ্ঠেই বলিল--"তুমি কাঁদছ শোভা, তোমার চোখেও জল ?"

"হাঁ আমার চোখেও জল ?" বলিয়াই শোভা থামিয়া গেল, মিনিট পাঁচেক নীরবে থাকিয়া আবার বলিল—"সত্যি আমার চোখে জল, আর পাষাণের প্রাণ সমান কথা, যাদের সঙ্গে আমার একদিনের জন্যও দেখা হয়েছে, তারাও এমন জিনিষটী ভাবতে পারে নি, কিন্তু সে কার জন্যে ?"

নির্ম্মল দুই দুইবার শোভার মুখ হইতে ঠিক এই ভাবের কথাই শুনিয়া আপনাকে অপরাধী ভাবিতেছিল, আর সেই সঙ্গে তাহার যেন থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছিল, সেই গর্ব্বিতা শোভা এমনটি হইয়া পড়িয়াছে, একি সত্যই তাহারই জন্যে। শোভা মুখ তুলিয়া চাহিল না, ধীরে ক্লান্ত স্বরেই বলিল—"আজ আমার সে গর্ব্ব নেই, কেননা কালও আমি ঠিক তত খানি বুঝতে পারিনি যে, সত্যি একটা পুরুষের অভাবে স্ত্রীহৃদয় পৃথিবীর সমস্ত সুখ, সকল প্রার্থিত বস্তু হতে বঞ্চিত হতে পারে ?"

নির্ম্মলের স্থির সংকল্পটা যেন কেমন এলোমেলো হইয়া উঠিল, শোভা কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিল, নির্ম্মল দেখিল, শোভার পরিচ্ছদে আড়ম্বর নাই, চুলে চিরুণি পড়ে নাই, পায়ে জুতা নাই, গায়েও একটি সামান্য জামা মাত্র, নির্ম্মলের মন আলোড়িত হইতেছিল, তথাপি সে সংযম রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া পূর্ণ গম্ভীর স্বরেই কহিল—"যতখানি অভাব তুমি আজ অনুভব কচ্ছ শোভা, এরও অনেক বেশী তোমার ভবিষ্যতে অনুভব কর্ত্তে হবে বলেই আমি হৃদয় পাষাণ করেছি, এভাবে বিলিয়ে দিলে তোমার অপূর্ণতাই থেকে যাবে, সেই জন্য যাতে তোমার পূর্ণতা, তারি পথ কাল তোমায় দেখিয়ে দিয়েছি।" বলিতে বলিতে নির্ম্মলের স্বর ভার হইয়া আসিল। শোভার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, নির্ম্মল অতি কষ্টেই কান্না চাপিয়া যাইতেছে। শোভা উঠিয়া দাঁড়াইল, একবার একটা নীরব আত্মগরিমা অনুভব করিয়া লইয়া বলিল—"থাকে থাকুক, বেচে থাক্‌লেই মানুষ সুখ শান্তির আশা কর্ত্তে পারে, আমার যে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে !"

নির্ম্মল বাধা দিল, বলিল—"না না অমন কথাগুলো বল না, প্রাণকে বোঝাও, আপনি স্থির হবে।"

"বোঝাতেও আমি কম চেষ্টা করিনি, সেই থেকে এ পর্য্যন্ত আমিও

যে চুপ করে বসে ছিলাম, অমন কথা কেন ভাব্‌ছ, কিন্তু যা হবার নয়, তাত শত সহস্র চেষ্টাতেও মানুষ করে উঠতে পারে না। জীবন আমার তোমার হাতে, তাকে রক্ষা কর্ত্তে হয় কর, নয়ত এস ছুরি নাও, এই বুক পেতে দিচ্ছি, এক মুহূর্ত্তে জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। এমন ভাবে আর ক্ষুধিত প্রাণের হাহাকার আমি সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছি না।"

শোভা আবার কাঁদিয়া ফেলিল, সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, উজ্জ্বল আলোতে গৃহের আসবাবগুলি যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছে। খোলা জানালায় বাতাস প্রবেশ করিয়া শোভার যৌবনোন্মত্ত বাসনাগুলি যেন আরও উদ্দীপিত করিয়া দিতেছিল। শোভা আর তিষ্ঠাইতে পারিতেছিল না। কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"সেই গর্ব্বিতা শোভা আজ তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে, ইচ্ছা হয় প্রাণরক্ষা কর্ত্তে পার, নয়ত আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়োব, এ তোমায় খাটিই বলছি, বল নির্ম্মল, এই ভিখারিণীর প্রার্থনা পূর্ণ কর্ব্বে কিনা। তুমি জান, জীবনে আমি ধর্ম্ম মানিনি, আজও তাকে আমি বিশ্বাস কর্ত্তে চাইনি। প্রাণ যা চায়, তাই আমি চিরকাল পেয়ে এসেছি, আজও আমি সেই দুর্ব্বিনীত মনকে বোঝাতে না পেরে তোমার পায়ে পড়ে কাতর প্রার্থনা কচ্ছি!"

নির্ম্মল যেন ঝড়ের বেগে কাঁপিতেছিল। চিরপ্রার্থিত চিরবাঞ্ছিত, দেহ মনের আরাধ্য দেবতাকে হাতে পাইয়া পরিত্যাগ করিবে, তাহার এমন কি লোভ সংবরণের স্পৃহা। জীবনকে দুঃখের মধ্যে ভাসাইয়া সে এই যে কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে যাইবে, ইহার জন্য তাহার জন্মান্তরে সুখ, না না হাতের গোড়ার সুখ সৌভাগ্য কি মানুষ এমন করিয়া পদাঘাতে তাড়াইয়া দিতে পারে। নির্ম্মলের বিচলিত মন দলিত হইয়া যাইতেছিল, শোভা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিল—"বল আমায় বাঁচতে দিবে কিনা, চল এই মুহূর্ত্তে এই রাজ্য ছেড়ে চলে যাই, তোমার ভয় কিছু থাকবে না, আমাদের কেউ খুঁজেও বার কর্ত্তে পার্ব্বে না। আমি একদিনেই ঠিক বুঝে নিয়েছি, তোমায় নিয়ে আমি বনে গিয়ে থাকলেও আমার যে সুখ—"

শোভা আর বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, সে জোর করিয়া নির্ম্মলকে টানিয়া পাশে আনিতে যাইতেছিল, নির্ম্মলের অধরও কাঁপিয়া কাঁপিয়া অগ্রসর হইতেছিল, সহসা গম্ভীর কণ্ঠের ডাক আসিল—"মা ?"

নির্ম্মল হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, অভিসম্পাতের মত এই মাতৃ-সম্বোধন তাহাকে যেন মাতৃজাতির গৌরব অনেকটা বুঝাইয়া দিল। আর শোভা থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একবার পিছনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল। পুলীনবিহারী আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"পাপের পথেত সুখ নেই মা, ওতে যে ভীষণ জ্বালা ?"

(৫)

পুলীনবিহারীর এই একটি মাতৃসম্বোধনে শোভার হৃদয়ে যেন অমৃতবর্ষণ হইল, স্নেহ দয়া সহানুভূতি জড়িত এই সম্বোধনটি যেন শান্তির ফোয়ারা লইয়া তাহার গুরু-গরম মস্তিষ্কে শীতল বারিধারা ঢালিতে লাগিল, এমন একটি কথা যেন সে আর এ জীবনে শুনিতে পায় নাই। উদ্দাম গতিতে হৃদয়ের বেগ যেন চোখ বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল, আর নির্ম্মল নিতান্ত আহাম্মকের মত অতি বড় অপরাধীর মত মস্তক নত করিয়া নিজের চরিত্রের কথা ভাবিয়াই মরমে মরিয়া যাইতেছিল, যতই হউক ভদ্র সন্তানের পক্ষে এই লম্পটোচিত ব্যবহার যে কত জঘন্য, কত অমাননীয় অপরাধ জড়িত, তাহা বুঝিতে তাহারও বিলম্ব হইল না, এই পুলীনবিহারী, ইনিও ত মানুষ, আর সেই মানুষের চামড়া গায়ে পরিয়াও উহাতে আর তাহাতে কত পার্থক্য, ইনি ধর্ম্মরক্ষা করিতে সমাজ বন্ধন অটুট রাখিতে শোভাকে উদ্ধার করিবার জন্যই যেন এতখানি অপরাধ করিলেও আবার তাহারই জন্য ছুটিয়া আসিয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা এই কথাটাই তাহার পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল, ইহার মধ্যে ত তাহার বিন্দুমাত্র স্বার্থসম্বন্ধ নাই, বরং অকাতর ত্যাগেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। নহিলে তাহার যে অবস্থা, যে প্রতিপত্তি, তাহাতে শোভার মত পুত্রবধূ করিতে হইলে কিছু ঘর ছাড়িয়া একটি পাও বাড়াইতে হইত না, ঘরে বসিয়া শত সহস্র অনুরোধের মধ্যে ইচ্ছা করিলেই তিনি পুত্রের পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া এতখানি অপরাধ যে করিয়াছে, বিবাহের পর হইতেই অন্য একটি যুবকের জন্য, যে স্বামীকে উপেক্ষা করিয়া ভ্রষ্টার মত অপরের পিছনে পিছনে ছুটিতেছে, তাহাকে শোধরাইয়া লইবার জন্য তাহার এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব ব্যবহার যে মানুষের পক্ষে অসম্ভব। পুত্রকন্যা বহিয়া গেলে, দুশ্চরিত্র হইলে তাহার চরিত্র শোধনে মানুষ যেমন অন্যের অগোচরে যত্ন করে, এ যেন

তাহাই। আর নির্ম্মল, নিরপরাধে নিজের স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া যাহার জাতি রক্ষার জন্য পুলিনবিহারীর এতখানি প্রয়াস, তাহারই জাতিনাশের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া মাতাকে কাঁদাইয়া নিরাশ্রয়া পত্নীকে ফেলিয়া রাখিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এমন দিন মানুষের জীবনে হয়ত খুব কমই হয়, যেদিন বিবেকের আঘাতে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপরাধগুলি ফুটিয়া বাহির হইয়া জ্যোতিঃস্বরূপ চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। সে সময়টি এত গরিমাপূর্ণ, যে মানুষ তখন আর অন্য কোন কথা ভাবিতে না পারিয়া আত্মার মধ্যে একটা নূতন মহত্ত্বের অনুভূতিতে সহসাই যেন পৃথিবীর সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের সমস্ত ত্যাগ করিয়াও হৃদয়ের সেই সৌন্দর্য্যটুকু রক্ষা করিবার জন্য অন্যের মত উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। নির্ম্মলেরও আজ সেই শুভ মুহূর্ত্তটি আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই সে এতক্ষণ দীননয়নে পুলীনবিহারীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া যেন ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছিল, ঠিক সেই অবস্থায় শোভার মাথায় হাত রাখিয়া মিষ্ট স্বরে পুলীনবিহারী বলিলেন— "দেখ নির্ম্মল, তুমি আমার ছেলের মত, আমার হিত অন্বেষণ যেমন তোমার কর্ত্তব্য, তোমার কল্যাণ কামনাও ঠিক তেমনি আমার করা উচিত। কিন্তু যা কর্ত্তে এসেছি, যদিও তা সবখানিই আমার নিজের জন্যে, তথাপি তোমাকে অনুরোধ কর্ত্তে পারি—"

পুলীনবিহারী থামিয়া গেলেন, নির্ম্মলের পাণ্ডুর মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া ইহার পর আর কোন কথা বলিবার ক্ষমতা তাঁহার রহিল না। নির্ম্মল কিন্তু এতখানির মধ্যে একটুও পুলীনবিহারীর নিজের স্বার্থ দেখিতে পাইল না। তাহার যেন মনে হইল, শোভাকে ভিতরে রাখিয়া পুলীনবিহারীর এই যে হিত চেষ্টা, ইহার সমস্ত খানিই তাহার জন্য। মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিয়া পুলীনবিহারী আবার বলিলেন—"এ অনুরোধ আমি তোমায় জোর করেও কর্ত্তে পারি, তুমি এমন করে আমার জাতি মের না। আমার ঘরের বৌ, এমন করে উচ্ছন্নে গেছে, এমন কথাত আমি মুখ ফুটে কারুর কাছে বল্‌তে পার্ব্ব না, আর কেউ যদি কথাপ্রসঙ্গেও বলে ফেলে, তবে যে প্রাণ ধারণ করাও আমার পক্ষে কষ্টকর হবে।"

নির্ম্মল নিরবে ভাবিতে ছিল, পুলীনবিহারীর এই প্রত্যক্ষ আত্মস্বার্থের মধ্যে যে কতখানি পরার্থপরতা লুক্কায়িত ছিল, অন্য দিন হয়ত সে তাহা বুঝিতে পারিত না, কিন্তু আজ যে চির লুপ্ত জিনিষটি তাহার মনের মধ্যে পুনঃ

পুনঃ আনাগোণা করিতেছিল, তাহার সাহায্যেও তাহার আর কোন বিষয় বুঝিতে বাকি ছিল না। সে পুনর্ব্বারও কাতর নয়নে দৃষ্টি করিয়া কাতর কণ্ঠেই বলিল—"সত্যি আমি বড় অভাগা, আমার এমন পিতা বেচে থাকৃতে এমন একটু সময় হয় নি যে, তাঁর কথা আমি শুনব। কিন্তু আজ অভাবে পড়ে যেন বুঝ্‌ছি, আপনি ঠিক তাঁর যায়গাটি অধিকার করে দাঁড়িয়েছেন। আমি মনকে বোঝাতে চেষ্টা কর্ব্ব; কিন্তু আপনি কি আমার অপরাধ ক্ষমা কর্ত্তে পার্ব্বেন।"

পুলীনবিহারী গম্ভীর কণ্ঠেই বলিলেন—"অপরাধ ক্ষমা না করে ঘরের ছেলেকে উচ্ছন্নের পথে তুলে দেব, এত সাহস আমার নাই, নির্ম্মল, তাতে যে বড় ক্ষতি। ধর—একা তোমার জন্যে সমস্ত সংসারটা ছারখারে যাচ্ছে, ফিরাতে যদি নাই পারি ত তোমার মারই বা কি হবে, আর অভাগিনী বিমলা—"

পুলীনবিহারী আবার থামিলেন, এবার মাথা ছাড়িয়া হাত ধরিয়া শোভাকে উঠাইয়া লইয়া বলিলেন—"মা, কোন্ দোষে তোমার এই বুড় ছেলেকে ত্যাগ কর্ব্বে। চল মা, ঘর সংসার যে তোমার অভাবে থাক্‌বে না। আর দেখ নির্ম্মল, এসব ভুলে যাও, এমন একটা অন্য চিন্তার মধ্যে কিছু দিন মনকে ব্যস্ত রাখ্‌তে চেষ্টা কর্ব্বে, যাতে সেই চিন্তার হাত হতে যেদিন ত্রাণ পাবে, সেদিন দেখ্‌বে, তুমি নূতন পৃথিবীতে এসে পড়েছ, সেখানে শোভাও নেই, নীলিমাও নেই, সকল সৌন্দর্য্য নিয়ে বিমলা এসে তোমার হৃদয়টি ঘিরে দাঁড়িয়েছে।" বলিয়া আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি শোভার হাত ধরিয়া ধীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন। নির্ম্মল পিপাসিতের মত যতক্ষণ দেখা গেল, তাঁহার সেই সৌম্য কান্তির দিকেই চাহিয়া রহিল।

(৫১)

মানুষের অভাবে জগতের সমস্ত অভাব টানিয়া আনে, এ কথাটা শ্বশুরের মৃত্যুর পর কয়টা মাস যাইতে না যাইতেই বিমলা যেমন বুঝিতেছিল, এমন যেন আর কেহ বুঝিতে পারে না। সুখশান্তির আশা সে এ জীবনের মত অনেককাল আগেই ত্যাগ করিয়া বসিয়াছিল, সে জন্য আর তাহার ভয়ও ছিল না, কিন্তু এই শ্বশুরের ভিটায় একটি দীপ দিয়া শ্বশুরের ক্রিয়া কর্ম্মগুলি বজায় রাখিয়া যদি সে মরিতে পারে ত, পিতার মত শ্বশুরের মৃত্যুকালের আদেশটা পালনের জন্য যতটুকু সৌভাগ্য, তাহার লোভ ত্যাগ করা বিমলার পক্ষে দুষ্কর হইলেও বিধাতার চক্রান্ত তাহাকে সেই পথেই টানিয়া লইতে-

ছিল। নিজের শরীর তাহার অনেক কাল হইতেই ভাল ছিল না; তাহার উপর শ্বশুরের মৃত্যুর পর হইতে শাশুড়ী যে শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, আর কিন্তু তাঁহার শয্যা ত্যাগের আশাও ছিল না, তিনি যেন অলক্ষ্যে দিন দিনই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিলেন। পাষাণের মত দুর্ভাবনা বিমলার বুকে নিরন্তর লগুড়াঘাত করিতেছিল, শান্তি নাই, সহায় নাই, নির্ম্মলের সংবাদ নাই, কথাটি বলিবে এমন লোকও তাহার ছিল না। একটা পরামর্শ লইবে এমন কেহ জগতে নাই, এক শশাঙ্ক, কিন্তু রমার শরীরও অনেক কাল যাবৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, বলিয়া সেও রমাকে লইয়া পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। অন্ধকার, অন্ধকার ছাড়া যেন বিমলার আর কিছুই ছিল না। এদিকে পূজা সম্মুখবর্ত্তী, অর্থেরও প্রয়োজন, কিন্তু এক পয়সা আদায় নাই, যে কয় স্থানে খাজনা পাওনা আছে, লোকের অভাবে তাগাদা হয় না, ক্ষেতের শস্য ঘরে আসে না, সুদী টাকার একটি পয়সা সুদ আদায় হইতেছে না। ঘরে যাহা ছিল, তাহাও কয়মাসে শেষ হইয়া আসিল, বিমলার না জানি ভাতের জন্যও পরের দোরে দাঁড়াইতে হয়। হায় বিমলার কিসের অভাব ছিল, বিমলা কিন্তু বিপরীত ভাবিত। অভাব তাহার চিরকাল সমানই আছে, যে অভাবে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ, তাহা অপেক্ষা অভাব কিছু জগতে কাহারও হইতে পারে না। একমাত্র ভাবনা, শাশুড়ী, আর সংসারের কাজ। সেদিন সন্ধ্যাকালে সে গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল, সহসা করুণাময়ী ডাকিয়া বলিলেন—"মা সামনে পূজ, যে করে হ'ক রাখ্‌তে না পাল্লে যে পরলোকে তাঁর বড় কষ্ট হবে।"

বিমলা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, করুণাময়ী বলিলেন—"পয়সা হলেও যে করে কর্ম্মে দেবে এমন লোক নেই, কি হবে মা।"

কি যে হইবে, বিমলাও যে কতকাল হইতে, তাহাই ভাবিতেছিল। করুণাময়ী আবার বলিলেন—"অবস্থা যা দেখ্‌ছি, তাতে ত গ্রামের মাধব ছাড়া আর কেউ আমাদের আপনার লোক নেই, ওই হাটাহাটি করে তবু খোজটা খবরটা নিচ্ছে, আর সবাই যেন হা করে গিল্‌তে যাচ্ছে, কি করে সব গ্রাস কর্ব্বে?"

বিমলা সকলই জানিত, মাধবের এই অতিরিক্ত অনুরক্তিটা তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভীত করিয়া তুলিয়াছিল। আপদ বালাই বলিয়া সকলে যেমন তাহাদিগকে আমলেও আনে না, মাধবও যদি ঠিক তেমনি করিত, তবে হয়ত এত ভাবনার কারণ ছিল না। সে এই মাধবের ঘনিষ্ঠতায় মনে মনে উতলা

হইয়াও শ্বশ্রুকে আজ পর্য্যন্ত কোন একটি কথাও বলিতে সাহস পায় নাই। কি জানি রোগশীর্ণা শোকসন্তপ্তা শ্বশ্রু আরও কাতর হইয়া পড়িবেন। তাহার এক সাহস ও সহায়—শান্তি, শান্তিই আজ পর্য্যন্ত হাটিয়া খাটিয়া তাগাদা করিয়া আদায় ওয়াশিল করিয়া যাহক দু পাঁচটাকার আমদানী করিতেছিল, আর সাবধানতার বলে প্রভুর মত সে বিমলাকে রক্ষা করিবার জন্য মাধবকে দূরে দূরেই রাখিবার চেষ্টা পাইতেছিল। বিমলার মনে বল ছিল, স্বামি-পরায়ণা আত্মবলেই আত্মরক্ষা করিবে ভাবিয়া মাধবের কুৎসিত অভিপ্রায়ের কথা শান্তির নিকট ব্যক্ত করে নাই। কিন্তু বিমলা যে গোপন করিতেছে, একথা শান্তি বেশ জানিত, না বলিলেও সব জানিয়া শুনিয়া শান্তি যে মাধবের প্রতি তীক্ষ দণ্ডের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহাও বিমলার অবিদিত ছিল না। করুণাময়ী আবার বলিলেন—"নয় ত মাধবকেই ডেকে পাঠাও মা, এই ত একটা মাস মাত্র সময় আছে, এখন থেকে চেষ্টা না কল্লে কিছু হয়ে উঠ্‌বে না।"

খান দুইতিন বাসন হাতে শান্তি ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে থামিয়া গেল, হস্তে-জিতে বিমলাকে ডাকিয়া বলিল—"মাধবের কথা কি হচ্ছিল না।"

বিমলা শান্তির কথার ধাক্কে থতমত, খাইয়া গেল, উত্তর না পাইয়া শান্তি আবার বলিল—"দেখ, বৌদী, ঐ বিটকেল বামুনকে যদি আবার এবাড়ী মাড়াতে দেবেত আমারই একদিন কি তারই একদিন। আমি তাকে সোজা করে দিয়ে তবে ছাড়্‌ব।"

বিমলা এবার ঢোক গিলিয়া ধীরে ধীরেই বলিল—"ছি, এমন দুঃসময়ে নাকি মানুষের পেছনে লাগ্‌তে আছে।"

"লাগ্‌তে নেই।" শান্তি গর্জ্জিয়া উঠিল,—"আস্কারা দিয়ে তারপর ওর হাতে—"বলিতে বলিতে শান্তি থামিল, বিমলা সম্বন্ধে যে কথাটা মনে ভাবাও পাপ, তেমনই একটা কথা মুখে আনিতে গিয়া সে যেন অতর্কিতে বাধা পাইয়া কথা হজম করিয়া লইল। বিমলা শান্ত সহজ স্বরেই বলিল—"তুই কিছু ভাবিস না শান্তি, আপনার গায়ে জোর থাক্‌লে, কার সাধ্য তাকে নিজের স্থান থেকে একপা সরিয়ে দেয়। ভগবান্ তাকে রক্ষে করেন। শান্তি তুই তাঁকেই ডেকে আন ?"

শান্তি আর সাড়া দিল না, সে মাধবকে ডাকিতেও গেল না, তাহার সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদও করিল না, তীক্ষ ক্রূর দৃষ্টিতে বিমলার দিকে

চাহিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে মাধবের অনুসরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে শরতের বাতাস ধীরে ধীরে খাল বিল হইতে জলীয় শীতলতা লইয়া আনাগোণা করিতেছিল, আকাশের এক পাশে শান্ত চন্দ্র যেন শান্ত শিশুটীর মত মধুর হাসিতে সুষমা বিতরণ করিতেছিল। অদূরস্থিত বাগানের স্থলপদ্মফুল যেন একটা নূতন সাড়া পাইয়া পূর্ণ বিকসিত হইতেছে! শেফালিকার পবিত্র গন্ধে বাড়ী ঘর আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। কাশির স্বরে সতর্কতা প্রকাশ করিয়া হ্যারিকেন হাতে মাধব আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। এক পাশের একটী স্তিমিত প্রায় দীপালোকে বিমলা মহাভারতের উপাখ্যান পড়িতেছিল, পায়ের শব্দে দৃষ্টি ফিরাইতেই তাহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। মাধবের পিপাসিত দৃষ্টি তাহাকে যেন গ্রাস করিতে যাইতেছিল। সে মস্তক নত করিয়া লইল, মাধব তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিল—"আজ কেমন আছেন?"

করুণাময়ী ঘুমাইতেছিলেন, শান্তি পাকের ঘরে আহারে বসিয়াছিল, বিমলা বড় বিপদে পড়িল—"বাড়ীতে যখন আর কেউ নেই, কথা না বল্লে কিছু রোগীর খবরও জান্‌তে পার্ব্ব না, আর তোমারই এত লজ্জা কিসের বৌদী?"

মাধব যুবক, মাধব সুন্দর, মাধব ধনীর সন্তান, মাধবের সকলই আছে, নাই কেবল চরিত্রের বল। বিমলা এই নূতন সম্বন্ধসূচক সম্বোধনে যেন অনেকটা আশা পাইল, হয় ত এই সম্বন্ধ বলিয়াই পরিহাসচ্ছলে মাধব যখন তখন যাতা বলিয়া থাকে! কিন্তু এই সম্বন্ধের কথাত ইহার পূর্ব্বে আর সে জানিতে পারে নাই। মাধব অগ্রসর হইতে হইতে বলিল—"নির্ম্মলদা ত গ্রামের মধ্যে আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাস্‌তেন, দূর সম্পর্ক হলেও আমিই ছিলাম, তার আশ্রয়ের মত?"

স্বামীর নামে বিমলার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, সে ধীরে ধীরে করুণাময়ীর গায়ে হাত দিতে, দ্রুতপদে শান্তি আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা মাধববাবু, বল ত এ তোমার কেমন আক্কেল, সময় নেই, অসময় নেই, ঘরে এসে ঢুকবে, বাঁধো মানবে না, যখন তখন যা তা বলে জ্বালাতন কর্ব্বে?"

মাধবের মনটা বসিয়া পড়িল। বিমলা যেন মস্ত একটা বিপদের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া মুক্তির শ্বাস ত্যাগ করিয়া শয্যায় গা ঢালিয়া দিল।

(৫২)

শোভা গাড়ীতে উঠিয়া নিজের কথাই আলোচনা করিতেছিল, কুলটার মত সে যে ঘর ছাড়িয়া নির্ম্মলের প্রণয় ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। যে ভাবে হউক আত্মসুখ উপার্জ্জন মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য এ কথা ভাবিয়া ঠিক এক ঘণ্টা পূর্ব্বেও সে নিজের সেই কার্য্যটার বিরুদ্ধে কোন কথা বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু পুলীনবিহারী পাপের নাম করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, একথা মনে হইতেই একটা অতি নিবিড় গিরিগুহা ধ্বনিত কষ্টশ্রুত প্রতিধ্বনি যেন পুনঃ পুনঃই তাহার কাণের গোড়ায় আনাগোণা করিয়া বলিতেছিল—"পাপপুণ্য ত সত্যি রয়েছে, আর পাপেরই পরিণাম ভীষণ, একবার তাহার হস্তগত হলে আর ত রক্ষা নাই ?"

একবার শিহরিয়া উঠিয়া সে মনে মনেই বলিতেছিল, "তবে কি সত্যি পাপপুণ্য আছে, সত্যি মানুষকে তার ফলভোগ কর্ত্তে হয়। না না ও একটা প্রাচীন বিশৃঙ্খল ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়, ছিঃ যা দেখতে পাওয়া যায় না, শুনতে পাওয়া যায় না, তারই অস্তিত্ব-কল্পনা! নিশ্চয় এ উন্মত্তের বিকৃত মস্তিষ্কের একটা ভুয়া ধারণা ?" শোভা আবার ভাবিতেছিল, আবার তাহার মুখ যেন বিষন্ন হইতেছিল—"সত্যি যদি এসব নাই থাকেত, লোকের এ ধারণারই কারণ কি ? যত বড় পাপই মানুষ করুক না, যত উচ্ছৃঙ্খলই হউক না, জীবনের যে কোন একদিন তার মুখে ত এমন ধরণেরই একটা হাহাকার একটা অস্ফুটধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, তবে কি সত্যি ?"

গাঢ় চিন্তায় বাধা দিয়া পুলীনবিহারী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"কি ভাবছ মা ?" একবার থামিয়া বলিলেন—"জান মা, এই বুড়ো ছেলে ঠিক তোমার মনের কথা টের পেয়েছে, বলব কি' ভাবছ !" পুলীনবিহারী আবার থামিলেন, তাঁহার নাসানির্গত একটী ক্ষুদ্র শ্বাস যেন মানুষের এই প্রকাণ্ড ভ্রান্তির জন্য দুঃখ ঘোষণা করিল—"এমন কথা একালে হয় ত অনেকেই ভাবে, তুমি ভাব্‌বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু মা একটা কথা খাটী করে বল্‌বে।

জিজ্ঞাসার ভাবেই শোভার মন নিদারুণ বিস্ময়ে ভরিয়া গেল! যে হৃদয় কোন একদিনের জন্য যে সকল বিষয়ের ছায়ামাত্র স্পর্শ করে নাই, আজ যেন সে সকল বিষয়ই তাহার মনের উপর আধিপত্য করিতে ছিল, পুলীনবিহারী আবার বলিলেন—"এই যে এত কাজ মনের মত করে এসেছ, যার হাতে থেকে সংযম জিনিষটিকে আমল দেও নি, আচ্ছা বেশ ভাল করে ভেবে দেখে বল দিখি, একদিনও কি আশায় পূর্ণতা লাভ কর্ত্তে পেরেছ?"

শোভা কি উত্তর করিবে, ভাবিয়া পাইল না, এ সকল কথা সে উত্তর করিবার মত করিয়া কোন দিন ভাবিয়াও দেখে নাই, জীবনে ভাবিবে এমন বিশ্বাসও তাহার ছিলনা। ভালমন্দ দোষগুণ বিচার সে করিত না, তেমন শক্তিও তাহার ছিলনা, তাই নীরবে মুখ নীচু করিয়াই রহিল।

মেঘ ছিলনা. শরতের স্নিগ্ধ আকাশ প্রকৃতির কোলে বিমল ছটা বিলাইয়া নীরবে যেন ধ্যান করিতেছিল। পুলীনবিহারী গাড়ীর জানালায় আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সংসারের এসব কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, গাড়ী চলিতে চলিতে একটা পথের মোড়ে আসিয়া পড়িল! পুলিনবিহারীর যেন চেতনা ফিরিয়া আসিল। তিনি শান্ত স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"উচ্ছৃঙ্খলতায় সুখ নেই মা, সে যে কেবল আশা বাড়িয়ে তোলে। মনকে যত প্রশ্রয় দিবে, সে যে ততই ক্ষুধিত হয়ে উঠ্‌বে, যতই ভোগ কর মা, বাসনাত বেড়েই যাবে। তাতেই হয় ত মানুষের কল্যাণের জন্য এ সকল সংযমের সৃষ্টি হয়েছে। গৃহস্থের পক্ষে ভোগ নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু তাতেও প্রতি-পদে বিধিনিষেধ পালন করে চল্‌তে হবে। গাড়ীর চাকার মত ঘুরে ঘুরে প্রতি নিয়তই যেন একটীর পর একটী কর্ত্তব্য এসে সম্মুখে দাঁড়ায়, খাবে ঘুমোবে সবই নিয়ম বাঁধা, কোন কাজে তার গণ্ডীর বাইরে গেলে কি বিপদে পড়লে।"

জীবনে যাহা কখনও শোনে নাই, যাহা শ্রদ্ধা না করিয়া উপহাস করিয়াই উড়াইয়া দিয়াছে, ঠিক সেই কথাগুলি জুজুর মত বসিয়া শোভা আজ শুনিয়া যাইতেছিল। প্রতিবাদ করিবে, তেমন দুষ্প্রবৃত্তি যেন আজ কোন্ কুহকে তাহার সীমাও ঘেষিতে পারিতেছিল না। দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া নূতন একটা বাড়ীর দোরে থামিল, পুলিনবিহারী শোভার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"নেবে এস মা?"

শোভা উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু মনের ঔৎসুক্য নিবারণ করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"এখানে?"

"হাঁ মা, এই বাড়ীই তোমার জন্য ঠিক করা হয়েছে। তুমি যে এবার নূতন মানুষ হবে, তাই এই নতুন বাড়ী আমি ঠিক করে রেখেছি ?" বলিয়া তিনি শোভার হাত ধরিয়া সরাসর সিঁড়ী বাহিয়া উপরে উঠিয়া সুন্দর সজ্জিত একখানা গৃহে প্রবেশ করিতেই, ঝী চাকরে প্রায় পাঁচসাত জন লোক আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"এই তোমাদের কর্ত্রি, এর জন্যই তোমাদের সব রাখা হয়েছে। সবাই এর কথা শুনে কাজ কর্ব্বে, মার যেন আমার কোন কষ্ট না হয় ?"

(৫৩)

"এইবার চল বাড়ী যাই, শরীরত অনেকটা সেরেছে। ঘর দোর ফেলে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে ত কিছু থাকবেনা। তা ছাড়া ঠাকুরঝীর জন্য ভেবে আমার ভাল লাগছেনা।

সমুদ্রের ধারে জানালা দরজা খোলা গৃহখানায় হুহু শব্দে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিতেছিল। অদূরস্থিত সমুদ্রের নীল জলে সান্ধ্য রবির রক্তচ্ছটা পড়িয়া সিমন্তিনীর সিঁথিতে সিন্দুর বিন্দুর মতই ভাসিতেছিল। শান্ত বারিধির প্রশান্ত বক্ষে যেন একটা জীবন্ত সুষমা ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। শশাঙ্ক তাহারই দিকে চাহিয়া বলিল—" তুমি যতই বল, আর যত ভাবনাই কেন না থাক, এমন সুন্দর জিনিস ত্যাগ করে যেতে আমার ইচ্ছা হয় না। এ যেন একটা নবীন রাজ্য রমা, রোগ শোক পাপতাপ এর গন্ধও যেন এখানে নাই। সমাজ বল, আত্মীয় বল, যত কিছু সবার কোলাহল থেকে বেরিয়ে ক্রমে মানুষ যদি এমন স্থানই অধিকার কর্ত্তে পারেত কেন কর্ব্বেনা। যে সান্ত্বনা, জগন্নাথ দেব যেন তাঁহার প্রিয়সহচরী যমুনার কল্লোলের মধ্যে পৃথিবীর শোক সন্তাপ লুকিয়া রেখেছেন। বল ত রমা, কেন তোমার এমন স্থান ছেড়ে যেতে ইচ্ছে যাচ্ছে ?"

রমা এই কেনর উত্তর যে কত ভাবে দিতে পারিত, তাহা সেই জানে, স্ত্রীপুরুষের মনের হয় ত এখানেই তফাৎ। তাহারা জানে ঘরসংসার, সন্তানসন্ততি, আত্মীয়, গৃহ-দেবতা, বারব্রত। আর পুরুষ ভুলিয়া প্রকৃতির লীলায় আত্মলীন করিয়া চিত্তবৃত্তির চরিতার্থ করিতে পারিলে বাঁচিয়া যায়। ইহারই জন্য স্ত্রীহৃদয় কুসুম কোমল, আর পুরুষ পাষাণ কঠিন। বিপন্নের বিপদুদ্ধারে, নিরন্নের অন্নদানে, পিপাসাকাতরের পিপাসা শান্তি করিয়া সন্তান হারার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া স্ত্রীলোক যত সুখী, পুরুষ

জগন্নাথ বা কাশীর বিশ্বেশ্বর হয়ত তাহাদিগকে তত সুখ দিতে পারে না, পুরুষ ভিন্ন প্রকৃতি, দয়া মায়া প্রভৃতি মন্দগতিতে তাহাদের হৃদয় আকর্ষণ করিলেও তাহাদের যেখানে সুখ, যেখানে প্রকৃত আনন্দ, যেখানে প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্ফুরণ, যেখানে দীনের ক্রন্দন গিয়া পৌঁছায় না, সন্তান হারার ব্যাকুলতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, নিত্য নূতন আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া তাহারা পৃথিবীর কথা বিস্মৃত হইয়া যায়। তাহারা চিরস্থায়ী জিনিষ চাহে। আর মাতৃজাতি স্নেহে, দয়ায় যে অপূর্ব্ব পরম বস্তুর সৃষ্টি করে, তাহার অনুভূতি না থাকিলেও তাহার জন্য ধর্ম্মোপার্জ্জনের সত্তাজ্ঞান না থাকিলেও তাহারা তখনকার মত ঐ শান্তিটুকু লাভ করিয়াই আত্ম-চরিতার্থতা লাভ করে। তাই নানা চিন্তায় বিব্রতা রমা ক্ষুণ্ণস্বরেই বলিল—"না না, আমার এ সকল কিছু ভাল লাগে না। চাকর দাসীর ওপর ভার দিয়ে না কি ঘর সংসার বজায় থাকে, তা ছাড়া এই ত কত দিন ঠাকুরঝির খবরটি নেই। বুড় শ্বাশুড়ী, তা ও আবার তাকে রোগে ধরেছে, তাকে ঘাড়ে করে ঠাকুরঝীর আমার কি অবস্থা হয়েছে, কেমন করে বল্‌ব। আমারা ছাড়া কিছু তার আর এমনটি কেউ নেই যে, জিজ্ঞেস করে। তুমি ফির্‌বার আয়োজন করে নাও, এখানে আর আমার মোটে মন টিক্‌ছে না!"

শশাঙ্ক বাধ্য হইয়া কথা ঘুরাইয়া লইল, ধীরে ধীরে বলিল—"তোমার যাতে ভাল লাগে, তাই আমার কর্ত্তে হচ্ছে রমা, যতটুকু হল, এও তোমারি জন্যে, নৈলে যতই ভাল আমার লাগুক, এখানে আসা যে হত না, সে খাটি কথা?"

রমা অল্প হাসিল, বলিল—"আবার আস্‌বে, যখন আমার শেষ সময় হবে, কিন্তু এখন আর নয়—"

"ছিঃ রমা?" বলিয়া শশাঙ্ক মুখ বাঁকা করিল। রমা স্বামীর হাত ধরিল বলিল—"কেন আমি কি অমর হয়ে এসেছি। তোমার যখন এতই ভাল লাগে, তখন নয়ত এখানে এসেই মর্ব্ব, তোমারও লাভ, আমারও কিছু লোক্‌সান নেই, কিন্তু তাও বল্‌ছি তোমায়, মরতেও তোমার ভিটেয় আমার যত সুখ, তত আর কোন্‌খানে হবে না। সে বাড়ীর বেড়াল কুকুরটি পর্য্যন্ত যেন আমার আপনার হয়ে আছে। তাদের মুখ না দেখে মরলে স্বর্গে গেলেও যে আমার সুখ হতে পারে না—"

রমা আরও কি বলিতে যাইতেছিল। শশাঙ্ক দুই হাতে মুখ চিপিয়া ধরিল, বলিল—"ফের ঐ রকম কথা বল্‌বেত, আমি, ছমাস এখান ছেড়ে যাচ্ছি না।"

"আচ্ছা ফিরিয়ে নিলাম, বলিয়া রমা হাসিল। শশাঙ্ক বলিল—"তা হলেও আর কটা দিন এখানে থাক্‌তে হচ্ছে, ডাক্তার কি বলেছেন জানত?"

"তাত জানি? বলিয়া রমা বিমর্ষ হইয়া পড়িল। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তেই সে বিমলার জন্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। বিমলা যেন তাহার অস্থিমজ্জা, এত দূরে থাকিয়া তাহার বিন্দুমাত্র সংবাদ না জানিয়া ইহার পরও কেমন করিয়া দিন কাটাইবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে সে অস্তগমনোন্মুখ রক্তচ্ছটার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"তবে তাই, তুমি যখন কথাই শুন্‌বে না।"

(ক্রমশঃ)

বিপ্লব

[লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরেশের নিকট হইতে বিতাড়িত হইয়া হরিচরণ একটুও ক্ষুব্ধ বা আশ্চর্য্যান্বিত হইল না; কেন না সে এইরূপই কতকটা আশা করিয়াছিল। ব্যাঘের মুখ হইতে তাহার শিকারটা ছিনাইয়া লইতে গেলে যে ব্যাঘের বিষম আক্রোশে পড়িতে হয় এটুকু বুঝিবার শক্তি হরিচরণের ছিল। সে জানিত ডাক্তার বাবু শৈলজার উপর সম্পূর্ণ অনুরক্ত। শৈলও যে ডাক্তার বাবুর অনুরাগী ইহাও সে না বুঝিত এমন নহে, কিন্তু তাহার ধারণা ছিল, মেয়ে মানুষের আবার রাগ অনুরাগ কি? উহারা ঠিক লতার মত, যখন যে গাছের কাছে থাকিবে, তখন সেই গাছটাকেই জড়াইয়া ধরিবে! আজ

সে ডাক্তার বাবুর প্রতি অনুরক্ত আছে, কিন্তু কাল তাহাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলে তাহারই পদানত হইয়া পড়িবে। মেয়ে-মানুষের ভালবাসার দৃঢ়তা বা কোন মূল্য আছে ইহা হরিচরণের বুদ্ধিতে আসিত না। সুতরাং সে শৈলকে বিবাহ করিবে ও ভবিষ্যতে তাহার ভালবাসা পাইবে এই আনন্দই তাহার হৃদয়টা তখন এমনই ভরপুর হইয়াছিল যে, পরেশের নিকট হইতে প্রত্যাখান জনিত ক্ষোভটা সেখানে আদৌ স্থান পাইলনা।

সে রামচরণের মুখে পরেশের আদেশ শুনিয়া ডাক্তার খানা হইতে বাহির হইল, এবং পিসীর বাড়ীতে না গিয়া শিষ দিতে দিতে সোজা অদ্বৈত কর্ম্মকারের কর্ম্মশালায় উপস্থিত হইল। তাহার বিবাহের কথাটা গ্রামে প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং অদ্বৈত তাহাকে দেখিয়াই হাত তুলিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "এই যে বাবাঠাকুর; এবার শাউড়ে হলে নাকি?"

হরিচরণ মৃদু হাসিয়া কোঁচার খুট দিয়া ঘোটা কাঠখানা ঝাড়িয়া তাহার উপর বসিয়া পড়িল। অদ্বৈত ছাড়া আরও দুই তিন জন লোক তথায় উপস্থিত ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "সব ঠিক ঠাক হয়ে গেল?"

ঈষৎ প্রফুল্ল কণ্ঠে হরিচরণ বলিল "হাঁ, কি করি বল, অনাথা বিধবা, কাঁদা কাটা করে, তার উপর সার্ব্বভৌম মশায়ের মত লোকের অনুরোধ। কাজেই মত দিতে হল; পিসী মা এখনো মত দেন নি। তিনি গোপালগঞ্জ হ'তে এক সম্বন্ধ এনেছেন, নগদ দুটী হাজার টাকা। তা আমি বলি পিসী মা, টাকায় কি আসে যায়, ব্রাহ্মণের জাতরক্ষা, আমি না নীলে বামুনের মেয়েটী পার হয় না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "হাঁ হাঁ, ওেনাদের যে আবার একটু দোষ আছে।"

ভ্রুকুটি করিয়া হরিচরণ বলিল, "ড্যাম দোষ! এখানকার লোক গুলো কি মানুষ! আর এই তরেই তো সার্বভোম মশায়ের এত জেদ। আমরা আমাদের ওখানকার সমাজের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা; আমি যদি মেয়েটীকে ঘরে নিয়ে যাই. কেউ কি মাথাটী নাড়তে পারবে? সব বেটাকে ঘাড় হেট করে বসে ওর হাতের ভাত খেতে হবে।"

তাহার এই অখণ্ড সামাজিক প্রভাব শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ হর্ষবিস্ময় বিমিশ্রিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। হরিচরণ আপনার নবোদগত গুম্ফরাশির মধ্যে হস্তাবর্ষণ করিতে করিতে তাহাদের দিকে এক একবার সগর্ব্ব কটাক্ষ

নিক্ষেপ করিল। তখন প্রথম বক্তা বলিল, "সে যাই হউক বাবাঠাকুর আমাদের আগে কিছু খাইয়ে দাও।

হরিচরণ হাসিতে হাসিতে ট্যাঁক হইতে কাগজের একটা ক্ষুদ্র মোড়ক বাহির করিয়া বক্তার দিকে ছুড়িয়া দিল। বক্তা মোড়কটী খুলিতে খুলিতে সহর্ষে বলিল, "বিয়ের কথায় বাবাঠাকুরের মেজাজটা দিল দরিয়া হয়েছে। দু'ছিলিম হবে।"

হরিচরণ বলিল, "না না, ভোরপুর ক'রে এক ছিলিম কর।"

বক্তা আদেশ পালনে মনোনিবেশ করিল। অতঃপর হরিচরণ অদ্বৈতের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এবার যে তোমাদের এখান থেকে চল্লাম হে অদ্বৈত।"

অদ্বৈত বাঁ হাতে জাঁতার শিকল এবং ডান হাতে শাঁড়াসীটা ধরিয়াই বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল; অন্যান্য সকলেও অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তখন হরিচরণ তাহাদিগকে জানাইল যে, সে আর পরাধীন ভাবে কাজ করিবে না। আজই সে পরেশ ডাক্তারের কাজে জবাব দিয়া আসিয়াছে। তাহাকে রাখিবার জন্য ডাক্তার অনেক অনুনয় বিনয়, সাধ্যসাধনা করিয়াছিল। 'এমন কি ডবল 'পে' দিতেও রাজী হইয়াছিল, কিন্তু শ্বশুর বাড়ীর গাঁয়ে চাকরী! সে একবারে স্পষ্টকথায় পরেশ ডাক্তারকে 'রিজাইন' দিয়া আসিয়াছে। ইহাতে ডাক্তার বাবু তাহার উপর যে একটু না চটিয়াছে এমন নয়; কিন্তু সে তো তাহার কাছে চাকরী করিতেছে না, সুতরাং সে এমন বাজে রাগকে আদৌ 'কেয়ার' করে না।

শুনিয়া সকলের মুখ ম্লান হইয়া গেল। হরিচরণের সহিত তাহাদের আজিকার পরিচয় নয়, সাত আট বৎসরের আলাপ, এতদিনের বন্ধুত্ব বন্ধন ছিন্ন করিয়া হরিচরণ চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া তাহারা যেন হর্ষে বিষাদ অনুভব করিল। অদ্বৈত ম্লান স্বরে বলিল, "এমন তর কাজ কেন কল্লে বাবাঠাকুর, চাকরী লক্ষ্মী, তাকে ছাড়তে আছে। তার ওপর বিয়ে থা ক'রে সংসারিক হবা!"

উদ্ধত স্বরে হরিচরণ বলিলেন, "ড্যাম চকরী। পরেশ ডাক্তারের কাছে আবার মনুষে চাকরী করে? ওর না আছে চক্ষুলজ্জা, না আছে মাথা, না আছে বিদ্যা বুদ্ধি। বিলেত গিয়েছিল, এই পর্য্যন্ত, গরু শুয়োর খেয়ে ফিরে এসেছে।"

শ্রোতৃবর্গ ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিল। তখন হরিচরণ যেরূপ পরেশ ডাক্তারের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিল। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই, পরেশ ডক্তারের ঔষধে এতকাল যে রোগী সব ভাল হইয়া আসিয়াছে, তাহা হরিচরণেরই গুণে। নতুবা ডাক্তারের লেখা মত ঔষধ দিলে সদ্যসদ্য যমালয়ে যাইত। একবার এক পেটের ব্যায়রামের রোগীকে লিখিয়া দিয়াছিল, গ্যালিসাই ৩ ড্রাম; গ্যালিসাই নিমোনিয়ায় চলে, হরিচরণ সেটাকে কাটিয়া দিয়াছিল। একবার নিমোনিয়া রোগীর প্রিস্‌কিপ্‌সনে লিখিয়াছিল। আরসেনিক ৩ গ্রেণ, সর্ব্বনাশ হরিচরণ তাহা কাটিয়া আধ গ্রেণ করিয়া দিল। আর একবার সর্দ্দিজ্বরের ব্যবস্থায় লিখিয়াছিল—সর্ব্বনাশ, এযে কট্‌ বিষ; খাইলে রোগী কি এক মহূর্ত্ত বাঁচিত। ভাগ্যে হরিচরণের হাতে এই সকল প্রিসক্রিপসন পড়িয়াছিল তাই রক্ষা; নতুবা কি যে হইত বলা যায় না।

হরিচরণের বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। হরিচরণ তখন তাহাদের সমক্ষে আরও নানাবিধ দুর্ব্বোধ্য ঔষধের নামোল্লেখ করিল এবং কতবার কত প্রকারে পরেশের ভুলভ্রান্তি হইয়াছিল ও সে ঐ সকল ভ্রম ধরাইয়া দেওয়ায় পরেশ তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাই প্রকাশ করিয়া প্রমাণ স্বরূপে জানাইল যে, এই সকল ভ্রমপূর্ণ প্রেসক্রিপ্‌সন এখনও ডাক্তারখানার ফাইলে বর্ত্তমান আছে। সে কাজে জবাব দিয়া আসিয়াছে, নতুবা আনিয়া তাহাদিগকে দেখাইতে পারিত।

দেখাইবার প্রয়োজনাও হইল না, শ্রোতৃবর্গ তাহার মুখের কথাতেই যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছে ইহা জানাইয়া দিল। তখন হরিচরণ তারপর কি করিবে ইহাই সকলের জিজ্ঞাস্য হইল। উত্তরে হরিচরণ জানাইল যে, সে কম্পাউণ্ডারী আর করিবে না, করিবার প্রয়োজনও নাই। বিবাহের পরই সে দেশে গিয়া ডাক্তারখানা খুলিবে, এবং নিজে ডাক্তারী করিবে। সে একবার ডাক্তারী আরম্ভ করিলে হীরুডাক্তার বা পরেশ ডাক্তারের মত লোককে কলিকা পাইতে হইবে না।

তাহার এই ভাবী উন্নতির আশায় সকলেরই মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, এবং তাহারা যেন বাবাঠাকুরের কৃপা হইতে কখনও বঞ্চিত না হয়, ইহাই প্রার্থনা করিল। হরিচরণ তাহাদিগকে অভয় দিয়া, ধূমপান শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিল।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে; অন্ধকার খুব জমাট বাঁধিয়া পথ ঘাট

ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। পথের আশে পাশে এক একটা গাছকে দূর হইতে কৃষ্ণবসনাবৃত-প্রেতমূর্ত্তির মত দেখাইতেছে; ঝিল্লীর অশ্রান্ত চীৎকারে নির্জ্জন পথের গাম্ভীর্য্য যেন আরও বর্দ্ধিত হইতেছে। সেদিন সঙ্গে আলো ছিল না; সুতরাং হরিচরণের গা যেন ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। সে গুণ্ গুণ্ করিয়া গান ধরিল।

"এখনো তারে চোখে দেখি নি,
শুধু বাঁশী শুনেছি।
মনো প্রাণো যা ছিল সবই দিয়েছি।"

গা-ছমছমানিটা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, গলাও তত উচ্চে উঠিল। ক্রমে তাহা সুর, ভাষা ছাড়িয়া বিকট চীৎকারে পরিণত হইল। সে চীৎকারে বৃক্ষশাখাসীন পক্ষীরা চঞ্চল হইয়া উঠিল, কুকুরগুলা সজাগ হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিল, শৃগালেরা পথ ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইল। কিন্তু হরিচরণের সে সকল দিকে লক্ষ্য ছিল না; সে গানের প্রথম চরণ দুইটী গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতে অভ্যাসে প্রবৃত্ত বালকের মত বারবার উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিতে করিতে দ্রুতপদে চলিল। যখন পিসীমার দরজায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাহার সঙ্গীতের বিরাম হইল।

কিন্তু বাড়ী ঢুকিতেই সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার ক্ষোভ ও বিরক্তির সীমা রহিল না। দেখিল, তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা অনিলচন্দ্র গলায় কাচা দিয়া বসিয়া আছে, পিসীমা তাহার কাছে বসিয়া সুখ দুঃখের কথা ব্যক্ত করিতেছেন। এ কথার অর্থ বুঝিতে হরিচরণের বিলম্ব হইল না, তথাপি পিসীমা ক্রন্দন জড়িত সুরে তাহাকে জানাইয়া দিলেন, "ওরে বাবা হরি রে, আমার অনেক আদরের বড় বৌ তোদের কাঙ্গাল ক'রে চলে গেছে রে!"

হরিচরণ বিরক্তিপূর্ণ মুখভঙ্গী করিল।

তারপর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের নিকট দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিল। প্রায় তিন চারিমাস হইতে মাতা জর ও কাশিতে ভুগিতে ছিলেন, অর্থাভাবে চিকিৎসা হয় নাই। তাহাতে রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায়। ক্রমে মাতা শয্যাশায়ী হন। বহু কষ্টে গ্রামের কবিরাজের নিকট দাতব্য ঔষধ সংগৃহীত হইল, কিন্তু পথ্য জুটিল না। জ্যেষ্ঠকে দুই তিনখানা পত্র লিখিয়া সংবাদ দেওয়া হইলেও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। মাতা তাঁহাকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তাঁহার সাধ পূর্ণ

হইল না। মধ্যমও ম্যালেরিয়ায় মাসাধিক কাল শয্যাগত। সুতরাং একা অনিলের ঘাড়েই যজমান, সংসার, রোগীর সেবা সকলই পড়িল,·কাজেই সে জ্যেষ্ঠের নিকট আসিতে পারিল না। তারপর রোগ যন্ত্রণায় ক্লান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে মাতা একদিন চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি 'হরি এলি বাপ, হরি এলি বাপ' বলিয়া বারবার কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর ঘরের ঘটীবাটী যাহা ছিল তাহা বেচিয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত ও সৎকার করা হইয়াছে। এক্ষণে কাল কি দিয়া দুই ভায়ে হবিষ্য করিবে তাঁহার সংস্থান নাই। তারপর মাতার শ্রাদ্ধ করিয়া কিরূপে শুদ্ধ হওয়া যাইবে তাহাও এক্ষণে জ্যেষ্ঠের বিবেচনাধীন।

হরিচরণ খুব গম্ভীর ভাবেই মাতার এই করুণ মৃত্যুকাহিনী শ্রবণ করিল, কিন্তু ভাল মন্দ কিছুই বলিল না।

হায়, কোথায় বিবাহ, আর কোথায় শ্রাদ্ধ! শুধু শ্রাদ্ধ হইয়া গেলেই কি আপদ্ চুকিবে, হয় তো কালাশৌচ বলিয়া এক বৎসর বিবাহ হইবে না। এই এক বৎসর কি শৈলর মাতা তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে? অসম্ভব। কত কষ্টে সার্ব্বভৌমকে হস্তগত করিয়া নিতান্ত অসম্ভব ঘটনাটাকেও সম্ভব করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু তরী শেষে কুলে আসিয়া ডুবিল। হায়, জগৎশুদ্ধ কি তাহার শত্রু? নতুবা গর্ভধারিণী মাতাও তাহার সহিত এরূপ শত্রুতা করিবেন কেন? তিনি কি আর মরিবার সময় পাইলেন না? আর সাতটা দিন পরে মরিলে তাঁহার কি কষ্ট ছিল? হায়, জগৎটা কি স্বার্থপর!

ইহার উপর শ্রাদ্ধ। নমোনম করিয়া তিলকাঞ্চনে সারিলেও পঁচিশ টাকার কমে হইবে না। তাহার নিকট তিন মাসের মাহিয়ানা যে ত্রিশটী টাকা পুঁজি ছিল, তাহা ঘটকের প্রণামী স্বরূপ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চরণে অগ্রিম সমর্পণ করিয়াছে। বিবাহ না হইলেও সে টাকা কি তিনি আর ফেরৎ দিবেন? এখন এ মাসের দশটী দিনের মাত্র মাহিনা পুঁজি। ডাক্তার বাবুকে ধরিলে কিছু পাওয়া যাইত, কিন্তু সে পথও বন্ধ। দূর হউক, সে এ সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাইবে না। উহারা দুইভায়ে যজমানদের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কোনরূপে দায় হইতে উদ্ধার হউক। সে একটাকা খরচ করিয়া কলিকাতায় গিয়া গঙ্গাতীরে শুদ্ধ হইয়া আসিবে। কিন্তু লোকে বলিবে কি? শৈল বা শৈলর মাতা ইহা শুনিলে কি ভাবিবে? হায় হায়, তাহার এমনই ইচ্ছা

হইতেছে যে; সে সংসার ত্যাগ করিয়া কোন্ দিকে চলিয়া যায়। মা যাহার সহিত এমন শত্রুতা সাধন করে, তাহার আর সংসারবাসে ফল কি?

ভাবিতে ভাবিতে এইরূপ গভীর বৈরাগ্য লইয়া হরিচরণ নিদ্রিত হইল, এবং স্বপ্নে দেখিল, সে ডাক্তার বাবুর সহিত শৈলর বিবাহ হইতেছে. আর সে বরযাত্র সাজিয়া লুচী খাইতে বসিয়াছে। হরিচরণ রাগে পা দিয়া লুচীর পাতাটা যেমন উঠানের দিকে—যেখানে সম্প্রদান কার্য্য হইতেছিল সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া দিতে গেল, অমনি ভিজা মাটীতে পা পিছলাইয়া সশব্দে পাতের উপর পড়িয়া গেল, লোকগুলা হাততালি দিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। হরিচরণ আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া পলাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু পতন হেতু পায়ে এমন আঘাত লাগিয়াছিল যে, উঠিয়া দাঁড়াইতেই পুনরায় উলটিয়া পড়িয়া গেল; লোকগুলা আরও উচ্চশব্দে হাসিতে লাগিল। সে হাসির শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; সে জাগিয়া দেখিল, অনেকটা বেলা হইয়া গিয়াছে, এবং যে হাসির শব্দে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, তাহা বরযাত্রীদের হাসি নয়, পিসীমার কাছে তাহার বিবাহের কথা শুনিয়া কনিষ্ঠ অনিলচন্দ্র উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিয়াছে। হরিচরণ দাঁতে দাত চাপিয়া উঠিয়া বসিল।

পিসীমার আদেশমত হরিচরণকে স্নান করিয়া আসিয়া ক্যাচা পরিতে হইল। কাল অনিলের হবিষ্য করা হয় নাই, সুতরাং পিসীমা সকাল সকাল তাহার হবিষ্যান্নের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। হরিচরণের এ সকাল কিছুই ভাল লাগিতেছিল না; সে চুপ করিয়া বসিয়া অতঃপর কি করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

এমন সময় রামচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং পরেশ তাহাকে এখনই সাক্ষাৎ করিতে ডাকিয়াছে ইহা জানাইল। ডাক্তার বাবুর আহ্বান শুনিয়া হরিচরণের মুখ শুকাইয়া গেল। কল্যকার কামারশালার কথাগুলা কি তাঁহার কাণে গিয়েছে? কোন লোকটা এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিল! সুতরাং হরিচরণ ভীতভাবে রামচরণকে বলিল যে, সে সময়ান্তরে গিয়া ডাক্তার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবে। রামচরণ কিন্তু সঙ্গে লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানাইল। হরিচরণ ইতঃস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু পিসীমা তাড়া দিয়া বলিলেন, "ওমা, বাবু ডেকেছেন, এক্ষুণি যা হরি; বাবুর দয়ার শরীর তোর এই মাতৃদায় দেখলে বাবু নিশ্চই একটা উপায় ক'রে দেবনে।"

অগত্যা হরিচরণকে উঠিয়া রামচরণের সহিত যাত্রা করিতে হইল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রবল উত্তেজনার পরই প্রবল অবসাদ আসে। শৈল চলিয়া গেলই পরেশের দেহ মন দুইই যেন অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িল। দিনের আলো ঝিমিয়া আসিল; রামচরণ আসিয়া ঘরে আলো দিয়া গেল। পরেশ তাহাকে কোন রোগী আসিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। রোগী দুই চারিজন আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের জন্য পরেশ পাছে নীচে নামে বলিয়া রামচরণ দরজা হইতেই তাহাদের বিদায় দিয়াছিল। সুতরাং প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে সে জানাইল যে, কোন রোগীই এক্ষণে আসে নাই। পরেশ মেঝের এদিক সেদিক একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

একটু পরে অনুপমা চা লইয়া ঘরে ঢুকিল। পরেশ দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া শুইয়াছিল, অনুপমার পায়ের শব্দ পাইয়াই ফিরিয়া চাহিল, এবং ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল, "চা এনেছ নাকি? দাও।"

অনুপমা নিঃশব্দে চায়ের বাটী হাতে দিল। পরেশ আগ্রহের সহিত তাহাতে একটা চুমুক দিয়া আরাম সূচক শব্দ করিয়া বলিল, "চমৎকার চা হ'য়েছে।"

এই প্রশংসাটাকে অনুপমা পরিহাস ভাবিয়া লইয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পরেশ বলিল, "বাস্তবিক, তুমি তো বেশ চা তৈরী কত্তে পার। শৈল বুঝি শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে?"

অনুপমা নতমুখে অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "হাঁ।"

পরেশ বলিল, "তা হোক, শুধু অপরের শিক্ষায় এমন ভাল জিনিষ হয় না। এর ভিতর তোমারও নৈপুণ্য আছে।"

এই প্রশংসাবাদে অনুপমা যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। পরেশ আর এক চুমুক চা উদরস্থ করিয়া প্রফুল্ল হাস্যের সহিত বলিল, দেখ, এ জিনিষটা তৈরী করা যে তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার, আমার খেয়ালই ছিল না। আমার উচিত ছিল, তোমাকে দেখিয়ে দেওয়া, 'তা না দিয়ে—যাক্,' শৈল দেখচি আমার সে শিক্ষকতার কার্য্যটুকু লাঘব ক'রে দিয়ে গিয়েছে।"

অনুপমা নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এই নিরুত্তর ভাবটুকু আজ যে পরেশের পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। পরেশের ইচ্ছা, অনুপমার সঙ্গে কতকগুলা বকিয়া সে মনের অবসাদকে

ঝাড়িয়া ফেলে। স্বতরাং অনুপমা নিরুত্তর থাকিলেও পরেশ ছাড়িল না। সে বাটীর চা টুকু নিঃশেষ করিয়া অনুপমার পায়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পাটা কেমন আছে?"

পরেশ দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িলে অনুপমা পা টাকে তাড়াতাড়ি সরাইয়া লইয়া সসঙ্কোচে বলিল, "ভাল আছে।"

পরেশ বলিল, "ভাল আছে কি রকম? ফোস্কা উঠেছে যে? মলমটা লাগিয়ে ছিলে? ভাল লাগাতে পার নি বুঝি? কৈ সেটা নিয়ে এস, আমি লাগিয়ে দিচ্চি।"

"আচ্ছা" বলিয়া অনুপমা স্বামীর মুখের উপর হাস্যপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। পরেশ বলিল, "তাতে দোষ কি? ডাক্তারী কত্তে গিয়ে আমাদের কত লোকের পায়ে হাত দিতে হয়।"

"তা হয় হোক" বলিয়া অনুপমা ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। পরেশ বলিল, "দেখ, আমাদের দেশের মেয়েদের এই এক প্রধান দোষ যে, তারা রোগে ওষুধ ব্যবহার কত্তে চায় না। এই কারণে তারা কষ্টও পায় বেশী। তবে তাদের এই একটা গুণ যে, খুব বড় কষ্টটাকেও তারা মুখ বুজে সহ্য ক'রে যেতে পারে।"

একটু শ্লেষের স্বরে অনুপমা বলিল, "মেয়েদের তো তোমাদের মত এত সুখের শরীর নয় যে, একটুতেই অস্থির হ'য়ে পড়বে।"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "শরীর মেয়ে পুরুষ সকলেরই সমান, তবে তোমা-দের সহিষ্ণুতা খুব বেশী বলতে হবে।"

স্বরে একটু তীব্রতা আনিয়া অনুপমা বলিল, "কাজেই, তা নইলে—"

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই অনুপমা থামিয়া গেল। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "তা নইলে কি হ'তো? সংসারটা ভেঙ্গে পড়তো?"

বলিয়া পরেশ একটু হাসিল। অনুপমা কোন উত্তর না দিয়া চায়ের সরঞ্জাম লইয়া বাহির হইয়া গেল। পরেশ একা বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরেশ আজ সকলের উপর যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা কাহারও নিকট আদৌ প্রীতিপ্রদ নয়। বিশেষ অনুপমার উপর যে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা নিতান্তই রূঢ়। এতটা রূঢ় ব্যবহারে অভ্যস্ত না হইলেও সে কেমন করিয়া যে ইহা সম্পন্ন করিল তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। শৈলর বিবাহের কথাটা শুনিয়া তাহার মেজাজটা এমনই বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল যে,

সে ইহা ভাবিবারও অবসর পায় নাই। কিন্তু তাহার সে মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ কি? বিবাহ হইবে না তো সে কি চিরদিন অবিবাহিত থাকিবে? তাহা অসম্ভব। আর তাঁহাদের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে খুব ভাল ঘরেও বিবাহ হইতে পারে না। একে সামাজিক দোষ, তাহার উপর অর্থাভাব! এ অবস্থায় হরিচরণের মত পাত্র ছাড়া আর কে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে?

কিন্তু গোল যত এইখানেই। তাহার ন্যায় শিক্ষিতা সৎস্বভাবা মহিলা যে হরিচরণের মত লোকের স্ত্রী হইবে, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক। ইহাতে কি সে সুখী হইবে? অসম্ভব। তবে এমন অসম্ভব ব্যাপারটা সম্ভব হইয়া আসিল কেন? তাহার অপরাধ কি? অপরাধের মধ্যে সমাজের মিথ্যা কলঙ্ক, অপরাধ এই যে তাহার অর্থাভাব। কিন্তু তাহার যে রূপ, যে গুণ আছে, তাহার দ্বারা কি এই অপরাধের মার্জ্জনা হইতে পারে না? কিন্তু মার্জ্জনা করিবে কে?—সমাজ? পরেশ তাহাকে মার্জ্জনা করিতে পারে, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারে না। এক স্ত্রী সত্ত্বে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ, ইহা যে পারে করুক, পরেশ করিতে পারে না; সে অনুপমার উপর আর যত প্রকারেই রূঢ় হউক, এমন পৈশাচিক রূঢ়তা তাহার দ্বারা অসম্ভব। সুতরাং এক্ষেত্রে তাহার কোনই হাত নাই, তাহার ক্রোধ বা বিরক্তি সকলই নিষ্ফল। আপনার অক্ষমতা স্মরণে পরেশ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

একটু পরে তারাসুন্দরী মালা হাতে আসিয়া দরজার বাহির হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরেশ জেগে আছিস্?"

পরেশ বলিল, "কে, পিসী মা?"

"হাঁরে শৈলর নাকি বিয়ে?"

"শুনছি।"

তারাসুন্দরী দরজার ভিতর আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "পাত্তর নাকি তোর কম্পাণ্ডার হরিচরণ।"

পরেশ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তারাসুন্দরী ক্ষণকাল গম্ভীরভাবে থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু ছেলেটী মনের মত হ'লো না।"

পরেশ উদাসস্বরে উত্তর করিল, "তা কি করবে বল, ওদের যে রকম অবস্থা!"

তারাসুন্দরী হাতের মালার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "তাহা হউক

বাপু অবস্থা, তাই ব'লে অমন মেয়েটীকে এমন ক'রে জলে ফেলে দেওয়া—না বাছা, আমার তো মোটেই পছন্দ হয় না।"

ম্লান হাসি হাসিয়া পরেশ বলিল, "তোমার আমার পছন্দে কি আসে যায় পিসীমা ?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে "তা বটে" বলিয়া তারাসুন্দরী মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। কয়েকটা মালা ঘুরাইয়া মুখ তুলিয়া ঈষৎ চাপা গলায় বলিলেন, "আমার কিন্তু ইচ্ছা ছিল—"বলিয়া তিনি একবার দরজার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন ; এবং পুনরায় দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল, মেয়েটীকে ঘরে আনি।"

পরেশ একবার পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল। তারাসুন্দরী আর একবার বাহিরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোরা সব বাছা আজ কালকার ছেলে, তোদের আলাদা মেজাজ, আলাদা মত ; কিন্তু এই যে আগে কুলীনের ঘরে বিশ পঁচিশটা বিয়ে কত্তো, তাতে কি এতই দোষ হ'তো ? আমারই ঠাকুরদাদা, তাঁর তো শুনি সাতটা বিয়ে। আমার বেশ মনে পড়ে তাঁর শেষ পক্ষের স্ত্রী মারা যেতে বাবা বটা ক'রে শ্রাদ্ধ করলেন।"

পরেশ নিরুত্তর। তারাসুন্দরী বলিলেন, "তোদের আজকাল দু' পাতা ইংরিজী প'ড়ে আলাদা আইন হ'য়েছে। এক স্ত্রী থাকতে আর বিয়ে কত্তে নাই। সত্যি বলতে কি বাছা, বৌমাকে নিয়ে তুইও জলে পুড়ে খাক্, আমিও পোড়া কপালী, দু'দিন যে সুখের মুখ দেখবো তাও হ'লো না। তুই কি বলিস্ ? এখনো দেখ্ !"

তীব্র কণ্ঠে পরেশ উত্তর করিল "ছিঃ পিসী মা।"

অগত্যা পিসীমাকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াই নিরস্ত হইতে হইল। পরেশ প্রসঙ্গটাকে ফিরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিল, "একটা কাজ বড় খারাপ করে ফেলেছি পিসিমা, রাগের মাথায় হরিচরণকে হঠাৎ জবাব দিয়েছি।"

বিস্ময়ের সহিত তারা সুন্দরী বলিলেন, "একেবারে জবাব দিয়েছিস্ ? বলিস্ কিরে। আহা ছেলেটী বড় ভাল ছিল, পিসীমা পিসীমা ক'রে আসতো। জবাব দিলি ?"

পরেশ বলিল "তাই ভাবছি।"

তারা সুন্দরী বলিলেন, "না বাছা, বামুনের ছেলে, জবাব দিস্ না, মনে দুঃখু করবে।"

পরেশ বলিল, "আচ্ছা, কাল ডাকিয়ে আন্‌বো।"

অতঃপর তারা সুন্দরী সংসারিক আরও দুই চারি কথা কহিয়া প্রস্থান করিলেন। পরেশ শুইয়া পড়িল।

খানিক পরে অনুপমা আসিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিল। পরেশ চিন্তামগ্ন ছিল, সুতরাং একটু চমকিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল। "কে ?"

মৃদু স্বরে অনুপমা বলিল, "আমি।"

পরেশ আর কিছু বলিল না; অনুপমা আপনার হাত খানি বাহির করিয়া আস্তে আস্তে তাহার পায়ের উপর বুলাইতে লাগিল। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু বল্‌তে এসেছ কি?"

মৃদু হাসিয়া অনুপমা বলিল, "কিছু বলবার না থাকলে কি তোমার কাছে আসতে নাই?"

পরেশ সহাস্যে উত্তর করিল, "অপরের থাকলেও তোমার বোধ হয় নাই।"

"কিসে জান্‌লে?"

"কোনও দরকার না হইলে তো এসো না।"

"এই তো এসেছি।"

"সুতরাং, বোধ হয় নিশ্চই কিছু বক্তব্য আছে।"

"বক্তব্যটা কি বলতে পার?"

"অতদুর অনুমান করবার ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু বক্তব্য কিছু আছে কিনা বল দেখি?"

মৃদু হাসিয়া অনুপমা বলিল, "আছে।"

পরেশ বলিল, "বেশ বলতে পার।"

অনুপমা বলিল, "বললে শুনবে?"

পরেশ বিস্ময় পূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। অনুপমা সহাস্যে বলিল, "আমি যদি কোন অনুরোধ করি তা রাখবে?"

পরেশ ঈষৎ বিস্ময়োৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "তুমি তো কোন দিন কিছু বল নাই, এই তোমার প্রথম অনুরোধ। এ অনুরোধ বোধ হয় রাখতে পারি। কিন্তু আমি স্বামী, তুমি স্ত্রী, অতটা দুরে থাক কেন?"

একটু সোহাগ বিমিশ্রস্বরে অনুপমা বলিল, "তাহোক, তুমি কথা রাখবে কি না বল।"

পরেশ বলিল, "যদি নিতান্ত অসাধ্য না হয়, তবে রাখবো।"

"দেখো?"

"হাঁ।"

অনুপমা এবার একটু সোজা হইয়া, কাসিয়া, গলাটাকে একটু পরিস্কার করিয়া লইয়া ধীরস্বরে বলিল, "তুমি শৈলকে বিবাহ কর।"

পরেশের সমস্ত শরীর যেন বিদ্যুতের আঘাতে শিহরিয়া উঠিল। মুখ দিয়া বিস্ময় সূচক একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল। অনুপমা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং প্রশান্ত কণ্ঠে বলিল, "এই আমার প্রথম আর শেষ অনুরোধ; তুমি তিন সত্য করেছ, এখন রাখতে হয় রাখ, না হয় যা ইচ্ছা কর্ত্তে পার।"

পরেশ উত্তেজিত কণ্ঠে "পাষাণী" বলিয়া ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া বসিল, এবং অনুপমাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। কিন্তু অনুপমা ধরা দিল না, সে দ্রুত পদক্ষেপে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

গল্পলহরী

বর্ষ } চৈত্র, ১৩২৫ { ১২শ সংখ্যা

সব শাদা।

(গল্প)

[শ্রীদেবিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]

সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এসেছে, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে ছেয়ে গেছে, আকাশ মেঘে ভরে উঠেছে, তখন কি জানি কেন হঠাৎ একদিন তার সেই দয়া-মায়া-হীন নিষ্ঠুর প্রাণের মধ্যে প্রশ্ন উঠ্‌ল—'সারা জীবন ধরে এ আমি করেছি কি!' মানুষের মনের মাঝে অমন কত প্রশ্ন ওঠে, আবার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে যায়। কিন্তু তার এ প্রশ্নটা তো উঠে আবার তখনই মিলিয়ে গেল না! কে যেন তার হৃদয়ের মাঝে যখন তখন মাথা নাড়া দিয়ে বলতে লাগ্‌ল—"এ তুমি সারাজীবন করেছ কি!"

সে ডাকাত—চিরদিন চুরি ডাকাতি করেই কাটিয়েছে। সারা জীবনের মধ্যে সে যে কত মানুষ মেরেছে, কত লোকের সর্ব্বনাশ করেছে, তার আর ইয়ত্তা নাই। বাপ মা তার কি নাম রেখেছিল কে জানে, কিন্তু লোকে তাকে 'রুদ্রকান্ত' বলেই জান্‌ত। হৃদয়টা তার নামেরই অনুরূপ হয়ে উঠেছিল। 'রুদ্রকান্ত'—এই নামটা উচ্চারিত হ'তে শুন্‌লে লোকে ভয়ে কাঁপত। যৌবনে যখন তার শরীরে তেজ ছিল, তখন তারই লাঠির দাপে বাঘে বলদে নাকি হিংসা ভুলে গিয়ে একই ঘাটে জল খেয়েছে!

আজ সে জরাগ্রস্ত—অশীতিপর বৃদ্ধ। শরীরে সে তেজ নাই, মনে সে ফূর্ত্তি নাই, বাহুতে সে বল নাই! আজ তার হাত পা সব শিথিল হয়ে পড়েছে, চর্ম্ম লোল হয়ে গেছে, কপাল কুঞ্চিত হয়েছে। আজ আর সে তেমন সোজা

হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমন ভাবে লাঠি ধরতে পারে না। জীবনের পরপারে দাঁড়িয়ে আজ তার মনে হল—তাইত, আমি করেছি কি! কিন্তু কৈ, এতদিন তার ও কথা একবারও তো মনে হয়নি—জীবনের বসন্তকাল যখন ছিল তখন সে গো-হত্যা, ব্রহ্ম-হত্যা করতে, লোকের সর্ব্বনাশ করতে কৈ এতটুকুও তো কুণ্ঠা বোধ করেনি। জীবন-সায়াহ্নে যখন এ প্রশ্নটা তার মনে এল, তখন তার পাপের ফল এ জীবনেই ফলতে আরম্ভ হয়েছে—তার সমস্ত শরীর কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছে, হাত পায়ের আঙ্গুল সব গলে গলে পড়ে গেছে, সর্ব্বাঙ্গে ঘা হয়েছে, দেহের রং কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে, দাঁত সমস্ত পড়ে গেছে, মাথার চুল সব শাদা হয়ে গেছে, মুখখানা কেমন কেকাসে হয়ে পড়েছে। আজ আর যদিও সে লাঠি ধর্ত্তে পারে না, তবুও সে তার এই এতদিনের সুখের দুঃখের সঙ্গী রূপায় বাঁধানো লাঠিটাকে কাছছাড়া কর্ত্তে পারেনি। এই লাঠিতেই সে কত লোকের মাথা ফাটিয়েছে, এই লাঠিতেই সে কতলোকের সর্ব্বনাশ করেছে, আর আজ এই লাঠির উপর ভর করেই তাকে দাঁড়াতে হচ্চে—এই লাঠিই আজ তার একমাত্র আশ্রয়! লাঠিটার দিকে সে একবার চেয়ে দেখলে। তার মনে হল, এই লাঠিই তাকে হিড় হিড় করে পাপের পথে টেনে নিয়ে গিয়ে আজ এই দুর্দ্দশা করেছে! লাঠিটাকে ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিতে তার ইচ্ছা হলো কিন্তু তা সে পারলে না—ছুঁড়ে ফেলার পরিবর্ত্তে বরং লাঠিটাকে বুকের মাঝে টেনে এনে সে তার গত জীবনের মধ্যে তাকিয়ে বেশ করে দেখতে লাগল—যদি কোথাও এতটুকু আলোর রেখা দেখতে পায়! কিন্তু আলো সেখানে যে মোটেই নাই—সবই অন্ধকার, কেবল অন্ধকার! ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায় সে হতাশ হয়ে তার চোখ দুটো সেই অন্ধকারের মাঝ থেকে ফিরিয়ে নিলে, কিন্তু আলোর এতটুকু ক্ষীণরশ্মিও যে তার জীবনে কোথাও নেই! যেদিকে চাইবে কেবলই অন্ধকার!

সে স্থির করলে, এরূপভাবে আর আমি যন্ত্রণা সহ্য করব না, বরং ঐ পাহাড়ের উপর গিয়ে ওখান থেকে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এ পাপজীবনের শেষ করব। আজীবনের সম্বল সেই লাঠিতে ভর ক'রে সে ধীরে ধীরে গিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠল, তারপর সে তার হাত দুটো যোড় ক'রে জীবনে ভুলেও যাঁকে একবার ডাকেনি, তাঁর প্রতি চোখ দুটো তুলে মনে মনে কি জানালে, চোখ দুটো সজল হয়ে এলো। তারপর এ দুর্ব্বলতা থেকে যখন সে নিজেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য ঠিক হয়ে দাঁড়াল, তখন

কোথা হ'তে একটা নিষেধ-বাণী এসে তার কানে পৌঁছল। বিস্মিত হ'য়ে পেছন ফিরে চাইতেই সে দেখতে পেলে,—তারই পশ্চাতে একজন জটাজূটমণ্ডিত, প্রশান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সে ক্ষুব্ধ হ'য়ে বল্লে—"ঠাকুর, কেন আমায় মৃত্যুর মুখ থেকে আবার এ যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে ফিরিয়ে আন্‌লে?"

সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে বল্লেন,—"মলেই কি তুমি শান্তি পাবে মনে করেছ?" সন্ন্যাসীর প্রশ্নে সে কাতর হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ল। সন্ন্যাসী তাকে উঠিয়ে তার কানে কানে কি বল্লেন। সে চীৎকার করে বলে উঠ্‌ল—"আচ্ছা, তাই হবে।" তারপর সন্ন্যাসী বল্লেন—"ঐ যে অশ্বত্থ গাছটা দেখতে পাচ্ছ—ওর সমস্ত পাতা কটা যেদিন শাদা হয়ে যাবে, সেদিন তোমার পাপের ক্ষয়, আর সেদিনই তোমার মুক্তি—তার আগে নয়।" সে কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কল্লে—"ও যে অসংখ্য অসংখ্য পাতা—ও সমস্ত শাদা হতে কতদিন লাগবে ঠাকুর?" সন্ন্যাসী বল্লেন,—"কতদিন যে লাগবে তা হিসেব করে বলা যায় না।" সে আবার বল্লে,—"আমি কি ততদিন বাঁচব?" সন্ন্যাসী বল্লেন—"হাঁ, তার আগে তোমার মরণ হবে না—যাও, এখন তোমায় যা' কাজ বলে দিলুম করগে।" তার মুখের ওপর যন্ত্রণা ফুটে উঠ্‌ল, সে চেয়ে দেখলে কিন্তু সন্ন্যাসীকে আর দেখতে পেলে না। তখন সন্ন্যাসী তার কানে কানে যা বলে দিয়েছিলেন তাই করবার জন্যে নীচে সেই অশ্বত্থ গাছের তলায় সে নেমে গেল।

তারপর সে যে সেখানে কি অধীরভাবে সন্ন্যাসীর কথামত দিন কাটাতে লাগ্‌ল তা বলবার নয়। কোনদিন সে উপবাস দিয়ে কাটিয়ে দেয়, আর কোন দিন বা দুটো বেলপাতা খেয়েই তার চলে যায়। এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগ্‌লো, আর সে অধীর আবেগে কতদিনে সব পাতাকটী শাদা হবে তারই প্রতীক্ষায় বসে রইল। কি সে কষ্ট—কি সে যন্ত্রণা! কখনও সে চেঁচিয়ে কাঁদে, আর কখনও বা হাতযোড় করে বলে—"ঠাকুর, কতদিনে মুক্তি পাব?" এমনি করে যখন পনেরটী বছর কেটে গেল তখন সে একদিন প্রভাতের প্রথম সূর্য্যালোকসম্পাতের সঙ্গে দেখ্‌লে যে, একটী মাত্র পাতা এতদিনের মধ্যে শাদা হয়ে উঠেছে। অসংখ্য পাতার মধ্যে একটী মাত্র পাতা এই দীর্ঘ পনেরটী বছরে শাদা হয়েছে—সব শাদা হবে কতদিনে—সে দিন কতদূরে! কতকাল সে এমনভাবে অপেক্ষা

করে বসে থাক্‌বে! কতকাল তাকে এমন কঠোর তপস্যা কর্ত্তে হবে! যন্ত্রণায় তার বুক ফেটে যেতে লাগলো। আবার তার মর্‌তে সাধ হল—আর পনের বছর এমনি প্রতীক্ষা করে থাক্‌লে হয়ত আর একটী পাতা শাদা হবে—এর চেয়ে কি মরণ ভাল নয়!

এমনি চিন্তায় সে মগ্ন হয়ে আছে, এমন সময় একটা করুণ চীৎকার কোথা হ'তে বাতাসের সঙ্গে ভেসে এসে তার কানের পর্দায় আঘাত কল্লে। শব্দটা তার প্রাণের মাঝে গিয়ে লাগ্‌ল। সে কিছু বিস্মিত হল—এমন শব্দ সে জীবনে কতবার শুনেছে! যখন নিরাশ্রয় পথিকের মাথায় লাঠি মেরে তার সমস্ত ধনসম্পত্তি কেড়ে নিত, তখন সেই পথিক এমনিভাবেই তো চীৎকার কর্ত্ত! যখন মায়ের কোল থেকে সুপ্ত শিশুকে কেড়ে নিয়ে সে পাথরের উপর আছাড় মার্ত্তো, তখন শিশুহারা জননীর বিলাপধ্বনি তো ঠিক এমনিভাবেই তার কাণে লাগতো! আজ আবার এমন শব্দ কোথা হতে আসে? শব্দটা ক্রমে নিকটবর্ত্তী হতে লাগ্‌লো। জীবনে সে কতবার এমন কাতরধ্বনি শুনেছে কিন্তু আজকের মত সে ধ্বনি কখনও তো তার হৃদয়ে যেয়ে এমনভাবে আঘাত কর্ত্তে পারেনি! কাতর ক্রন্দনে তারও হৃদয় আজ কেঁদে উঠ্‌ল—সে আর স্থির থাকতে পার্‌লে না। যে দিক থেকে শব্দটা আস্‌ছিল সেইদিকে সে তার দীপ্ত চক্ষু দুটো ফেরালে। দেখতে পেলে, একটা অস্পষ্ট স্ত্রী-মূর্ত্তি আগে আগে ছুটে আস্‌ছে, আর তারই পশ্চাতে ছুটে আস্‌ছে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত যমদূতাকৃতি একটা পুরুষ মূর্ত্তি! নিমেষের মধ্যে ব্যাপারটা সে বুঝে নিলে। চোখ দুটো তার জ্বলে উঠ্‌ল—হাতে যদিও আঙ্গুল ছিল না, তবুও সেই ঠুঁটো হাত দিয়ে তার সেই লাঠিটা জড়িয়ে ধরে পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়ালো। কি! তার চোখের সাম্‌নে এমনি একজন অসহায় বৃথা চীৎকার করবে, আর সে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে! কিন্তু জীবনের এই শেষ কটা দিনে সে কি আবার একটা হত্যা করে বস্‌বে!' সে একবার সেই অশ্বত্থ গাছের শাদা পাতাটীর দিকে চাইলে। ভাবলে, হয়ত ওটিও আবার যেমন ছিল তেমনি হয়ে যাবে।

একবার সে ইতস্ততঃ কল্লে কিন্তু পিশাচমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি পড়্‌তেই তার রক্ত আবার গরম হয়ে উঠ্‌ল—সে লাঠি নিয়ে সেইদিকে ভীমবেগে দৌড়ল।

তার সেই ঠুঁটো হাতের একঘা খেয়েই লোকটা পড়ে গেল। তার এ শক্তিহীন, অঙ্গুলিহীন হাতে কোথা হতে এতটা শক্তি এলো তা সে নিজেই

বুঝতে পাল্লে না ! লোকটার মুখ দিয়ে দুবার দু'ঝলক রক্ত উঠ্‌ল, তারপর সে চিরকালের মত চক্ষু মুদ্‌ল।

রুদ্রকান্ত ভাব্‌ল, হায়, হায়, কর্‌লাম কি ! জীবনের শেষ কটা দিনে আবার একটা মানুষ মেরে পাপের বোঝা বাড়িয়ে ফেল্‌লাম ! পনেরো বৎসরের পুণ্যফলে আজ একটীমাত্র পাতা শাদা হয়েছে— এ পাপে সেটীও হয়ত ঘুঁচে গেল !

এই ভেবে সে সেই শাদা পাতাটীর দিকে চেয়ে দেখলে। সেদিকে দৃষ্টিপাত করবামাত্র সে যা' দেখতে পেলে, তাতে বিস্ময়-স্তম্ভিত হয়ে কাঠের পুতুলের মত তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইল—চোখ আর ফিরিয়ে নিতে পার্‌ল না ! কোন্ ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালপ্রভাবে এমন কাণ্ড ঘট্‌ল তা' সে ভেবে উঠতে পাল্লে না। সে দেখলে, গাছের সব পাতাকটাই শাদা হয়ে গেছে !

বিপ্লব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

[লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।]

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

সকালে উপস্থিত রোগীদের ব্যবস্থা ও ঔষধ দিয়া পরেশ অতঃপর কি করিবে তাহাই ভাবিতেছিল, এমন সময় হরিচরণ কাচা গলায় দিয়া উপস্থিত হইল এবং নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে পরেশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহার অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইল এবং প্রীতিপূর্ণ-স্বরে তাহাকে পুনরায় কাজ করিতে বলিয়া তাহার মাতৃশ্রাদ্ধে যথাসম্ভব সাহায্য করিবার আশ্বাস দিল। হরিচরণ এতটা আশা করে নাই, সুতরাং পরেশের এই সদয় ব্যবহারে সে শুধু আনন্দিত হইল না, যথেষ্ট বিস্ময়ও অনুভব করিল। তারপর পরেশ উঠিয়া গেলে সে ডাক্তার বাবুর এই অসম্ভব সদয় ব্যবহারের কারণ কি তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

অনেক ভাবিয়া শেষে সে স্থির করিল, তাহার কার্য্যদক্ষতাই ইহার একমাত্র কারণ; তাহার মত অভিজ্ঞ কম্পাউণ্ডার দেশে আর নাই। সুতরাং কয়েক দিন পরেই বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব করিতে হইবে, এবং অদ্যই অদ্বৈত কামারের বাড়ী গিয়া গুপ্ত কথাগুলি যাহাতে ব্যক্ত না হয় সে সম্বন্ধে লোকগুলাকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে।

পরেশ বাহির হইয়া শৈলদের বাড়ীর দিকে চলিল। পথে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সার্ব্বভৌম মহাশয় তাহার সম্পূর্ণ আরোগ্য-লাভে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং তাহার আরোগ্যের জন্য তিনি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন, ইহাও প্রকাশ করিতে ছাড়িলেন না। অতঃপর পরেশ শৈলদের বাড়ী যাইতেছে শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ সহকারে বলিলেন যে, পরেশের সহিত মেয়েটার বিবাহ দিবার জন্য তিনি বধূমাতাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ও মেয়েটী চিরকালই একরোখা, গুরুজনের আদেশ প্রতিপালন করে না; আর এই দোষেই সে এত কষ্ট ভোগ করিতেছে। সপত্নীর উপর কন্যাদানে সে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। কিন্তু সেজন্য পরেশের বিবাহ কি আটক থাকিবে? কত রাজা রাজড়া তাহাকে মেয়ে দিবার জন্য প্রস্তুত। এত বড় বিদ্বান্, এতবড় ডাক্তার এ তল্লাটে কি আর আছে? তাহার মত লোক কখন আকুলীর মেয়েকে লইয়া সংসার করিতে পারে না। শীঘ্রই যে কোন রাজকন্যা আসিয়া তাহার গৃহশোভা বর্দ্ধন করিবে, সার্ব্বভৌম মহাশয় এ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া রহিয়াছেন। রমার মেয়ের কপাল! আঁস্তাকুড়ের পাতা কখন স্বর্গে যায় কি?

পরেশ কষ্টে হাস্য সম্বরণ পূর্ব্বক এই সহৃদয়তার জন্য সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিল। সার্ব্বভৌম মহাশয় অদূরবর্ত্তী শম্ভু পালের দোকানে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, পরেশ ডাক্তারের মত পাষণ্ড আর দ্বিতীয় নাই, এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং এজন্য সে সার্ব্বভৌম মহাশয়কে ধরিয়া বসিয়াছে যে, রমানাথের মেয়েটী তাহার হাতে দেওয়া হউক। এজন্য কত উপরোধ অনুরোধ; কিন্তু তাহার অনুরোধে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ন্যায় ধার্ম্মিক ব্যক্তি কি এমন ঘোরতর অধর্ম্মের কাজ করিতে পারেন? দেহে প্রাণ থাকিতে নয়।

যাহারা পথিমধ্যে সার্ব্বভৌমের সহিত পরেশকে কথোপকথন করিতে

দেখিয়াছিল, তাহারা সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিল না, তাহারা এই ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের নির্ভীক ধর্ম্মপরায়ণতায় মুগ্ধ হইল।

কাত্যায়নী পূজায় বসিয়াছিলেন, পরেশকে উপস্থিত দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে গেলেন। পরেশ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে উঠিতে নিষেধ করিয়া শৈল কোথায় জিজ্ঞাসা করিল। কাত্যায়নী বলিলেন, "তার একটু জ্বরের মত হয়েছে, ঘরে শুয়ে আছে।"

শৈলর অসুখের কথা শুনিয়া পরেশ যেন একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। কাত্যায়নী বলিলেন, "তাকে একবার দেখে এস বাবা, আমি ততক্ষণ পুজোটা সেরে নিই।"

পরেশ শয়নগৃহের দিকে অগ্রসর হইল, কাত্যায়নী পুনর্ব্বার আচমন করিয়া পূজায় মনোনিবেশ করিলেন।

পরেশ ঘরে ঢুকিয়াই ডাকিল, "শৈল!"

শৈল উপুড় হইয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল; পরেশের আহ্বানে সচকিতে মুখ তুলিয়া চাহিয়াই আবার মুখটাকে বালিসে গুঁজিয়া দিল। সেই নিমেষের দৃষ্টিতেই পরেশ বুঝিতে পারিল, শৈল কাঁদিতেছে, তাহার চক্ষু দুইটা এখনও সম্পূর্ণ অশ্রুবিমুক্ত হয় নাই। পরেশ আস্তে আস্তে গিয়া বিছানার কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, এবং শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার জ্বর হয়েছে?"

শৈল কোন উত্তর দিল না। পরেশ বলিল, "হাতটা দেখি।" বলিয়া পরেশ হাত বাড়াইল। শৈল বাঁ হাতটা সরাইয়া বুকের ভিতর রাখিয়া চাপিয়া রহিল। পরেশ হাত দিয়া তাহার কপালের উত্তাপ পরীক্ষা করিতে গেল; কিন্তু কপালে করস্পর্শ হইবামাত্র শৈল তীব্রবেগে উঠিয়া বসিল, এবং রোদন-রক্তিম চোখ দুইটা পরেশের মুখের উপর স্থাপন করিয়া ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কেন বলুন দেখি আপনি—"

বলিয়া সে মুহূর্ত্তকাল নিঃশব্দে পরেশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আবার ব্যস্তভাবে শুইয়া পড়িল, এবং মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরেশ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বাহির হইয়া যেখানে কাত্যায়নী পূজা করিতেছিলেন, সেইখানে তাঁহার পাশে একটু দূরে বসিয়া পড়িল। কাত্যায়নী ইহাতে যেন একটু অস্বস্ত হইয়া উঠিলেন। পরেশ বলিল "আপনি পূজো করুন, আমি দেখি।"

ঈষৎ হাসিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "মেয়েমানুষের পূজোর কি দেখবে বাবা ?"

পরেশ বলিল, "দেখবার যদি কিছু থাকে, তা আপনাদের কেবল পূজোয় কেন, সকল কাজের মধ্যেই আছে। আমাদের নীচ ভণ্ডামি, ব্যর্থ অভিমানের উপর শ্রদ্ধার, ভক্তির, মমতার আবরণ দিয়ে আপনারাই যে সংসারটাকে শান্তিময় করে রেখেছেন মা।"

মৃদু হাসিয়া কাত্যায়নী পূজায় বসিলেন। পরেশ স্থিরভাবে বসিয়া তাঁহার পূজা দেখিতে লাগিল। শিবপূজা শেষ করিয়া কাত্যায়নী দেবী মহিম্নস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন; তাঁহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ, মধুর স্বরভঙ্গী পরেশ মুগ্ধ-বিহ্বল চিত্তে বসিয়া শুনিতে লাগিল। সে শুনিল, কাত্যায়নী ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে পড়িতেছেন—

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগং পশুমতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"

পরেশ ভাবিল, যাহাদের স্তোত্রে, নীতিতে, নিত্যপূজায় এত উদার নীতি, তাহারা ধর্ম্মের ভাণে এত সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেয় কেন ?

পূজা শেষ হইলে কাত্যায়নীর সহিত পরেশও দেবতাকে প্রণাম করিল। প্রণামান্তে হাত পাতিয়া বলিল, "চরণামৃত দাও মা।"

কাত্যায়নী দেবতার চরণামৃত দিলেন। পরেশ তাহা খাইয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "অনেক দিন হতে একটা কথা বলবো মনে করি, কিন্তু আজ আর না বলে থাকতে পাচ্চি না।"

কাত্যায়নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কি কথা বাবা ?"

পরেশ বলিল, "শৈলর বিবাহ সম্বন্ধে।"

কাত্যায়নী চমকিতভাবে পরেশের মুখের দিকে চাহিলেন। পরেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি তো হরিচরণের সঙ্গে তার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেছেন।"

কাত্যায়নী বলিলেন, "আমি কোন মতামত প্রকাশ না করলেও ঠাকুর নিজে দাঁড়িয়ে সব কথা স্থির করে দিয়েছেন।"

হরিচরণের সহিত শৈলর বিবাহের অস্বাভাবিক রহস্য এতক্ষণে পরেশের

নিকট যেন খুব স্বাভাবিক, খুব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তাঁর এই হঠাৎ হিতৈষিতার কারণ ?"

কাত্যায়নী কোন উত্তর করিলেন না। পরেশ বলিল, "কিন্তু আপনি তো কোন প্রতিবাদ করেন নি ?"

কাত্যায়নী বলিলেন, "প্রতিবাদ করে কি করবো বাবা ? মেয়ের বিয়ে তো দিতেই হবে।"

পরেশ উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু এর নাম কি বিয়ে ?"

"অদৃষ্ট !" বলিয়া কাত্যায়নী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিষাদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কাল ওবাড়ীর গিন্নীর কাছে একটু অমত প্রকাশ করেছিলাম, তাই শুনে ঠাকুর আজ সকালে যে তিরস্কার করে গিয়েছেন—" বলিয়া কাত্যায়নী একটু থামিয়া, আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমাকে যাই বলুন, কিন্তু মেয়েটাকে—"

পরেশ ব্যস্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তাকে কি বলেছেন ?"

কাত্যায়নী বলিলেন, "সে কুলটা, তোমার কাছে যায়, এইরকম কত কথা। শেষে বলে গিয়েছেন, এরকম হলে আমাদের গ্রাম হতে দূর করে দেবেন।"

ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে পরেশ বলিল, "তিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা নাকি ?"

কাত্যায়নী শূন্যে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাষ্পব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "গরীবের উপর দণ্ড প্রয়োগ কত্তে বেশী ক্ষমতার দরকার হয় না বাবা।"

কাত্যায়নীর নেত্রপ্রান্ত হইতে একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। পরেশ দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল ; তার পর অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলিল, "আমি এতদিন বলি বলি করেও যে কথাটা বলতে পারি নাই, আজ সেই কথাটাই বলছি, আপনি আমার উপর নির্ভর কত্তে পারেন ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "যে অকূল সমুদ্রে ভাসছে, সে যে একগাছা তৃণকেও আঁকড়ে ধরতে পারে না বাবা।"

উৎফুল্লকণ্ঠে পরেশ বলিল, "কিন্তু বিধাতা সার্ব্বভৌম মহাশয়ের উদ্যোগ আয়োজন সব পণ্ড করে দিয়েছেন। হরিচরণ বেচারীর মা মারা গিয়েছে।"

পরেশ দেখিল, এ কথায় কাত্যায়নীর মুখভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না ; তাহা তেমনি স্থির, তেমনি বিষাদগম্ভীর। পরেশ বিনীতস্বরে বলিল, "আপনি যদি আমার উপর নির্ভর কত্তে পারেন, তাহলে আমার একটা অনু-

রোধ, আপনি শৈলর বিবাহের জন্ত একটুও ভাববেন না। সে ভার আমার।"

কাত্যায়নী তাহার মুখের উপর আশাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পরেশ বলিল, "কিন্তু তার আগে আপনাদের এ স্থান ত্যাগ কত্তে হবে।"

কাত্যায়নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় সব?"

পরেশ বলিল, "আমার বাড়ীতে। অবশ্য আমার বাড়ীকে আপনি পরের বাড়ী—"

বাধা দিয়া সহাস্যে কাত্যায়নী বলিলেন, "আমি তা মনে করি না বাবা।"

পরেশ বলিল, "তা জানি বলেই আমি এ প্রস্তাব কত্তে সাহসী হয়েছি। আর এটাও বলে রাখি যে, পিসীমা বা অনুপমার কাছে আপনাদের সম্মানের তিলমাত্র হানি হবে না।"

বলিয়া পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। কাত্যায়নী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিন্তু জান কি বাবা, কত বড় গুরুভার তুমি গ্রহণ কচ্চো? বোধ হয় সমাজের কোন ভদ্রঘরের ছেলে আমার মেয়েকে গ্রহণ কত্তে সম্মত হবে না।"

বলিয়া তিনি মস্তক অবনত করিলেন। পরেশ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আর কেউ না করে, আমি নিজে গ্রহণ করবো।"

বলিয়া পরেশ আর কিছু শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরেশ যখন বাড়ী ফিরিল, তখন অনেকটা বেলা হইয়াছে। সে ঘরে ঢুকিতেই অনুপমা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত বেলা পর্য্যন্ত না খেয়ে দেয়ে কোথায় বসেছিলে?"

পরেশ একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া বলিল, "শৈলদের বাড়ীতে ছিলাম।"

বলিয়াই সে অনুপমার মুখের দিকে চাহিল; চাহিবার অর্থ, এ কথায় অনুপমার মুখভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় কি না। কিন্তু তাহার মুখে কোন পরিবর্ত্তনই দেখা গেল না, সে তেমনই শান্তভাবে বলিল, "সেখানে এতক্ষণ কি কচ্ছিলে? না খাওয়া, না দাওয়া।"

ঈষৎ হাসিয়া পরেশ বলিল, "একটা বড় রকম খাওয়ারই পরামর্শ কচ্ছিলাম।"

অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "সেটা কি রকম খাওয়া ?"

"বিবাহের ভোজ।"

"খাওয়াবে কে ?"

"আমি।"

"তুমি খাওয়াবে, কিন্তু তাতে তোমার নিজের পেট তো ভরবে না।"

"যে খাওয়ায় সে নিজেও না খেয়ে ছাড়ে না।"

বলিয়া পরেশ হাসিতে হাসিতে জামা কাপড় ছাড়িতে উদ্যত হইল। অনুপমা একটু সরিয়া আসিয়া তাহার কোটের প্রান্তটা ধরিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি ?"

পরেশ বলিল, "কি সত্যি ?"

"সত্যিই বিয়ে ?"

"খুব সত্যি।"

"মিথ্যে বলবো না।"

"একটুও না।"

"দেখো।"

"তুমিও দেখে নিও।"

অনুপমা জামাটা ছাড়িয়া দিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। সে দরজায় পা দিতেই পরেশ পশ্চাৎ হইতে স্নিগ্ধ-কোমল কণ্ঠে ডাকিল "অনু !"

অনুপমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। এমন স্নেহভরা প্রেমপূর্ণ সম্বোধন যে এই প্রথম! অনুপমার বুকটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। হায় প্রভু, কয়দিন আগে এমনই করিয়া ডাকিলে না কেন? কষ্টে অন্তরের উচ্ছ্বাস অন্তরে চাপিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। গম্ভীরস্বরে পরেশ বলিল, "এখনো ভেবে দেখ অনু।"

অনুপমা কিছুকাল স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "খুব ভেবে দেখেছি গো, খুব ভেবে দেখেছি।"

বলিয়া ঘাড় দোলাইয়া দুড় দুড় করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আহার করিতে করিতে পরেশ পিসীমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বিয়ের যোগাড় কর পিসী মা।"

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার বিয়েরে পরেশ ?"

পরেশ বলিল, "শৈলর বিয়ে।"

পিসীমা বলিলেন, "কোথায় রে ?"

যেন খুব বিরক্তভাবে পরেশ উত্তর করিল, "এই বাড়ীতে, আবার কোথায়।"

তারাসুন্দরী অবাক হইয়া পরেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরেশ ঘাড় নীচু করিয়া বলিল, "আজ বৈকালের গাড়ীতেই আমি কলকাতা যাব, গয়না কাপড় সব চাই তো। আজ সন্ধ্যার সময় রামুকাকা যে ওদের আনতে পাঠাবে। এ কদিন ওরা এইখানেই থাকবে।"

পরেশ আহার শেষ করিয়া উঠিয়া গেল। তারাসুন্দরী হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

খানিকপরে তিনি অনুপমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব আবার কি বৌমা ?"

অনুপমা বলিল, "যে যাতে সুখী হয় সে তাই করুক না পিসীমা, তোমার আমার কি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "তা হলে তুমি মত দিয়েছ ?"

অনুপমা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। পিসীমা ভাবিলেন, "তা হলে পরেশের দোষ কি ?"

বিবাহের তিন দিন পূর্ব্বে পরেশ কলিকাতা হইতে ফিরিল। সঙ্গে অনেক মোট মাট আসিল, আর আসিল তাহার বন্ধু শিরীষচন্দ্র। পরেশ তাহাকে পিসীমার কাছে লইয়া বলিল, "এ ছোঁড়ার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল পিসী মা, যখন কলকাতায় পড়তাম, তখন এর মা আমাকে ঠিক ছেলের মতই যত্ন কত্তো।"

শিরীষ তারাসুন্দরীর পায়ের ধূলা লইল; তারাসুন্দরী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সার্ব্বভৌম মহাশয় গ্রামে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, ঐ ছোকরাটী ধুতি চাদর পরিধান করিয়া আসিলেও আসলে ও হিন্দু নয়, খিরিষ্টান পাদরী, খিরিষ্টানী মতের বিবাহ দিতে আসিয়াছে। উহার হ্যাট কোট ঐ চামড়ার ব্যাগটার ভিতর লুকান আছে।

এই সংবাদ সার্ব্বভৌম মহাশয় এমনই দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন যে কেহই ইহাতে অবিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন দেশের

বুকের উপর এই খিরিষ্টানী মতের বিবাহটা সম্পন্ন হইলে যে দেশের বংশের মাথা হেঁট হইবে এই আশঙ্কায় সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল, এবং কোনরূপ আইনের সাহায্য লইয়া ইহার প্রতিবিধান করা যায় কি না, সে সম্বন্ধে গুপ্ত পরামর্শ চলিতে লাগিল।

এই গুপ্ত পরামর্শ ঠিক গুপ্তভাবে না থাকিলেও এবং ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ পরেশের কর্ণগোচর হইলেও পরেশ কিন্তু ইহাতে কর্ণপাত করিল না, সে সকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া নববধূর জন্য সংগৃহীত বস্ত্রালঙ্কারাদি অনুপমাকে দেখাইতে ব্যস্ত হইল এবং তদ্দর্শনে অনুপমার প্রফুল্লমুখের প্রশংসা শুনিয়া বিস্ময়ে এমনই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল যে, কোন আইনকানুনের দিকে মনোযোগ দিবার শক্তি তাহার রহিল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

স্বার্থত্যাগ কথাটার ভিতর খুব একটা উচ্চভাব এবং মনোহারিত্ব থাকিলেও কার্য্যক্ষেত্রে ইহার মধ্যে যে কঠোরতাটুকু আছে, তাহার প্রভাব অতিক্রম করা বড়ই দুরূহ। স্বার্থ লইয়াই জগৎ; এই যে জীবন ইহাও স্বার্থে ভরা। উপনিষদ্ বলেন, পত্নীপ্রেম, পুত্রস্নেহ, স্বজনপ্রীতি, এ সকলের মধ্যেই আত্মপ্রীতিরূপ স্বার্থ নিহিত। পত্নীর প্রীতির জন্য তাহাকে ভালবাসি না, ভালবাসিয়া আত্মার তৃপ্তি হয়; তাই তাহাকে ভালবাসি। পুত্রকে স্নেহ করি আপনার সুখানুভূতির জন্য। সুতরাং স্বার্থটা সংসারের সর্ব্বাঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। সেই স্বার্থকে ত্যাগ করা সহজসাধ্য নহে। যাহাকে ভালবাসি, তাহার সুখের জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া মহত্ত্ব অর্জ্জন করা যায় বটে, কিন্তু সেই মহত্ত্বের অন্তরালে কি গভীর বেদনা হৃদয়ে নিহিত থাকে, অন্তস্তল হইতে অহরহ কি করুণ রোল ধ্বনিত হইয়া উঠে, তাহা অন্যে কি বুঝিবে।

অনুপমার অন্তরের বেদনা অপরে না বুঝিলেও সে ইহার গুরুত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল। একদিন সে ভাবিয়াছিল, স্বামীর সুখের জন্য সব ত্যাগ করা যায়; আজ কিন্তু বুঝিল, সকলই ত্যাগ করা যায় বটে, কিন্তু স্বামীর জন্য স্বামীকে ত্যাগ করা যায় না। সে কি আশাতেই বা এতটা ত্যাগ-স্বীকার করিল? যাহার জন্য এই কঠোর ত্যাগস্বীকার, সে তো তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চায় না, সে আপনার আনন্দের উন্মাদনায় আপনি ভাসিয়া

বেড়াইতেছে। তাহার এই আনন্দ—এইটুকুই তো তাহার সুখ। কিন্তু এ সুখের মূল্য যে বড় বেশী। মেয়ে মানুষ সব ত্যাগ করিতে পারে, জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারে, কিন্তু স্বামীকে অপরের হাতে তুলিয়া দিতে পারে না।

পরেশ একদিন অনুপমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ের সময় তুমি থাকবে তো?"

অনুপমা বলিল, "আমি না থাকলে বরণ করবে কে?"

পরেশ শুনিয়া হাসিয়া উঠিল।

আর একদিন সে ঘরে বসিয়াছিল, এমন সময় পরেশ তাহার বন্ধুকে লইয়া উপস্থিত হইল। অনুপমা ঘোমটা টানিয়া পাশ কাটাইয়া পলাইল। পরেশের ডাকাডাকিতেও সে ফিরিল না। সিঁড়িতে নামিতে নামিতে শুনিতে পাইল, পরেশ তাহার বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "এই লজ্জা আর ঘোমটার বাড়াবাড়ি আমি পছন্দ করি না।"

শুনিয়া অনুপমা থমকিয়া দাঁড়াইল; তাহার ইচ্ছা হইল, সে উঠিয়া গিয়া শুনাইয়া দিয়া আসে,—'এবার তো বেশ একটা নির্লজ্জা ঘোমটাহীনা পছন্দ করে নিয়েছ? তাকে নিয়ে মজলিসে যাবে।'

যাবে কেন? এখনি তো যাইতেছ। এই যে বাড়ীতে একটা ভদ্রলোক আসিয়াছে, কোনপুরুষে যাহার সহিত পরিচয় নাই, স্বচ্ছন্দে তাহার সম্মুখে গিয়া তাহার সহিত হাসি গল্প করিতেছে, নিজের হাতে চা তৈরী করিয়া তাহাকে খাওয়াইতেছে, বই পড়িয়া তাহাকে শুনাইতেছে। এইবার ঠিক মনের মতই হইয়াছে; যেমন সাহেব, তেমনি বিবি জুটিয়াছে।

কিন্তু এই দিন কয়টা কাটিলে যে বাঁচা যায়। ভয়টা পতনের আগেই থাকে, পড়িয়া গেলে তখন হাতই ভাঙ্গুক, পাই ভাঙ্গুক, ভয়ের উদ্বেগটা আর থাকে না। বিবাহটা একবার হইয়া গেলে বোধ হয় আর এতটা কষ্ট থাকিবে না। কিন্তু ইহার মধ্যে যদি এমন কোন একটা ঘটনা ঘটে, যাহাতে বিবাহটা বন্ধ হইয়া যায়? না না, তেমন কি ঘটনা ঘটিবে। যদিই ঘটে—না, ঘটিয়া কাজ নাই; ওঁর এত আনন্দের উপর 'হরিষে বিষাদ'—হে ভগবান, নির্ব্বিঘ্নে বিবাহটা শেষ করিয়া দাও। কিন্তু তাহার এই কাতর প্রার্থনাকে যেন সফল করিবার জন্যই যখন সেই দিনটা আসিয়া পড়িল, এবং সকালেই রোসন চৌকীর দল আসিয়া দরজা চাপিয়া বসিল, সানাইটা প্রভাত গগন কাঁপাইয়া গান ধরিল,—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
　　　　পেখনু পিয়া মুখচন্দা"

তখন অনুপমার মনে হইল, এটা শানায়ের গান নয়, তাহার বুকের গোটা হাড়খানা হইতেই এই বেদনার সুরটা উঠিয়া বাড়ীটা কাঁপাইয়া তুলিয়াছে।

এ সুরটা আর একজনের কর্ণে মিষ্ট লাগিল না; সে রামচরণ। গানটা একবার আবৃত্তি করিয়া পুনরায় তাহার অন্তরাটা ধরিতেই রামচরণ আসিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "থাম বাবু থাম, সকালবেলায় কাজের সময় কাণের কাছে পোঁ পোঁ ভাল লাগে না।"

তারাসুন্দরী গাত্রহরিদ্রার সমস্ত আয়োজন করিয়া পরেশকে ডাকিতে পাঠাইলেন। অনুপমা তৈল-হরিদ্রার পাত্র হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, অদূরে কাত্যায়নী কন্যার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। এমন সময়ে পরেশ বন্ধুর হাত ধরিয়া তথায় উপস্থিত হইল। অনুপমা মাথার কাপড় টানিয়া দিল। তারাসুন্দরী বলিলেন, "নে পরেশ, বোস, আবার বারবেলা পড়বে।"

ঈষৎ হাসিয়া পরেশ বলিল, "না, আর দেরী কি, শুভস্য শীঘ্রং।"

বলিয়া সে বন্ধু শিরীষের হাত ধরিয়া পিঁড়ার উপর বসাইয়া দিল। সকলেরই মুখ দিয়া একটা বিস্ময়সূচক অস্ফুট শব্দ নির্গত হইল। পরেশ কিন্তু একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না; সে স্থির গম্ভীরভাবে কাত্যায়নীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কি করি বলুন, সকলেই পরোপকার করে, কাজেই আমিও একটু পুণ্যসঞ্চয় না করে থাকতে পারলাম না। তবে বিনা আয়াসে পুণ্যটুকু সঞ্চয় হয় নি, দুদিন ঘুরে ছোকরাকে কায়দায় পেয়েছি। তা পাত্রটী হরিচরণের চাইতে বোধ হয় মন্দ হবে না।"

বলিয়া পরেশ একটু হাসিল; কাত্যায়নীও মৃদু হাসিলেন। শৈল মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। পরেশ তখন তারাসুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ছোকরার সব ভাল পিসীমা, দোষের মধ্যে বওয়াটে। অনেক কষ্টে এম. এ. পাশটা দিয়ে দেড়শো টাকা মাহিনেয় কলেজে ছেলে ঠেঙ্গাতে সুরু করেছে। বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হবার ঝোঁক রীতিমত আছে। বওয়াটে কি না। তা যত বড়ই বওয়াটে হোক, শৈল ওকে ঠিক করে নিতে পারবে. কি বল পিসীমা, সে গুণ শৈলর খুব আছে।"

তারাসুন্দরী হাসিয়া উঠিলেন। শৈল পলাইবার উপক্রম করিতেছিল,

পরেশ ছুটিয়া গিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিল, এবং তাহাকে টানিয়া আনিয়া শিরীষের পাশে বসাইয়া দিল, তারপর অনুপমার দিকে চাহিয়া বলিল, "দাওনা গো, ওদের হলুদ মাখিয়ে। ভয় নাই, ওরা বিলাত ফেরৎ নয়, ছুঁলে জাত যাবে না।"

বলিয়া পরেশ হাসিয়া উঠিল। অনুপমা ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং খানিকটা হলুদ লইয়া পরেশের পায়ে মাখাইয়া দিয়া ঢিপ করিয়া একটা গড় করিল। পরেশের সঙ্গে আর সকলেই হাসিয়া উঠিল।

রামচরণ এতক্ষণ উঠানে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; সে ছুটিয়া বাহিরে গিয়া সানাইদারকে বলিল, "বাজা বাজা, খুব জোরে বাজা।"

সানাই উচ্চতানে গাহিয়া উঠিল—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ দিশি ভেল নিরনন্দা।"

সম্পূর্ণ।

একাল সেকাল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(ক)

পুলিনবিহারী নির্ম্মলাকে যে ধাঁধার মধ্যে রাখিয়া গিয়াছিলেন, চিন্তায় চিন্তায় তাহা যেন দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল, কদিন সে আর বাড়ী হইতে বাহির হয় নাই, ঘরে পড়িয়া জীবনবৃত্তান্ত লইয়াই ওলট পালট করিতেছিল, অন্যায় অকর্ম্মন্য নিজের কার্য্যগুলির কথা জলবুদ্‌বুদের মত একটির পর একটি উঁকি দিয়া তাহার মনুষ্যহীনতার কথা জানাইয়া দিয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছিল, আর একটা অবিমিশ্র বিস্ময় বিষাদের রাশি বহন করিয়া আনিয়া যেন উপহাসের স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছিল—"এত কাল ধরে কি কাজ সে করে এসেছে।"

জবাবদিহি করিবে এমন ভরসা তাহার মোটেও ছিল না, নিজের মনকে প্রবোধ দিবে এমন সম্ভাবনাও নাই, যত কুকার্য্যই করিয়া থাকুক, একদিনের জন্য সুখী হইতে পারিলে বা পৃথিবীর যে কোন এক ব্যক্তিকেও সুখী করিতে পারিলে তবু সে আত্মার কাছে অন্তত নিজের আত্মীয়তার পরিচয় দিয়া আর না হউক মনের এই স্তূপীকৃত অন্ধকারের মধ্যেও যেমন করিয়া হউক একটু ক্ষীণ আলোক-রশ্মিও ফুটাইয়া তুলিতে পারিত, কিন্তু সে যে একূল ওকূল দুইকূল হারাইয়াছে, আজ যেন পুনঃ পুনঃই তাহাকে কে এই অদ্ভুত কথাটা বলিতেছিল—"পরের ধনে নবাব সাজতে যাদের ইচ্ছে যায়, তাদের কোন পথই সুগম হয় না, তারা সুধু লাভ করে মানুষের উপহাস, আত্মার অধোগতি ; এমনি তাদের ভাগ্যবিধাতা যে, কাজের ফলে একদিন নিজের অন্তরাত্মাই চেপে ধরে, এই এতবড় মনুষ্যহীনতার জন্য প্রাণান্ত করে তুলে।"

এই এতবড় দুর্ভাবনটা গুরু করিয়া দিল সতীশ, সেদিন সন্ধ্যার পর বারান্দায় ইজি চেয়ারে পড়িয়া নির্ম্মল রাত্রির শীতল বাতাসে উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা করিতে-ছিল, নক্ষত্রবহুল নৈশ আকাশ যেন তাহার মনের উপর অনেকটা পবিত্রতা আনিয়া দিতেছিল, তখন সতীশ আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্ম্মলের মুখ শুকাইয়া গেল, কথা বলা দূরে থাক সে মুখ ফিরাইয়া লইল, কিন্তু সতীশ ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছেন নির্ম্মল বাবু ?"

নির্ম্মল জবাব করিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভিতরে গিয়া আলোগুলি নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল, সতীশ কিন্তু এত বাধার একটিও গ্রাহ্য করিল না, নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে শয্যাস্থানে উপস্থিত হইয়া মৃদু-স্বরেই বলিল—"এমন সন্ধ্যাবেলা শুয়ে পড়লেন যে ?"

বিরক্তিতে বিস্ময়ে নির্ম্মলের মন আনচান করিতেছিল। সতীশ পূর্ব্বাপেক্ষাও গম্ভীরভাব অবলম্বন করিল, কোমল হস্তে নির্ম্মলের হাত ধরিয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত সস্নেহে বলিল—"এমন কি অপরাধ করেছি, যাতে বন্ধু বলে না হ'ক, অন্ততঃ চেনা মানুষ বলেও আমল দিতে চান না নির্ম্মল বাবু ?"

নির্ম্মল বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া বসিল, তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, চক্ষু জ্বলিতেছিল, অতিকষ্টে সে বলিয়া উঠিল—"আমি ত পাপিষ্ঠ, আপনাকে বন্ধু বলে গ্রহণ কর্‌তে যাই এত সাহস আমার সেই, আর ততখানি আহাম্মুকও আমি নই।"

সতীশ চাহিয়া চাহিয়া নির্ম্মলের অবস্থাটাই দেখিতেছিল, নির্ম্মল আবার বলিল—"আমায় যেন আপনারা উপহাসের পাত্রই ঠিক করে নিয়েছেন। কিন্তু—"

সতীশ বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা খাঁটি করে বলবেন নির্ম্মল বাবু, সত্যিকার উপহাস আজ পর্য্যন্ত আপনাকে আমি করেছি কিনা ?"

নির্ম্মল অবাক হইয়া সতীশের দিকে দৃষ্টি করিল। সত্যই যেন সতীশের স্বরে মুখে চোখে একটা সহামুভূতির আভাস পাওয়া যাইতেছিল, বিশেষ করিয়া সতীশের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথাগুলি আলোচনা করিয়া সত্যিকার একটা প্রাণতাই যেন সে অনুভব করিতেছিল। তাই সে আপনার করুণদৃষ্ট ফিরাইতে পারিল না, ছলছল চোখ দুটি সতীশের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া যেন করুণার জন্ম কাতর হইয়া উঠিল। সতীশ গা ঘেঁষিয়া বসিয়া বলিল—"আপনাকে বাড়ীতে না গেলে আর চল্‌ছে না, শশাঙ্ক বাবু আমায় লিখে পাঠিয়েছেন, আপনার মার অবস্থা শোচনীয়।"

নির্ম্মল ঘড়ির দিকে চাহিয়া বসিয়া পড়িল, এত রাত্রিতে ট্রেন ধরিবার উপায় নাই, সতীশ বলিল—"কাল্‌কে সকালের গাড়ীতেই যাবেন, আর দেখুন,—"

নির্ম্মল সতীশের কথা সমাপ্ত করিতে দিল না, বাধা দিয়া উত্তেজিত কণ্ঠেই বলিল—"না না, আর কোন উপদেশ আজ আমায় দেবেন না সতীশ বাবু, আমি হজম কর্ত্তে পার্ব্ব না।" বলিতে বলিতে তাহার চোখের দুই কোণ ভিজিয়া উঠিল, সতীশ বুঝিল, বাতাস ঘুরিয়াছে, সে আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

নির্ম্মল সকালে শয্যা হইতে উঠিতে পারিল না, সর্ব্বাঙ্গ পচিয়া যাইতেছে, এমনই বেদনায় সে শেষ রাত্রি হইতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, থার্ম্মমিটার লাগাইয়া দেখিল, জ্বরও বেশ হইয়াছে, তখন আর তাহার কোন আশা ছিল না। বাপকে ত দেখিতে পায়ই নাই, মাকে যে দেখিতে পাইবে, সে ভরসা ত্যাগ করিয়া মনে মনেই বলিল—"পাপের প্রায়শ্চিত্ত পাপেই হবে, এতে ত আর ভাববার কিছু নেই।"

ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকার সরিয়া গেল, প্রভাতের আলো সরল হাসি লইয়া আকাশ জুড়িয়া বসিল, কাক কোকিল ডাকিল, পৃথিবী যেন নূতন সঞ্জীবতায় আত্মহারা হইয়া উঠিল, কিন্তু নির্ম্মলের সুধু অবসাদ। বেলা পড়িয়া যাইতেছে, সকালে সে সতীশকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়াছিল, লোক ফিরিয়া আসিল, তাহার সহিত সতীশও আসিল না, আসিল নিলীমার বাড়ীর সেই চাকরটি, লোকটাকে দেখিয়াই নির্ম্মল উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সতীশবাবু ?"

"তিনি বাড়ী নেই।"

"আর ঐ?"

"এখানেই আস্‌ছিল?"

নিলীমার ভৃত্যটি অগ্রসর হইয়া নমস্কার করিয়া খামে আঁটা একখানা চিঠি সম্মুখে রাখিল, নিলীমার চিঠি মনে করিয়া সতীশ যেন তাহাকে স্পর্শ করিতে ভীত হইয়াছিল, কিন্তু দরোয়ানের হাতে একটা উত্তর না দিলে অন্যায় হইবে মনে করিয়া বলিল—"দাঁড়া, জবাব লিখে দিচ্ছি।"

বেয়ারা সেলাম করিয়া জবাবের প্রয়োজন নাই জানাইয়া কাজের তাড়ার কথা বলিয়া বাহির হইয়া গেল। নির্ম্মল খামখানা হাতে করিতেই যেন একটা সন্দেহের বৃশ্চিক তাহাকে কামড়াইয়া ধরিল। লাল ফিতায় আঁটা রক্তবর্ণের খামখানা যেন শুভ সংবাদ ঘোষণা করিয়া একটি মস্ত বিদ্রোহ পাকাইয়া তুলিতেছিল। সে আর দেরি করিতে পারিল না। ক্ষিপ্রহস্তে আবরণ উন্মোচন করিয়া পত্রখানা পড়িতে পড়িতে সুখ অনুভব করিতে লাগিল, কয়েক লাইন অতিক্রম করিয়া যেখানে "শ্রীমতী নিলীমার শুভবিবাহ" লেখা ছিল, সেখানে গিয়া পাঠ বন্ধ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠিখানা শয্যার উপর পড়িয়া গেল, একটা প্রশ্ন যেন তাহাকে বিব্রত করিতে ছাড়িল না, "তা হলে এদের এ মানুষ ধরবার ফাঁদ কেন?" কে উত্তর করিবে, কিন্তু কৌতূহল দমন হইতে বেশী বিলম্ব হইল না, পতিত পত্রখানায় পাত্রের নামটি চোখে পড়িতে আবারও সে বলিয়া উঠিল—"এত বড় লোক সে, তাকে ছেড়ে" আর বলিতে পারিল না। ধীরে ধীরে শয্যায় শুইয়া পড়িয়া মুক্তির শ্বাস ত্যাগ করিল।

(খ)

নূতন বাড়ীতে আসিয়া পুলিনবিহারীর হেপাজতের মধ্যে নানা অসুবিধা অনুভব করিতে হইলেও মিষ্ট কথার অনুপম স্বাদ যেন মন্ত্রের মতই শোভাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পুলিনবিহারী প্রতি পদে বাধা প্রদান করিতেন, কর্ত্তব্য কার্য্যে উপদেশ দিতেন, অথচ তাহা এত সহজ, এত শান্ত ও উপাদেয় যে বাধা বা অনুশাসনের মত মনে করিবার শক্তি তাহার ছিল না, গৃহের অনতিদূরে প্রশস্ত উদ্যান, নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষে সুশোভিত, বাহিরের গৃহখানা আসবাবে পরিপূর্ণ, তাহারই পরে শোভার প্রশস্ত শয্যাগৃহে একদিকে কুসুমকোমল শয্যা, অন্য দিকে প্রকাণ্ড কয়টা আলমারিতে পরিপূর্ণ বাঙ্গালা সংস্কৃত পুস্তক,

গৃহের ভিত্তিতে দেবদেবীর চিত্র, শোভা প্রথম কয়দিন এ গৃহে প্রবেশ করিতে মুখ কুঞ্চিত করিয়াছে, কখনও কোন পুস্তক সম্মুখে পড়িলে তাহার মুখে উপহাসের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কি প্রহেলিকা, কি দুর্ভেদ্য মায়া, পুলিনবিহারীর কুহক যেন ধীরে অতি নিপুণতার সহিত শোভাকে ইহার মধ্যে টানিয়া আনিতে লাগিল, বাহিরে সে আজকাল আর যাইত না, কারণ কতগুলি বিষয়ে ভ্রাতা সতীশই কঠোর আদেশ করিয়াছিল, যদিও পুলিনবিহারী তাহার মধ্যে আছেন, এমন কথা শোভা জানিত না, তথাপি সতীশের সেই একটি কথা। "শোভা, এখনও যদি কথা না শোন ত আমি দেশত্যাগী হব, আমি তোমার একমাত্র ভাই, আমায় আর জন্মের মত দেখতে পাবে না।" ভয়ে না হউক, আশঙ্কায় শোভা বাড়ীতেই থাকিত, এ ঘর সে ঘর করিত, উদ্যানের ফোটা ফুল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিত, কিন্তু যখন এই সকল কার্য্যে তাহার অবসাদ আসিত, মনে হইত, উড়িয়া সে বাহির হইয়া যায়, ঠিক সেই সময়েই পুলিনবিহারী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেন, মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিতেন—"আজ তোমার মুখখানা এমন শুকিয়ে গেছে কেন মা, খাওনি বুঝি, না না তুমি এমন করে থেক না যেন; জানত তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নেই।"

শোভা উত্তর করিত না, পুলিনবিহারী তাহার হাত ধরিয়া বলিতেন, চল মা, দেখি গিয়ে তোমার শাশুড়ী কি কচ্ছে।" বলিয়া তিনি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া যাইতেন, শোভা এক দৃষ্টিতে সেই বর্ষীয়সীর কার্য্য দেখিয়া কখনও বিরক্ত হইত, কখনও বা বিন্দুমাত্র লজ্জা তাহাকে অধিকার করিত, অপরিমিত ঝী চাকর থাকিতেও তাহার শ্বশ্রূর মুহূর্ত্ত বিশ্রাম ছিল না। বিশেষ করিয়া দেবকার্য্য, স্বামী-সেবায় সেই বৃদ্ধার উৎসাহ ও শোভার প্রতি একনিষ্ঠ স্নেহ সত্যই একটা আবছায়া শোভার নয়নের গোড়ায় দাঁড় করাইয়া দিত। শোভা সেখানে আর দাঁড়াইত না, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, শয্যাগৃহে ঢুকিয়া যা তা একটা বই লইয়া কোনপ্রকারে সময় কাটাইতে চাহিত, কিন্তু দেখিয়া যাহা দূরে ফেলিতে ইচ্ছা করিত, পড়িতে আরম্ভ করিলে কিন্তু তেমন বিষদৃশ বা বিরক্তিজনক মনে হইত না, সেই ধর্ম্মগ্রন্থ, যে ধর্ম্মের নামে শোভা জ্বলিয়া উঠিত, পড়িতে পড়িতে যেন তাহার মনে হইত, ইহার মধ্যে একটা মধুরতা আছে। ঠিক এমন সময় পুলীনবিহারী গৃহে প্রবেশ করিতেন—সস্নেহে বলিতেন—"কি পড়ছ মা, মহাভারত, আচ্ছা যযাতি উপাখ্যানটা পড়ত।"

শোভা পড়িতে পড়িতে শ্রান্তি বোধ করিলেও থামিতে পারিত না, শ্বশুরের

তন্ময়তা দেখিয়া সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাই পড়িয়া যাইত, ক্রমে শুনিতে শুনিতে পুলিনবিহারীর চোখে জল আসিত, শোভা তখন পুস্তক বন্ধ করিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিতে যাইবে, তখনই বৃদ্ধ কাপড়ে চোখ মুছিতেন, তাড়াতাড়ি বলিতেন—"কষ্ট হচ্ছে মা, তা থাক, চল এবার বাগানে গিয়ে বেড়িয়ে আসি।"

এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল, সহসা সেদিন সতীশ আসিয়া ধরিয়া বসিল—"শোভা! তোকে রাঁধতে হবে, মা মারা যেতে ঠাকুরের হাতে খেয়ে খেয়ে কেমন অরুচি ধরে গেছে। আপন বলে যত্ন করে খাওয়াবে এমনত তুই ছাড়া আর কেউ নেই।"

"আমি ত রাঁধতে জানি না, দাদাবাবু।"

"না বোন্, ওকথা আমি শুনব না, কেন তুমিই ত কতবার বলেছ, ইচ্ছে কল্লেই মানুষ কাজ কর্ত্তে পারে, পারি না এমন কথা ত তোমার মুখে সাজে না?"

শোভা অপেক্ষাকৃত দৃঢ়স্বরে বলিল—"সে কথা আমি আজও অস্বীকার কর্চ্ছিনি, কিন্তু তোমাদের এ কি মতলব, আমায় শেষে ঝী-চাকরের কাজ করিয়ে ছাড়বে!"

"ঝী-চাকরের" সতীশ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, "কি শিখছ শোভা, এতদিনে তোমার এতটুকু শিক্ষা হয় নি। যার ঘরে বৃদ্ধা শাশুড়ী এমন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটছে, তাঁর হাতে থেকেও তোমার এতটুকু জ্ঞান হল না।"

শোভার মুখ কাল হইয়া উঠিল, কিছুদিন যাবৎ যে লজ্জার ছায়ামাত্র তাহার মাথার উপর উঁকি দিতেছিল, আজ যেন তাহাই একটু বড় হইয়া পড়িল। সে আর কথা না বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া একেবারে পাকে প্রবৃত্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু ফলে যাহা দাঁড়াইল, তাহাতে সতীশের পিত্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পুলিনবিহারি কোন প্রকারে মানাইয়া রাখিলেন। সে রাত্রিতে আহার তাহারও হইল না, বরং নলীনাক্ষ গোটাকত কড়া কথা শোভাকে শুনাইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। কিন্তু শোভার মুখে কথা ছিল না, এত তেজ, এত গর্ব্ব যেন এই সামান্য কার্য্যের বিফলতায় একেবারে জল হইয়া গেল। শোভা মনমড়া হইয়া পড়িল। সতীশের রাগ বাড়িয়াছিল, তবু সে যাইবার কালে ডাকিয়া বলিয়া গেল—"শোভা! ইচ্ছে কল্লেই মানুষ কোন কাজ কর্ত্তে পারে না, এটা হয় ত এখন থেকে তোমার মনে থাকবে। আর আমার এই এতখানি দুঃখ সেদিনই নাশ হবে, যেদিন তুমি পাঁচজনের একজন হবে।"

শোভা শুনিয়া গেল, কিন্তু একটা অত্যাজ্য জ্বালা যেন সেদিন হইতে তাহাকে কামড়াইতে লাগিল। এভাবে আর তাহার থাকা চলে না, এ বাড়ী পরিত্যাগ না করিতে পারিলে তাহার উপায় নাই, কিন্তু পরিত্যাগ করিয়াই কোথায় যাইবে, সতীশ আর তাহাকে প্রশ্রয় দিবে না, তাহা সে বুঝিয়াছিল, একটা অবসাদ স্বাধীনভাবে বিচরণের ক্ষমতা হইতেও যেন তাহাকে কেমন বিচ্যুত করিয়া তুলিয়াছে। ধীরে ধীরে সে শ্বশ্রূর সাহায্য করিতেই প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহাতেও শোয়াস্তি ছিল না, প্রত্যক্ষে পরোক্ষে নলীনাক্ষের উপহাসবাণী তাহার মর্ম্ম বিঁধিতেছিল। শোভা আবার উত্তেজিত হইল, এ বাড়ী সে ছাড়িবে, কিন্তু পদে পদে বাধা, পুলীনবিহারী যেন পায়ের বেড়ী হইয়া রহিয়াছেন। উপায় নাই, কূলকিনারা না পাইয়া শ্বশ্রূর অনুবর্ত্তিনী হইয়া শোভার কাজগুলি যেন অবসাদের মধ্যে আনন্দ, তাচ্ছিল্যের মধ্যে গৌরব, উপহাসের মধ্যে প্রশংসা বহন করিয়া তাহার চিত্তকে কখনও অস্থির কখনও স্থির, এমনই ঘুরাইতেছিল।

(গ)

দিন দুই তিন পরে সন্ধ্যার পরে বাগানের আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিলে শোভা একটা চেয়ারে কাত হইয়া পড়িয়া একটা অকিঞ্চিৎকর আনন্দ অনুভব করিতেছিল। দিনের বেলা সে নিজ হাতে দুই তিন খানা ব্যঞ্জন পাক করিয়াছিল, যদিও তাহাতে তাহার কষ্টের সীমা ছিল না, তথাপি শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের দীর্ঘ আশীর্ব্বাণী ও প্রশংসাটা তাহাকে নৈরাশ্যের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া অবসাদের পরিবর্ত্তে আনন্দই দান করিয়াছে। বাগানের ফোটা ফুলের গন্ধ লইয়া বাতাস উচ্ছ্বাস-গতিতে চলিয়াছে, শরতের চাঁদ আকাশের কোণ হইতে উঁকি দিতেছিল, কি জানি কি যে একটা নূতন ভাবনা শোভাকে আজ নাড়া দিতেছিল। প্রতি বৎসরের ঠিক এই সময়টিতে কত বিরহতপ্ত হৃদয় জুড়াইবে, কত স্ত্রী স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিবে। শোভার মন যেন জোর করিয়া বলিতেছিল—"ওর মত আনন্দের বস্তু পৃথিবীতে আর দুটি নেই।"

শোভার নলীনাক্ষের কথা মনে হইল, কিন্তু কৈ সেত আর স্বামীর মত ব্যবহার করে না। কিছুদিন সে যদিও মানুষে যাহা পারে না, তাহাই করিয়াছে, তথাপি এ বাড়ীতে আসিয়া তাহার যেন কেমন একটা ঔদাস্য ও অবজ্ঞার ভাবই শোভা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। সে কার দোষ। শোভা

উঠিয়া দাঁড়াইয়া, যূঁইফুলের কটা ডাল ছিড়িয়া লইয়া বলিল—"দূর হক গে, দোষ যারই হক, স্বামী স্ত্রীর সুখ হতেও পারে, কিন্তু তারও ত উপযুক্ততা চাই।"

সম্মুখে অন্য মানুষের মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল, শোভা চাহিয়া দেখিল পিসী। মৃদুমধুর কণ্ঠে বলিল—"পিসীমা, তুমি কখন এলে?"

পিসীর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এই "পিসীমা" শব্দটীর মধ্যে যে মাধুর্য্য ছিল, এতখানি মাধুর্য্য শোভার নিকট আশা করাই আকাঙ্খার বাহিরে বলিয়া মনে হইত। পিসী ধীরে অগ্রসর হইয়া প্রস্তরবিনির্ম্মিত একখানা আসনে বসিয়া পড়িলেন। সস্নেহে বলিলেন "বস মা, আমি এইক্ষণ আসছি। নলীনাক্ষ কেমন আছে মা?"

বীণার যে তারটা বেসুরা বাজিতেছিল, পিসী তাহাতেই টিপ দিলেন, শোভা মনে মনে বলিল—"তার আমি কি জানি, আমার সঙ্গে সম্বন্ধ?" প্রকাশ্যে বলিতে আজ যেন তাহার মনটা কেমন দোল খাইতেছিল, তাই সে ছোট্ট স্বরেই বলিল—"তার আমি কি জানি?"

"তুমি জান না মা?" বলিয়া পিসী থামিয়া গেলেন, শোভা মাত্র বলিল—"না?"

"শোভা! আজও তোর পাগলাম গেল না, তার শরীরের প্রতি যদি তুই দৃষ্টি না করিবি—?"

শোভা হাসিয়া ফেলিয়া, বলিল—"পুরুষ মানুষ, নিজের শরীর নিজেই সাম্‌লিয়ে চলতে পারে, তা ছাড়া তার মা বাপ রয়েছে।"

"পুরুষই হক, আর মেয়েই হক, দুজন না হলেত জীবনের পূর্ণতা হয় না মা, এরি জন্যে পুরুষ আর প্রকৃতি বলে, আর এরিজন্যই হয়ত বিধাতার সৃষ্টিরহস্যের মধ্যে এটাই একটা প্রকাণ্ড রহস্য যে, স্ত্রী-পুরুষ স্বামী-স্ত্রী। উভয়ে উভয়ের পুষ্টি কর্ব্বে, তুষ্টি জন্মাবে, দুইয়ে এক হয়ে সংসার পথে চল্‌তে না শিখলে ত পদে পদে আঘাত পেয়ে ফিরতে হবে।"

শোভার আবার ভাবনা হইল, সে নলীনাক্ষের জন্য নহে, নিজের জন্য—এই যে শূন্যতা, এই যে অবসাদ, এই যে পূর্ণ গৃহেও কেমন একাকী ভাব, সাথী পাইলে কি জানি এমনটা থাকিত না। কিন্তু তাহার মন বলিল—"সাথীর খোঁজ কর্ত্তেত ত্রুটি কার হয়নি, এযে অযোগ্য হয়ে জুড়ে বসেছে, দুষ্ট বলদ হতে শূন্য গোশালা কি ভাল নয়?"

পিসী বলিলেন—"শোভা, তুই তাকে বড় কষ্ট দিচ্ছিস, একটিবার চেয়ে

দেখিস না, শরীর দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে। অমন মাটির মানুষ, দেবতার মত চরিত্র, তাকে তুই চিনতে পাল্লি না মা ?"

মাটির মানুষ, দেবতার মত চরিত্র, প্রতিবাদ করিবার মত শোভার কিছু ছিল না। নিন্দা করিবার মত, অনুযোগ করিবার মত, নলীনাক্ষে কৈ কিছুত সে আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পায় নাই, কিন্তু তবে সে মন্দ কিসে ? অযোগ্য কিসে ? নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিতেছিল না। পিসী গলাটা ঝাড়া দিয়া আবারও কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাহিরের ফটকে অতি সন্তর্পণে কাহাকে ধরিয়া পুলীনবিহারীকে নামিতে দেখিয়া তাহার মুখের কথা মুখেই আটকাইয়া গেল।

শোভা গৃহে প্রবেশ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সম্মুখের শয্যায় সজ্ঞাহীন নির্ম্মল ও পালঙ্কের পাশে লালসাড়ী পড়া একটি রমণী অধোমুখে বসিয়াছিল, আর পুলীনবিহারি আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন—"কিছু ভয় কর না মা, তোমার পুণ্যে নির্ম্মল আমার ঠিকই সেরে উঠবে, এখানে ওর চিকিৎসারও কোন ত্রুটি হবে না, তুমি মা, যাও হাত মুখ ধোও গে, সেই সকালে এসেছ, এক মিনিটের জন্য ওঠনি, শরীর বৈবে কি করে।"

শোভার সমস্ত শরীর ঝাঁকানি দিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সে মুখ ফিরাইয়া লইল, নির্ম্মলের প্রতি দৃষ্টি করিবে সে সাধ্য তাহার ছিল না, পুলীনবিহারী তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"পর কখনও আপন হয় না মা, এতগুলি ঝী-চাকর বাসায় রয়েছে, নির্ম্মলের এই অবস্থা, একবার খোঁজ নেয়নি, আমাকে যে একটা সংবাদ দিবে, তাও পারে নি, দেখেছ বাছার আমার কি অবস্থা করেছে। একে তুমি জান না মা, এ নির্ম্মলের স্ত্রী, বিমলা। ওর মত মানুষ ত একালে হয় না মা, যাও মা, ওকে সঙ্গে করে নে যাও, দুদিন এ মুখে জলটুকু দেইনি, কাকের মুখে খবর পেয়ে পাগলের মত ছুটে এসেছে, এসেই যে স্বামীর পায়ের গোড়ায় বসেছে আর ত ওঠেনি।"

শোভা দৃষ্টি ফিরাইল, এই সেই বিমলা, একবার সে নিজের শরীরাকৃতির উপরও দৃষ্টি করিল, তাহার রূপের গৌরব যেন পরাভূত হইয়া গেল, একটা গৌরবমণ্ডিত লাবণ্য যেন এই রমণীর সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া রহিয়াছে। কি একটা মোহ যেন শোভাকে ইহার দিকে আকর্ষণ করিতেছিল, কিন্তু যাহার সহিত এতখানি শত্রুতা করা হইয়াছে, কোন্ মুখে তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করিবে, শোভা আবার দৃষ্টি নত করিল, পুলীনবিহারি পুনর্ব্বার বলিলেন—

"যাওনা দাঁড়িয়ে রইলে যে, তুমি এখন ঘরের গিন্নী, কেউ এলে তার খাওয়া দাওয়া যে সকলই তোমাকে দেখতে হবে, আর এই নির্ম্মল, এর সঙ্কট অবস্থা, এর জন্যেও কিছু কম খাটতে হবে না, আমি আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পাচ্ছি না মা, এখুনি ডাক্তার ডাকতে হবে।" বলিয়া পুলীনবিহারী শোভার ঘাড়ে সমস্ত ভারটা চাপাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। বাধ্য হইয়া শোভাকে কথা বলিতে হইল, সে ধরাগলায় বলিল—"আপনি উঠে চলুন।"

বিমলা ঘোমটাটা একটু টানিয়া লইয়া অতি সন্তর্পণে শোভার কাছ ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—"আমি এখন যাব না দিদি, একা ফেলে ?"

বীণার ঝঙ্কারের মত এই কথা কয়টি শোভাকে দ্বিগুণ আকর্ষণ করিল, সে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া বলিল—"দুদিন আপনি না খেয়ে আছেন—"

"দুদিন ! দুবছর না খেলেওত দুঃখ নেই দিদি, তোমরা যদি—"

বিমলা আর বলিতে পারিল না, ঝর ঝর করিয়া জল পড়িয়া তাহার বক্ষ প্লাবিত করিয়া দিল। শোভা এতখানি কাতরতার কারণ বুঝিল না, বলিল—"আমি ঝী-চাকর কাউকে ডেকে দিচ্ছি, সে এখানে থাক্‌বে।"

বিমলা রুদ্ধকণ্ঠেই বলিল—"না না, ঝী-চাকর কেন, আর তাদের কাছে রেখে কি শোয়াস্তি পাওয়া যায় দিদি, আমি এখন যাব না, সত্যি আমার ক্ষুধা পায় নি।"

এই নূতন ঘটনাটা শোভার বুকের উপর পাষাণ চাপা দিয়া বসিল। নির্ম্মলের এই অসুখ, তাহার প্রাণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছিল, কিন্তু নির্ম্মল তাহার কে, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের পিসীর কথাগুলি তাহার মনে পড়িল, আর অত্যাচার-পীড়িতা রমণীর আচরণও সে প্রত্যক্ষ দেখিতেছিল, কিন্তু কৈ, স্বামীর জন্যত তাহার একবারও একটু কষ্ট হয় না। সে বলিল—"কিন্তু তোমার প্রতি এত অন্যায় আচরণ যে করেছে,—তার জন্যে ?"

বিমলা শঙ্কিত হইয়া উঠিল, বাধা দিয়া বলিল, "ছিঃ দিদি, অমন কথা বল না, তোমার ত বিয়ে হয়েছে, ঘর সংসার করছ, তোমার মুখে এমন কথা, পুরুষের দোষ গুণ বিচার নাকি আমরা কর্ত্তে পারি !"

শোভার বুকের ভারটা বাড়িয়াই চলিল, মুখে জবাব আসিল না। ডাক্তার লইয়া সতীশ ক্ষিপ্রপদে প্রবেশ করিতেই, বিমলা তাড়াতাড়ি দোরের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল, শোভাও যেন কেমন একটা আকর্ষণে তাহার সহিত বাহির হইয়া গেল।

(ঘ)

তিন দিন তিন রাত্রি নির্ম্মলের চেতনা ছিল না, পুলীনবিহারীর সংসারটি একটা নিবিড় অশান্তির কোলে পড়িয়াছিল, শোভাও কেমন এক রকমের হইয়া পড়িয়াছে। বিমলার নিরন্তর শুশ্রূষা দেখিতে দেখিতে সে একবার বিস্মিত হইতেছিল, এমন সেবা, এমন অকাতর প্রাণপাত পরিশ্রম, আহার নিদ্রাত্যাগ জীবনে সে এই প্রথম দেখিতেছিল। নীরব সহিষ্ণুতায় ও ঐকান্তিক যত্নে বিমলা যেন সাধনরতা দেবীর মত নূতন আলো লইয়া শোভার সৌষ্ঠবকে উপহাস করিতেছে, কি স্থিরতা, কি গাম্ভীর্য্য, এক গাছা চুল স্থানচ্যুত হইতে পায় না, চিকিৎসক যাহা যাহা বলিতেছেন, তাহাই প্রতি অক্ষরে প্রতি-পালিত হইতেছে, এতটুকু গ্লানি নাই, এক বিন্দু অনিচ্ছা নাই, আশা যেন উৎসাহ বর্দ্ধিত করিয়া বিমলাকে কার্য্যে পরিচালিত করিতেছে। পুলীনবিহারীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে বিমলা দিনান্তে উঠিত, হাত মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া নামমাত্র ভাতের গোড়ায় বসিয়া উঠিয়া আসিত। এমনই অবস্থায় আরও পাঁচ সাতদিন কাটিয়া গেল, রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছিল, টাইফয়েড জ্বর, মাথায় পেটে সাংঘাতিক আক্রমণ, বিমলার আশা রহিল না, সে যেদিন পুলীনবিহারীকে ডাকিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিয়া ফেলিল—"আমার শ্বশুরকে দেখেছি, অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসার আগে দৈবকার্য্য করাতেন।"

পুলীনবিহারী ইঙ্গিতটা বুঝিলেন, "নচ দৈবাৎ পরং বলং" এই চিরন্তন সত্য কথাটির প্রতি এত বিশ্বাস থাকিতেও নানা ঝঞ্ঝাটে তিনি যে সেদিকে কোনই বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই, এজন্য লজ্জিত হইয়া আশা দিয়া তাহারই ব্যবস্থার জন্য বাহির হইয়া গেলেন। শোভাও সম্মুখেই উপস্থিত ছিল, তাহার কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকর বিশ্বাসে বিরক্তি জন্মিল, গাঢ়কণ্ঠেই বলিল—"এ কিন্তু তোমাদের আচ্ছা বিশ্বাস, তাই যা দেখতে পাওয়া যায় না, তারই পেছনে ভূতের বোঝা বয়ে বেড়াতে যাচ্ছ!"

তর্ক করিবার শক্তি বিমলার ছিল না, তবু সে বলিল—"দেখতে পাওয়া না পাওয়া সে কিন্তু দিদি নিজের জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। আমরা সে সব বিষয়েই অন্ধ। ডাক্তার যে ওষুধ দিচ্ছে, তার ক্রিয়াও কিছু অসমবা ফলের দ্বারাই প্রত্যক্ষ করি, ভগবানকে ডাকবার যে ফলও কিছু অপ্রত্যক্ষ থাকে না।"

শোভা যে জটীল রহস্যের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রায় সমবয়সী এই রমণী যেন প্রতিপদে তাহাকে একটা যবনিকার দ্বার উন্মোচন করিয়া

অঙ্গুলিসঙ্কেতে কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি দেখাইয়া দিতেছিল। বিমলা হতাশার স্বরে আবার বলিল—"আমাদের যে এই একটা মস্ত স্বস্তি, যখন কোন উপায় থাকে না, নিজের হাত ছাড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়, তখন এই ভগবানের ওপর ভার দিয়েই আমরা শান্তি লাভ করি, ওকে অন্ধবিশ্বাসই বল, আর যাই বল, হিঁদুর ঘর হতে এই জিনিষটি যখন লোপ পাবে, তখন তাঁদের আর কিছু থাকবে না। আমি কত দেখেছি, কোলের ছেলে বিদেশে পাঠাবার সময় মা বলে "যা করেন ভগবান, ঘরে আহার না থাকলে গৃহস্থ ঐ নাম করে মনকে প্রবোধ দেয়।"

শোভা মনে মনে হাসিলেও কে জেন জোর করিয়া বলিতেছিল — প্রবৃত্তির যেখানে চরিতার্থতা হতে পারে না, তখন সত্যি দোষ দিবার একটি পাত্র হাতে থাকলে অনেকটা শান্তি পেতে পারা যায়, হয়ত এর ওপর নির্ভর করে মানুষ কৃতকর্ম্মের জন্যও অনুতাপ না করে পারে, কিন্তু সত্যি কি সে শক্ত এদের আছে !"

"ভগবান্ সব কচ্চেন, তাঁরই হাতের কলের পুতুল আমরা এ কথা যদি মনে কর্ত্তে না পাত্তেম, তবে কিসের বলে এমন অবস্থা দেখেও বুক বাঁধছি দিদি ?" বলিয়া বিমলা থামিল, এই বুক বাঁধার কথাটা শোভাকে অন্য একটি পথ দেখাইয়া দিল, সত্যইত আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে যে নির্ম্মল ইহাকে আমল দেয় নাই, তাহার জন্যে, আজ বিমলা এতখানি করিতে পারিত না। দিনে দিনে পলে পলে যাহা ঘটিতেছে, তাহা তাহারই কার্য্য, এ কথা মনে করিলেই হয়ত মানুষ এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

পুলীনবিহারী আসিয়া বলিল—"আমি সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে এসেছি মা, কাল থেকে তোমার কথা মতই সব হবে।" বলিয়া একবার থামিয়া তিনি আবার বলিলেন—"আমার একটা অনুরোধ আজ রাখতে হবে মা, তুমি আজ আর রাত জাগতে পার্ব্বে না।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, এ কথাটায় বিমলা যেন মহা ফাঁপরে পড়িল, তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না, এ নিষেধের উদ্দেশ্য কি, আজ চৌদ্দ দিন, রাত্রির অবস্থা অসহনীয় হইবে, হয়ত বা বিমলার জীবনের আজই শেষ। জগতে তাহারত আর কেহ নাই, যদিও একদিনের জন্য পতির প্রেম লাভ করিতে পারে নাই, যদিও নির্ম্মল দুশ্চরিত্রের মত নানা কার্য্যে আত্মনিবাশ করিয়া রাখিয়াছিল, তথাপি সেই যে তাহার সর্ব্বস্ব, নির্ম্মলই যে তাহার প্রাণা-

পেক্ষা প্রিয়, দেবতারও অধিক ভক্তির পাত্র, অবরুদ্ধ অশ্রু বাধা মানিল না, শান্তনেত্রে মুখ নীচু করিয়া বিমলা কাঁদিয়া ফেলিল। পুলীনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার কথা রাখবে না মা?"

বিমলা প্রাণ শক্ত করিল, কাতর কণ্ঠেই বলিল—"আপনি আমার পিতার মত, আমি বড় অপরাধিনী, আমাকে কেন এই সুযোগ হতেও বঞ্চিত কর্ত্তে চাচ্ছেন। বরাতের ফল কিছু খণ্ডাতে পার্ব্বেন না, তবে কেন সঙ্কুচিত হচ্ছেন?"

পুলীনবিহারীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি জোর দিয়া বলিলেন—"না মা, আমিই ভুল করেছি, তুমি পার্ব্বে মা, যমের সাধ্য কি, তুমি শয্যায় থাকতে বাছার কেশাগ্র স্পর্শ করে।"

বিমলা লোটাইয়া পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল "আমি বড় অভাগিনী বাবা, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁর জোরে যেন আমার হাতের নোয়া বজায় থাকে। আমিত আর কিছু চাই না।"

শোভা যে সুধু বিস্মিত হইতেছিল, তাহা নহে, পুলীনবিহারীর রোমাঞ্চ হইতেছিল, সত্যই কি সাবিত্রী আসিয়া এই দুর্ভাগ্যের জীবনদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি মা, আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি, তোমার পুণ্যে নির্ম্মলকে অক্ষয় করুক।"

(৬)

সমস্ত রাত্রি যমে মানুষে যুদ্ধ করিয়া ভোরবেলায় নির্ম্মল চোখ মেলিয়া চাহিতে ডাক্তার অভয় প্রদান করিয়া বিদায় হইলেন। বিমলার প্রাণটা যেন নাচিয়া উঠিল, এত বড় আনন্দের আভাসটা তাহার সহ্য করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। বিমলা কাঁদিয়া ফেলিল, পুলীনবিহারী সারারাত্রি ঠায় বসিয়াছিলেন, এবার উঠিয়া বলিলেন "তোমার পুণ্য ছাড়া নির্ম্মলকে যমের হাত থেকে কেউ রক্ষা কর্ত্তে পার্ত্ত না! যেদিন তোমার মত রমণী ঘরে ঘরে জন্মাবে, সেদিন পৃথিবীতে শোক তাপ অশান্তি উদ্বেগ থাকবে না।"

পুলীনবিহারী চলিয়া গেলেন, নির্ম্মলের ঠোঁট নড়িয়া উঠিল। অস্ফুট শব্দ হইল, "উঃ বড় যাতনা!"

বিমলার শরীর ঠক্ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল, হাতপা যেন অসার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কি করিলে যাতনা কমিবে এই চিন্তায় মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বেদানার রসের বাটিটা হাতে করিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল, খাইতে বলিবে

এতটা সাহসে কুলাইল না, কি জানি তাহার স্বর শুনিয়া বিতৃষ্ণা বাড়িয়া যায়। নির্ম্মল আবার চোখ চাহিল, অতিকষ্টে অস্ফুটস্বরে বলিল—"গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।"

বিমলা আশঙ্কান্বিত হইয়া অগ্রসর হইল, অতি কষ্টে কান্না রোধ করিয়া ধরা গলায় বলিল—"বেদানার রসটা!"

নির্ম্মল হাঁ করিয়া বেদানার রসটা লইল, হাত উঠাইতে গিয়া পারিল না। পাণ্ডুর মুখে প্রসন্নতার ছায়া ফুটিয়া উঠিল। ধীরকণ্ঠে বলিল—"কে তুমি—দেবী!"

বিমলার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল, "আমি, আমি তোমার দাসী" বলিয়া সে অবশ শিথিল দেহে মাটীতে বসিয়া পড়িল, নির্ম্মল "বিমলা" বলিতে বলিতে চোখ বুজিল।

কদিন পরে আজ শোভাকে ডাকিয়া বিমলা যেন পরিষ্কার কণ্ঠে কথা বলিতেছিল, স্বামীর জীবনের কোনও ভয় নাই, এই সংবাদটা যেন সাধ্বীর জীবনের ভীতি কাড়িয়া লইয়াছিল, একান্তে পাইয়া শোভাকে আজ সে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি ভাই স্বামীর সেবা কর না কেন?"

শোভা কি উত্তর করিবে ভাবিয়া পাইল না, যদিও বিমলার এই কয়দিনের আচরণে স্বামিসম্বন্ধে তাহার একটা নূতন ধরনের জ্ঞান জন্মিয়াছিল; তথাপি সেবা করিয়া, যত্ন করিয়া স্বামীর সন্তোষসাধন করিবে, এমন শক্তি বা ইচ্ছা তাহার ছিল না, তাই সে অল্প হাসিয়া বলিল—"তোমরা এত মূর্খ কেন ভাই?"

কথাটা বিমলাকে দারুণ বিঁধিল, সে মনে মনে জবাব করিল—"মূর্খ বলেই আমার এমন অদৃষ্ট?" প্রকাশ্যে বলিল—"তুমি আমায় লেখাপড়া শিখিয়ে দিতে পার?"

"তা পারি, কিন্তু লেখাপড়া শিখলে তোমার এমন মতিগতি থাকবে না।"

বিমলা উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। শোভা আবার বলিল—"এই এত কচ্ছ, কেন তুমি কি বাঁদী না কি?"

বিমলা কাঁপিয়া উঠিল, উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল—"না না, তা হলে আমি চাই না তেমন শিক্ষা লাভ কর্ত্তে, যাতে মেয়ে মানুষ স্বামীর সেবা ভুলে যায়।"

বিমলার আকুলতা দেখিয়া শোভার কুটিল নেত্র হইতে একটা ক্ষীণ হাসি দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল। পুলীনবিহারী প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—

"বেশ বেশ, তুমি মা এর সঙ্গেই দুদিন থাক, এর মত যদি হ'তে পার, তবে ত দুঃখের সীমা থাকবে না।"

শোভার মন বিচলিত হইয়া উঠিল, পুলীনবিহারী আবার বলিলেন—"জগতের সেবায় যা সুখ, তাত আর কোথাও নেই, আর স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ যে আমরণ মানুষের পক্ষে অমৃত বর্ষণ করে, এ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে এই পৃথিবীতে এত শোকতাপে মানুষ ত সব ভুলে থাকতে পারত না।"

শোভা উঠিয়া দাঁড়াইল, গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"এটাকেই এমন প্রশস্ত পথ কেন বলছেন?"

"আমি বলছি না মা, আবহমান কাল যা চলে আসছে, তাতে না করে পার পাবে এমন শক্তিই কার আছে।" বলিয়া তিনি তড়িতপদে বাহির হইয়া গেলেন। বিমলা বলিল—"তুমি দিদি লেখা পড়া শিখেছ, তোমায় কোন কথা বলতে আমার ভয় হয়, কিন্তু একদিনও যদি স্বামি সৌভাগ্য লাভ করতে পার্ত্তে।" বলিয়া সে থামিল। শোভার দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিতেছিল, পার্শ্বের ঘরের একটি প্রাণমাতান ঘটনা তাহাকে আকর্ষণ করিল। সকালে রমা ও শশাঙ্ক আসিয়াছিল, দম্পতী আহারের পর হাস্যামোদে পার্শ্বের ঘরখানাও দ্বিপ্রহরের নীরবতার মধ্যে একটা আনন্দের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। সুখের একটা আকাঙ্ক্ষাই যেন তাহাকে আকুল করিয়া রাখিয়াছিল, সে ভাবিতে লাগিল, বিমলার কথা যদি সত্য হয়, ইহাতে যদি সত্যই সুখ শান্তি থাকে তবে সে কেন পরের দোরে দাঁড়ায়, এতকালত এত করিয়া আসিয়াছে, এখন নয় দুদিন ঘরের দিকে মন দিয়াই দেখিতে পারে, কিন্তু তাহার স্বামীত আর তাহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেন না, সেই যেদিন সে অভিসারোদ্দেশে নির্ম্মলের দিকে ধাইয়া চলিয়াছিল, সেদিন হইতে নলীনাক্ষ যে তাহাকে দূরে দূরে রাখিতেই যত্ন করিতেছে, তাহার পূর্ব্বরাত্রির কথা মনে হইতে শোভা শিহরিয়া উঠিল, সে স্বামীর প্রতি যে অত্যাচারটা করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেও যে মাথা ঘুরিয়া যায়, তবে তাহার অপরাধ! বিমলা এই নীরব চিন্তায় বাধা দিয়া বলিল—"আমি ভাই, শশাঙ্কবাবুর কাছে সব শুনেছি। তুমি আমায় বোল দিদি, তাতেই জোর করে বলছি, ভ্রমের পথে আর যেও না। মূর্খ বলে তুমি হয়ত আমার কথায় হাসছ। কিন্তু একটিবার পরীক্ষা করে দেখ, স্বামীর বুকে যে অমৃত আছে, এমনত আর পৃথিবীতে কোথাও পাবে না।"

বিমলা উঠিয়া দাঁড়াইল, শোভা হাত ধরিল, কিন্তু সে হাত ছাড়াইয়া লইতে

চেষ্টা করিয়া বলিল—"না দিদি, এখন আর বসতে পারি না, এই যে ওবুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে।"

শোভার কেমন ঠেকিতেছিল, সে বাধা দিয়া বলিল—"আর দুমিনিট।"

"না দিদি, আর ত গৌণ কর্ত্তে পারি না।" বলিয়া সে হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। শোভা আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে পার্শ্বের ঘরেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বুকের মধ্যে কিসের একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিল।

(চ)

"নির্ম্মল ?"

"কেন ভাই ?"

"এখন কি কর্ব্বে ঠিক করেছ ?"

নির্ম্মল উঠিয়া বসিল, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"কি কর্ব্ব, কর্ত্তেত কিছু বাকি রাখিনি যে, এরপরও ঠিক কর্ত্তে হবে।"

শশাঙ্ক ভীত হইল, কি জানি এখনও যদি নির্ম্মলের মন না ভিজিয়া থাকে। নির্ম্মল গাঢ় কণ্ঠে বলিল—"মাকে দেখতে বড্ড ইচ্ছা হচ্ছেবে। তিনি কি আমার পাপের কথা ভুলে বুকে করে নেবেন।"

শশাঙ্কের আশা হইল, সে জোর দিয়া বলিল—"নেবেন না, তোর জন্যেই যে তিনি হায় হায় কচ্ছেন, তাঁকে কি রেখে আসতে পারি, কত করে মিথ্যা বলে তবেই না রেখে এসেছি। শোকাতাপা মানুষ, তোর এ অবস্থা দেখলে আর বাঁচতেন না।"

"চল শশাঙ্ক, একবার তাঁকে আমি দেখে আসি।"

শশাঙ্ক বলিল—"তাই চল, কিন্তু—"

"কিন্তু কিরে, আজ আর কিন্তু কর না ভাই, য বলবার থাকে খুলে বল, জীবনের একটি দিন যদি তোমাদের সুখী কর্ত্তে পারি।"

"বিমলা ?"

"তার জন্যে ভেব না শশাঙ্ক, সে দেবতা, এত অপরাধ মাথা পেতে নিয়ে এমন করে যে প্রাণ সমর্পণ কর্ত্তে পারে, তার অসাধ্য কার্য্যত নেই, সে আমার অপরাধও ক্ষমা কর্ত্তে পার্ব্বে।"

শশাঙ্ক কি উত্তর করিতে যাইতেছিল, নির্ম্মল বাধা দিয়া বলিল—"তোমায় কি বলব ভাই, যেদিন ও বাসায় এল, তখনও আমার জ্ঞান ছিল, এসেই কেঁদে পড়ে পায়ের গোড়ায় বসে পল্লে, কি করে কি কল্লে জানি না, এখানে এলাম,

নৈলে হয়ত প্রাণেও বাঁচতেম না, তারপর এই দুই দুইটা মাস, ওর এক মুহূর্ত্ত আলস্য দেখিনি, আহার নিদ্রা ভুলে জীবনের মায়া ত্যাগ করে, ঠা'য় বসে যেন দেব আরাধনা কর্চ্ছে, বিমলা নৈলে আর কেউত আমায় বাঁচাতে পার্ত্ত না।"

রমা পাশে বসিয়া এই করুণ-কাহিনী শুনিতেছিল, আর স্ত্রীলোকের নিজস্ব গর্ব্বে তাহার বুক স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। নির্ম্মল তাহার দিকে দৃষ্টি করিয়া বাষ্পাকুলিত স্বরে বলিল—"সত্যি বৌদি, বিমলা যেন এবার বদলে এসেছে, লজ্জা, ভয়, মান অপমান, তার কিছু নেই, যেন ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি, সব দিয়ে সে যেন সুধু আমাকেই এই পাপিষ্ঠকেই চায়। এমন ঐকান্তিকতা পৃথিবীতে আমি আর দেখিনি।"

"আর দেখবি রে, তুই ওকে একদিন আদর কর।" বলিয়া শশাঙ্ক নির্ম্মলের হাত দুখানা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"বিমলা আমাদের বড় আদরের। কিন্তু ও ত একদিনের জন্য সুখ কেমন জানেনি, পোড়া হয়েই এসেছে, তুই একদিনের জন্যেও—"

নির্ম্মল আর শুনিতে পারিল না, উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার বসিয়া পড়িল, অবসন্ন স্বরে বলিল –"আর আমায় অপরাধী কর না শশাঙ্ক।"

দেখিতে দেখিতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল, সহরের অবিশ্রান্ত কোলাহলও যেন প্রকৃতির নিয়মে কমিয়া আসিল, সজ্জিত কক্ষে অতৃপ্ত পিপাসা লইয়া নির্ম্মল বিমলার অপেক্ষা করিতেছিল। এই দুই মাসে একটা অবাধ স্রোত যেন তাহাকে একেবারে বিমলাময় করিয়া তুলিয়াছিল, পরম পবিত্রা অপরিসীম যত্নশীলা পতির পদে ত্যক্তসর্ব্বস্বা বিমলার বুকে মুখে যত মধু নির্ম্মল যেন এতখানি আর কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই, কোথায় শোভা কোথায় বা পীসিমা, এক বিমলা ছাড়া সমস্ত সংসার যেন দরিয়ায় ভাসিতেছে। নির্ম্মল লজ্জিত, ধিক্কৃত, অপরাধী, তবু তাহার অপার আনন্দ, এত সকল ঘটনার মধ্যে এই জ্বরের ক্রিয়ার জন্যই যেন সে বিধাতার নিকট কৃতজ্ঞ, নহিলেত সে ইহাকে জীবনেও চিনিতে পারিত না, প্রকৃত পরীক্ষার সময় আসিলে কষ্টিপাথরে কষা খাঁটি সোণা যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, কালে পড়িয়া মাথায় রাখিয়া সর্ব্বতোভাবেই যে শোয়াস্তি, শান্তি, এমন পবিত্র জিনিষের স্বাদ সে পূর্ব্বে জানিতে পারে নাই বুলিয়াই যেন নূতন উন্মাদনায় তাহার মন বিমলাময় হইয়া পড়িয়াছিল।

খোলা জানালায় বাতাস সর সর করিয়া বহিতেছিল, যুঁইফুলের তীব্র গন্ধে ঘর মাতোয়ারা হইয়াছিল, গৃহে শান্ত তেলের প্রদীপ উল্লাসে নাচিয়া

বেড়াইতেছে।—ঘোমটা ঢাকা লজ্জাজড়িতা কোমল লতার মত বিমলা শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতেই নির্ম্মল ডাকিল—"বিমল ?"

বিমলা তাড়াতাড়ি ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া শয্যার পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি ?"

বিমলার উদ্বেল আবেগ যেন ফোয়ারার মুখে ছুটিয়া বাহির হইতে ছিল, তবু কিন্তু সে লজ্জা ত্যাগ করিতে পারে না, চিরদিনের স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না, তাহার হৃদয় যেন বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া পতির পদে গিয়া লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছিল, তবু সেকালের শিক্ষা দীক্ষার হাত হইতে সুখকে নিবৃত্ত করিতে পারে না। তথাপি সে মুখের ঘোমটাটা একটু কমাইয়া দিয়া নির্ম্মলের গা ঘেষিয়া বসিল। নির্ম্মল কাতর কণ্ঠে বলিল,—"বল বিমল, একবার পরিষ্কার করে বল, তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করেছ ?"

এই একটা কথাই পুনঃ পুনঃ শুনিয়া বিমলা ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল, তাই যে কথাটা সে নিজের মনে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়াছে, অতি সাহসে আজ তাহাই মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল—"বার বার এককথা বলে আমায় কেন বৃথা অপরাধী কর্চ্ছ ?"

"না বিমল, সত্যি আমার মত পাপী দুটি নেই—"

বিমলা আর পারিল না, বাধা দিয়া বলিল—"না থাকে নাই থাক, বারবার আমি একথা আর শুনতে পারি না, তোমার পাপ পুণ্যের বিচার যেদিন কর্ব্বে, তার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়। আমি পাপ জানি না, তোমায় জানি, তুমি আমায় পায়ে স্থান দিয়েছ, এর বাড়া পুণ্যের ফলও যেন কোন রমণী কখনও আশা করে না।"

বিস্ময়ে পুলকে নির্ম্মল লাফাইয়া উঠিল, জোর করিয়া বিমলাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"উঃ আমি কি মূর্খ, এমন রত্ন চিন্তে না পেরে, কাঁচের পিছন নিয়ে ছিলাম, তুমি না কথা কইতে জান্তে না বিমল ?"

বিমলা দীর্ণ তৃপ্ত বুকে যে মহা আনন্দের সঞ্চার হইয়া তাহা আজই প্রথম, মুখ ফুটিয়া কথা বলিবে সে শক্তি তাহার লোপ পাইয়াছিল, মনে মনে সে কামনা করিতে লাগিল—"ভগবান্, এ বন্ধন হতে যেন আমায় আর বিচ্ছিন্ন কর না।"

(ছ)

চতুর্দ্দিকে জ্বলিত অঙ্গারবেষ্টিত স্বর্ণের মত, পবিত্র-তীর্থ-সঙ্গত পাপীর

মত, আরাধনারত সাধকের মত, শোভা, পুলীনবিহারী ও তাঁহার স্ত্রী, অশোক ও রমা, নির্ম্মল ও বিমলা ইহাদের মধ্যস্থানে থাকিয়া দিন দিন যেন আপনার মনের কালিমা ধুইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল, আর অতি লঘু ভাবে প্রবিষ্ট অনুতাপ প্রবল আকার ধারণ করিয়া তাহাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছিল। মিলিত দম্পতীত্রয়ের সম্পত্তীভূত ভালবাসা, অন্যান্য আকর্ষণ, সুখ শান্তি তাহাকে ঠিক এমনই একটি জিনিষের জন্য লালায়িত করিয়া ফেলিয়াছে, পূর্ব্ব কার্য্য স্মরণে এক একবার সে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, কণ্টকাবিদ্ধের মত যাতনায় অস্থির হইয়া পড়ে, এদিকে ওদিকে চাহিয়া একটা প্রকাণ্ড হতাশ্বাসে তাহার হাত পা দেহ মন অবস আচ্ছন্ন হইয়া আসে। নলীনাক্ষকে কদাচিৎ দেখিতে পায়, কি উদাস মূর্ত্তি, যেন সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, যে শোভাকে সে হাত ধরিয়া কাতরবচনে দীননয়নে অত প্রার্থনা জানাইয়াছে, এখন আর সেই শোভার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না, এই সৌম্যমূর্ত্তির নির্ব্বিকার ভাব শোভাকে দ্বিগুণ ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে, একবার সে মনে করে—ছুটিয়া গিয়া পায়ে পড়িয়া প্রেম যাচ্ঞা করিয়া লয়, কিন্তু কাহার অনিবার্য্য অজ্ঞাত আক্রমণে যেন তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পায় না, একটা ভীতি ক্ষণিক লজ্জা তাহাকে বাধা প্রদান করে। কদিন সে পুলীনবিহারীকেও দেখিতে পায় না, সমস্ত দিনটা বিমলার সঙ্গেই তাহার কাটিতেছিল, মধ্যে মধ্যে বিকারগ্রস্তের বিষ প্রয়োগের মত খোচা দিয়া রমা দুচার কথা বলিয়া তাহাকে আরও উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছে। বিমলা সান্ত্বনা করিত, পতির প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য উপদেশ দিতে দিতে পুণ্যকাহিনী বিবৃত করিতে করিতে শোভাকে কাঁদাইয়া নিজে কাঁদিত, আবার সৎপথে পদার্পণ করিলে, সুখ অনিবার্য্য জানাইয়া তাহাকে মন স্থির করিতে বলিত! এমনই ঘটনার মধ্যে আরও একটি মাস কাটিয়া গেল, নির্ম্মল সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া চলাফিরা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বাড়ী যাইবার জন্যে তাহার প্রবল আগ্রহ, কিন্তু পুলীনবিহারীর ইঙ্গিতেই কেহ আজ পর্য্যন্ত একপা নড়িতে পারেন নাই, তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন, এমন সংসর্গে যদি শোভাকে উদ্ধার করিতে না পারেন, তবে ত আর অন্য উপায় নাই। সেদিন আকাশে থরে থরে তারা ফুটিয়াছিল, ছাদের আলিশায় মাথা রাখিয়া এই চন্দ্রকরধৌত রজনীতে বিমলার ও রমার আনন্দের কথা ভাবিয়া শোভা হায় হায় করিতেছে, ছাদে কোকিল ডাকিতেছে, একটা উদাস বাতাস যেন কাণের গোড়ায় করুণকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। সহসা সতীশ আসিয়া ডাকিল,—"শোভা!"

সতীশের স্বর শক্ত, কঠোর, শোভা তাহার মুখে এমন স্বর জীবনে শোনে নাই, সে কথা বলিতে পারিল না, চোখ বাহিয়া জল ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। সতীশ আবার বলিল,—"এত দেখে, এমনতর সংস্রবে থেকেও তোর চিত্তশুদ্ধি হল না, হা অদৃষ্ট!"

সতীশের এই খেদসূচক বাণী শোভাকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিল, সে নিজে ত সুখী হইতে পারিল না, অধিকন্তু তাহার জন্য প্রাণের ভ্রাতা সতীশও পুড়িয়া মরিতেছে, ছোট্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিল,—"কি কর্ত্তে বল?"

"কি আবার বল্‌ব, হিঁদু রমণীরা যা করে থাকে?"

শোভা উঠিয়া দাঁড়াইল, নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল—"আমিত কিছু জানি না দাদা, তুমি আমায় শিখিয়ে দাও।"

শোভার স্বর ধরা, গাঢ়। সতীশের হৃৎস্পন্দন হইল, বলিল,—"অপরাধ যা করেছিস, তার কিছু প্রায়শ্চিত্ত নেই, তবু যা, স্বামীর পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

স্বামীকে সে কোথায় পাইবে, তাহাই ভাবিতেছিল, সতীশ হাত ধরিয়া বলিল—"আয় নীচে যাই।" বলিয়া নীচে আসিয়া অঙ্গুলিটী দ্বারা একটি কক্ষ দেখাইয়া দিয়া বলিল—"যা, ঐ ঘরে নলীনাক্ষ রয়েছে।" বলিয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল।

শোভার পা কাঁপিতেছিল, একপা অগ্রসর হইয়া সে দুইপা পিছাইয়া আসিল, নলীনাক্ষের রুক্ষ দৃষ্টি তাহাকে ভীত করিয়া তুলিল, সতীশ দূর হইতে বলিল—"যা বোন, পায়ে ধরে পড়, ও ছাড়াত তোর গতি হবে না।"

শোভা আবার পা বাড়াইল, একপা একপা করিয়া সে নলীনাক্ষের পায়ের গোড়ায় গিয়া দাঁড়াইয়া মাথা নীচু করিল, নলীনাক্ষের মুখচোখ ছাপাইয়া যেন একটা উপহাসের প্রত্যাখ্যানের হাসি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। শোভার বুক হইতে একটা চীৎকার যেন দ্রুতবেগে আসিয়া তাহার কণ্ঠদেশে আটকাইয়া গেল, সতীশ অভয় প্রদান করিয়া বাহির হইতে বলিল—"বল আমায় ক্ষমা করবে, গঙ্গা ত সমস্ত পাপীকেই কোলে তুলে, ওরা যে তারই মত পবিত্র, তোর শরীরে যত পাপই থাকুক না, ধুয়ে পবিত্র করে নিতে পার্‌বেন।"

দৈববাণীর মত সতীশের কথাগুলি শোভার কাণে গেল, সে অতি কষ্টে বলিল,—"ক্ষমা?" আর কোন কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না।

চেয়ারে বসিয়া নলীনাক্ষের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, এ কি ভীষণ

পরীক্ষা। শোভার পাপের কথাত তাহার অবিদিত ছিল না। আর্য্যসন্তান নাকি এমন স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে পারে; সতীশ বাহির হইতেই চীৎকার করিয়া বলিল—"পায় ধরে ক্ষমা প্রার্থনা কর বোন, তোমার পাপ ত কম নয়।"

শোভা কথা বলিতে পারিল না, ছিন্ন বল্লীর মত নলীনাক্ষের পায়ের উপর পড়িয়া গেল, নলীনাক্ষ কি করিবে তাহাই ভাবিতেছিল, ঠিক এই সময়ে পুলীন-বিহারী আসিয়া বলিলেন—"ক্ষমা কর বাপ, মাকে আমার ক্ষমা কর, ওর পাপ ধুয়ে গেছে, আমার আদেশ, একে তুমি প্রত্যাখ্যান কর না, এ তোমার ধর্ম্মপত্নী, আমি যাকে ঘরে এনেছি, তার একদিনের অপরাধ আমার আদেশে তুমি ভুলে যাও।" বলিয়া তিনি যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনি বাহির হইয়া গেলেন। নলীনাক্ষ বিকৃতমুখে শোভার হাত ধরিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইতেই সে নলীনাক্ষের বুকের উপর ঢলিয়া পড়িল।

সম্পূর্ণ।

থার্ড মাষ্টার

(শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

গ্রামের স্কুলে যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখন একদিন আমাদের তৃতীয় শিক্ষক রমাকান্ত বাবু কার্য্যে অবসর গ্রহণ করিলেন। স্কুলের মধ্যে কেবল মাত্র তিনি আমাদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তাহার কারণ তিনি ছাত্রদিগকে নিজের সন্তানের ন্যায় দেখিতেন ও অত্যধিক পরিমাণে তাহাদের আবদার সহ্য করিতেন। কোন পর্ব্ব উপলক্ষে ছুটি আবশ্যক হইলে আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে যাইয়া ধরিতাম, তাহাতেই আমাদের কার্য্য সিদ্ধি হইত। কোনও অন্যায় কার্য্য করিলে তিনি প্রায়ই আমাদের হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের বেত্রাঘাত হইতে রক্ষা করিতেন। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল স্কুলে পড়াইতে-ছিলেন, সেই জন্য হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ও তাঁহাকে বেশ মান্য ও খাতির করিয়া চলিতেন। এ হেন থার্ড মাষ্টার মহাশয় যখন কার্য্যে অবসর গ্রহণ করিলেন তখন আমরা বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলাম।

স্কুলের মধ্যে আমাদের ক্লাশের ভয়ানক বদনাম ছিল। ক্লাশের মধ্যে আমরা

অনেকতক ভয়ানক দুর্দ্দান্ত ছিলাম। যদি কোন শিক্ষক আমাদের উপর উপদ্রব করিতেন তাঁহা হইলে আর তাঁহার রক্ষা থাকিত না, কোন না কোন প্রকারে তাঁহাকে অপদস্থ করিতাম। অবশ্য ইহার জন্য সময়ে সময়ে হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে আমাদের উত্তম মধ্যম দু'চার বা যে না হইত তাহা নহে, কিন্তু তারপর আবার আমরা যে কে সেই। কোন নূতন শিক্ষক কার্য্যে নিযুক্ত হইলে হেড্‌মাষ্টার মহাশয় যখন জিজ্ঞাসা করিতেন "কি মশায়, ছেলেদের কেমন দেখছেন?" তখন তিনি উত্তর দিতেন "আজ্ঞে, অপরাপর ক্লাশের ছেলেরা বেশ পড়া শুনা করে ও কথা শুনে, কিন্তু এই সেকেণ্ড ক্লাশের কতক-গুলো জ্যাঠা ছেলে বড়ই বিরক্ত করে মেরেছে। হতভাগারা নিজে ত কিছু করবেই না, বাকী যারা কিছু করে, তাদের মাথা খাচ্ছে।"

হেড্‌মাষ্টার মহাশয় গোঁফ যোড়াটি নাড়িয়া একটু হাসিয়া উত্তর দিতেন "আপনি যে এর মধ্যেই ধরেছেন দেখছি! ঐ ক'টা বিশ্ববকাটকে না তাড়ালে আর ক্লাশের উন্নতি নেই দেখ্‌ছি।"

যা'হক রমাকান্ত বাবুর অবসর গ্রহণের দুই দিন পরেই হেড্‌মাষ্টার মহাশয় একজন চশমাধারী ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া আমাদের ক্লাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি লোকটিকে দেখাইয়া বলিলেন "ইনি আজ থেকে থার্ড মাষ্টার হ'লেন, তোমরা এঁকে খুব ভক্তি ও মান্য করবে।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

হেড্‌মাষ্টার মহাশয় চলিয়া গেলে তিনি আমাদের বসিতে বলিলেন ও ফার্ষ্ট বেঞ্চের ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের কি ইতিহাসের পড়া দেওয়া আছে?"

অমনি আমাদের বেঞ্চ হইতে উত্তর হইল "না স্যার্, পড়া কিছু দেওয়া নেই।"

থার্ড মাষ্টার তৎক্ষণাৎ চশমার ভিতর হইতে চোখ দু'টা ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন "চুপ কর, তোমাদের জিজ্ঞাসা করিনি, তোমরা চুপ করে থাক। দেখ, ও রকম আমার ক্লাশে চলবে না। আমি হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের কাছ হ'তে তোমাদের গুণকীর্ত্তন সমস্তই শুনে এসেছি, মনে রেখ আমার ক্লাশে ফাঁকি চলবে না—আর আমি ঠিক মত পড়া ও আদব কায়দা চাই।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম "আচ্ছা, তোমার আদব কায়দা বার করছি দাঁড়াও। ঘুঘু দেখেছ বাছাধন, তার ফাঁদ ত এখনও দেখনি।"

ফাষ্ট বেঞ্চের ছেলেরা বলিয়া উঠিল "আজ্ঞে আমাদের থার্ড মাষ্টার মশায় আকবর রাজত্ব পড়া দিয়ে গিয়েছিলেন।"

"বেশ তাই হ'বে, কই একখানা বই দেখি।" এই বলিয়া তিনি তাঁহাদের দিকে চাহিলেন।

যাই বলা অমনি ফাষ্ট বেঞ্চের ভাল ছেলেদের দল হইতে চার পাঁচখানা অধর বাবুর ইতিহাস একেবারে টেবিলের উপর রক্ষিত হইল। তিনি একখানি বই লইয়া পড়া ধরিতে আরম্ভ করিলেন।

'যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।' তিনি বই লইয়াই একেবারে আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আকবর কে? এবং তাহার সম্বন্ধে কি জান বল?"

আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম কিন্তু কোন উত্তর দিলাম না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম "আঃ লোকটা গোড়া থেকেই জ্বালাতে লাগল দেখছি। একেবারে বন গাঁয়ে শেয়াল রাজা হয়ে এসেছেন।"

"কিহে; তোমাকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকৃতে কে বলেছে, আকবর কে?"

আমি মাথা চুলকাইয়া উত্তর করিলাম "ওখানটা ভাল প'ড়ে আসিনি স্যার।"

"আচ্ছা খারাপ করে বল শোনা যাক।"

আমি কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

গম্ভীরভাবে তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "ও তাই বুঝি বলছিলে পড়া কিছু দেওয়া নেই, বেঞ্চের উপর দাঁড়াও।"

আমি আর কিছু না বলিয়া বেঞ্চের উপর দাঁড়াইলাম। মনে মনে বলিলাম "তোমার আর বেশী দিন নয়।"

ক্রমে ক্রমে আমাদের বেঞ্চের প্রায় সকলেরই ঐ প্রকার অবস্থা হইল।

তিনি ঘাড় মুখ নাড়িয়া পড়া বুঝাইয়া দিলেন ও নূতন পড়া বলিয়া দিয়া বিদায় লইলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "কাল যে পড়া না ক'রে আসবে তাকে স্কুলের ছুটীর পর দুঘণ্টা স্কুলে আবদ্ধ করে রাখা হবে।"

(২)

সেই দিন স্কুলের ছুটীর পর আমাদের এক মিটীং হইয়া গেল। স্থির হইল আগামী কল্য শনিবার আমরা রমাকান্ত বাবুর বাড়ী যাইব, তাহার পর এই থার্ড মাষ্টারকে তাড়াইবার ব্যবস্থা করা হইবে। তাহাতে যদি আমাদের পড়া ছাড়িতে হয়, তাও প্রস্তুত।

পরদিন আমরা পাঁচজন স্কুল কামাই করিয়া রমাকান্ত বাবুর বাড়ী চলিলাম, পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম আমাদের নব্য থার্ড মাষ্টার ললিত বাবু সাইকেল করিয়া আমাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। যথাসময়ে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন নিচের ঘরে বসিয়াছিলেন। আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "কি রে, সব কি মনে ক'রে ?"

আমরা একভাবে উত্তর করিলাম "আজ্ঞে আমরা ললিত বাবুর কাছে পড়্‌ব না। আপনি দয়া ক'রে আর বছর খানেক আমাদের পড়াবেন চলুন।"

"তা কি আর হয় রে বাবা, বুড়ো বয়সে আর পারব কেন ? কেন আমি জানি উনি ত লোক ভাল।"

"আজ্ঞে না, আপনাকে যেতেই হবে। উনি ত প্রায় আমাদের বয়সি, ওঁর কাছে আবার পড়্‌ব কি !"

"ছি, তোদের আর পাগলামি গেল না দেখছি। তোরা বুঝি সব বদমাইসি করেছিলি ?" এই বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন।

"আজ্ঞে না, কিছু না। কাল ক্লাশে একবার কথা বলেছিলাম বলে একেবারে বলেন কি না বেঞ্চের উপর দাঁড়াও।"

"তা নাই বা ক্লাশে কথা কইলি বাপু! পড়ার সময় কি কথা কওয়া উচিত ? আর কি জানিস, ওরা হচ্ছে নূতন পাশ করা, কাঁচা বয়স, তাই অত বাচালতা দেখতে পারে না।"

"আর আমরা বুঝি সব বুড়ো হ'য়ে গেছি ?"

"আহা, উনি শিক্ষক আর তোরা ছাত্র, ওঁর কথা মান্য করে তোদের ত চলতেই হবে।"

"সে যাই হ'ক আপনাকে যেতেই হবে।"

"আচ্ছা আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বলে দেব এখন। তিনি পড়াচ্ছেন, আর কি আমার যাওয়া ভাল দেখায় ? আর এ বয়সে আর পারবই বা কেন।" এই প্রকারে নানা রকম উপদেশ দিয়া তিনি আমাদের বিদায় করিলেন।

পরদিন হইতে যথাসময়ে স্কুলে যাইতে লাগিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, ললিত বাবুর ক্লাশে পড়াশুনা একেবারেই করিতাম না ও তাহার জন্য মাঝে মাঝে বেত্রাঘাতও যে না সহিতাম তাহা নহে। মনে মনে বড়ই রাগ হইত ও কি প্রকারে তাঁহাকে অপদস্থ করিয়া স্কুল হইতে বিদায় করিব তাহার সুযোগ

খুঁজিতাম। একদিন রমাকান্ত বাবুর বাড়ী যাইয়া ললিত বাবুর ঠিকানাটি জানিয়া লইলাম। শুনিলাম তিনি অনেক দূর হইতে পড়াইতে আসেন।

ইতিমধ্যে একদিন পড়া বলিতে না পারায় তিনি আমাকে গাধার টুপি মাথায় দিয়া সমস্ত ক্লাশ ঘুরাইয়া আনিলেন। সেদিন আর আমার ধৈর্য্য রহিল না, সঙ্কল্প করিলাম কাল যেমন করিয়া পারি ইহার প্রতিকার করিব।"

পরদিন আমি ও আমার দলের জনকতক মিলিয়া পথে ললিত বাবুকে একটু জব্দ করিলাম যে তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাকে দোষী করিতে না পারিলেও আমি যে তাহার মূল ছিলাম এ কথা হেড মাষ্টার মহাশয় বেশ ভাল রকম বুঝিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহার নিকট হইতে আমার দাদা মহাশয়ের নামে এক পত্র আসিল। তিনি লিখিয়াছেন "মহাশয়, আপনাকে অনেক দিন হইতে আপনার পৌত্র দেবেনের বিষয় জানাইয়া আসিতেছি, কিন্তু আপনি কিছুই করিলেন না। গত কল্য দেবেন উহাদের ক্লাশের এক শিক্ষককে বিশেষরূপে অপদস্থ ও মর্ম্মাহত করিয়াছে। আমি আর উহাকে বিদ্যালয়ে রাখিতে ইচ্ছা করি না।"

বাল্যে আমার পিতামাতা মারা যান। সংসারে একমাত্র দাদামহাশয় ভিন্ন আমার ও আমার ভগিনী নির্ম্মলার আর কেহই ছিল না। পিতা মাতার মৃত্যুর পর দাদামহাশয় আমাদের চক্ষের অন্তরাল করিতেন না ও প্রাণ অপেক্ষা আমাদের ভাল বাসিতেন। কেহ আমাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে আসিলে তিনি বলিতেন "বাপুহে, তোমরা বুড়ো হয়ে মরতে চল্লে, এ সব দুধের ছেলের সঙ্গে লাগতে তোমাদের লজ্জা করে না।" সে সময় আমি যাহা বলিতাম তিনি তাহাই বিশ্বাস করিতেন; তখন আমার বিরুদ্ধে হাজার প্রমাণ থাকিলেও তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিতেন।

পূর্ব্বে আমার নামে অনেকবার স্কুল হইতে হেড মাষ্টার দাদামহাশয়ের নিকট নালিশ করিয়াছেন কিন্তু তিনি কিছুই বিশ্বাস করেন নাই। এবার পত্র পাইয়া তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "হাঁরে দেবু, হেড মাষ্টার যা লিখেছেন এ কি সত্য?"

আমি তৎক্ষণাৎ তাহা অস্বীকার করিলাম। অধিকন্তু একটু রাগতভাব দেখাইয়া বলিলাম "দাদা মশায়, আমি আর ও স্কুলে পড়ব না। ওরা আমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে—তা না হলে দেখুন না কাল আমি স্কুলেই যাই নি। আর বলে কি না আমি শিক্ষককে মেরেছি! এ কি কথা দাদা মশায়?"

কথাটা দাদা মহাশয়ের যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। তিনি বলিলেন "তাই ত বটে! তুই ত কাল স্কুলেই যাস নি; আমি সব বুঝেছি। আমি তোকে আর এখানে রাখব না। কাল সার্টিফিকেট নিয়ে আসবি। পাড়া-গাঁয়ের স্কুলের দশাই ঐ।"

আমি মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইলাম ও পরদিন স্কুল হইতে বিদায় লইয়া আসিলাম। স্থির হইল সম্মুখে পৌষ মাস বাদ মাঘ মাস হইতে কলিকাতার স্কুলে ভর্ত্তি হইব ও সেখানে দাদা মহাশয়ের সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু নিমাই বাবুর বাড়ীতে থাকিব।

(৩)

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন হাটতলা থেকে বাড়ী ফিরছি এমন সময় দেখি আমাদের ক্লাশের হরলাল স্কুল যাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি রে তোদের থার্ড মাষ্টার বেশ সুখে আছে ত?"

হরলাল এক গাল হাসিয়া উত্তর করিল "আর থার্ড মাষ্টার! তিনি ত কাল রিজাইন দিয়েছেন।"

আমি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন রে হঠাৎ যে রিজাইন দিলে?"

"সে ভাই ভারি মজা হ'য়ে গেছে; বাচাধনকে ঘরে বাইরে ব্যতিব্যস্ত করে মেরেছে।"

আমি আরও আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কি ব্যাপার বল দেখি।"

"তবে একান্তই শুনবি" এই বলিয়া আবার কহিল "থার্ড মাষ্টার ডাক্তারী কর্‌ত।"

"কি রকম?"

"এই স্কুলে আসবার আগে সকাল বেলা যতক্ষণ বাড়ী থাকত ততক্ষণ পাড়ার গরীব দুঃখীদের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিতরণ করত। আবার স্কুলের পর থেকে রাত্রি ন'টা পর্য্যন্তও ঐ রকম করত। কলকেতা থেকে এক বাক্স হোমিও-প্যাথিক ওষুধ নিয়ে এসেছেন। রাত্রে দরকার হ'লে আবার গরীব দুঃখী-দের বাড়ীতে রোগীও দেখতে যেত—" এই বলিয়া হরলাল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তাহার হাসি দেখিয়া আমারও হাসি পাইতে লাগিল। আমি একটু হাসিয়া বলিলাম "কিরে তুই যে হেসেই খুন। তার পর?"

"তার পর, পরশুদিন রাত্রি আটটার সময় দুজন লোক ওর বাড়ীতে এসে বলে "মশায়, আমাদের বাড়ীতে যদি দয়া করে এখন একবার রোগী দেখতে যান তাহলে বড় ভাল হয়।"

আমি তার কাছে আর একটু ঘেঁসিয়ে উত্তর করিলাম "তার পর?"

"লোকটা এদিকে যাই হোক বড় পরোপকারী কিনা, তাদের অমনি বললে 'বেশত চল যাচ্ছি' এই বলে তাদের সঙ্গে যান। লোক দুটো তাকে নিয়ে এঁকা বেঁকা রাস্তা দিয়ে দুতিন খানা ধান জমি পেরিয়ে একখানা খোলার ঘরে এসে হাজির হল। তারপর ওঁকে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢোকে! তার—" এই বলিয়া হরলাল হাসিয়া উঠিল।

"আরে তুই যে হেসেই মলি, একেবারে শেষ করেই হাসবি এখন।"

"ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকে দেখলেন, মেজেতে একটা লোক আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে পড়ে আছে, আর তার পাশে মিটু মিটু করে একটা আলো জ্বলছে। বেচারা রোগীর নাড়ী দেখবে বলে যেই তার কাছে গেছে অমনি সেই লোক দুটো বাহির থেকে ঘরের শেকল তুলে দিলে। যেই শেকল দেওয়া অমনি সেই লোকটা একেবারে উঠে বসে কোমর থেকে একখানা ছোরা বার করলে—"

আমি ভয়ানক বিস্মিত হইয়া বলিলাম "তাইত বলিস্ কিরে, এ যে আরব্য উপন্যাসের গল্প হয়ে উঠল। তোরা এ সব শুনলি কার কাছ থেকে?"

"ও হেড্‌মাষ্টারকে সমস্ত বলছিল, হেড্‌মাষ্টার আবার আমাদের কাছে সব ক্লাশে বললেন। তারপর সেই লোকটা ওঁকে ছোরা দেখিয়ে ওঁর ঘড়ি ও শাল কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। বেচারা ভয়ে ও শীতে কাঁপতে কাঁপতে রাত্রি দশটার সময় বাড়ী এসে হাজির।"

"তা ঘরে হল চুরি, চাকরি ছাড়লে কেন?"

"আর ছাড়লে কেন? হেড্‌মাষ্টারকে বললে "মশায় এ স্কুলে ঢুকে পর্য্যন্ত আমার বড় বিপদ যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস এ সব ছেলেরাই এ রকম কচ্ছে।"

আমি বলিলাম "তা বেশ হয়েছে বাছাধন, বড় চাল দেখাতে এসেছিলেন, ভগবান ত আছেন!"

(৪)

দেখতে দেখতে পৌষ মাস কেটে গেল। মাঘ মাসের প্রথমে আমার কলিকাতা যাইবার কথা। দাদামহাশয় কলিকাতায় নিমাইবাবুকে পত্র লিখিয়াছিলেন। একদিন আমি দাদামহাশয়কে বলিলাম "দাদামশায়, আর আমার দেরি করা ভাল হচ্ছে না। আমার বড় ক্ষতি হচ্ছে।" প্রকৃতপক্ষে পড়ার ক্ষতি বিশেষ মত হউক আর নাই হউক কলিকাতা বেড়াইবার ক্ষতি হইতেছিল বটে।

আমার কথা শুনিয়া দাদা মহাশয় বলিলেন "তাইত যাবি, আমি একলা থাকব! তোদের ছেড়ে যে আমি একদণ্ডও থাকতে পারি না।" এই বলিয়া কাপড় দিয়া চক্ষু মুছিলেন। আমারও মনটা কেমন হইয়া গেল আমি বলিলাম "এই কটা মাস বইত নয়, আবার এই গ্রীষ্মের ছুটী হলেই চলে আসব।"

চক্ষু মুছিয়া তিনি বলিলেন "দেখিস ভাই সেখানে খুব সাবধানে থাকিস। আর নিমাইকে আমার মতন দেখবি।"

যথাসময়ে নিমাইবাবুর পত্র আসিল। তিনি লিখিয়াছেন "কল্য দেবেন ভায়াকে পাঠাইবে, আমি ষ্টেশনে থাকিব।"

পরদিন দাদামহাশয় ও নির্ম্মলার নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলাম। কলিকাতায় যাইয়া প্রথম প্রথম মন বড় খারাপ হইয়া গেল। স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম বটে কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাইলাম না। সদাই দাদামহাশয়ের নিকট মন পড়িয়া থাকিত। কি করিব, মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিতাম; কারণ আমি নিজেই আমার দুঃখের কারণ। যখন একলা থাকিতাম অতীতের স্মৃতি একে একে সমস্তই মনে পড়িত। 'হায়! কেন থার্ডমাষ্টারের প্রতি ঐরূপ রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলাম! প্রকৃতপক্ষে তিনি ত লোক মন্দ ছিলেন না, তবে কেন বিনাদোষে তাঁহার উপর অন্যায় আচরণ করিয়াছি! তাঁহার প্রতি এরূপ ব্যবহার না করিলে বোধ হয় আমাকে এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না।'

দুই তিন মাস বাদে গ্রীষ্মের ছুটী আসিল। ছুটীর পরদিনই বাড়ী চলিয়া গেলাম। দাদামহাশয়ের আর আনন্দ ধরে না। ছুটীর কয়দিন বেশ আমোদে কাটিয়া গেল। সুখের দিন মানুষের বেশিদিন স্থায়ী হয় না, যথাসময়ে পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় দাদামহাশয় বলিয়া দিলেন

"দেখ, নির্ম্মলার চার পাঁচ জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসছে, এই শ্রাবণের মধ্যে একটা ঠিক করে ফেলতেই হবে। তুই আমার চিঠি পেলেই চলে আসবি।"

কলিকাতায় পৌঁছিবার কিছুদিন পরেই দাদামহাশয়ের এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন "আগামী ৬ই শ্রাবণ নির্ম্মলার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, শীঘ্র চলিয়া আসিবে। নিমাইবাবুকে বলিবে তিনিও যেন আসেন।"

আমার তখন হাফইয়ার্লী পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলাম ৩রা পরীক্ষা শেষ হইবে; মনে মনে বড়ই দুঃখ হইল—হায়, আমার স্নেহের ভগিনীর বিবাহ, আর আমি দশদিন আগে হইতে তাহার উদ্যোগ করিতে পারিব না।

৪ঠা সকালবেলা বাড়ী রওনা হইলাম। নিমাইবাবু বিবাহের দিন বৈকালে আসিবেন বলিলেন। যথাসময়ে বাড়ী পৌঁছিলাম। কোমর বাঁধিয়া ভগিনীর বিবাহের যোগাড় করিতে লাগিয়া গেলাম।

বিবাহের দিন বিকালবেলা নিমাইবাবুকে আনিবার জন্য ষ্টেশনে গেলাম। তাঁহাকে লইয়া বাড়ীর নিকটে আসিবা মাত্র শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইলাম, বুঝিলাম বর আসিয়াছে, তাড়াতাড়ি বর দেখিতে ছুটিলাম। যাহা দেখিলাম সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। বর আর কেহই নহে আমাদের নব্য থার্ডমাষ্টার ললিতবাবু। তিনিও একবার আমার দিকে চাহিয়া চক্ষু নত করিলেন। মনে মনে তখন দুঃখ ও লজ্জা দুইই হইতে লাগিল, কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। আগে দাদামহাশয়ের নিকট সংবাদটা জানিয়া লইলে যা হয় একটা কিছু করা যাইত।

নির্দ্দিষ্টলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন একটা কথা হঠাৎ আমার মনে পড়িয়া গেল। আমি বরকে আমার ঘরে লইয়া গেলাম। তার পর আমার ট্রাঙ্ক খুলিয়া তাহা হইতে একটি ঘড়ি ও একখানি শাল বাহির করিয়া তাঁহাকে বলিলাম 'আপনার সঙ্গে কাল থেকে আমার যে সম্পর্ক হয়েছে সেই হিসাবে আজ আপনার শাল, ঘড়ি কেড়ে নিয়ে ঠাট্টা করলে সেটা অনেক পরিমাণে সঙ্গত বলা যায়। কিন্তু কয় মাস আগে এ রসিকতাটা অন্ততঃ আপনার কাছে যে অত্যন্ত নীরস বোধ হয়েছিল তা আজ আমি বেশ ভাল রকমই বুঝছি। যাহক মাস কতক আগেকার ঘটনাটা আজকের দিনে আলোর মধ্যে এনে ফেলে সেটা শালা ভগ্নীপতির ঠাট্টা মনে করে আমায় ক্ষমা করবেন ললিতবাবু।

আর এ জুতো আপনাকে অনেক আগে ফিরিয়ে দেওয়া আমার উচিত ছিল, কিন্তু এর কথা আমি একেবারে ভুলেই গেছিলাম।"

বলা বাহুল্য থার্ড মাষ্টারের ঘড়ি ও শাল হস্তগত করা আমারই ষড়যন্ত্রে।

ঘোমটা আঁটা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(লেখক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার অন্ধকার পবিত্র তীর্থবাসীর উপর ঘনাইয়া উঠিতেছিল,—দূরে দূরে কাশীর রাজপথের আলোগুলি ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তীর্থবাসী সাধুগণের হর-হর শঙ্কর রবে সমস্ত কাশী মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। সুদর্শনবাবু একখানা বেতের আরাম কেদারার উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবিষ্ট,—তাঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র,—কপালে চন্দনের ফোঁটা। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত বটে, কিন্তু তিনি নিদ্রিত নহেন,—গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া যাইবার পর সুদর্শনবাবু একবার চক্ষু উন্মিলিত করিয়া গৃহের চারিপার্শ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। গৃহে তখন আলো জ্বালা হয় নাই,—সন্ধ্যার অন্ধকার খুব খানিকটা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঘরটাকে অনেকটা ঘোলাটে করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি গবাক্ষের ভিতর দিয়া নীল আকাশের উপর গিয়া পড়িল। সেখানে দুই একটা তারা দূরে দূরে মিটমিট করিতেছিল। সুদর্শনবাবু সেই তারার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সেই সময় একখানি শোকের জীবন্ত প্রতিমা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার গৃহ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরখানা বেশ একটা নিবিড় শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। যে বিষাদ মূর্ত্তিখানি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল,—সে একটী কিশোরী,—তাহার বয়স অনুমান ষোল সতর,—পরিধানে শুভ্র থান ধুতি। এই নিরাভরণা বিষাদ মূর্ত্তিখানির সর্ব্বাঙ্গ

হইতে যেন একটা মহান্‌ পবিত্রতা ঝরিয়া পড়িতেছে। কিশোরী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে গৃহের আলোটা জ্বালিয়া দিল। আলো জ্বলিবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহের অন্ধকার ধীরে ধীরে গবাক্ষ দিয়া বাহির হইয়া গিয়া বাহিরের অন্ধকারের সহিত মিশিয়া গেল। ভিতরের আলোটা সেই অন্ধকারকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়া গবাক্ষের ভিতর দিয়া অনেকটা বাহিরে যাইয়া পড়িল। কিশোরীর গৃহ প্রবেশের শব্দ সুদর্শনবাবুর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল,—কিন্তু তথাপি তিনি চক্ষু উন্মিলিত করেন নাই,—পূর্ব্বে যে ভাবে চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন এখন ঠিক সেই ভাবে চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন। কিশোরী ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া অতি মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যাঠামশাই, আপনার দুধ কি এখন গরম করে নিয়ে আসবো ?"

কিশোরীর মৃদু স্বর সুদর্শনবাবুর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। তাঁহার প্রশান্ত স্বর, অতি প্রশান্ত ভাবে বাহির হইয়া আসিল, "না মা, এখন দুধ গরম করে আনবার প্রয়োজন নেই। আজ কেন জানিনি মোটেই কিছু খেতে ইচ্ছে কচ্ছে না। সমস্ত দিন কিছু খাইনি তবু কই ক্ষুধের তো কোন উদ্রেক দেখতে পাচ্ছি না। মরণ হলে এ কষ্ট বোধ হয় আর থাকবে না।"

সুদর্শনবাবুর কথা কয়টীতে কিশোরীর মুখখানি আরও যেন ম্লান হইয়া পড়িল। সে অতি বিষাদভরে বলিল, "জ্যাঠামশাই ও কথা বলবেন না। পৃথিবীতে আমার আর কে আছে বলুন,—আপনি বিহনে আমায় আর কে আশ্রয় দেবে বলুন। স্বামীর মৃত্যুর পর যে দিন বিনাদোষে,—দুটো অন্ন দেবার ভয়ে শ্বশুর আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন,—সেই দিন দয়া করে আপনি যদি না আমায় আশ্রয় দিতেন তাহলে আজ আমার কি হতো তা ভগবান কেবল বলতে পারেন। সে কথা ভাবলে আজও আমার শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে। আপনার কাছে থেকে আপনার হিতোপদেশে নারী-ধর্ম্ম কি তাহা আমি বুঝেছি। স্বামীই যে নারীর ইষ্টদেবতা আপনার উপদেশে তা আমি বুঝেছি। আমার প্রাণটুকু তাঁর চরণে মিশিয়ে দিয়ে আমি তাঁর পূজা কর্ত্তে শিখেছি। সে পূজায় আমি যে সুখ পেয়েছি সে সুখের তুলনায় অন্য সুখ কিছুই নয়। জ্যাঠামশাই, আপনি আমাকে ছেড়ে গেলে,—কার কাছে যাব,—বলুন কোথায় গেলে আমি নিশ্চিন্তে স্বামী পূজা কর্ত্তে পারবো। না—না ও কথা আপনি বলবেন না।"

সুদর্শনবাবুর মুখের উপর একটা বিষাদ হাসি ভাসিয়া উঠিল। তিনি মৃদু স্বরে বলিলেন, "সেফালি, মা আমার,—তোমার মুখের দিকে চাইলে আমার বুক ফেটে যায়। জানিনা রহস্তময়ের কি রহস্ত,—কেন তিনি তোমার মত নির্ম্মল ফুলটাকে সর্ব্ব সুখ থেকে বঞ্চিত কর্লেন। মা মানুষের জ্ঞানই বল,—বুদ্ধিই বল,—শক্তিই বল তার ক্ষমতা অতি সামান্ত। রহস্তময়ের কোন রহস্তই আমরা বুঝি না,—বুঝতে পারি না,—বুঝবার চেষ্টাও করি না। কিন্তু তাঁর প্রতি কার্য্যের বিশেষ যে একটা উদ্দেশ্ত আছে তার কোন সন্দেহ নেই। তোমার স্বামীকে কেড়ে নিয়ে তোমাকে শ্বশুরের ভিটা থেকে বিতাড়িত করে যে তার কি কার্য্যের সুশৃঙ্খলা হলো সে কেবল তিনিই জানেন। তা হক তবু যেন মা তিনি যা করেন তা মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের কার্য্য নয়। মা ততটা যে আমি তোমার জন্তে ভাবিনি। আমি অনিমার চেয়েও তোমার জন্তে বেশী ভাবি। তার জীবনে আশা আছে,—উদ্দেশ্ত আছে,—অর্থ আছে কিন্তু মা তোমার কিছুই নেই। তুমি আমার কেউ নও,—রক্ত সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ না থাকলেও কিন্তু মা এখন তুমি আমার হৃদয়ের অনেকটা স্থান জুড়ে বসেছ। তোমায় আশ্রয় দেবার জন্তে ভগবান যেদিন আমায় প্রাণে ইচ্ছা দিয়েছিলেন,—সেই দিনই আমি বুঝেছিলুম তুমি মা আমার কেউ না হলেও কেউ। এ কাটাম বদলাবার পূর্ব্বে আমি তোমার এমন ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব,—যাতে কোন দিন না তোমার জীবনে স্বামী পূজার ব্যাঘাৎ না হয়। তুমি জান না মা,—আমি তখনই বুঝেছি,—যে আমার কাটাম বদলাবার ঘণ্টা বেজেছে। তখন থেকেই আমি যাবার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছি মা। আমি উইল করেছি,—সে উইলের সর্ত্ত অনুসারে তোমার যে ব্যবস্থা হবে তাতে কোন দিন মা তোমার স্বামী পূজায় বিঘ্ন হবে না।"

কিশোরীর নাম সেফালী। সেফালীর অদৃষ্টে কেন জানি না ভগবান সুখ লেখেন নাই। অতি বাল্যকালেই সে পিতৃমাতৃহীন হয়। আত্মীয় স্বজন কেহ না থাকায় একজন প্রতিবাসী এই মাতৃপিতৃহীন হতভাগিনীকে আশ্রয় দান করেন, সেফালীর বাল্যজীবন দুঃখ কষ্টে তাঁহারই আলয়ে অতিবাহিত হয়। সে বিবাহ বয়সে পদার্পণ করিলে, পাড়ার দশ জন ভদ্রলোক অনাথিনী দেখিয়া চাঁদা তুলিয়া একটী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেন। কিন্তু সেফালীর এমনি পোড়া অদৃষ্ট যে বিবাহের দুই বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতে সে বিধবা হইল। সে সুখের মুখ দেখিতে না দেখিতেই তাহাকে সর্ব্ব

সুখে জলাঞ্জলী দিতে হইল। স্বামীর মৃত্যুর দুই মাস অতিবাহিত হইতে না হইতে শ্বশুর তাহাকে এক বেলা এক মুটা অন্ন দিতেও প্রস্তুত হইলেন না, তিনি তাহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিলেন। সে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে স্বামীর ভিটা শ্বশুরের আলয় পরিত্যাগ করিল। তাহার সে অশ্রুজল বোধ হয় ভগবানের চরণে পৌঁছিয়াছিল। দৈবক্রমে সেইদিন সে পথ দিয়া সুদর্শন বাবু গমন করিতেছিলেন, তিনি শেফালীর অশ্রুজল দেখিয়া তাহার প্রাণের ব্যথা বুঝিলেন। তিনি কথায় কথায় বিধবার সকল কথা জানিয়া লইলেন ও বিধবাকে নিজের আশ্রয়ে লইয়া গিয়া রাখিলেন। যে দিন হইতে সেফালী তাঁহার গৃহে বাস করিতে লাগিল, সেই দিন হইতে তিনিও ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করিলেন। একমাত্র কন্যা অমিয়াকে বালীগঞ্জের বাটীতে রাখিয়া তিনি সেফালীকে লইয়া কাশীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই হইতে সেফালী তাঁহার নিকট বাস করিতেছে। তাহার পর আজ পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই পৃথিবীর বক্ষে কত নূতন ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে,কত পুরান কীর্ত্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই পাঁচ বৎসর শেফালীকে তিনি নিজের কাছে কাছে রাখিয়া, হিন্দু বিধবার আচার ব্যবহার, রীতি নীতি সবই শিখাইয়াছেন। শেফালী শৈশব হইতেই অযত্নে অবত্ন বাড়িয়া উঠিয়াছে, কেহই তাহাকে কিছুই শিক্ষা দেয় নাই, সে কিছুই জানিত না। তিনি তাহাকে লেখাপড়া শিখাইলেন, তাহার পর কাছে বসাইয়া প্রতিদিন তাঁহাকে পুরাণ হইতে নানা গল্প করিয়া হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছিলেন। সুদর্শন বাবুর সে উপদেশ বৃথা হয় নাই, শেফালীও ধীরে ধীরে তাহার স্বামী পূজায় মন সংযোগ করিতেছিল। সুদর্শন বাবু নীরব হইলেন, শেফালীও আর কোন কথা কহিল না; নীরবে তাঁহার সম্মুখে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। সুদর্শন বাবু কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, "মা এ পৃথিবীতে বন্ধু বলতে আমার দু'জন আছে। একজন মহা কুটীল, আর একজন উদার। একজন জানে, না খেয়ে পরকে ঠকিয়ে কেমন করে টাকা বাড়াতে হয়, আর একজন এই সংসারের সব বিষয়েই অজ্ঞ। শুধু তার আছে প্রাণ। তাই আমি এই দুইজনকে আমার উইলের ইক্‌জিকিউটার করেছি। এর কারণ কি জান মা, এতে করে অমিয়া কোন দিন তার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে না বা তার সম্পত্তি বরবাদে যাবে না। একজন ঠকাতে চাইলে আর জন তা কর্ত্তে দেবে না। আর মা তোমার যে ব্যবস্থা করেছি তাতে করে তোমায়ও কোন দিন বিব্রত হতে হবে না।"

সুদর্শন বাবু নীরব হইলেন। শেফালী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সুদর্শন বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যাঠা মশাই, অনিকে এখানে আনবেন বলেছিলেন, সে কি এর মধ্যে এখানে আসবে? তার বয়স হ'ল, কই আপনি তো তার বিয়ের কোন চেষ্টা করেন না। এই বার তার একটু বিয়ে দেওয়া উচিত।"

শেফালীর কথায় সুদর্শন বাবু মৃদু হাসিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা, তোমার অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি আর মেয়ের বিয়ে দিতে সাহস হয় না। মেয়ে জানলে না বুঝলে না বিবাহ কি—অথচ কন্যার বিবাহ হ'লো, সে কন্যা বল মা কতটুকু তার স্বামীকে সুখী কর্ত্তে পারে? আমার বিশ্বাস ঐটুকু মেয়ের ওপর বিবাহরূপ গুরু দায়িত্ব পড়লে সে কিছুতেই সে দায়িত্ব বহন ক'রতে পারে না। তাতে করে হয় কি জান মা, সেও সুখী হতে পারে না, তার স্বামীও সুখী হতে পারে না। অনির মা অতি ছোট বেলায় মরে গেছে, আমারই কোলে সে এত বড়টা হ'য়ে উঠেছে। আমার যা কর্ত্তব্য আমি তা করবার জন্য সাধ্য মত চেষ্টা কচ্ছি। তাকে সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষিত করার চেষ্টা কচ্ছি। কেন জান, সব সময় সে না অসুখী হয়। সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষিত করে তাকে আমি পৃথিবীর কোলে ছেড়ে দেব। সে যখন বুঝবে বিবাহ করা উচিত, তখন সে বিবাহ করবে। মানুষের প্রাণ নিয়ে মানুষের খেলা করা উচিত নয়। আমিও তা চাই নি। আজ মেয়ের বিয়ে দেব, কাল হয় ত সে বিধবা হবে, হয় ত তার এ কথা মনেও হবে, বাবা এমন একটা লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলে যে আমি বিধবা হ'লেম। এ আক্ষেপ করবার অবসর আমি ত আমার মেয়েকে দিতে দেব না। সে নিজে যদি দেখে শুনে বিয়ে করে, তা হলে আর আক্ষেপ থাকবে না। তা ছাড়া আরও বড় কথা আমাদের ধর্ম্মেত তো আছে মা, তার যে স্বামী তার সঙ্গে তার বিয়ে হবেই। চেষ্টা করবার তো কোন প্রয়োজন নেই।"

শেফালী এক মনে সুদর্শন বাবুর কথাগুলি শুনিতেছিল, তিনি নীরব হইলে সে ভাল মন্দ সে কথার কোনই উত্তর দিল না, কেবলমাত্র মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যাঠা মশাই, রাত হ'ল, আমি এইবার আপনার দুধ গরম করে নিয়ে আসি।"

সুদর্শন বাবু এক গবাক্ষ দিয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন। বাহিরে রাত্রের অন্ধকার কাশীর উপর একেবারে জমাট বাঁধিয়া স্তব্ধ হইয়া উঠিয়াছে! কাশী

সহর অন্ধকারের ভিতর ক্রমেই নীরব হইয়া পড়িতেছে। সুদর্শন বাবু ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ মা, রাত হয়েছে—যাও দুধটা গরম করে আনগে যাও। কিছু যখন খেতে হবে তখন আর রাত করে ফল নেই। আমি অমিকে আনবার জন্য শ্রীকান্তকে টেলিগ্রাম করেছি, সেও বোধ হয়—কাল এসে পৌঁছুবে।"

শেফালী আর কোন কথা কহিল না,—সুদর্শন বাবুর জন্য দুধটুকু গরম করিয়া আনিবার জন্য ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। সুদর্শন বাবুও সেই আরাম কেদারার উপর আড় হইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আকাশ পাতাল কত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুদর্শন বাবু কাশীতে যে বাটীখানিতে বাস করিতেছিলেন,—তাহার বাহিরে রাস্তার উপর একটী ক্ষুদ্র রক ছিল। সেই রকের উপর হইতে, দশাশ্বমেধ ঘাটের পদ ধৌত করিয়া ভাগীরথী তাহার চির-প্রিয় দর্শন আশায় ছুটিয়াছে,—তাহার সেই আকুল আগ্রহের প্রতি তরঙ্গটুকু পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইত। পরদিন প্রত্যূষে সুদর্শন বাবু একখানি আরাম কেদারায় সেই রকটীর উপর বসিয়া উষার মাধুরীমাখা জাহ্নবীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিতেছিলেন,—আর ভাবিতেছিলেন, জীবনস্রোত এমনি ভাবেই বহিয়া যাইতেছে,—শত বাধা বিঘ্ন, শত বার আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইতেছে—কিন্তু কোন বাধাই সে স্রোত মানিতেছে না,—সে এ ঠিক বহিয়া চলিয়াছে কিন্তু এমন দিন আসিবে —যে দিন এই স্রোতটুকু এক মহা স্রোতে এক ভাবেই ভিতরে পড়িয়া নিজের অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিবে। দেখিতে দেখিতে দুই দিনেই এ স্রোতের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত ধরার কোল হইতে লুপ্ত হইবে,—সকলেই ভাবিবে—এই স্রোতের এইখানেই বুঝি শেষ,—এ স্রোতের কি হইল,—কোথায় গেল, আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন সঠিক মীমাংসাই হয় নাই,—কখন হইবেও না। কিন্তু তথাপি মানুষ মায়ায় এমনি মুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়াও তাহারা ভাবে এ স্রোতের আর শেষ নাই,—এই স্রোত এই ভাবেই বুঝি অনন্তকাল

পর্য্যন্ত বহিতে থাকিবে। কাল, এ স্রোত শেষ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই মানুষকে প্রস্তুত হইবার জন্য নানাভাবে নানাদিক হইতে সঙ্কেত করিতে থাকে। কিন্তু মায়ায় মুগ্ধ মানুষ কিছুতেই প্রস্তুত হইতে পারে না। সমস্ত অবন্দোবস্ত অবস্থায় একদিন সহসা জীবন স্রোত বন্ধ হইয়া যায়,—কাজেই সমস্ত উলোট পালট হইয়া সে যাহাদের রাখিয়া যায় তাহাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহারা এক্ষণে কি করিবে,—কোন্ রাস্তা ধরিবে, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারে না। সুদর্শন বাবুর চিন্তার স্রোতটা একই ভাবে পরে পরে বহিয়া যাইতেছিল,—সহসা একখানা গাড়ী আসিয়া বাটীর দোরে দণ্ডায়মান হওয়ায় তাঁহার সেই চিন্তা স্রোতে বাধা পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠিক কৌতূহল আসিয়া তাঁহার সমস্ত প্রাণটা দুলাইয়া দিল,—তিনি তাড়াতাড়ি ঘাড় তুলিয়া গাড়ীর দিকে চাহিলেন। গাড়ী বাটীর দোরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবামাত্রই,—সহিস গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়াছিল,—গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন শ্রীকান্ত বাবু, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অমিয়া। তাহাকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়াই কেমন যেন একটা হর্ষে সুদর্শন বাবুর সমস্ত প্রাণটা ভরিয়া গেল। সন্তানস্নেহ এমনি মধুর,—সন্তানকে সম্মুখে দেখিলেই সে স্নেহের উৎস যেন আবার একটা নূতন বন্যা আনিয়া দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে নব আনন্দে সমস্ত প্রাণটা তোলপাড় করিয়া উঠে।

শ্রীকান্ত বাবু গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়াই সম্মুখে রকের উপর আরাম কেদারায় সুদর্শন বাবুকে দেখিয়া বোধ হয় একটু বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মহা বিস্মিত স্বরে কহিলেন,—"একি, তুমি বাহিরে বোসে আছ,—আমরা তো তোমার তার পেয়ে ভেবে চিন্তে অস্থির হয়ে পড়েছিলুম। ভেবেছিলুম নিশ্চয়ই তোমার কোন শক্ত ব্যায়ারাম। সেই জন্যেই আরো আমি তাড়াতাড়ি অমিকে নিয়ে ছুটে এলেম। সে যাহক্ তুমি যে ভালো আছ সেই ভালো।"

পিতার ব্যাধির চিন্তায় অমিয়াও গাড়ীতে সমস্ত রাত্রি চিন্তিত অবস্থায় কাটাইয়াছে। পৃথিবীতে তাহার আপনার বলিতে এই পিতা। তাহার প্রাণের সবটুকু ভক্তি,—সবটুকু ভালবাসা এই পিতার সর্ব্বাঙ্গে দিন রাত বেষ্টিত হইয়া থাকে। সেই পিতার ব্যাধির সংবাদে তাহার সমস্ত প্রাণটা কতদূর কাতর হইয়া পড়িয়াছিল,—সে কেবল বুঝিতেছিলেন তিনি, যিনি অন্তরে বসিয়া হৃদয়ের সমস্ত কথাই বুঝিতে পারেন। অমিয়া পিতাকে যে

এ ভাবে দেখিতে পাইবে তাহা সে একবারও ভাবে নাই,—পিতাকে সুস্থ দেখিবামাত্রই তাহারও প্রাণটা আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল,—সে তাড়াতাড়ি সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাবা, কাল সমস্ত রাত আমি গাড়ীতে একটুও ঘুমুতে পারিনি, সমস্ত বুকটা ধড়াস ধড়াস করেছে। আপনার টেলিগ্রাম পাওয়া পর্য্যন্ত আমি ভেবে মর্চ্ছিলুম। ভাবলুম বুঝি আপনার ভারি শক্ত ব্যারাম।"

সুদর্শন বাবু কন্যার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন,—কন্যা নীরব হইলে একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "না না অসুখ আমার তেমন বেশী কিছু হয়নি। মাঝে উপর্য্যুপরি দুই দিন জ্বর হয়েছিল বটে, কিন্তু সে জ্বর মারাত্মক নয়। তবে বয়স হলো, যাবারও সময় হলো, এখন সর্ব্বদাই সে জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকা উচিত। এ জীবন প্রদীপ কবে যে নিব্‌বে,—আর কেমন করে যে নিব্‌বে তাতো কেউ বল্‌তে পারে না। সবারই মাথার চুল পাকার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের প্রস্তুত হওয়া উচিত। তাহলে আর মৃত্যু আপশোধের হয় না।"

তারপর শ্রীকান্ত বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কান্ত, আমি ভাই একটা উইল করেছি, সেইটাই একবার তোমাদের শুনিয়ে রাখবার জন্যে কাল তাড়াতাড়ি তোমাদের আস্‌বার জন্যে একখানা টেলিগ্রাম করেছিলেম। সেই উইলের তুমি আর রামদয়াল হলে ট্রাষ্টী; তাকেও আস্‌বার জন্যে টেলিগ্রাম করেছি,—আমার বিশ্বাস সেও আজ না হয় কাল এসে পৌঁছুবে। ভাই দেখতেই তো পাচ্ছ মানুষ এই আছে এই নেই,—কাজেই মানুষের সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকা উচিত। অমির আপনার বল্‌তে পৃথিবীতে আর কেউ নেই,—তবে তোমাদের হাতে দিয়ে যাচ্ছি,—দেখ যেন একেবারে না ভেসে যায়। শুধু এইটুকুই ভেব যে তার আর কেউ নেই—তোমরাই সব।"

সুদর্শন বাবু আরাম কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—শ্রীকান্ত বাবু মুখখানা যেন একটু গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "তোমার দেখছি সব বিষয়েই একটু বাড়াবাড়ি। তোমার এমন কিছু বেশী বয়স হয়নি যে এখনি যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। তবে উইল করেছ সে ভাল কাজই করেছ,—তোমার অত বিষয় সম্পত্তি, একটা উইল করে রাখা ভালো।"

সুদর্শন বাবু একটু মৃদু হাসিলেন,—ঘাড়টা নাড়িয়া বলিলেন, "ভাই এর ভেতর বাড়াবাড়ি কিছু নেই। আমার বিশ্বাস মানুষ যদি একটু ভালো করে

নিজের প্রতি লক্ষ্য করে যায়—তাহলে মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বেই সে অনায়াসে বুঝতে পারে, তার সময় শেষ হয়েছে। ভাই, এটা বাজে কথা ভেব না, আমি সত্যিই টের পাচ্ছি আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। এখন চল ভেতরে বসবে চল,—সমস্ত রাত ট্রেনে এসেছ,—কাপড় জামাটামাগুলো ছেড়ে ফেলে, একটু চা খেয়ে সুস্থ হবে চল। ভাই আমার যে দিন ফুরিয়ে এসেছে তা আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি।"

সুদর্শন বাবু আর কোন কথা বলিলেন না,—বাটীর ভিতরের দিকে অগ্রসর হইলেন। শ্রীকান্ত বাবু ও অমিয়া নীরবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বাটীর নীচের তলায় তিন চারিখানি ঘর আছে বটে কিন্তু সেগুলি লোকাভাবে খালি পড়িয়া থাকে,—সেগুলি এক্ষণে আর বাসোপযোগী নাই। আবর্জ্জনায় একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া সম্মুখের উঠানটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহারই পার্শ্ব দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়া তিনজনেই উপরে উঠিলেন,—উপরে দ্বিতলেও তিন চারিখানি ঘর; সিঁড়ির পার্শ্বের গৃহখানিই সুদর্শন বাবু বসিবার গৃহ করিয়াছিলেন। উপরে উঠিয়া সুদর্শন বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্রীকান্ত বাবু ও অমিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। গৃহে আসবাব পত্র অতি সামান্যই। গৃহের এক পার্শ্বে একখানি তক্তপোষ,—তাহার উপর মোটা বিছানা পাতা। সুদর্শন বাবু সেই তক্তপোষের উপর উপবিষ্ট হইয়া শ্রীকান্ত বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বোস শ্রীকান্ত।"

শ্রীকান্তবাবু সুদর্শনবাবুর পার্শ্বে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। অমিয়াও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল,—শ্রীকান্তবাবু তাহার গলার উত্তরীয়খানা খুলিয়া অমিয়ার হস্তে দিয়া বলিলেন, "নে মা এটা এক জায়গায় টাঙ্গিয়ে রেখে দে।"

সুদর্শনবাবু বলিলেন, "শ্রীকান্ত, জামাটাও খুলে ফেল,—সমস্ত রাত ট্রেণে এসেছ,—সমস্ত রাত গায়ে জামা আঁটা ছিল,—গায়ে একটু হাওয়া লাগা দরকার।"

তারপর, অমিয়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"যা মা ভেতরে যা,—তুই এসেছিস গৌরী বোধ হয় এখনও খবর পায় নি। সে কাল রাত্রেও তোর কথা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছে। তুই এসেছিস্ খবর পেলে সে এতক্ষণ ছুটে আসতো।"

সুদর্শনবাবু যা কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না,—শ্রীকান্তবাবু বেশ একটু রহস্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই গৌরীটী কে, তোমার শালির মেয়ে না? আহা মেয়েটীর কত কষ্ট!' এই বয়সে একে ব্রহ্মচর্য্য কর্ত্তে দেওয়া উচিত নয়। এই জিনিষটা আমাদের নিকট একেবারেই বিশ্রী ঠেক। এই জন্যই আমি বালিকা বিবাহের কোন দিনই পক্ষপাতি নই। এই মেয়েটীর কথা ভাবলে বুক ফেটে যায়। যার যা নয়, তাকে জোর করে কি তাই করান কোন মানুষের উচিত!"

গৌরীর কথায় সুদর্শনবাবুর মুখখানিও গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল,—তিনি অতি মৃদু স্বরে শ্রীকান্তবাবুর কথার উত্তর দিলেন, তার মুখের দিকে চাইলে যে বুক ফেটে যায় এ কথা কে অস্বীকার কর্ব্বে বল? কিন্তু যে পারে তার করাই উচিত। এমন মহিমাময় জিনিস আর কিছু নেই। মৃত স্বামীর স্মৃতি পূজায় সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া যে নারীর প্রাণটা নির্ম্মল হয়ে ওঠে, সে জিনিষের মত পবিত্র—সে জিনিষের মত মহান্ আর পৃথিবীতে কি থাকতে পারে বল? ত্যাগের এমন মূর্ত্তিমতী প্রতিমূর্ত্তি পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। এ আদর্শ একেবারে লুপ্ত করাও উচিত নয়। বরং এ আদর্শ দেখে পুরুষেরও কিছু ত্যাগ স্বীকার করা উচিত।"

শ্রীকান্তবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"করা উচিত বটে, কিন্তু কজন পুরুষ করে বা কর্ত্তে পারে? পুরুষের যখন স্ত্রী মরবার পর দুদিনও বিলম্ব সয় না আবার বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে, তাতে যখন কোন দোষ হয় না তখন মেয়েরাই বা কেন মুখটী বুজে এত যন্ত্রণা সহ্য কর্ব্বে। পুরুষের জন্য এক ব্যবস্থা আর মেয়েদের জন্যে আর এক ব্যবস্থা, এ কখন ভগবানের সৃষ্টি হতে পারে? স্বার্থপর পুরুষগণেরাই নিশ্চয় এই ব্যবস্থা করেছে। সুদর্শন ভাই, তুমি ঠিক জান না তোমার মত তো সব মানুষ নয়। যে দিন গৌরী এসে তোমার বাড়ী উঠেছে, সেই দিন থেকেই তুমিও মাছমাংস পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করেছ। কিন্তু এ রকম কজন করে। আমি জোর করে বলতে পারি, একজনও নয়। আমি দেখেছি মেয়ে একাদশীর দিন জলটুকু পর্য্যন্ত ঠোঁটে না দিয়ে পড়ে থাকে,—অথচ বাপ মা মাছের মুড়ো দিয়ে দিব্য করে ভাত খেয়ে ঢেঁকুর তুলছেন। পুরুষ মানুষ গায়ে আঁচটুকু পর্য্যন্ত সহ্য করবেন না,—আর মেয়েদের সব সহ্য কর্ত্তে হবে,—এটা যেন মেয়েদের প্রতি একটা মহা জুলুম বলে মনে হয়।"

সুদর্শনবাবু শ্রীকান্তের এই কথায় একটু মৃদু হাসিলেন,—ধীরে ধীরে বলিলেন, "জুলুমের ওপর কোন্ কাজটা সম্পন্ন হয়েছে বল ভাই। এ পৃথিবীতে জুলুম করে কেহ কোন দিন কোন কাজই কর্ত্তে পারেনি। আমাদের দেশের মেয়েদের যে ইচ্ছা আছে তাই তারা আমাদের এ জুলুমটুকু মেনে নেয়,—নইলে পুরুষের সাধ্য কি যে তারা মেয়েদের ওপর জুলুম কর্ত্তে পারে। যাক্ সে কথা,—এখন শুনি কলকাতার সংবাদ কি ?"

তারপর আবার অন্তঃপুরের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন,—"গৌরী,—গৌরী,—কে এসেছে দেখ।"

অতি প্রত্যূষে গৌরী গঙ্গা স্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুর পূজায় বসিয়াছিল। ঠাকুর পূজা শেষ করিয়া সে ত্রিতলের ঠাকুর ঘর বন্ধ করিয়া বাহির হইতেছিল, সেই সময় সুদর্শনবাবুর কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে তাড়াতাড়ি ঠাকুর ঘর বন্ধ করিয়া যে গৃহে সুদর্শনবাবু, শ্রীকান্তবাবু ও অমিয় আসিয়া বসিয়াছিল সে গৃহের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল। সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র সম্মুখে অমিয়াকে দেখিয়া তাহার ম্লান মুখখানির উপর যেন একটা আনন্দের ভাতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কিন্তু সুদর্শনবাবুর পার্শ্বে শ্রীকান্তবাবুকে দেখিয়া সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইল। তাহার কণ্ঠ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। সুদর্শনবাবু গৌরীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "মা গৌরী,—এঁর নাম শ্রীকান্তবাবু,—ইনি আমার বিশেষ বন্ধু,—এঁর কথা আমি তোমায় অনেকবার বলেছি,—এঁরই পরিদর্শনে থেকে অমি লেখা পড়া শিখছে। ইনি তোমার পিতৃতুল্য, এঁকে প্রণাম কর।"

গৌরী কোন কথা কহিল না, ধীরে ধীরে শ্রীকান্তবাবুর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। শ্রীকান্তবাবু তাঁহার পদদ্বয় একটু সরাইয়া লইয়া, যেন একটু ব্যস্তভাবে বলিলেন, "থাক মা হয়েছে,—আমি এমনিই তোমায় আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, কিন্তু কি যে আশীর্ব্বাদ করব তাই শুধু বুঝে উঠতে পাচ্ছিনি।"

সুদর্শনবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কেন ? তুমি আমার গৌরী মাকে এই আশীর্ব্বাদ কর,—স্বামী পূজায় মায়ের দেহ যেন নির্ম্মল হয়ে [illegible] ধর্ম্মে যেন তার চিরদিন মতি থাকে।"

এই হিন্দু বিধবার দিকে চাহিয়া, ইহার দুঃখের কথা ভাবিয়া শ্রীকান্তবাবুর

সমস্ত প্রাণটা একেবারে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল,—তিনি গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন, "মা আমি তোমায় তাই আশীর্ব্বাদ করি, তোমার যেন ধর্ম্মে চিরদিন মতি থাকে।"

সুদর্শনবাবু কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যা মা, গৌরীর সঙ্গে ভেতরে যা। সমস্ত রাত ট্রেণে জেগে এসেছিস, সকাল সকাল স্নান করে ফেলগে।"

অমিয়া কোন কথা বলিল না,—গৌরীর হাত ধরিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। শ্রীকান্তবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সুদর্শন, দেখ বাল্য বিবাহের কি জীবন্ত পরিণাম। তবু মানুষ বাল্য বিবাহ ত্যাগ কর্ত্তে পারে না। এমনি সংস্কার। আমাদের দেশ থেকে যতদিন পর্য্যন্ত না বাল্য বিবাহ প্রথা উঠে যাবে, তত দিন আমাদের জাতের,—আমাদের সমাজের কোন মঙ্গল নেই।"

সুদর্শনবাবু গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন, "কোন্‌টায় মঙ্গল,—কোন্‌টায় অমঙ্গল এ একটা বিরাট সমস্যা,—এ সমস্যার মীমাংসা যে কি তা জানেন তিনি, যিনি সর্ব্বজ্ঞ। আমার কি মনে হয় জান শ্রীকান্ত, এ সবই কর্ম্ম-ফল। কর্ম্মের উপরই পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা; যার যেমন কর্ম্ম তার তেমনি ভোগ।"

শ্রীকান্তবাবু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন,—বিশেষ কোন কথা কহিলেন না।

(ক্রমশঃ)